তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র

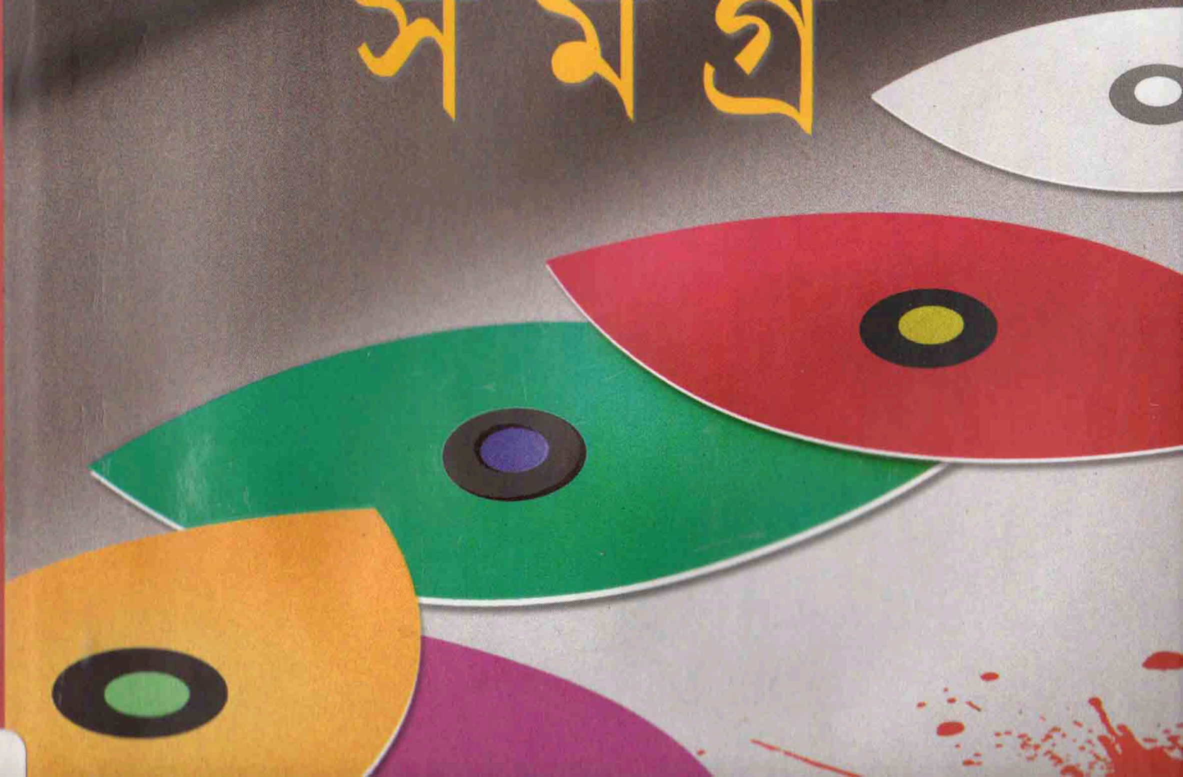

গোয়েন্দা গার্গী সমগ্র

১

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

pathagar.net

সূচি

ঈর্ষার সবুজ চোখ
৯
বহে বিষ বাতাস
২৩৯
হলুদ খামের রহস্য
৪১৫

pathagar.net

ঈর্ষার সবুজ চোখ

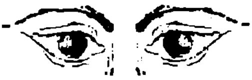

pathagar.net

উৎসর্গ

আশাপূর্ণা দেবীকে
শ্রদ্ধার সঙ্গে

রচনাকাল : অক্টোবর ১৯৯০—সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৫, মাঘ ১৪০১

pathagar.net

ঠিক চারদিন পর হাজতঘর থেকে মুক্তি পেতে একটা বড় করে শ্বাস নিতে চাইল সায়ন। কিন্তু পারল না। লোহার গরাদ দেওয়া দরজা, চার দেওয়ালের জানালাহীন বদ্ধ পরিবেশের ভেতর চার-চারটে দিন কাটিয়ে তার ফুসফুস যেন জমাট বেঁধে গেছে। তাতে হাওয়া ঢোকার মতো কোনও রন্ধ্রপথ নেই। মনে হচ্ছে চারদিন নয়, চার বছর কিংবা চার লক্ষ বছর পার হয়ে গেছে তার জীবনে। চারদিন চাররাতে ঠিক কত ঘণ্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড হয় তা সায়ন জানে না, কিন্তু এই দম-বন্ধ করা ঘরের ভেতর প্রতিটি মুহূর্তই তার জীবনে দীর্ঘতম হয়ে দেখা দিয়েছে। সে ভেবেছিল, হয়তো আর কোনও দিনও এই গরাদের বাইরে যাওয়ার ছাড়পত্র পাবে না। কিন্তু কাল সন্ধের পর থানার দারোগা যখন জানালেন, আপনার জামিন হয়েছে, কাল সকালেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তখন থেকেই প্রতিটি সেকেন্ডের কড়াক্রান্তি হিসেব করেছে সে। আর মনে মনে শিউরে উঠে ভেবেছে, উঃ কী ভীষণ এই হাজতবাস। চারপাশে অন্ধকার, দুর্গন্ধ, বীভৎস পরিবেশ। এই নরকের মধ্যে সায়নের মতো ভদ্র, শিক্ষিত, সুবেশ যুবক কীভাবে সময় কাটাতে পারে তা চারদিন আগেও তার বিশ্বাসের জগতে ছিল না।

অথচ নিয়তি হয়তো এরকমই ছিল। চারদিন আগে, কাকও ডাকেনি এমন ভোরবেলায় সে যখন মারুতিগাড়ি থেকে নেমেছিল তাদের বাড়ি 'ব্লু ওয়ান্ডার'-এর সামনে, অবাক হয়ে দেখেছিল, পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে। গেটটা খোলা, ভেতরে-বাইরে লোকজন, পুলিশের লোকই বেশি। তাকে দেখেই একজন কনস্টেবল চ্যাঁচিয়ে উঠেছিল, এই তো, কালপ্রিট এখানেই। বোধহয় পালাচ্ছিল—

সায়নের পরনে তখন সদ্য ট্যুর-থেকে ফিরে-আসা আধময়লা জামাপ্যান্ট, হাতে ব্রিফকেস। মাথার চুল কিছু উশকোখুশকো। চোখে রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। সে একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল, কী হয়েছে!

একজন সাদা পোশাকের লোক, পুলিশই হবে সম্ভবত, বলে উঠেছিল, আহা ন্যাকা, কিছু জানেন না যেন। বলেই চ্যাঁচিয়ে উঠেছিল বড়বাবু, এই যে, নাম্বার ওয়ান কালপ্রিট!

বাড়ির ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে পোড়া গন্ধ ভেসে আসতে চমকে উঠেছিল সায়ন। গন্ধটা কী বিশ্রী। গন্ধটা আসছে বাড়ির সেই দিক থেকে যেদিকে সায়নদের ফ্ল্যাট। তাহলে কি তাদেরই ফ্ল্যাটে কোনও কিছু—!

শরৎ বোস রোডের উপর সায়নদের বিশাল দোতলা বাড়ির সামনে তখন এক ভীষণ থমথমা। কিছু লোকজনও আশপাশের বাড়ি থেকে জেগে উঠে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়ির চত্বরে। চোখ তুলতেই দেখতে পেয়েছিল, সিঁড়ির কাছে অদ্ভুত ভয়ার্ত চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মা চন্দ্রাদেবী, ভাই হিমন, দুজনেই।

এমন থমথমার ভেতর পৌঁছে আসলে ঠিক কী ঘটেছে তা বুঝতেই পারছিল না সায়ন। শুধু পোড়া গন্ধটা হঠাৎ চলকে এসে ঠোনা দিচ্ছিল তার নাকের লতিতে। নিশ্চই কোনও দুঃসংবাদ, ভাবতেই সে আশেপাশে তাকাল। এ বাড়িতে তো আরও একজন সদস্য আছে। ঐন্দ্রিলা, সায়নের স্ত্রী। ঐন্দ্রিলা কোথায়? মাত্র দু'বছর আগে যাকে সায়ন অগ্নিসাক্ষী করে নিয়ে

pathagar.net

এসেছিল, যে তরুণী এ বাড়িতে আসার পরই প্রতিবেশীরা বলেছিল, এ তো দেবীপ্রতিমার মতো মুখ। বন্ধুরা বলেছিল, প্যারাগন অব বিউটি। এমনকি তার খুঁতখুঁতে মাও বলেছিলেন, ও মা, এ যে রূপের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। সেই ঐন্দ্রিলা, যাকে প্রথম দেখার মুহূর্তে ঝলসে গিয়েছিল সায়নের ছাব্বিশ বছরের চোখ। সাধারণ বাঙালি মেয়ের তুলনায় একটু দীর্ঘাঙ্গীই, মাথায় কোঁকড়া চুলের ঢল আধখানা চাঁদের মতো লাল ফর্সা কপাল, প্রায় শিল্পীর হাতের আঁকা নিখুঁত চোখ-নাক-ঠোঁট। যে মেয়েটি লজ্জায় চোখ নীচু করে থাকলে মনে হত, টলটলে দিঘির জলে একটি ফুটি-ফুটি রক্তপদ্মই যেনবা, সেই মেয়ে তার আয়ত চোখ মেলে তাকালে মনে হত, হঠাৎ পাপড়ি ছড়িয়ে ফুটে উঠল সেই রক্তপদ্মটি। অমনই রক্তবরণ তার গায়ের রং, অমনই টলটলে দিঘির মতো চোখ। সে বিছানায় শুয়ে থাকলে সায়ন ভাবত, কে সেই ঈশ্বর, যিনি এমন সৌন্দর্য রচনা করতে পারেন তাঁর নিখুঁত তুলিতে!

যে পোড়া গন্ধটা সেদিন ভোরে চাউর হয়ে গিয়েছিল বাতাসে, তা ঐন্দ্রিলার শরীর থেকেই। কখন যেন পরনের শাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল ঐন্দ্রিলার! তার ফলেই এই ভয়াবহ পরিণতি। কিন্তু কী করে শেষ রাতে তার শাড়িতে আগুন ধরল, তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য জবাব কেউ দিতে পারেনি পুলিশের কাছে। পুলিশ যখন দোতলায় সায়নদের অংশে ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল, তার ফ্ল্যাটের দরজা নাকি খোলাই ছিল। ভেতরে বেড়রুমের মেঝেয় পড়েছিল ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীর। তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেই পোড়া স্তূপের ভেতর থেকে। সেখানে আর কেউ ছিল না। এ বাড়ির দোতলায় অন্য ফ্ল্যাটটিতে তার মা ও ভাই থাকে। তার দরজা অবশ্য ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। পুলিশ বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেওয়ার পর সে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন চন্দ্রাদেবী আর হিমন। তারা দুজনেই পুলিশ দেখে যেন আকাশ থেকে পড়েছিল।

সেই মুহূর্তে বাড়ির কোথাও সায়নকে দেখা যায়নি। তার একটু পরেই ব্রিফকেস হাতে এসে পৌঁছেছিল সে। তাকে তখন ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সে শরীরের বীভৎসতায় চিৎকার করে উঠেছিল সায়ন। দু'চোখ দু'হাতের তালুতে ঢেকে আর্তনাদ করে বলেছিল, কেন ঐন্দ্রিলা, কেন, কেন। শুধু তার শাড়ির দু-একটা না-পোড়া অংশ, পোড়া আঙুলে তুঁতে রঙের পাথর-বসানো রুইতন আকারের আংটি, কানের ঝলসে যাওয়া দুল— এগুলো ছাড়া ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটি চেনার আর কোনও উপায়ই ছিল না। সে দৃশ্যে সায়ন মূঢ়, স্তম্ভিত, আতঙ্কিত। ঘটনার আকস্মিকতায় হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল। কেন ঐন্দ্রিলা, কেন— !

পুলিশ অফিসারটি সে কথা বিশ্বাস করেনি। গোটা বাড়ির সবখানেই তখন পুলিশে পুলিশ। এক অদ্ভুত, অবিশ্বাস চোখে তারা ঘিরে রয়েছে সায়নকে।

সায়ন তখন অবাক হয়ে ভাববার চেষ্টা করছিল, কী করে এমন বীভৎস কাণ্ড নিঃশব্দে ঘটে গেল! কেন হঠাৎ এভাবে মরতে হল ঐন্দ্রিলাকে! কী করে ভোর হওয়ার আগেই, পড়শিরা জেগে ওঠার আগেই পুলিশের কাছে পৌঁছে গেল এ খবর, সেটাও তার কাছে রহস্য। কেউ আত্মহত্যা করলে সে কি পুলিশে খবর জানিয়ে দেয় আগেভাগে!

আত্মহত্যা নয়, হত্যা। পুলিশ অফিসারটি দাঁত কিড়মিড় করে উচ্চারণ করেছিলেন, আপনারা তিনজনে মিলে একটি নিরপরাধ বধূকে হত্যা করেছেন। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায়, নির্ভুল গাণিতিক পদ্ধতিতে সময় হিসেব করে। ভোর হওয়ার আগেই যাতে ডেডবডি ডিজপোজ অফ করে দিতে পারেন—

pathagar.net

ততক্ষণে আরও বিস্ময় চারিয়ে গেছে সায়নের ভেতর, ইউ মিন, মার্ডার!

—ইয়েস, এ কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার। টেলিফোনটা ঠিক সময় না পৌঁছালে আপনারা সমস্ত প্রমাণ হাপিস করে ফেলতেন।

স্তম্ভিত চোখে তাকিয়েছিল সায়ন, কখন টেলিফোনটা গিয়েছিল আপনাদের কাছে?

—ভোর সাড়ে তিনটেয়। তার বোধ হয় ঘণ্টাখানেক আগেই আপনাদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে।

আর ভাবতে পারেনি সায়ন। তার হতভম্ব ভাব কাটার আগেই পুলিশ অফিসারটি গম্ভীর স্বরে বলেছিলেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

সায়নের তখন বলার ক্ষমতাও নেই, কেন। সে অসহায়ভাবে তার হাতে দুটো বাড়িয়ে দিয়েছিল, যেন হাতকড়া পরতেই হবে এমন নিয়তি তার। শুধু সে একাই নয়, এ বাড়ির আরও দুজন, তার মা চন্দ্রাদেবী, ভাই হিমন, তাদেরও উঠতে হয়েছিল পুলিশের গাড়িতে।

আশেপাশের বাড়ির আরও অনেকের চোখের সামনে দিয়ে, বহু চেনা ও অচেনা পড়শির বিস্ময়, আতঙ্ক আর কৌতুকের ভেতর তাদের তিনজনকে যেতে হয়েছিল থানায়, হাজতঘরের ভেতর।

ততক্ষণে সে বুঝে গিয়েছিল, শুধু পুলিশ অফিসার বা তার বাহিনীই নয়, সমস্ত পৃথিবী সেদিন সকাল থেকে তাদের দিকে লক্ষ তর্জনি ছুড়ে দেবে, ইউ আর দ্য মার্ডারার। তাদের বাড়ির চারপাশে ঘিরে থাকা সমস্ত পুলিশরা সেভাবেই তাকাচ্ছিল তাদের দিকে। প্রতিবেশীদের দৃষ্টির ধরনও ছিল সেরকমই। গাড়িতে উঠেও সে উদভ্রান্তের মতো ভেবে চলেছিল, আত্মহত্যা, না হত্যা! আত্মহত্যা হলে কেনই বা আত্মহত্যা! হত্যা হলে কে বা কারা। ঝিমধরা মাথায় চোখ বুজে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে চেষ্টা করেছিল, তার সঙ্গে ঐন্দ্রিলার এমন কোনও বাদানুবাদ বা কলহ হয়নি, যার জন্যে ঐন্দ্রিলাকে বেছে নিতে হবে আত্মহত্যার পথ। আর যদি একটি নিরপরাধ চব্বিশ বছরের তরুণীকে হত্যাই করা হয়ে থাকবে, তাহলে কেন! আর কারাই-বা! নিজের অজান্তেই পুলিশের গাড়িতে তার পাশে বসা দুজনের দিকে হঠাৎই তাকিয়ে দেখেছিল সে। গত দেড়-দু বছর মা বা ভাইয়ের সঙ্গে তার তেমন সম্পর্ক নেই-ই বলতে গেলে। তার আগেও যে ছিল তা-ও না। বলা যায়, পরিস্থিতির বিচারে তার সঙ্গে তার মা ও ভাইয়ের সম্পর্ক এক ধরনের বিরক্তিকর, ঘৃণার বা অসহ্যের। তাহলে কি তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার মা, কিংবা ভাই! অথবা দুজনে মিলে!

পুলিশ অফিসারটি বলেছেন, আপনারা তিনজনেই। ঘটনার দিন সন্ধেবেলা তাদের বাড়ির দারোয়ান মোহন ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল তার মোতিবাগানের বস্তিবাড়িতে। অতএব ঐন্দ্রিলা ছাড়া আর মাত্র তাদের তিনজনেরই সে রাতে বাড়িতে থাকার কথা। অতএব পৃথিবীর সমস্ত তর্জনি তো তাদের তিনজনের দিকেই ধাবিত হবে।

তা-ই হয়েছে। তারপর থেকে সন্দেহের সমস্ত তির ক্রমশ তাদের তিনজনের দিকেই আছড়ে পড়েছে। পরদিন একসঙ্গে তিনজনকে যখন কোর্টে আসামির কাঠগড়ায় তোলা হল, তখন সায়নের চারপাশে একরাশ অপমানের অন্ধকার। তার চোখ দুটো ঝাপসা, কান, গলা দিয়ে ঝাঁ-ঝাঁ করে আগুন বেরোচ্ছে, পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত একটা গরম হলকা। তার মধ্যেই সে অনুভব করল, বিচারক-উকিল-পেশকার থেকে শুরু করে উপস্থিত সমস্ত দর্শকই তাদের দিকে তাকিয়ে আছে এক অদ্ভুত কৌতূহল আর ঘৃণা নিয়ে। কোর্টরুম পেরিয়ে বাইরেও উপচে পড়ছে ভিড়। এহেন ভিড়, কেননা সেদিনই সকালে সমস্ত সংবাদপত্রের

boiRboi.net

হেডলাইনে ছাপা হয়েছে এক অভিজাত পরিবারের গৃহবধূ হত্যার খবর।

সংবাদপত্র তখনও দেখেনি সায়ন। তবু অনুমান করতে পেরেছিল, এসব খবর যতটা সম্ভব রসালো করে, নিখুঁত বর্ণনায় পরিবেশন করে রিপোর্টাররা। সমস্ত মানুষের ভাবনার, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় এই খবরটিই। তারপর দিনের পর দিন ধারাবাহিক উপন্যাসের মতো প্রকাশিত হতে থাকবে প্রতিদিনকার ঘটনাবলি।

আদালতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল ফোটোগ্রাফাররা। গাড়ি থেকে নামতেই কয়েকঝলক আলো জ্বলে ওঠার আগেই দেখেছিল, তার মা চন্দ্রাদেবী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছেন। হিমন এমনিতেই ঠাণ্ডা স্বভাবের, তবু কীভাবে যেন সেও তার দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল সেই মুহূর্তে। কিন্তু সায়ন তার মুখ ঢাকতে চায়নি। এই ভয়ঙ্কর বীভৎস ঘটনার সমস্ত দায় যেন সে নিজের উপরই ন্যস্ত করতে চেয়েছিল।

পরদিনই ছবিটি সমস্ত সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছে। তার সঙ্গে চৌধুরীবাড়ির সমস্ত অতীত ইতিহাস। সায়নের বাবার কথা, চন্দ্রাদেবীর কথা, তাঁর অসংখ্য পুরুষ-বন্ধুর কথা, বিশেষ করে রবার্ট ও নীলের প্রসঙ্গ, তার ভাই হিমনের স্ত্রী দীয়াও যে এখন আর চৌধুরীবাড়িতে থাকে না, এই সমস্ত ঘটনার কারণ ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ছেপেছে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা ধরে।

পুলিশ হাজতে থাকার সময় একদিন সংবাদপত্রের চেহারা একঝলক দেখে নিয়েছে সায়ন। তার প্রতিটি পংক্তিতেই অপমানের সূচ। সেই তীক্ষ্ণ ফলা তার চামড়ার গভীরে গিয়ে ফুটেছে।

তার পরদিন প্রকাশিত হয়েছিল সায়নের সোপ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি 'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর খুঁটিনাটি। সেখানেও নানান কেচ্ছার খবর খুঁজে পেয়েছে সাংবাদিকরা। অনেক ষড়যন্ত্র, অনেক নারীঘটিত ব্যাপার। তিন-চারদিনের খবরের কাগজ খুঁটিয়ে পড়ার পর সে উপলব্ধি করেছে, শৈশব-কৈশোর থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা তার কেরিয়ার একমুহূর্তে, একটি রাতের আকস্মিকতায়—তার বীভৎসতায় ধুয়েমুছে শেষ হয়ে গেছে। ঐন্দ্রিলার সুন্দর শরীরটার সঙ্গে তার জীবন, যৌবন, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব পুড়ে ছারখার।

সরকারি পক্ষের উকিল সেদিনই আদালতে সওয়াল করে বলেছিলেন, ইয়োর অনার, এই ভদ্রবেশি মানুষগুলো যে কী ধরনের পাশবিক অত্যাচার করে তাদের ঘরের বউয়ের উপর, দিনে দিনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, তা ভাবা যায় না। এক নম্বর আসামি সায়ন চৌধুরী একজন যুবক, অফিসের কাজের নাম করে মাসে অন্তত দশদিন বাইরে রাত কাটায়, কলকাতার বাইরে জেলা-শহরে কিংবা অন্য রাজ্যে ট্যুরে যায়, দামি হোটেলে রাত্রিবাস করে অন্য মেয়েছেলের সঙ্গে। ঘরের বউকে সঙ্গ দেয় না, টরচার করে, মাত্র দু'বছর বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে তাদের ভেতর চরম অবনিবনা। আরও আশ্চর্যের ঘটনা এই যে, হত্যাকাণ্ডের মাত্র চারদিন আগে, দোসরা এপ্রিল, এই আসামি ট্যুরের নাম করে গিয়েছিল মধ্যপ্রদেশে। সঙ্গে ছিল আলো বোস নামের এক মহিলা, একই ট্রেনে একই ক্যুপে দুজনে ট্রাভেল করেছে, তেসরা এপ্রিল রাত কাটিয়েছে বিলাসপুর স্টেশনের কাছে এক হোটেলে, এই দেখুন হুজুর, 'হোটেল মীনাক্ষী' থেকে আমরা রেজিস্টার ও বিলের ফোটোকপি আনিয়েছি। সেখানে প্রকাশ্যে ব্যভিচার করেছে, অথচ তার দুদিন পর পাঁচ তারিখে সকালে বাড়ি ফিরে এসে চরম উৎপীড়ন করেছে তার স্ত্রীর উপর—এই দেখুন তার ট্রেনের ফেরার টিকিটের কপি, আর সেই অত্যাচারের পরিণতিতে সেদিন শেষ রাতে, অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডার মতে ছ তারিখ ভোরবেলা এই হত্যাকাণ্ড। দু'নম্বর আসামি চন্দ্রাদেবীও একজন দুশ্চরিত্রা, দুঁদে মহিলা। তাঁর অত্যাচারে বাড়ি

ছেড়ে পালিয়েছে এই মামলার তিন নম্বর আসামি হিমন চৌধুরীর স্ত্রী। একইভাবে তাঁর বড় ছেলে সায়ন চৌধুরীর স্ত্রীকেও তিনি তাড়াতে চেয়েছিলেন। পারেননি বলেই শেষপর্যন্ত ষড়যন্ত্র করে এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছেন, তিন নম্বর আসামি হিমন চৌধুরীও—।

সওয়াল শুনতে শুনতে অবাক হয়ে গিয়েছিল সায়ন। বিস্ময় এই কারণেই যে, জবরদস্ত উকিলবাবুরা কী চমৎকারভাবে সাজাতে পারেন এ ধরনের মামলা। শুধুমাত্র উপস্থাপনার গুণে, কথার কারসাজিতে হয়কে নয়, নয়কে হয় করতে পারেন।

সরকারি উকিলের সওয়ালের বয়ান, অবশ্য অনেকাংশেই সত্যি। সে গত সপ্তাহে বিলাসপুরে ট্যুরে করতে গিয়েছিল ঠিকই। একই ক্যাম্পে ছিলেন আলো বোস তাও ঠিক, বিলাসপুরে এক রাত্রি হোটেলে বাস করেছে সেটাও মিথ্যে নয়, তার মা সত্যিই একজন জাঁহাবাজ মহিলা, তার ভাই হিমনের স্ত্রী দীয়াও যে তাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—এ সবই সত্যি। তবু সব মিলিয়ে উকিলবাবু যেভাবে উপস্থিত করলেন ঘটনাগুলো, সেটা মিথ্যে। বিশেষ করে আলো বোসের সঙ্গে তরা ব্যভিচারের ঘটনাটা। অনেক ভেবেচিন্তে উকিলবাবুকে এভাবেই সাজাতে হয়েছে কেসটাকে। এতসব তথ্যের সঙ্গে সায়নকে যেভাবে জড়ানো হয়েছে খুনের সঙ্গে, তাতে যে-কোনও মানুষেরই মনে হবে, এ খুবই বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। কিন্তু ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক তো ঠিক এরকম ছিল না।

ঘটনার পারম্পর্য, আদালতের সওয়াল অনুযায়ী সায়নকেই হত্যাকারী ভাবা স্বাভাবিক। সায়নের কলকাতায় ফেরার ট্রেনের টিকিটের তারিখ মেলালে তার যে পাঁচ তারিখ রাতে তাদের শরৎ বোস রোডের বাড়িতে উপস্থিত থাকার কথা, এ বিষয়ে কারও দ্বিমত হওয়ার অবকাশ নেই। তাই সায়ন কাউকে বিশ্বাস করাতে পারেনি—পাঁচ তারিখ ভোরে তার কলকাতা ফেরার কথা থাকলেও সে আসলে ফিরেছিল ছ' তারিখ। ভোররাত্রে, সেদিন বাড়িতে তার পা দেওয়ার কিছুক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে ঐন্দ্রিলার। কিন্তু কেউ সে কথা বিশ্বাস করেনি। করেনি বলেই সম্ভাব্য হত্যাকারীদের তালিকায় তারই নাম সবার প্রথমে। সায়ন নিজেও অবাক হয়ে ভেবেছে, তার ফিরতে যে একদিন দেরি হল, সেও কি নিয়তির অমোঘ টানে!

হাজত থেকে বেরোবার মুখে একজন কনস্টেবল জানাল, তাকে একবার বড়বাবুর কাছে যেতে হবে।

যেতে হল, কারণ কয়েকটা খাতায়, কাগজপত্রে সইসাবুদ করার ব্যাপার আছে। এসব কেসে এত সহজে জামিন পাওয়া যায় না। জামিনের শর্ত হয়েছে, প্রতি সপ্তাহে একদিন করে আই ও অর্থাৎ ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কাছে হাজিরা দিতে হবে। এর আগে এমন অভিজাতবাড়ির যে ক'টি কেলেঙ্কারি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা আলোকিত করেছে, সেসব কেসের অভিযুক্তদের কাররওই এভাবে জামিন হয়নি। দু'মাস তিন মাস পর্যন্ত জেলে-হাজতে পচতে হয়েছে। একটা কেসে তো প্রথমে ফাঁসির হুকুম, পরে তা রদ হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। প্রথমদিন অ্যারেস্ট হয়ে হাজতে ঢোকার পর জেলের বাইরেই আর বেরোতে পারেননি তাঁরা। সায়নদের পক্ষের উকিল তাঁর সওয়ালে এমন কিছু জোরালো বক্তব্য রেখেছেন, যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনদিনের মাথায় তার মা ও ভাই, চারদিনের মাথায় তাকে জামিন দিয়েছেন বিচারক।

চারদিন পর হাজতের বাইরে বেরিয়ে সায়নের মনে হল, তার বয়স বেড়ে গিয়েছে আরও অন্তত কুড়ি বছর। তার মুখে এমন খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় রুক্ষ চুল, আয়নায় না দেখেও মনে হচ্ছে তাতে পাক ধরে গিয়েছে। চেহারায় এক অকালবৃদ্ধের ছাপ। কেমন জীর্ণ, ন্যুব্জ হয়ে

গিয়েছে শরীরটা।

তাকে দেখে পুলিশ অফিসার কয়েকটা খাতা এগিয়ে দিলেন, নিন, এইখানে সই করুন—

যন্ত্রচালিতের মতো এখানে-ওখানে সই করল সায়ন।

—এই কাগজটাতেও।

আবারও কাঁপা-কাঁপা হাতে সে তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করল। এখন আর কোনও কিছু পড়ার সময় নেই, ভাবারও সময় নেই। অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এসেও মনে হচ্ছিল, কুয়াশায় ঢেকে রয়েছে চারপাশ। সে এখন একদম একা। বাইরের পৃথিবীতে এখন তার জন্য কেউ আর অপেক্ষায় নেই। পুলিশের গাড়িতে প্রথমদিন ওঠার সময় সে যেমন তার মা ও ভাইকে মনে মনে সম্ভাব্য খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, তেমনই তার প্রবল প্রতাপান্বিত মায়ের একঝলক দৃষ্টি দেখে তারও মনে হয়েছিল, তিনিও সায়নকে সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে ভাবছেন। হিমনের কথা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যেই আনেনি সে। সেদিন শুধু নয়, কোনও দিনই। হিমন বরাবরই হিমশীতল। ওর বউ দীয়াই বলত—

গাড়িতে যেতে যেতে সে আরও বুঝেছিল, তার সঙ্গে তার মা ও ভাইয়ের যে দুস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে গত কয়েক বছরে, তার প্রকাশ আরও প্রবলভাবে ঘটে গেল গাড়িতে পাশাপাশি বসে থাকার সময়। আরও হিংস্রভাবে।

—আপনার জন্য একজন অপেক্ষা করছেন বাইরে, ইনস্পেক্টরের গলার স্বরে চমকে উঠল সায়ন, কে?

—একজন যুবতী, বলেই একচিলতে বাঁকা হাসি ভদ্রলোকের পুরু ঠোঁটে খেলে গেল। যুবতী বলেই এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ।

সায়ন হতবাক হয়। একজন খুনি আসামির জন্য কে অপেক্ষা করছে বাইরে! তার অফিসের পি.এ. কঙ্কা রায়? নাকি তার কোম্পানির অ্যাডভাইটিজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদার?

পুলিশের খাতায় সই-স্বাক্ষর শেষ হওয়ার পর সায়ন যখন চোখ তুলে তাকাল, তার চারপাশে বিদ্যুতের মতো ঝকমকাচ্ছে অজস্র বাঁকা-হাসির ছুরি। সে এখন এমন একজন খুনি আসামি যে ধরা পড়েছে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে, তারপর গত চার দিন হাজতবাস করার পর এখন জামিনে ছাড়া পেয়ে বেরোচ্ছে, আর তারই জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছে একজন যুবতী—সংবাদটি তার চরিত্র উন্মোচনের পক্ষে যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ।

কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল তার। অবশ, নিথর পায়ে বাইরের দিকে পা বাড়াতে যাবে, তখনই কেউ যেন বলল, এই নিন, আপনার কিছু বিলঙ্গিংস্।

কিছু কাগজপত্র, কয়েকটা টাকা—হাজতে ঢোকানার সময় সায়নের পকেটে যা পাওয়া গিয়েছিল, তা পুলিশ রেখে দিয়েছিল ওদের জিম্মায়। সায়ন তাও মাথা নীচু করে নিল। চারপাশে সবাই তখন কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। শুধু একদিকে বেঞ্চির উপর বসে খাকি পোশাক পরা একজন দারোগা-চেহারার লোক মন দিয়ে সেদিনকার সংবাদপত্রে চোখ বুলোচ্ছে। লোকটি কাগজের সেই অংশেই চোখ রেখেছে, যেখানে ফলাও করে ছাপা হয়েছে সেদিনকার ঐন্দ্রিলা-হত্যার ধারাবিবরণী। নিশ্চয় সে বর্ণনা এমন রসালো যে লোকটি ঘটনার

নায়ককে চোখের সামনে দেখার সুযোগ পেয়েও সেদিকে না তাকিয়ে খবরের কাগজ পড়ে চলেছে একমনে।

সায়ন অবাক হয় না। স্ক্যান্ডালের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াটা মানুষের স্বভাব। সে কেচ্ছা যদি কোনও অভিজাত বাড়ির হয়ে থাকে, তবে তা আরও মুখরোচক হয়। তা তারিয়ে তারিয়ে পড়ার ভেতর এক ধরনের নিষিদ্ধ রোমাঞ্চ থাকে। সায়ন এখন এই স্ক্যান্ডালের নায়ক। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় তাকে বর্ণনা করা হয়েছে এক অসাধারণ নারীশিকারি হিসেবে। তার সঙ্গে তার পারিবারিক নানান কেচ্ছার গল্প জড়িয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার নারীলোলুপ চরিত্র। হাজতবাস করে বেরোচ্ছে যে উশকোখুশকো চেহারার সায়ন, তার চেয়ে রিপোর্টিং অনেক উত্তেজক। তাই-ই দারোগা-চেহারার লোকটি—

অথচ এই সায়ন আশৈশব ব্রিলিয়ান্ট, চৌখস ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল তার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন। তার প্রতিটি রেজাল্টশিটই ছিল সম্ভ্রম করার মতো, অন্য যে-কোনও ছাত্রের কাছে ঈর্ষণীয়, প্রেরণার আধারও বটে। জন্মসূত্রে সে এই মেধা লাভ করেছিল তার বাবা নিশীথ চৌধুরীর কাছ থেকে।

নিশীথ চৌধুরী ছিলেন দক্ষিণের এই অভিজাত এলাকার এক খ্যাতনামা ডাক্তার। শরৎ বোস রোডের ওপর বিশাল দোতলা বাড়িটি তিনিই তৈরি করেছিলেন অনেককাল আগে, উনিশশো আটান্নো। তাঁরও ছিল স্কুল-কলেজে নজর কাড়ার মতো ঝকঝকে কেরিয়ার। ডাক্তার হিসেবে খুবই নাম করেছিলেন প্রথম জীবনে, তারপর বিলেত ঘুরে আসার পর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর পশার বেড়ে গিয়েছিল হু-হু করে। বাড়ির একতলায় বিশাল চেম্বার ছিল, তাতে সর্বক্ষণ অপেক্ষা করত অজস্র রুগি। তার সঙ্গে বাইরের 'কল'ও ছিল অহরহ। চেম্বারের পিছনে বিশাল একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করে তাতে গবেষণা করতেন চেম্বারের রুগি দেখা থেকে ফুরসত খুঁজে নিয়ে, এ ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কম নয়, বড় বড় ইনস্টিটিউটে সেমিনার, মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকতেন।

এতসব কর্মকাণ্ড নিয়ে তিনি এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে নিজের বাড়িতে সময় দেওয়ার অবসরই জুটত না। এমনকি বিয়ের পর চন্দ্রাদেবীর সঙ্গেও সময় দিতে পারতেন না তেমন। চন্দ্রাদেবীর তাতে অবশ্য খুব একটা যায় আসেনি, কারণ তাঁর রূপ, সৌন্দর্য ও আভিজাত্যের প্রভাবে তিনি ইতিমধ্যে জুটিয়ে ফেলেছিলেন অনেক পুরুষ বন্ধু। তাঁরা পালা করে ব্লু ওয়ান্ডারে এসে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে যেতেন। বিশেষ করে রর্বাট ও'নীল নামের বিদেশি যুবকের সঙ্গে চন্দ্রাদেবীর ঘনিষ্ঠতা ছিল চোখে পড়ার মতো। নিশীথ চৌধুরী তাঁর প্রফেসন নিয়ে এতই ব্যাপৃত থাকতেন যে স্ত্রীর এই পদস্খলনকে তেমন আমল দেননি। কেন না তার আগেই চন্দ্রার কোলে এসে গেছে সায়ন। নিশীথ চেয়েছিলেন, তাঁর এই ফুটফুটে ছেলেটি তাঁরই মতো নাম-ডাকঅলা ডাক্তার হোক।

সায়ন যখন দু'বছরের, তখন চন্দ্রাদেবী জন্ম দিলেন আর এক পুত্রের, সে হিমন। যে নিশীথ চৌধুরী রাতদিন ব্যস্ত থাকতেন ডাক্তারি নিয়ে, দক্ষিণ কলকাতার মানুষ যে ডাক্তারের নাম ধন্বন্তরির মতো জপ করত, সেই তিনিই হঠাৎ হিমনকে দেখে কেমন চমকে উঠলেন। বিড়বিড় করে বললেন, এর চুল এমন লালচে কেন! এমন কোঁকড়া-কোঁকড়াই বা কেন!

সায়নের মুখচোখের সঙ্গে হিমনের এতটাই তফাত যে তাকে দেখে কেমন পাগলের মতো হয়ে গেলেন নিশীথ চৌধুরী। তাঁর ডাক্তারিতে ভাটা পড়ল, সারাক্ষণ তাঁকে দেখাত উদ্ভ্রান্ত,

pathagar.net

অন্যমনস্ক। কেবলই বলতেন, ওর চুল অমন লাল্‌চে কেন! অমন সাহেবি-চেহারার কেন আমার ছেলে! এই আঘাত এতটাই তীব্র হয়ে উঠল যে এরপর আর খুব বেশিদিন বাঁচেননি নিশীথ চৌধুরী। তখন সায়ন বেশ ছোটই। সে কিন্তু বড় হয়ে কেন কে জানে ডাক্তার হতে চায়নি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন স্কলারশিপ নিয়ে বেরোল, তখন একটা কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হল, অন্তত বাবার চোখের সামনে তাকে অবাধ্য হতে হবে না। সে ইতিমধ্যে স্থির করে নিয়েছে, বড় হয়ে স্বাধীনভাবে অন্য কেরিয়ার গড়বে। ডাক্তার নয়, ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি, এমন ধরনের একটা কিছু।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেমিস্ট্রিতে ডিগ্রি নেওয়ার পর সে ঠিক করল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে আমেরিকা পাড়ি দেবে। যখন জিনিসপত্র গোছগাছ করছে, ঘোরাঘুরি করছে পাসপোর্ট, ভিসা ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য, ঠিক সে সময় তার নজরে পড়ল সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি ছোট্ট ফিচার। ফিচারটি ভারি অভিনব, আর সায়নের মনে হল, জীবনে বড় হয়ে ওঠার অ্যাম্বিশন যাদের আছে, তাদের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিদেশের পটভূমিকায় রচিত এই ফিচারটি বেশ কয়েক দশক আগের এক দরিদ্র কিশোরকে নিয়ে, যে সামান্য অবস্থা থেকে শুধুমাত্র ইচ্ছাশক্তি, অধ্যবসায় আর কঠোর পরিশ্রমে উন্নীত হয়েছিল সাফল্যের চূড়ান্ত সীমায়। নীল চোখ, লালচে গায়ের রং আর সোনালি চুলের এই কিশোর প্রথমে জীবনে মাথায় সাবানের কেক নিয়ে ফেরি করে বেড়াত পাড়ায় পাড়ায়, দোকানে দোকানে। সেই ছিল তাদের পরিবারের একমাত্র রোজগেরে মানুষ, যার ওপর নির্ভর করত তার একদা-পরিশ্রমী কিন্তু এখন পঙ্গু বাবা, স্নেহশীলা মা ও একদঙ্গল ভাইবোন। যে সাবান সে মাথায় নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াত, তার না ছিল কোনও নাম, না ছিল রঙিন মোড়কে জড়ানো। সাবান মানে তখন শুধুই সাবান।

সেই কিশোর একদিন সারাক্ষণ ঘুরে ঘুরে যখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, হঠাৎ তার মগজে উদয় হল এত অদ্ভুত ভাবনা। তার মনে হল, সাবানের কেকগুলো যদি কোনও ঝকমকে, রঙিন, মোলায়েম কাগজে মুড়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় ক্রেতার সামনে, তা হলে সাবানটি তার কাছে নিশ্চই আরও লোভনীয় হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্য, তার এই ভাবনাটি সাবান বিক্রির ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ঝকঝকে প্যাকেটে ভরে সাবান বিক্রি করতে শুরু করায় অন্যান্য বিক্রেতাদের চেয়ে তার সাবানের চাহিদা বেড়ে গেল অনেক বেশি। তার পরের ভাবনাটি আরও চমকপ্রদ। সে ভাবল, মোড়কের ওপর সাবানের একটা জুতসই নাম লিখে দিলে হয়তো আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। যেসব মানুষ এখন দোকানে গিয়ে 'একটা সাবান দাও তো' বলে, সে এরপর বলতে শিখবে 'অমুক সাবান দাও'। তাতে তার সাবানের কাটতি নিঃসন্দেহে উর্ধ্বমুখী হবে দিনে-দিনে।

মাথায় সাবান নিয়ে ফেরি করে বেড়াত যে সোনালিচুলের কিশোর, সে পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়ে ওঠে সাবানের একচেটিয়া ব্যবসায়ী হিসেবে। এর পর নিজেই সাবান তৈরি করবে বলে শুরু করল একটি ছোট্ট কারখানা। নিজস্ব ব্র্যান্ডনেমের সেই ছোট্ট কারখানা ক্রমশ রূপান্তরিত হয় এক বিশাল কারখানায়। তারপরের ঘটনা এক ইতিহাস। সারা পৃথিবী জুড়ে কোটি-কোটি টাকার ব্যাবসা করে সেই কিশোর পরবর্তী কালে সাবান-ব্যবসায়ের অন্যতম পথিকৃৎ বলে গণ্য হয়েছে।

সেই কিশোরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সায়নও চেয়েছিল, এমনই কোনও একটি ব্যাবসা শুরু করতে, যে পণ্যদ্রব্য মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগে। সাবানের কারখানার উদাহরণটি

মাথায় রেখে সায়ন চলে গিয়েছিল আমেরিকায়—তার কেরিয়ার তৈরির জন্য। বাবার রেখে যাওয়া টাকা নিয়ে সেখানে দু'বছর পড়াশুনা করে আবার ফিরে এল কলকাতায়। এসেই শুরু করেছিল তার 'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড', তাতে নতুন ও অভিনব ধরনের সব সাবান তৈরি করে সে-ও এ দেশে সাবান তৈরির জগতে আনতে চেয়েছিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এ দেশে সাবান তৈরির তখন অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানি—প্রত্যেকেই চুটিয়ে ব্যাবসা করছে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, এমনকি দেশের বাইরেও। তারা খবরের কাগজে, টি.ভি.-তে কোটি-কোটি টাকার বিজ্ঞাপন করে মার্কেটে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে বিরাজ করছে।

তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভাবাই যায় না। সায়নও এত সব বড়-বড় কোম্পানির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠবে এমন ভরসা করেনি প্রথমে। কিন্তু তার চোখে পড়েছিল, খাস কলকাতায় আর একটি বড় কোম্পানি 'দি লাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' বেশ রমরমা ব্যাবসা চালাচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে। 'লাইম ইন্ডিয়া'র চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় এক প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। চেহারা ছোটখাটো, কিন্তু তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি প্রখর। মাত্র দু'লাখ টাকা ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে সাবানের ব্যাবসা শুরু করে ক্রমে তাঁর কোম্পানিতে কয়েক কোটি টাকার টার্নওভার। ভিন রাজ্যের নামীদামি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে দিব্যি টক্কর দিয়ে জমিয়ে ফেলেছেন তাঁর কোম্পানির ব্যাবসা। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটের এককোণে একটা বিশাল ন'তলা বাড়ির গোটা সাততলাটা নিয়ে তাঁদের অফিস। গায়ে-মাখা সাবান, ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরির জগতে ঈর্ষণীয় বাজার তৈরির মুখে এসে পৌঁছেছে মাত্র পনেরো-ষোলো বছরের মধ্যে। কোম্পানির প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণতোষ বটব্যাল পরপর তিন-চার ধরনের সাবান তৈরি করে এমন চমক দিয়ে বাজারে ছেড়েছিলেন যে অন্তত তার পরের দশ-পনেরো বছর কোম্পানির টার্নওভার নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়নি। কলকাতার বাজারে, এমনকি মফস্বলেও তাদের রেডরিবন বিউটিবাথ ব্লু জুয়েলের তখন ভীষণ কাটতি। অন্য ছোটখাটো কোনও বাঙালি কোম্পানি লাইম ইন্ডিয়ার প্রোডাক্টের ধারে কাছে পৌঁছাতে পারছিল না। কোম্পানির সর্বশেষ উৎপাদন ছিল লেমন্ টাচ যা গায়ে মাখলেই চমৎকার গন্ধরাজ লেবুর গন্ধে ভুরভুর করত শরীর। লাইম ইন্ডিয়াকে দেখে সায়নের মনে হল, তা হলে বাঙালি কোম্পানিও ইচ্ছে করলে বড় হতে পারে।

হঠাৎ একদিন কলকাতার সব কাগজেই বড়-বড় করে নতুন একটি সাবানের বিজ্ঞাপন বেরোল। একটি বাঙালি কোম্পানি 'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ লিমিটেড' বার করেছে 'রোজবেরি' নামে একটি সাবান, যার মোড়ক থেকে সাবানের শেষ বিন্দু পর্যন্ত চমৎকার গোলাপের সুবাসে ভরা। স্নানের ঘরে রাখলে গোটা বাথরুম গোলাপের গন্ধে ভরে ওঠে। পর পর দু-তিনটি এমন চমক দেওয়া বিজ্ঞাপনও বেরিয়ে গেল সংবাদপত্রে যে, বাসে-ট্রামে, রেস্তোরাঁয়, বাড়িতে-বাড়িতে শুরু হয়ে গেল 'রোজবেরি' নিয়ে আলোচনা।

'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস'-এর ধারাবাহিক সাফল্যের সেই শুরু। সায়ন ততদিনে তার ফ্ল্যাটের পেছনের অংশে একটা ঘরে ছোট্ট ল্যাবরেটরি-রুম তৈরি করে নিয়েছে। তার বাবা নিশীথ চৌধুরী একতলায় যেমন গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন, ঠিক সেই ধাঁচে। বিদেশ থেকে শিখে আসা অধীত বিষয়ের সঙ্গে নিজের জ্ঞান মেধা মিশেল দিয়ে সেই ছোট্ট ঘরটিতে সায়ন গবেষণা করে চলল অবিরাম। তারপর একের পর এক নতুন ফর্মুলা বার করেছে গায়ে মাখা সাবান তৈরির অভিনব সব রহস্য। তার তৈরি প্রতিটি প্রোডাক্টই তখন স্বাদে-গন্ধে অপূর্ব। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের প্রতিটি বর্ণময় সৃষ্টিই তখন আলোড়ন তুলছে গেরস্থ-ঘরে।

pathagar.net

সায়ন চৌধুরীর জীবনে তখন একটাই মূলমন্ত্র, ওয়ার্ক, ওয়ার্ক হার্ড। বড় হওয়ার পথে কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। সে ততদিনে নতুন করে সাজাচ্ছে তার অফিস। ভাল-ভাল অফিসার রিক্রুট করছে তার এসপ্ল্যানেড ইস্টের নতুন অফিসে। পূর্ব কলকাতার উপকণ্ঠে অনেকখানি জায়গা নিয়ে তৈরি করেছে ফ্যাক্টরি। প্রতিটি কর্মীকে উৎসাহ দিচ্ছে কাজে। শেখাচ্ছে তার জীবনের মন্ত্র, ওয়ার্ক হার্ড। অনেককাল আগে রদ্যাঁর শিল্পকর্ম দেখতে গিয়ে সায়ন জেনে ফেলেছিল এই বিখ্যাত ভাস্করটির জীবনী। বিশালদেহী অসুরের মতো চেহারার মানুষটির জীবনেও এই একটিই বাণী কাজ করত তাঁর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। তাঁর কাছে সেক্রেটারির কাজ করতে এসেছিলেন তরুণ কবি রাইনার মারিয়া রিলকে, যিনি পরবর্তীকালে জার্মান কবিদের অন্যতম পুরোধা হিসেবে খ্যাত। রদ্যাঁ তাকে বলেছিলেন, পরিশ্রম করো, নিরন্তর পরিশ্রম করো। শুধু মেধা থাকলেই কেউ বড় হতে পারে না, মেধার সঙ্গে পরিশ্রম মিশিয়েই—

সায়নও জানত, পৃথিবীর সমস্ত কৃতী মানুষ জীবনে কঠোর পরিশ্রম করেই বড় হয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানীই হোন, লেখক, কবি বা শিল্পীই হোন, রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা ব্যবসায়ী যিনিই হোন না কেন, কেউই জাদুবলে রাতারাতি বড় হননি। প্রত্যেক বড়মাপের মানুষের সাফল্যের ইতিহাস খুঁজলে প্রমাণিত হবে তাঁর জীবন কতখানি পরিশ্রম দিয়ে তৈরি।

আর আশ্চর্য, সায়নের মেধায়, পরিশ্রমে, উদ্যোগে কয়েক বছরের মধ্যেই তার কোম্পানি ছাড়িয়ে গিয়েছিল বাজারের অন্য সব কোম্পানিকে। অনেক দিনের পুরানো কোম্পানি 'লাইম ইন্ডিয়ার'ও নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে ততদিনে।

লাইম ইন্ডিয়ার ছোট্টখাট্ট গোলগাল চেহারার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় তখন রাগে চুল ছিঁড়ছেন। হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস জুড়ে বসেছে কলকাতার মার্কেটে, ছড়িয়ে পড়ছে জেলায়-জেলায়। তাতে ভিন রাজ্যের নামী কোম্পানির প্রোডাক্টও যেমন মার খাচ্ছে, তেমনি সেল ফল করছে লাইম ইন্ডিয়ারও।

হেমজ্যোতি সিংহরায় তখন ঘন ঘন মিটিং করছেন অফিসে, অনবরত ধমকাচ্ছেন অফিসারদের। চ্যাঁচাচ্ছেন, লাইম ইন্ডিয়ার অবস্থা এখন ভয়ঙ্কর খাদের মুখোমুখি, গত দিন বছরে কোম্পানির টার্নওভার প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। প্রতি বছরই দশ-পনেরো লক্ষ টাকা লোকসান হচ্ছে, ব্যাঙ্কের ক্রেডিট-লিমিট ছাড়িয়ে আরও বারো কোটি টাকা ওভার-ড্রাফ্‌ট্‌ চলছে। এই মুহূর্তে মির‍্যাকল্‌ কিছু না করতে পারলে কোম্পানির ক্লোজার ঘোষণা করা ছাড়া কোনও উপায়ই থাকবে না। আর তার অর্থ, এই কয়েক হাজার কর্মচারীর বেকারত্ব।

সায়নও তার কোম্পানির কর্মচারীদের মিটিং করে বলছে, লাইম ইন্ডিয়া কিন্তু ঢেলে সাজাচ্ছে তাদের প্রতিষ্ঠান। আমাদের কোম্পানিতে সাফল্য এসেছে বলে একটুও রিল্যাক্স করার সময় নেই। আমাদের কাজে সামান্য গাফিলতি হলেই কিন্তু লাইম ইন্ডিয়া আবার জাঁকিয়ে বসবে বাজারে, এখনও পর্যন্ত আমরা তৈরি করেছি শুধু স্নান করার সাবান। এরপর তৈরি করতে চলেছি নতুন এক ধরনের মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার।

পাশাপাশি দুটো কোম্পানি থাকলে তাদের মধ্যে এহেন প্রতিযোগিতা লেগেই থাকবে। সায়নের ধারণা, তাতে কর্মীদের ভেতর প্রেরণা জোগাতে সুবিধে হয়। তার কোম্পানি যখন মার্কেট ধরে ফেলেছে, তখন একমাত্র উপায় হল, এই বাজারটা ধরে রাখা, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করা। মধ্যবিত্ত-মানসিকতাও ততদিনে ভালই পড়ে ফেলেছে সায়ন। মধ্যবিত্ত মানুষ যা চায় তা হল কম দাম ভাল প্রোডাক্ট, তবেই বেশি বিক্রি। বেশি বিক্রি মানে বেশি লাভ। বেশি লাভ মানে কোম্পানির বাড়বাড়ান্ত।

pathagar.net

'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টের' এমন ভরা সাফল্যের দিনেই সায়নের জীবনে এসেছিল ঐন্দ্রিলার মতো একটি চমৎকার মিষ্টি মেয়ে, প্রায় অলৌকিকের মতো। সে সব প্রায় স্বপ্নের মতো দিন। বিয়ের পর একটা ঘোরের ভেতর দিন কাটত তাদের। কখনও দু'জনে রাতের দিকে চলে যেত চৌরঙ্গি পাড়ায়, সিনেমা দেখতে। সায়নের আবার পছন্দ কোনও বিদেশি ক্লাসিক ছবি। হলের সব চেয়ে দামি দুটো টিকিট কিনে নিয়ে একান্তে বসত দু'জনে। ঐন্দ্রিলার উষ্ণ সান্নিধ্যের সঙ্গে ক্লাসিক ছবি দেখার চার্মই আলাদা।

আবার কখনও তারা গাড়ি নিয়ে চলে যেত ছোটখাটো আউটিঙে। ব্যান্ডেল চার্চ কিংবা ডায়মন্ডহারবার। কখনও কোলাঘাটের নওপালা কিংবা বনগাঁর পারমাদন ডাকবাংলোয় একরাত। কখনও আরও অখ্যাত সব জায়গায়। নতুন স্পট খুঁজে বেড়ানোতেই ছিল তার আনন্দ। কাকদ্বীপ যাওয়ার পথে নিশ্চিন্তপুর থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে গঙ্গার চর, কিংবা ক্যানিং হয়ে ডাব্বু ডাকবাংলো—এমন অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় চলে যাওয়াই ছিল তার এক ভারি প্রিয় বিলাসিতা।

ঐন্দ্রিলা যতটা পারত, তার কথায়, সেবায়, সাহচর্যে ভরিয়ে তুলতে চাইত সায়নের অবসর সময়টুকু।

ঐন্দ্রিলাও খুব খুশি হয়েছিল সায়নের মতো যুবককে স্বামী হিসেবে পেয়ে। কখনও তার মনে হত, সায়ন এক বড় মাপের মানুষ, তার নাগাল পাওয়াই ভার। সে পাগলের মতো কাজ করতে ভালবাসে। নানারকম বিদেশি বই পড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তা থেকে হঠাৎ-হঠাৎ নতুন সব প্ল্যান পেয়ে যায়। তা হঠাৎ নিবিষ্ট মনে বোঝাতে বসে ঐন্দ্রিলাকে। ঐন্দ্রিলা তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে কিছুক্ষণ পর নিজেই হেসে বলে, দূর তোমাকে আমি কী বোঝাতে বসেছি। কাল অফিসে গিয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজারকে বোঝাতে হবে এগুলো। এই নতুন ফর্মুলাটা বাজারে ছাড়লে যা হই-রই শুরু হয়ে যাবে না—

স্কাই ইজ দ্য লিমিট—মনে মনে স্বপ্নের ঘোরে আওড়াত সে। আকাশ লক্ষ করেই দৌড়াচ্ছিল সে। তারপর যখন সাফল্যের চূড়া তার প্রায় হাতের মুঠোয় তখনই ঘটে গেল এই বিরাট অঘটন। হয়তো সেদিন ট্যুরে বিলাসপুরে যাওয়াটাই কাল হয়ে গেল তার জীবনে।

বিলাসপুরে যাওয়ার আগের দিন হঠাৎ ঐন্দ্রিলা বলেছিল, খুব যেতে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে—

সায়ন অবাক হয়ে বলেছিল, বিলাসপুরে! আউটিঙের পক্ষে মোটেই তেমন সুখপ্রদ নয়। তা ছাড়া এ যাত্রা আমার একেবারে হারিকেন ট্যুর। তিন তারিখ সকালে পৌঁছাব, চার তারিখ কাজ সেরে বিকেলের ট্রেনেই রওনা দেব। মাঝের কয়েকঘণ্টা ঝড়ের মতো ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে শুধু মিটিং আর মিটিং। বরং তার চেয়ে পরের মাসে নেপাল যাওয়ার কথা আছে। তখন হাতে একটু সময় নিয়ে যাব। ওখানে আমার সঙ্গে যেও। নেপাল ইজ বিউটিফুল।

ঐন্দ্রিলা হেসে বলেছিল, ঠিক তো?

—পজিটিভলি, সায়ন ঐন্দ্রিলাকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরেছিল, বিলাসপুরে গিয়ে শুধু-শুধু বোর হওয়ার কোনও মানে হয় না।

বিলাসপুরে ভাগ্যিস নিয়ে যায়নি ঐন্দ্রিলাকে। পৌঁছে দেখেছিল, সেখানে হই-হই কাণ্ড। রেলওয়ে মিনিস্টার পরদিন বিলাসপুরে মিটিং করতে আসবেন বলে কোনও হোটেল, গেস্টহাউস ফাঁকা ছিল না। নিরাপত্তাকর্মী থেকে শুরু করে একরাশ ভি.আই.পি-তে ভরে গিয়েছে শহর। সবার জন্যে থাকার ব্যবস্থা করতে আগেভাগে সমস্ত জায়গা বুক করে

pathagar.net

ফেলেছিল প্রশাসন। সায়নকে উঠতে হয়েছিল একটি তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে। বেশি রাতের দিকে জল পাওয়া যায় না এমন অব্যবস্থা হোটেলটায়।

তখন মনে হয়েছিল, ভাগ্যিস নিয়ে যায়নি ঐন্দ্রিলাকে। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো নিয়ে গেলেই ভাল হত। তাতে সাময়িকভাবে ঐন্দ্রিলার কিছু অসুবিধে হত ঠিকই, কিন্তু তার জীবনটা শেষ হয়ে যেত না এভাবে।

আর সায়নের জীবনেও নেমে আসত না এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এখন চোখ তুললেই দেখতে পাচ্ছে চারপাশে বিদ্রুপের শাণিত ছুরি, অভিযোগের উদ্যত আঙুল।

আজ ইনস্পেক্টরের ঘর থেকে বেরোতেই সেই তর্জনি আরও তীক্ষ্ণ হল। বাইরে অপেক্ষা করে আছে আরও কয়েকজন লোক, বোধহয় সাংবাদিক হবে। সায়ন বেরোতেই তারা প্রায় হামলে পড়ল তার উপর। তবু যা-হোক কোনও ফোটোগ্রাফার নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়। তার এই কালচে-ধরা খোঁচা-খোঁচা দাড়িশুদ্ধ বুড়োটে মুখ সভ্য জগতের মানুষ আর দেখুক সে চায় না। সাংবাদিকদের কোনওক্রমে এড়িয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু কে বাইরে অপেক্ষা করে আছে তার জন্য? একজন যুবতী!

নিশ্চয় এ নিয়ে কালকের সংবাদপত্রে আবারও অনেক খবর লেখা হবে রসালো করে, ব্যঙ্গবিদ্রুপ মিশিয়ে।

কিন্তু কোনও যুবতী কেনই বা আসবে তার জন্য! খুনি বলে অভিহিত হওয়া একজন মানুষের কাছে!

বাইরে বেরিয়ে যাকে দেখল, তাকে দেখার জন্য কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না সায়ন। যে হাহাকার, শূন্যতা গত চারদিন দরে তার ভেতর তীব্র হয়ে সূচ ফোটাচ্ছিল তা তীব্রতর হয়ে ঘিরে ধরল তার শরীর। অসহায় কণ্ঠে বলল গার্গী, তুমি!

বাইরে অপেক্ষারত গার্গীর চোখে তখন এক তীক্ষ্ণ, ক্রুদ্ধ চাউনি। তার খরদৃষ্টি দিয়ে সে যেন সেই মুহূর্তে ফালাফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে সায়নকে।

সে দৃষ্টির সামনে পড়ে সায়ন কেঁপে উঠল। এক বিদুষী, বুদ্ধিমতী, শাণিত চেহারার যুবতীর বিদ্রুপ মেশানো ঘৃণা ও আক্রোশের মুখোমুখি হলে আত্মগ্লানি কী তীব্র হয়ে দেখা দেয় তা এই মুহূর্তে সায়ন ছাড়া আর কেউ জানল না।

গার্গী, তুমি! এই শব্দ দুটো ছাড়া আর কিছুই বেরোল না সায়নের মুখ থেকে।

তার উত্তরে গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, সে হাসি প্রায় কান্নারই মতো। বলল, কখনও কোনও খুনিকে নিজের চোখে দেখিনি কিনা, তাই দেখতে এলাম, খুব পরিচিত আর প্রিয় এককজনকে, যে কিনা মার্ডারার। নিজের বউকে খুন করেছে—

সায়ন স্তম্ভিত, ঝাপসা চোখে তাকিয়ে থাকে গার্গীর দিকে।

গার্গী তখনও তার হুল ফুটিয়ে চলেছে, সত্যি, এমন ভান করছেন যেন আপনি কিছুই জানেন না। যেন আপনাকে শুধু শুধু ধরে এনেছে পুলিশ।

সায়নের কান দুটো তখন ঝাঁ-ঝাঁ করছে। একটু সময় নিল নিজেকে সামলাতে, তারপর বলতে পারল, গার্গী, তুমিও! তুমিও তাই বললে?

—শুধু আমি কেন, গার্গী মুখ বাঁকিয়ে হাসল। সে হাসির ঝাঁঝ সায়নের গোটা ভেতরটা পুড়িয়ে দিয়ে গেল, শুধু আমি কেন, গোটা দেশের মানুষ তাই বলছে। আপনি বোধহয় এই ক'দিনের খবরের কাগজ পড়েননি। পড়লেই বুঝতে পারতেন—

তারপর আবার শব্দ করে হাসল গার্গী, বোধহয় পাগলের মতোই, বলল, এমন অনেক কথাও লিখেছে যা আমিও আপনার সম্পর্কে জানতাম না। ছি ছি—

—শুধু খবরের কাগজ পড়েই এমন ধারণা করলে? সায়ন দু' হাতে মুখ ঢাকে।

—না ভাবার মতো কিছু নেই। সব ইন-টো-টো মিলে যাচ্ছে। দুই আর দুই চারের মতো, ব্যাপারটা আমি আর ভাবতেই পারছি না। এতদিন মিশছি আপনার সঙ্গে, কখনও বুঝতে পারিনি আপনি এরকম! এত নিষ্ঠুর? এমন ভয়ঙ্কর!

গার্গীকে কখনও এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে দেখেনি সায়ন। বিদুষী গার্গী বরাবরই ভারি ঠাণ্ডা স্বভাবের, যে কোনও বিষয়ের গভীরে ঢুকে যেতে পারে দ্রুত, যে কোনও পরিস্থিতির মোকাবিলা করে তার শাণিত বুদ্ধি দিয়ে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতায় গার্গী মুখার্জি তার ঝকঝকে, শাণিত চাউনি দিয়েই বুঝিয়ে দিত, সে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র।

আজ সেই গার্গীর দু'চোখে ক্ষোভের আগুন। আর সে আগুন, সায়ন মনে মনে ভাবল, তেমন অপ্রত্যাশিতও নয়। ঐন্দ্রিলাকে হারিয়ে সায়নের বুকের ভেতর যে হাহাকার, গার্গীর মনেও তেমনই শূন্যতা। ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক, কারণ ঐন্দ্রিলা নাম্নী সুন্দর নিষ্পাপ তরুণীটিকে সায়নের জীবনে এনে দিয়েছিল এই গার্গীই। জুবিলি পাকের গার্গী মুখার্জি।

সায়নকে দোষী সাব্যস্ত করে গার্গী যখন কথার চাবুকে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে, তার মুখের দিকে অসহায়, নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকে সায়ন। যতবার সে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চাইল, গার্গীর বিদ্রুপ, হিংস্র চাউনি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ছড়ানো ছিটোনো বোল্ডারে আছাড় মারতে মারতে। তার কোনও কথাই গার্গীর কাছে আজ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

অথচ কী আশ্চর্য, গার্গীর সঙ্গে সায়নের এতকালের সম্পর্ক। ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক হয়েই কবে যেন একদিন সে এসেছিল তার জীবনে। তারপর প্রধানত তারই উদ্যোগে দিনে-দিনে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে দু'জনের মধ্যে, ঐন্দ্রিলা আসার পর আরও। ঐন্দ্রিলাকে এ ক'বছরে যতটুকু চিনেছে সায়ন, গার্গীকেও জেনেছে ক্রমশ।

কিন্তু এতদিনের সেই গার্গী আর আজকের গার্গী এক নয়। শিক্ষিত বুদ্ধিমতী মেয়েটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে আজ এক অন্য ভূমিকায়।

তার প্রবল ক্রোধের সামনে সহসা বিমূঢ় হয়ে গেল সায়ন। সমস্ত পৃথিবী যখন সায়নের বিরুদ্ধে, তখন একমাত্র গার্গীই তাকে বুঝতে পারবে, মনে মনে এমন আশা করেছিল। এহেন বহু জটিল পরিস্থিতি এর আগে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সহজ সরল করে তুলেছে গার্গী। তার তাৎক্ষণিক বুদ্ধি দেখে সায়ন নিজেই কতবার অবাক হয়েছে। গার্গীকে কনগ্র্যাট্স্ জানিয়ে বলেছে, হ্যাট্স অফ্ মিস্ ইনটেলিজেন্ট। তোমার অঙ্ক পড়া বুদ্ধিটা কতভাবেই না কাজে লাগাচ্ছ। গার্গী অবশ্য জানে না, অঙ্ক পড়েই তার বুদ্ধি এমন শাণিত হয়েছে কি না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালে বিশুদ্ধ গণিতের ছাত্রী ছিল গার্গী। কিন্তু সেসময় নিজের পঠিত বিষয়ে নয়, সম্পূর্ণ অন্য এক এক্সট্রা-ক্যারিকুলার মেধায় সে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। হঠাৎই অ্যাডভেঞ্চারিস্টের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেট-কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিল সেবার। ডিবেটের বিষয়বস্তু ছিল, ভারতীয় গণতন্ত্রই বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র। বিষয়টির পক্ষে এমন চমৎকার সব যুক্তিজাল বিস্তার করেছিল যে, বিচারকেরা একবাক্যে তাকেই প্রথম হিসেবে নির্বাচিত করেছিলেন। গার্গী মুখার্জি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। তার কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে তার ক্লাসের বন্ধুবান্ধবীরা একদিন বিশুদ্ধ গণিতের ক্লাসে বেশ ঘটা করে সম্বর্ধনা দিয়েছিল তাকে। কিছু স্তুতি, সবাইকার উচ্ছ্বসিত চাউনি আর ফুলের তোড়ার ভেতর সে অভিভূত হয়েছিল সারাটা দিন। ডিবেটের মঞ্চে যা যা বলেছিল, আবার শোনাতে হল ক্লাসের সবাইকে।

pathagar.net

গার্গীর চমৎকার বক্তৃতা শুনে ইউনিয়নের ছেলেরা তাকে ধরেছিল, তাদের দলের হয়ে ইউনিয়নের নির্বাচনে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু রাজনীতি তার অভীষ্ট বিষয় নয়, তাই বেশ কায়দা করে এড়িয়ে গিয়েছিল নাছোড়বান্দাদের।

বরং তার প্রিয় বিষয় ছিল দেশ, কাল ও সময়। সে পড়তে ভালবাসে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান। বিশুদ্ধ গণিতের ক্লাসে আইনস্টাইনের টাইম অ্যান্ড স্পেস থিয়োরি নিয়ে আলোচনার সময় বান্ধবীদের বলত, দ্যাখ, কত বছর আগে জন্মে ভদ্রলোক আমাদের পৃথিবীকে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে দিয়ে গেছেন। যদি তখন না জন্মে এই বিংশ শতাব্দীর শেষে জন্মাতেন, তাহলে হয়তো আরও কয়েকশো বছর এগিয়ে দিতে পারতেন আমাদের। এখন রিসার্চ করার কত বেশি সুযোগ, কত বেশি উপকরণ।

ভর্তি হওয়ার পর প্রথম গার্গী ভাবত সে গণিতের অধ্যাপিকা বা শিক্ষিকা হবে। পরে হঠাৎ বদলে ফেলল তার মত। পরীক্ষান্তে যখন তার বন্ধুবান্ধবীরা কলেজে শিক্ষকতার চাকরি খুঁজছে, একটি ভেকেন্সির খবর কাগজে প্রকাশিত হলে সবাই মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তখন গার্গী একেবারেই সেদিকে গেল না। সে তখন কলকাতার বিভিন্ন এলাকায়, অলিতে-গলিতে, বস্তিতে, বড় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিচিত্র সব পরিবেশ, ঘটনা, চরিত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। যা কিছু তার চোখে অদ্ভুত ঠেকছে, কিংবা অভাবনীয়, অথবা অভিনব কিছু, অমনি তাই নিয়ে স্টোরি তৈরি করছে। তারপর হানা দিচ্ছে কোনও সংবাদপত্রের অফিসে।

খুব অল্পদিনের মধ্যেই সে পরিচিত হয়ে উঠল একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে।

বাড়িতে তার দাদা-বউদি কেউই চায়নি গার্গী এরকম টো-টো করে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করুক। দাদা সুশোভন মুখার্জি বলেছিলেন, কোনও কলেজের অধ্যাপিকা হওয়া অনেক বেশি সম্মানের।

আর বউদি অনমিত্রা মুখ বাঁকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসেছিলেন, ও মা, শেষ পর্যন্ত রিপোর্টার। মেয়েদের এরকম মদ্দগিরি করা কি চলে?

—কেন নয়? গার্গী প্রতিবাদ করেছিল, সাংবাদিকতার মধ্যে যা রোমান্স আছে, ভাবতে পারবে না, বউদি। প্রতিটি ঘটনাই নতুন আর অভিনব মনে হবে। সেসব সূত্র থেকে স্টোরি তৈরি করতে যা থ্রিল না! তার পাশে কলেজে পড়ানোটা আমার কাছে একঘেয়েমি মনে হয়। একই অঙ্ক বছরের পর বছর ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে হবে। দু-তিন বছর পর সেই থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি—

সংবাদের পেছনে দৌড়াতে গিয়েই সে একবার আবিষ্কার করেছিল লেকটাউন এলাকায় এক অনাথ আশ্রম। এক ভদ্রলোক স্রেফ নিজের টাকায় জনা পনেরো অনাথ বালককে মানুষ করছেন। ইচ্ছে করেই কোনও সরকারি সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাননি। সরকারি অফিসে গেলেই সেখানকার কেরানিবাবুরা মনে করবে, লোকটা নির্ঘাত চোর। তাই একক প্রচেষ্টাতেই—। ছেলেগুলোকে মানুষ করতে গিয়ে নিজে আর বিয়েই করে উঠতে পারেননি।

এইভাবেই খুঁজতে খুঁজতে সে একবার দেখা পেয়েছিল কেষ্টপুর এলাকায় এক বস্তির কিশোরকে, যে সকাল-বিকেল রিকশো চালিয়ে জোগাড় করে তার স্কুলের বেতন। তার পরিবারের ভরণপোষণও। সেই স্টোরিটিও দারুণ প্রশংসা পেয়েছিল।

ঠিক একইভাবে তার সঙ্গে একদিন আলাপ হয়ে গিয়েছিল ভি আই পি রোডের কাছাকাছি একটি ঝকঝকে ফ্যাক্টরির মালিক সায়ন চৌধুরীর। ফ্যাক্টরিটা ঘুরে ঘুরে দেখে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, স্ট্রেঞ্জ! একটি বাঙালি প্রতিষ্ঠানের এহেন অভাবনীয় বোলবোলাও! যেখানে শতকরা

pathagar.net

নিরানব্বই দশমিক নয় নয় ভাগ বাঙালি সন্তান ব্যবসায়ের নাম শুনলে আঁতকে ওঠে, সেখানে এরকম একটি লাভজনক সংস্থা করে ফেলাটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সংবাদপত্রে এ ধরনের খবরেরই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

সায়ন হেসে বলেছিল, মানুষ কিন্তু মৃত্যুর খবরে বেশি ইন্টারেস্টেড, জীবনের খবরে নয়। সংবাদপত্র মানুষের টেস্ট বুঝেই কোথায় প্লেন-ক্র্যাশ হল, কোথায় গোলমাল বা ফায়ারিং হল, কোথায় কটা খুন হল সেগুলিকেই লিড নিউজ করে।

তবে সায়নের ফ্যাক্টরির স্টোরিটা সংবাদপত্রের তৃতীয় পৃষ্ঠায় বেশ ভাল পজিশনেই ছাপাতে পেরেছিল গার্গী। বেশ প্রশংসাও জুটেছিল পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি থেকে। হয়তো এই কারণেই সায়নের সঙ্গে তার সম্পর্ক একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। কখনও কাজের ফাঁকে ফুরসত পেলে চলে গেছে এসপ্ল্যানেড ইস্টের একটা ছোট্ট গলিতে, নতুন ছ'তলা বাড়ির থার্ড ফ্লোরে সায়নের অফিসে। সায়নের পরিকল্পনা, তার উচ্চকাঙ্ক্ষা, তার কর্মপদ্ধতি দেখে আশ্চর্য হয়েছে, বারবার মুগ্ধ হয়ে বলেছে, ফ্যান্টাস্টিক। কতরকম নতুন ডিজাইনের গন্ধওলা সাবান তৈরি হচ্ছে তার ফ্যাক্টরিতে, সবই সায়নের আবিষ্কৃত নিজস্ব ফর্মুলায়। সে সাবান চমৎকার প্যাকিংয়ে পৌঁছে যাচ্ছে কলকাতায়, জেলাগুলিতে, এমনকি ভিনরাজ্যের দোকানে দোকানে, সেখান থেকে গৃহস্থের বাড়িতে।

একদিন সায়নের চেম্বারে বসে কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ জেনে গেল সায়ন এখনও ব্যাচেলর। শুনে চমৎকৃত হয়ে বলেছে, তাই নাকি। তাহলে আপনার জন্যে একটা পাত্রী দেখতে হয়।

সায়ন হো হো করে হেসে বলেছে, তাই নাকি? তা পাত্রীটি কে? আপনিই নাকি? গার্গী বিব্রত হয়ে বলেছে, আজ্ঞে, না, আমার আপাতত বিয়ে করার ইচ্ছে নেই, সময়ও নেই। তবে আরও ভাল পাত্রী। আমার চেয়ে ঢের ঢের ভাল।

সায়ন বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়েছে, সত্যিই অবাক করে দিলেন। তা কে সেই পাত্রী?

—ঐন্দ্রিলা। সম্পর্কে আমার মাসতুতো দিদি হলেও আমরা দু'জনে বন্ধুও বলতে পারেন। আমার মেসো—ব্যারিস্টার সমর ভট্টাচার্য তাঁর একমাত্র কন্যার জন্য ফ্র্যান্টিক্যালি পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। একজন সৎ চরিত্রবান সুপুরুষ যুবক।

—মাই গড। এত কোয়ালিফিকেশন তো আমার নেই। আপনাকে অন্য পাত্র দেখতে হবে।

—উঁহু, আমি কিন্তু ইয়ার্কি করছি না। দেখবেন, সে একদম রাজকন্যা। রুস্কা, মানে ঐন্দ্রিলা যদিও আমার থেকে সাত মাসের বড়, তবু একই ইয়ারে পাশ করেছি আমরা। কিন্তু পিওর ম্যাথ্স্ পড়ে আমার মতো সে ড্রাই হয়ে যায়নি, ফিলোজফিতে এম.এ. করেছে। বেশ দার্শনিক দার্শনিক চোখ। আর ভীষণ রোমান্টিকও।

তারপর গার্গীই একদিন ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল সায়নের। আলাপপর্বের শুরু ভবানীপুরের এক রেস্তোরাঁয়। ছোট্ট রেস্তোরাঁটির পর্দা-ঘেরা কেবিনের ভেতর বসে মোগলাই পরোটা আর চিকেনের অর্ডার দিয়েছিল গার্গী। তারপর সায়নের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল, দেখুন তো, পছন্দ হয় কি না।

ঐন্দ্রিলা এ সব ষড়যন্ত্রের কিছুই জানত না।

হঠাৎই রেস্তোরাঁয় এসে একজন অপরিচিত যুবককে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার উপর গার্গীর 'দেখুন তো, পছন্দ হয় কি না' শুনে হতচকিত, লজ্জায় আরক্ত হয়ে বলেছিল, যাঃ, মিতুন, এ সব কী!

pathagar.net

আর সায়ন মনে মনে ঘাড় নেড়েছিল, হুঁ, রাজকন্যাই বটে। ঐন্দ্রিলা খুবই সুন্দরী। সুন্দরী নারী বলতে একজন পুরুষ ঠিক যেরকম কল্পনা করে নিতে পারে, ঐন্দ্রিলা ঠিক সেরকম। বার বার চোরাচোখে তাকিয়ে দেখছিলও—ঐন্দ্রিলার যেন তুলি দিয়ে আঁকা মুখখানা।

গার্গী পরে ফিসফিস করে বলেছিল, কী মশাই, মাথা ঘুরে গেল নাকি!

—তা একটু ঘুরছে বইকি। তবে কোনও মেয়ে যে তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অন্য এক সুন্দরী মেয়ের আলাপ করিয়ে দেয়, তা এই প্রথম জানলাম। এটাই আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগছে।

—কিন্তু এখন আর শুধু বন্ধু নয়। জামাইবাবু হয়ে যাবেন খুব শিগগির।

তবু প্রায় একবছর সময় নিয়েছিল সায়ন বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। এই একবছরে সেও ঐন্দ্রিলা পরস্পরকে আবিষ্কার করেছিল, চেনাজানার পরিধিকে একটু বাড়িয়ে নিয়েছিল। যতটুকু পর্যন্ত মিশলে শালীনতা বজায় থাকে, সে পর্যন্তই ঐন্দ্রিলা মিশেছিল সায়নের সঙ্গে। তার ভালবাসা ছিল বিশাল একটা সায়রের মতো, তার টলটলে জলে ডুবে মরতেও সাধ যায়।

বিয়ের পর সায়ন বুঝেছিল, সেই সায়র সত্যিই কত গভীর। তখন দিনগুলো ছিল যেন পাখা মেলে উড়ে যাওয়ার মতো।

তখন তাদের দু'জনের মধ্যে কখনও গার্গীও এসে জুটত, বলত, দিদি রাগ করিস নে, তোর কর্তার সঙ্গে গল্প করতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

আসলে সায়ন সত্যিই এক সজীব প্রাণবন্ত টগবগে যুবক। তার মেধার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্মিত হয়ে যেত গার্গী। বিংশ শতাব্দীর শেষপর্বে বাস করেও তার ভাবনায়, শিক্ষায়, মেধায় তাকে প্রায় একবিংশ শতাব্দীর মানুষ বলে মনে হতো। তার মনে হাজারো স্বপ্ন, হাজারো পরিকল্পনা। কথাপ্রসঙ্গে প্রায়ই বলত, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস দাঁড়িয়ে গেলে আরও ডাইভারসি-ফিকেশনের কথা ভাবতে হবে। নতুন নতুন প্রোজেক্টের কাজ হাতে নিতে হবে। একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে বিজনেস ফ্লারিশ করবে না।

গার্গী তাদের সঙ্গে শুধু আড্ডাই দিত না, তাদের সঙ্গী হয়ে চলে যেত আউটিঙে, চমৎকার ছবির মতো কত জায়গায়।

দু'দুটো বছর এমন আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা। সেই গার্গীই যখন হঠাৎ টেলিফোন পেল, ঐন্দ্রিলা আর নেই, সে মাথা ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, ইম্‌পশিব্‌ল্‌। এ হতেই পারে না।

কিন্তু তাইই। আর সায়নই—

শুধু একা সায়ন নয়, তার মা-ভাই সবাই মিলে—

গার্গী বিস্ময়ে স্তব্ধ, বেবাক হয়ে গিয়েছিল। তার চেয়ে মাত্র সাতমাসের বড় এই দিদিটি যে তার ভারি আদরের, ভারি প্রিয় ছিল। ঐন্দ্রিলা যে শুধু তার দিদিই ছিল না। একই সঙ্গে বান্ধবীও, ছিল তার অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রেরণাও। যখনই গার্গী কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছে, নতুন কোনও স্টোরির গন্ধ পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, প্রায়ই তা নিয়ে আলোচনায় বসত ঐন্দ্রিলার সঙ্গে। মাঝেমধ্যে এমন চমৎকার সব পয়েন্টস্‌ বেরিয়ে আসত সেই আলোচনার ভেতর থেকে যে গার্গী, কোনও অসুবিধেই হত না লেখাটাকে সাদা পৃষ্ঠার উপর নামিয়ে ফেলতে।

সেই ঐন্দ্রিলা আর নেই তা ভাবতে পারছিল না গার্গী। নিজেকে ভীষণ অপরাধী লেগেছিল ঐন্দ্রিলার বাবা-মায়ের কথা ভেবে। রুঙ্কা যে তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান! ঘটনাটা শোনার পর তাঁরা সুস্থ আছেন কি না তা ভাবতে গিয়ে শরীর হিম হয়ে যাচ্ছিল তার। রুঙ্কার বাবা সমর ভট্টাচার্যের হৃদযন্ত্রে অনেকদিন আগেই গোলযোগ ধরা পড়েছে। তার মাও কিছুদিন

pathagar.net

হল বাতের ব্যথায় প্রায় শয্যাশায়ী। এহেন অবস্থায় দু'জন মানুষের একমাত্র হৃৎপিণ্ড, তাঁদের একমাত্র আদরের কন্যার এহেন দুঃসংবাদে কাউকেও আর ধরে রাখা যাবে কি না সন্দেহ।

খবর পাওয়ার পর থেকেই দু'দিন বাড়ি থেকে বেরোতে পারেনি গার্গী। শোকে, দু'খে, ক্রোধে, আক্রোশে একা একা ফুঁসেছে নিজের ঘরের ভেতর, শক্তি সঞ্চয় করেছে সায়নের মুখোমুখি হওয়ার। কিন্তু প্রতিদিনকার খবরের কাগজে এমন সব বিশ্রী ইঙ্গিত করা হয়েছে সায়নের প্রতি, যে তা পড়ার পর প্রতিনিয়ত ঘৃণায় কুঁচকে উঠেছে তার মুখ। এই সায়নকে তাহলে সে এতদিন চিনতে পারেনি। সায়নের চরিত্র এত জঘন্য, এমন নীচ!

যে ক'দিন সায়ন হাজতে ছিল, তার কাছে যাওয়ার মতো মানসিকতাই ছিল না গার্গীর। কিন্তু যখন শুনল, আদালত থেকে তার জামিন হয়েছে, তখন মনে হল, সে যাবে, শুধু সায়নের মুখোমুখি হয়ে সে জানতে চাইবে, কেন, কেন সায়ন এমন একটা জঘন্য, নৃশংস, পৈশাচিক কাজ করেছে—

তাই অনেক শক্তি সঞ্চয় করে গিয়েছিল সে। রাগে নীল হয়ে অপেক্ষা করেছে দীর্ঘক্ষণ, কিন্তু সায়ন যখন তার চারদিনের ক্লান্তি, একমুখ দাড়ি আর বিপর্যস্ত ফালাফালা মন নিয়ে থানার বাইরে বেরিয়ে এল, তার চেহারা দেখে বেশ একটু অবাকই হল। সমস্ত সংবাদপত্র, তাবৎ প্রশাসন, লক্ষ লক্ষ শহরবাসীর আলোচনা ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যে পুরুষটি তার এমন ঝড়-খাওয়া চেহারা দেখে যেন চেনাই যায় না তাকে। সায়নের সেই স্মার্ট, তুখোড় চেহারার ব্যক্তিত্ব কয়েকদিনের মধ্যে কেউ যেন একপোঁচ কালি মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়েছে। যেন মানুষ নয়, একটি মৃতপ্রায় কাঠামো। চোখের সেই দীপ্তি কোথায় মিলিয়ে গেছে। কোথায় হারিয়ে গেছে হাঁটাচলার ঋজু ভঙ্গি, গার্গীকে যেন চিনতেই পারল না প্রথমটা এমন উদাসীন, ঝাপসা তার দু'চোখ।

পুলিশের নজর, সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসাবাদ পেরিয়ে দুজনে ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছে অনেকখানি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন, বাড়িতেই তো—

—বাড়িতে, হুঁ, বাড়িতেই তো যেতে হবে। এই চেহারা নিয়ে কোথাও আর যাওয়া যাবে না, সায়ন অস্ফুটকণ্ঠে বিড়বিড় করে, কিন্তু ও বাড়িতে কীভাবে যে যাব তা-ও ভেবে পাচ্ছি না।

গার্গী ভ্রুক্ষেপ না করে বলল, তা হলে একটা ট্যাক্সি ডাকি।

—ট্যাক্সি! সায়ন থমকে দাঁড়ায়। বাড়ি যাওয়ার কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভেতর একসঙ্গে অনেকগুলো ছবি হুড়মুড় করে ভেসে উঠল। এ ক'দিন তবু বাড়ি থেকে অনেক দূরে, এক নরকের মধ্যে বাস করেছে।

এখন মনে হচ্ছে তা বুঝি বাড়ি ফেরার চেয়েও ভাল ছিল। গত দু'বছর যে ভরভরন্ত বাড়িতে বসবাস করেছে, সেখানে এই মুহূর্তে কীভাবে ফিরবে ভাবতেই তার মাথায় এক অসম্ভব শূন্যতা। দুরন্ত একটা হাহাকারবোধ তাকে দাপিয়ে তাড়া করে এল। এখন বাড়ি ফিরলে আগের মতো একমুখ হাসি নিয়ে তাকে দরজা খুলে দেওয়ার কেউ নেই। পরিবর্তে শূন্য ঘরের ভেতর একটা হতাশা, একটা আতঙ্ক, একরাশ হা-হা শূন্যতা।

—কী ভাবছেন। শিগগির ডিসিশন নিন। নইলে রাস্তায় ভিড় জমে যাবে। আপনি এখন কলকাতার একজন ভি আই পি। হঠাৎ এক রাত্রির ঘটনায় আপনি রাতারাতি এমন ইমপর্ট্যান্ট পার্সোন্যালিটি হয়ে উঠেছেন, যা আরও তিরিশ বছর প্যারাডাইস প্রোডাকটস্ চালিয়েও হতে

pathagar.net

পারতেন না, গার্গী কেমন হিসহিস করে বলে উঠল, পিছনে কিছু সাংবাদিক ফলো করে আসছে বলে মনে হচ্ছে। কালকের কাগজে আমাকে জড়িয়েও কিছু রসালো খবর নিশ্চয় ছাপাবে ওরা। তবু এই রিস্কটুকু নিয়েছি, শুধু আপনার কথা ভেবেই—

গার্গীর কণ্ঠস্বর হঠাৎই যেন রুদ্ধ হয়ে এল। সায়নের দিক থেকে একলহমা ফিরিয়ে নিল মুখটা, বোধহয় মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে, তারপর বলল, ট্যাক্সি ডাকি?

—ডাকো।

মিনিট সাতেকের চেষ্টায় একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। তার আগে অন্তত দুটো ট্যাক্সি রিফিউজ করেছে ওদের। প্রথমটি এত স্বল্প দূরত্বে যেতে চায়নি, দ্বিতীয়টি তখন ঠিক উল্টোদিকের প্যাসেঞ্জার খুঁজছে।

গার্গীও ট্যাক্সিতে উঠে বসল। উঠেই বলল, আমি আপনাকে গেটে নামিয়ে দিয়েই চলে আসব। ও বাড়িতে যাওয়ার মতো মানসিকতা আর নেই আমার; যাবও না কোনও দিন।

সায়ন বললও না, চলো গার্গী, অথচ আগে হলে নিশ্চিত ছাড়ত না ওকে। বলত, চলো, রুঙ্কা দারুণ খুশি হবে তোমাকে দেখলে। আজকের মেনুতে নতুন একটা আইটেম করার কথা। নতুন কোনও আইটেম করলে প্রথমেই বলে, মিতুনকে খবর দিতে পারলে বেশ হত। মিতুন গাজরের হালুয়া থেকে দারুণ ভালবাসে। কিংবা তেল-কই খুব পছন্দ করে মিতুন। ফোন করো না ওকে।

আজ বলল না। বলবেই বা কী করে। মিতুনকে আজ কার কাছে নিয়ে যাবে সায়ন। সেই মানুষটাই যখন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে—

—আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমার কিছু বলার নেই গার্গী। অন্তত তোমাকে বলি, সংবাদপত্র যাই লিখুক, পুলিশের লোক যাই বলুক, তুমি অন্তত আমাকে দোষারোপ কোরো না। আমি সত্যিই খুনি নই।

ট্যাক্সি ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে শরৎ বোস রোডের ব্লু ওয়ান্ডার-এর সামনে। বাড়ির গেটের কাছে সায়ন নেমে দাঁড়াতেই গার্গী আর তার দিকে তাকাল না। ট্যাক্সিওলাকে বলল, চলুন— বিমূঢ় সায়নকে থমথমে বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে হুস্‌ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা। একবার ভাবলও না, ঐন্দ্রিলাবিহীন এই ফ্ল্যাটের ভেতর কী করে ঢুকবে সায়ন।

ল্যান্সডাউন রোডের উপর 'ব্লু ওয়ান্ডার' বাড়িটি এককালে প্রায় বিস্ময়ের মতোই ছিল, লোকে বলত, ছবির মতো। এখন আর তত ছবির মতো বলা যায় না, তবু গেটের উপর আর্চ-ডিজাইনের শেড, তার উপর মাধবিলতার ঝুপসি লতানে ডালে এখনও ফুলের রাশ কারণে-অকারণে উপচে পড়ে। গেটে পেরিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পথে নুড়ি পাথরের কিছু অবশেষ রয়ে গেছে আরও। পথের দু'পাশে দু'সার পামগাছের ভগ্নাবশেষ টিমটিম করছে। বাড়ির সামনে এককালে চমৎকার লন ছিল, কিছু ফুলের কেয়ারিও। আপাতত সে লনে ঘাসের চাপড়া উঠে গিয়ে মাটির হাড়গোড় দৃশ্যমান। যত্ন নেই বলে ফুলও ফোটে না আর।

এহেন বাড়ির সামনে তন্বীর নীল আঁচল উড়িয়ে আসার মতো পাক খেয়ে এসে দাঁড়াল একটা নীল মারুতি। অন্যদিন মারুতির শব্দে মোহন এসে গেট খুলে দেয়। মারুতিটা শোঁ করে

pathagar.net

ঢুকে যায় ভেতরে। আজ গেটের সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে বলে বাইরের রাস্তায় রয়ে গেল গাড়িটা। তার স্টিয়ারিং ছেড়ে নামলেন ধূসর রঙের চুল, ততোধিক ধূসর চোখের অধিকারী একজন সাহেবি চেহারার মানুষ। তাঁর মুখময় দাড়ি-গোঁফে অবশ্য সামান্য পিঙ্গল রঙ।

রবার্ট ও'নীল এ বাড়িতে মাঝেমধ্যেই এসে থাকেন। তাঁর মুখে সর্বক্ষণ ধরা থাকে একটি দীর্ঘকায় চুরুট। পরনে বিস্কুট রঙের শার্ট, ডিপ কালো প্যান্ট। চুল অবশ্য খানিকটা উশকোখুশকোই, তাতে একটা দার্শনিক-দার্শনিক ছাপ এসেছে তাঁর চেহারায়।

অন্যদিন কোনও দিকে না তাকিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উদাসীন হেঁটে যান বাড়ির সিঁড়ির দিকে। আজ তাতে সামান্য জড়তা। কারণ গেটের সামনে দাঁড়ানো চারজন পুলিশ তাঁকে কড়া চোখে তাকিয়ে জরিপ করছে। যাবার পথে এক মুহূর্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশ নজর করলেন রবার্ট ও'নীল। মাত্র চারদিনেই বাড়িটার খোলনলচে যেন আমূল বদলে গেছে। আগে একটা নিরিবিলি বিস্ময় ঘিরে থাকত দোতলা বাড়িটায়, এখন সেখানে থম হয়ে রয়েছে একটা আতঙ্ক।

মোহনকে আশেপাশে কোথাও দেখতে না পেয়ে রবার্ট সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন দোতলায়, বাঁদিকে ফ্ল্যাটের দিকে একঝলক নজর ছুড়ে দিলেন। তারপর ডানদিকে ফ্ল্যাটের দরজার ডোরবেলে মৃদু আঙুল রাখতেই ভেতরে চমৎকার সুরের মূর্ছনা। ডোরবেলটি অবশ্য রবার্টেরই পছন্দ করে কেনা।

রবার্ট ও'নীলের সঙ্গে 'ব্লু ওয়ান্ডার'-এর সম্পর্ক বহুদিনের। পরিচয়ের সূত্র অবশ্য এ বাড়ির মালিকান চন্দ্রাদেবীকে ঘিরেই। আজ থেকে তিরিশ-একত্রিশ বছর আগে চন্দ্রা ছিলেন এক সদ্যবিবাহিতা তরুণী। তাঁর বাবা বিলেত-ফেরত ডাক্তার ছিলেন বলে মেয়েকেও তৈরি করেছিলেন মেমসাহেবদের মতো। বিয়ের আগেই তাঁর রূপ, সৌন্দর্য আর গুণপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল কলকাতার অভিজাত সমাজে। অনেক খুঁজে পেতে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তখনকার আর এক তরুণ প্রতিভাবান ডাক্তার নিশীথ চৌধুরীর সঙ্গে।

সবাই ভেবেছিল নিশীথ আর চন্দ্রা নিশ্চয় মেড ফর ইচ আদার হয়ে উঠবেন অচিরেই।

কিন্তু নিশীথ চৌধুরী ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাঁর ডাক্তারি নিয়ে, আর চন্দ্রা তাঁর স্বামীর ব্যস্ততা দেখে নিজে জড়িয়ে পড়লেন তাঁর প্রিয় বিলাসব্যসন শিল্প-সঙ্গীত-সংস্কৃতি নিয়ে। রবার্ট ও'নীলের সঙ্গে সেই তখন থেকেই তাঁর আলাপ। অস্ট্রেলীয় এই যুবকটি তখন সদ্য কলকাতায় এসেছেন। দেশে থাকতেই তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পপ মিউজিসিয়ান হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। জনপ্রিয়তাও ছিল প্রবল। পপ গান গাইতে গাইতে তাঁর হঠাৎই কানে এসেছিল ভারতবর্ষের মার্গসঙ্গীতের কথা। তখনই একদিন বাউণ্ডুলের মতো দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে।

সেই থেকে কলকাতাই তাঁর বাসস্থান। তাঁর শিরায়-শিরায় তখন সঙ্গীতের মূর্ছনা। এ দেশে যেমন ধ্রুপদি সঙ্গীত নিয়ে মেতে উঠলেন, তেমনই আলাপিত হলেন কলকাতার বহু সংস্কৃতিমনা যুবক-যুবতীর সঙ্গে। সেই সব যুবতীদের মধ্যে একজন ছিলেন পপ সঙের এক দারুণ ভক্ত চন্দ্রা। বিট্‌ল্‌সদের নিয়ে তখন মাতামাতি চলছে সারা বিশ্বে। জন লেনন তখন তাঁর প্রথম বই 'ইন ইজ ওন রাইট'-এ তিরিশটি ছন্নছাড়া গদ্য-পদ্য সংকলিত করে হই চই বাধিয়ে ফেলেছেন। সে বই নিয়ে আলোচনা চলছে কলকাতায়। সেই পাগলা হাওয়ার দিনে আর এক পপ্ সিঙ্গার রবার্টের গান শুনে হঠাৎ মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন তরুণী চন্দ্রা। তখন থেকেই তিনি রবার্টের এক অন্ধ ফ্যান। বোধহয় আজও সেরকমই। ঠিক তার আগেই নিশীথ চৌধুরীর

সঙ্গে তাঁর বিয়ে না হলে হয়তো এই অস্ট্রেলীয় যুবককেই—। কিন্তু সেই থেকে রবার্ট ও'নীলের সঙ্গে তাঁর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েই গেছে। চন্দ্রাদেবীর দু-তিনজন পুরুষবন্ধুদের মধ্যে রবার্ট ও'নীল অবশ্যই ঘনিষ্ঠতম।

কিন্তু রবার্ট ও'নীলের ঘনিষ্ঠতমদের সংখ্যা বহু। চন্দ্রা ছাড়াও আরও অনেক—

বস্তুত এ শহরে বন্ধুর চেয়ে রবার্ট ও'নীলের বান্ধবীর সংখ্যাই বেশি। তাঁর ঠিক কতজন বান্ধবী তা হয়তো তাঁর নিজের পক্ষেই বলা শক্ত। ষোলো থেকে ছেষট্টি সব বয়সের বান্ধবীই তাঁর বর্তমান। এক আশ্চর্য পারঙ্গমতায় এই বিভিন্ন বয়সি বান্ধবীদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারেন। ষোলো বছরের ডোরার সঙ্গে রবার্ট যখন কথা বলেন তখন তাঁর মানসিক বয়স গিয়ে পৌঁছায় একুশে। যখন তেইশ বছরের অরুন্ধতীকে পপ-মিউজিকের তালিম দিতে থাকেন, তখন তাঁকে মনে হয় ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের এক যুবকই যেন বা। যখন তেত্রিশ বছরের মিসেস বাসুর সঙ্গে মার্গ সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা হয় তখন তাঁকে দেখায় অনতিচল্লিশ এক অভিজ্ঞ পুরুষের মতো। আবার পঞ্চাশ বছরের চন্দ্রাদেবীর সঙ্গেও তাঁর আশ্চর্য বন্ধুত্ব। বাষট্টি বছরের ও'নীল তখন বাষট্টি বছরেরই।

ডোরাকে হয়তো বলেন, বুঝলে ডোরা, মাইকেল জ্যাকসনের 'ব্যাড' যে কী দারুণ কম্পোজিশন, ভাবা যায় না। আইয়্যাম সিম্পলি ম্যাড ফর জ্যাকসন। কী চমৎকার কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল বলো—

তারপর দিনই অরুন্ধতীকে হয়তো বলতে থাকেন, দেখেছ অরুন্ধতী, ম্যাডোনা এক 'পাপা ডোন্ট প্রিচ' গেয়ে কী ভীষণ হই হই ফেলে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তুমিও পারবে। এই গানটা ধরো, 'আয়্যাম অ্যাভেইলেব্‌ল টু-নাইট—' মনে করো, বিশাল এক শান্ত সরোবরে টুপটাপ শব্দে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা, সেই শব্দ সঞ্চারিত করতে হবে তোমার মনের গহনে, হ্যাঁ, আরও একটু চটুল করতে হবে তোমার গলার স্বর, হ্যাঁ, ঠিক এরকম, হচ্ছে, বাহ্‌ চমৎকার, এই জন্যেই তোমাকে আমার এত্ত ভাল লাগে—

অথবা মিসেস বাসুকে বলেন, খুব ইচ্ছে ছিল বড়ে গোলাম আলিকে আমার গান একবার শোনাই। কীরকম রপ্ত করতে পেরেছি এ দেশের সুর। আসল গুণী মানুষকে নিজের কম্পোজিশন শোনানো এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। তবে একবার শুনিয়েছিলাম ভীমসেন যোশীকে। দ্যাট ওয়াজ অ্যা মেমোরেবল ডে অব মাই লাইফ।

চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে আবার অন্যরকম বন্ধুত্ব। হয়তো পুরানো যুগের বান্ধবীদের মধ্যে এক চন্দ্রাদেবীই এখনও তাঁর উপর গভীরভাবে নির্ভর করে চলেন। সেই প্রথম জীবন থেকে রবার্ট ও'নীল তাঁকে এতটাই সময় দিয়ে আসছেন, যে, সে সময় হয়তো অন্য কোনও গূঢ় অর্থেও, নিশীথ চৌধুরী বলতেন, সত্যি, ভদ্রলোককে দেখলে আমার ঈর্ষা হয়। আমার একটিমাত্র স্ত্রী, অ্যান্ড নো বান্ধবী, তাকেও আমার ঠিকমতো দেখভাল করা হয়ে ওঠে না। অথচ ও'নীল এতজন বান্ধবীকে অ্যাটেন্ড করে যাচ্ছে ঠিক নিয়ম করে। অথচ তার প্রফেসনেও যে ফাঁকি দেয়, তা-ও নয়।

সত্যিই ঈর্ষণীয় চরিত্রের মানুষ এই রবার্ট ও'নীল। এত বছর পরেও চন্দ্রার জন্য এতখানি সময় দিয়ে যাচ্ছেন। গত চারদিন থানায় ছোটাছুটি, আদালতে হাজিরা দেওয়া, উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ, সব তিনিই করেছেন একা হাতে। এখনও এ বাড়িতে এলে ডোরবেল টিপে অপেক্ষা করেন কয়েক মুহূর্ত, চন্দ্রা দরজা খুলতেই মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে বলে ওঠেন, ইস্‌ চন্দ্রা, তোমার বাড়ির ডোরবেলের আওয়াজটা এমন মিষ্টি, এতকাল শুনেও যেন পুরানো হয়

pathagar.net

না। বাজছে তো বেজেই চলেছে। মনে হয়, দরজা খুলতে আরও একটু দেরি হলেও ক্ষতি নেই।

অথবা, এই শাড়িটা কবে কিনলে, চন্দ্রা, দারুণ কালারটা তো, কী দারুণ লাগছে যে আজ তোমাকে—

চন্দ্রা ঠোঁট টিপে হাসেন, থাক্, সে তোমার টিন-এজার কোনও বান্ধবীকে বলো, আইহ্যাভ গ্রোন এনাফ, চুলে কতটা পাক ধরেছে দেখো—

—ওটা কিছু নয়। বরং চুলে কিছু সিলভার লাইনিং থাকলে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব এনে দেয় মেয়েদের। ইন্দিরা গান্ধিকে তো এই একটুকরো সিলভার টাচেই কী রূপবতী দেখাত বলো।

চন্দ্রাদেবীও অবশ্য প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময়ী। কিন্তু তাঁর পার্সোন্যালিটি এতটাই বেশি যে তাকে ব্যক্তিত্ব না বলে প্রতাপ বলাই ভাল। অন্তত হিমনের বউ দীয়া তাই বলত।

ডোরবেল টিপে এই মুহূর্তে অবশ্য সেই সুরের মূর্ছনা শুনতে ও'নীলের ঠিক ভাল লাগছিল না। একটু আগে চারজন পুলিশের কড়া নজর ঠাহর করে এসেছেন। গেট থেকে অদূরে দু'জন প্লেন-ড্রেসের লোক, পুলিশও হতে পারে, সাংবাদিক হওয়াও বিচিত্র নয়, তারাও পকেট থেকে নোটবুক বার করে নোট করে নিল কিছু। সম্ভবত গাড়ির নম্বর। আজ সকালের কাগজে তাঁকে জড়িয়ে কিছু মুখরোচক খবর প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকদিন ধরে তাঁর কোর্টে ঘোরাঘুরি, ব্যস্তসমস্ত চলাফেরা, সর্বোপরি তাঁর বিদেশি চেহারা ভারি নজর কেড়েছে সাংবাদিকদের। একজন প্রবীণ সাংবাদিক, সংযোজনা অংশে, তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভা ও তাঁর বহুনারীপ্রিয়তা সম্পর্কে বেশ হিউমার-টিউমার দিয়ে চমৎকার একটি রচনা লিখেছেন। হয়তো তাঁর আজকের আগমনবার্তাটিও কিছু রং চড়িয়ে প্রকাশিত হবে আগামীকালের পাতায়।

মনে মনে হাসলেন ও'নীল। একটি তরুণীর আত্মহত্যা কিংবা হত্যাকে কেন্দ্র করে আরও বহু মানুষ হঠাৎ খবরের কাগজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। সারাটা জীবনে অসংখ্য নারী এসেছে তাঁর সংস্পর্শে, বহু বিচিত্র তরুণী, যুবতী, প্রৌঢ়া এমনকি বৃদ্ধার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতা বিভিন্ন পার্টিতে, ক্লাবে কিংবা কোনও বাড়ির মজলিশে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেও তা কখনও সংবাদপত্রের আলোচ্য হয়ে ওঠেনি। এখন হঠাৎ—

যথারীতি আজও দরজা খুললেন চন্দ্রা-ই, কিন্তু আজ তার মুখে কালবৈশাখীর যেন বা। উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই, শুধু বললেন, কাম ইন—

বড় হলঘরটার একপাশে ব্রাউন রঙের রেক্সিন-অলা মস্ত সোফা, তার উপর রাখা নীল ভেলভেটে মোড়া তিনটি তাকিয়ার একটি টেনে নিয়ে বসলেন ও'নীল, হাতের নিভে যাওয়া চুরুটটির মুখে পুনর্বার আগুন লাগাতে লাগাতে বললেন, সায়ন ফিরেছে?

প্রায় গুলি-খাওয়া বাঘের মতো হুঙ্কার ছাড়লেন চন্দ্রাদেবী, হুঁ।

ও'নীল চুপচাপ লক্ষ করতে লাগলেন চন্দ্রাদেবীর অভিব্যক্তি। মাত্র চারদিনে হঠাৎ যেন তাঁর বয়স বেড়ে গেছে অনেকখানি। মাথার চুল সাদার ছোপ্ যেন খানিকটা বেশিই। মুখের চামড়ায় কেমন কালচে ভাব। কিছু এবোড়া-খেবড়ো কোঁচও, যা ও'নীলের চোখে আগে ধরা পড়েনি। অন্যদিন তাঁকে বেশ ফিটফাট, উজ্জ্বল চকচকে চেহারায় দেখা যায়, আজ একেবারে ঝড়বিধ্বস্ত রূপ।

রবার্ট চুরুটে টান দিতে দিতে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, হিমন কোথায়?

—পাশের ঘরে। তেমনই সংক্ষিপ্ত উত্তর। কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্যে কাটে। এই নৈঃশব্দ্যের রূপ

pathagar.net

ও'নীলের ভারি চেনা। তাঁর অনুমান মতো চন্দ্রাদেবীর স্বাভাবিক তেজিয়ান কণ্ঠস্বর হঠাৎই বদলে গেল, প্রায় কান্না-জড়ানো গলায় বললেন, আমার সব গেল, সোসাইটিতে আর মুখ দেখানোর জো রইল না। আই হ্যাভ লস্ট এভরিথিং। ডাইনিটা আমার সব শেষ করে দিয়েছে—

ও'নীল সোফা থেকে উঠে চন্দ্রার কাছে গেলেন। বুকের কাছে তাঁকে টেনে তাঁর মাথায় হাত বেলাতে বোলাতে বললেন, ডোন্ট গেট নার্ভাস, ডার্লিং। সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঝেমধ্যে জীবনে ওরকম ওঠাপড়া আসেই—

—নো, নো, অ্যাবসার্ড। আর কিছুই ফিরে পাওয়া যাবে না। আমি, আমার ফ্যামিলি, আমার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, সবই এখন সারা কলকাতার গসিপের বস্তু। আইয়্যাম লস্ট, কমপ্লিটলি রুইন্ড—

ও'নীল একইভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরগুলি আরও উত্তেজিত করে তুলেছে চন্দ্রাকে। কয়েকদিনের স্টোরিগুলো পড়তে পড়তে বেশ অবাক হয়েছেন ও'নীলও। অভিজাত বাড়ির আদব-কায়দা, জীবনযাপন সাধারণ মানুষদের চোখে স্বভাবতই একটু অন্যরকম। বোধহয় তাই ইচ্ছে করলে কলকাতার যে-কোনও অভিজাত পরিবারকে নিয়েই এ ধরনের স্ক্যান্ডাল ছড়াতে পারে কাগজগুলো। এমনিতে জানা যায় না, হঠাৎ কোনওভাবে সংবাদ হয়ে উঠলে তখন কোনও সাধারণ ঘটনাও অসাধারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই নৈঃশব্দ্যের মুহূর্তে হঠাৎ বিশ্রী শব্দ করে বেজে উঠল ঘরের কোণে রাখা টেলিফোনটা। ও'নীল চন্দ্রার কাছ থেকে সরে এসে তুলতে যাচ্ছিলেন রিসিভার, তার আগে চন্দ্রা নিজেই ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললেন হ্যালো—

ওপাশ থেকে ভেসে আসা কিছু কথা মন দিয়ে শুনলেন দু-চারবার—ইয়েস, হ্যাঁ, হুঁ, ও.কে বললেন, তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে প্রায় হতাশ ভঙ্গিতে এসে বসে পড়লেন, আতঙ্কের গলায় বললেন, আবার আসছে ওরা—

ও'নীল অবাক হয়ে বললেন, কারা!

—পুলিশ। এই নিয়ে কাল বাড়ি ফেরার পর থেকে তিনবার। প্রায় বুলডগের মতো লেগে আছে পিছনে। যতবার বলছি, আই নো নাথিং, আস্ক সায়ন, কিন্তু স্কাউন্ড্রেলগুলো কনটিউনিয়াসলি চেজ্ করে যাচ্ছে আমাকে। বোগাস্—

ও'নীল বিড়বিড় করে বললেন, ওদের কাজ তো ওরা করবেই। লেট দেম ডু দেয়ার জব।

হঠাৎ কী যেন নজরে পড়তে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন চন্দ্রা, ও হো—বলেই টেবিলের এককোণে পড়ে থাকা একটা মোটা লম্বা ব্রাউন রঙের খাম তুলে নিলেন দ্রুত, সেটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন পাশের ঘরে, মিনিট চার-পাঁচ পরে ফিরে এলেন উদ্বিগ্ন মুখে। ও'নীল জিজ্ঞাসা করলেন, কী ওটা?

—কী আবার। আমার পিণ্ডি। ডিভোর্সের নোটিশ পাঠিয়েছে দীয়া। আমি তো যত ডাইনির পাল্লায় পড়েছি।

—কবে এল।

—এই তো একটু আগে। বাই রেজিস্টার্ড পোস্ট। পাঠিয়েছে সেই সাতদিন আগে।

—সাতদিন? তার পরে একবার এসে দীয়া ঘুরে গেল না!

—গেলই তো। এই তো সেদিন। এল, কী যেন খুঁজল ওদের আলমারিতে। হিমনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি হল। তারপর নিজেই এককাপ কফি করে খেল। বিছানায় গড়িয়ে

pathagar.net

খানিকক্ষণ ম্যাগাজিন দেখল উল্টেপাল্টে। তারপর সন্ধের দিকে চলে গেল গটগট করে। আমার সঙ্গে কথাই বলেনি।

—তাই নাকি! তখন একবারও ডিভোর্সের কথা বলেনি?

—না। অথচ পোস্টঅফিসের শিলমোহর থেকে দেখতে পাচ্ছি তার আগেই নোটিস ছাড়া হয়েছে।

—বাহ, ওয়ান্ডার গার্ল, বলে ও'নীল হো হো করে হেসে উঠলেন, বেশ পাগলি আছে তোমার ছোট বউটা। ওয়ান্ডার গার্ল, হা-হা, বলে এ ক'দিনের বরফচাপা নৈঃশব্দ্য ভেঙে হঠাৎ বেশ অনেকক্ষণ ধরে হাসতে থাকলেন।

—ওয়ান্ডার উইচ বলো, চন্দ্রা বিস্মিত হয়ে ও'নীলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, একে তো এক বউয়ের কীর্তিতে আমার সারাজীবনের অর্জিত সমস্ত সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে গেল, তার উপর এখন আর এক বউ—অল ননসেন্স। যদি এই চিঠিটা এখন পুলিশের নজরে পড়ে, তাহলে কাল পেপারে আর এক স্টোরি বেরোবে।

এতক্ষণ একনাগাড়ে বলে বেশ হাঁপাতে লাগলেন চন্দ্রাদেবী। খুবই উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাঁকে। ও'নীল আবারও সান্ত্বনা দিতে শুরু করেন, ডোন্ট গেট এক্সাইটেড্; ডার্লিং। মাঝেমধ্যে মানুষের জীবনে এক-একটা স্পেল এরকম আসে। দীয়ার সঙ্গে আমার দেখা হলে ওকে ব্যাপারটা আমিই বোঝাব। লাইফ ইজ নট অ্যা ম্যাটার অব জোক। হঠাৎ এভাবে একটা ডিভোর্স নিলে সারাজীবন কাটাবেই বা কী করে বেচারি। এখন অল্প বয়স, উত্তেজিত হয়ে একটা ডিসিশন নিলে পরে ও-ই পস্তাবে।

—না, তার আর দরকার নেই। হিসহিস করে উঠলেন চন্দ্রা, আমি আবার হিমনের বিয়ে দেব।

—ডোন্ট বি অ্যা ফুল, চন্দ্রা, ও'নীল এতক্ষণে ধমক লাগালেন, এখন সাংঘাতিক ক্রাইসিসের সময়, এ সময় এরকম একটা কথা কারও কানে যাওয়া মানে একেবারে বুমেরাং হয়ে আসবে। স্টপ ইট নাউ।

ও'নীলের ধমকে থমকে গেলেন চন্দ্রা, ব্যাপারটা বুঝলেন, তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে চ্যাঁচিয়ে ডাকলেন, হিমন, হিমন—

একটু পরেই দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল হিমন, ও'নীলকে সোফায় বসে থাকতে দেখে একমুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর ঘাড় নীচু করে বলল, কী বলছ?

—আবার একজন পুলিশ অফিসার আসছে। ইন্টারোগেট করবে মনে হয়। দীয়ার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ডিভোর্সের নোটিসের ব্যাপারটা একদম চেপে যাবে, বুঝলে?

ঘাড় নাড়ল হিমন, হুঁ।

হিমনের বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। লম্বা ঋজু চেহারা, চুল উশকোখুশকো ধরনের। মুখে দাড়ি-গোঁফ ভর্তি। চুল-দাড়ি-গোঁফ সবই সামান্য লালচে ধরনের। তার শরীরের গঠন যতটা মজবুত, তার গলার স্বর ততটা নয়। কণ্ঠস্বর একটু চাপা, মেয়েলি ধরনের। কণ্ঠস্বরের মতো তার ব্যক্তিত্বও কিছুটা কম বলে মনে হয়। লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ গড়নের তুলনায় ব্যক্তিত্ব বেমানান। মায়ের সামনে এলে সে যেন আরও একটু কুঁকড়ে থাকে।

চন্দ্রা আবার বললেন, পুলিশের সামনে বেশি আমতা-আমতা করবে না, বুঝেছ?

হিমন একবার ঢোক গিলে তাকাল ও'নীলের দিকে, তারপর নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

—ঠিক আছে, এবার যাও—

pathagar.net

বলতেই হিমন আবার পায়ে-পায়ে তার ঘরের দিকে চলে গেল। যাওয়ার আগে মনে হল তার মুখে জড়ো হল একরাশ শঙ্কার ছাপ।

রবার্ট ও'নীল সে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসছিলেন। হিমন চলে যেতে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, চন্দ্রা, একজন গ্রোন-আপ বয়কে তোমার এভাবে গাইড করা ঠিক নয়। এতে তার পার্সোন্যালিটি গড়ে উঠতে পারে না। সবসময় নার্ভাস ফিল করবে। ঠিক-ঠিক জায়গায় ঠিক-ঠিক জবাব দিতে পারবে না।

চন্দ্রাদেবী হিমনের ঘরের দিকে তাকিয়ে একটা অবজ্ঞার ভাব ফোটালেন মুখে, ও তো ছেলেবেলা থেকেই ইমম্যাচিওরড্। তারপর একটু থেমে আবার বললেন, কিন্তু অন্তত বড়টার মতো দুর্বিনীত নয়। হিমন এখনও কথা শোনে, যা বলি মুখ বুজে মেনে চলে।

ও'নীল কোনও কথা না বলে টুকটুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। ধোঁয়ার আড়ালে তাঁর ঠোঁটের কোণে ঝুলে থাকে আলতো হাসি। সে অস্পষ্ট হাসিতে, চুরুটের ধোঁয়ায়, দাড়িগোঁফের জঙ্গলের রহস্যময়তায় ভারি অদ্ভুত দেখায় ও'নীলকে। তখন তাঁর মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তিতে চমৎকার একটা স্বর্গীয় টাচ। কখনও লঘু মুহূর্তে চন্দ্রাদেবীই তাঁকে পরিহাস করে বলে ওঠেন, নাউ, ইউ লুক লাইক জেসাস ক্রাইস্ট। জাস্ট ফর দিস আই লাভ ইউ, রবার্ট। এখন আর সে কথা বললেন না। বলার মতো মনের অবস্থাও নেই। আগের প্রসঙ্গ ধরেই বললেন, এ তবু অনেক ভাল। অন্তত আমার মুখ ডুবিয়ে দেয়নি। কিন্তু যার পার্সোন্যালিটি গড়ে উঠেছে, সে তো আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি। আর এখন তো আমাকে রুইন্ড করে দিয়েছে।

আবার চন্দ্রাদেবীর মুখ উত্তেজনায়, ক্রোধে লাল হয়ে এল। বোধহয় মনে পড়ল পরপর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। পরক্ষণেই দরজায় ডোরবেলের শব্দ শুরু হতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন মুহূর্তে, চোখে ঘনিয়ে এল শঙ্কা। ও'নীলের দিকে তাকাতেই তিনি দ্রুত উঠে পড়লেন সোফা থেকে, ওয়েট, আমিই দরজা খুলছি। পুলিশ তো ইনভেস্টিগেট করতে দু-দশবার প্লেস অব অকারেন্সে আসবেই, ইন্টারোগেট করবে, ক্লু খুঁজবে, তাতে নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই।

একটু পরে ও'নীলের পিছু-পিছু এসে ঢুকলেন একজন সুঠামদেহী পুলিশ-অফিসার। টানটান ইস্ত্রি করা খাকি পোশাকে বুক-পকেটে লাল-নীল অনেকগুলো তক্‌মা, বাহুতে রুপোলি ফলক। বেশ বোঝা যাচ্ছে একজন ওপরঅলা কেউ।

অফিসারটি ঢুকেই বললেন, আমি ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। ইন্টারোগেট করতে চাই আর একবার—

চন্দ্রাদেবী ঘাড় নাড়তেই দেবাদ্রি সান্যাল আবার বললেন, মিঃ সায়ন চৌধুরী তো আজই জামিনে রিলিজ পেয়েছেন। বাড়ি আছেন তো?

—হ্যাঁ আছেন। ও থাকে পাশের ফ্ল্যাটে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে—

—জানি, বলে দেবাদ্রি সান্যাল এবার তাকালেন ও'নীলের দিকে, আপনিই নিশ্চয় রবার্ট ও'নীল। দি গ্রেট পপ-সিঙ্গার। ইজ্‌নট ইট?

ও'নীল হাসলেন, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য কমপ্লিমেন্ট।

মিঃ সান্যালও হাসলেন, ঠিক আছে। আমি আপনাদের পর-পর কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব। কাইন্ডলি একটু হেল্প করবেন আমাকে। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রমাণ হাতে এসেছে আমাদের—

pathagar.net

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার আগে তাঁর হাতের ডায়েরিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এই গুরুত্বপূর্ণ থানাটির পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। পুরানো জটিলতর কেসগুলি একটি ঢাউস ডায়েরিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নোট করে রাখা তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস। কখনও চার্জশিটের কপি থেকে, কখনও আদালতের নথি থেকে, কখনও সিনিয়র পুলিশ-অফিসারদের স্মৃতি থেকে, এমনকি'সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে তা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় লিখে রাখেন সযত্নে। যাতে পরবর্তীকালে তা থেকে তদন্তের সূত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

গত কয়েক বছরে অন্তত তিন-চারটি এ ধরনের বড়ঘরের কেলেঙ্কারি ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। তাতে জড়িয়ে পড়েছেন শিক্ষাবিদ্ থেকে অভিনেত্রী, বড় বিজনেসম্যান থেকে বিগ বস্, নামী সাঁতারু থেকে গায়িকা অনেকেই। তদন্তে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে অনেকানেক স্ক্যান্ডাল, হয়তো অনেক অভিজাত পরিবারেই এমন স্ক্যান্ডাল জড়িয়ে থাকে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো, তা তাদের জীবনে নিতান্ত স্বাভাবিক বলেই তেমন নজরে আসে না কারও, হইচইও হয় না। হঠাৎ কখনও এমন বিপর্যয় ঘটে গেলে সহসা উন্মোচিত হয় তাদের জীবন-যাপনের ভেতরকার নানান গোপন রহস্য। তখনই জানা যায়, রূপসী গৃহবধূও কীভাবে অত্যাচারিত হয় এইসব অভিজাত বাড়িতে, শেষ পর্যন্ত খুনও হতে হয়, কখনও ধরা পড়ে, কখনও পড়ে না।

ঐন্দ্রিলা-হত্যার খুঁটিনাটি বিবরণ মেরুন রঙের ঢাউস ডায়েরিতে নোট করে নিতে নিতে তাই মাঝেমধ্যেই ভুরুতে কোঁচ পড়ছিল তাঁর। যা মনে হয়েছিল ভারি সহজ, জলবৎ তরলং, তেমন জটিলতা নেই, তার চারপাশ ঘিরে এখন ঘন রহস্য। এক অসহায় গৃহবধূকে পরিকল্পনামাফিক খুন করে নিষ্কণ্টক হতে চেয়েছে স্বামী, শাশুড়ি ও দেওর। অতএব সেইমতো চার্জশিট দাখিল করে দিলেই তাঁর ইনভেস্টিগেশন শেষ এমনটা ভেবেছিলেন, কিন্তু কেসটির গভীরে ঢুকতে গিয়ে এখন প্রতিপদেই রীতিমতো হোঁচট। বিশেষ করে যে মুহূর্তে জানতে পারলেন, সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মা ও ভাইয়ের অবনিবনার শিকড় এতটাই গভীরে যে তাঁদের মধ্যে প্রায় কোনও সম্পর্কই নেই গত কয়েক বছর। সে সংকট এমনই তীব্র যে দুটি ফ্ল্যাটের মাঝখানে বয়ে চলেছে এক আমাজন জল। সে বৃহত্তম নদ পেরোনো দেবাদ্রি সান্যালের মতো এক দুঁদে, পোড়-খাওয়া পুলিশ ইনস্পেক্টরের পক্ষেও যেন অসম্ভব। তার উপর আরও ঠেক খেলেন আজ এই মুহূর্তে চন্দ্রাদেবীর ফ্ল্যাটে ঢুকে। বুঝতে পারলেন অনেক 'কিন্তু' এবং 'যদি' জড়িয়ে আছে ঘটনাটির অন্তরালে। রবার্ট ও'নীল নামের এই বিদেশি মানুষটিকে ক'দিন ধরেই ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছিল কখনও থানায়, কখনও কোর্টরুমে। কখনও পরামর্শ করছিলেন কালো জোব্বা পরা উকিলবাবুদের সঙ্গে। তাঁকে এই মুহূর্তে এ-বাড়িতেও দেখতে পাবেন তা ঠিক ভাবতে পারেননি যেন। বাইরের ঘরে কেবল তাঁরা দু'জনেই, নিশ্চয় একান্তে বসে এতক্ষণ কোনও গূঢ় পরামর্শে ব্যস্ত ছিলেন, পুলিশ ইন্সপেক্টরকে দেখে দু'জনেরই মুখ আপাতত বিব্রত, অসন্তুষ্ট, থমথমে।

তাঁর প্রশ্নে চন্দ্রাদেবী নয়, রবার্ট ও'নীলই জিজ্ঞাসু চোখ ছুড়ে দিলেন, ই বলুন—

দেবাদ্রি খুঁটিয়ে দেখছিলেন দু'জনকেই।

pathagar.net

ইতিমধ্যেই শুনেছেন, দুজনের ভেতর নিছক বন্ধুত্বই শুধু নয়, এক গভীরতর সম্পর্ক আছে যা নাকি খুবই জটিল ও কৌতূহল উদ্রেককারী। সে সম্পর্ক প্রায় আটাশ-ঊনত্রিশ বছরের পুরানো। পুরানো মদের মতোই দীর্ঘকালের এই অ-বিবাহিত সম্পর্ক নাকি ঢের ঢের মাদকগুণসম্পন্ন। তাই অ্যারাউন্ড-ফিফ্‌টি চন্দ্রাদেবীকে দেখে উপলব্ধি করছিলেন, এতকাল পরেও তাঁদের প্রণয়ে কতখানি গভীরতা। বিবাহই প্রেমের সমাধি—এ কথা যিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি নিশ্চই যথার্থ, না হলে কেনই বা রবার্ট ও'নীল তাঁর এই ওল্ড ফ্লেমটির জন্য এখনও মাথা ঘামাবেন এত, পাগলের মতো ছোটাছুটি করবেন এভাবে! চৌধুরী পরিবারকে কীভাবে এই প্রবল বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত করে আনা যায় তা নিয়ে তো তাঁর ক'দিন ধরে চিন্তা ভাবনার অন্ত নেই। প্রায় এলোপাথাড়ি ভাবে, এর আগে টুকরো টুকরো প্রশ্ন করে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছেন দেবাদ্রি। মেরুন রঙের ডায়েরিতে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুলিয়ে একটু সড়গড় হয়ে নিয়ে এতক্ষণে মাথা তুললেন, হ্যাঁ, হয়তো রিপিট করতে হচ্ছে, সেজন্য আমি দুঃখিতও, তবু পাঁচুই এপ্রিল রাতে আপনারা কে কোথায় ছিলেন সেটাই আর একবার ডিটেলসে বলতে হবে আপনাদের।

রবার্ট ও'নীল তাঁর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অল্প-অল্প ধোঁয়া ছাড়ছিলেন এতক্ষণ। দেবাদ্রির মনে হচ্ছিল কেমন নীলচে রঙের ধোঁয়াই যেন বা, অনেকটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ব্যাপার আছে সে-ধোঁয়ায়। সেই রহস্যময়তার ভেতর থেকেই সামান্য বিদেশি অ্যাক্‌সেন্ট-মেশানো পরিষ্কার বাংলায় কণ্ঠস্বর শোনা গেল ও'নীলের, এর আগে তো আপনি শুনেছেন, মিঃ সান্যাল, সেদিন সন্ধেয় আমি আর চন্দ্রা দু'জনে গিয়েছিলাম পার্ক সার্কাসের এক মিউজিক কনফারেন্সে, ফিরেছিলাম একটু রাত করেই, তখন প্রায় একটা হবে রাত, চন্দ্রাকে এ বাড়িতে ড্রপ করে দিয়ে যখন আমি বাড়ি ফিরি তখন অন্তত রাত দেড়টা-পৌনে দুটো হবে।

—হুঁ, এবার চন্দ্রাদেবীর দিকে তাকালেন দেবাদ্রি, আর হিমন চৌধুরী?

বোধহয় একই প্রশ্ন বারবার করার মুখে বিরক্তির ছাপ পড়ছিল চন্দ্রাদেবীর, বললেন, হিমন সেদিন রাত নটা-সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিল। ডাইনিং টেবিলে ক্যাসারোলে তার খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল। খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা বাড়ি ফেরার অনেক আগেই—

—আপনি কী করে জানলেন তিনি ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন তখন? আপনি কি তার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছিলেন?

—না, তা দেখিনি। তবে খাওয়ার পর তার এঁটো থালা-বাটি পড়েছিল টেবিলে। যেমন রোজই থাকে। ডিনারের পর রোজই তো তার ঘরে ঢুকে যায়।

—আর ইউ শিওর, সেদিন ডিনার সেরে উনি ঘুমোতেই গিয়েছিলেন?

চন্দ্রাদেবী ঈষৎ রেগে গিয়ে বললেন, নিশ্চই। ভোরবেলা পুলিশ এসে যখন কলিং বেল টিপেছিল, তখনও সে তার ঘর থেকেই বেরিয়েছিল।

দেবাদ্রি অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুচকি হাসলেন এক লহমা, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, খাওয়ার পর তিনি ঘরেই ছিলেন। হয়তো খেয়ে ফ্ল্যাটের বাইরে গিয়েছিলেন, আপনি ফেরার অনেক পর চুপিচুপি ফিরে এসে শুয়েছেন আপনার অগোচরে।

চন্দ্রাদেবী প্রায় গর্জে উঠে বললেন, নেভার। ওর সে সাহসই হবে না—

—তাই নাকি? দেবাদ্রি হাসতে লাগলেন, ঠিক আছে, এবার বলুন তো, হিমন চৌধুরী সাধারণত ক'টার সময় বাড়ি ফেরেন রোজ?

চন্দ্রাদেবী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন, ও কোনও দিনই বেশি রাত করে না। রোজই রাত ন'টা-সাড়ে ন'টার মধ্যেই ফিরে আসে।

pathagar.net

—ও, দেবাদ্রি ডায়েরির পৃষ্ঠায় চোখ রাখলেন, ওঁর অফিস তো ছুটি হয় বিকেল ছ'টায়, সাধারণত তার পরই ফেরার কথা। তা হলে এত দেরি হয় কেন? অফিস-ছুটির পর নিশ্চই কোথাও যান রোজ?

একটু ইতস্তত করে চন্দ্রাদেবী বললেন, আসলে ছোটবেলা থেকেই ও বেশ ইমম্যাচিওরড্ ধরনের। কথাবার্তায়, চলাফেরায় একধরনের জড়তা আছে। হয়তো ছোটবেলা থেকে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করতে দিইনি বলেই। তাই এখন বলেছি, অফিস-ছুটির পর রোজ ওদের কোম্পানির ক্লাবে খেলতে যেতে। সেখানে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা করলে যদি ওর চলাফেরায় একটু স্মার্টনেস আসে—

—সেখানে কী খেলেন উনি?

—ক্যারাম, টেবিল টেনিস—সাধারণত এ গুলোই। শীতে কখনও সখনও ব্যাডমিন্টন।

—হুঁ, বলেই হঠাৎ আচম্কা কথার মোড় ঘোরালেন দেবাদ্রি, আচ্ছা, সেদিন বলেছিলেন, আপনারা রাত একটায় যখন বাড়ি ফিরেছিলেন, সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছিল।

—হ্যাঁ, ফ্ল্যাটের পেছনদিকে ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বলছিল।

—আলো ছাড়া আর কোনও অস্বাভাবিক দৃশ্য চোখে পড়েনি আপনাদের?

—না।

—কিন্তু অত রাতে ওঁদের ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে কেন, সে প্রশ্নও তো মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

—রাত একটা আমাদের বাড়িতে এমন কিছু বেশি রাত নয়, মিঃ সান্যাল। তা ছাড়া, আমরা জানতাম, বেশি রাত পর্যন্ত জেগে ল্যাবরেটরিতে কাজ করা সায়নের বরাবরের অভ্যাস। অনেকসময় সারারাত কাটিয়ে দেয় সেখানে। এই তো কদিন আগেও—

দেবাদ্রির ঠোঁট একটুকরো চোরা হাসি খেলা করে গেল সহসা, বললেন, আচ্ছা, সেদিন বলেছিলেন, সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটের সঙ্গে আপনাদের দীর্ঘদিনের কোনও সম্পর্ক নেই, প্রায় মুখ দেখাদেখি বন্ধ, তা হলে তাঁর বিষয়ে এত সব কথা জানলেন কী করে?

একমুহূর্ত থতমত খেলেন চন্দ্রাদেবী, একনজর বিব্রতমুখে তাকালেন ও'নীলের দিকে, তারপর বললেন, বাড়িটা এমনভাবে তৈরি যে দুটো ফ্ল্যাট প্রায় মুখোমুখি, এ-ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে ও-ফ্ল্যাটের ব্যালকনি দেখা যায়।

—কাল কিন্তু আপনি বলেছিলেন, আপনাদের মধ্যে যেহেতু খুবই খারাপ সম্পর্ক, বহুকাল ব্যালকনির দিকের দরজা খোলা হয়নি আপনাদের।

—ঠিকই বলেছিলাম মিঃ সান্যাল। ব্যালকনিতে না গিয়েও এ-ফ্ল্যাটের লিভিং রুমের জানলায় দাঁড়ালে ও-ফ্ল্যাটের আলো জ্বলছে কি জ্বলছে না তা বোঝা যায়। আমি লিভিং রুমের জানালায় দাঁড়িয়েই দেখেছিলাম।

হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আচমকা প্রশ্ন ছুড়েছিলেন দেবাদ্রি, আপনি কি এ-ফ্ল্যাট থেকে ও-ফ্ল্যাটে কী হচ্ছে না হচ্ছে, তার নিয়মিত নজরদারি করেন মিসেস চৌধুরী?

চন্দ্রাদেবী তাঁর নিচের ঠোঁটটা হঠাৎ কামড়ে ধরলেন, তাঁর ফর্সা মুখ একটু লাল হয়ে উঠল যেন বা, চোখদুটো সামান্য জ্বলেও উঠল, দ্রুত কেমন শক্ত হয়ে গিয়ে বললেন, এর নাম মোটেই নজরদারি নয়। রাতের বেলা কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতে আলো জ্বললে তার দিকে যে-কারও চোখ যাবে।

pathagar.net

গভীর মনোযোগ দিয়ে চন্দ্রাদেবীর এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াটুকু লক্ষ করলেন দেবাদ্রি, তারপর হেসে বললেন, সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হঠাৎ এত খারাপ হয়ে গেল কেন, মিসেস চৌধুরী?

সায়নের নাম শুনে সহসা মুখচোখ আরও খানিকটা শক্ত হলে গেল চন্দ্রাদেবীর। বোধহয় কিছুটা সময় নিলেন কী উত্তর দেবেন তা ভাবতে, আবার চোখাচোখি করে নিলেন রবার্ট ও'নীলের সঙ্গে, তারপর বললেন, সে-সব আমাদের পারিবারিক ব্যাপার, সব কথা আপনাদের বলতে আমি বাধ্য নই।

—কিন্তু এ-কেসের ইনভেস্টিগেশনের জন্য সে সব কথা জানা আমাদের কাছে খুবই জরুরি, মিসেস চৌধুরী।

চন্দ্রাদেবীর চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল আরও, যদি দরকার হয় তাহলে যা বলার কোর্টেই বলব, আপনার কাছে নয়।

দেবাদ্রির মুখও শক্ত হয়ে উঠেছিল, কিছুক্ষণ চন্দ্রাদেবীর জবাব ও তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে দ্রুত চলে এলেন প্রসঙ্গে, আচ্ছা বলুন তো, আপনার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ দীয়া চৌধুরী হঠাৎ এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন কেন?

চন্দ্রাদেবী তেমনই গম্ভীর স্বরে বললেন, চলে গেছে আপনাকে কে বলল? সে তো প্রায়ই আসে।

—তাই নাকি? কিন্তু সে এ বাড়িতে রাত্রিবাস করে না বলেই জেনেছি। গত তিন-চার মাস ধরেই—

—কে আপনাকে এ-সব কথা বলেছে? দীয়াই নাকি?

দেবাদ্রি কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, শুনলাম, আপনাদের অত্যাচারেই নাকি সে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে—

চন্দ্রাদেবী উত্তেজিত হয়ে বললেন, ইটস আ ড্যাম লাই। তার এ বাড়িতে থাকতে ভাল লাগে না তাই সে হুটহাট করে চলে যায় মাঝেমধ্যে। ক'দিন পরেই আবার আসে—

—আসে, কিন্তু রাতে থাকে না।

—থাকে না, তার কারণ হিমনের সঙ্গে তার অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় না।

—শুধু কি তাই, মিসেস চৌধুরী? দেবাদ্রি মুখ-চোখ শক্ত করলেন ফের, নাকি আপনি পুত্রবধূর ওপর অসম্ভব ডমিনেট করেন বলেই—

চন্দ্রাদেবীর মুখ লাল হয়ে উঠল, গলাও একটু চড়ে গেল তাঁর, ঘরের বউ হুটহাট করে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তার প্রতিবাদ করলে যদি ডমিনেট করা হয়—

দেবাদ্রি হঠাৎ ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে বললেন, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য লাগছে মিসেস চৌধুরী। কোনও ঘরের বউ কি স্বেচ্ছায় তার শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যায়, যদি না তাকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়?

উত্তেজনায় চন্দ্রাদেবী তখন প্রায় থরথর করে কাঁপছেন। যেন কিছু একটা বলতে চাইছেন, অথচ কোনও জটিল কারণে তা বলতে পারছেন না বলেই তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠছে প্রবল ক্রোধ। তার সঙ্গে অসহায়তায়ও। দেবাদ্রি মুখে এক প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ফুটিয়ে লক্ষ করছিলেন এই অভিজাত বাড়ির মহিলাটির রকমারি প্রতিক্রিয়া। পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই অথবা সদ্য পেরিয়েছেন যে রমণী, তিনি এ-বয়সেও এতটাই সুন্দরী, তাঁর গায়ের চামড়া এখনও এমনই মসৃণ যে অন্তত দশ বছর বয়স কমিয়ে বলতে পারেন অনায়াসে। বিশেষ করে তাঁর চোখের চাউনিতে জড়িয়ে

pathagar.net

আছে এমন একটি চোরাটান যে প্রকৃত বয়স না জানলে দেবাদ্রি নিজেই তাঁর প্রেমে পড়ে যেতে পারতেন হয়তো। তবে পারা সম্ভবও ছিল না, কারণ তাঁর দাপুটে স্বভাবের জন্য। অন্যের ওপর ডমিনেট করাটা তাঁর এতটাই সহজাত যে প্রতিমুহূর্তে তা বুঝিয়ে দেন তাঁর চাউনিতে, কথনভঙ্গিতে, চালচলনে।

তাঁর এই প্রবল ক্রোধ প্রশমন করতে এগিয়ে এলেন এতক্ষণ পাশে স্থির হয়ে বসে থাকা রবার্ট ও'নীল, দেবাদ্রির দিকে তাকিয়ে বললেন, দীয়া একটু পাগলি ধরনের আছে, মিঃ সান্যাল। মোটে বছর দেড়েক বিয়ে হয়েছে ওদের। মানবজীবন সম্পর্কে আমার যা স্টাডি, তাতে দেখেছি, বিয়ের দেড় দু'বছর পরে এরকম একটা ক্রাইসিস অনেক দম্পতির জীবনেই দেখা দেয়। কিছুদিন এরকম টালমাটাল অবস্থা চলে। তারপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়ে যায়। দীয়াও ইদানীং তার হাজব্যান্ডের সঙ্গে টুকটাক খুনসুটি, অবনিবনা হলেই রাগঝাগ করে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, ক'দিন পরেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে—

দেবাদ্রি চমৎকৃত হওয়ার মতো মুখ করে বললেন, ইজ ইট। তাহলে এবার আমাকে বলুন তো, সায়ন চৌধুরীর জীবনেও কি এই ধরনের কোনও ক্রাইসিস দেখা দিয়েছিল ইদানীং?

আচমকা এহেন প্রশ্নে সামান্য থতমত খেয়ে গেলেন রবার্ট ও'নীল, তারপর সামলে নিয়ে হাসলেন, স্যরি ইনস্পেক্টর, এই প্রশ্নের জবাব আমি বোধহয় ঠিকঠাক দিতে পারব না—

দেবাদ্রি আশ্চর্য হওয়ার ভান করে বললেন, কেন?

সামান্য ইতস্তত করে ও'নীল বললেন, আসলে সায়ন বোধহয় কোনও দিনই আমাকে তেমন পছন্দ করত না। তাই ওদের কাছাকাছি হওয়ার সৌভাগ্যও আমার হয়নি তেমন ভাবে। ফলে ওদের দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে কিছু বলা আমার সাজে না।

—তাই? দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন নিজের মনেই, যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তাহলে কেন আপনাকে পছন্দ করতেন না, তার কারণ কি জেনেছেন কখনও?

—নাহ, রবার্ট ও'নীল হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেলেন, সেটাই বোধহয় আমার জীবনের একটা দুর্ভাগ্য। তাই নিজেকে কখনও শোধরাতে পারিনি অনেক চেষ্টা করেও। ইট'স মাই ব্যাড লাক—

দেবাদ্রি কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে এই বিদেশি মানুষটির অভিব্যক্তি লক্ষ করলেন। সায়ন চৌধুরীর উপেক্ষা যে তাঁকে খুবই ক্ষুণ্ণ করেছে, ক্ষুব্ধও, তা তাঁর কথার জড়ানো ভঙ্গি, ধূসর চাউনি এবং দীর্ঘশ্বাসে স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটু পরেই হঠাৎ কথার মোড় বদলালেন ফের, আচ্ছা মিঃ ও'নীল, সায়ন চৌধুরীর ল্যাবরেটরি ঘরের আলো তো আপনিও দেখেছিলেন, তা অত রাতে আলো জ্বলছিল, এ দৃশ্য দেখার পর আপনারও কিছু মনে হয়নি?

—কী আর মনে হবে। ভেবেছি, কাজ-পাগল ছেলেটা নতুন কোনও ফর্মুলা বার করার চেষ্টা করছে।

—ও, সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন একটা বোমা ফাটালেন দেবাদ্রি, কিন্তু মিঃ ও'নীল, অ্যারেস্ট হওয়ার দিন সায়ন চৌধুরী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন, সে রাতে তিনি বাড়িতেই ছিলেন না। বিলাসপুর থেকে সেদিন তাঁর ফেরার কথা থাকলেও কোনও বিশেষ কারণে তিনি নাকি কলকাতায় পৌঁছাতে পারেননি। তাহলে ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বলছিল কেন?

রবার্ট ও'নীল ও চন্দ্রাদেবী দু'জনেই ভীষণ থতমত খেয়ে গেলেন হঠাৎ। একে অপরের দিকে চোখাচোখিও করে নিলেন এক লহমা। কিন্তু কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। এক অদ্ভুত সন্দেহে সমস্ত পরিবেশ সহসা ভীষণ থমথমে হয়ে উঠল। দেবাদ্রি আবার বললেন,

আচ্ছা, মিঃ ও'নীল, আপনি একটু আগেই বলেছেন, চন্দ্রাদেবীকে এ-বাড়িতে ড্রপ করে আপনি নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন সে-রাতে, তা হলে ল্যাবরেটরি-রুমের আলো আপনার চোখে পড়ল কী করে? বাইরের গেট থেকে এ-আলো তা দেখতে পাওয়ার কথা নয়।

হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন ও'নীল, নিশ্চয় অত রাতে একজন মহিলাকে বাড়ির গেটে ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া যায় না। তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তবেই—

দেবাদ্রি এবার দুম করে বলে বসলেন, আর ইউ শিয়োর, আপনি সে-রাতে এ বাড়িতে থাকেননি, ফিরে গিয়েছিলেন নিজের আস্তানায়?

ও'নীলের মুখে তখনও ছুঁয়ে আছে এক সকৌতুক ভঙ্গি, বললেন, না, মিঃ সান্যাল, শুধু সে-দিন কেন, এ বাড়িতে রাত কাটানোর সৌভাগ্য আমার কোনও দিনই হয়নি।

—তাই! দেবাদ্রির মুখে একধরনের চোরাহাসি ফুটে উঠল মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই হঠাৎ আর একখানা বোমা ফাটালেন, আচ্ছা, সেদিন পার্ক সার্কাসে মিউজিক কনফারেন্স হয়েছিল সারারাত ধরে। হঠাৎ মধ্যরাতে আপনারা দু'জন ফিরে এলেন কেন? শেষ রাতেই তো ভারত-বিখ্যাত শিল্পীরা গেয়েছিলেন, সেদিন সে অনুষ্ঠান ছেড়ে—

দেবাদ্রির সামনে বসা দু'জনই কিছুক্ষণের জন্য স্থাণু হয়ে গেলেন, একটু পরে চন্দ্রাদেবী বলে উঠলেন, আমার সেদিন ঠিক ভাল লাগছিল না প্রোগ্রামগুলো। বোধহয় মুডই অফ ছিল আমার, তাই আমি বলেছিলাম, চলে যাব—

—ও, দেবাদ্রি হেসে বললেন, ঠিক আছে, এবার হিমন চৌধুরীকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। ওঁকে যদি একবার এ-ঘরে পাঠিয়ে দেন—

হিমনের কথা উঠতেই চন্দ্রাদেবী আরও অস্বস্তি বোধ করলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোফা থেকে উঠে সেঁধিয়ে গেলেন পাশের ঘরে, একটু পরেই জড়ভরতের মতো এক-পা এক-পা করে হেঁটে হিমন এসে দাঁড়াল সোফার সামনে। দেবাদ্রি 'বসুন' বলতেই সে সোফার এককোণে সিঁটিয়ে বসল। চোখমুখে অসম্ভব ত্রাস।

একটু আগে যে চোরাহাসি দেবাদ্রির মুখে খেলা করছিল, লাল্‌চে রঙের চুল আর গোঁফদাড়িতে ঢাকা হিমনের মুখখানা দেখে তা আরও উচ্ছল হয়ে চল্‌কে উঠল মুহূর্তে। তার দিকে কয়েক লহমা তাকিয়ে পরক্ষণেই তাকালেন রবার্ট ও'নীলের দিকে। ও'নীল একটু আগেই বলেছিলেন 'এ বাড়িতে রাত কাটানোর সৌভাগ্য আমার কোনও দিন হয়নি' সেই কথাগুলোকে যেন বিদ্রূপ করে উঠল হিমনের সাহেবি-ধাঁচের মুখ, তার চোখের ধূসর মণিটি পর্যন্ত।

চোরাহাসিটির কিছুক্ষণ চোরাঘূর্ণি হয়ে ঢেউ খেলল দেবাদ্রির আপাত গম্ভীর মুখে, তারপর সরাসরি প্রসঙ্গে চলে গেলেন, হিমনবাবু, আপনি পাঁচ তারিখ বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিলেন?

একটু কঠিন গলায়ই জিজ্ঞাসা করেছিলেন দেবাদ্রি, তাতে হিমনের জিভ আরও শুকিয়ে গেল যেন, জড়ানো গলায় বলল, অফিস-ক্লাবে ক্যারাম খেলতে।

—কতক্ষণ ছিলেন সেখানে?

—সাড়ে আটটা হবে তখন। না, না, বোধহয় পৌনে ন'টা—তখন বেরিয়ে এসেছিলাম।

—আপনার সঙ্গে আর কেউ ছিল বেরিয়ে আসার সময়?

হিমন ঢোক গিলল, আর? না, না, আর কেউ তো নয়। আমি একাই—

দেবাদ্রি হঠাৎ জোরে ধমক দিয়ে উঠলেন, আপনি প্রতিটি কথাই মিথ্যে বলছেন হিমনবাবু, আমি যদি বলি, অফিস থেকে বেরিয়ে আপনি বেল ক্লাব-এ গিয়েছিলেন, অফিস-ক্লাবে নয়।

boiparoi.net

—বেল ক্লাব? হিমনও ঢোক গিলল ফের, না তো—

—আর ক্যারাম নয়, আপনি ক্যাসিনো খেলেছিলেন সেখানে।

—ক্যাসিনো? না, না, হিমন প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, ভয়ার্ত চোখে তাকাল একটু দূরে প্রায় মিলিটারি চোখে তাকিয়ে থাকা চন্দ্রাদেবীর দিকে।

—হ্যাঁ, সেদিন বেশ কিছু টাকাও হেরেছিলেন আপনি। যখন ক্লাব থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, আপনার সঙ্গে একজন বান্ধবী ছিল। অ্যান্ড সি ইজ আ চেন-স্মোকার।

প্রবল ভুঁইকাঁপে তাঁদের বাড়িটা উল্টে গেলেও বোধহয় চন্দ্রাদেবী বা ও'নীল এতখানি চমকে উঠতেন না। কয়েক মুহূর্ত টালমাটাল হওয়ার পর চন্দ্রাদেবী প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, উইল ইউ প্লিজ স্টপ, ইনস্পেক্টর? আমার ছেলেকে আপনি নতুন করে চেনাচ্ছেন আমাদের? যে কিনা ভাল করে চলাফেরা করতে পারে না, ইমম্যাচিওর্‌ড, প্রায় পঙ্গু, সে কিনা—

দেবাদ্রি হেসে বললেন, ঠিক আছে, হিমনবাবু, আপনি এখন যেতে পারেন—

হিমন প্রায় বিস্ফারিত চোখে টলতে টলতে চলে গেল তার ঘরের দিকে। আর চন্দ্রাদেবী দাঁড়িয়ে রইলেন চন্দ্রাহত হয়ে।

রবার্ট ও'নীল এতক্ষণে বললেন, আপনি কি আমাদের সবাইকেই মার্ডারার ঠাউরেছেন, মিঃ সান্যাল? দেখতেই তো পাচ্ছেন, এই অঘটনের ফলে চৌধুরী পরিবার রুইন্ড হতে বসেছে, তাদের প্রেস্টিজ, সোশ্যাল স্ট্যাটাস, আভিজাত্য সব শেষ। এমনকি সায়নের দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস-এর অস্তিত্বও নাউ অ্যাট স্টেক—

প্যারাডাউস প্রোডাক্টসের এ হেন দুর্দিনে সবচেয়ে উল্লসিত হয়েছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন 'লাইম ইন্ডিয়া'র চেয়ারম্যান থেকে নিচুতলার কর্মী, সবাই। একমাত্র রৌণকই তার ব্যতিক্রম।

হাইরাইজ বিল্ডিংটির সাততলার জানালা থেকে চিন্তিত, উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল সে, মানে লাইম ইন্ডিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জি। তার টেবিলের ওপর একটা সাদা প্যাড, হাতে সোনালি ক্যাপের পেন। কিছু একটা ভাবনা তার মাথায় চক্কর দিয়ে ঘুরতে থাকলেও সে একবর্ণও এখনও ন্যস্ত করতে পারেনি সাদা পৃষ্ঠার ওপর।

সিক্সথ ফ্লোরে অফিস হওয়ার সুবাদে তার চেম্বারের জানালা ফুঁড়ে চলে আসে কলকাতা শহরের অনেকখানি। বার্ডস্ আই ভিউ হলেও সে দেখতে পায়, চৌরঙ্গি পাড়ার একদিকে অজস্র ছোট-বড় মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, এক-একটার শুঁড় এমন উঁচু হয়ে উঠে গেছে যেন ছুঁয়ে ফেলবে আকাশ। অন্যদিকে সবুজ মাঠ। তার একপাশে শহিদ-মিনারের গগনচুম্বিত অহঙ্কার—আজকাল সন্ধের পর আলোয় সেজেগুজে তা আরও রূপসী হয়ে ওঠে। এমনকি তাদের অফিসের পাশে রাজভবনটিকেও মনে হয় একটা বড়সড় খেলনা বাড়ি। সব মিলিয়ে কলকাতার এই অঞ্চলে একটা অ্যাফ্লুয়েন্স। ফরাসি কবিতার মতো এই চৌরঙ্গিপাড়া চিত্রকল্পে, ছন্দের ঐশ্বর্যে, রমণীয় সৌন্দর্যের অহঙ্কারে যথেষ্ট ধনীই।

মাঝেমধ্যে উদাসীন হয়ে রৌণক কখনও একা-একা চাখতে বসে কলকাতার এই অদ্ভুত সৌন্দর্য। এভাবে কয়েক লহমা আনমনা হয়ে থাকাটা তার ভারি পছন্দের, শৌখিন বিলাসিতাও

pathagar.net

বটে। এর মধ্যে একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ব্যাপার আছে। রিল্‌কে-র কবিতায় যেমন এক-এক ঝলক রহস্যময়তা, তেমনি এই কলকাতা-প্রিয়তায়।

কিন্তু আপাতত রৌণকের মনে কোনও কবিতা নেই। মগজে ঘাই মারছে না কোনও মালার্মে বা পল এলুয়ার। কিছুক্ষণ আগেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহ রায়, তাঁর ঝকঝকে চেম্বারে বসে প্রায় হুঙ্কারের ভঙ্গিতে বললেন, খুব তো বিজ্ঞাপনের কপিতে কবিত্ব ফলান, এ বার একটা কিছু করুন, যাতে প্যারাডাইসের স্বর্গ ভেঙে খানখান হয়ে যায়। নইলে লাইম ইন্ডিয়ার অস্তিত্ব আর থাকবে না। যে ভাবে টার্নওভার নেমে আসছে দ্রুত, তাতে আর কিছুদিন পরে লালবাতি জ্বলবে কোম্পানিতে। সেই বাতি আপনাদের সবাইকে এক-একটা করে ধরিয়ে দেওয়া হবে। বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সবাই মিলে তার চারপাশ ঘিরে বসে শোকসভা করবেন।

চেয়ারম্যানের কথাগুলো প্রথমটা ঠিক মাথায় ঢোকেনি রৌণকের। তারপর একটু থিতু হতে বুঝতে পারল, চেয়ারম্যান বলছেন এমন সব বিজ্ঞাপন কাগজে ছাপতে, যাতে তাদের প্রতিযোগী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ক্ষতি হয়, তাদের সেল পড়ে যায়। প্যারাডাইসের সেল পড়ে গেলে নিশ্চই লাইম ইন্ডিয়ার সেল বাড়বে।

বিষয়টি উপলব্ধি করে মুখ লাল করে তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসেছে রৌণক। নিজের চেয়ারে থম হয়ে বসে সে ভাবতেই পারছে না তার এখন কী করা উচিত। মাত্র ছ-সাত বছর হল সে এই কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে। তাদের কোম্পানির প্রোডাক্ট—তার গুণ, উপকারিতা ইত্যাদি সব বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরাই তার কাজ। আজ ক'বছর তারই মধ্যে লীন হয়ে আছে তার ভাবনার অভিনবত্ব-সমেত।

বিজ্ঞাপনের জগতে রৌণকের যখন প্রথম প্রবেশ, তখন তার মনের ভেতর টায়টায় ভরে ছিল এক প্রবল উচ্চাশা। সে তখন বিজ্ঞাপনের নতুন চমকে, নতুন উদ্ভাবনায় লাইম ইন্ডিয়াকে খ্যাতি শিখরে পৌঁছে দিতে উৎসুক। নতুন নতুন আইডিয়া দিয়ে সে লে-আউট তৈরি করাতে থাকে তাদের অ্যাড—এজেন্সিটিকে দিয়ে। ছবির সঙ্গে চমকপ্রদ সব ক্যাপসন দেয়। তখন লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হত সাবানের ফ্লেবার ফুরফুর করে ভেসে আসছে খবরের কাগজের পাতা থেকে। দুধসাদা বাব্‌ল ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা পৃষ্ঠা ছাপিয়ে ঘরের ভেতর। এ ভাবেই বাণিজ্যিক পৃথিবীতে সে ছড়িয়ে দিতে শুরু করে তার মনের রোমান্টিক সব ভাবনা।

ইতিমধ্যে তার ভাবনার চমৎকারিত্বে, কলমের কারুকাজে ভাল বিজ্ঞাপন তৈরি করে কোম্পানির ইমেজ অনেকখানি তুলে এনেছে সে। তার ভাবনার মধ্যে একটা পজিটিভ ব্যাপার আছে, একটু অন্যরকম ইমাজিনেশনও। কিন্তু চেয়ারম্যান হঠাৎ আজ যা বললেন—

পেনের সোনালি ক্যাপটা সে আরও একবার কামড়ে ধরল দাঁতে। গত তিনবছর ধরে কোম্পানির টার্নওভারে টান ধরার পর থেকেই এ হেন ঝড়ঝাপট চলছে ক্রমাগত। ততদিনই তার বিজ্ঞাপনের রমরমা ছিল, যতদিন 'দি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড' এমন হই-হই করে বাজারে উঠে আসেনি। প্যারাডাইসের 'রোজবেরি' হঠাৎ মার্কেট ধরে নিতেই টনক নড়েছিল লাইম ইন্ডিয়ার। রোজবেরির গোলাপ-গন্ধ, তার সঙ্গে তার বিজ্ঞাপনের চমৎকারিত্ব তখন গুনগুন করে ঘুরছে মানুষের মুখে-মুখে। সে আলোচনার রেশ তার সুবাস একদিন ধাক্কা মারল রৌণকের মনের গলিঘুঁজিতেও। বিজ্ঞাপনের সাফল্য সেখানেই যখন তা ঝাঁকুনি দিতে পারে মানুষকে, বিজ্ঞাপন পড়ার বা দেখার অনেক পরেও যা গুঞ্জন তুলে ঘুরে বেড়ায় মনের ভেতর। তার মানে প্যারাডাইসের বিজ্ঞাপন প্রভাবিত করছে মানুষকে,

pathagar.net

সম্মোহিতও। কিন্তু পরে বুঝল, শুধু বিজ্ঞাপনই নয়, প্যারাডাইসের প্রোডাক্টও বেশ লোভনীয়। একদিন বাড়ি ফেরার পথে রৌণক নিজেই একটা রোজবেরি কিনে ফেলল আচমকা। দু-তিনবার মোড়কের ওপর থেকেই শুঁকল তার গন্ধ। মনে-মনে তারিফও করল, বাহ্ দারুণ তো! তারপর বাড়ি ফিরে ভাল করে সাবানটি মেখে উপুরঝুপুর স্নান করে ফেলল। নাহ্, সাবানটা সত্যিই অদ্ভুত। কী চমৎকার সেন্ট। বাথরুম থেকে বেরিয়ে স্ত্রী ঋতবৃতাকে বলল, দ্যাখো তো ঋতু, এ সাবানটায় স্নান করলে কেমন লাগে?

গোলাপের এ হেন চমৎকার গন্ধ ইতিমধ্যে ঠোনা দিয়েছিল ঋতবৃতার নাকেও। সে মুখ আলো করে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে, চোখ বড় বড় করে বলল, বেশ ফ্যান্টাস্টিক গন্ধ তো! তোমাদের কোম্পানি থেকে নতুন বেরোল?

—উঁহু। আর একটা প্যারালাল কোম্পানি গজিয়েছে কলকাতায়। তাদেরই প্রোডাক্ট।

—তাই নাকি! তারাও তোমাদের ফ্রি-তে সাবান দিচ্ছে! বেশ মজা তো—

—না হে খুকি। দোকান থেকে গাঁটের পয়সা খরচ করে কিনে আনলাম। সাবানটার মাহাত্ম্য বুঝতে। বাজারে খুব ধরেছে এটা।

রৌণক সাবান কোম্পানিতে চাকরি করার গত ক'বছরে কখনও দোকান থেকে সাবান কিনতে হয়নি ঋতবৃতাকে। তাদের কোম্পানি ফি মাসে একডজন করে সাবান উপহার দেয় সব ম্যানেজারদের। বিয়ের পর ঋতবৃতা এত সাবান মেখেছে যে, রৌণক ইয়ার্কি করে প্রায়ই বলে, তার বউটা বিয়ের আগে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল, এখন লাইম ইন্ডিয়ার কল্যাণে বেশ ফর্সাই হয়ে গেছে বলা যায়।

তবে ঝামেলাও হয়েছে একটা। আগে তার গায়ে একটা প্রেমিকা-প্রেমিকা সুবাস ছিল। গত এক বছর লেমন-টাচ সাবান মেখে সে সুবাস উঠে গিয়ে এখন তার গায়ে ওতপ্রোত হয়ে থাকে গন্ধরাজ লেবুর গন্ধ। সে অভিজ্ঞতাও অবশ্য কম রোমাঞ্চকর নয়। রাতে বিছানায় ঋতবৃতার পাশে শুয়ে ঘুমোতে গেলে এ হেন গন্ধরাজের গন্ধে সে আজকাল প্রায়শ নস্টালজিক হয়ে পড়ছে।

রৌণক যে গাঁয়ে পড়াশুনো করেছে ছোটবেলায়, সেখানে গরমের দিনে মর্নিং স্কুল হত। স্কুলে যাওয়ার আগে তারা ভাইবোনেরা ভোরে লাইন দিয়ে বসে পান্তাভাতের সঙ্গে গন্ধরাজ লেবু আর নুন মেখে জারিয়ে খেত। সে এক চমৎকার ব্রেকফাস্ট। কিন্তু গত বারো-চোদ্দোবছর কলকাতায় বাস করার পর এখন সে ভাবতেই পারে না কী ভাবে পান্তাভাত খেত তখন। ঋতবৃতাকে সে কথা বলতে সে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

রৌণক পয়সা দিয়ে রোজবেরি সাবান কিনে এনেছে শুনে মোটেই খুশি হল না ঋতবৃতা। কিন্তু সাবানের গন্ধটা তখনও লেগে আছে তার নাকের লতিতে, বলল, কেন, তোমাদের কোম্পানি এমন গোলাপের গন্ধঅলা সাবান তৈরি করতে পারে না?

রৌণক হাসল, সেইটেই তো সমস্যা। আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার কোনও থই খুঁজে পাচ্ছে না। রাহুল রায়কে আমাদের চেয়ারম্যান গত সপ্তাহে খুব করে কড়কে দিয়েছেন।

তা সেই শুরু। তারপর গত তিনবছরে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ হু-হু করে উঠে গিয়েছে অনেকদূর। রোজবেরির পর ড্রিমবাথ। ড্রিমবাথ এমন চমৎকার নীলচে যে, বাথরুমের ভেতর আলো জ্বালিয়ে রাখলে মনে হয়, সত্যিই একটা গাঢ় নীল স্বপ্নের ভেতর ডুবে আছে। ঋতবৃতা তো ড্রিমবাথ মেখে বলেছিল, ধুর ধুর, তোমাদের কোম্পানির ওই ছাই বিউটিবাথ, ফেলে দাও ওগুলো। ড্রিমবাথের তুলনা হয় না।

সত্যিই কয়েকমাস পর বিউটিবাথের প্রোডাকশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল লাইম ইন্ডিয়াকে।

লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহ রায় সে সময় ডেকে পাঠিয়েছিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজারকে, চোখ গরম করে বলেছিলেন, কী ব্যাপার, আপনিও তো কানাডা না মেক্সিকো কোথা থেকে ঘুরে এসেছিলেন, তা সেখানে কি কিছুই শিখে আসেননি?

সেই তখন থেকেই বেশ নার্ভাস, টেন্‌শ হয়ে আছেন রাহুল রায়। তাঁদের কোম্পানির চেয়ারম্যান বলতে গেলে একটি ছোটখাটো নাদুসনুদুস রয়েল বেঙ্গল। হাইট বড়জোর পাঁচফুট, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, মুখে একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফ খণ্ড-ত -এর মতো পাকিয়ে নেমে এসেছে ঠোঁটের দু'পাশে। চশমার ভেতর দিয়ে দু'চোখে আগুন ছোটাচ্ছেন সর্বক্ষণ। ছোট্টখাট্ট মানুষ, অথচ মুখ দিয়ে অনর্গল তুবড়ি।

এমন চেয়ারম্যানের মুখোমুখি হওয়া মানে অনবরত ছ্যাঁকছ্যাঁক করে ছ্যাঁকা লাগে গায়ে। তাঁর বিষদৃষ্টিতে পড়লে হেড-অপিসের দুঁদে বড়বাবুকেও ট্রান্সফার হয়ে চলে যেতে হয় ভোপাল-এরিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার হয়ে। শেষ বয়সে ভদ্রলোকের কী ভোগান্তি! দাবার ঘুঁটির মতো তিনি বালিগঞ্জের রিপ্রেজেন্টেটিভকে তুলে বসিয়ে দেন ব্যাঙ্গালোরে, ব্যাঙ্গালোরের লোককে পট করে তুলে আনেন ভবানীপুরে। দিল্লির সেলস ম্যানেজারকে রাজাভাত খাওয়ায়।

একবার হেড-অফিসের এক অ্যাসিস্ট্যান্টের ওপর রুষ্ট হয়ে তাকে বদলি করে পাঠালেন ভুবনেশ্বরে। সে আবার নেতা, ইউনিয়নের ট্রেজারার। ইউনিয়ন থেকে দল বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে চেয়ারম্যান চোখ লাল করে বলেছিলেন, যাবে না মানে? দরকার হলে সাততলা থেকে নিচে ফে।। দেওয়া হবে।

এমন দাপুটে চেয়ারম্যানের ভয়ে গোটা কোম্পানি থরথর করে কাঁপে। সেল্‌স ম্যানেজার অনঙ্গ চক্রবর্তী একদিন রৌণকের ঘরে ঢুকে বললেন, আচ্ছা, ওইটুকু শরীরে অত তেজ থাকে কী করে বলুন তো?

রৌণক এদিকে-ওদিক তাকিয়ে বলেছিল, এ তো অ্যাটম বোম নয়, রীতিমতো হাইড্রোজেন বোম। ওঁর জিনের ভেতর নিশ্চয় প্রচুর ইলেকট্রন-প্রোটন আছে, আর তা বোধ হয় ইদানীংকালের আর ডি এক্সের চেয়েও অনেক বেশি বিস্ফোরক।

এই হেমজ্যোতি সিংহ রায়ের হুকুমনামা পেয়ে যখন একগলা জলে ডুবে হাঁসফাঁস করছে তাঁর কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জি, ঠিক সে সময় তার ঘরে এসে ঢুকলেন রাহুল রায়। রাহুল রায়ের বয়স রৌণকের চেয়ে কিছু বেশিই, বোধহয় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি, মাঝামাঝি গড়ন, হাইট পাঁচ-সাতের মতো, সামনের চেয়ারে বসে বললেন, চেয়ারম্যান কিছু বললেন নাকি, মিঃ মুখার্জি।

রৌণক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, হুঁ, প্যারাডাইসের স্বর্গ ভেঙে খানখান করতে বলেছেন—

রাহুল তৎক্ষণাৎ নড়েচড়ে বসে বললেন, একজ্যাক্টলি, আমিও তাই ভাবছিলাম। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবুন তো আপনি। একটা কিছু করতেই হবে আপনাকে। এটাই কোম্পানির শেষ সুযোগ। একটা সরু সুতোর উপর দাঁড়িয়ে আছে কোম্পানির ভাগ্য, আর তা রক্ষা করার ভার আপনার হাতেই। থিঙ্ক ওভার ইট—

রৌণক ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রাহুলের দিকে। তাদের চেয়ারম্যান গত দু-তিনবছর ধরেই প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায়কে প্রায় উদ্যত বর্শার নিচে রেখে দিয়েছেন। প্রোডাকশনে কিছু নতুনত্ব কিংবা চমৎকারিত্ব না দেখাতে পারলে তাঁর বোধহয় আর

pathagar.net

নিস্তার নেই। এ হেন বিপর্যয়ের দিনে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চেয়ারম্যান-কাম-এম ডি সায়ন চৌধুরীর পরিবারে হঠাৎ একটি অঘটন ঘটে যেতে ভারি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন রাহুল রায়। রৌণককে হঠাৎ বললেন, দিস ইজ হাই টাইম, মিঃ মুখার্জি। ক্র্যাশ দেম, ক্র্যাশ—

রাহুল রায়ের কথাগুলো প্রায় চেয়ারম্যানের কথারই প্রতিধ্বনি। হয়তো রাহুল রায়ই ভাবনাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে চেয়ারম্যানের মাথায়। এখন নিজে এসে রৌণককে তাতাচ্ছে, ক্র্যাশ—

প্রতিযোগী কোনও কনসার্নকে কী করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে—তাকে সত্যিই গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত কি না এমন ভাবনায় ক্রমশ নিজের ভেতর তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে রৌণক। লাইম ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ এতদিন তার উৎপন্ন দ্রব্য দিয়ে যে কাজ পারেনি, এখন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের বিপর্যয়ের দিনে এক ক্ষতিকারক বিজ্ঞাপন দিয়ে তাইই করতে চাইছে।

রাহুল রায়ের মুখের দিকে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে রৌণকের মনে হল, তার মাথা ঘুরছে, ঝিমঝিম করছে শরীর। সে এতকাল বিজ্ঞাপনের কপি লেখা নিয়ে কতরকম চিন্তা-ভাবনা করেছে, কত কবিত্বও। কী ভাবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাদের লাইম ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট। কী ভাবে আরও গ্রহণীয় করে তোলা যায় তাদের বিউটিবাথ, কিংবা রেড রিবন, অথবা ব্লু জুয়েল—সেইসব নানান ভাবনার আবর্তে ব্যস্ত থাকে সারাদিন। বোধহয় রাতে স্বপ্নের ভেতরও কাজ করে চলে তার মগজ। বলা বাহুল্য, তারই বিজ্ঞাপনের জোরে কোম্পানি গত ছ-সাত বছরে তাদের প্রোডাক্টের একটা উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তৈরি করতে পেরেছে। কিন্তু শুধু ভাবমূর্তি বাড়ালেই তো প্রোডাক্ট বিক্রি হবে না, তার সঙ্গে প্রোডাক্টের কোয়ালিটিও ভাল হওয়া দরকার। প্যারাডাইসের ড্রিমবাথের পাশে লাইম ইন্ডিয়ার বিউটিবাথ, রোজবেরির পাশে তাদের লেমনটাচ্ কিংবা রেডরিবন দাঁড়াতেই পারছে না মার্কেটে। রৌণক কী করবে!

এ দিকে রাহুল রায় চোখমুখ লাল করে বলছেন, ক্র্যাশ দেম, ক্র্যাশ—

আর সেই ক্র্যাশ করার দায়িত্ব এসে পড়ল কি না রৌণকের উপর!

ব্যাপারটা সত্যিই অনৈতিক। বিজ্ঞাপনের এথিকসে এ ভাবে কোনও প্রতিযোগী কনসার্নকে আক্রমণ করার অধিকার দেয় না। তুমি তোমার নিজের প্রোডাক্টকে যত খুশি ভাল বলো, 'ভাল'র মগডালে তুলে দাও। বলো যে, এমন জিনিস সারা পৃথিবীতে আর কেউ ম্যানুফ্যাকচার করতে পারেনি। কিন্তু অন্য সংস্থার প্রোডাক্টকে খারাপ বলার অধিকার তোমার নেই। তাদের আক্রমণ করে কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া তোমার নীতিবিরুদ্ধ।

সমস্ত ভাবনাটা নিজের মনে ঢালা-উপুড় করতে করতে দারুণ বিধ্বস্ত হয়ে যেতে লাগল রৌণক। আশ্চর্য, স্বয়ং চেয়ারম্যানও তাইই চাইছেন। ক্রুদ্ধ চেয়ারম্যান চোখ-মুখ গরম করে হুকুম দিয়েছেন রৌণককে, ডু ইট ইমিডিয়েটলি।

লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের হুকুম তামিল না করা যে কী ভয়াবহ ব্যাপার তা রৌণকরা হাড়ে-হাড়ে জানে। কদিন আগেই খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরকেই ইউনিয়নের ছেলেরা ঘেরাও করেছিল। বেশ কিছু খারাপ খারাপ কথাও তারা প্রয়োগ করেছে এম ডি-র উপর। তার দু-চারটে শব্দ কানে শুনলেও চরিত্র খারাপ হয়ে যায়। এম ডি তাদের বিরুদ্ধে কোনও অ্যাকশনই নিতে পারেননি। কারণ অফিসে অন্যরা বলাবলি করেছে, ঘেরাও-এর পেছনে স্বয়ং চেয়ারম্যানের মদত ছিল। ইদানীং চেয়ারম্যানের সঙ্গে এম ডি-র ঠিক বনিবনা হচ্ছে না, সম্ভবত তারই জের—

এখন তার পেনের সোনালি ক্যাপে কামড় দিতে দিতে রৌণকের মনে হচ্ছে, সে

pathagar.net

কোম্পানির হালচালের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না নিজেকে। বলা যায়, মিসফিট। দিনকাল যা পড়েছে তাতে বেশ ধুরন্ধর টাইপের না হলে বেঁচে বর্তে থাকাই মুশকিল। এ হেন কোম্পানি, যা এই মুহূর্তে সিঙ্কিং সিপ, তাতে কাজ করা আরও সংকটের।

আসলে রৌণক নিতান্তই এক আটপৌরে বাঙালি ঘরের সন্তান। বরাবরই এমন রোমান্টিক স্বভাবের। বিয়ের আগে ঋতবৃতাকে নিয়ে সে বেশ কয়েকটা কবিতাও লিখে ফেলেছিল। পড়ে খুব হেসেছিল ঋতু, ধুর, প্রেমপর্বে সব ছেলেই অমন মেয়েদের হরিণীর মতো চোখ, কালো মেঘের মতো চুল দেখে থাকে। কিন্তু বিয়ের পর ভালবাসি শব্দটা পর্যন্ত বলতে ভুলে যায়। তখন কেবল রাগারাগি, খিটিমিটি।

রৌণকের সারা চোখে তখন উমসুম হয়েছিল স্বপ্ন, উঁহু, দেখো, আমিও ফরাসি কবি লুই আরাগঁর মতো বিয়ের পরও তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখে যাব। এমন চমৎকার মিষ্টি মিষ্টি মেয়েকে সারাক্ষণ চোখের সামনে দেখলে কলমের ডগায় অমনিই কবিতা এসে যাবে।

বিয়ের এতদিন পরও ঋতবৃতা তেমনই মিষ্টি, তেমনই সুন্দরী রয়ে গেছে। গত তিনবছরে তার সঙ্গে রৌণকের কবার খিটিমিটি হয়েছে তা সে হাতে গুনে বলতে পারে। আসলে ঋতবৃতার শরীরে যেন রাগ বলতে নেই। সব ব্যাপারেই তার যেন একটা অদ্ভুত বিস্ময়, অপার কৌতূহল, পরম প্রশান্তি। ঋতবৃতার দরকারি কোনও জিনিস আনতে রৌণক পর-পর দু' তিনদিন ভুলে গেলেও ঋতবৃতা রাগে না। বলে, দাঁড়াও কাল অফিস যাওয়ার সময় তোমার পিঠে একটা কাগজ সেঁটে দেব, তাতে রিমাইন্ডার থাকবে। এমনকি রৌণক যদি কোনও কারণে রেগে ওঠে, তাতেও ঋতবৃতা মিটমিট করে হাসে, বলে, বাহ্ বেশ পার্সোন্যালিটি আছে তো তোমার। পুরুষমানুষ একটু-আধটু না রাগলে কি মানায়।

শুধু লুই আরাগঁ আর হয়ে ওঠা হয়নি রৌণকের। চাকরির চাপে কবিতা লেখার ব্যাপারটা সে এখন প্রায় ভুলেই গেছে। আপাতত তার যতটুকু কবিত্ব সব তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনের কপিতে।

কিন্তু নিজের আদর্শ, ধ্যানধারণা অনুযায়ী কাজে করতে চাইলেই কি কাজ করা যায়। দুটো বুলডোজারের মতো দুদিক দিয়ে এখন তাকে চেপে ধরেছেন দুজন। একদিকে চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায়, অন্যদিকে প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায়।

এখন তার আসনে চেয়ারে বসা সেই রাহুল রায় ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ ফিসফিস করে বললেন, এক রিপোর্টারের সঙ্গে এক-আধটু জানাশোনা ছিল। ব্যস্, তাকে কঙ্কা রায়ের ব্যাপারটা খাইয়ে দিলাম। সেদিন এক সেমিনারে দেখি, কঙ্কা রায় একেবারে পরীর মতো সেজে এসেছে। যেমনি তার মারকাটারি ফিগার, তেমনি দুর্দান্ত মুখের প্রোফাইল। দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। দেখি কি, একেবার ফেভিকলের মতো সেঁটে আছে তার এম ডি সায়ন চৌধুরীর গায়ে-গায়ে। আর কী হ্যা হ্যা করে হাসছে। দিলাম ঝুলিয়ে—

তারপর একটু থেমে আবার ফিসফিস করলেন, সাংবাদিকরা এখন খবরের জন্য হাঁ করে মুখিয়ে আছে। আপনিও খাইয়ে দিন না একটা গসিপ। ওদের মধুমন্তী, ওই যে অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার, খুবসুরত চেহারা, আপনাকে তো ক'বছর ধরে খুব নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে। আপনার এত ভাল বিজ্ঞাপনের হাত, কিন্তু ওই মধুমন্তী, শুধু সুন্দরী মহিলা বলে কাগজের লোকগুলোকে হাত করেছে, আর কী খারাপ লে-আউটের বিজ্ঞাপন কী ভাল জায়গায় প্লেস করে নাম কিনছে বলুন। ডিভোর্সি তো, ওর সঙ্গেও সায়ন চৌধুরীর খুব ইবনবিং। কিছু কিছু আমিও জানি। দিন না ফাঁস করে সব—

pathagar.net

সায়নকে ব্লু-ওয়ান্ডার-এর গেটে সেই যে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দিয়েছিল, তারপর তার আর কোনও খোঁজই নেয়নি গার্গী, নেবেও না এমনই ভেবেছিল, তবু দু-তিনদিন কেটে যাওয়ার পর কী এক অনিবার্য তাড়নায় মনে হল, একবার টেলিফোন করে খবর নেওয়া উচিত। কিন্তু বেশ কয়েকবার ডায়াল ঘুরিয়ে দেখে, বাড়ির টেলিফোনটা পুরোপুরি ডেড, যেন ঐন্দ্রিলাবিহীন ফ্ল্যাটে সেও স্থাণু, শোকবিহ্বল। কিছু দোনামোনা করে অগত্যা রিং করল সায়নের অফিসেই।

পর-পর দুদিনই অবশ্য সায়নের অফিস থেকে একই জবাব পেল, সরি, হি ইজ নট অ্যাভেইলেব্‌ল টু-ডে।

—নট অ্যাভেইলেব্‌ল! গার্গী বুঝি-বা একটু চিন্তায় পড়ল! দ্বিতীয়দিন পীড়াপীড়ি করেও এ ছাড়া অতিরিক্ত কোনও বাক্য আদায় করতে পারল না তার অফিস থেকে। যেন এর বেশি আর কিছু উচ্চারণ করাও তাদের নিষেধ।

টেলিফোনের ওপাশ থেকে ভেসে আসছিল এক নারীর কণ্ঠস্বর। সে স্বর মৃদু, সুরেলা, অথচ বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। নিশ্চয় সায়নের রিক্রুট করা তার নতুন পি.এ., কী যেন নাম মেয়েটার, কঙ্কা, হ্যাঁ কঙ্কাই। গার্গী এ মেয়েটাকে দেখেনি কখনও, কিন্তু শুনেছে অপূর্ব সুন্দরী। খুবই স্মার্ট, আর ইংরেজিতে তুখোড় কথা বলে।

বছর দুয়েক আগে সায়নের এসপ্লানেড ইস্টের অফিসে খুব যাতায়াত ছিল গার্গীর, তখন তার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে কেউ ছিল না, বোধ হয় দরকারও হত না। বছরখানেক হল, তার কাজের চাপ এত বেড়ে গেছে, বেড়ে গেছে এত চিঠিচাপাটি, ফোনাফোনি যে তার একজন পি.এ. না হলেই নাকি আর চলছিল না। তাই এই কঙ্কা। কঙ্কা রায়।

কঙ্কা সম্পর্কে টুকটাক আরও কিছু তথ্য এর আগে কানে এসেছে গার্গীর, কিন্তু যাচাই করার সুযোগ ঘটেনি। ঘটবেই বা কী করে। ঐন্দ্রিলার সঙ্গে সায়নের বিয়ের পর তার অফিসে যাওয়ার আর প্রয়োজন হয়নি গার্গীর। কিছু দরকার পড়লেই তো হুটহাট গিয়ে পড়ত তাদের ফ্লাটে। সেখানেই জমাটি, খুশিয়াল আড্ডার আসর বসাত তিনজনে। তাতে সায়নের সুন্দরী পি.এ,-এ মুখোমুখি কোনও দিন হতে হয়নি বলে তার ভেতরে কিছু আফসোস না ছিল তা নয়, তবে কৌতূহল দেখায়নি কখনও।

তবে অন্য আফসোস ছিল। কখন যে সায়ন হঠাৎ তার অফিসে একজন পি.এ অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে ফেলল তা সে জানতেও পারেনি সে সময়। পরে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, ইস, কখন বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে, দেখতে পাইনি তো! তা হলে আমিও অ্যাপ্লাই করতাম।

সায়ন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল তার কথা, ধুর তুমি পি.এ. হবে কি!

—কেন? গার্গী কৃত্রিম বিস্ময়ে বলেছিল, আমি যথেষ্ট সুন্দরী নই বলে? শুনেছি আপনার পি.এ নাকি একেবারে আগুনের শিখা?

'আগুনের শিখা' শব্দবন্ধটিকে এড়িয়ে গিয়ে সায়নের জবাব ছিল অন্যরকম, উঁহু, পি.এ.-র চাকরির যোগ্যতার তুমি ওভার-কোয়ালিফায়েড। যদি চাও তো আমার কোম্পানিতে তোমাকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর করে দিতে পারি। আমি একই সঙ্গে চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ করে আর পারছি না।

pathagar.net

গার্গী চোখ কপালে তুলে বলেছিল, ও বাবা, একেবারে খোদ এম.ডি? না বাবা, ও চাকরিতে আমার দরকার নেই।

সায়ন আর গার্গীর এহেন কথোপকথনের ফাঁকে ফুলে ফুলে হাসত ঐন্দ্রিলা, উফ, তোমরা পারও বটে।

কঙ্কা রায়কে দেখেনি গার্গী, কিন্তু ফোনে তার সংযত, গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল, বেশ পার্সোন্যালিটি আছে মেয়েটার। আজই সংবাদপত্রে কঙ্কা রায় সম্পর্কে কিছু টিপ্‌স্ দিয়েছে বক্স করে। কঙ্কা রায় শুধু সুন্দরীই নয়, তার সঙ্গে সায়ন চৌধুরীর বেশ হবনবিং ছিল, সে কথা জানিয়ে দিয়েছে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে। কোনও একটা বড়সড় সেমিনারে সায়ন চৌধুরী এসেছিলেন বক্তৃতা করতে, সেদিন তাঁর সঙ্গে নাকি আঠার মতো সেঁটে ছিলেন কঙ্কা রায়। বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো এই যুবতীর সঙ্গে খুব হাসিঠাট্টাও করতে দেখা গেছে সায়নকে।

গার্গী সে খবর পড়তে বিড়বিড় করেছে নিজের মনে, কী অদ্ভুত এই খবরের কাগজঅলারা। একজন পুরুষ আর একজন নারী নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললেই তারা মনে করবে তাদের মধ্যে অ্যাফেয়ার আছে। আশ্চর্য এই যে, দুজন পুরুষ কিংবা দুই নারীর মধ্যে অবাধ হাসিঠাট্টা চলতে পারে, কিন্তু একজন পুরুষ আর একজন নারীর মধ্যে নৈব নৈব চ। তার ওপর এম.ডি. যদি সুন্দরী পি.এ.-র সঙ্গে একটু খোশগল্প করেন, তার হলে তো কথাই নেই। আরে বাবা, এম.ডি. তার ঠাসবুনোট কাজকর্মের ফাঁকে পি.এ.-র সঙ্গে যদি এক-আধটু জোক করে রিল্যাক্সড্ মুডে থাকে, তা নিয়েও তোরা স্টোরি বানাবি।

'সরি হি ইজ নট অ্যাভেইলেব্‌ল্ টু-ডে' শুনে ভুরুতে কোঁচ পড়ল গার্গীর। বাড়ি ফিরেছে বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল, অথচ সায়ন আজ পর্যন্ত তার অফিসে আসছে না, কাজকর্ম করছে না, ফিরে আসছে না স্বাভাবিক জীবনযাত্রায়, এটা ভেবে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে, কিছু দুর্ভাবনায়ও। সায়ন কি বাড়িতেই আছে, নাকি অন্য কোথাও। বাড়িতে থাকলে তার শুনশান ফ্ল্যাটে একা কি করছে, কীভাবে কাটাচ্ছে এই প্রেতপুরীতে, কেমন আছে—এইসব সাতপাঁচ ভেবে ভীষণ উদ্বিগ্ন বোধ করতে থাকে। সেদিন বাড়ির ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে না দিয়ে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতো তাকে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল বাড়ির গেটে এ-কথা ভেবে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছিল সে। সমস্ত পৃথিবী যখন সায়নকেই সম্ভাব্য খুনি হিসেবে চিহ্নিত করে উপভোগ করছে এক অদ্ভুত আরাম, তখন কী জানি কেন গার্গী সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সে অনেকবার 'যাই, গিয়ে দেখে আসি কী করছে', 'না থাক', 'উঁহু, যাই-ই না', ইত্যাদি নানান ভাবনায় আন্দোলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল তার জুবিলি পার্কের আস্তানা থেকে। দু-দুটো বাস পাড়ি দিয়ে একসময় পায়ে-পায়ে গিয়ে হাজির হল আপাতত কলকাতার তাবৎ মানুষের কৌতূহলের লক্ষ্যবস্তু 'ব্লু-ওয়ান্ডার'-এর গেটে। দুপাশে যথারীতি পুলিশ দণ্ডায়মান। তাকে দেখে তারা পরস্পর চোখাচোখি করল, কিছু ইঙ্গিতও। কিন্তু গার্গী ভ্রূক্ষেপ করল না। তার চেহারা নজরে পড়তে ছুটে এসে গেটের দরজা হাট করে খুলে দিল এ-বাড়ির মোহন নামের ভৃত্য-কাম-দারোয়ানটি। এর আগে এ বাড়িতে যতবার এসেছে গার্গী এভাবেই দরজা খুলে দিয়েছে মোহন। প্রতিবারের মতোই এবারও লোকটি কোনও শব্দ করল না মুখে। চেনা মানুষ হলে অবশ্য তার শব্দ না করারই নিয়ম।

অবলীলায় গেট পেরিয়ে গার্গী হনহন করে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। সিঁড়িটা প্রথম কয়েক ধাপ উঠে যাওয়ার পর দুদিকে ভাগ হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় ধাপের সিঁড়ি বেয়ে বাঁ দিকে উঠলে সায়নদের ফ্ল্যাট, ডান দিকে উঠলে চন্দ্রাদেবী-হিমনদের। একটু ছাড়া দুই ফ্ল্যাটের মধ্যে

আর কোনও যোগসূত্র নেই। সায়নের বাবা নাকি এমনভাবে ডিজাইন করিয়েছিলেন তাঁর বাড়িটা, যাতে দুই ছেলে দুই স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হতে পারে। এও নাকি বলেছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তিনি থাকবেন সায়নদের সংসারে, চন্দ্রাদেবী থাকবেন হিমনের কাছে।

কেন এমনটা বলেছিলেন, তা নিয়ে কু-লোকে অবশ্য কু-কথা বলে।

যাই হোক, সংসারের শেষটুকু আর নিশীথ চৌধুরীর কপালে দেখা হয়ে ওঠেনি, যেহেতু ছেলেদের বিয়ের অনেক আগেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল অন্য-লোকের ডাকে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে বেঁকে দোতলায় পৌঁছে কলিংবেলে আঙুল ছোঁয়াল গার্গী। দু-তিনবার ভেতরে টুং-নানা শব্দ হওয়ার পরেও যখন দরজা খুলতে কেউ এগিয়ে এল না, গার্গী অবাক হল, গাঢ় হল তার দু ভুরুর কোঁচ, কী করব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সুইং-ডোর ঠেলতেই চট করে খুলে গেল দরজাটা।

নিতান্ত বিস্মিত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তেই তার শরীর জুড়ে প্রবল এক অস্বস্তি। কদিন আগেও সে ঘরে ঢোকামাত্র হইহই করে ছুটে আসতে ঐন্দ্রিলা, আরে মিতুন, আয় আয়—তোকে কতদিন দেখিনি। এবার কেউ আর সেরকম বলল না, বরং লিভিং রুমে ঢুকে দেখল এক বিচিত্র দৃশ্য।

সায়ন বসে আছে সোফায়, গা এলিয়ে, প্রায় চিত্রার্পিতের মতো। চুল উশকোখুশকো, কতদিন স্নানঘরে যায়নি কে জানে, মুখে কালো ছোপ ধরা দাড়ি, কাস্টডি থেকে বেরোবার পরও কামানো হয়নি, পরনে আধ-নোংরা পাঞ্জাবি-পাতলুন। তার সামনে সেন্টারটেবিলে দু-তিনটে সিগারেটের খালি প্যাকেট, মেঝেতেও তিন-চারটে। অ্যাশট্রেতে উপচে পড়ছে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, ছাই—। এক পাশে খালি একটা রামের বোতল, খালি গেলাসও। পার্টিতে কিংবা আউটিং-এ না গেলে সায়ন ড্রিঙ্ক করে না এমনই জানত গার্গী অথচ এখন তার চেহারা, সেন্টার টেবিলের দশা, মদের বোতল, ঘরের পরিবেশ, সব দেখে আঁতকে উঠল।

সায়নের চোখে তখন এক অস্পষ্ট, ধূসর চাউনি। গার্গীর দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু সে দৃষ্টি যেন বহু যুগের ওপার থেকে। কিছুক্ষণ তার দিকে অদ্ভুত, আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে রইল গার্গী। তার কাছে এ এক বিরল অভিজ্ঞতা। গত কয়েক বছরে যে সায়নকে সে তিলতিল করে চিনেছে, সে সায়ন আর এই সায়ন যেন এক নয়। এই সায়নকে সে চেনে না, আর সায়নও যেন চিনতে পারছে না তাকে।

অনেক, অনেকক্ষণ এমন অচেনার মতো তাকিয়ে থাকতে থাকতে গার্গী হঠাৎ ডেকে উঠল, সায়নদা—

ডাকতেই মনে হল, সায়নের চোখের কোণ দুটো চিকচিক করছে। সে দৃশ্যে গার্গীরও দু চোখ ভরে জল আসতে চাইল। তক্ষুণি চোখ ফিরিয়ে নিল সে, প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল যাতে তার চোখেও দুর্বলতা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। তবু এই কদিনে তার জমে থাকা অশ্রুর ঢল আছাড়িপিছাড়ি করছে ভেতরে। কান্না সামলে নিয়ে কোনও ক্রমে বলতে পারল, ছি সায়নদা, এভাবে কেউ নোংরা হয়ে থাকে।

পরমুহূর্তে সে আলমারি খুলে বার করল সায়নের কাটা ইস্ত্রি করা পাজামা-পাঞ্জাবি, দ্রুত তার দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, নিন, শেভ হয়ে এসে স্নান করে জামাকাপড় বদলে নিন। কুইক। তারপর সেন্টারটেবিলের ওপর পড়ে থাকা যাবতীয় আবর্জনা একটা একটা করে তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখল ঘরের কোণে। অ্যাশট্রে খালি করে আবার সেটা রেখে দিল যথাস্থানে। মেঝের

pathagar.net

ধুলো পরিষ্কার করে ফেলল একনিমেষে। পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, ডাইনিং টেবিলে অর্ধেক খাওয়া ভাত-তরকারির রাশ। সায়নকে খাবার পাঠাচ্ছে কেউ, হয়তো তার মা। কিংবা হয়তো মোহন এনে দিচ্ছে বাইরের হোটেল থেকে। কিন্তু সে ভাত তার মুখে রুচছে না। তার মানে, এ কদিন প্রায় অভুক্তই আছে সায়নদা।

ডাইনিং টেবিলের এঁটো পরিষ্কার করে এ ঘরটাও মুহূর্তে পরিষ্কার করে তুলল গার্গী। তারপর বেডরুম। কয়েক মিনিটের মধ্যে এতদিনকার অবহেলায় পড়ে থাকা সংসারটা আবার গুছিয়ে ফেলল ম্যাজিকের মতো। কেন করছে তা সে জানে না। যেন ঐন্দ্রিলার ফেলে যাওয়া সংসারটা গুছিয়ে রাখার দায় তারই। না হলে ঐন্দ্রিলা যেন বলবে, কি রে মিতুন, তুই থাকতেও তোর সায়নদা ওরকমভাবে নোংরার মধ্যে বাস করবে?

সায়ন তখনও চুপচাপ বসে আছে নিথর, ভাবলেশহীন হয়ে। হয়তো বিস্মিত হয়ে গার্গীর এই অস্বাভাবিক কাণ্ডকারখানা দেখছে। গার্গী তো এ বাড়ির অতিথি হয়েই ছিল এতটা কাল। সে আসত, জাঁকিয়ে বসে হইহই করত, কফি কিংবা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ঝড় তুলত কোনও আনকোরা আলোচনায়, তারপর আবার টা টা করে ফিরে যেত তার নিজের আস্তানায়। আর আজ হঠাৎ—

হঠাৎই গার্গী চলে গেল ঐন্দ্রিলার ফেলে যাওয়া কিচেনে। খুঁজে বার করল কফির পাত্র। তারপর গ্যাস জ্বালিয়ে কয়েক মুহূর্তে বানিয়ে ফেলল দু কাপ গরম কফি। প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এসে দুম করে রাখল সেন্টারটেবিলে, নিন তো, কফি খান। তারপর দ্রুত তৈরি হয়ে নিন। একটু বেরোব।

—কোথায়, শব্দটা সায়নের গলা থেকে না ফুটে বেরোলেও তার সম্বিত ফিরে পাওয়া চাউনি থেকে ছড়িয়ে পড়ল গার্গীর চোখেমুখে। সে কথার উত্তর না দিয়ে গার্গী আবারও বলল, নিন, খেয়ে নিন। বলে তার হাতে ধরিয়ে দিল কফির কাপ। তারপর বাকি কাপ-প্লেটটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে বেশ আয়েশ করে চুমুক দিয়ে বলল উঠল, বাহ্, ফার্স্ট ক্লাস।

মনে মনে হেসেও ফেলল সঙ্গে সঙ্গে, সে নিজের হাতে তৈরি কফি কিনা নিজেই তারিফ করছে মহানন্দে। কিন্তু এতক্ষণে দেখল সায়নও কফির কাপে ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছে। অথচ আশ্চর্য, তার দু'চোখ ভরে জল। গার্গীরও চোখে আবার উপচিয়ে আসছে, কিন্তু তা দমন করে বলল, আপনার গাড়িতে তেল আছে? একটু বেরোব—

সায়ন বুঝতে পারছে না, গার্গী কী করতে চায়, কোথায় বা যেতে চায় হঠাৎ। গরম কফিতে তার শরীরে জড়তা ভেঙে উষ্ণ হয়ে উঠছে দ্রুত, দু চোখের অশ্রুর ভিতরেও উথলে উঠল তার বিস্ময়, কোথায়?

—আগে স্নান সেরে রেডি হয়ে নিন তো, তারপর জানতে পারবেন।

প্রায় হুকুম দিয়েই সায়নকে শেভ করিয়ে, স্নান করিয়ে, পরিষ্কার জামাকাপড়ে ঝকমকে করে তুলল গার্গী। সায়নের শরীরে জমে থাকা কতদিনের ক্লেদ, ক্লান্তি,জড়তা ঝরিয়ে ফেলে তাকে চাঙ্গা করে তোলা যে কী কঠিন কাজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল, অথচ সে যে সায়নকে চিনত, সে একেবারেই অন্যরকম ছিল। বরবার দেখেছে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস-এর চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইন ফ্যাক্ট অল-ইন-অল সায়ন চৌধুরী কলকাতার অন্যতম স্মার্ট, ঝকঝকে, উদ্যমী, কর্মতৎপর, বুদ্ধিদীপ্ত যুবক। কয়েক বছরের মধ্যে এ শহরের এক সফল ব্যক্তিত্বও বটে। আর ঐন্দ্রিলার সঙ্গে বিয়ের পর এ-কথাও প্রমাণিত হয়েছে, গার্হস্থ্য জীবনেও সে অন্য যে কোনও পুরুষের চেয়েও যথেষ্ট ঈর্ষণীয়।

আজও সাদা বেসের উপর হালকা নীল স্ট্রাইপ দেওয়া শার্টটি তার ডিপ ব্লু রঙের প্যান্টের ভেতর গুঁজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সেই সফল পুরুষের কিছুটা উদ্ভাসিত হল। কিন্তু তার চোখমুখে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। দুটি চোখ বরং সন্ত্রস্ত, উদভ্রান্ত।

গার্গী তাকে সঙ্গে নিয়ে নিচে গ্যারেজের কাছে গিয়ে গাড়ির চাবিটা হাতে নিয়ে বলল, এ যাত্রা না হয় আমার ভূমিকাটা একটু বদলে নিই। রোজ আমিই যাত্রীর সিটে বসি, আজ বসব চালকের সিটে। আপনাকে আজ সওয়ারি করে নিই।

গার্গীর একনাগাড় কাণ্ডেভান্ডে রীতিমতো বেবাক, বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল সায়ন। কয়েকদিন ধরেই তার মস্তিষ্ক ঠিকঠাক সচল, রীতিসম্মত নেই। আজও সে তার বোধ, চেতনা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হল। চুপচাপ বাধ্য ছেলের মতো গিয়ে বসল সামনের সিটে, চালকের পাশে। মেয়েরা এভাবেই বোধহয় প্রায়শ রেইন করে থাকে পুরুষদের ওপর। সে বসতেই তৎক্ষণাৎ গার্গী প্রায় বিদ্যুৎগতিতে চালিয়ে দিল সায়নের নতুন কেনা মারুতি ভ্যান। গাঢ় চকোলেট রঙের সেই বাহনটি। ঐন্দ্রিলা হেসে বলেছিল, এ আমার এক সতীন। সারাক্ষণ তুকতুক করে রেখেছে ওটাকে। যেন গাড়িটার গায়ে টোকা লাগলেও ফোস্কা পড়বে।

গার্গী প্রথমেই সায়নকে নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রিটের একটা দামি রেস্তোরাঁয়। ঝকঝকে নীল ঢেউ খেলানো সানমাইকার টেবিলে বসে বেয়ারাকে অর্ডার দিল বিরিয়ানি, চিকেন-চাঁপ। সঙ্গে রায়তা, আলু-মটর। আর ফ্রুট জুস। বলতে না বলতে চমৎকার খাবারের সুগন্ধে ভরে উঠল তাদের টেবিল। সায়ন খেতেই পারছিল না প্রায়, বার বার বলছিল, পারব না, গার্গী। একটুও খাবার ইচ্ছে নেই আমার। আমাকে ছেড়ে দাও, প্লিজ। গার্গী নিজেও কি পারছে খেতে! এতক্ষণ ঐন্দ্রিলা থাকলে সমস্ত পরিবেশটাই হয়ে উঠত অন্যরকম। সায়নকে কত স্মার্ট আর খুশি-খুশি লাগত। ঐন্দ্রিলা খুব বেশি হইচই করতে পারত তা নয়, কিন্তু তার ঠোঁটের কোণে লেগে থাকত এক অদ্ভুত মাদকতা মাখানো হাসির টুকরো। অথচ গার্গী বরাবরের চঞ্চল, দুষ্টু, একাই হইহই করে জমিয়ে রাখত গোটা টেবিল। সেই গার্গীই আজ কত শান্ত। স্তব্ধতার মধ্যেও প্রায় মৃদু ধমকের মতো বলছে, ঠিক আছে, আর একটু খেয়ে নিন। আর একটুকরো চিকেন।

প্রায় যন্ত্রচালিতের মতো সায়ন খেয়ে উঠল রেস্তোরাঁ থেকে। গার্গী সবসময় খেয়াল রাখছে, তাদের দিকে কেউ কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে কি না। সংবাদপত্রের কল্যাণে সায়ন এখন প্রায় ভি আই পি-র মর্যাদা পাচ্ছে, অবশ্যই বেশ কদর্থে। তবু পারিপার্শ্বিক কোনও চাউনিকেই এখন আর ভ্রুক্ষেপ করছে না সে। আসার পথে একবার মনে হয়েছিল, একটা সাদা অ্যামবাসাডার যেন তাদের ফলো করছে। কিন্তু এত দ্রুত গার্গী স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এ গলি ও গলি পার হয়ে পার্ক স্ট্রিটে ঢুকে পড়েছে যে সাদা অ্যামবাসাডার তাদের পাত্তাই করতে পারেনি। কি জানি, হয়তো কোনও প্লেন ড্রেসের পুলিশ—

পার্ক স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে এবার গার্গী চলল রেসকোর্স পার হয়ে দক্ষিণের দিকে। রবীন্দ্র সদন ক্রশ করে রেসকোর্স ডাইনে রেখে সে বাঁই করে ঢুকে পড়ল ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভিনিউ হয়ে একবালপুর, সেখান থেকে সোজা বেহালার পথে। ঠাকুরপুকুর জোকা পার হতেই সে গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা লাফিয়ে তুলে দিল প্রায় আশি-নব্বই-এ। ততক্ষণে সায়নের প্রিয় চকোলেট রঙের মারুতি ভ্যান প্রায় পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতো উড়ে চলেছে ডায়মন্ডহারবারের রাস্তায়।

পৃথ্বীরাজ যেন সংযুক্তাকে নিয়ে পালাচ্ছে না, বরং সংযুক্তাই পৃথ্বীরাজকে—

সায়ন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল গার্গীকে। এ তারা কোথায় চলেছে, কেনই বা চলেছে।

গার্গী কিন্তু তার দিকে তাকাচ্ছেই না। সে স্তব্ধ, নির্বাক, শুধু মাঝেমধ্যে স্পিডোমিটারের দিকে তাকিয়ে তখনও আরও স্পিড বাড়িয়ে দিচ্ছিল তার অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে। আসলে কোথাও যাওয়াটা তার লক্ষ্য নয়। যে সায়ন তার সমস্ত প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে অক্ষম, জড়পদার্থ হতে চলেছে, তার রক্তে পুনর্বার ফিরিয়ে আনতে চাইছে প্রাণস্পন্দন। তাই এই গতি। আরও গতি, আরও, আরও। দ্রুত পাড়ি দিতে দিতে হঠাৎ এক-একটা টার্ন নিচ্ছে স্পিড একটুও না কমিয়ে। কখনও ভারী ট্রাক, কিংবা লং রুটের বাস গাঁক-গাঁক করে আসছে, গতি একটুও না বদলে সামান্য কব্জির মোচড়ে নিখুঁত কায়দায় তাদের পাশ কাটিয়ে চলেছে হু হু করে। সায়ন এক-আধবার বলার চেষ্টা করল, আস্তে গার্গী, আস্তে! এ রাস্তার গাড়িগুলো প্রায় দৈত্যের মতো আসে, একটু ছোঁয়া লাগলেই—

কিন্তু গার্গী শুনছেই না কিছু। তার রক্তে আজ যেন গতির নেশা।

না, ডায়মণ্ডহারবার নয়, গার্গী হঠাৎ দস্তিপুর থেকে ডাইনে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে তার গতিপথ বদলে নিল ফলতার পথে। হু হু করে এসে পৌঁছাল গঙ্গার ধারে। কিছুক্ষণ ফাঁকা চত্বরে কাটিয়ে, গঙ্গার বিশুদ্ধ হাওয়ায় স্নান করে, চাপুরচুপুর পরিতৃপ্ত হয়ে নিজেই তার খেয়াল-খুশিমতো বকবক করে ঘন্টা দু-তিন পর আবার ফিরে চলল কলকাতার দিকে। ফেরার পথে কিছু কেক, বিস্কুট ছাড়াও রাতের খাবার কিনে নিল। তারপর ব্লু-ওয়ান্ডার-এ পৌঁছে গাড়ি গ্যারেজ করে সমস্ত খাবার সায়নের জিম্মায় রেখে একসময় ফিরে গেল নিজের ডেরায়। যেন একটা যুদ্ধ জয় করে ফিরল।

তার পরদিন একই সময়ে গার্গী আবার এল সায়নের ঘরে। ঠিক একইভাবে সায়নকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেল অন্য রাস্তায়। বারাসত ডাকবাংলোর মোড় পার হয়ে কল্যাণীর পথে। এতালবেতোল ঘুরে বেড়াল গাঁয়ে গঞ্জে, কল্যাণী টাউনশিপেও কিছুক্ষণ।

তার পরদিন উলুবেড়িয়া পেরিয়ে গাদিয়াড়ায়। দুজনে অনেকক্ষণ ধরে রূপনারায়ণের তীর ধরে হাঁটল। দু'চোখ ভরে দেখল, রূপনারায়ণ আর হুগলি নদীর মেশামেশি—এক বিশাল জলরাশি অপরূপ মন-জুড়ানো দৃশ্য। সন্ধে হলে ফের তীব্র গতিতে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এল কলকাতায়। পরপর কয়েকদিন এমন নতুন সব দৃশ্যাবলির ভেতর সায়নকে ঘুরিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাইল তার ভেতরের সব শোক। তাকে নিয়ে গেল এমন সব জায়গায়, যেখানে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আসেনি সায়ন। তা হলেই ঐন্দ্রিলার কথা ফের মনে পড়ে যেত তার। তাইই একদিন কাকদ্বীপে, একদিন হাসনাবাদ!

গার্গীকেও যেন কয়েকদিনে এক অদ্ভুত গতির নেশায় পেয়ে বসেছে। সেই তীব্র গতি সে সঞ্চারিত করে দিতে চাইল সায়নের শরীরেও। আর আশ্চর্য, গার্গীর থিয়োরি হুবহু কাজে লেগে গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্তব্ধ, শোকবিহ্বল সায়ন কয়েকদিনের মধ্যে আবার হয়ে উঠল গতিময়, প্রাণচঞ্চল, কিন্তু আগের চেয়ে বেশ একটু গম্ভীর, সংযত, ঢের বয়স্কও।

তারপর একদিন সায়ন নিজেই বলল, ভাবছি, কাল একটু অফিসে যাব।

গার্গী উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, তাই?

—একটা নতুন প্রোডাক্ট ছাড়া হবে বলে সমস্ত পরিকল্পনা করা ছিল। তার কী হল কে জানে। আমি কদিন অফিসে না থাকা মানে নিশ্চই সব জট পাকিয়ে গেছে। এখন আবার নতুন করে সাজাতে হবে সব কিছু।

গার্গী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে শুধু এইটুকুই চেয়েছিল। ঐন্দ্রিলা নিশ্চয় কষ্ট পাচ্ছিল সায়নের অমন বিবর্ণ, হতশ্রী দশা দেখে। এখন আবার খুশি হয়ে উঠবে ঠিক।

বেশ খুশি মনেই সেদিন ঘরে ফিরেছিল গার্গী। হয়তো অনেকদিন পরে একটু ঘুমিয়েও ছিল ভাল করে। কিন্তু পরদিন খবরের কাগজ হাতে পেতে ভীষণ চমকে উঠল—

প্রথম পৃষ্ঠার নিচে বেশ বড় করে একটা সংবাদ ছাপা হয়েছে, তার মর্মার্থ :

নাটকীয়ভাবে ঐন্দ্রিলা-হত্যা রহস্যে এক নতুন মোড়।

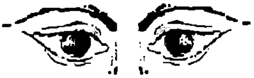

সেদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলেন সুশোভন মুখার্জিও। সুশোভন একটি কোম্পানির জুনিয়র এক্সিকিউটিভ। তাঁকে অফিসে বেরোতে হয় সকাল আটটার মধ্যেই। কোম্পানির গাড়ি তাঁদের ফ্ল্যাটের নিচে পাক্কা আটটা বাজতে একমিনিট আগে এসে হর্ন দেবে, আটটা এক পর্যন্ত দাঁড়াবে গাড়িটা, তার মধ্যে সুশোভন নিচে নেমে গাড়িতে না উঠতে পারলে ড্রাইভার হুস করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবে পরবর্তী অফিসারের বাড়িতে। গাড়িটা বড়সড় একটা স্টেশন ওয়াগনের মতো, জনা বারো অফিসারকে এভাবে পিকআপ করে ঠিক পৌনে নটার মধ্যে কোম্পানির অফিস-গেটের মধ্যে ঢুকে যায় রোজ। ফলে সকালের প্রতিটি মুহূর্তই সুশোভনের কাছে জরুরি। কোনও কারণে গাড়ি ফেল করলে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তক্ষুণি অ্যাটাচি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে বড়রাস্তায় যেতে হবে। সকালের ওই পিক-আওয়ারে ট্যাক্সি ধরাটা প্রায় লটারি পাওয়ার সমতুল। মিনি-বাসে গেলে অত্যন্ত বিশমিনিট লেটে ঢুকতে হবে অফিসে।

গাড়ি ফেল করার একটা অন্য অর্থও আছে তাঁদের কোম্পানিতে। অন্য অফিসারদের চোখে এটা তাঁর ইনএফিসিয়েন্সি। তা ছাড়াও, হয় বাইশ-চব্বিশ টাকা ট্যাক্সিতে গাঁটগচ্চা, অথবা মিনিবাসে কুড়ি মিনিট লেটে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাচ-ঘেরা ঘরের সামনে দিয়ে তাঁর সিটের দিকে যাওয়া—দুটোই তাঁর কাছে দু'রকম যন্ত্রণা।

হেডলাইন ছাড়া সকালের দিকে খবরের কাগজের আর একটি পংক্তিও প্রায় দেখা হয়ে ওঠে না তাঁর। কিন্তু সেদিন হঠাৎ প্রথম পৃষ্ঠায় একেবারে নিচের একটা খবরের চোখ আটকে গেল দুম করে। ঐন্দ্রিলা-হত্যার ব্যাপারে যে খবরটি প্রতিদিন ধারাবাহিক বেরোচ্ছে, মাঝেমধ্যে কৌতূহলী হয়ে তার দু-চার লাইন পড়ে ফেলেন কখনও। আজও তার রসাল হেডিং, তার সঙ্গে খবরের প্রথমেই গার্গীর নামটা দেখে বেশ একটা শক্ খেলেন সুশোভন।

সায়ন চৌধুরীর জীবনে আরও এক নতুন নারী এমন একটি টাইটেল দিয়ে বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর দশ-বারো দিনও যায়নি, এর মধ্যে সায়ন চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয়, দামি হোটেলে, এমনকি কোনও দিন ফলতা, কোনও দিন কল্যাণী, কোনও দিন কাকদ্বীপে। সঙ্গে ঐন্দ্রিলারই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী গার্গী মুখার্জি, যার সঙ্গে বিয়ের অনেক আগে থেকেই একটা মাখামাখি ছিল সায়নের। ঘটনাটি পুলিশমহলে আলোড়ন তুলেছে। ঐন্দ্রিলা-হত্যার ব্যাপারে যে অনুসন্ধান চলছে, তাতে এই ঘটনাটি এক নতুন আলোকপাত করবে বলে বিশেষজ্ঞমহল মনে করছেন।

পুরো লেখাটা পড়ে শেষ করতে পারলেন না সুশোভন। তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল থরথর করে। প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ হিসেবে তৃতীয় পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে খবরটা, আরও প্রায়

দু'কলম জুড়ে। দু'এক জায়গায় চোখ বোলাতেই গলা শুকিয়ে এল তাঁর। ফ্যাঁসফেসে গলায় ডাকলেন অনু, অনু, অনমিত্রা—

অনমিত্রার তখন রান্নাঘর থেকে একসেকেন্ডও বেরিয়ে আসার সময় নেই। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রেখে গ্যাসের ওপর পর পর আইটেম চাপিয়ে যেতে হয় তাকে। ঠিক সাতটা চল্লিশের মধ্যে ডাইনিং টেবিলে সাজিয়ে দিতে হবে সুশোভনের ভাত। নইলে অনর্থ। তাঁদের কোম্পানির অন্য সব অফিসাররা অবশ্য কেউই বাড়িতে লাঞ্চ খান না। সবাইই ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোন। লাঞ্চ খেয়ে নেন অফিসে। কিন্তু অফিসের রান্না সুশোভনের পছন্দ নয় বলে যত সকালেই হোক বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে যাওয়াটাই রপ্ত করে নিয়েছেন। অফিসে গিয়ে সবাই যখন লাঞ্চ-আওয়ারে চলে যান অফিসারদের বিশেষ ক্যান্টিনে, সুশোভন তখন একটা হেভি টিফিন সেরে নেন নিজের চেম্বারে বসেই।

ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে সাতটা ছুঁই-ছুঁই, সুশোভনের ডাকেও তাই অনমিত্রার সাড়া দেওয়ার অবসর থাকে না। বার দুই-তিন অসহিষ্ণু ডাক শুনে বাধ্য হয়ে রান্নাঘর থেকেই চ্যাঁচিয়ে বলল, মাছের ঝোল সবে চাপিয়েছি—

সুশোভনের তখন সে-কথা শোনার ধৈর্য নেই, বেশ তিরিক্ষি মেজাজেই বলে উঠলেন, বলছি একবার শুনে যাও—

মেজাজ শুনে, কিছু একটা গোলমাল আঁচ করে অনমিত্রা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এল দ্রুতপায়ে, সুশোভনের মুখচোখ দেখে ভয় পেয়ে বলল, কী হয়েছে, কোনও খারাপ খবর নাকি!

খবরের কাগজটা অনমিত্রার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে সুশোভন ঝাঁকিয়ে উঠলেন, দ্যাখো পড়ে, মিতুনের ব্যাপার-স্যাপার।

খবরের কাগজটা মাটিতে মুখ ঘসটে পড়ে রইল। সেদিকে একবার তাকিয়ে অনমিত্রা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল সুশোভনের মুখের দিকে, কী হয়েছে, বলবে তো?

সুশোভনের মুখচোখ তখন রাগে লাল টকটকে হয়ে গিয়েছে, কাঁপছে আঙুলগুলোও, ফের ঝোঁকে উঠে দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, সমাজে আর মুখ দেখানোর জো রইল না। শেষ পর্যন্ত আমার বোন কিনা একটা খুনি আসামির সঙ্গে কেচ্ছা করে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে ঘুরছে এখেনে-সেখেনে! আর তাকে নিয়ে মজা লুটছে লম্পটটা!

কিছুক্ষণ চ্যাঁচাতেই মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করতে লাগল সুশোভনের। এই ঘটনার পর সুশোভন আর কি অফিসের গেট পেরোতে পারবেন! চারদিকে আলোচনার ঝড় বয়ে যাবে এমন ভাবতে ভাবতে অসহায় চোখমুখ করে গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়লেন সোফায়। অনমিত্রা ততক্ষণে বুঝে ফেলেছে, কী হয়েছে। গলা চড়িয়ে বলল, এবার তুমিই বোঝো। কতবার বলেছি, বাড়ির মেয়েকে অমন লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো ঘুরতে দেওয়া ভাল নয়। মেয়ে একেবারে স্বাধীন। কী না কী একটা অফিসে চাকরি করে, আর কী সব লেখেজোখে, তার জন্যে ভোর থেকে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত তার টিকিটিও দেখা যায় না। ছি ছি, কী লজ্জা! আত্মীয়স্বজনদের কাছে মুখ দেখাবে কী করে। এখন ঘর থেকে বেরোলেই তো উষা মাসিমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। নিশ্চয় ওরাও এতক্ষণ পড়েছে সব।

সুশোভন চ্যাঁচিয়ে উঠে বললেন, দাও, বাড়ি থেকে দূর করে দাও। কোথায় গেলেন তিনি।

—কোথায় আবার যাবেন। ফিরছেন তো রাত সাড়ে দশটায়। এখন বেলা দুপুর পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছেন।

pathagar.net

গার্গী অবশ্য তখন আর ঘুমিয়ে নেই। অনেকক্ষণ আগেই জেগেছে। জেগে জেগে ভোরঘুমের সুখ উপভোগ করছিল। হঠাৎ ড্রইংরুম থেকে ভেসে আসতে শুনল দাদা-বউদির চিল-চিৎকার। শুনে একটু অবাকই হল, কারণ সকালের এই দেড়-দু'ঘণ্টা সময় তাদের কিচেন ও ডাইনিং-এ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি চলে। এক রবিবার যা ব্যতিক্রম। কিন্তু আজ তো রবিবার নয়। গার্গীদের সোসিও ইকোনমিক রিসার্চ আকাদেমিতে বুধ, শনি আর রবিবার ক্লাস থাকে, গতকাল তার ক্লাস ছিল না, আজও নেই। অতএব—

খানিকক্ষণ কান খাড়া করে সে বুঝতে পারল, কলহের বিষয়বস্তু মিতুন ওরফে গার্গীই। মাঝমধ্যে এরকম দু-চারবার হয়ে থাকে মাসের মধ্যে। দাদা-বউদির সংসারে আইবুড়ো ননদ থাকলে, সে ধর্মের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ালে এমন বিবাদ-বিসম্বাদ যে হবেই তাতে তার নিজেরও কোন সন্দেহ নেই। প্রতিমাসে সে ষোলোশো টাকা পায় তাদের আকাদেমি থেকে। তার থেকে ছ'শো টাকা বউদির হাতে তুলে দেয়, সংসার-খাওয়া চলে না একথা অনেকবার শুনেছে, বোধহয় আজও সেরকম কোনও তুফান উঠেছে চায়ের কাপে।

কিন্তু কান পেতে শুনে মনে হল, ব্যাপারটা তার চেয়েও সিরিয়াস।

দ্রুত মশারি-বিছানা গুছিয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখল, যা ভাবছিল, তার চেয়েও ডাব্‌ল-ডাব্‌ল জরুরি ব্যাপার ঘটে চলেছে ড্রইংরুমে। দাদা সুশোভন আড় হয়ে পড়ে আছে সোফায়। ও পাশে বউদি অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে রাগ-রাগ মুখ করে। তাদের দু'জনের মাঝখানে হাইফেন হয়ে সকালের কাগজটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মাটিতে। তৎক্ষণাৎ কিছু একটা অনুমান করে সে দ্রুত কুড়িয়ে নিল কাগজটা। তেমনই দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে শুনল, নিচে দাদার গাড়ি হর্ন দিয়ে সুশোভনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না পেয়ে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেল অন্য অফিসারের বাড়ি। তার মানে ব্যাপারটা রীতিমতো সিরিয়াস। ট্রিপ্‌ল-ট্রিপ্‌ল, কিংবা রি-ডাব্‌ল রি-ডাব্‌ল।

তখন হঠাৎ কাগজের নিচের দিকে চোখ পড়তে সে সমস্তই বুঝে ফেলল মুহূর্তে। খবরটায় চোখ বোলাতে বোলাতে তার চোখের পাতা প্রায় পুড়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পড়ার পর সে আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগল, গত কয়েকদিন এক ঘোরের মধ্যে সে ঘুরে বেড়িয়েছে সায়নকে নিয়ে। একবারের জন্য অবশ্য তার মনে হয়েছিল কলকাতার পথে কেউ যেন অনুসরণ করছে তাদের। গোয়েন্দা, না সাংবাদিক, না পুলিশ— তা ঠিক অনুমান করতে পারেনি। তখন মনে করেছিল তাদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছে। কিন্তু শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার বাইরে তারা যেখানে-যেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে, সব জায়গাতেই ফলো করে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তো লিখেইছে, উপরন্তু তারা যা করেনি তাও রসালো করে লিখেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। পড়তে পড়তে রাগে-ঘেন্নায়-অপমানে কুঁচকে এল তার চোখমুখ। তার সঙ্গে ভীষণ একটা মন-খারাপ করার মতো ব্যাপারও। সারা পৃথিবী এখন সায়ন চৌধুরীর দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলছে, সে একটা খুনি, খুনি, খুনি। তার ফ্ল্যাটে যাওয়া, তার সঙ্গে মেলামেশা করা, কথা বলা, বেড়ানো—সবকিছুই এখন সমাজের চোখে জঘন্য অপরাধ। প্রতিদিন তার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরীদের জড়িয়ে নানান কেচ্ছাকাহিনী ফাঁদার ষড়যন্ত্র চলেছে। শুধু সায়নকে নিয়েই নয়, সায়নের পরিবারের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছে তাদের সবাইকে নিয়েই এখন ব্যস্ত মিডিয়ার লোকজন।

জঘন্য ইঙ্গিত মেশানো খবরটা পড়ে গার্গী এতই শক্‌ড, এতখানি স্তম্ভিত হয়ে গেল যে সুশোভনের প্রতিটি নির্মম বাক্যবাণই সহ্য করল মুখ বুজে। অনমিত্রার বাঁকা কথাগুলো তার

কানে সিসে-পোড়ানো হল্‌কা ছড়ালেও মুখে রা-টি কাড়ল না। চুপচাপ নিজের ঘরে এসে গা এলিয়ে দিল তার বিছানায়। অসহ্য অপমানে চোখ বুজে পড়ে রইল একা-একা। নিঃস্পন্দ, শব্দহীন। দু-দিনদিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে আর বেরোলই না।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু টেলিফোন এসেছে তার খোঁজে, তার দু-একটি সংবাদপত্রের তরফ থেকে। একটা কল্‌ ছিল থানা থেকেও। গার্গী কোনও টেলিফোনই অ্যাটেন্ড করেনি। সাক্ষাৎ করতে এসেছিল কেউ কেউ। সবাইকে বলে দিয়েছে সে ভীষণভাবে অসুস্থ। দেখা করতেই পারবে না।

প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে সে কয়েকদিন অন্তরিন হয়ে রইল তার ঘরের মধ্যে।

চতুর্থদিনে শুনল, তার আর একটি টেলিফোন এসেছে, সেটি সায়নের। খবরটা দিয়ে অনমিত্রা তার দিকে একপশলা জ্বলন্ত চাউনি ছুড়ে দিয়ে পায়ে ধুপধাপ শব্দ তুলে চলে গেল। তার নিজের ঘরে। এবার আর উদাসীন থাকা গেল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী উঠে গিয়ে রিসিভার কানে দিল, হ্যালো, গার্গী বলছি—

—গার্গী, তোমাকে দু-তিনদিন ধরে খুব এক্সপেক্ট করছিলাম। তোমার কি শরীর খারাপ?

—নাহ্, গার্গী নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব কণ্ঠস্বর সংযত করে বলল, ক'দিন বেরোইনি, এমনই—

সায়নের গলায় কোনও জড়তা নেই, যেন কিছুই হয়নি এমন কথাবার্তা, খুব একটা ঝামেলায় পড়ে গিয়েছি গার্গী।

গার্গী তৎক্ষণাৎ ইন্‌ভল্‌ভড হয়ে পড়ল সায়নের সমস্যার মধ্যে, কী ব্যাপার, খুব সিরিয়াস কিছু?

—হ্যাঁ, আমাদের ফ্যাক্টরির ব্যাপার নিয়েই, তুমি একবার আসতে পারবে সন্ধের পর? আমি সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরব।

গার্গী একমুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর বলল ঠিক আছে, যাচ্ছি—

টেলিফোন রাখার পর সে বিমূঢ় হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। বুঝতেই পারছে, বাড়িতে এখন তার বিরুদ্ধে বয়ে যাচ্ছে একটা রোষ, চোরা চাউনি, প্রতিবাদের ঝড়। সে নিজেও কয়েক মুহূর্ত ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে রইল। দ্বিধাগ্রস্তও, কেন না এহেন সংকটের মুহূর্ত তার জীবনে খুব বেশি আসেনি। তারপর হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল, এই অহেতুক কুৎসায় ভয় পেয়ে পালিয়ে থাকাটা নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। তারপর সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে গার্গী প্রস্তুত হয়ে নিল, বউদি অনমিত্রা কঠিন চোখে তার তৎপরতা লক্ষ করেছে জেনেও সে দ্রুতপায়ে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। তাদের গলি থেকে বাসরাস্তা মিনিট তিনেকের পথ। এই পথটুকু রোজই হেঁটে গিয়ে সে বাস ধরে। আজ কিন্তু হেঁটে যাওয়ার সময় তার সারাশরীর জুড়ে একটা অস্বস্তি। মনে হল, সমস্ত পাড়ার লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে সে এখন একটি দ্রষ্টব্যবস্তু। কোনও দিকে না তাকিয়ে সে হেঁটে চলল হনহন করে। সবে কিছুটা এগিয়েছে—তাদের গলিতে যে বিশাল নিমগাছটা দাঁড়িয়ে আছে আজ বহুবছর ধরে, হঠাৎ তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল, কেউ তার পিছু নিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল। সঞ্চারিত হল ক্রোধও। একবার আধ-ফেরা হয়ে উপলব্ধি করল, হুঁ, ঠিক তাইই। তা হলে—

মুহূর্তে মনস্থির করে নিল সে। গলিটা ঠিক যেখানে বড়রাস্তায় গিয়ে পড়েছে, তার আগেই একটা শার্প রাইট-টার্ন। গার্গী ডানদিকে ঘুরেই পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল সহসা।

pathagar.net

তার ঠিক পেছনে ইতি-উতি তাকাতে তাকাতে এসে পৌঁছাল যে সে নিতান্তই একটি রোগা প্যাংলা তরুণ। চুলে একটা বাহারি টাচ আছে বটে, কিন্তু একেবারে গোবেচারা ছেলেমানুষ। বড় জোর বাইশ-তেইশ। ডানদিকে ঘুরতেই ছেলেটি হঠাৎ গার্গীর মুখোমুখি হয়ে কেমন হতভম্ভ হয়ে গেল।

গার্গী তার হতভম্ব অবস্থাটা কেটে যাওয়ার সময় দিল না, মুহূর্তে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির কলারের কাছে জামাটা খামচে ধরল, চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, খোকা? ফলো করছিলে কেন আমাকে?

ছেলেটি রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল এই ঝটিতি আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে।

গার্গী এক ধমক দিয়ে বলল, সাংবাদিক?

ধরা পড়ে গিয়ে ছেলেটি আমতা-আমতা করল, উ-হাঁ—

গার্গী আবার ধমক দিয়ে বলল, নিশ্চয় ওই কাগজটার, যারা রোজ ধারাবাহিক গোয়েন্দা-কাহিনী ছাপছে, তাই না?

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল, হুঁ—

—গত চারদিন আগে আমাকে নিয়ে যে স্টোরিটা বেরিয়েছে, সেটা তোমার লেখা?

একেবারে আপসেট হয়ে গিয়েছে ছেলেটি, তার কলারের কাছে গার্গীর হাতের মুঠি ক্রমশ শক্ত হচ্ছে মেয়েটার চোখমুখ এমন লাল হয়ে উঠেছে রাগে যে হয়ত মেরেই বসবে তাকে। এই শেষ-বিকেলের দিকে গলিতে এই মুহূর্তে কেউ নেই বলে বাঁচোয়া। বলল, না ওটা মৌলিনাথদার লেখা—

গার্গী এবার তার কলার ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলল, আর তুমি তার শাগরেদ, তাই না? লজ্জা করে না আজগুবি স্টোরি বানিয়ে বানিয়ে লিখতে? ফলতায় গিয়ে আমরা নৌকাবিহার করেছি? জলকেলি করেছি! এই তোমাদের কাগজের জার্নালিজম! বুঝলে, আমিও সাংবাদিকতা করি, তবে ফ্রি-ল্যান্স। ক'দিন আগে 'দেশমাতৃকা'র প্রথম পৃষ্ঠায় নেলসন ম্যান্ডেলার উপর একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছে পড়েছিলে? ওটা আমারই লেখা। তোমার মৌলিনাথদাকে বোলো, কাকে যেমন কাকের মাংস খায় না, সাংবাদিকরা তেমনি সাংবাদিকদের মাংস খায় না। আমিও অনেক সাংবাদিকের হাঁড়ির খবর জানি। তোমাদের ওই মৌলিনাথদা সেদিন সন্ধেয় জিরো-জিরো সেভেনে কোন্ মেয়েকে নিয়ে হুইস্কি খেয়েছে, তারপর তাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে কোন হোটেলে গিয়ে উঠেছে, সব আমার জানা আছে। এই ঝামেলাটা কেটে যাওয়ার পর দেশমাতৃকায় সে রিপোর্ট আমি লিখে দেব, বুঝলে—?

বলে এক ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে এমনভাবে ঠেলে দিল গার্গী, যে ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল বোধহয়। গার্গী বুঝতেই পারল না প্রচণ্ড রাগের ফলে তার গায়েই জোর বেড়ে গেল, না কি ছেলেটাই অমন দুব্‌লা-প্যাংলা, কে জানে। ছেলেটাকে ছেড়ে দেওয়ার পর তাকে আবার হুমকি দিল গার্গী, ক্যারাটে জানো!

ছেলেটি তখনও হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে, ভয়ে-ভয়ে ঘাড় নাড়ল, না—

—আমার ও বিদ্যেটি ভালই জানা আছে, এরপর ফের যদি কাউকে ফলো করতে দেখি তাহলে কিন্তু একটা এসপার ওস্‌পার হয়ে যাবে। বুঝলে? এখন যাও—

ছাড়া পেতে ছেলেটি প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। তার এই ক্ষুদ্র সাংবাদিক জীবনে এ হেন জাহাঁবাজ মেয়েছেলে সে বোধহয় এখনও দেখেনি। জীবন নিয়ে ফিরতে পেরেছে মনে করে নিশ্চই এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। একটা উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ভেবে স্বস্তির শ্বাস

pathagar.net

ফেলল গার্গী। হাসলও কিছুক্ষণ মনে মনে। ছেলেটাকে আরও একটু কড়কে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। নেহাত হঠাৎ চোখে পড়ল ওদিকে বাস থেকে নেমে তাদের গলির এক ভদ্রলোক হনহন করে হেঁটে আসছেন, তাইই—

তাঁকে দেখে গার্গীও মুখ নীচু করে তাঁর পাশ কাটিয়ে চলে গেল দ্রুত।

টালিগঞ্জ থেকে শরৎ বসু রোডে সায়নদের বাড়ি পৌঁছাতে প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেখল, সায়ন আগেই এসে পৌঁছেছে ফ্ল্যাটে। সোফায়, বসে আছে রীতিমতো ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে। অফিসের জামাপ্যান্ট তখনও ছাড়েনি। কিন্তু ঘরের চারপাশে তাকিয়ে, ঘরের ছন্নছাড়া অবস্থা দেখে তার দম বন্ধ হয়ে এল। অ্যাশট্রে ঠিক আগের মতোই ছাপাছাপি, ছাই উপছে পড়ে নোংরা হয়ে রয়েছে সেন্টার টেবিল। মেঝে, ঘরের কোণ, ডাইনিং টেবিল, বিছানা সবই অগোছালো। বিশ্রী হয়ে রয়েছে সমস্ত পরিবেশটাই। মাত্র দিনচারেক আসেনি সে, তার মধ্যেই আবার ঘরদোর সব যে-কে সেই।

কাজের লোক কখনও রাখতে দেয়নি ঐন্দ্রিলা। অতএব ঐন্দ্রিলাবিহীন ঘরের এহেন দশা তো হবেই। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর চেপে গার্গী বলল, কী ব্যাপার, হঠাৎ এমন জরুরি তলব কেন? এনি মিস্‌হ্যাপ?

সায়ন উদাসীনভাবে ঘাড় নাড়ল, খুব সিরিয়াস ধরনের। যে মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার বাজারে ছাড়া হবে বলে আমাদের দীর্ঘদিনের প্ল্যানিং, তার প্রোডাকশন শুরু হয়েছিল গত পরশু। হঠাৎ আজ সকালে মেশিন স্টার্ট হওয়ামাত্র সেটা বার্স্ট করে যায়।

—তাই! গার্গীকে উদ্বিগ্ন দেখায়, কেউ উন্ডেড হয়েছে?

—না, ঠিক সেই মুহূর্তে কেউ কাছাকাছি ছিল না। যে সুপারভাইজার সুইচ অন করে, সে ভাগ্যক্রমে মেশিন চালু করেই একটু বেরিয়েছিল কী একটা কাজে। প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত তখনও ফ্যাক্টরিতে পৌঁছাননি। তিনি থাকলে হয়তো ঘটনাটা ঘটত না। সুইচ অন করার আগে একটু চেক-আপ করা উচিত ছিল মেশিনটা।

—কিন্তু আগের দিন সন্ধেতেও তো মেশিন চালু ছিল?

তা ছিল। কিন্তু আজ ফার্স্ট আওয়ারেই কোনও একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

—তা হলে ওই সুপারভাইজার?

—তাকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়েছে। কিন্তু লোকটা সারাদিন ধরে এমন কান্নাকাটি করছে যে মনে হয় না এটা তার কাজ। কৌশিক দত্তও বলল, এটা এমন মেকানিক্যাল ডিফেক্ট যেটা সকালে এসে সবার সামনে ওই সুপারভাইজারের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কাল ওই লোকটির অবশ্য ডিউটি ছিল না।

—তাহলে গতকালের সুপারভাইজার?

সায়ন ক্লান্তভাবে হাসল, কৌশিক দত্ত বলছে, কাল রাতে সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মেশিন বন্ধ করে রেখে গেছে। নিশ্চয় মধ্যরাতে কেউ মেশিনে হাত দিয়েছিল।

গার্গী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, স্যাবোটেজ?

—কৌশিক দত্ত তাইই সন্দেহ করছে।

—খুব সিরিয়াস ড্যামেজ? সারানো যাবে না?

—না, সায়ন মাথা নাড়ে, ফরেন মেশিনারিজ্। এখানে সব পার্টস পাওয়া যায় না। বেশ কিছুদিন লেগে যাবে ফরেন থেকে পার্টস আনিয়ে মেরামত করতে।

গার্গী চুপচাপ শুনল, তারপর ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ভাবলও। এর আগে সায়নদের

pathagar.net

ফ্যাক্টরির টুকটাক দুর্ঘটনা, লেবার-ট্রাব্‌ল সবই তার কানে আসত। তখন এ-সব ব্যাপারে তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি, এখনও করা উচিত কি না তা বুঝতে পারল না। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, তা এ ব্যাপারে আমি কোন কাজে লাগব? আমাকে কি এক্সপার্ট ঠাওরালেন নাকি?

সায়ন গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, না, তবে ভীষণ আপসেট হয়ে গেছি। আজ থেকে কুড়ি-বাইশদিন আগেই প্রোডাকশন শুরু হওয়ার কথা। ঠিক সেই মুহূর্তে এক মিসহ্যাপ হল, আবার এখন প্রোডাকশন শুরু হতে-না-হতে ফের মিস্‌হ্যাপ। এত অসহায় লাগছে নিজেকে যে কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারছি না। মনে হচ্ছে রুইনড হয়ে যাব একেবারে। নিজের বলতে এ পৃথিবীতে আমার আর কেউই নেই যাকে এতসব কথা বলতে পারি। রুক্কা চলে গিয়ে আমি এত একা হয়ে গেছি না—, তাইই তোমাকে—

বলতে বলতে সায়নের গলা ধরে এল যেন। তার অসহায়, নিঃসঙ্গ মুখের দিকে তাকিয়ে গার্গী চমকে উঠল ফের। কয়েকদিনের প্রাণপণ চেষ্টায় সায়নকে তার জড় অবস্থা থেকে কিছুটা প্রাণচঞ্চল করে তুলেছিল, আবার এখন সন্ধের এই আবছা আলোয় সে তাকিয়ে দেখল, সায়নের চোখে সেই ধূসরভাব আবার ফিরে আসছে। সে বুঝতেই পারছে না, হঠাৎ কে বা কারা অলক্ষ্যে সায়নের প্ল্যান্টে স্যাবোটেজ করতে আসবে। তার যে সর্বনাশ হওয়ার কথা তা তো হয়েই গেছে। আবারও কেন—

ভাবতে ভাবতে গার্গী আবার আগের দিনের মতো দ্রুতহাতে পরিষ্কার করতে শুরু করল সেন্টার-টেবিল, মেঝের ধুলো, শোবার ঘরের বিছানা, আসবাবপত্র। মাত্র কয়েকদিনেই পুরুষমানুষেরা কীভাবে ঘরদোর নোংরা করে ছড়িয়েছিটিয়ে একশা করে রাখতে পারে, তা না দেখলে ভাবা যায় না। ঘর গুছোতে গুছোতেই জিজ্ঞাসা করল, খাওয়াদাওয়া করেছেন, না কি—

সায়ন অবাক হয়ে দেখছিল গার্গীর ঘরদোর পরিষ্কার করা। হেসে বলল, খাচ্ছি। দুপুরে অফিসে, রাতে ঘরে খাবার আনিয়ে নিচ্ছি। শুধু কালই কিছু খাওয়া হয়নি। হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অফিস থেকে রাত করে ফিরে। যখন ঘুম ভাঙল, দেখি সাড়ে এগারোটা।

গার্গী হঠাৎ তার কাজের মধ্যে থেমে গিয়ে উদ্বিগ্নচোখে তাকাল সায়নের মুখের দিকে, বাহ্‌, বেশ মানুষ আপনি যা হোক। তারপর তার কাজ শেষ করে বলল, চলুন, রাতে কোথাও গিয়ে খেয়ে নেবেন, রেডি হোন, কুইক-কুইক—

তার ধমকে সায়ন দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিল, বাইরে বেরোতে বেরোতে বলল, কাল আবার কাগজে কিন্তু এই ডিনারের রিপোর্ট বেরোবে। আবার বেশ ফলাও করে—

সেদিন রেস্তোরাঁ থেকে ফিরে সায়ন যখন গার্গীকে নামিয়ে দিল টালিগঞ্জে, জুবিলি পার্কে তাদের গলির মুখে, তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বাড়ি ফিরে ওপরে উঠতেই দেখল, দাদা-বউদি মুখ ফার্নেস করে অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে তার ঘরের দিকে চুপচাপ পা বাড়াতেই শুনতে পেল সুশোভনের গর্জন, শোন্—

গার্গী এই গর্জনের জন্য প্রস্তুত ছিল, সে থমকে দাঁড়াতেই সুশোভন বললেন, এভাবে মিডনাইট পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বেহেল্লাপনা করে বেড়ালে এ বাড়িতে জায়গা হবে না। আমাদের ফ্যামিলির একটা প্রেস্টিজ বলে ব্যাপার আছে—

গার্গী শান্তভাবে এগিয়ে এল সুশোভনের সামনে। একবার অনমিত্রার দিকে তাকিয়ে নিয়ে দৃঢ় অথচ অবিচল ভঙ্গিতে বলে ফেলল, আমি সায়নদাকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি—

বেশ কয়েক দিন নিজের ভেতর চুরমুর, বিধ্বস্ত হওয়ার পর আজকাল অফিসে ঢুকে নিজের চেম্বারে আসীন হয়েও একলহমাও স্বস্তি বোধ করছে না সায়ন। এটা তার নিজেরই অফিস, এই অফিসের প্রতিটি কোণাই তার নিজের তত্ত্বাবধানে তৈরি। তার নিজের বিশাল রাউন্ড-শেপ্‌ড্‌ অভিনব সানমাইকা-লাগানো টেবিল, কাঁধ-উঁচু রিভলভিং চেয়ার তো বটেই, এ অফিসের প্রতিটি দপ্তর, প্রতিটি চেয়ার-টেবিল, অফিসার, কর্মী তার বড়-চেনা। এতদিন পর্যন্ত সবাই তার বড় আপনও ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে অফিসে ঢোকা ইস্তক মনে হচ্ছে, তার ও অফিসের বাকি সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে একটা মস্ত ফাটল। যে ফাটল এতই চওড়া যে সায়ন কিছুতেই যেন তা আর পেরোতে পারবে না। আজ সে অফিসে আসতেই সারা অফিস যেন ভীত, সন্ত্রস্ত, সবখানেই এক প্রবল নিঃস্তব্ধতা, একটা অদ্ভুত থমথমে ভাব, যেন শ্মশানপুরীর শূন্যতাই। কোথাও এক এক মুহূর্ত ফিসফিস শোনা গেল হয়তো, পরক্ষণেই কেউ তা থামিয়ে দিল আর এক ফিসানিতে, অ্যাই, চুপ, চুপ।

সায়নও বসে রইল প্রবল আড়ষ্টভাবে। হাতও দিতে পারছে না কোনও ফাইলে, ডাকতেও পারছে না কোনও অফিসার কিংবা কর্মীকে, বেশ কিছুক্ষণ এভাবে স্থাণু, নিথর বসে থাকার পর তার মনে হল, সে হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মহেঞ্জোদারোর এক ধ্বংসস্তূপ হয়ে যাবে।

সেই মুহূর্তে কেউ যেন তার চেম্বারের দরজার ওদিক থেকে টোকা দিল তিনবার। 'প্লিজ কাম ইন' কথাটা বলার আগেই যিনি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লেন, তিনি পুলিশ ইনস্পেকটর দেবাদ্রি সান্যাল।

বোধহয় ওত পেতেই ছিলেন দেবাদ্রি, কখন সায়ন অফিসে জয়েন করে, তাই এর আগে আরও বার কয়েক জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও আজ ফার্স্ট আওয়ারেই তাঁর প্রথাসিদ্ধ উর্দিতে ওতপ্রোত হয়ে হঠাৎ আবির্ভাব। পুলিশি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ভারী কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন, সরি, মিঃ চৌধুরী, আপনাকে আরও একবার ডিসটার্ব করছি।

সায়ন তখনও যেন এক ঘোরের ভেতর আছে। যতবার চেষ্টা করছে সেই অন্ধকারের জাল কেটে আলোয় ছিটকে বেরোবার, তার সমস্ত সত্তা এক নিদারুণ লজ্জায়, অপমানে, হাহাকারে তাকে চেপে রেখে দিচ্ছে সেই আচ্ছন্নতার ভেতর, তেমনই কুয়াশার ভেতর লীন হয়ে থেকে শুধু বলতে পারল, হুঁ, বলুন, আর কী জিজ্ঞাসা করার আছে।

দেবাদ্রি তীক্ষ্ণ নজরে তাকালেন সায়নের দিকে, যে প্রশ্নটা বার বার করেছি, আর কেবলই তা এড়িয়ে যাচ্ছেন আপনি, সেটাই জানতে চাইছি আবারও। আপনার ট্রেনের টিকিটে লেখা আছে চৌঠা এপ্রিলে আপনি চেপেছিলেন বোম্বে মেলে, যে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছোবার কথা পাঁচই এপ্রিল সকালে, অথচ আপনি বারবার একই উত্তর দিচ্ছেন যে, আপনি এসে পৌঁছেছেন পাঁচ তারিখ শেষ রাতে অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ভাষায় ছ-তারিখ ভোর রাতে। এই সতেরো আঠারো ঘণ্টার হিসেব কিন্তু আমাদের দিচ্ছেন না আপনি।

সায়ন ঝাপসা চোখে তাকাল সামনের দিকে, চুপচাপ রইল অনেকক্ষণ, যেন কী বলবে তা ভেবে উঠতে পারছে না, তারপর হঠাৎ বলল, বলেছি তো, কোনও একটি বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলাম খড়গপুরে।

pathagar.net

—সে তো আগেও বলেছিলেন, কিন্তু কী সেই বিশেষ কাজ তা বলেননি। এতক্ষণই বা কেন লাগল তাও খোলসা করে বলছেন না।

—না-ই বা জানলেন অত কথা, ধরুন, একান্তই ব্যক্তিগত।

দেবাদ্রি হাসলেন, কিন্তু মিঃ চৌধুরী, কাজটা যত ব্যক্তিগতই হোক, পুলিশের কাছে তা বলতেই হবে আপনাকে।

সায়ন অস্পষ্ট চোখে তাকিয়ে রইল, কিছু বললই না।

দেবাদ্রি গভীরভাবে লক্ষ করছিল সায়নের প্রতিক্রিয়া, সায়ন কী ভাবছে, কতটুকু বলছে, চেপে যাচ্ছে কতটা এইসব নোট করছিল মনে মনে। একটু থেমে বলল, এই কয়েক ঘন্টা সময়ই কিন্তু এই কেসের মেরিটের পক্ষে দারুণ ভাইট্যাল। আমাদের ধারণা, আপনি পাঁচই এপ্রিলে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন সন্ধের মধ্যেই। তারপর সে রাতে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছিল যার পরিণতিতেই আপনি ঐন্দ্রিলা দেবীকে হত্যা করতে বাধ্য হন।

সায়নের বুকের ভেতর তখন যেন ক্রমাগত হিম পতন হচ্ছে। শিরশির করে উঠছে তার শরীরের ভেতরটা। সে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করে উঠতে চাইল দেবাদ্রির অভিযোগের বিরুদ্ধে, কিন্তু তার গলার স্বর জড়িয়ে গেল যেন, আশ্চর্য, কোনও কথাই ফুটল না তার মুখে।

—আপনাকে তাহলে আরও জিজ্ঞাসা করি, মিঃ চৌধুরী, সেদিন রাত একটার সময় আপনার ল্যাবরেটরিরুমে আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছিল। বলতে পারেন, কে ছিল সেই ঘরে?

—রাত একটায়? সায়ন যেন বিস্মিত হল, আপনি কী করে জানলেন?

দেবাদ্রির মুখে মুচকি হাসি ঢেউ খেলে গেল। বললেন, তাহলে আপনিই ছিলেন? সায়ন অবাক হল, আমি কী করে থাকব? দেবাদ্রি হাসলেন, ঘটনার প্রেক্ষাপট বলছে, আপনার ল্যাবরেটরিরুমে নাকি আপনি ছাড়া আর কেউই ঢুকতেন না। তাহলে নিশ্চই আপনিই ছিলেন সেখানে। কী করছিলেন আপনি অত রাতে ল্যাবরেটরিরুমে?

সায়ন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ, আমি ছিলাম সে ঘরে আপনাকে কে বলল?

—কে আবার বলবে, দুয়ে-দুয়ে যেমন চার হয়, এই হিসেবও তেমনই মিলে যাচ্ছে—, বলতে বলতে দেবাদ্রি দুম করে অন্য প্রশ্নে চলে গেল, এবার বলুন তো মিঃ চৌধুরী, আপনার অফিসে সিগারেট খান এমন মহিলা ক' জন আছেন?

সায়ন, বোকার মতো তাকিয়ে থাকল আবারও, বলল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

দেবাদ্রি আগের মতো রহস্যেরই মুড়ে রাখলেন নিজেকে, সব প্রশ্নেরই কোনও না কোনও কারণ থাকে, আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দিন—

—এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না, কারণ আমার সামনে কেউ সিগারেট খায় না।

—ও, দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ অন্য প্রশ্নে চলে গেলেন, তা হলে এবার বলুন আপনার স্ত্রী ঐন্দ্রিলা দেবীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী রকম ছিল?

—সম্পর্ক। সায়ন হঠাৎই কেঁপে উঠল নিজের ভেতর। এক মুহূর্তে তার দু'বছরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি হুড়মুড় করে পার হয়ে গেল ফ্ল্যাশব্যাকের মতোই। যেন একটা দীর্ঘ এক্সপ্রেস ট্রেন পার হয়ে গেল সপাটে, সশব্দে, সমস্ত প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে। সায়ন সেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তার দুর্দান্ত ঝোড়ো-ঝাপটে সহসা তছনছ হয়ে গেল একা-একা।

—কী হল, চুপ করে রইলেন কেন, বলুন?

সায়ন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, বুঝতে পারছি না, ভাল ছিল বলেই তো জানতাম। এখন মনে হচ্ছে, হয় তো ছিল না।

pathagar.net

—হত্যাকাণ্ডের আগে আপনার সঙ্গে ঐন্দ্রিলা-দেবীর কোনও ঝগড়া হয়েছিল?

সায়ন অস্পষ্ট চোখে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল, না, ওর সঙ্গে কখনও ঝগড়া হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না।

—আচ্ছা, আপনি জানেন, বিয়ের আগে ঐন্দ্রিলা দেবীর কোনও প্রেমিক ছিল কি না?

—প্রেমিক! সায়ন একগলা জলে ভাসতে ভাসতে হঠাৎই এক ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেল যেন, কী বলছেন আপনি! ঐন্দ্রিলার প্রেমিক! কই, না তো? ছিল না কি?

—সে তো আপনারই জানা উচিত, মিঃ চৌধুরী। এমনও তো হতে পারে, বিয়ের আগে কাউকে ভালবাসতেন ঐন্দ্রিলা দেবী, কোনও কারণে তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি, এও হতে পারে, বিয়ের পরেও তাঁর সঙ্গে ঐন্দ্রিলাদেবী যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন, আপনি তা জানতে পেরেই—

—উইল ইউ প্লিজ স্টপ, ইনস্পেকটর? সায়ন এতক্ষণে প্রায় গর্জে উঠল, যা জানেন না, তা নিয়ে অযথা অনুমান করে ঐন্দ্রিলার গায়ে কালি ছিটোবেন না। আমি তার সঙ্গে দু'বছর ঘর করেছি। তার অতীতের ঘটনা নিয়ে আমি কখনও মাথা ঘামাইনি বটে, কিন্তু দু'বছরের মধ্যে এমন কিছু ঘটেনি, যা আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। কিছু ঘটলে নিশ্চই জানতে পারতাম।

দেবাদ্রি হাসলেন, সবসময় অতীতের কথা কি জানা যায়, মিঃ চৌধুরী। কোনও স্ত্রীই চাইবেন না তাঁর এ ধরনের কোনও অতীত ইতিহাস তাঁর স্বামী জানুক। অনেক মেয়েরই জীবনে এরকম প্রেমের ইতিহাস থাকে, কৈশোরে কিংবা প্রথম যৌবনে বহু মেয়েরই হঠাৎ ভাল লেগে যায় কাউকে। সে বয়সটা এমনই যে তখন সেই প্রেমিক, সে যেরকমই হোক না কেন, তাকেই মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। তারপর কখনও তাদের বিয়ে হয়, কখনও হয় না। হয় না অনেক কারণেই। কিন্তু সেই প্রথম প্রেমের দাগ খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়। কোনও কোনও নারী সেই দাগ অনেক চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না। সেই প্রেমের স্মৃতি সারাজীবন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সায়ন প্রায় পাগলের মতো ঘাড় নাড়তে নাড়তে এতক্ষণে স্পষ্ট কণ্ঠে বলল, আপনি যা ভাবছেন, তা ঠিক নয়, ইনস্পেকটর। তেমন কোনও ঘটনা থাকলে তা আমি অবশ্যই জানতাম। আমি না জানলে গার্গী অবশ্যই জানত—

—গার্গী মুখার্জি?

—হ্যাঁ। সে-ই ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্পর্ক করেছিল। ঐন্দ্রিলার জীবনে তেমন কোনও ঘটনা থাকলে নিশ্চই সে যেচে এসে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক করত না।

দেবাদ্রি মুচকি হাসলেন আবার, যাই হোক, মিঃ চৌধুরী, আপনি কি জানেন, ঐন্দ্রিলাদেবী কখনও সিগারেট খেতেন কি না?

—সিগারেট! সায়ন আবার ধমকে উঠল হঠাৎ, কী সব যা-তা বলছেন, মিঃ সান্যাল?

অত উত্তেজিত হবেন না, মিঃ চৌধুরী। ইনভেস্টিগেশনের স্বার্থে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে হয় আমাদের। এতে শুধু পুলিশের দরকারই জড়িয়ে আছে, তা নয়, সব প্রশ্নের জবাব ঠিক-ঠিক বলা আপনার নিজের স্বার্থেও প্রয়োজন। আপনি যদি ঠিকমতো গাইড করেন পুলিশের তদন্তের কাজ, তাহলে আপনি যে নির্দোষ তা প্রমাণ করাও আপনার পক্ষে সহজ হয়ে পড়বে। নইলে এখন অভিযোগের আঙুল ক্রমশ আপনার উদ্দেশেই ধাবিত হচ্ছে তা নিশ্চই বুঝতে পারছেন—

pathagar.net

সায়ন এতক্ষণে একটু সহজ হয়ে বলল, কিন্তু মিঃ সান্যাল, আপনার প্রতিটি প্রশ্নই এত অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক, এতই অবাস্তব যে আমার বিস্মিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আমার স্ত্রী সিগারেট খেতেন কি খেতেন না এটাও জানব না আমি?

দেবাদ্রি তাঁর একটি ঢাউস নোটবুকে পর-পর নোট করে নিচ্ছেলেন সায়নের প্রতিটি জবাব, দেবাদ্রির প্রশ্নে তার প্রতিক্রিয়া, কখন বিস্মিত হচ্ছে, কখন চমকে উঠছে তখন মুখখানা অন্ধকার হয়ে আসছে তার।

নোট করা শেষ হলে এবার বললেন, আমি আপনার অফিসের কয়েকজনকেও কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই—

—অফিসের কেউও এর সঙ্গে জড়িত বলে আপনার মনে হচ্ছে?

—কে জড়িত, কে জড়িত নয়, তা অত চট করে বুঝে ওঠা যায় না, মিঃ চৌধুরী। তদন্তের স্বার্থে অনেককেই অনেক অসম্ভব সব প্রশ্নও আমাদের জিজ্ঞাসা করতে হয়।

—হুঁ বলুন, কাকে কাকে জিজ্ঞাসা করবেন?

দেবাদ্রি তাঁর ডায়েরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, একে-একে ডেকে দিন, প্রথমে আপনার পি.এ কঙ্কা রায়, তারপর অ্যাড্ভার্টিইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদার, তারপর—

সায়ন অবাক হয়ে বলল, এদের সবাইকে সন্দেহ করছেন আপনি।

দেবাদ্রি একটু বিরক্ত হলেন এবার, দেখুন মিঃ চৌধুরী, খুন এমনই একটি ঘটনা, যা তদন্ত করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত দিকে বাঁক নেয় তার সূত্র, যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একটি হত্যার পিছনে জড়িয়ে থাকে অনেক পরিকল্পনা, অনেক মোটিভ, অনেক অসম্ভব কারণও, তৎক্ষণিকভাবে কখনও কোনও হত্যা না হয় তাও নয়, তবে তার পেছনেও জড়িয়ে থাকে অনেক রহস্য, তার তদন্তেও উদ্ঘাটিত হয় অদ্ভুত সব কাহিনী। হয় তো ঐন্দ্রিলা হত্যার পেছনেও নিহিত হয়ে আছে অভূতপূর্ব কোনও কারণ।

চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় বোর্ডরুমের বিশাল ঘরখানায় বসে প্রায় রয়েল বেঙ্গলের ভঙ্গিতে গর্জন করছিলেন।

লাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের আলাদা কোনও মিটিংরুম নেই। যা আছে তা হল এই পেল্লাই সাইজের বোর্ডরুমটি, যেখানে বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস মাসে একবার করে মিলিত হন তাঁদের মিটিংয়ে। বাকি দিনগুলো ঘরটা খালিই পড়ে থাকে বলে অফিসের অন্যান্য জরুরি মিটিংগুলো এই বোর্ডরুমেই হয়ে থাকে।

আজ সেই রকমই একটা জরুরি মিটিং।

পঁচিশ বাই কুড়ি মাপের এই বিশাল ঘরটির মাঝখান জুড়ে রয়েছে উড্ কালারের সানমাইকা লাগানো একটি প্রমাণ সাইজের টেবিল। টেবিলটি ডিম্বাকৃতি, তার চারপাশে পর পর সাজানো গোটা কুড়ি চেয়ার, তার মধ্যে একটি বিশাল সিংহাসনপ্রতিম, অন্যগুলি ফোমের নরম গদি-আঁটা, হাতলঅলা। চেয়ারম্যান সেই সিংহাসনে আসীন, ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ চোখে। তাঁর ঠিক বিপরীত মেরুর চেয়ারে বসে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৈনাক বিশ্বাস। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের

চোখমুখ অবশ্য ভাবলেশহীন, তাঁর সামনে খোলা একটি ঝকমকে ইংরেজি জার্নাল, কখনও সেই জার্নালের পৃষ্ঠায় চোখ রাখছেন, কখনও উদাসীন হয়ে তাকাচ্ছেন খোলা জানালার ওপাশে। কী দেখছেন তিনিই জানেন। বাকি চেয়ারগুলিতে অবশ্য আসামির মতো রুদ্ধশ্বাস হয়ে কোম্পনির ম্যানেজারিয়াল র‍্যাঙ্কের অন্য অফিসাররা, তাঁরা সবাই যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পাংশুমুখে শুনছেন চেয়ারম্যানের একনাগাড় বোম্বার্ডিং। বোম্বার্ডিংয়ের তাপ এমনই প্রখর যে ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠছিল অফিসারদের। কিন্তু আজকের মিটিংয়ে চা পর্যন্ত আনার হুকুম হয়নি চেয়ারম্যানের।

চা তার সঙ্গে টা এলে মিটিংয়ের টাফনেস টাল খেয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় আজকের এই ড্রাই অ্যারেঞ্জমেন্ট। রৌণকের তেষ্টা পেয়েছিল কিন্তু কাউকে জলও আনতে বলা যাচ্ছে না এমন টেন্‌শ্‌ মুহূর্ত বয়ে চলেছে বোর্ডরুমের ভেতর।

ছোট্টখাট্ট গোলগাল চেহারার চেয়ারম্যান, যাকে রৌণকরা আড়ালে আবডালে প্রায়শ কুমড়ো-পটাশ বলে উল্লেখ করে থাকে, চোখ পাকিয়ে বলছিলেন, আপনারা নিশ্চয় জানেন, এখন লাইম ইন্ডিয়ার ভাগ্য ঝুলছে একটা সরু সুতোর ওপর। আমাদের প্রতিযোগী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্ট এর আগে আমাদের সমস্ত বাথিং সোপগুলোকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিয়েছে। মাত্র একটিই প্রোডাক্ট এখন বিক্রি হয় আমাদের, সেটি হল ডিটারজেন্ট পাউডার। তাও এই জন্যে যে, প্যারাডাইস এখনও পর্যন্ত তাদের নতুন ফর্মুলায় তৈরি মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার বাজারে ছাড়তে পারেনি বলে। আমি শুনেছি, তাদের এই প্রোডাক্টটিও নাকি খুবই উন্নতমানের হবে। অন্তত আমাদের পি. এম. রাহুল রায়ের তৈরি প্রোডাক্টের চেয়ে ফার, ফার বেটার। সুখের কথা এই যে, প্রোডাকশন শুরু হওয়ার আগেই ওদের মেশিন বার্স্ট করেছে এবং মেশিনটি অন্তত আরও এক মাসের আগে কাজ শুরু করতে পারবে না। আর ঠিক এই সুযোগটাই নিতে হবে আমাদের। এখন এই এক মাস কোম্পানির প্রত্যেকেরই কনসেনট্রেশন হবে, আমাদের ডিটারজেন্ট পাউডার 'হোয়াইট ওয়াশ'-এর বিক্রি বাড়ানো। একবার সেল বাড়াতে পারলে—

এই পর্যন্ত বলে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামলেন চেয়ারম্যান। বোধহয় দম নিচ্ছেন। লোকটার বয়স তো আর কম হয়নি। এতখানি উত্তেজনার ধকল কী করে সইতে পারেন কে জানে! কিন্তু আজ যেরকম ডেস্ট্রাক্টিভ মুডে আছেন, তাতে এত তাড়াতাড়ি বক্তৃতায় ক্ষান্ত দেবেন তা মনে হয় না। মাস্টারমশাই যেমন ছাত্রদের পড়া ধরেন, সেই ভঙ্গিতে তাঁর দৃষ্টি একে-একে ন্যস্ত হচ্ছে অফিসারদের মুখের দিকে। ফলে রৌণকও কায়দা করে তার চোখ চেয়ারম্যানের দিকে থেকে সরিয়ে রাখল সামনে বসে থাকা অনঙ্গ চক্রবর্তীর মুখে। একটু আগে কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে রাহুল রায়, আবার কার ওপর কোপ পড়বে কে জানে। আরও কতক্ষণ যে চলবে এই আগুন-ঝরানো মিটিং।

কিন্তু না, চেয়ারম্যান বললেন, আমরা ঠিক দুদিন পর আবার এই বোর্ডরুমে বসব, সন্ধের পর। তার মধ্যে আপনারা যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে লাইন অব্ অ্যাকশন ভেবে ফেলুন। আন্ডার দ্য গাইডেন্স অব এম.ডি। বিক্রি বাড়াতেই হবে আমাদের।

বলে আড়চোখে একবার এম.ডি-র দিকে তাকিয়ে চেয়ারম্যানের গলা আবার গমগম করে উঠল, তবে মনে রাখবেন, একমাসের মধ্যে যদি প্রোডাক্টের সেল আশানুরূপ না বাড়ে, দেন সাম অব্ ইউ উইল হ্যাভ টু গো ফ্রম দিস কোম্পানি। ও. কে?

শেষের মারাত্মক বাক্যটি বলে দুম করে চেয়ার ছাড়লেন হেমজ্যোতি সিংহরায়। উঠে

pathagar.net

দাঁড়িয়ে আরও একবার জ্বলন্ত চাউনি ছুড়ে দিলেন সামনে থম হয়ে বসে থাকা আসামিদের দিকে। তারপর ছোট ছোট পায়ে খুরখুর করে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন বোর্ডরুমের দরজা খুলে।

চেয়ারম্যান বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই এম.ডি-ও জার্নাল বন্ধ করে সবাইকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে চলে গেলেন নিজের চেম্বারে। বাকি অফিসাররা টেন্‌শ্‌ হয়ে বসে রইল একে অপরের দিকে তাকিয়ে। প্রাইভেট কোম্পানিতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিচিত, কিছুটা বন্ধুও, কেননা রোজই পাশাপাশি ঘরে বসতে হয়, আলোচনা করতে হয়, সময় বিশেষে একজায়গায় চা খেতে খেতে আড্ডাও মারতে হয়। কিন্তু প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রুও। চেয়ারম্যানের শেষ কথাগুলো তখনও প্রত্যেকের বুকের ভেতর ঝনঝন করে ভাঙছে। 'সাম অব্‌ ইউ' বলতে ঠিক কে কে তা হয়তো চেয়ারম্যানের মনের ভেতর কিছুটা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, কিছুটা হয়তো ঠিক হবে আগামী এক মাসের পারফরমেন্সে। অতএব সবাই সবাইয়ের দিকে ঝাপসা চোখে তাকাচ্ছে, ভাবছে একটা প্রোডাক্ট যে সেল হচ্ছে না তার জন্যে দায়ী ঠিক কে। কোম্পানির যিনি প্রোডাকশনের দায়িত্বে আছেন সেই রাহুল রায়, নাকি সেলসের দায়িত্বে থাকা অনঙ্গ চক্রবর্তী অথবা অ্যাডভার্টাইজিংয়ের দফতর যিনি দেখছেন সেই রৌণক মুখার্জি। কিংবা সেলস্‌ রিপ্রেজেন্টেটিভরা, যাদের কাজ বিভিন্ন এরিয়ায় ঘুরে ঘুরে সাপ্লাইয়ের তদারকি করা, সেলস্‌ প্রোমোশনের ব্যবস্থা করা, তা না করে যাদের অধিকাংশই ঘরে বসে ট্যুর দেখায়, তারা। অথবা এঁদের কেউই নন, খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরই, যিনি গত কয়েক মাস ইচ্ছাকৃতভাবে কোম্পানির কাজে ঢিল দিয়েছেন, চেয়ারম্যানের ব্যবহারে কাজে তিতিবিরক্ত হয়ে। হয়তো এখানে ঠিকমতো মানিয়ে নিতে পারছেন না, চলে যাবেন অন্য কোথাও—

কয়েক মুহূর্তের একটা স্থির নৈঃশব্দ্য বরফ-শীতল হয়ে বিরাজ করল সবার মধ্যে। তারপর দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে একসঙ্গে উঠে পড়ল সবাই। রাত অনেক হয়ে গেছে, ঘরে ফিরতে হবে তো।

বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত ব্যাপারটা মনের ভেতর ঢালা-উপুড় করতে শুরু করল রৌণক। সে এই কোম্পানির বিজ্ঞাপন দফতর দেখাশুনো করছে গত কয়েক বছর। তার কাজে সাহায্য করার জন্য আছে যে অ্যাডভাটাইজিং এজেন্সিটি, তার কর্ণধার অমৃত মজুমদার ভারি চমৎকার স্বভাবের যুবক, খুব পরিশ্রমীও। আরও দু-তিনটি উৎসাহী তরুণকে নিয়ে সে খুলে বসেছে তার বি.পি.বি. অর্থাৎ বেঙ্গল পাবলিসিটি ব্যুরো, যাদের বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু এই লাইম ইন্ডিয়া দিয়েই। তারাই প্রতিদিন সযত্নে তৈরি করে লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনের কাজ শুরু এই লাইম লে-আউট, কপি। তৈরি করে নতুন নতুন ক্যাপশন দিয়ে, স্পেস বুক করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তাদেরই চেষ্টায় বিজ্ঞাপনের জৌলুসও বেড়েছে কয়েক বছরে।

রৌণক এই কোম্পানিতে যোগ দেওয়ার আগে এখানকার অন্য একজন অফিসার বিজ্ঞাপনের দায়িত্বে ছিলেন। কোম্পানি তখন প্রধানত নজর দিত প্রোডাকশনের ওপর, বিজ্ঞাপনের কোনও গুরুত্বই ছিল না, গুরুত্ব দেওয়ার কথা ভাবেওনি কেউ।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর মৈনাক বিশ্বাস ব্যাপারটা খেয়াল করে রৌণককে নিয়ে এসেছিলেন লাইম ইন্ডিয়ায়, বলেছিলেন, ট্রাই ইয়োর বেস্ট। কোম্পানির একটা ভাল ইমেজ তৈরি করতে হবে।

জয়েন করেই বিজ্ঞাপনের দফতর ঢেলে সাজিয়েছিল রৌণক। দেবপ্রিয় রায় নামের একজন পরিশ্রমী অ্যাসিস্ট্যান্টকে দায়িত্ব দিয়েছিল ফাইলের, সঙ্গে সঙ্গে অমৃত মজুমদারকে তার নানান চিন্তা-ভাবনার হদিশ দিয়েছিল লে-আউট তৈরি করার সময়। সেই সঙ্গে বাংলা

pathagar.net

ছবির গ্লামারাস সব অভিনেত্রীদের মডেল হিসেবে ব্যবহার করায় কয়েক বছরেই বেশ চমক জাগিয়েছিল লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপন। ছবির সঙ্গে চমৎকার লাগসই ক্যাপশন।

কিছুকালের মধ্যেই রৌণক উপলব্ধি করল, বিজ্ঞাপনের এই জগৎ শুধু বর্ণাঢ্যই নয়, তা যেমন কম্পিটিটিভ্ তেমনই চ্যালেঞ্জিং। বিজ্ঞাপনেই কোম্পানির ইমেজ বাড়ে, ক্রেজও। প্রথম থেকেই কাজটা ভারি উপভোগ্য মনে হয়েছিল তার। এত বছর পরে এখনও তেমনই সমান উৎসাহ বোধ করে নতুন নতুন লে-আউট নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে, অভিনব সব ক্যাপশন সাজেস্ট করতে। ভাল ক্যাপশন ভাবার মধ্যেও সে একটা মাদকতা খুঁজে পায় আজও। একবার একটা সাড়া জাগানো ক্যাপশন লিখে বেশ আলোড়ন জাগিয়েছিল বিজ্ঞাপন মহলে। ছবিতে সাবান মাখছে একটি তরুণী, বিউটিবাথের ফেনায় তার বুক থেকে পা অবধি শরীর ঢাকা, সাবানের বাবলগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েটির চারপাশের ফাঁকা, স্পেসে, তার ঠিক পাশে ক্যাপশন 'হ্যাপি বাথ্ডে টু ইউ'। বার্থ-এর পরিবর্তে : 'বাথ' শব্দটি ব্যবহার করায় বিজ্ঞাপনের মাত্রাটাই বদলে গিয়েছিল একেবারে। অনেক কাগজ আর বিজ্ঞাপন সংস্থার তরফ থেকে পেয়েছিল অজস্র অভিনন্দন আর প্রশংসা।

তার এমন সব উদ্ভাবনী প্রতিভা দিয়ে রৌণক এ যাবৎ জয় করেছে বিজ্ঞাপনের জগৎ, বাড়িয়েছে কোম্পানির ইমেজ। অথচ এই মুহূর্তে চেয়ারম্যানের ধমকানিতে সে অজস্র ভাবনার মুখোমুখি।

পরদিন অফিসে এসেও তার এই আচ্ছন্নতা গেল না। নতুন করে ভাবতে বসল বিজ্ঞাপনের লে-আউট। হোয়াইট ওয়াশ নামটি তার কোনও দিনই পছন্দ নয়। শব্দটার মধ্যে কেমন চুনকাম চুনকাম গন্ধ। কে যে নামকরণ করেছিল! তার চেয়ে—ভাবতে বসল রৌণক, ডিটারজেন্ট পাউডারটি যখন বাজারে ভাল চলছে না, তখন তার নাম বদলে নতুন ঝকঝকে প্যাকেটে ভরে বাজারে ছাড়লে কেমন হয়। নতুন একটা নাম দেওয়া যাক্, সফেদ-সাদা, কিংবা মার্বেল হোয়াইট, কিংবা কিংবা মিল্ক হোয়াইট—

তার এমন রকমারি ভাবনার ফাঁকে হঠাৎ তার চেম্বারের দরজা খুলে ঢুকে পড়লেন রাহুল রায়, কী ব্যাপার, মুখার্জি সাহেব, খুব খোশমেজাজে আছেন মনে হচ্ছে। কালকের ওই ব্লাস্টিঙের পরেও—

—কী আর করা যাবে, মিঃ রায়, এই বয়সে তো আর কাঁদা যায় না!

—রাইট ইউ আর। কিন্তু দেখছেন, আকারে ইঙ্গিতে সমস্ত দোষটা আমার ঘাড়েই এসে পড়ছে। যাদের বিক্রি করার কথা, সেই সেল্স্ উইং কিন্তু নির্বিকার। সেল্সের লোকেরা কেবলই হুইস্পারিং ক্যাম্পেন করে চলেছে, প্রোডাক্ট ভাল নয়, লোক কিনছে না, এ মাল চলবে না, এইসব। কিন্তু তাদের যে বিক্রি করার গরজ নেই, এটা কেউ দেখছে না। সেল্স্ ম্যানেজার মাসে কদিন ট্যুরে বেরোয় বলুন তো? এমনকি এরিয়া অফিসার, যাদের রেগুলার ট্যুর করার কথা, তারা বিভিন্ন ছুতোয় অফিসে এসে আড্ডা মারে, তা হলে বিক্রি হবে কী করে? আরে বাবা, সেল্সে ভাল লোক থাকলে আটা বলে ভুসিও বিক্রি করে আসা যায়—

রৌণক হাসল, কিংবা এও তো বলতে পারেন, ঠিকমতো বিজ্ঞাপন হচ্ছে না বলেই বিক্রি বাড়ছে না।

—আজকের দিনে বিজ্ঞাপনের রোল ভাইটাল সে কথাও ঠিক। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞাপন তো ভালই হচ্ছে। তবে কোম্পানির উচিত বিজ্ঞাপনের বাজেট আরও আড়ানো। আগে

pathagar.net

দু-একবার টি.ভি.-তে দেওয়া হয়েছিল, সেও কতকাল হল বন্ধ হয়ে গেছে। অল ইন্ডিয়া মার্কেট ধরতে হলে খবরের কাগজ তো মাস্ট। কিন্তু টিভিতেও দিতে হবে।

রৌণক ঘাড় নাড়ল, বাজেটের যা অবস্থা, তাতে টি ভি-তে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ভাবতেই পারছি না। বরং সেল আরও বাড়ুক। টার্ন-ওভার বাড়লে তখন টি ভি-র জন্য আলাদা বাজেট করব। তা ছাড়া টি ভি-র জন্য যে অ্যাড-ফিল্মটা তোলা হয়েছিল, সেটাও এখন পুরানো হয়ে গেছে। নতুন একটা অ্যাড ফিল্ম তুলতে গেলেই এখন দু' তিন লাখ টাকা মিনিমাম লাগবে।

রাহুল রায়কে হতাশ দেখায়, তা হলে কী করা যায় বলুন তো! সেল বাড়ানোর ব্যাপারে আপনি কিছু ভেবেছেন?

রৌণক এর মধ্যে অনেকটা ভেবে ফেলেছে, অন্তত তার দৃষ্টিকোণ থেকে। কিছুটা ড্রাফটিং করেছে, বাকিটা করে ফেলে বিকেলে টাইপ করিয়ে নেবে। কিন্তু সেটা এখনই পি এম-এর সামনে সে ভাঙতে চায় না। হেসে বলল, ভাববার চেষ্টা করছি, মিঃ রায়। মিটিং তো কাল সন্ধের পর। তখন যা হোক কিছু একটা সাবমিট করে দেব। আপনিও ভাবুন না—

প্রোডাকশন ম্যানেজার ঘাড় নাড়তে লাগলেন অসহায়ভাবে, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। এম. ডি. তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন সব দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে। অথচ প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের কথা ভাবুন। সেখানে এম. ডি. নিজেই প্রোডাকশনের সঙ্গে ইনভলভড্। ইন ফ্যাক্ট, এম. ডিই তাঁর নিজস্ব ফর্মুলায় প্রোডাকশন করান। হি ইজ অ্যা গ্রেট মাস্টার।প্রোডাকশন ম্যানেজারের কোনও রোলই নেই সেখানে। কৌশিক দত্ত কত আরামে চাকরি করছে ওখানে ভাবুন। তার ডিউটি স্রেফ ফ্যাক্টরি ঠিকমতো চলছে কি না তা দেখা, সবাই শিফ্‌ট অনুযায়ী হাজিরা দিচ্ছে কি না তা মিলিয়ে নেওয়া। ব্যস্।

—কিন্তু কৌশিক দত্ত ওখানে থাকতে চাইছে না শুনেছিলাম।

—একজ্যাক্টলি, রাহুল রায় হঠাৎ ভীষণ উৎসাহী হয়ে পড়লেন, কেন জানেন, সায়ন চৌধুরী প্রোডাকশনের ব্যাপারটা পুরোপুরি তার নিজের হাতে রেখেছে বলেই কৌশিক দত্তের আক্ষেপ। ওদের প্রোডাক্টের এত রমরমা, তার কৃতিত্বের পুরোটাই ভোগ করছেন এম.ডি. নিজে। তাতে প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তের কোনও ভূমিকা নেই। সেদিন কৌশিক দত্তের সঙ্গে দেখা হল। একদম ফিউরিয়াস হয়ে আছে। রাগে গরগর করছে এম. ডি.র ওপর। বলল, আমার হাতে প্রোডাকশনের ভার দিক না। এর চেয়েও ভাল প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়তে পারি—

রৌণক আশ্চর্য হয়ে বলল, তা এম.ডি. তো কিছুটা ছেড়ে দিতে পারেন কৌশিক দত্তের হাতে—

রাহুল রায় ঘাড় নাড়ল, কেনই বা ছাড়বে। আমাদের এম. ডি.র যেমন শুধু ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি আছে, টেকনিকাল নো-হাউ কিছুই জানেন না। প্যারাডাইসের সায়ন চৌধুরী তো আর তা নন। তাঁর টেকনিক্যাল নলেজও আছে। এরকম এম. ডি.র আন্ডারে কাজ করতে পারলে আমি তো বর্তে যেতাম। প্রোডাকশনের ব্যাপারে নিজের রেশপনসিবিলিটি খুব বেশি থাকত না। কত আরামের চাকরি—

রৌণক হাসতে হাসতে বলল, কৌশিক দত্ত কি সত্যিই চাকরি ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়?

—উঁহু, মনে হয় না। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, খুব জটিল ধরনের মানুষ। মুখে এক রকম বলে, কাজে আর এক রকম। ওদের প্ল্যান্টে একটা মেশিন সেদিন বার্স্ট করেছে। একজন

pathagar.net

সাসপেন্ড হয়েছে, কিন্তু সে লোকটা নিরপরাধ। কিন্তু যার পক্ষে এই স্যাবোটাজ করা সম্ভব, কৌশিক দত্ত তাকে সেভ করতে চাইছে। নিশ্চয় কোনও গূঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে ওর ভেতর।

রৌণক আশ্চর্য হল তাই নাকি?

—হ্যাঁ, তবে কৌশিক দত্ত যদি চাকরি ছাড়ে তখন আমাকে সায়ন চৌধুরীর শরণাপন্নই হতে হবে। বিকজ মাই চেয়ারম্যান ইজ নট হ্যাপি উইথ মি। যদি হঠাৎ ডিসচার্জ লেটার ধরিয়ে দেন তা হলে খুব বিপদে পড়ে যাব।

রৌণক অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল রাহুল রায়ের মুখের দিকে। খুবই শেকি আর নার্ভাস হয়ে আছেন ভদ্রলোক। তার হাসিও পেয়ে গেল এই কারণে যে, কয়েকদিন আগে ওই রাহুল রায়ই সায়ন চৌধুরীর কোম্পানিকে ক্র্যাশ করার জন্য তার চেম্বারে এসে খুব তাতিয়েছে। আজ আবার কৌশিক দত্ত চাকরি ছাড়বে খবর পেয়ে প্যারাডাইসে জয়েন করার তাল করছে। সত্যিই পৃথিবীটা ভারি বিচিত্র। অবশ্য ডিসচার্জ লেটার ধরিয়ে দেওয়ার কথাটা শুনে রৌণকের নিজেরও খুব অস্বস্তি হচ্ছে। হঠাৎ তাকেও যদি চেয়ারম্যান স্যাক্ করেন, তার পক্ষেও নতুন চাকরি খুঁজে পাওয়া এ মুহূর্তে ভারি কঠিন কাজ। চকিতে ঋতবৃতার সুন্দর মুখখানা ভেসে উঠল তার মগজের ক্যানভাসে। সেই হাসি হাসি মুখটি মিলিয়ে না যেতেই তার চেম্বারে ঢুকে পড়লেন সেল্স্ ম্যানেজার অনঙ্গ চক্রবর্তী। মাঝারি উচ্চতার চেহারা, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ, কপালের অনেকটা জুড়ে টাক আছে, বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁকে দেখেই রৌণকের ঋতবৃতা-ভাবনার চটকা ঝট্ করে কেটে গেল, বলল, কী ব্যাপার, মিঃ চক্রবর্তী, আপনিও খুব দুশ্চিন্তায় আছেন বলে মনে হচ্ছে।

অনঙ্গ চক্রবর্তী সাদাসাপ্টা মানুষ, বললেন, আমার জীবনে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। সেলসের লোক মানেই কথা বিক্রি করে খেতে হয়। কারখানা থেকে যে রকম মাল বেরোবে সে রকম বিক্রি করব। ভাল মাল বেরোলে ভাল বিক্রি হবে, খারাপ মাল বেরোবে সেলও ফল করবে। কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে খারাপ মাল একবার বিক্রি করা যায়, দুবার বিক্রি করা যায়, বার বার গেরস্তকে টুপি পরানো যায় না। আজকালকার মানুষ ভীষণ অ্যালার্ট। যত দিন যাচ্ছে, ততই টাফ হয়ে উঠছে সেলসের লাইন। এখন দরকার হলে ভাল প্রোডাক্ট। বুঝলেন?

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, একটা রিপোর্ট তৈরি করে ফেলছি। প্রোডাকশন ম্যানেজারের হাতে হ্যারিকেন ধরিয়ে দিয়েছি রিপোর্টে। এম.ডি-কে গিয়ে নাকি বলেছে, সেলস্ উইং কাজ করছে না। দেখুন দেখি ছেলেগুলো ঢন ঢন করে ঘুরতে ঘুরতে সব জনডিস বাধিয়ে ফেলল, আর উনি কি না—

—তাই! রৌণক চুপ করে থাকে। প্রোডাকশন ম্যানেজার আর সেলস ম্যানেজারের এই ঝগড়াটুকু কোম্পানিতে সবাই বেশ উপভোগ করে মনে মনে। দু' দফতরই চায় অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে পার পেয়ে যেতে। অথচ গলদ যে আসলে কোথায় তা কেউ খুঁজে দেখতে চায় না। কাল চেয়ারম্যানের মিটিংয়ে ব্যাপারটা তা হলে বেশ জমে উঠবে।

কথা বলতে বলতে সেল্স ম্যানেজার হঠাৎ উঠে পড়লেন, যাই, এম.ডি.র সঙ্গে একটা পরামর্শ করে নিই। বাঘের সামনে পড়ার আগে—

বাঘ অর্থাৎ চেয়ারম্যান। অর্থাৎ সেলস্ ম্যানেজারও বেশ টেনশ্ হয়ে আছেন আগামী কালের ব্যাপারে।

রৌণক তার পরিকল্পনা আবার নতুন করে ভাবতে বসল। পুরানো প্রোডাকশন পুরানো

pathagar.net

নামে পুরানো প্যাকে চালানো সুবিধেজনক, না কি পুরানো প্রোডাকশনকে একটু বদলে ফেলে নতুন প্যাকে নতুন নামে বিক্রি করাটা অধিকতর শ্রেয়। হুইচ ওয়ান ইজ মোর সেলেবল্?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পার্সোনেল ম্যানেজার সামঞ্জস্য মৈত্রের ঘরে ঢুকল রৌণক, তার টেবিলে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেটটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মৈত্র সাহেব, আপনি কি এই সিগারেটই বরাবর খেয়ে আসছেন, নাকি মাঝে মাঝে বদলে ফেলেন ব্র্যান্ড।

সামঞ্জস্য মৈত্র বিস্মিত হলেন, কেন হঠাৎ? কলেজে যখন সিগারেটে হাতে খড়ি হয়, থুড়ি হাতে খড়ি নয়, মুখে আগুন হয় তখন বেশ দামি সিগারেট ধরেছিলাম। তারপর গত কুড়ি বছর এইটেই চলে আসছে। এখন আর বদলাতে ইচ্ছে করে না। কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে—

—ও, তার মানে আপনি লয়্যাল, রৌণক তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে গিয়ে ফোন করল দীপঙ্করকে, আচ্ছা দীপঙ্কর, আপনি কি একই ব্র্যান্ডের সিগারেট বরাবর খেয়ে আসছেন, না কি মাঝে মাঝে বদলান?

দীপঙ্করও অবাক হল, আমি তো প্রায়ই ব্র্যান্ড বদলাই। ইন ফ্যাক্ট নতুন কোনও সিগারেট বাজারে বেরোলেই কেন জানি না, আমার কিনতে খুব লোভ জাগে। মনে হয় দেখি না কেমন টেস্ট—

—আপনি হলেন ফ্লোটার, রৌণক ফোন ছেড়ে দেয়। একান্ত আত্মমগ্ন হয়েই বাড়ি ফেরে সেদিন, হঠাৎ ঋতবৃতাকে জিজ্ঞাসা করে, একই সাবান রোজ রোজ মাখতে ইচ্ছে করে তোমার, নাকি মাঝে মাঝে বদলাতে চাও।

হকচকিয়ে যায় ঋতবৃতা, কেন, নতুন নতুন সাবানে চান করতেই তো মজা বেশি, নতুন গন্ধই তো—

রাতে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ঋতবৃতার ফরসা নরম আঙুল তুলে নেয় নিজের বুকের উপর। ঈষৎ গোলাপি নেল-পালিশে চকচক করতে ঋতুর নখ।— বলো তো ঋতু, একই নেলপালিশ রোজ রোজ মাখতে ভাল লাগে, নাকি এক-একদিন এক-এক রঙের এক-এক ব্র্যান্ডের?

ঋতবৃতা ফুলে ফুলে হাসে, কেন, সেদিন দেখনি, কি রকম রক্তের রঙের নেল-পালিশ পরেছিলাম, তুমি আরও বললে, কী ব্যাপার, আমার পিঠ থেকে রক্ত খামচে নিয়েছ নাকি, এত লাল কেন নখ? এমন অসভ্য না তুমি—

—তার মানে তুমি ফ্লোটার, রৌণক বিড় বিড় করে।

—ফ্লোটার মানে?

—কেউ কেউ একই ব্র্যান্ড চিরকাল আঁকড়ে ধরে থাকে, তাদের বলা হয় লয়্যাল। আবার কেউ কেউ ইচ্ছেমতো ব্র্যান্ড বদলায়, নতুন কোনও কিছুতে তাদের আকর্ষণ, মার্কেট রিসার্চের ভাষায় এদের ফ্লোটার বলে। আচ্ছা, বলো তো ঋতু, মার্বেল-হোয়াইট নামটা বেশি ভাল লাগে শুনতে, নাকি সফেদ-সাদা, নাকি মিল্ক-হোয়াইট?

ঋতবৃতা সে কথার জবাব না দিয়ে রৌণকের হাতটা তার বুকের উপর তুলে নেয়, তা হলে এবার তুমি বলো তো, একই বউ রোজ-রোজ পছন্দ হয় তোমার, নাকি রোজ নতুন-নতুন—

রৌণক হেসে ফেলল, এই একটা ব্যাপারে শতকরা নিরানব্বই ভাগ বাঙালি লয়্যাল, তবে অবশ্যই সাংসারিক জীবনে, মনে মনে হয়তো নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে একজন ফ্লোটার আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, তিনি প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চেয়ারম্যান শ্রী এম. ডি. সায়ন চৌধুরী। রোজ কাগজে যা পড়ছি, নতুন নতুন মেয়ে নিয়ে—

pathagar.net

কঙ্কাকে কোম্পানির কয়েকটি জরুরি চিঠি লেখার তাগিদ ছিল বলে ডেকে পাঠিয়েছিল সায়ন। কঙ্কা রায় তার পি.এ.-কাম সেক্রেটারি, খবরের কাগজে প্রায় 'পাত্রী চাই' এর ভঙ্গিতে তার দেওয়া বিজ্ঞাপন, 'একজন সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী পি.এ. চাই, যাকে একই সঙ্গে স্টেনো এবং সেক্রেটারির কাজও জানতে হবে। স্যালারি নিগোশিয়েবল।' এর উত্তরে ছবিসহ একশো তিনখানা দরখাস্ত পেয়েছিল। ছবি দেখে, যোগ্যতা বিচার করে ইন্টারভিউতে ডেকেছিল ষোলোজনকে, তার মধ্যে থেকে নিখুঁত বাছাই করে পছন্দ করেছিল এই কঙ্কা রায়কে, গত দেড় বছরে কঙ্কার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সে বুঝেছে তার নির্বাচন ব্যর্থ হয়নি। শুধু সুন্দরীই নয় কঙ্কা, স্মার্ট, সদা হাস্যময়ী, বুদ্ধিমতী, চমৎকার নোট নেয় শর্টহ্যান্ডে, টাইপও ঝকঝকে। ফাইলের রক্ষণাবেক্ষণও ছবির মতো। আর—কোনও কোনও লঘুমুহূর্তে সামান্য চপলাও।

টেনশন পরিবৃত অফিসের কাজের ফাঁকে তার এই টুকরো-টাকরা চাপল্যটুকু বেশ উপভোগ করে সায়ন।

কিন্তু দুর্ঘটনার কারণে গত কয়েকদিনের বিরতির পর যখন নতুন করে অফিস শুরু করল, তখন থেকেই লক্ষ করেছে, কঙ্কা ঠিক আগের মতো নেই, একটু গম্ভীর, সতর্ক, একটু যেন এড়িয়ে থাকছে। অবশ্য শুধু সে-ই নয়, অফিসের অন্য সবাইই তার কাছ থেকে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে আগের চেয়ে। ঐন্দ্রিলার মৃত্যু হয়তো এ রকম দূরত্ব সৃষ্টি করার পক্ষে একটি যথেষ্ট কারণ, তবু কঙ্কা রায়ের এই গাম্ভীর্য তাকে কিছুটা ক্ষুব্ধ, কিছুটা বিচলিত করে তুলেছে।

আজ দেখল, কঙ্কার ধনুকের মতো সরু বাঁকানো দুই ভুরুর মাঝখানে এটা ছোট্ট কোঁচও। হাতে যথারীতি সেই হিজিবিজি অক্ষরের শর্টহ্যান্ড খাতাটি এবং পেন্সিল।

তার পরনে কালো পাড়, হালকা বাদামিরঙের জংলা ছাপার শাড়ি, গায়ে কালো ব্লাউজ, ব্লাউজের হাতা একটু বড়ই পরে কঙ্কা, তাতে ওর ফর্সা শরীরের দারুণ মানানসই লাগছে। অন্য বাঙালিমেয়ের চেয়ে কঙ্কার শারীরিক উচ্চতা একটু বেশিই, পাঁচ-পাঁচটাচ হবে। সেই সঙ্গে মানানসই দোহারা চেহারা। তার দিঘল, টানটান শরীর যে-কোনও পুরুষের কাছে নিঃসন্দেহে প্রবল আকর্ষণীয়। তবু গত দেড় বছরে শুধু একটু আধটু হাসিঠাট্টার লঘুমুহূর্ত সৃষ্টি করা ছাড়া কঙ্কার প্রতি আর কোনও দুর্বলতা কখনও প্রকাশ করেনি সায়ন। তার দরকারও হয়নি, কারণ দিঘির মতো শান্ত, টলটলে ঐন্দ্রিলাই ছিল তার এই দু' বছরের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন। তবু কঙ্কার ভুরুতে কেন এই কোঁচ, বিরক্তির কারণই বা কী, এমন ভাবতে ভাবতে হঠাৎই ডিক্টেশন দিতে শুরু করে, ডিয়ার স্যর, কাইন্ডলি রিকল আওয়ার ডিসকাশন...

অফিসে এসে প্রতিদিন নিজেই ডাকের চিঠি খোলে সে। ডাক ফাইলের ঝকঝকে খামগুলোর ভেতর থেকে চিঠির পর চিঠি বার করে সামনে মেলে ধরাটা তার কাছে এক ধরনের রোমাঞ্চ। এত বড় দেশটার কত-কত জায়গা থেকে কত জন প্রতিদিন স্মরণ করে তার প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে। কোনও চিঠি ব্যাঙ্গালোর থেকে এল তো পরের চিঠিটা তমলুক কি কোচবিহারের। কোনও চিঠি সিউড়ির তো পরের চিঠি ভিলাই কিংবা জব্বলপুরের। যে চিঠিগুলো জরুরি শুধু সেগুলোই কাছে রেখে বাকি চিঠিগুলো পাঠিয়ে দেয় রিসিপ্ট-ডেসপ্যাচ

-এর ক্লার্ক ঋষিতা তালুকদারের কাছে। জরুরি চিঠিগুলোর মধ্যে যেগুলোর এখনই উত্তর দেওয়া দরকার, তার প্রতিটির ডিকটেশন এভাবে নিজেই দিয়ে থাকে রোজ। যাঁরা চিঠি দিচ্ছেন, তাঁরা পত্রপাঠ উত্তর পেলে খুশি তো হনই, প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের তৎপরতা সম্পর্কে নিশ্চিন্তও থাকেন। সায়নের অফিসের কাজেও একটা অন্য রকম গতির সঞ্চার হয়। নইলে অন্য অফিসারদের ওপর নির্ভর করলে দেখা যাবে, অর্ধেক চিঠি তাদের ড্রয়ারে, কিংবা কোনও ফাইলের দুরূহ কোণে অবহেলায় জিরোচ্ছে। দশ পনেরো দিন পরে হঠাৎ রিমাইন্ডার এলে তখন খোঁজ খোঁজ—

খুবই দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে ডিকটেশন নিতে পারে কঙ্কা। ডিকটেশন নিতে নিতে একদিন হঠাৎই বলেছিল, স্যার, ইংরেজি লেখার ব্যাপারে আপনি বোধহয় খুবই কনজারভেটিভ।

সায়ন একটু অবাক হয়ে তার নতুন রিক্রুটেড্ পি.এ. টির ঈষৎ কৌতুক মেশানো মুখের দিতে তাকিয়েছিল কেন?

—আপনি একেবারে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজিতে ডিক্টেশন দেন। লিখতে গিয়ে আমার পেন্সিলের শিস্ ভেঙে যায়। আর একটু সহজ ইংরেজিতে লিখলে চিঠিগুলো এত বড়ও হয় না বোধহয়।

প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সায়ন। কোম্পানির যিনি অল-ইন-অল, যার সঙ্গে ম্যানেজারিয়াল স্টাফ থেকে শুরু করে মিনিয়্যালস্ পর্যন্ত সবাই প্রবল সমীহ করে কথা বলে সেখানে মাত্র কয়েক মাসও চাকরি হয়নি যে কঙ্কা রায়ের সে কিনা—

ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা বেশ কিছুক্ষণ মগজে ঢালা উপুড় করেছিল সায়ন। স্কুল-লাইফ থেকেই সে এই ভিক্টোরিয়ান ইংরেজিতেই অভ্যস্ত। যে শিক্ষক তাকে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন, তিনিও এমন রক্ষণশীল, পুরানো ট্রাডিশন আঁকড়ে ধরার মানুষ ছিলেন। এত দিনেও তাঁর শেখানো সেই গণ্ডি সে যে পেরোতে পারেনি সেদিন কঙ্কার এই আলটপকা মন্তব্য শুনে উপলব্ধি করেছিল, হুঁ, ঠিকই বলেছে মেয়েটা। একটু পরেই ঘাড় নেড়েছিল, রাইট ইউ আর, বিষয়টা এভাবে ভাবিনি কখনও।

—কিছু মনে করলেন না তো স্যর? পানপাতা-মুখের উপর উড়ে এসে পড়া চূর্ণচুলের গুচ্ছ বাঁ-হাতে সরাতে সরাতে হেসে উঠেছিল কঙ্কা, আমার মাঝেমধ্যে এ রকম উল্টোপাল্টা কথা বলার অভ্যেস আছে। কলেজে পড়ার সময় আমাদের রাশভারী হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টকে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে প্রায়ই বিব্রত করতাম। এমনকি বাংলার অধ্যাপককে একদিন বলেছিলাম, স্যর, কখনও কখনও আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দ বড় কবি, শুনে সেই অধ্যাপক আমাকে মারতে আসেন আর কি। আমি মেয়ে বলে অদ্দূর আর গড়ায়নি ব্যাপারটা নইলে—

কঙ্কা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, হাসির প্রাবল্য একটু বেশিই ছিল বোধহয়, পর মুহূর্তেই সংযত করেছিল নিজেকে, এটা অফিস, বাড়ির বৈঠকখানা নয় বুঝতে পেরে। সায়ন অবশ্য কৌতুক অনুভব করেছিল ঘটনাটায়। এ সব কোম্পানিতে ব্যাবসাজনিত টানাপোড়েন প্রতিটি মুহূর্ত এমন রুদ্ধশ্বাস হয়ে থাকে যে কখনও চটুল পরিহাস হয়তো দরকার। তারপরও অবশ্য মাঝেমধ্যে কাজের অবসর বুঝে কঙ্কা তার যুক্তিতে, শাণিত কথায়, কৌতুকের স্ফুরণে কোনও নতুন ভাবনায় আন্দোলিত করত সায়নকে, ডিকটেশন শেষ হওয়ার পরও দু-একটা লঘু সংলাপে সায়নের চাপ চাপ টেনশন লাঘব করত কিছুটা। কিন্তু আজ নোট নেওয়া শেষ

হতেই সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনই চুপচাপ শব্দহীন, মাথা নীচু করে তার খাতা-পেন্সিল গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল দ্রুত। চেয়ার ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই সায়ন অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, কঙ্কা—

বোধহয় কিছুটা বিস্মিত হয়েই কঙ্কা ফিরে দাঁড়ায় সায়নের দিকে, ভুরুতে তেমনই কোঁচ।

—আর ইউ সিক, কঙ্কা?

কঙ্কা সহসা হতচকিত, তেমনই বিস্ময় নিয়ে বলল, কেন স্যর?

—তোমাকে ক'দিন ধরেই খুব গম্ভীর দেখছি। শরীর ঠিক না থাকলে কয়েকদিন ছুটি নিয়ে বিশ্রাম নিতে পারো। আমি পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের পি.এ. রোহিণীবাবুকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নেব।

সায়নের কণ্ঠস্বরে এমনই দৃঢ়তা ছিল যে, কঙ্কা রায়ের ফরসা মুখখানা মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল, অভিব্যক্তিতে একটা অস্বস্তিও, দ্রুত বলে ফেলল, নো স্যর, আই অ্যাম ও. কে, স্যর।

—ঠিক আছে, এখন যেতে পার, সায়ন আরও গম্ভীর হয়ে বলল।

দ্বিধাজড়িত পায়ে কঙ্কা বেরিয়ে যাওয়ার পর চোখ বুজে কিছুক্ষণ বসে রইল সায়ন। সংবাদপত্রে গত এক মাস ধরে যে সব কুৎসা মেশানো রসালো ঘটনা, তার প্রতিক্রিয়া পর পর প্রকাশিত হয়ে চলেছে, তাতে একটি বাঙালি পরিবারের মেয়ের পক্ষে, সে যত আধুনিকাই হোক না কেন, সায়ন চৌধুরীকে এই মুহূর্তে এড়িয়ে থাকতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক, ইতিমধ্যে একদিন কোর্টে হাজিরা দিতে হয়েছে সায়নকে। গার্গী তার সঙ্গে কোর্টে যেতে চেয়েছিল, সায়ন আঁতকে উঠে বলেছিল, এই কাজটি কোরো না প্লিজ। কাল কাগজে আমার ছবি তো উঠবেই, সঙ্গে তোমার ছবিও। সঙ্গে আর এক প্রস্থ পর্নো-মেশানো স্টোরি। ছবি আর গল্প ছাপাতে চাও তো—

গার্গী অদ্ভুতভাবে হেসেছিল, বদনাম তো হয়েই গেছে। না হয় আরও কিছু মিথ্যে বানিয়ে বানিয়ে লিখবে। কী মিথ্যুক ওরা বলুন! সেদিন দিব্যি লিখে দিল, আমাকে নাকি কোলাঘাট বাংলোয় নাইটি পরা অবস্থায় দেখা গেছে আপনার সঙ্গে। অথচ আদৌ কোনও বাংলোয় যাইনি আমরা। রূপনারায়ণের তীরে বসে জেলেদের মাছ ধরা দেখছিলাম—

সায়ন রেগেমেগে বলেছিল, যত্ত সব রাবিশ।

গার্গী হাসতে হাসতে বলেছিল, তবু ভাগ্যিস লেখেনি রাত্রিবাসও করেছি আমরা। তাহলে লোকে আরও রসিয়ে রসিয়ে পড়ত।

সায়ন গম্ভীর হয়েছিল, যখন হাতি কাদায় পড়ে, তখন ব্যাঙেও তাকে লাথি মারে। সেদিন আমার পি.এ. কঙ্কা রায়কে জড়িয়েও অশ্লীল ইঙ্গিত করেছে পড়েছ?

গার্গী তৎক্ষণাৎ বলেছিল, পড়েছি, এমন কনভিন্সিং ভঙ্গিতে ওরা লেখে যে, প্রথমে বিশ্বাস করেও ফেলেছিলাম। পরে যখন দেখলাম, আমার সম্পর্কেও যা-তা লিখেছে; যা সত্যি নয় তাইই লিখেছে অসহ্য গা-রি-রি করা বর্ণনা দিয়ে, তখন আর ওদের কোনও লেখাই বিশ্বাস করি না।

—তা হলে কোর্টে যাওয়াটা থাক, কী বলো, গার্গী।

গার্গীও সায় দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, তা হলে থাক।

তার চেম্বারের দরজায় সামান্য শব্দ তুলে কঙ্কা ধীর পায়ে বেরিয়ে যেতে সায়ন মনে মনে ঘাড় নাড়ল, কাগজের লোকদের ভয়েই কঙ্কা এড়িয়ে যেতে চাইছে তাকে, অবশ্য ঠিকই করছে সে। কঙ্কা গার্গীর মতো বেহিসেবি নয়, সে তার কেরিয়ার গড়ে তুলেছে অতি সযত্নে! তার

pathagar.net

অফিস-বসের সঙ্গে কতটুকু মিশলে, কতটা কথা বললে, হাসলে, শরীরে কতটা ঢেউ তুললে তার অ্যাম্বিশন ঊর্ধ্বমুখী হবে, তা সে ভালই জানে। এই মুহূর্তে প্যারাডাইসের গুড উইলের গ্রাফ নিম্নমুখী, এখানে তার চাকরির ভবিষ্যৎ এখন শূন্যই বলা যায়। হয়তো সে এর পর চাকরি খুঁজবে অন্য কনসার্নে, কিছু একটা অফার পেলেই তক্ষুণি রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে অব্যাহতি চাইবে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস থেকে। সায়ন অবশ্য তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দেবে তাকে। অমন একটি শিক্ষিতা, চৌখস মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হোক, সে কখনওই চাইবে না।

ভাবতে ভাবতে কয়েক মুহূর্তের জন্য বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে কখন যেন বেল বাজিয়ে ডেকে পাঠিয়েছে কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রকে। বছর বত্রিশের হ্যান্ডশাম, স্মার্ট যুবক, কথাবার্তায় দারুণ শার্প, চেম্বারের দরজা ঠেলে একটা চেয়ার টেনে বসতেই সায়ন জিজ্ঞাসা করে, সেলস-এর খবর কী, মিঃ মিত্র?

বেশ কয়েকদিন পর দেখা হল রোহিতাশ্ব মিত্রের সঙ্গে, স্পষ্টতই তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, ভাল নয়, স্যর। এক মাসে সেল ফল্ করেছে প্রায় অর্ধেক।

—মাই গড্! সায়ন চমকে উঠল, টেবিলের উপর রাখা একটি ফুল-লতাপাতা-ভরা পেপারওয়েট আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছিল, কমার্শিয়াল ম্যানেজারের জবাব শুনে একদম স্টিফ্ হয়ে গেল পেপারওয়েটটা, বলেন কি—

—হ্যাঁ স্যর, অনেক চেষ্টা করছি সেল্ তুলতে, কিন্তু ঠিকমতো রেশপনস পাচ্ছি না। এরিয়া ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিংও করলাম দু-তিনটে—

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সায়ন বলল, দেন, হোয়াট'স্ দ্য ওয়ে আউট?

—কিছু ভাববেন না স্যর, ক'দিন পর আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এক-আধটা খারাপ সময় তো আসতেই পারে কোম্পানিতে, তখন বাজার কিছুটা মন্দা হয়ে যায়। আপনি কয়েকদিন ছিলেন না বলে একটু স্ল্যাক্নেসও দেখা দিয়েছিল ফিল্ড-ওয়ার্কারদের মধ্যে। সামান্য কনফিউশনও, তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ কী হবে এই ভেবে। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া? সায়নের ভুরুতে কোঁচ পড়ল।

আবার ইতস্তত করলেন মিঃ মিত্র, স্যর কাগজে এত লেখালেখি হচ্ছে, তার একটা অ্যাফেক্ট তো কোম্পানির গুডউইলের ওপর পড়বেই। এই ক্রাইসিস্ ফেজটা কেটে গেলেই দেখবেন আবার সব কিছু নর্মাল হয়ে উঠবে।

রোহিতাশ্ব মিত্র যা বলেন একটু স্ট্রেটকাটই বলেন। এই জন্যেই তাকে বেশ পছন্দ হয় সায়নের। কাজেকর্মেও যেমন তুখোড়, কোনও সমস্যার মোকাবিলাও করেন বেশ সোজাসুজি। পেছনে সমালোচনা না করে সামনাসামনি বলাটা অনেক যুক্তিযুক্ত। তাতে কোম্পানির চেহারাটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

—ঠিক আছে, মিঃ মিত্র। ট্রাই ইয়োর বেস্ট।

রোহিতাশ্ব মিত্র 'ও. কে. স্যর' বলে বাইরে গেলেন।

গত কয়েকদিন ধরে অফিসে আসছে বটে সায়ন, কিন্তু সে এতই অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ, দুশ্চিন্তায় ভুরুতে এমন কোঁচ ফেলে আছে যে মন বসাতেই পারছে না কাজে। একে ওকে ডেকে টুকটাক এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করেছে। খোঁজখবর নিয়েছে কোনও কোনও সেকশনের, কিছু হয়তো কাজও দিয়েছে কাউকে, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে মন বসানোর তাগিদ খুঁজে পায়নি। বার বার মনে হচ্ছিল, কার জন্যই বা তার এত পরিকল্পনা, এত খাটা-খাটুনি। ঐন্দ্রিলার কথা যতবার মনে হচ্ছিল, ততই তার ভেতর উসকে উঠছে এক ধারাবাহিক অস্থিরতা।

প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত অফিসে আসেননি আজ। ফ্যাক্টরিতে ফোন করে দেখল, সেখানেও নেই। কাল দেখা হয়েছিল এক মুহূর্তের জন্য, তখন কিন্তু বলেননি, আজ আসবেন না। অথবা হয়তো বলেছিলেন, অন্যমনস্ক ছিল বলে সায়ন শুনতে পায়নি, কিংবা মনে নেই।

তিন-চার দিন ধরে সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে যাতে মন ও শরীরের সম্পূর্ণ জড়তা ঝেড়ে ফেলে আবার আগের মতো শুরু করতে পারে তার দৈনন্দিন রোজনামচা। কিন্তু কী একটা বিপুল অপরাধের বোঝা তার ঘাড়ে চেপে বসেছে যা থেকে বহু চেষ্টা করেও মুক্ত হতে পারছে না। সেল্ ফল করেছে, তার অর্থ গত এক মাসের প্রোডাকশনের অনেকখানি স্টক জমে গেছে। স্টক পাইলিং হয়ে যাওয়া মানে টাকা ব্লকড হয়ে যাওয়া। তার মানে ব্যাঙ্কে বিরাট অঙ্কের সুদ গুনতে হবে। সব মিলিয়ে—

না কি, সে অফিসে ছিল না বলে গত এক মাসে ঠিকমতো প্রোডাকশনও হয়নি। কৌশিক দত্ত অবশ্য তাতে একবারও বলেনি সে কথা। গত কয়েকদিন বেশ কয়েকবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল সায়ন। নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে, ড্যামেজড্ প্ল্যান্ট নিয়েই বা কিছু আলোচনা, প্ল্যানিং হয়েছে। পাইলিং-এর ব্যাপারে নয়। কিন্তু যদি পাইলিং হয়ে থাকে, তাহলে কোন্ প্রোডাক্টটা—রোজবেরি না ড্রিমবাথ! নাকি দুটোই! আগেকার প্রোডাক্টের সেল যদি আগের জায়গায় ধরে রাখা না যায়, তবে নতুন প্রোডাক্টের ভাবনা তো আরও পিছিয়ে দিতে হবে। না কি, এক্ষুনি নতুন কোনও প্রোডাক্ট শুরু করে দেওয়াটাই উচিত?

এত সব ভাবনা একসঙ্গে মাথার ভেতর ভিড় করে আসায় অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল তার। একটা রাইজিং কনসার্ন হঠাৎ কীভাবে এক অভাবিত দুর্ঘটনার ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না। এখন এহেন ক্রাইসিস থেকে উদ্ধার পেতেই হবে তাকে। তার জন্যে দরকার নতুন উদ্যোগ, নতুন কোনও পরিকল্পনা। আবারও নিজেকে উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে কাজের মধ্যে।

হঠাৎ তার ভাবনার তার ছিঁড়ে বাইরে প্রথমে তিনবার টক্ টক্ টক্ শব্দে নক্। তার পর সুইংডোর ঠেলে যিনি সায়নের ঘরে ঢুকলেন তিনি মধুমন্তী রায়মজুমদার, কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার। সায়ন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, বসুন, মিসেস রায় মজুমদার।

—স্যর, এ ক'দিন অফিসে এসেছেন, কিন্তু আমাকে একবারও ডাকেননি, তাই নিজেই চলে এলাম, সামনের চেয়ারে ছড়িয়ে বিছিয়ে বসে কাঁধের শাড়ি বিন্যস্ত করতে করতে মধুমন্তী বললেন।

সবুজ-হলুদ প্রিন্টের চমৎকার একটি সিল্কের শাড়ি পরেছেন মধুমন্তী, কপালে বড় করে একটা টিপ, তাতে ওঁর চওড়া কপালে বেশ মানানসই লাগছে, রোজ টিপের রং-ও বদলে যায় শাড়ি-ব্লাউজের রঙের সঙ্গে ম্যাচ করতে। আজ পরেছেন সবুজে-হলুদে মেশানো টিপ। বয়স বত্রিশ তেত্রিশের মতো হবে, কিন্তু এমন চমৎকার শরীরের বাঁধুনি আর মুখের গড়ন যে পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি মনেই হয় না। হাতে শাঁখা বা কপালে সিঁদুর কোনওটাই নেই, অথচ নাম লেখেন মিসেস—। এ ব্যাপারে কখনও কৌতূহল প্রকাশ করেনি সায়ন, তবু কারও কাছে যেন অস্পষ্ট শুনেছিল ভদ্রমহিলা ডিভোর্সি।

এ-কোম্পানিতে জয়েন করার পর থেকেই মধুমন্তী বরাবর কেমন বিষণ্ণ, নিষ্প্রভ হয়ে থাকতেন অথচ মুখশ্রী কী চমৎকার, যখন হাসেন, একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য ছড়িয়ে থাকে সমস্ত

pathagar.net

শরীরময়। বিষণ্ণ সৌন্দর্যই। এই সৌন্দর্যও যে কতটা নজর কাড়তে পারে একজন পুরুষের তা মধুমন্তীকে না দেখলে বোঝা যায় না।

আজ কিন্তু মনে হচ্ছে, মধুমন্তী কেন যেন বেশ খুশি খুশি। সেই খুশিয়াল রেশ ঝরে পড়ল তার গলার, স্যর, বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কোনও ডিসিশন নিইনি আপনার অ্যাব্‌সেন্সে। বিভিন্ন কাগজের লোকেরা অনবরত আসছে। সবাইকে বলেছি, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে।

অন্য দিনকার তুলনায় বেশ ফ্রিও লাগছে আজ মধুমন্তীকে। চোখের কোণে জমে থাকা বিষণ্ণতার রেশটুকু আজ তেমন নেই। একটু বেশি সেজেওছেন মনে হচ্ছে। আগে ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক লাগাতেন, আজ গাঢ় রক্ত রঙের লিপস্টিক গ্লেজ দিচ্ছে দারুণভাবে। ব্যাপার কী, নতুন করে কারও প্রেমে পড়লেন নাকি মধুমন্তী!

—স্যর, সেল ফল করেছে শুনে আমিও খুব দুশ্চিন্তায় আছি। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে নতুন একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়। এই মুহূর্তে আমাদের অ্যাডের খানিকটা ডাইভার্সান করাই উচিত। মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল। নতুন কোনও থিম্ পেলে অনায়াসে ভুলে যায় পুরানো সব কথা। পুরানো অ্যাড্ বদলে নতুন কয়েকটা লে-আউট কাগজে ছাপালেই দেখবেন আমাদের প্রোডাক্ট আবার বাজার ধরে নিয়েছে।

সায়ন ঘাড় নাড়ল, হুঁ, ঠিক আছে—

—এক উঠতি ফিল্ম-আর্টিস্ট আমার প্রায় বান্ধবীর মতো। বোম্বে গিয়ে সিরিয়াল করে খুব নাম করেছে। দশ-বারো করে নেয়, আমি বললে হাজার পাঁচেকে রাজি হয়ে যাবে আমাদের কোম্পানির মডেল হতে। ওতে দিয়ে কয়েকটা অ্যাড করাই। নতুন ক্যাপশনে নতুন লে-আউটে।

সায়ন আবার ঘাড় নাড়ল, অনুমোদনের ভঙ্গিতে। মধুমন্তী রায়মজুমদারের মাথায় এসব ব্যাপারে বেশ আইডিয়া-টাইডিয়া খেলে। চমকপ্রদ ক্যাপশন দিয়ে ভাল অ্যাড করানোর ব্যাপারে কিছুটা খ্যাতি হয়েছে। একজন তরুণ আর্টিস্টকে ধরে এনে তাকে নিজের মতো করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছেন। একটা নামী অ্যাডভার্টাইজিং সংস্থার থ্রু দিয়ে রিলিজ করাচ্ছেন বিজ্ঞাপনগুলো। তাতে ওই অ্যাড এজেন্সি কমিশনের একটা পার্সেন্টেজ নিয়ে নেয় বটে, কিন্তু তাতে বড় কাগজগুলো থেকে ক্রেডিট পাওয়া যায়। ক্যাশ ডাউন করতে হয় না সঙ্গে সঙ্গে।

রোজবেরি আর ড্রিমবাথ দিয়ে গত বছর চমৎকার একটা টিভি অ্যাডও করিয়েছেন মধুমন্তী। কম্পোজিশনটা দারুণ হয়েছিল। প্রায় স্বপ্নের মতো একটা দৃশ্য। চারদিকে শুধু নীল, নীল আর নীল। তার ভেতর একটা বাথটাবে শুয়ে আছে নীল সাবানের ফেনায় মাখামাখি একটি সুন্দরী যুবতী। স্বপ্নের মতো তার চোখদুটো। সে একবার মিষ্টি করে হাসতেই বাথটাবটা হঠাৎ রূপান্তরিত হল বিশাল একটি অ্যাকোয়ারিয়ামে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও পরিণত হল এক মৎস্যকন্যায়। মৎস্যকন্যার মতো ডানা দুলিয়ে সে সাঁতার কাটতে থাকে অ্যাকোয়ারিয়ামের নীল জলের ভেতর। সেই সঙ্গে সারাক্ষণ জলতরঙ্গের একটা মিহি সুর বেজে চলেছে। অ্যাড-ফিল্মটা টিভিতে রিলিজ করার পর সে সময় অনেকের মুখেই প্রশংসা শুনেছিল সায়ন। সেও রিটার্ন থ্যাংকস জানিয়েছিল মধুমন্তীকে।

মাসখানেক আগেও তাদের নতুন প্রোডাক্ট মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার নিয়েও একটা অভিনব অ্যাড-ফিল্ম করানো হবে এমন ভাবাভাবি চলছিল, ঠিক সে সময়ে সায়নের জীবনে এই দুর্ঘটনা।

pathagar.net

—ঠিক আছে, গো অ্যাহেড, সায়ন তার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের ভাবনাচিন্তা অনুমোদন করে দিতেই 'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যর' বলে হেসে উঠে পড়লেন মধুমন্তী। তার চলে যাওয়ার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সায়ন। ভদ্রমহিলার স্বামী নেই, অথবা থেকেও নেই। তাকে দেখে সায়নের মনে বরাবর একধরনের সহানুভূতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। আজ তার উচ্ছল খুশিয়াল চেহারা দেখে সায়নের ভালই লাগল।

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ শ্লথ হয়ে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে রইল সে। চোখদুটো বোজানো। এক ধরনের ডিপ্রেশন তার সারা শরীর ও মনে জাঁকিয়ে বসছে দ্রুত। সারাক্ষণ এমন এক ক্লান্তি থাকে অবশ করে তুলছে যা তার চরিত্রের মানসিক গঠনের বিরোধী। যে কোনও ঝড়ঝাপটাকেই সে প্রতিহত করে এগিয়ে গিয়েছে এতকাল। অতিক্রম করেছে সমস্ত বাধাবিপত্তি। তার অ্যাম্বিশন ছিল আকাশছোঁয়া। অন্যের চেয়ে, অন্যকে ছাড়িয়ে বড় হতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তা কেবল নিজের প্রতিভা আর শ্রমের জোরে। কোনও অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নয়। লাইম ইন্ডিয়া কিন্তু তার এই সাফল্যকে কখনও ভাল চোখে দেখেনি। গত কয়েক দিন আগেই এক অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কাগজে, 'স্বপ্নস্নান আর স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন, তার থেকে দূরে থাকুন।' তারপর আর একদিন, 'গোলাপে কণ্টক থাকে, মাখতে গেলে গায়ে লাগে।'

সায়ন বুঝতে পেরেছে ড্রিমবাথ আর রোজবেরিকে আক্রমণ করে এই বিজ্ঞাপন। আর তা প্রকাশিত হয়েছে লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায়ের নির্দেশ। অর্থাৎ লাইম ইন্ডিয়া অলক্ষ্যে প্যারাডাইসের প্রোডাক্টকে হেয় করে তুলতে চাইছে মানুষের চোখে। বুদ্ধিমান মানুষের তো আর অভাব নেই দেশে। তারা ঠিকই আলোচনা করবে বিজ্ঞাপনগুলো নিয়ে। হাসাহাসি করবে। তারপর হুইস্পারিং চলবে পথেঘাটে, ট্রামে-বাসে, কী ব্যাপার, তা হলে রোজবেরি আর ড্রিমবাথ!

প্যারাডাইসের সেল যখন হু হু করে পড়ে যাচ্ছে, তখন এই বিজ্ঞাপন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো। মধুমন্তীর সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করবে ভেবে রেখেছিল, একদম ভুলে গেছে অন্যমনস্কতায়।

এখন চারদিকের এই ছোবল এড়াতে একটা কিছু পরিত্রাণের পথ খুঁজে বার করতে হবে তাকে। এত বড় অফিস, এমন বিশাল এস্টাব্লিশমেন্টে, এত লোকের জীবিকা, তার মানসম্মান সব জিইয়ে রাখতে গেলে নতুন কোনও ওয়ে-আউট বাতলাতে হবে তাকে। মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশন আরম্ভ হওয়ার আগেই বন্ধ করে দিতে হল এক আচম্বিত দুর্ঘটনায়। কেন যে হঠাৎ প্ল্যান্ট বার্স্ট করল তার কারণও বেশ রহস্যময় রয়ে গেল তার কাছে। এও কি তা হলে আর এক স্যাবোটেজ? কার হাত আছে এর পেছনে। লাইম ইন্ডিয়ার নয় তো! তার কানে এসেছে, তাদের মেশিন বার্স্ট করায় ভারি খুশি হয়েছেন লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান। তার প্রোডাক্ট মার্কেটে বেরোলে সায়ন নিশ্চিত ছিল, লাইম ইন্ডিয়ার 'হোয়াইট-ওয়াশ' বাজারে মার খেয়ে যাবে। লাইম ইন্ডিয়ার কাছে সেটা হত একেবারে দুঃস্বপ্নের মতো। সেজন্যে কি তারাই—

লাইম ইন্ডিয়ার ভাবনাটা মাথায় কয়েক বার রোল খাওয়ার পর সায়ন হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল, ডিটারজেন্ট পাউডার যখন বাজারে ছাড়া যাচ্ছে না, তখন নতুন কোনও একটা স্নানের সাবান তৈরি করবে সে। রোজবেরি কিংবা ড্রিমবাথের মার্কেট যখন মন্দা করছে, তখন নতুন কোনও

প্রোডাক্ট মার্কেটিং করাই হবে সবচেয়ে সহজ কাজ। একেবারে আনকমন একটি প্রোডাক্ট। নতুন নামে, নতুন গন্ধে, নতুন রঙে। ভাবতে ভাবতে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। তা হলে আরও একবার তাকে ম্যাজিক দেখাতে হবে। নতুন ফর্মুলায় নতুন সাবান। আরও একবার তার ল্যাবরেটরিতে নতুন ফর্মুলার উৎস সন্ধানে ডুব দিতে হবে, হুঁ ঠিকই, দ্যাটস দ্য আইডিয়া। লাফিয়ে উঠল সায়ন।

ঠিক এই মুহূর্তে একটি ফোন বেজে উঠল তার টেবিলে, রিসিভার তুলে বেশ প্রসন্ন মেজাজেই বলল, হ্যালো, কে, গার্গী? কী ব্যাপারে, কদিন একদম দেখা নেই কেন? আমাকে ভুলে গেলে নাকি!

কিন্তু একটু পরেই টেলিফোনের ওদিককার কথা শুনতে শুনতে সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। গার্গীর প্রতিটি সংলাপ ভূমিকম্পের মতো কাঁপাচ্ছে তার শরীর। তার বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সব।

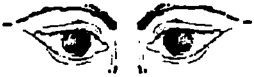

রিসিভার হাতে নিয়ে সায়ন বসেই থাকে নির্বাক, রক্তশূন্য মুখে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের হাজারো ভাবনায় যখন সে বিপর্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, ঠিক তখনই গার্গী তাকে জানাল আর এক কঠিন বার্তা। এতই জটিল সে সমস্যা যে সায়ন এখন তাকে নিয়ে কী করবে সে কথা ভাবার এতটুকু সময় পর্যন্ত তার সামনে নেই।

গার্গীকে সে এতকাল চিনে এসেছে, একভাবে, এখন দেখছে, সে নতুন এক ভূমিকায় অবতীর্ণ। সে-ভূমিকা সায়নের অভিভাবকের। সায়নও এই প্রবল ঝোড়োঝাপটের ধাক্কায় বেসামাল হয়ে তাকেই আঁকড়ে ধরেছিল খড়কুটোর মতো। তাতে সে নিজে কিছুটা সামলে উঠলেও প্রবল ক্ষতি হয়েছে গার্গীর। তার সঙ্গে গার্গীকে জড়িয়ে এমন অনেক রসালো খবর প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে, যার অনেকটাই সত্যি নয়। তবু লোকে তাইই বিশ্বাস করে যা প্রকাশিত হয় ছাপার অক্ষরে।

এত সব ভাবতে ভাবতে সায়ন তার টেবিল গুছিয়ে, ব্রিফকেস বন্ধ করে দ্রুত নেমে এল নিচে। পার্ক করে রাখা গাড়িটির চালকের আসনে বসে সেল্‌ফ্‌ অন্‌ করল মুহূর্তে। তারপরই বাঁই করে চকোলেট রঙের মারুতি বার করে আনল কলকাতার প্রধান রাস্তায়। দ্রুত পার হতে লাগল রাজপথ, ক্রশিংয়ের পর ক্রশিং।

এসপ্ল্যানেড ইস্টে রোজই কোনও না কোনও মিটিং, প্রতিবাদ। তাতে রাস্তা বন্ধ থাকে। ভাগ্যক্রমে আজই কোনও জমায়েত বা মিটিং ছিল না। সন্ধেও নেমে আসছে ততক্ষণে। চৌরঙ্গি মোড় সেজেগুজে ক্রমশ রূপসী হয়ে উঠছে, কিন্তু সায়নের চোখে এখন আর কোনও রং নেই। এখন তার চারপাশে ধূসর আলো আরও ম্লান হয়ে আসছে দ্রুত। মাত্র কয়েকদিন আগেও তার পৃথিবী ছিল আলো ঝলমলে, বর্ণাঢ্য, রঙিন। এই অল্পসময়ে আমূল বদলে গেছে সমস্ত পটভূমিকা। এক অনন্ত লোডশেডিং চলছে তার জীবনযাপনে।

ঐন্দ্রিলা ছিল, আর ঐন্দ্রিলা নেই—মাত্র একটা শব্দের পরিবর্তনে তার জীবনে এখন পর-পর এলোঝড়। সে-ঝাপট তাকে এখন সামলাতে হবে অভিমন্যুর মতো, একা, নিরুপায়ভাবে।

pathagar.net

গাড়ি প্রায় টপ্-গিয়ারে রেখে দ্রুত সায়ন ফিরে এল তাদের ফ্ল্যাটে। বেশ একটু জোরেই চালিয়েছে আজ, কিছুটা উত্তেজনায়ও বটে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে টার্ন নেওয়ার পর ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে একটা ছোট দুর্ঘটনা হতে হতেও সময়মতো ঘুরিয়েছে তার স্টিয়ারিং। গাড়ি গ্যারাজে না ঢুকিয়ে, লনের ওপর রেখেই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে।

গার্গী যেমন বলেছিল ফোনে, তার কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে। সেন্টার-টেবিলের সামনে সোফার ওপর বসে আছে একটা অসহায়-অসহায় মুখ করে, প্রায় নীরক্ত, বেবাক্ হয়ে। গার্গীর চলে আসার কারণ আগেই ফোনে শুনেছিল সায়ন, শোনার পর থেকেই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা তার। হঠাৎ একটি কুমারী মেয়ে বাড়ির অভিভাবকদের সঙ্গে বিবাদ করে যদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, সঙ্গে সুটকেস, আর আশ্রয় নেয় এমন একজনের বাড়ি, যার জীবনযাপনে চলছে এক তীব্র টানাপোড়েন, তার ওপর সে পুরুষটি যদি মাত্র একা বসবাস করে ফ্ল্যাটে, এমনকি তার ঘরে একটি ঠাকুর-চাকরও নেই, তবে তার অবস্থা কী দাঁড়ায়। হঠাৎ কী কারণে গার্গী এমন একটি সিদ্ধান্ত নিল, এমন অতর্কিতে, তা সায়ন জানে না। শুধু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছে, ও বাড়িতে আর থাকা গেল না, সায়নদা—

অথচ সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, ঘরে টিউব জ্বলছে, মনে হচ্ছে'বুঝিবা এখন অনেকটা রাত, এই সঙ্কটের মুহূর্তে এহেন গার্গীকে নিয়ে সায়ন এখন কী করবে! কীই বা করা উচিত তার?

গার্গীর মুখে অসহায় চাউনি দেখে ঘেমে নেয়ে উঠল সায়ন। এপ্রিলের শেষাশেষি ঘরের ভেতর ফুল-স্পিডে ফ্যান চলতে থাকা সত্ত্বেও ভ্যাপ্সা গরম। সে গরম কিছুটা উত্তেজনাতেও।

সায়ন চোখ ফিরিয়ে গার্গীর সুটকেস, ব্যাগের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। মুখে একটুকরো ছায়াও ঘনিয়ে এল, বোধহয়, তা সত্ত্বেও হাসতে চেষ্টা করল, কী হল, হঠাৎ এরকম ডিসিশন নিতে হল কেন?

গার্গী সায়নের চোখমুখ দেখে মুহূর্তে বুঝে ফেলল সব। মেয়েরা এভাবেই বোঝে পুরুষের চাউনি, দেখলেই তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব পলকে উপলব্ধি করে ফেলে। তৎক্ষণাৎ বলল, তাহলে চলে যাব?

সায়ন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, দাঁড়াও। চলে যেতে বললাম নাকি? জানতে চেয়েছি, কী হয়েছিল। কার সঙ্গে ঝগড়া হল, দাদা, না বউদি?

—দু'জনের সঙ্গেই, বলে গার্গীও হাসার চেষ্টা করল, এরকম তো মাঝেমধ্যেই হত, কিন্তু এ ক'দিন ধরে ভীষণ চলছিল। আজ সকালে অফিস বেরোবার মুখে দাদা বলে গেল, তোর জন্যে আর লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারছি না। অফিস থেকে ফিরে এসে যেন এ বাড়িতে আর তোকে না দেখি।

হাসছিস গার্গী, হঠাৎ শেষ কথাগুলো বলার সময় তার চোখে জল এসে গেল।

গার্গীর চোখে জল! সায়ন ভাবতে পারে না। গার্গীর শৈশব-কৈশোর কেটেছে এক প্রবল যুদ্ধের ভেতর। তার বাবা নেই ছোটবেলা থেকেই, মা কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করে মানুষ করেছিলেন দুই ছেলে-মেয়েকে। সুশোভন লেখাপড়ায় মোটামুটি মেধাবীই ছিলেন, নিজের অধ্যবসায়ের জোরে তিনি এখন ভাল কোম্পানির এক্সিকিউটিভ পোস্টে। জুনিয়র এক্সিকিউটিভ বলেও মাইনে পান ভালই। জুবিলি পার্কের এই ভাড়া বাড়িতে আছেন বহুকাল। কোম্পানি থেকে লোন নিয়ে নতুন ফ্ল্যাট কিনে চলে যাবেন খুব শিগগির। গার্গীর মা যখন মারা

যান, তখন গার্গী কলেজ ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখনও ভাই-বোনের সম্পর্ক ভালই ছিল। এমনকি সুশোভন চাকরি পেয়ে বিয়ে করার পর পর্যন্তও। তারপর হয়তো—

ছাত্রী হিসেবে গার্গীও কম মেধাবী ছিল না, কিন্তু প্রচণ্ড জেদি, একগুঁয়ে মেয়ে বলে বরাবরই তার সামনে কোনও সুস্পষ্ট নিশানা ছিল না। সে কখনও ভেবেছিল গণিতের অধ্যাপিকা, না হলে শিক্ষিকা হবে। কখনও ভাবত, ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। তথ্য সংগ্রহের নেশাটা এখনও আছে। এর মধ্যে হঠাৎ সোসিও-ইকোনমিক রিসার্চ আকাডেমি নামের এক সমাজ-সংস্কারের সংস্থায় ঢুকে পড়েছে, তাতে কখনও সমাজ-সংস্কারক হবে এমন ইচ্ছের কথাও একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল। আসলে যখন সে বিষয়ে সে মনোনিবেশ করে, খুব সিরিয়াসলিই করে। পরে নতুন বিষয় এলে ঝুঁকে পড়ে সেদিকেই। এভাবেই চলছিল বেশ, হঠাৎ এই এলো ঝড়ের ভিতর ঢুকে পড়ে সায়নের সঙ্গে তার জীবনটাও এলোমেলো, ছন্নছাড়া হয়ে উঠেছে সহসা।

সায়ন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল গার্গীকে। এই মুহূর্তে তাঁকে ভীষণ দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছে। সেরকমই ম্লান, নিঃস্ব, বিধ্বস্ত মুখেই বিড়বিড় করছিল, আসলে কি জানেন, সারা দুপুর ভেবেও ঠিক করে উঠতে পারিনি, দাদার আশ্রয় ছেড়ে এখন কোথায় যাব। তেমন কোনও আত্মীয় নেই, কিংবা কোনও নিকট-বান্ধবী, যার কাছে গিয়ে ক'দিনের জন্য উঠতে পারি। যতক্ষণ না কোনও একটা নিজস্ব আস্তানা খুঁজে বার করা যায়। কঙ্কার বাবা-মা তাঁদের মেয়ের শোকে এমনই পাগল যে সেখানেও যাওয়ার মতো সাহস অর্জন করতে পারিনি—

ফ্ল্যাটের জানলার বাইরে যে তারাভরা কলকাতার আকাশ সেদিকে তাকিয়ে আপনমনে কথাগুলো বলে চলেছিল গার্গী। মাত্র কদিন আগেই সে তার দাদা-বউদির কাছে বলে ফেলেছিল, 'আমি সায়নদাকে বিয়ে করব ঠিক করে ফেলেছি', এখন সায়নের বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, সে নিতান্তই কল্পকথা। এই মুহূর্তে সে বুঝে ফেলেছে, হঠাৎ খেয়ালের বশে, ঝোঁকের মাথায় সে এগিয়ে এসেছে অনেকদূর। এখন আর এক-পাও এগোনো যাবে না, ফিরে যে যাবে সে আরও কঠিন, কঠিনতর কাজ। তবু তো ফিরতেই হবে তাকে, তাই উথলে ওঠা কান্নার দমক চেপে অস্ফুট গলায় বলল, আছে কোনও আস্তানা আপনার সন্ধানে, যেখানে থাকা যাবে অন্তত ক'দিন?

—দাঁড়াও, এত অস্থির হচ্ছ কেন, এমন বলল সায়ন, তার এই একলা-একা ফ্ল্যাটে কোনও মতেই রাখা যায় না গার্গীকে—ভাবতে ভাবতে নিজেকে গুছিয়ে ফেলল সহসা, হেসে ফেলল, এতক্ষণের টেনশনপীড়িত অস্বস্তি, বিব্রতভাব কাটিয়ে, দ্রুত বদলে ফেলল পটভূমিকা, যেন কিছুই হয়নি এমন সাবলীল হয়ে বলল, ঠিক আছে, সে একটা আস্তানা খুঁজে বার করা যাবে'খন। আপাতত দু'কাপ কফি করে আনো তো। অফিস থেকে ফেরার পর কফি না পেলে মেজাজটা ঠিক আগে বাগে আনা যায় না। মগজও ঠিকঠাক কাজ করে না যেন—

গার্গীর মুখ থমথমে, গম্ভীর, কিছু একটা আলোর ঝিলিক সায়নের চোখে পড়েছে এমন মনে হল। আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, চেনা একটা মানুষ কখনও ঝঞ্ঝাটে পড়লে কেমন অচেনা হয়ে যায়। সায়নও তার কাছে এই মুহূর্তে যেন অন্য এক গ্রহের মানুষ। ইচ্ছে করলেও তাকে আর ছুঁতে পারবে না। কী অদ্ভুত সে, কী নিষ্ঠুর! পরক্ষণেই ভাবল, সায়ন নিশ্চই তার সিদ্ধান্তে ঠিক, সেইই বিচক্ষণ। গার্গীই এক বিচিত্র ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে চলেছে ক'দিন ধরে। তাতে ক্রমাগত জটিল ছিন্নভিন্ন হয়ে উঠেছে তার জীপনযাপন। সায়ন যেদিন কাস্টডি থেকে মুক্তি পায়, সেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে না গেলেই হয়তো সবচেয়ে ভাল হত।

অন্যমনস্কভাবেই গ্যাস জ্বেলে দু-কাপ কফি তৈরি করে নিয়ে এসে বসল গার্গী, আবহাওয়া

pathagar.net

লঘু করে ফেলার জন্য একটু হাসল, সত্যিই খুব বিপদে ফেলেছি আপনাকে। কিন্তু আমিও তো বিপন্ন। হঠাৎ সেই মুহূর্তে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে যদি আপনার কথা আমার মনে পড়ে থাকে তা হলে আমি কী করব? গত দু-তিন বছর এত প্রশ্রয় দিয়েছেন আমাকে—

কফিতে বেশ শব্দ করে চুমুক দেয় সায়ন, গাঢ় বাদামি ধোঁয়া-ওঠা কফি, বেশ কড়া, একটু কড়াই দরকার ছিল সায়নের, গরম স্বাদ জিভ বেয়ে কণ্ঠনালিতে যেতেই বেশ চনমনে হয়ে উঠল তার শরীর। হেসে বলল, সত্যিই। এখন মনে হচ্ছে, আমার এখানে না এসে অন্য কোথাও গেলে সবচেয়ে আশ্চর্য হতাম আমিই। হয়তো ভীষণ রেগেও যেতাম। যেদিন কাস্টডি থেকে বেরোলাম, সেদিন একমাত্র তুমি, তুমিই তো এসেছিলে আমাকে নিতে—

কফিতে চুমুক দিতে দিতে আবারও আন্‌মনা হয়ে যাচ্ছিল গার্গী। সে যে সায়নের ঝড়ঝাপটের ভেতর একটা বাড়তি বোঝা হয়ে উঠল ভেবে একটুও স্বস্তি পাচ্ছে না। এর পর সায়ন কী বলবে, কী করবে তাকে নিয়ে এ ভাবনা পীড়িত করছে তাকেও।

কফি খাওয়া শেষ হতেই সায়ন উঠে দাঁড়াল, চলো, তোমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যাই—

গার্গী বিস্মিত হয়ে তাকাল, কোথায়?

শব্দ করে হাসল সায়ন, কোথাও একটা আস্তানার সন্ধান তো বার করতেই হবে। নইলে এক যুবতী হঠাৎ যদি এভাবে একলা-পুরুষের ঘরে রাত কাটায়, সেটা কি ভাল দেখাবে, গার্গী?

গার্গীও উঠে দাঁড়াল, খুব গভীরভাবে তাকাল সায়নের দিকে, আমার কিন্তু আপনার ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে।

—আমারও নিজের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে, সায়ন গার্গীর চোখের দিকে চোখ রাখে, কিন্তু পাবলিকের নেই। একজন পুরুষ আর একজন নারী এক বাড়িতে রাত কাটিয়েছে, আর তৃতীয় প্রাণীটি নেই যে ফ্ল্যাটে, মানুষ ধরেই নেবে তারা এক বিছানায় রাত কাটিয়েছে।

গার্গী হঠাৎ কেঁপে উঠল নিজের ভেতরে, কী বলবে ভেবে পেল না। সায়নই আবার বলল, তাও একজন খুনি আসামির সঙ্গে। সেটা তোমার পক্ষে নিশ্চয় স্বস্তির হবে না।

ভীষণ রেগে উঠল গার্গী, এই 'আসামি' শব্দটা ব্যবহার করতে কি খুব ভাল লাগে আপনার? যখন আপনি জানেন, মিথ্যে করে জড়ানো হয়েছে আপনাকে?

সায়ন হাসল, সে হাসি ম্লান, হয়তো ক্ষোভে, অপমানে মেশানো, বলল, সারা পৃথিবীর লোক যখন বলছে, সায়ন চৌধুরীই খুন করেছে, তখন আমার আর নিস্তার পাওয়ার পথ কোথায়? তুমি কি জানো, আমার স্টেনো পর্যন্ত আমার কাছে ঘেঁসতে চাইছে না। আমার নিঃশ্বাসেও এখন বিষ। কে যে আমার এমন ক্ষতি করে গেল, সেটাই প্রতি মুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত করছে আমাকে? চূর্ণ হয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত।

গার্গী সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। দরজা লক্ করে সায়ন নেমে এল তরতর করে। গাড়ি ফের স্টার্ট দিল চাবি ঘুরিয়ে, হু-হু করে বেরিয়ে এল শরৎ বসু রোডে, গার্গীকে পাশে বসিয়ে নিয়ে। গার্গীর একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে, কোন জাহান্নামে,' কিন্তু করল না, সে এখন সায়নের কাছে সমর্পণ করেছে নিজেকে। শুধু যেতে যেতে বলল, যে হত্যাকারী তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না?

সায়ন ততক্ষণে দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে পৌঁছে টার্ন নিয়েছে গড়িয়াহাটের দিকে। রাত্রি প্রায় আটটার মতো। কলকাতা শহর এমনি সবচেয়ে জমজমাটি, বর্ণময়। আলোর ফুলকি দোকানে-দোকানে, লাইটপোস্টে, সার সার বাড়ির একতলা-দোতলা-বহুতল জানলায়।

pathagar.net

লোডশেডিং না থাকলে প্রথম রাত্রির কলকাতা তো বিলাসের তুঙ্গে থাকে। গড়িয়াহাট ক্রশিংয়ের ঝলমলে অহঙ্কার পার হয়ে বিজনসেতু উঠতে উঠতে সায়ন বলল, সবাইই তো খুঁজছে। পুলিশ, সাংবাদিক, কোর্ট—সবাই। তাদের প্রতিটি আঙুলই তো এই সায়ন চৌধুরীর দিকেই তুলে ধরা।

গার্গী তখন তীক্ষ্ণ জরিপ করছে সায়নকে, হঠাৎ বলল, এ ক'দিন প্রসঙ্গটা তুলিনি। কাগজে নানারকম পড়ছিই শুধু, আর তা থেকেই নানারকম ধারণা করে নিচ্ছি। এখন বুঝতে পারছি, প্রকৃত রহস্য বোধহয় আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। আচ্ছা, সত্যিই বলুন তো, কী ঘটেছিল সেদিন রাতে? আপনার কী মনে হয়?

সায়ন গাড়ি চালাতে চালাতে আনমনা হয়ে যাচ্ছিল, বোধহয় সে রাতের বীভৎস স্মৃতি ফিরে আসছিল তার মগজে, আর চমকে উঠছিল বারবার। তেমন অন্যমনস্ক স্বরেই বলল, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুকে আমি আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই ভাবিনি প্রথমে। একাই ঘরে ছিল ঐন্দ্রিলা সেদিন। আমি বাইরে ট্যুরে গেলে প্রায়ই এভাবে একা থাকত। কতবার বলেছি, তার বাবা-মা'র ওখানে গিয়ে থাকতে, প্রথম-প্রথম গিয়ে থাকতও, পরে আর যেত না। বলত, বাড়ি ফাঁকা রেখে যাওয়া ঠিক নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে একা একজন মহিলার পক্ষে সুইসাইড করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অবাক হয়ে ভেবেছি, কেনই বা? সে-কথা আকাশ-পাতাল ভেবেও কিনারা করতে পারিনি। কিন্তু পুলিশ ইন্সপেকটর দেবাদ্রি সান্যাল সেদিন বললেন—

—কী বলবেন? গার্গী উৎসুক হল।

জানালেন, ইট'স নট এ কেস অব্ সুইসাইড, মিঃ চৌধুরী, ইর্টস এ মার্ডার। পোস্টমর্টেম থেকে জানা গেছে, প্রথমে গলা টিপে হত্যা করে, তারপর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, বলতে বলতে শিউরে উঠল সায়ন সে দৃশ্য কল্পনা করে, আমি আজও বুঝতে পারি না, কে বা কার দ্বারা এ হত্যাকাণ্ড সম্ভব। দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, ভেবে দেখুন ব্যাপারটা পাশেই আপনার মা ও ভাই থাকেন, আপনার সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না, কথা পর্যন্ত নয়, এ ক্ষেত্রে—

—ও, গার্গী কয়েক লহমা কিছু যেন ভাবল, তারপর ফের তাকাল সায়নের দিকে, আর কী বললেন পুলিশ ইন্সপেকটর?

—উনি তো আমাকে বার বার বলেছিলেন, মিঃ চৌধুরী, সে-রাতে আপনি বাড়িতে ছিলেন না, তা কিন্তু এখনও ঠিকঠাক প্রমাণ করতে পারেননি। বিলাসপুর থেকে আপনার ফেরার কথা পাঁচ তারিখ থেকে সকালেই। আপনার কাছ থেকে ট্রেনের টিকিটও পাওয়া গেছে ওই তারিখেই। অথচ আপনি বলছেন, ফিরেছেন হত্যার পর ভোররাত্রে—, অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ছ'তারিখ ভোরে। কেন একদিন দেরি হল তার কোনও বিশ্বাসযোগ্য কারণ এখনও দেখাতে পারেননি কিন্তু।

গার্গী ঠিক একই প্রশ্ন করল, কেন ফেরেননি?

সায়ন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সে কথা এখন থাক, গার্গী, পরে একসময় বলব

—ফেরার সময় আপনার সঙ্গে কেউ ছিল?

—ছিল, সায়ন ঘাড় নাড়ল, আলো বোস—

গার্গী চকিতে সায়নের দিকে তাকাল একবার। অন্ধকারে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না তাকে। দু-একবার সামনের দিক থেকে আসা কোনও গাড়ির হেড-লাইটের আলোয় কখনও উদ্ভাসিত হচ্ছে সায়নের মুখ, পরক্ষণেই হারিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। সহসা দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল গার্গী। কী অবহেলায় সায়ন উচ্চারণ করল আলো বোসের নাম, একটুও কাঁপল না তার

কণ্ঠস্বর। কে এই আলো বোস, তার সঙ্গে সায়নের সম্পর্কই বা কী? কতদূর সে সম্পর্কের শিকড়? কথাটা ভাবতে গিয়ে গার্গীর নিজের শরীরটা কেঁপে উঠল হঠাৎ, পরক্ষণেই সে সায়নের দিকে আছড়ে ফেলল পরবর্তী প্রশ্ন, একদিন পরে যে ফিরেছিলেন সে-কথা আলো বোসকে এনে প্রমাণ করাতে পারবেন?

সায়ন ঘাড় নাড়ল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, চেষ্টা করব।

—আপনার আর কাউকে সন্দেহ হয়?

সায়নের মারুতি তখন রাস্তা ফাঁকা পেতে হু-হু করে ছুটছে ইস্টার্ন বাইপাসের দিকে। গার্গী বুঝতেই পারছে না এ তারা কোথায় চলেছে, কেনই বা। এ পথে গার্গী আরও দু-একবার এসেছে আগে। একবার সায়ন আর ঐন্দ্রিলার সঙ্গে, যেবার তারা দারুণ হইহই করতে করতে গিয়েছিল বেথুয়াডহরি, ফরেস্টের একটি চমৎকার ডাক-বাংলোয়। গোলাপি রঙের দোতলা বাড়িটার ঠিক নিচেই, চত্বরে রোজ সন্ধের পর হরিণের দল এসে ভিড় করেছিল। জ্যোৎস্নায় চাপুরচুপুর ভিজতে ভিজতে তারা হাঁ করে দেখছিল গার্গীদের। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু এত রাতে সায়ন নিশ্চয় বেথুয়াডহরি যেতে চাইবে না—

গার্গীর প্রশ্নে সায়ন আবারও দ্বিধাগ্রস্ত, কাকেই বা সন্দেহ করব? আমার জীবনে কোনও শত্রু আছে কিনা তা কখনও ভেবে দেখিনি। ভাবার সময়ও পাইনি কখনও। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তখন একটাই টার্গেট, কী করে আমার তৈরি প্রোডাক্ট বাজারে এক নম্বর হবে। কীভাবে আমার অফিস বড় হবে, আমার ব্যাবসা হু-হু করে ছড়িয়ে পড়বে সারা বাংলায়, সারা ভারতবর্ষে। প্রায় নেশার ঘোরে ছিলাম। তার ওপর তুমি আবার ঐন্দ্রিলাকে এনে দিলে আমার জীবনে। সে আর এক নেশা।

—তবু কাউকেই সন্দেহ হয় না আপনার?

সায়ন যেন এক ঘোরের তলিয়ে গিয়েছিল, যেন এক স্বপ্নের ভেতর থেকে কথা বলছিল, সেভাবেই বলল, আমি অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করেছি, কে বা কারা এর পেছনে থাকতে পারে। লাইম ইণ্ডিয়ার কারও কথা মাথায় এতদিন ছিল না, এখন পর পর কয়েকটা ঘটনায় হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো ব্যাপারটা ঘোরাফেরা করছে আমার মাথায়। লাইম ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান পর্যন্ত ঈর্ষা করে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে। হঠাৎই আমাদের ডিটারজেন্ট পাউডারের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওদের কোম্পানির সবাই উল্লসিত। ওদের হোয়াইট ওয়াশ নামের ডিটারজেন্ট পাউডারটি নাম বদলে হঠাৎ মিল্ক হোয়াইট হয়ে গেল। সেই নামেই বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ। নতুন নামে, নতুন প্যাকে ওরা পুরানো প্রোডাক্টটা বাজারে ছাড়ছে শিগগির। বুঝতে পারছি না, এ সব কিছুর মধ্যে কোনও যোগসূত্র আছে কি না—

বলতে বলতে হঠাৎ আবার কেমন থম্ মেরে গেল সায়ন। এক অদ্ভুত ঘোরের ভেতর আছে, অথচ স্টিয়ারিং, অ্যাকসিলারেটর, ক্লাচ, ব্রেকে তার হাত-পা ঠিকঠিক কাজ করে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে এক ধরনের রিফ্লেক্স কাজ করে। কসবা-এলাকা অনেকক্ষণ আগেই পার হয়ে ঢুকে পড়েছে ইস্টার্ন বাইপাসে, দ্রুত ছুটতে থাকা আরও শয়ে-শয়ে গাড়ির পিছনে শামিল হতে হতে বলল, জানো গার্গী, সেদিন পুলিশ-অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল হঠাৎ একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলেন, আচ্ছা, ঐন্দ্রিলা দেবী কি মাঝে মধ্যে বা নিয়মিত সিগারেট খেতেন? আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম,কই, না তো? দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, এমনও তো হতে পারে, আপনি জানতেন না। আমি হেসে উঠে বলেছিলাম, তাহলে আরও দু'বছর ধরে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করলাম কেন? কিন্তু হঠাৎ পুলিশ অফিসার কথাটা কেন জিজ্ঞাসা করলেন, তা আজও

pathagar.net

ভেবে পাইনি। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টে কেউ সিগারেট খায় কি খায় না তাও লেখা থাকে নাকি!

গার্গী প্রতিবাদ করল তৎক্ষণাৎ, অসম্ভব, রুঙ্কা কখনওই সিগারেট খেত না। শখ করেই কখনও খায়নি।

—আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন পুলিশ ইন্সপেকটর। বলেছিলেন, আপনার অ্যাবসেন্সে কেউ আসত কি না ঐন্দ্রিলার কাছে। কোনও পুরুষ কিংবা মহিলা? আমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলাম, না, তাহলে আমি জানতে পারতাম। সব কথাই ঐন্দ্রিলা বলত আমাকে। ইন্সপেকটর হেসে বলেছিলেন, দু'বছর কি কোনও মহিলাকে চিনে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট সময়, মিঃ চৌধুরী। তিরিশ বছর ঘর করেও অনেক পুরুষই নিজের স্ত্রীকে চিনে উঠতে পারেন না, তা জানেন? তবে জেনে রাখুন, কেউ না কেউ সে রাতে এসেছিল আপনার ঘরে। ঐন্দ্রিলা দেবীর চেনা কেউ।

গার্গী এবারও ফুঁসে উঠল, পুলিশের লোক সব সময়েই ছিদ্রান্বেষী হয়। আশ্চর্য, ঐন্দ্রিলার নামেও বদ্‌নাম করতে ওরা পিছপা হয় না।

সায়ন হাসল, ওরা এখন কেবলই স্ক্যাণ্ডাল খুঁজে বেড়াচ্ছে, যাতে শেষ পর্যন্ত আমাদের কাউকে না কাউকে ওরা দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করতে পারে। শুনলাম পুলিশ দ্রুত গুটিয়ে ফেলছে অনুসন্ধানের জাল। আর কয়েকদিনের জালে ধরা পড়বে সেই অপরাধী। কে জানে হয়তো আমার বিরুদ্ধেই ওরা প্রমাণ তৈরি করছে। একের পর এক—

—সায়নের শেষ কথাগুলো কেমন ভারী আর জড়ানো, তাতে মেশানো একটুকরো দীর্ঘশ্বাসও। তার বুকের ভেতরও যেন এক ধরনের কাঁপ। এ ক'দিন সায়নের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে গার্গী, ঐন্দ্রিলা-প্রসঙ্গ একবারের জন্যও তোলেনি এই ভেবে যে সায়নের মানসিক আঘাত তাতে হয়তো আরও তীব্র হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, যখন সায়ন কিছুটা সহজ, সাবলীল, তার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এত সব কথা জেনে নিল গার্গী। শুনে বুঝল, অনেক কিছু তথ্যই এই পরিবারের সঙ্গে মিশেও জানতে পারেনি এতকাল।

সায়নের মারুতি তখন ইস্টার্ন-বাইপাসের আলো ঝলমলে বিস্তৃত রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে বিদ্যুৎ গতিতে। রাতের বেলা এ রাস্তায় ইচ্ছে করলেও আস্তে চালানো যায় না। পেছনে সামনে দু'দিকেই সমস্ত গাড়ির গতি তখন তুঙ্গে। সায়নও নিখুঁত ড্রাইভিং-এ এগিয়ে চলেছে হু হু করে। প্রথমে পার্ক সার্কাস কানেকটরের মোড়, তারপর বেলেঘাটা রোড ক্রশিং পার হয়ে, , সল্টলেক স্টেডিয়াম ডাইনে রেখে একসময় ঢুকে পড়ল সল্টলেকের নির্জন রাস্তায়। হঠাৎ সল্টলেকেই বা ঢুকে পড়ল কেন, গার্গী বুঝতে পারছে না। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কিছুই বলেনি সায়ন। তবে কি গার্গীর হাত থেকে নিস্তার পেতে তাকে কোন নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ এক লহমার জন্য ভয় পেয়ে গার্গী। মনে হল, বাইরের যে কোন সায়নকে ঐন্দ্রিলার খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তেমনিভাবে গার্গীকেও কি সে—

বুকের ভেতরটা কয়েক মুহূর্তে ধক্‌ধক্ করে উঠল তার। পাশে নিশ্চিন্ত হয়েও স্টিয়ারিং ধরে থাকা সায়নের চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করল। এতদিন ধরে দেখছে সায়নকে, তবু মনে হল, এই সায়নকে সে যেন চেনে না।

সায়ন তখন রাস্তার পর রাস্তা পেরোচ্ছে, অনেকগুলো আইল্যাণ্ড পার হয়ে জলের ট্যাঙ্ক ক্রশ করে এগিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্যে। সল্টলেকের ভেতরটা কিছুতেই মনে রাখতে পারে না গার্গী। কত যে রাস্তা, কত যে জলের ট্যাঙ্ক, কত যে পাখির খাঁচা বরাবর তা যেন বারবার

pathagar.net

ওলটপালট হয়ে যায়। তার ওপর রাতের সল্টলেক তো তার কাছে এক গোলকধাঁধা। এমনই অনেক ধাঁধা, গাছপালাময় পথ। সুন্দর সুন্দর বাড়ির সারি পার হয়ে ছোট্ট অথচ ছবির মতো চমৎকার একটি বাড়ির সামনে ঘ্যাঁচ করে গাড়ি দাঁড় করাল সায়ন। গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, নামো—

প্রায় যন্ত্রচালিত হয়ে নেমে এল গার্গী। সায়ন ততক্ষণে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে বেল টিপছে। ঘরের মধ্যে চড়ুইপাখির মতো কিচমিচ শব্দে বেল বাজাতে থাকল কিছুক্ষণ। পরক্ষণেই দরজা খুলে যিনি বেরোলেন, তার দিকে আঙুল নির্দেশ করে সায়ন গার্গীকে বলল, ইনিই হলেন সেই আলো বোস, যাঁর সঙ্গে বিলাসপুর গিয়েছিলাম আমি, হোটেলে একই ঘরে রাত কাটিয়েছিলাম।

গার্গী সেদিকে তাকিয়ে বিস্মিত, হতচকিত, নির্বাক হয়ে গেল মুহূর্তে।

মধ্যবয়স্ক, গোলগাল মুখের সেই ভদ্রলোকের দিকে তখন বিস্মিত, স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে গার্গী। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর চেক-কাটা সবুজ লুঙি। মাথায় মস্ত টাক চকচক করছে সদ্য-জ্বালা টিউবলাইটের আলোয়, যেটুকু চুল আছে এ-পাশে ও-পাশে তাও আধপাকা, বয়স পঞ্চাশের একটু ওপরেই।

বারান্দায় কারুকাজ-করা গ্রিলের কাছে এসে প্রথমে গার্গীর দিকে চোখ পড়তে একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন, পরক্ষণেই সায়নকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, আরে সায়ন যে—

সায়ন বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল, আপনি যে গুজরাত চলে গেছেন তা জানতামই না। এ ক'দিন এমন ঝঞ্ঝাটের ভেতর কেটেছে যে আপনার সাহায্য নেওয়ার ফুরসতই জোটেনি। অথচ খুব দরকার পড়েছিল মাঝখানে। ভাগ্যিস আজ সকালে আপনি ফোন করেছিলেন, তাই সন্ধের পর এমন একটা বিপদে পড়লাম যে প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়ল।

বলে একটু থেমে গার্গীর দিকে একবার তাকিয়ে সায়ন বেশ স্মার্টভঙ্গিতে বলল, আপনাকে একটা দারুণ সারপ্রাইজ দেব বলে চলে এলাম, আলোদা। মিট গাগী, গার্গী মুখার্জি। আমার বান্ধবী।

আলোদা হাতজোড় করে হাসি-হাসি মুখে বললেন, এ অধম তোমাদের যদি কোনও উপকারে লাগে—

—উপকারে লাগবে বলেই এলাম, আলোদা। সেই সংকটময় মুহূর্তে যদি আপনি কলকাতায় থাকতেন, তাহলে হয়তো আরও সুবিধে হত।

—প্রায় চার সপ্তাহ পরে কলকাতা ফিরে এসে এ কদিনের খবরের কাগজ পড়ছি, আর চমকে চমকে উঠছি। প্রায় ভূত দেখারই মতো অবস্থা আমার। আমাকে নিয়েও কত স্টোরি লিখেছে। আজ তো আবার দেখছি, পুলিশ তোমার অফিস নিয়ে পড়েছে। এমনকি বার্স্ট হয়ে যাওয়া মেশিনটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, সায়ন চৌধুরী নিজেই গোপনে বার্স্ট করিয়ে দিয়েছে, যাতে সবার নজর ওদিকেই ঘুরে যায়। সে রাতে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তোমার অফিসেরই কেউ নাকি একজনকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিল ফ্যাক্টরি-অফিস থেকে টেলিফোন করবে বলে! সে নাকি তোমার খুব আস্থাভাজন ব্যক্তি। কিন্তু তার নাম চেপে যাওয়া হচ্ছে—

সায়ন ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ, কালীজীবনবাবু। ফ্যাক্টরির কাছেই তাঁর রেসিডেন্স। এরকম প্রায়ই যান টেলিফোন করতে। সেদিন অত রাতে গিয়েছিলেন কেন, বুঝতে পারছি না। তিনি কোম্পানিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, আমাকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়ে রাখেন। তিনি মেশিনের সর্বনাশ করবেন, তা ভাবা যায় না। তাই পুলিশকে জানাইনি তাঁর নাম।

গার্গী তখনও অবাক হয়ে দেখছিল, আলোদা নামের গৃহকর্তার দিকে। রাতের বেলা চারপাশ অসম্ভব ফাঁকা সল্টলেক ডুবে থাকে ঘোর নির্জনতায়। এখানে ছবির মতো এক-একটা বাড়ি যেন এক-একটা দ্বীপ। বড়-বড় রাস্তার দুপাশ জুড়ে এমন অসংখ্য দ্বীপের সমাহার বলে সল্টলেককে নির্জনতম আখ্যায় ভূষিত করা যায়। দিনের বেলায় সাজানো ছিমছাম এই নির্জন শহর তবু একরকম, রাতের বেলা গার্গীর কাছে মনে হল প্রায় জনহীন সাইবেরিয়া। সে থাকে জুবিলি পার্কের মতো গা-ঘেঁষাঘেষি বাড়ি এমন জনবহুল সরগরম এলাকায়,তাকে যদি হঠাৎই রাতের বেলা সল্টলেকের এই গহন নির্জনতায় উপস্থিত করা যায়, তাহলে বুকে একটু হৃৎকম্প জাগবেই।

আলোদার পেছনেই বেরিয়ে এলেন এক মহিলা, প্রায় মধ্যবয়সি, মুখশ্রী ভারি সুন্দর। তাঁকে দেখে সায়ন হেসে বলল, বউদি, আজ রাতে আমরা আপনার গেস্ট, আবার নতুন করে রাঁধতে হবে।

হঠাৎ সায়নকে এক রাতে দেখে, তার ওপর সঙ্গে এক অচেনা তরুণী, স্বভাবতই বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন বউদি। সায়নের কথা শুনে অবশ্য হাসিতে ভরিয়ে ফেললেন মুখ, ঈষৎ অবাঙালি কথার টানে বললেন, আসুন, আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। সল্টলেকে বাড়ি করে চলে আসার পর তো গেস্ট পাওয়াই যায় না আজকাল।

এতক্ষণে সায়নের খেয়াল পড়ল গার্গীর দিকে, গার্গী, এই হল আমার এক দাদা-বউদি, আলো বোস আর সুচন্দনী—

আলো বোস নামটা কানে যাওয়ার পর থেকেই প্রবল এক ধাঁধার ভেতর ছিল গার্গী, মাথায় চকিতে ঘাই দিয়ে উঠেছিল সংবাদপত্রে পড়া সরকারি উকিলবাবুর সওয়ালের সারসংক্ষেপে। পুলিশ-রিপোর্ট অনুযায়ী আলো বোসের একজন মহিলা হওয়ার কথা! অথচ কী আশ্চর্য, তার বদলে ভুঁড়িওয়ালা এক মধ্যবয়স্ক পুরুষ! ভদ্রলোককে গার্গী এর আগে কখনও চোখে দেখেনি, সায়নের কাছে শোনেওনি এঁর কথা। একমাত্র উকিলবাবু সওয়ালেই—

সুচন্দনী ততক্ষণে সবাইকে ডেকেডুকে নিয়ে গিয়েছেন ভিতরে। বোধহয় চল্লিশের কিছু ওপারে বয়স সুচন্দনীর, একটু বেশি রকমের স্বাস্থ্যবতী, হয়তো বয়সের গুণেই,তবু মুখখানা কোনও এক চিত্রতারকার আদল মনে পড়ায়। মহিলা তরুণী বয়সে নিশ্চই অনেক পুরুষের চিত্তবেদনার কারণ হয়েছেন। পরনে ঠাসবুনোটের চমৎকার ধনেখালি শাড়ি, হালকা হলুদের ওপর ম্যাজেন্টা রঙের স্ট্রাইপ। তার সঙ্গে হলুদ রঙের ব্লাউজে তাঁর কাঁচা সোনার মতো শরীরের রং এক আশ্চর্য দীপ্তি পেয়েছে। কেন কে জানে, সুচন্দনী বউদি বারবার তাকিয়ে দেখছিলেন গার্গীকে। সে চাউনিতে মিলমিশ হয়ে আছে একটুকরো সন্দেহের আঁচ। গোলমেলে ব্যাপার মেয়েরাই তো আঁচ করে প্রথমে।

—রান্না হতে তো দেরি হবে, ততক্ষণে একটু চা করি, বলে আল্‌তো হেসে সুচন্দনী সেঁধিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। আলোদা তখন ড্রইংরুমের সোফায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন বৈঠকি ভঙ্গিতে, পায়ের উপর পা তুলে। তাঁর সামনের দুটো সিঙ্গল সোফায় সায়ন আর গার্গী, এত রাতে এসে পরিস্থিতির চাপে একজনের মুখ অপ্রস্তুত তো অন্যজনের অস্বস্তিতে ভরা।

মাঝখানে গোলাপি সানমাইকা-লাগানো ট্রাপেজিয়াম-আকারের চমৎকার একটি সেন্টার-টেবিল। তার উপর সাদা অ্যাশট্রের গুহায় আধ-খাওয়া সিগারেট। হয়তো খেতে খেতে রেখে দিয়েছিলেন, আগুন নিভে গেছে কিছুক্ষণ পর। অ্যাশট্রের পাশে দু-দুটো সিগারেটের প্যাকেট, দেশলাই। বোঝাই যাচ্ছে, ভদ্রলোক ধূমপানে খুব বেশি আসক্ত।

কথা শুরু করার আগেই সিগারেটের প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে একটি সায়নের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অন্যটা নিজের ঠোঁটে গুঁজলেন আলোদা। তারপর দুটিতেই আগুন সংযোগ করে গার্গীর দিকে তাকালেন, খুব আশ্চর্য ঘটনা এই যে, সায়ন কিন্তু কখনও আমাকে বলেনি তার অমন একটি সুন্দরী বান্ধবী আছে। কাল সকালে গুজরাত থেকে ফিরে কদিনের বাসি খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই গার্গী নামটা প্রথম জানলাম।

এতক্ষণে সামান্য সহজ হওয়ার চেষ্টা করল গার্গী, তাহলে এখন আমি খুবই বিখ্যাত মেয়ে বলুন?

আলোদা হেসে উঠলেন, বেশ বলেছ কথাটা। বিখ্যাত—

—বিখ্যাত নিশ্চই। সায়নদার কল্যাণে এখন আমার নাম সবাই একডাকে চেনে। সায়নদা কয়েকদিন আগে মজা করে বলেছিল, ইচ্ছে করলে কাগজে ছবিও ছাপা হয়ে যেতে পারে আমার, বলতে বলতে গার্গী হাসল, তবে আলোদা, পুলিশ কিন্তু আপনাকেও বিখ্যাত করে দিয়েছে, কেবল ভুলবশত বদলে দিয়েছে জেন্ডারটি। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, পুলিশের এই ভুলটা কেন এতদিন ভাঙিয়ে দেয়নি সায়নদা।

সায়ন এতক্ষণে বলল, প্রথমে আমি এতটাই পাজ্‌ল্ড হয়ে পড়েছিলাম যে ব্যাপারটা মাথায় আসেনি আমার। পরে যখন পুলিশকে বলতে গেলাম, হেসে উড়িয়ে দিল ওরা। বলল, ও-সব গাঁজাখুরি গল্প ছাড়ুন। মাঝখানে একদিন আলোদার খোঁজ করতে পাঠিয়ে শুনি, ওঁর ঘর তালা-বন্ধ। তারপর তো আজ সকালে ফোন পেয়ে জানলাম, উনি এতদিন কলকাতায় ছিলেনই না।

গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলল, আশ্চর্য এই যে, সায়নদার সঙ্গে এই কবছর মেলামেশা করেও আপনার নামটা কিন্তু আমি কখনও জানতে পারিনি।

—আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ আমি এতই অকিঞ্চিৎকর মানুষ যে সায়ন আমার নাম অন্যের কাছে কেনই বা বলে বেড়াবে, আলোদা হাসতে হাসতে বললেন, তবে আসল কথা হল এই যে, সায়নের সঙ্গে আমার আলাপ বহুকাল আগের, সায়ন তখনও স্কুলে পড়ত। তারপর আমি কর্মসূত্রে আমেদাবাদ থেকে আরও ত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে একটা মফস্বল শহরে বদলি হয়ে চলে যাওয়ায় কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেখানেই বিয়েশাদি করে বেশ তোফা ছিলাম। সুচন্দানীর বাবাও সেখানকার প্রবাসী বাঙালি। এমন বাঙালি পাত্র হাতে পেতে মেয়েটা গছিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ পনেরো পছর পর ফের কলকাতায় বলদি হয়ে এসে কয়েকমাস নর্থ ক্যালকাটায় ভাড়া ছিলাম। তারপর সল্টলেকে এই বাড়ি করে চলে এসেছি কমাস আগে। এর মধ্যে সায়নের সঙ্গে হঠাৎ পথে একদিন দেখা। ও এতই সুন্দর আর সুপুরুষ হয়েছে যে আমি চিনতেই পারিনি প্রথমে। ও-ই বলল, কী আলোদা, চিনতে পারছেন না, আমি সায়ন। তারপর আস্তে আস্তে পুরানো সম্পর্ক কিছুটা ঝালাই হল। জানতাম, সায়ন জিনিয়াস, এখন দেখলাম, সে তার মেধার সদ্ব্যবহার করেছে। আমাকে দেখে ও এতই খুশি হল যে সঙ্গে সঙ্গে বলল, একদিন আমার অফিসে আসুন আলোদা। তারপর বেশ কয়েকবার ওর অফিসে গিয়েছি। দেখলাম আমাকে পেলে ও বেশ খুশি হয়। অনেক মনের

pathagar.net

কথা গড় গড় করে বলে ফেলে। মাঝে মধ্যে দু-একটা পরামর্শও চায়। আসলে এই সব কৃতী পুরুষরা কখনও কখনও নিজের ভেতর একা হয়ে পড়ে। তখন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকে পেলে স্বস্তি বোধ করে কিছুটা। এর আগে কলকাতায় দু-চারবার গাড়ি করে ও আমাকে নিয়ে গেছে ডিস্ট্রিবিউটারদের কাছে, কখনও বলেছে, বলুন তো আলোদা, লোকটা কেমন? রিলায়েব্‌ল? ফেরার পথে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে এখানে, এক কাপ চা নিয়ে বসে হয়তো আধ ঘন্টা গল্প করেছে। ব্যস, আমাদের সম্পর্ক বলতে এটুকুই। তাও মাত্র কয়েকমাস। হয়তো এ জন্যেই যেমন তুমি আমার সম্পর্কে কিছু জানো না, আমাকেও কোনও দিন বলেনি তোমার সম্পর্কে। মানে তেমন সুযোগই হয়নি হয়তো। তবে, আলোদা আবার একটা হাসলেন, সুন্দরী বান্ধবীর কথা কোনও পুরুষই বোধহয় অন্যের কাছে বলতে পছন্দ করে না—

গার্গী হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, আপনি তখন থেকে আমাকে সুন্দরী সুন্দরী বলছেন, আলোদা। আমি কিন্তু তেমন সুন্দরী নই। আয়নায় নিজের মুখখানা রোজই দেখতে পাই আমি।

একটু ঝাঁঝিয়ে বলল গার্গী, কিন্তু এ হেন তীক্ষ্ণ আক্রমণে মোটেই ঘাবড়ালেন না আলোদা, বললেন, কেন, সুন্দরী নয়ই বা কেন! আমাদের দেশে সুন্দরীর সংজ্ঞা হল, দুধে আলতা রং, আর দেবী সরস্বতীর মতো তুলিতে আঁকা চোখমুখ, তাই না? কিন্তু আজকালকার বিউটি-কনটেস্টে যেসব মেয়েরা যোগ দেয়, তাদের কেউই কিন্তু ওরকম কনসেপ্টের সুন্দরী নয়। মুখশ্রী আর ফিগারের সঙ্গে তাদের চাউনি, হাসি, ব্যক্তিত্ব, উপস্থিত বুদ্ধিও পরখ করে দেখা হয়। আমি কিন্তু সুন্দরী বলেছি সেই অর্থে। অর্থাৎ টোটাল বিউটি বলতে যা বোঝায়, তাইই। শুধু তোমার বুদ্ধিদীপ্ত চাউনিটুকুর দামই যে লাখটাকা।

গার্গী হেসে উঠে বলল, কী যে সব বলেন—

—একটুও বাড়িয়ে বলিনি কিন্তু। তোমার মুখ দেখে আমার মনে হচ্ছে, অনেক আগেই কিছু খ্যাতি প্রাপ্য ছিল তোমার। অবশ্য যে অর্থে একটু আগে নিজেকে বিখ্যাত বললে, সে অর্থে নয়। সদর্থেই—

সায়ন এতক্ষণ দুজনের বাগবিতণ্ডা উপভোগ করছিল, এবার বলল, ও কিন্তু সত্যিই একদিন খ্যাতিনাম হবে, দেখবেন আলোদা।

গার্গী চোখমুখ পাকিয়ে বলল, এর চেয়েও খ্যাতিমান! এখনই বলে সুইসাইড করার মতো অবস্থা—

আলোদা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, জীবনে এমন এক-আধটা দুর্বিপাক আসতেই পারে কারও। সময় পেরোলে সে-সব গ্রহ কেটে যায় একসময়। এই তো, এখন সংবাদপত্রে কল্যাণে সায়ন রীতিমতো লেডি-কিলার হিসেবে খ্যাত। অথচ আমি তো মাত্র ক'মাস ওর সঙ্গে মিশেই বুঝে ফেলেছি, মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার ব্যাপারে ও মোটেই এক্সপার্ট নয়। তাই আজ সত্যি সত্যিই আস্ত একটা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে দেখে আমি তাজ্জব। বুঝতেই পারছি না, এরকম একটা ম্যাজিক কী করে ঘটাল সায়ন।

গার্গীর মুখের আলো দপ করে নিভে গেল হঠাৎ, মুখ নিচু করে বলল, এর জন্যেই আমিই দায়ী, আলোদা।

সায়ন হাসতে হাসতে বলল, পরে সব বলব, আলোদা। আমি এখন ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।

ইতিমধ্যে সুচন্দনী চার কাপ চা ট্রেতে চাপিয়ে নিয়ে এলেন। তার থেকে একটা কাপ প্রথমেই তুলে নিয়ে আলোদা বললেন, চা না হলে আড্ডাটা ঠিক জমছিল না যেন। তারপর

pathagar.net

বেশ আয়েশ করে চুমুক দিয়ে বললেন, কী আশ্চর্য সায়ন, তুমি তো এর আগে ভাগ্য মানতে না। বরাবরই বলে এসেছ, পুরুষের ভাগ্য সে নিজের হাতেই তৈরি করে—

—এতদিন তাইই বলেছি। বিশ্বাসও করতাম সেরকমই। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে সেই বিখ্যাত প্রবচন হয়তো সত্যিই। ম্যান প্রপোজেস অ্যাণ্ড গড ডিসপোজেস। আপনি তো এর-ওর হাত দেখতেন শুনেছি। এখন মনে হচ্ছে, আপনাকে হাতটা দেখাই। আমার তিলতিল করে গড়া প্যারাডাইস এখন ডুবতে বসেছে। সেদিন আমাদের অ্যাকাউন্টস্ সেকশনের কালীজীবনবাবু হঠাৎ এসে বললেন, স্যর, লাইম ইণ্ডিয়ার একজন স্টাফ এসেছিল, আমাকে বলল, লাইম ইণ্ডিয়ার সব এরিয়া-ম্যানেজার, সুপারভাইজাররা এবার থেকে হুইসপারিং ক্যাম্পেন চালাবে প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ডিসট্রিবিউটরের কাছে, কলকাতায়, জেলায় জেলায়। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কী সাংঘাতিক কনস্পিরেসি! বলুন তো, এরপর প্যারাডাইসকে আর দাঁড় করাতে পারব?

হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল গার্গী, চায়ে চুমুক দিতে দিতে সায়নের কথাগুলো তাকে বিষণ্ণ করে তুলছিল। হাত দেখার নাম শুনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, তার এতক্ষণের অস্বস্তি, ঔদাসীন্য ভেঙে ফেলল মুহূর্তে, আপনি হাত দেখতে পারেন নাকি, আলোদা? সেই জন্যে তখন থেকে গ্রহট্রহের কথা বলছেন! আমার হাতটা একবার দেখে দেবেন?

হো হো করে হেসে উঠলেন আলোদা, সায়ন আর ক্যাপিটাল তোমার কাছে প্রথম দিনেই ফাঁস করে দিয়ে ভারি বিপদে ফেলল যে। আসলে কি জানো, হাত দেখানোর ব্যাপারে মেয়েরা একেবারে পাগল। আর মেয়েদের এই দুর্বলতাটুকু আমি এক্সপ্লয়েট করি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমি হাত দেখতে জানিই না।

কিন্তু গার্গী নাছোড় হল, উঁহু, দেখতেই হবে আপনাকে। আমি এসব কখনও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার ভবিষ্যৎটা এক্ষুনি জানা দরকার।

অগত্যা আলোদা গার্গীর হাতটা টেনে নিয়ে খানিকক্ষণ গভীরভাবে দেখলেন রেখাগুলো, তারপর হঠাৎ স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগলেন, খুব জেদি, একগুঁয়ে মেয়ে—

গার্গীর মুখে একঝলক হাসি ঢেউ খেলে গেল, কিছু বলবে ভাবল, তার আগেই আলোদা আবার বললেন, খুব ঝড়-ঝাপটের ভেতর দিয়ে কেটেছে তোমার শৈশব। বরাবরই তুমি খুব লড়াকু স্বভাবের মেয়ে। সংসারে প্রত্যেকের জন্যই অনেক করেছ, কিন্তু কারও মন পাওনি কখনও। তুমি সবার সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করো, কিন্তু অন্যে তোমায় ভুল বোঝে—

এক-একটা বাক্য বলছেন আলোদা, এক মুহূর্তের জন্য থামছেন, প্রতিক্রিয়া দেখছেন গার্গীর চোখমুখের, তারপর ফের বলতে শুরু করেছেন:

—তোমার হৃদয় খুব বড়, তোমার নজর সবসময় বেশ উঁচুর দিকেই। বেশ বনেদিবংশে তোমার জন্ম। তোমার বাবা-মায়ের মনও ছিল খুব উঁচু। মাঝে মধ্যে তোমার মন খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে। কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে কিছুতেই মন স্থির রাখতে পার না। এই মুহূর্তে কোনও একটা ব্যাপারে ভীষণ চঞ্চল হয়ে আছে, তবে শিগগির তোমার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটতে চলেছে—

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, কী পরিবর্তন?

আলোদা হাতের রেখা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, সেটা আমি পরিষ্কার করে বলছি না। তবে তোমাকে খুব শিগগির পর-পর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অনেক বড় একটা দায়িত্ব তোমার কাঁধে চাপবে হয়তো—

pathagar.net

গার্গী তখন বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, তিরতির করে কাঁপছে চোখের পাতা, কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, আর?

—ছেলেবেলায় একবার তুমি পড়ে গিয়েছিলে, খুব আঘাত লেগেছিল তাতে। স্কুলে কিংবা কলেজে পড়াকালীন খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল একটা, মনকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা, বলে বেশ জিজ্ঞাসু চোখে গার্গীর দিকে তাকালেন আলোদা, কী হল, এত যে কথা বললাম, তুমি কিছু বলছ না যে? কিছুই মিলছে না নাকি?

গার্গী এতক্ষণ কেমন সম্বিতবিহীন হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চমক ভাঙতে বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, না, না, মিলছে, মিলছে, দারুণ হাত দেখতে পারেন তো আপনি!

শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন আলোদা। ওদিকে হাসছিল সায়নও। গার্গীর হাত ছেড়ে দিয়ে আলোদা বললেন, ধুর, সব গাঁজাখুরি। আমি হাত দেখতেই পারিনে।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন, সবই তো মিলেছে।

মিটিমিটি হাসতে হাসতে আলোদা এবার বললেন, তাহলে রহস্যটা ফাঁস করে দি। বুঝলে, আমার যিনি হাত দেখার গুরু, তিনি এরকম তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা বাক্য আমার একটা খাতায় লিখে দিয়েছিলেন। তার থেকে দশ-বারোটা করে বাক্য এক-একজনের হাত দেখে বলে দি। কাকে কী কী বলব সেটা অবশ্য তাদের মুখ দেখে একটু আন্দাজ করে নিতে হয়। তাতে শতকরা নিরানব্বই জন মেয়েই বলবে, মিলেছে, মিলেছে। বিশ্বাস না হয়, তোমার কোনও বান্ধবীকে হাত দেখার ছুতো করে তোমাকে বলা কথাগুলোই তাকে বলে দেখ, দেখবে সেও বলছে, মিলেছে মিলেছে।

বলতে বলতে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে লম্বা করে টান দিয়ে আলোদা বললেন, বিবাহিত হলে আর একটা কথা যোগ করতাম ওর সঙ্গে। বলতাম, তোমার স্বামীটি বড় আলাভোলা, অপদার্থই বলা যায়। স্বামীর ওপর তোমার একটু ডমিনেট করার অভ্যেস আছে। মাঝে মধ্যে খিটিমিটি হয় তোমাদের মধ্যে?

এত সব হাত-দেখাদেখির মধ্যে সুচন্দনী কখন যেন গরম গরম ভাত আর ডিমের ঝোল তৈরি করে ফেলেছেন। ডাইনিং টেবিলে চমৎকার করে সাজিয়ে দিয়ে ডাক দিলেন সবাইকে। খিদের মাথায় অমৃতের মতো মনে হল সে ডিমের ঝোলের স্বাদ। সায়ন মুখে দিয়ে বলে উঠল, কী দারুণ!

খেয়ে উঠতে উঠতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা। সায়ন এতক্ষণে আলোদার কাছে একান্ত হয়ে সব ঘটনা বিবৃত করে বলল, গার্গীকে কয়েকদিন আপনাদের কাছে রেখে যেতে চাই আলোদা। যতক্ষণ না ওর জন্য কোথাও একটা ব্যবস্থা করতে পারছি।

আলোদা সাগ্রহে ঘাড় নাড়লেন ঠিক আছে। নো প্রবলেম। আমাদের বাড়িতে তো ছেলেপুলে নেই। ক'দিন মজা করে কাটাব ওর সঙ্গে।

সায়ন স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, তাহলে আমি এবার ফিরব।

সায়ন ফিরবে শুনতে সুচন্দনী হই-হই করে বললেন, এত রাতে! সে আবার কী কথা! আলোদা ঘাড় নেড়ে বাধা দিলেন, উঁহু, তা হয় না। এত রাতে ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে ফেরাটা যুক্তিযুক্ত হবে না। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটার পর পথঘাট সব নির্জন হয়ে যায়। কোথায় কোন বিপদ ঘটে যাবে তার ঠিক নেই। তা ছাড়া—হঠাৎ রসিকতা করে আলোদা বললেন, হঠাৎ একটি অচেনা যুবতীকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়তে চাইছ! তারপর ইলোপমেন্টের দায়ে পুলিশ আমাদের বাড়ি এসে চড়াও হোক আরও কি!

সায়ন হাসতে হাসতে বলল, পুলিশ তো সারাক্ষণ আমার পিছু নিয়েই আছে, কত আর তা নিয়ে ভাবব!

—না হে, রাতটা এখানেই থেকে যাও। রাস্তাঘাট তেমন ভাল নয়, তা ছাড়া বাড়ি ফেরার তো কোনও টানটোন নেই এখন। এসেছ যখন, থেকেই যাও, বেশ জমিয়ে আড্ডা মারা যাবেখন।

'বাড়ি ফেরার তো কোনও টানটোন নেই এখন' বাক্যটি হঠাৎ সায়নের বুকের ভেতর গেঁথে গেল যেন। মুহূর্তে এক অব্যক্ত ব্যথায় তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। অফিসের কাজে মাঝেমধ্যে এখানে-ওখানে সে চলে যেত ঠিকই, কিন্তু তার মন পড়ে থাকত ঐন্দ্রিলার কাছে। রাতে বাড়ি ফিরলে ঐন্দ্রিলার সাহচর্য ভরিয়ে তুলত তার সমস্ত পৃথিবী। সত্যিই, তারই টানেটানে তাকে তো ফিরে আসতে হত শরৎ বোস রোডের বাড়িতে।

এখন সেই খালি বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মানেই তো একাকীত্বের প্রবল যন্ত্রণায় শুধু ক্ষতবিক্ষত হওয়া। কীই বা হবে শুধু শুধু এর রাতে সেখানে গিয়ে— এমন ভাবতে ভাবতে আলোদার বাড়িতেই সে রাতে থেকে গেল সায়ন। অনেকদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমোলও বোধহয়। কিন্তু পরদিন সকালে সংবাদপত্র যে খবর বয়ে আনল তাদের জন্য, তাতে সল্টলেক সিটির এই সুন্দর ছোট্ট বাড়িটিতে কেউই প্রস্তুত ছিল না। 'সায়ন চৌধুরীর নৈশবিহার' এমন একটি হেড-লাইন দিয়ে সায়নের হঠাৎ অফিস ছেড়ে বাড়ি ফিরে আসা, গার্গীকে নিয়ে সন্ধের পর গাড়িতে করে বেরিয়ে যাওয়া এ সবই কভার করেছে রিপোর্টে। তারা যে রাতে কেউই আর বাড়ি ফেরেনি সে খবরও দিয়ে বলেছে, খুনের মোটিভ্ সম্পর্কে পুলিশ এতদিনে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

খবরটি পড়ে সায়ন স্তম্ভিত হয়ে রইল অনেকক্ষণ। কাল রাতে খাওয়াদাওয়ার পর অত রাস্তা ড্রাইভ করে ফেরাটা ক্লান্তিকর মনে হয়েছিল তার। তাইই সে শেষপর্যন্ত দোনামোনা করেও থেকে গিয়েছিল সল্টলেকে। এখন মনে হচ্ছে, ফিরে গেলেই ভাল হত। তাহলে কেচ্ছার গল্পটা লেখা হত না অমন রসালো করে।

আলোদা কাগজ পড়ে খুব আফসোস করছিলেন। বললেন, ইচ্ছে করছে, সংবাদদাতাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি এখানে। এনে দেখাই, কোথায় কীভাবে তারা রাত কাটিয়েছে।

সুচন্দনী হঠাৎ বেশ গম্ভীর হয়ে গেছেন। এমনিতে তিনি বেশ হাসিখুশি মানুষ, তবু সায়ন আর গার্গীর হঠাৎ রাতের বেলা একসঙ্গে উদয় হওয়াতে তিনি মোটেই স্বস্তি পাননি। রাতের বেলা স্বামীকে বলেওছেন, ব্যাপারটা তাঁর কাছে ঠিক ভাল ঠেকছে না—

সকাল থেকে বাড়ির পরিবেশ আরও বদলে গেল যেন। কেমন থমথমে তার অস্বস্তিকর। সায়ন অন্যমনস্ক, গার্গী গম্ভীর আলোদা অবশ্য খোলামেলা মানুষ। সবকিছু শুনে, দেখে কাগজ পড়ে, আলাদা আলাদা করে ডাকলেন সায়নকে, এ ব্যাপারে তুমি কিছু ভেবেছ, সায়ন?

সায়ন অবাক হল, কোন ব্যাপারে? গার্গীর?

—হ্যাঁ, যা শুনলাম, গার্গীর সঙ্গে তোমার তো অনেকদিনের সম্পর্ক। ওর সম্পর্কে তোমার কিরকম ধারণা?

সায়ন ভেতরে ভেতরে বিপর্যস্ত হয়েছিল, কিছুটা সম্বতবিহীনও, আলোদার কথার মর্মার্থ যেন ঠিক অনুধাবন করতে পারল না, বলল, গার্গী খুবই ভাল মেয়ে আলোদা, বিশ্বাস করুন। একটু বেপরোয়া বটে, কিন্তু ওর লেখার হাত চমৎকার। সুযোগ পেলেই আপনাকে

pathagar.net

আইনস্টাইনের টাইম অ্যাণ্ড স্পেশ থিয়োরি বুঝিয়ে দেবে, আবার সংরক্ষণের প্রশ্ন নিয়েও এক-দেড় ঘন্টা তর্ক করে যেতে পারে। কত বিষয়ে যে ওর আগ্রহ—

আলোদা লক্ষ করছিলেন সায়নের অভিব্যক্তি, তার কথা শেষ হতেই হেসে বললেন, তা হলে বরং তুমি গার্গীকে বিয়ে করে ফ্যালো।

আলোদা কথাটা এমন আচমকা বললেন যে সায়নের ঠিক বোধগম্য হল না। হয়তো তখনও সে তার আগের ভাবনার ঘোরেই ছিল, চমকে উঠে বলল, কী বললেন?

আলোদা কথাটা আবার বলতেই সায়ন প্রায় বেবাক্, বিমূঢ়, ছিটকে উঠে বলল, কী বলছেন আপনি, আলোদা? আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি জানেন না, গার্গীর সঙ্গে স্রেফ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।

আলোদা আরও কিছু যুক্তি দিয়ে বোঝাতে গেলেন, কিন্তু সায়ন প্রবল বেগে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, এ অসম্ভব, আলোদা, আমার সমস্ত সত্তার ভেতর এখনও ঐন্দ্রিলার অস্তিত্ব বর্তমান, আমাকে এতটা নিষ্ঠুর হতে বলবেন না, প্লিজ—

বিষয়টা সায়নকে এতটাই নাড়িয়ে দিল যে সে আর সেখানে বিন্দুমাত্র দেরি করল না। সুচন্দনীর তৈরি করা ব্রেকফাস্ট আর চা খেয়ে শুধু গার্গীকে একবার বলল, গার্গী, ক'টা দিন ওয়েট করো। নিশ্চয় কোথাও একটা থাকার ব্যবস্থা করে ফেলব তোমার, বলে নিতান্ত নিষ্ঠুরের মতো দ্রুত বেরিয়ে পড়ল তার মারুতি নিয়ে, অমন লম্বা ইস্টার্ন বাইপাস পেরোতে পেরোতে ঘাড় নাড়তে লাগল বারবার, না, এ কিছুতেই হতে পারে না, এ অসম্ভব, বলতে বলতে একসময় পৌঁছে গেল তার এসপ্ল্যানেড ইস্টের অফিসে। তারপর সকালের খবরের কাগজ পড়া থেকে শুরু করে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা ভুলে যেতে নিবিড়ভাবে নিমগ্ন হল তার অফিসের কাজে। প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তকে ডেকে পাঠাল প্রোডাকশনের খবরাখবর নেওয়ার জন্য। কৌশিক দত্ত নেই শুনে ব্যস্ত হয়ে ডেকে পাঠাল স্টোরের ইনচার্জকে, কত মাল এখনও স্টকে আছে তার হিসেবে নিয়ে ডেকে পাঠাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রকে, পর পর দুটো মিটিং করল তার এরিয়া ম্যানেজারদের নিয়ে মিটিং শেষ হতেই কঙ্কা রায়কে আসতে বলল একবার। ক্ষতিগ্রস্ত মেশিনের যে পার্টস্‌গুলো আনার জন্য বিদেশে চিঠি দিয়েছে তার একটা রিমাইন্ডার দেবে বলে। কঙ্কা রায় অফিসে শুনে অবাক হয়ে বলল, কেন, তার আবার কী হল? কী হয়েছে তা অবশ্য কেউ বলতে পারল না। কোনও ছুটির দরখাস্ত দিয়ে যায়নি কঙ্কা, কাল বাড়ি যাওযার সময় কিছু বলেও যায়নি, তাহলে নিশ্চয় তার অসুস্থ হওয়াই সম্ভব এমন ভাবল সায়ন। ঠিক আছে, রিমাইন্ডার না হয় পরদিনই দেবে। কিন্তু পরদিনও কঙ্কা না আসায় সে অবাক হল। পার্সোনেল ম্যানেজারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কঙ্কা কিছু বলে গেছে কি না তাকে, বলেনি শুনে বেশ আশ্চর্য হল। কঙ্কার খবর এল তৃতীয় দিনে, ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে জানিয়েছে, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

খবরটা পেয়ে কেন কে জানে একটু আশ্বস্ত হল সায়ন। তার পি. এ.-র অনুপস্থিতি হঠাৎ কেন যে তাকে একগলা টেনশনে ফেলেছিল তা অনুধাবন করতে পারল না, তবে উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলে সে ডেকে পাঠাল পার্সোনেল ডিপার্টমেন্টের স্টেনো রোহিণীবাবুকে, একটা লম্বা ডিকটেশন দিয়ে বলল, আগের চিঠির রেফারেন্সটা উল্লেখ করে দেবেন রিমাইন্ডারে। আজকেই যেন আউট হয় চিঠিটা।

কিন্তু রেফারেন্স খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ প্রবল এক গোলযোগ উপস্থিত হল অফিসে। ডেসপ্যাস-রেজিস্টার তন্নতন্ন খুঁজে আগের চিঠি যে পাঠানো হয়েছিল তার কোনও চিহ্নই

pathagar.net

পাওয়া গেল না। সায়ন এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, তার চিঠি নিশ্চই এতকালে পৌঁছে গেছে বিদেশে, তার প্ল্যান্টের ফরেন পার্টস হয়তো এর মধ্যে রওনা দিয়েছে, এসে পৌঁছাবে শিগগির। এখন জানতে পারল, সে চিঠি আদৌ পাঠানো হয়নি তার অফিস থেকে।

কথাটা সায়ন যেন বিশ্বাসই করতে পারল না। তার পর সারা অফিস তোলপাড় করে, ঋষিতার বাড়ি লোক পাঠিয়ে সন্ধের দিকে যে খবর তার কাছে পৌঁছাল, তা আরও অবিশ্বাস্য। কঙ্কা রায় চিঠি টাইপ করে সায়নকে দিয়ে সই করিয়ে দিয়ে এসেছিল ডেসপ্যাচ-ক্লার্ক ঋষিতা তালুকদারের কাছে। ঋষিতা যে-মুহূর্তে আরও কয়েকটা চিঠির সঙ্গে সে চিঠিও রেজিস্টারে নোট করতে যাবে, তখন তার একটি জরুরি ফোন আসে বাইরে থেকে। ফোনে তক্ষুণি তাকে বাড়ি চলে যেতে বলা হয়। ঋষিতা তড়িঘড়ি চিঠিগুলি ড্রয়ারে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে নেমে আসে নিচে। বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ কেউ তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, তাতে তার পায়ের বুড়ো আঙুলে এমন চোট পেয়েছে যে তার পরদিন থেকে আর অফিসেই আসতে পারেনি। ডেসপ্যাচে পরদিন থেকে অন্য একজন কাজ করছে বদলি হিসেবে। সে ওইসব চিঠির কথা জানেই না। ঋষিতাও কোনও খবর পাঠায়নি। চিঠিগুলো তার ড্রয়ারেই আছে এখন।

শুধু সায়নের মুখ থেকে প্রায় অবধারিতভাবে বেরিয়ে এল, অ্যাবসার্ড, কই, ড্রয়ারটা খুলুন তো—

ড্রয়ারের চাবি কারও কাছে নেই। ঋষিতার অবর্তমানে অগত্যা তালা ভাঙা হল ড্রয়ারের। আর আশ্চর্য, ড্রয়ারের ভেতর থেকে বেরোল চিঠির গোছা, তার মধ্যে কঙ্কা রায়ের টাইপ করা সেই চিঠিটাও।

সায়ন চিঠিটা হাতে নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল। তার চেতনা, তার বোধ যেন এখন আর ঠিকঠাক কাজ করছে না। সে ভাবতেই পারছে না, এরকম একটা ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে। কে ঋষিতাকে ফোন করল, কেনই বা করল, কেনই বা তাকে আহত হতে হল, তার কোনও সূত্রই খুঁজে পাচ্ছে না। সবকিছুই কি নিতান্তই কাকতালীয়, না কি কেউ সুপরিকল্পিতভাবেতে সব ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে আড়ালে থেকে। তারা কি তারই অফিসের লোক? প্রথমে তার মেশিন বার্স্ট করিয়ে, এখন গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটা ডেসপ্যাচ না করিয়ে আর দেরি করিয়ে দিতে চায় নতুন মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারটির উৎপাদন! তার অফিসের ভেতরেই কি তাহলে কাজ করছে কোনও দুষ্টচক্র? তারাই ঐন্দ্রিলাকে খুন করেছে? ভাবতে ভাবতে সায়ন স্থাণু হয়ে গেল একেবারে। তাকে ধ্বংস করার একটা প্রস্তুতি যেন প্রবলভাবে ঘনিয়ে আসছে চারপাশ থেকে। কিন্তু কে তারা? কেনই বা?

এসপ্ল্যানেড ইস্টের অফিস থেকে দ্রুত ড্রাইভ করে শরৎ বোস রোডের দিকে ফিরতে ফিরতে সায়ন ভাবছিল, তার অফিসের এত অফিসার, এত-এত স্টাফ, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তো তার এক নিবিড় সংযোগ, প্রত্যেকেরই সুখদুঃখের শরিক সে, অথচ তাদের মধ্যেই কেউ বা কারা অদৃশ্যে থেকে আয়োজন করে চলেছে সায়নেরই সর্বনাশ, তা কি কখনও সম্ভব! তার কোম্পানির ওঠাপড়ার সঙ্গে বাকি সবার ভবিষ্যৎই তো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তা জেনেও কি কেউ—

pathagar.net

চকিতে তার অফিসারদের মুখগুলো এক-এক লহমা ঘাই দিয়ে গেল মগজে। দফতরের যে-যে কর্মীর মুখগুলো তার চেনা, তাদের কথাও নাড়াচাড়া করল কয়েকবার। সে অফিসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ায়, মাথা নাড়িয়ে নড্ করে, কখনও চেম্বারে এসে কোম্পানির কাজকর্ম নিয়ে নিবিড় আলোচনা করে, সেই তারাই কি এভাবে চক্রান্ত করতে পারে তার আড়ালে গিয়ে! কেন কে জানে, সায়নের কিছুতেই বিশ্বাস হয় না সে-কথা। সে যে বড় বেশি বিশ্বাস করে মানুষকে।

নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে একা আপনমনে ঘাড় নাড়তে থাকে, তারই চেনা কেউ ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করেছে এ যেন সে ভাবতেই পারে না। অথচ পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের মত তাইই। সায়নের চেনাজানা সবাইকে ইন্টারোগেট করে তার ডায়েরি বোঝাই করেছেন। সায়নকে তো প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করছেন কিছু-না-কিছু। তার অফিসে, ফ্যাক্টরিতে ঘুরে ঘুরে কতকিছু দেখছেন, নোট নিচ্ছেন, জিজ্ঞাসা করেছেন একে-ওকে। এমনকি ফ্যাক্টরির নাইটগার্ড এতওয়ারিকেও অনেকক্ষণ জেরা করেছেন বার্স্ট হওয়া মেশিনটির ব্যাপারে। কে কে ফ্যাক্টরিতে বেশি রাত পর্যন্ত ছিল সেদিন কে কোথায় ডিউটি দেয়, এইসব।

দেবাদ্রি সান্যাল বলেছেন, এই পৃথিবীতে কী সম্ভব, আর কী সম্ভব নয়, তা কেউ জোর গলায় বলতে পারে না।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করতে করতে এই নিঃসঙ্গ, শব্দহীন ঘরে একা-একা ভারি মুষড়ে পড়ল সায়ন। তার অদৃষ্টই তাকে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে দেবে না। তা হলে এই একলা, হেরো, ফতুর জীবন সে আর এভাবে কতদিন টেনে নিয়ে বেড়াবে! এ ক'দিন যতক্ষণ অফিসে থাকত, তবু কিছুটা নিশ্চিন্তে কাটাত কাজের ভেতর ডুব দিয়ে। বাড়িতে ফিরলেই তো এই হা-হা নিঃস্ব রিক্ত ঘর, ঐন্দ্রিলার হাজারো স্মৃতি তাকে অবিশ্রান্ত ঝাপটে ঝাপটে অস্থির করে তোলে। রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারে না। চোখে তন্দ্রা এলেই হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে। কেমন শিরশির করে ওঠে শরীর। খোলা জানালা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ বুকের ভেতর একটা নিবিড়, চিনচিনে ব্যথা তাকে পোড়াতে থাকে। কেবলই মনে হয়, কখন রাত ফুরিয়ে সকাল হবে। সকাল হলে কোনওক্রমে চা খেয়ে, দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিয়ে অফিসে পৌঁছাতে পারলেই এড়াতে পারবে এই দুঃস্বপ্নের রাত। অফিসে কাজের অজস্র ব্যস্ততার ভেতর মুখ গুঁজে উটপাখির মতো পালিয়ে থাকতে পারবে সন্ধে পর্যন্ত। কিন্তু এখন সেই অফিসও যদি তার কাছে নিশ্চিন্তের জায়গা না হয়। তা হলে?

তা হলে কি পুলিশ অফিসারটি যেমন বলেছিলেন, সে কালীজীবনবাবুর নাম বলে দিয়ে তাকে অ্যারেস্ট করিয়ে দেবে? কালীজীবনবাবু অ্যারেস্ট হলেই ধরা পড়ে যাবে ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী? ফ্যাক্টরির নাইটগার্ড এত্ওয়ারির কাছ থেকে কালীজীবনবাবুর কথা জানতে পেরে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল সায়ন। ভদ্রলোক এসে হাউমাউ করে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরেছিল সায়নের, বিশ্বাস করুন স্যার, আমার পাড়ার ওই ছেলেটির ভাই বরানগরে হোস্টেলে থাকে। হঠাৎ কার কাছে খবর পেয়েছিল, ভাই নাকি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। তাই ফোন করে হোস্টেল-সুপারের কাছে খবর নিতে গিয়েছিলাম। আমি তো মাঝেমাঝেই দরকারমতো ফ্যাক্টরি থেকে ফোন করি। আপনাকেও একবার রাতে ফোন করেছিলাম, বোধহয় আপনার মনে আছে।

খুবই দায়িত্বশীল মানুষ কালীজীবনবাবু। অ্যাকাউন্টস-সেকশনের খুঁটিনাটি হিসেব তার নখদর্পণে। খুবই সৎ এবং অভিজ্ঞ। এহেন মানুষ কি—

pathagar.net

একা-একা এমনতর সব ভাবনায় সায়ন যখন ছিন্নভিন্ন, ক্ষতবিক্ষত, সেসময় তাকে সচকিত করে বেজে উঠল টেলিফোনের শব্দ। ভাবনার যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হতে বিস্মিত হয়ে ভাবল, কে-ই বা এত রাতে তাকে স্মরণ করবে? অফিসেরই কেউ, না কি আবার পুলিশের লোক!

রিসিভার তুলতেই ওপাশে গার্গীর গলা, আপনি কি আমাকে এখানে সত্যিই নির্বাসনে দিয়ে গেলেন, সায়নদা?

গার্গীর কণ্ঠস্বরে কেমন একধরনের অভিমান, যন্ত্রণা। সায়ন চমকে উঠে বলল, তুমি কোত্থেকে ফোন করছ?

—আলোদার পাশের বাড়ি থেকে। বাধ্য হয়ে করতেই হল। বুঝতে পারিনি, আমি হঠাৎ এসে পড়ে এমন বোঝা হয়ে উঠব আপনার কাছে। ঠিক আছে, আর কখনও বিরক্ত করব না আপনাকে। কাল সকালেই আমি আমার নিজের পথ দেখে নেব।

সায়ন কোনও কিছু বলার আগেই ওপাশে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে গার্গী, আর তা হওয়ারই কথা। সায়ন রিসিভার হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সহসা ভীষণ এক অনুশোচনায় ভরে গেল তার শরীর। এই মুহূর্তে মনে করতে পারছে না, ঠিক কতদিন আগে সে গার্গীকে জিম্মা দিয়ে এসেছিল আলোদার কাছে। দুদিন, তিনদিন, না কি সাতদিন! সেই যে চলে এসেছিল গার্গীর জন্য অন্য কোথাও আশ্রয় ঠিক করে দেবে বলে, তারপর নিজের অফিস আর একাকীত্ব নিয়ে যন্ত্রণায় এতখানি ক্ষতবিক্ষত হয়েছে যে গার্গীর কথা ভাবেনওনি আর।

নাকি ভেবেওছিল! কিন্তু সেদিন আলোদার প্রস্তাবে সে এমন চমকে উঠেছিল যে সল্টলেকে যাওয়ার কথা মনে হলেই কী এক উত্তেজনায় আক্রান্ত হয়েছে। তাই এভাবেই পালিয়ে থাকতে চাইছিল গার্গীর কাছ থেকে। এবং হ্যাঁ, নিজের কাছ থেকেও। কিন্তু কাল সকালেই 'আমি আমার নিজের পথ দেখে নেব' বাক্যটি পুনর্বার তার মগজে ঘাই দিয়ে উঠতেই সে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। যা জেদি আর একগুঁয়ে মেয়ে গার্গী! ঘড়িতে নজর করে দেখল, রাত তখন নটার মতো। এখনও যদি সে বেরিয়ে পড়ে—

তৎক্ষণাৎ গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করে হু-হু করে চালিয়ে দিল সেই পথে, সে পথ দিয়ে সেদিন গিয়েছিল গার্গীকে পাশে বসিয়ে নিয়ে। প্রবলগতিতে, প্রায় সম্বিতবিহীন হয়ে চালিয়ে মিনিট চল্লিশের মধ্যে সে গিয়ে পৌঁছাল তার গন্তব্যে।

আলোদা বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন, গার্গীর ফোন পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসবে সায়ন। গেট খুলে দিতে দিতে বললেন, বেশ লোক তুমি যা-হোক। মেয়েটাকে দিয়ে গেলে, তারপর একবার খোঁজও নিতে এলে না!

সায়ন কিছু বলতে পারছিল না। অনুশোচনা ক্রমাগত গ্রাস করেছিল তাকে। সে যে কী প্রবল ঝামেলার মধ্যে আছে, কী ভয়ঙ্কর টেনশনে, তা বললে কি এঁরা বুঝবেন!

গার্গী তখন অভিমানে, রাগে থমথমে হয়ে আছে। একবারও এল না সায়নের সামনে। পাশের ঘরেই আছে, অথচ এড়িয়ে থাকছে সায়নকে। যেন এক রুদ্ধশ্বাস ঝড় ওতপ্রোত হয়ে আছে তার শরীরে। যে কোনও মুহূর্তে সে ঝড় তুমুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সায়নের ওপর।

সুচন্দনী বেরিয়ে এসে সায়নের চেহারা দেখে কিন্তু আঁতকে উঠলেন, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার? দাড়ি কামাননি কেন এ ক'দিন?

আলোদা হাসতে হাসতে বললেন, গার্গী ঠিক এরকমই বলছিল কাল, বলছিল, জানেন, সায়নদা একা ঘরের ভেতরে কীরকম ছিরকুট্টি হয়ে থাকে! নিজের হাতে কিছু করতে পারে

pathagar.net

না। ঘরের ময়লা যেমন কে তেমন পড়ে থাকে। কেউ পরিষ্কার করারও নেই। বদলানো হয় না বিছানার চাদর। একই চাদরে দিনের পর দিন শোয়। দাড়ি কামানোর কথাও মনে থাকে না তার।

সায়ন হেসে দুগালের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলল, কদিন ধরে অফিসে যা ঝড়ঝাপটা গেল, তার দাপট সামলাতেই আমি অস্থির। শেভ করার কথা মনেই পড়েনি।

আলোদা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, আবার কী হল?

—আর বলবেন না, সায়ন হাসতে হাসতে গত কয়েকদিনের ঘটনা বিবৃত করে বলল, আমার কোম্পানিতেই এখন স্যাবোটেজ শুরু হয়ে গেছে। আর বোধহয় চালানো গেল না। ব্যাবসাপাতি বন্ধ করে দিতে হবে মনে হচ্ছে।

—গার্গী তাহলে ঠিকই বলছিল। বলছিল, নিশ্চই অফিসে আবার কোনও ঝামেলায় পড়েছে। অফিসে ঝামেলা হলে আর কোনও হুঁশজ্ঞান থাকে না বাবুর। সেইজন্যে খোঁজখবর নিতেও পারছে না।

সায়ন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, ঠিকই বলেছে। এ কদিন একা-একা এ, সব টাইফুনের ঝাপটা সয়েছি, আর ক্রমাগত শ্রিঙ্ক করেছি নিজের ভেতর। মনে হচ্ছিল, এই চাপ বোধহয় আর সইতে পারব না। এরপর হয় পাগল হয়ে যাব না হয়—

আলোদা হঠাৎ মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, ছি সায়ন, এত ভেঙে পড়লে চলে! শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই দেওয়াই হল মানুষের কাজ। জীবনটাকে ওয়ান-ডে ক্রিকেটের মতো ভেবে নাও। শেষ বল পর্যন্ত যুঝে যেতে হবে। শেষ বলেও বহু খেলার ফয়সালা হয়।

সায়নের এই উদ্‌ভ্রান্তি কাটিয়ে দিলেন সুচন্দনী, প্রায় ম্যাজিকের মতো ধূমায়িত চায়ের কাপ তার সামনে এগিয়ে দিয়ে। চা পেয়ে সায়ন বর্তে গেল, প্রায় শিশুসুলভ হাসি হেসে শব্দ করে চুমুক দিতে দিতে বলল, গার্গী আসবে না চায়ের আসরে?

আলোদা হো হো করে হেসে উঠে বললেন, নাহ, ও ভীষণ রেগে গেছে। বলেছে, সায়নদা আমাকে এখানে ডাম্প করে দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখব না এরপর। আমি যথেষ্ট সাবলম্বী, নিজেই নিজের পথ দেখে নিতে জানি।

সায়ন বিব্রত হয়ে ফের হাসল, একবার ভেতরের ঘরের দিকে চোখ চালিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল, কোন নিভৃত কোণে নিজেকে অন্তরিন রেখেছে গার্গী। না দেখে শুধু আবার শব্দ করে চুমুক দিল চায়ের কাপে।

সেদিন আরও একপ্রস্থ জম্পেশ খাওয়াদাওয়ার পর আলোদা আবার একান্তে ডাকলেন সায়নকে, বললেন, আমার প্রস্তাব নিয়ে আর কিছু ভেবেছ?

—কোন প্রস্তাব? সায়ন যেন বিস্মিত।

— আমার মনে হয়, এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। মেয়েটাকে দেখেও আমি বুঝেছি, ও তোমাকে ভালবাসে। খুবই ভালবাসে। সারাক্ষণ তুমি একা-একা ফ্ল্যাটে কীভাবে কাটাচ্ছ, কত কষ্টে আছ ভেবে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। এদিকে তুমি তার খবর একবার নিচ্ছ না দেখে গুম্ হয়ে থাকছে রাগে, ক্ষোভে। আর তাছাড়া—, তাছাড়া এখন ওর সামনে ফেরারও কোনও পথ নেই।

সায়ন কিন্তু আগের দিনের মতোই মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিল আলোদার প্রস্তাব, তা হয় না, আলোদা। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে, তার রেশ মেলায়নি এখনও।

আজও সর্বক্ষণ মনে হয়, ঐন্দ্রিলা নেই, তবু সে যেন আমার কাছে-কাছে ঘুরছে, হাসছে, কথা বলছে, শুধু আমার কাজে সে সাহায্য করতে পারছে না দেখে কষ্ট পাচ্ছে মনে মনে।

একটু চুপ করে থেকে আলোদা বললেন, সবই আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার পক্ষে এখন একা থাকাও যে কী কষ্টকর তাও অনুভব করতে পারি। ঐন্দ্রিলা নেই বলেই সারাক্ষণ আফসোস করছে গার্গীও। তবু গার্গীকে তোমার এখন দরকার। কেন, তুমি কি গার্গী সম্পর্কের কিছুই অনুভব করতে পার না?

—পারি, আলোদা। পারি বলেই এ কদিন কেবলই ভেবেছি, গার্গীকে নিয়ে আমি এখন কী করব, কোথায় রাখব। আমাকে বাঁচাতে গিয়েই তো ও এমন বিপদের মধ্যে পড়েছে। আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে এখন ওর কত দুর্নাম হয়ে গেল। সবই বুঝতে পারি, কিন্তু সমাজ বলেও তো একটা কথা আছে।

আলোদা হাসলেন, সমাজে যা দুর্নাম হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। বরং বিয়ে না করে এভাবে দুজনে ঘুরলেই দিন দিন আরও দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে। সে আরও কষ্টকর ব্যাপার। ভেবে দ্যাখো কথাটা।

সায়ন তখনও প্রবলভাবে মাথা নেড়ে চলেছে, তা হয় না আলোদা। নানা কারণে আমার মনটা ভাল নেই। দেবাদ্রি সান্যালের একটা কথা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। বলেছিল, আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ কি আপনার ফ্ল্যাটে আসে? কথাটা শুনে ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম, কিন্তু কাল মোহনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি জানো মোহন, কেউ আসত কি না? মোহন ঘাড় নিচু করে কেবল বিড়বিড় করতে লাগল, আমি জানি না সাহেব, আমি জানি না। আমি কিছু দেখিনি। কিন্তু তার বলার ধরনটা ভাল লাগল না। মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল, কিছু একটা লুকোতে চাইছে সে। তারপর থেকে এত যন্ত্রণা হচ্ছে ভেতরে যে, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। বেঁচে থাকতে যাকে কখনও কণামাত্র সন্দেহ করিনি, তার মৃত্যুর পর হঠাৎ এ কী বিষ ঢুকে গেল মনে! কে আসত তা হলে? কেনই বা আসত? সত্যিই কি আসত?

আলোদা ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমার কী মনে হয়? কেউ আসত?

সায়ন তখনও অন্যমনস্ক হয়ে বিড়বিড় করছে, আমি কিছুই জানি না। হয়তো রবার্ট আসত। দ্যাট্ ওল্ট ব্লাডি ফেলো। মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাতে ও ভারি ওস্তাদ। কিন্তু ভাবনাটা মনে এমন গেঁথে গেছে যে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না।

আলোদা সান্ত্বনা দিলেন, সেটা না-ও হতে পারে। যতক্ষণ না কোনও প্রমাণ পাচ্ছ, সন্দেহ করে লাভ নেই। শুধু শুধু ড্রিপেশনে ভুগবে। আর সেজন্যেই তো গার্গীকে এখন তোমার চাই। একমাত্র সে-ই পারবে তোমাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে। ওকে তো কদিন ধরে আমি দেখলাম।

—তবু এ বিয়েটা হলে চারদিকে কী ভীষণ ঝড় বয়ে যাবে তা ভাবতে পারছেন? ঢি ঢি পড়ে যাবে চারদিকে।

—ঢি ঢি পড়ার আর কিছু বাকি আছে নাকি? বিয়ে করলে হয়তো ক'দিন হইচই হবে, কানাকানি হবে, আলোচনা হবে, কাগজে লেখালেখি হবে, কিন্তু তাতে নিত্যনতুন গল্প খোঁজার তাগিদ চলে যাবে সবাইকার।

সায়ন তবু সুস্থির হতে পারে না, বলল, কিন্তু হত্যার রাতে আমি যে কলকাতায় ছিলাম না সেটাই তো বিশ্বাস করছে না পুলিশ। বারবার ট্রেনের টিকিটের তারিখের কথা বলছে। আমরা মা ও রবার্ট পুলিশের কাছে স্টেটমেন্টে বলেছে, সেদিন মধ্যরাতে তারা ল্যাবরেটরিতে আলো

pathagar.net

জ্বলতে দেখেছে। সবাই জানে একমাত্র আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কারও ল্যাবরেটরিতে প্রবেশাধিকার নেই, এমনকি ঐন্দ্রিলার কাছে চাবি থাকত, সেও কখনও ঢোকেনি ভেতরে, পাছে আমার কাগজপত্র এদিক-ওদিক হয়ে যায়। তাহলে সেদিন নিশ্চয় আমিই ছিলাম। কোর্ট তো মুখের কথায় বিশ্বাস করবে না—

আলোদা অদ্ভুতভাবে হাসলেন, বললেন, কাল গার্গীর সঙ্গে ডিটেইল্‌স আলোচনা হয়েছে এ ব্যাপারে। একটা ভাল পয়েন্ট বার করেছে ও। দাঁড়াও, ভেতর থেকে আসছি—

বলে আলোদা হঠাৎ উঠে গেলেন, একটু পরেই দুটো কাগজ এনে সায়নের হাতে দিলেন—তার একটি খড়গপুরের কোনও এক আদিবাসী-ক্লাবের ছাপানো আমন্ত্রণপত্র, অন্যটি উলুবেড়িয়ার কাছে একটি মোটর-রিপেয়ারিং গ্যারেজের বিল। বললেন, কাল কাগজদুটো হঠাৎই পেয়ে গেলাম শার্টের পকেটে, যে শার্ট পরে গিয়েছিলাম বিলাসপুরে। বিলাসপুর থেকে এসে হঠাৎ গুজরাত চলে যেতে হওয়ায় শার্টটা কাচতে দেওয়া হয়নি তখন। হয়নি বলেই কাগজ দুটো পেয়ে গেলাম ভাগ্যক্রমে। পরে কোর্টে লাগবে। কোর্টে হয়তো ওখানকার কাউকে কাউকে সাক্ষী হিসেবে ডেকে পাঠাবে।

সায়ন হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কাগজ দুটোর দিকে। অবাক হল গার্গীর বিচক্ষণতার কথা ভেবে। পরক্ষণেই কী যেন মনে পড়তে হঠাৎ বলল, গার্গীকে একবার ডাকুন তো। একটা দরকারি কথা আছে—

আলোদা হেসে বললেন, গার্গী রাগের চোটে ও-পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমার সামনে আসতেই চাইছে না।

গার্গী ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু সায়নের চোখে ঘুম এল না সে-রাতে। চোখ জুড়ে তন্দ্রা এসেও ফিরে গেল কতবার, কখনও ঘুম আসতে না আসতে চটকা ছুটে গেল। খুব ভোরে উঠে বারান্দায় এসে দেখল এক দুর্লভ দৃশ্য। গার্গী তারও আগে উঠে হাঁটছে সামনের রাস্তায়। ঘন নীল রঙের একটি শাড়ি ঘিরে রেখেছে তার দিঘল শরীর, চুল এলো হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে পিঠময়, ছোট-ছোট স্টেপ ফেলে রাস্তায় পায়চারি করছে এদিক থেকে ওদিক, আবার ওদিক থেকে এদিক। তাকে ভোরের মতোই স্নিগ্ধ আর পবিত্র লাগছে।

সায়নও দ্রুত এগিয়ে গেল, আস্তে করে ডাক দিল, গার্গী—

গার্গী তার দিকে তাকাল, কিন্তু কথা বলল না।

—গার্গী, সেদিন দেবাদ্রি সান্যাল কয়েকটা কথা বলে গেলেন। খুবই অদ্ভুত কয়েকটা পয়েন্ট, তার মধ্যে একটি আমার কাছে খুব আশ্চর্য মনে হয়েছে। কাল রাতেই ভেবেছিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করব।

গার্গী জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। এবারও কোনও কথা বলল না।

—বললেন বিয়ের আগে ঐন্দ্রিলার কোনও প্রেমিক ছিল কি না। সে প্রেমিক এখনও ঐন্দ্রিলার কাছে যাতায়াত করত কি না। আমি উত্তরে বললাম, আমার জানা নেই। তবে এ বাড়িতে সে এলে নিশ্চয় জানতে পারতাম। তখন জানালেন ঐন্দ্রিলার বাবাকেও উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ঐন্দ্রিলার বাবা প্রথমে গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, না। শেষে নাকি বলেছেন, কোনও এক যুবকের কাছে ফরাসি ভাষা শিখতে যেত ঐন্দ্রিলা। ভাল নাম বলতে পারেননি, ডাক নাম, রুনু। রুনু মুখার্জি। কবিতা লিখত নাকি। ঐন্দ্রিলার বাবা ভাষা শেখার ব্যাপারে বারণ করেননি মেয়েকে। কিন্তু পরে একদিন ঐন্দ্রিলার খাতার ভেতর একটা চিঠি পেয়েছিলেন। চিঠিটা ফরাসি ভাষায় লেখা। চিঠির মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেননি, তবে তার সম্বোধনটি পড়ে নাকি

pathagar.net

বুঝেছিলেন, সেটি প্রেমপত্র। পরদিন থেকেই মেয়ের ফরাসি ভাষা শেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, বলতে বলতে সায়ন থামল, তারপর একটু পরে বলল, তুমি জানো, কে রুনু?

গার্গী গম্ভীর হয়ে বলল, রুঙ্কা ফরাসি ভাষা শিখতে যেত তা জানি। কিন্তু কার কাছে তা জানি না। কিন্তু সে কথা এখন জেনে কী লাভ?

—তার সঙ্গে কিন্তু ঐন্দ্রিলার এখনও যোগাযোগ ছিল? কথাটা ভেবে কী জানি কেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।

গার্গী আরও গম্ভীর হয়ে বলল, যে দু'বছর ঐন্দ্রিলা আপনার কাছে ছিল, কখনও কি আপনার মনে হয়েছে, সে অন্যের কথা ভাবছে? উপেক্ষা করছে আপনাকে?

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সায়ন বলল, না, কখনও মনে হয়নি।

—তাহলে আর শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন কেন? রুঙ্কার হয়তো কোনও একটা ছোট্ট খেয়ালিপনা ছিল। সে তো অনেক মেয়েরই থাকে। সেটা বড় করে দেখছেন কেন। আপনারও তো সারাদিনে কতজনের সঙ্গে আলাপ হয়, কথাবার্তা হয়, তার মধ্যে মেয়েও তো থাকে কতজন। তা নিয়ে রুঙ্কা কি কখনও ভাবত, না ভেবে কষ্ট পেত! তবে জেনে রাখুন, রুনু যেই হোক না কেন, এ বাড়িতে সে এলে আপনার অজানা থাকত না। আপনাদের দারোয়ান মোহন জানত তাহলে।

—কিন্তু হত্যার রাতে মোহন ছুটিতে গিয়েছিল।

গার্গী তার দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল, ভুরু কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল সহসা।

সেই মুহূর্তে আলোদা বারান্দায় এসে ডাক দিলেন তাদের, শিগগির শোনো—

তারা দুজনে ঘরে ঢুকতেই হইহই করে উঠলেন আলোদা, খুবই সুখবর সায়ন, গার্গীর জন্য একটা দারুণ থাকার জায়গা খুঁজে পেয়েছি। খুব নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে।

সায়ন আশার আলো দেখল আলোদার দিকে তাকিয়ে। গার্গীও উৎফুল্ল হয়ে বলল, কোথায়?

আলোদা হাসলেন, কাল রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আইডিয়া মাথায় এল। এ কদিন কেন মনে পড়েনি তাই ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। সুচন্দনীও বলল, ওইটেই সবচেয়ে ভাল জায়গা। দাঁড়াও, পাশের বাড়িতে গিয়ে টেলিফোন করে খবরটা ঠিকঠাক নিয়ে আসি।

সুচন্দনী তখন রান্নাঘরে সেঁধিয়ে গিয়েছেন, বোধহয় ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে ব্যস্ত। আলোদা বেরিয়ে যেতে সায়ন তাকাল গার্গীর দিকে। কাল থেকে কথাই বলেনি সায়নের সঙ্গে। এখনও তার দুচোখ জুড়ে শুধু অভিমান আর অভিমান। অভিমানের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গেছে ক্ষোভ, ক্রোধ, একটা যন্ত্রণাও। আলোদা বেরিয়ে যেতেই বলল, যাক্, আলোদার কল্যাণে তবু আমার বোধহয় একটা হিল্লে হল। অন্তত আপনার শিরঃপীড়ার কারণ হচ্ছি না দেখে স্বস্তি পাচ্ছি। যেভাবে আমাকে নির্বাসন দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন—

সায়ন কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। সে কী যে টানাপোড়নের মধ্যে আছে, কেন যে গার্গীর মুখোমুখি হওয়ার সাহস অর্জন করতে পারছে না, তা গার্গী বুঝবে না, বুঝতে চাইবে না। সে তার সায়নদাকে ভালবাসে, অতএব সায়নদাই তার উদ্ধারকর্তা হবে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

গার্গীর এহেন আক্রমণে আরও বিপর্যস্ত হয়ে উঠল সায়ন, তবু বলল, ভাল জায়গাতেই তোমাকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলাম। আলোদা হয়তো এমন ভাল জায়গায় তোমাকে রাখার ব্যবস্থা করছেন, যা আমি পারতাম না।

pathagar.net

গার্গী চোখে আগুন জ্বেলে প্রায় ভস্ম করে দিতে চাইল সায়নকে। ঋষি দুর্বাসার মতোই। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরেই ফিরে এলেন আলোদা, তাঁর মুখে তখন বিশ্বজয়ের হাসি, এসেই হইহই করে বললেন, আমার মিশন সাকসেসফুল, প্লিজ গেট রেডি বাই নাইন থার্টি। সুচন্দনী, সুচন্দনী, শিগগির ব্রেকফাস্ট রেডি করে ফেলো। হেভি ব্রেকফাস্ট।

আলোদা এমন হইচই করতে লাগলেন যে সায়ন গার্গী দুজনেই কিছুটা উৎফুল্ল, কিছুটা অনিশ্চিত চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। সায়ন দু-একবার জিজ্ঞাসাও করল, কোথায় সায়নদা। কোনও হোস্টেলে নাকি?

—প্রায় সেরকমই। তবে তোফা আরামে থাকবে গার্গী। সায়নকে তার দুশ্চিন্তায় ভুগে ভুগে চোখের কোণে কালি ফেলতে হবে না। বলতে বলতে আবার হাঁক দিলেন আলোদা, সুচন্দনী, ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়ে গেলে তুমিও রেডি হয়ে নাও। আমরা সবাই মিলে গার্গীকে নতুন আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

সাড়ে নটার মধ্যেই সায়নের মারুতিতে চড়ে বেরিয়ে পড়ল সবাই। গার্গী তার একমাত্র সম্পত্তি ছোট্ট সুটকেসটা বয়ে নিয়ে চলেছে এক আস্তানা থেকে আর আস্তানায়। কদিন আগেও সে একবারও ভাবতে পারেনি তাকে এভাবে ক্রমাগত এক অনিশ্চিত জীবনযাপনের শরিক হয়ে উঠতে হবে। সমস্ত রাস্তা সে চুপচাপ, গম্ভীর হয়ে রইল। আলোদাই যা দু-একটা কথা বলছিলেন। মাঝে মধ্যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন সায়নকে—কোন পথে তাদের গন্তব্য। বিজন সেতু পার হয়ে সোজা গিয়ে পৌঁছাল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ক্রশিংয়ে, সেখান থেকে ডাইনে বাঁক নিয়ে হাজরা মোড়ের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ অন্য এক লেনের ভেতর ঢুকে যে বাড়িটার সামনে তারা পৌঁছাল, সেটা হিন্দু মিশন।

এমন একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে তাই-ই জানত না সায়নরা, এটা কিসের প্রতিষ্ঠান, কী হয় এখানে তাও অবহিত ছিল না। গাড়ি থেকে নেমে দেখল, আলোদার পরিচিত আরও এক দম্পতি তাদের অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়ে, তাঁদের হাতে অজস্র ফুলের সম্ভার, একটি চমৎকার বোকেও।

সায়ন, গার্গী দুজনেই হকচকিয়ে গেল, হঠাৎ তাদের এমন ফুলেল অভ্যর্থনা কেন তাও বুঝে উঠতে পারল না। বাড়িটার ভেতর ঢুকে আলোদা হাসি-হাসি মুখে বললেন, বুঝলে, রেজিস্ট্রি অফিসেও যেতে পারতাম, কিন্তু সেখানে একমাসের নোটিস দিতে হয়। অবশ্য ব্যাকডেটে সে-সবও করা যেত, কিন্তু আইনত একমাস আগে তুমি নোটিস দিতে পার না। তাইই হিন্দু মিশনে আসতে হল।

এতক্ষণে সায়নের কাছে খোলসা হল ব্যাপারটা। বুঝতে পেরেই তার পা নিথর, অবশ হয়ে গেল, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, এ সব কী, আলোদা?

আলোদা তাকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, কী সেটা একটু পরেই জানতে পারবে। এখন এদিকে এসো। বেশি সময় লাগে না এখানে, মাত্র পাঁচমিনিটের নোটিসেই সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

সায়ন একা নয়, গার্গীও ততক্ষণে নির্বাক। এ কোথায় তাদের নিয়ে এলেন আলোদা, কেনই বা, তা বুঝতে সেও খানিকটা সময় নিল। তারপর সায়নের রক্তশূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে।

pathagar.net

আলোদা যেমন বলেছিলেন, মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অসম্ভব ঘোরের ভেতর মুখোমুখি হল সায়ন তার গার্গী। কেউ কারও দিকে তাকাতে পারছিল না। যেন এক ধূসর স্বপ্নে ভেতর দুজনে দাঁড়িয়ে, স্পন্দনহীন, রুদ্ধশ্বাস। সে মুহূর্তে যা করার আলোদারাই করলেন। নামাবলি গায়ে জড়ানো পুরোহিত যন্ত্রের মতো পালন করলেন তাঁর ভূমিকা। এক অসম্ভবকে চমৎকার কৌশলে সম্ভব করে মুচকি মুচকি হাসছিলেন আলোদা, সুচন্দনী বউদি।

সায়ন-গার্গী দু'জনেরই ভেতর তখন এক ভুঁইকাঁপ চলছে। প্রবল টানাপোড়েনে, তীব্র অস্থিরতায়, গভীরতর এক উত্তেজনায় তখন লীন হয়ে যাচ্ছে দুজনের সত্তা, দুজনের অস্তিত্ব, দুজনের ভেতর এতাবদ জমা হয়ে থাকা যাবতীয় টালমাটাল। পরিবর্তে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন চাঞ্চল্য, শঙ্কা, এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা।

সায়ন-গার্গীর বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না আলোদা। হিন্দু মিশন থেকে বেরিয়ে সবাই মিলে হাজির হলেন একটা বাঙালি হোটেলে। চমৎকার ছিমছাম হোটেলটির একটি নির্জন কোণ বেছে নিয়ে একরাশ খাবারের অর্ডার দিলেন হইহই করে। খাওয়াও হল প্রায় রাজকীয়ভাবে, অনেকক্ষণ ধরে। আলোদারা বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন সায়ন আর গার্গীর অপ্রস্তুত মুহূর্তগুলো। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দুজনকে শুভকামনা জানিয়ে বললেন, গো অ্যান্ড এনজয় টু-নাইট। আজ তোমাদের বাসর। তবে তার আগে কাগজের অফিসে একটা ফোন করে জানিয়ে দিয়ো ঘটনাটা। না হলে কাল আবার কী না কী লিখবে।

আলোদাদের বিদায় দিয়ে দুজনে কিছুক্ষণ এলোমেলো ঘুরল, তারপর প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো ফিরে এল তাদের শরৎ বসু রোডের ফ্ল্যাটে। এমন অবিশ্বাস্যভাবে ঘটনাটা ঘটে গেল যে গার্গী বিমূঢ়, ভাল করে তাকাতেও পারছে না সায়নের দিকে। বন্ধ ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দুজনে ঘরের ভিতর ঢুকল, গার্গীর মনে হল তার শীত করছে, শরীর জুড়ে এক অদ্ভুত কাঁপুনি। সে কাঁপুনি আনন্দের, না ভয়ের, না লজ্জার তা সে জানে না।

কয়েকদিন আগেও গার্গী অনুমান করতে পারেনি, তাকে সত্যিই এহেন অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

সল্টলেক যেদিন সে যায়, তখন কিন্তু ভেবেছিল, সায়নের সঙ্গে একই বাড়িতে পাশাপাশি ঘরে রাত কাটানো তার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। অথচ এ কদিনে পরিস্থিতি বদলে গেছে আমূল। আজ ভাবতে পারছে না, কীভাবে একজন পুরুষের সঙ্গে একই ঘরে থাকবে সে!

সোফার উপর আড়ষ্ট, জবুথুবু হয়ে গার্গীকে বসে থাকতে দেখে সায়ন হঠাৎ বলল, অমন চুপচাপ হাত-পা ছেড়ে বসে থাকবে চলবে? সবে তো যুদ্ধের শুরু। এখনও অনেক ঝামেলার মোকাবিলা করতে হয় আমাদের। নাও, ওঠো—

গার্গী হতভম্ব হয়ে তাকাল সায়নের মুখের দিকে। সায়নের কণ্ঠস্বরে কিছু হালকা মেজাজ, যেন কিছুই হয়নি এমন একটা অনুভূতি। হঠাৎ কীভাবে এমন সহজ হয়ে উঠল সায়ন তা ভেবে আশ্চর্য হল, কেঁপেও উঠল গার্গী। একটা অজানা ভয়ও ঘিরে ধরল তার শরীর। সোফার জড়তা ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াতেই পারল না।

পাশের ঘর থেকে ততক্ষণে জামাকাপড় বদলে এসেছে সায়ন। খুবই স্বচ্ছন্দ, সাবলীল মনে

pathagar.net

হচ্ছে তাকে। অথচ এই বিয়ের জন্য সেইই প্রস্তুত ছিল না একেবারে। আলোদাই তো তাকে জোর করে নিয়ে এসে—

—নাও, ড্রেসটা চেঞ্জ করে এসো, গার্গী। আলোদা বলেছেন, আজ আমাদের বাসর। কিন্তু বাসর জাগবার লোক নেই যখন, তখন আমরা দুজনেই আজ জাগব। বুঝলে, একটা অন্যরকম কিছু করি আমরা, আন্‌কমন্‌। পুরো ব্যাপারটাই যখন স্বপ্নের মতো হল, তখন বিয়ের প্রথমরাত আমরা নতুন কোনও পদ্ধতিতে এন্‌জয় করি—

হঠাৎ একজন পুরুষের সঙ্গে একটি ফ্ল্যাটে রাত কাটাতে হবে ভাবতেই সারাটা শরীর কেঁপে উঠল গার্গীর। কোনও পুরুষের সঙ্গে এভাবে প্রথম রাত, এমন গা-শিরানো মুহূর্ত মেয়েদের জীবনে একবারই আসে, সব মেয়েদেরই তা কাঙ্খিত, তবু গার্গী কিছুকাল আগেও ব্যাপারটা আদপেই ভাবেনি। তার জীবন বয়ে চলেছিল একেবারে ভিন্ন খাতে, বিপরীত মেরুতেই বলা চলে, হঠাৎ প্রলয়ের মতো সেই রাত্রি তার জীবনে এমন দাপিয়ে এসে গেল কীভাবে, তা ভেবে ক্রমশ নিথর হয়ে আসছিল তার হাত-পা।

সায়নও যেন তার কাছে এই মুহূর্তে কেমন অচেনা, দুর্বোধ্য। তার কথা বলার সহজ ভঙ্গিটুকুই আরও আশ্চর্য করছিল তাকে। যাকে সে বহুকাল ধরে দেখে আসছে এক অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে, সেই যুবকের সহসা তার জীবনে পুরুষ হয়ে ওঠাটাই রীতিমতো বিস্ময়ের। তার ওপর সে যদি এমন রহস্যময় হয়ে ওঠে—

একবুক অস্থিরতা নিয়ে গার্গী ঢুকে পড়ল পাশের ঘরে, গিয়ে ছিটকিনি তুলে দিল। তাতে স্বস্তিও পেল যেন। পাশের ঘরটিই শোওয়ার ঘর। শোওয়ার ঘরে যেভাবে নবদম্পতির বাসর হয় তার কোনও অনুষঙ্গই আজ এ-ঘরে নেই, থাকার কথাও নয়, বরং পোশাক বদলানোর ফাঁকে সহসা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কেমন ছমছম করে উঠল তাঁর শরীর। সর্বত্রই তো ঐন্দ্রিলার ছাপ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। এ ক'দিন যতবার এ ঘরে এসেছে গার্গী, প্রতিবারই মনে হয়েছে, ঐন্দ্রিলা যেন বলছে, ছি মিতুন, তুই থাকতেও ও এমনভাবে কষ্ট পাবে! কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্নরকম। আজ যেন ঐন্দ্রিলা তার শতচক্ষু বিস্তৃত করে দেখছে গার্গীকে, আর স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে তার কাণ্ডকারখানায়। যেন তার ফেলে যাওয়া রাজ্যপাটে হঠাৎ দখল বসিয়েছে গার্গী।

কথাটা মনে হতেই দারুণভাবে শিরশির করে উঠল গার্গীর শরীর। পোশাক বদলে সে দ্রুত বেরিয়ে আসতে চাইল ঘর থেকে। বেরিয়ে আসার মুহূর্তে হঠাৎ নজর পড়ল খোলা জানলার ভেতর দিয়ে ও পাশের ফ্ল্যাটের দিকে। অন্ধকারে মনে হল, হিমনদের ফ্ল্যাটের এদিককার জানলা খোলা, সেখানে পর্দা সরিয়ে কেউ যেন তাকিয়ে আছে এদিকে। পুরুষ কিংবা নারী তা ঠিক বুঝতে পারল না, শুধু একজোড়া চোখ অন্ধকারে যেন জ্বলছে। অপলক অপেক্ষা করছে কখন এ ফ্ল্যাটের পর্দা হাওয়ায় উড়ে বেআব্রু করে দেবে ঘরটাকে।

দ্রুত জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে সে চলে এল বাইরের ঘরে। এক অদ্ভুত মিশ্র অনুভূতিতে তার বুকের ভেতর স্টিমারের ভট্‌ভট্‌ শব্দ। এ-ঘরে তখন এতদিনের চেনা সায়ন তার দিকে তাকাচ্ছে কেমন স্বপ্নিল দৃষ্টিতে। গার্গীর পরনে যে চমৎকার রাত পোশাকটি, সমুদ্র-নীল রঙের, একটু হাওয়া লাগলেই ফুলে ওঠে এমন ফুরফুরে, সেদিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল, আজ রাতটা আমরা জেগেই কাটাব, তবে ঘরের ভেতর নয়।

গার্গীর শরীর অবশ, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, জিজ্ঞাসাও করতে পারল না, কোথায়—

সায়ন নিজেই বলল, অনেকদিন ছাদে ওঠা হয় না। চলো, আজ দু'জনে ছাদে গিয়ে বসি।

pathagar.net

অবাক হল গার্গী, তবু মনে হল সায়ন যা বলেছে সেইটেই ঠিক এই মুহূর্তে। চারপাশের দেওয়াল-ঘেরা পরিসর ছেড়ে খোলা ছাদে পালিয়ে যাওয়াটাই এখন সবচেয়ে স্বস্তির। ততক্ষণে দু'খানা বেতের চেয়ার দু'হাতে ঝুলিয়ে নিয়েছে সায়ন, কুশন দুটো গার্গীর হাতে দিয়ে বলল, চলে এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সায়নের পিছুপিছু চলে এল গার্গী, ছাদে এসে মুগ্ধ হয়ে দেখল, রাতের কলকাতা ক্রমশ রহস্যময় হয়ে উঠছে। সায়নদের দোতলার ছাদ থেকে কলকাতা শহরের খুব বেশি দেখা যায় না, তবু নিচের শরৎ বোস রোড, চারপাশের তিনতলা-চারতলা বাড়ি, আরও দূরের মাল্‌টিস্টোরিড বিল্ডিং, সব মিলিয়ে কলকাতা এখন এক অনন্য সৌন্দর্যে গরীয়ান।

ছাদের যে-কোণটিতে বসলে সবচেয়ে ভালভাবে দেখা যায় এ-শহর, সেখানে দু'খানা চেয়ার পাতা হল মুখোমুখি। তার উপর নরম কুশন বিছিয়ে গা এলিয়ে দিল সায়ন, গার্গীকে বসতে বলে বলল, হঠাৎ একটা অদ্ভুত গল্প মনে পড়ে গেল, গার্গী।

গার্গীর স্বর মনে হল বসে গেছে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, কী গল্প!

—বিদেশি পটভূমিকার এক গল্প। এক যুবক আর যুবতী হঠাৎই বেরিয়ে পড়েছিল বাড়ি থেকে, বোহেমিয়ানের মতো। ধরা যাক, তাদের নাম পল আর ভিভিয়েন। দু'জনেরই বাড়ির অবস্থা সচ্ছল, অফুরন্ত টাকা তাদের খরচের জন্য বরাদ্দ। তবু একদিন তাদের মনে হল, এই ধরাবাঁধা জীবন, তা সে যত আরামদায়কই হোক না কেন, তাদের জন্য নয়। তারা দু'জন পৃথিবী ভ্রমণে বেরোবে। কীভাবে মনের ভেতর চারিয়ে যেতেই দুটো চিরকুট পাঠিয়ে দিল দু'জনের বাড়িতে, তাতে লেখা, মে নট সি ইউ এগেইন। তারপর দু'জনে দুটো বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অনির্দেশ্যের উদ্দেশ্যে।

বহু পিচঢালা পথ সারাদিন দুরন্ত গতিতে চাকার নিচে ফেলে সন্ধের সময় তারা আবিষ্কার করল, এমন একটা নির্জন জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে ত্রিসীমানায় কোনও লোকালয় নেই। দু'জনে বাইক থামিয়ে একমুহূর্ত ভাবল, কোথায় রাত কাটানো যায়। তাদের জীবনের প্রথম রাত। আস্তানা তো একটা খুঁজে বার করতেই হবে।

পল বলল, তাহলে আর একটু এগিয়ে যাই—

আরও খানিকটা বাইক ছুটিয়ে এবার যেখানে পৌঁছাল, সেটা একটা বিশাল নারকেল-বাগান। দীর্ঘ পথের দু'পাশ জুড়ে শুধু লম্বা নারকেল গাছ। সে পথও আবার পেরোতে পেরোতে হঠাৎ একসময় শেষ হয়ে গেল রাস্তাটা। দেখল, সামনে একটা সমুদ্র। শুধু জল আর জল। অন্তহীন জলরাশি যেন তার সহস্র বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের দু'জনকে অভ্যর্থনায়। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে চারদিকে। আকাশের অজস্র নক্ষত্র চুমকি-আলো হয়ে সমুদ্রে জল পড়ে চমকাচ্ছে। অজস্র ব্রেকার প্রবল গর্জন করে আছড়ে পড়ছে বিশাল সি-বিচে। কিন্তু কোথাও কোনও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ভিভিয়েন কখনও সমুদ্র দেখেনি, পলও নয়, তবু পলের মনে হল, সমুদ্রটা তার চেনা।

পল হাসল ভিভিয়নের মুখের দিকে তাকিয়ে, মনে হচ্ছে আজ রাতে আমাদের কপালে কোনও আস্তানা নেই। কী করা যায় বলো তো?

ভিভিয়েন তার সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে হাসল, সারা পৃথিবীটাই তো আমাদের আস্তানা। তাহলে এই সমুদ্রতীরে রাত কাটানোতেই বা আমাদের আপত্তি কিসের?

—গুড আইডিয়া, পল লাফিয়ে উঠল, তাহলে এসো, আজ সারারাত এই বিচের উপর বসে আমরা গল্প করে কাটাই—

pathagar.net

বলল বটে পল, কিন্তু বেশ অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে চারপাশে আঁতিপাতি করে কী যেন খুঁজতে লাগল। এই অন্তহীন নারকেল গাছের সারি, সামনের সমুদ্র, সাদা ফেনা-তোলা ব্রেকার, কাল্‌চে জলরাশি এই সব কিছুই যেন তার খুবই চেনা। হঠাৎ তার নজর পড়ল নারকেল বনের মধ্যে কিছু ভাঙা ইট, ধ্বংসস্তূপের মতো। দেখে সে বিস্ময়ে মোহিত হয়ে গেল, বিড়বিড় করে বলল, কী আশ্চর্য ভিভিয়েন, মনে হচ্ছে এ জায়গাটা আমার ভারি চেনা। ভিভিয়েনও অবাক হল, তাই! তাহলে তুমি নিশ্চই এই সমুদ্রতীরে কখনও এসেছ। পল মাথা নাড়ে, কখনও না, আমি কখনও সমুদ্র দেখেছি বলে মনে পড়ে না? আমাদের বাড়ি তো সমুদ্রতীর থেকে দুশো চল্লিশ মাইল দূরে। ভিভিয়েন চোখে বিস্ময় মাখিয়ে বলল, তাহলে? পল তখন তার দু-চোখে সমুদ্র মিশিয়ে নজর সেঁধিয়ে দিচ্ছে চতুর্দিকে, অন্ধকারে তার চোখে জ্বলতে লাগল ফসফরাস, বলল, কেবলই মনে হচ্ছে, আমি কোনও কালে এখানে বাস করতাম। যেখানে ধ্বংসস্তূপ রয়েছে সেখানে একটা বাড়ি ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যেতাম বালির বিচে। দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতাম, ঘন্টার পর ঘন্টা। তারপর—, হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে পল বলল, জানো একদিন দাঁড়িয়ে আছি বিকেলবেলা, হঠাৎ দূর থেকে দেখি, একটা বিশাল নৌকো আসছে, লম্বা ধরনের। নৌকোটা ক্রমশ কাছে আসতে আসতে একেবারে আমাদের ঘাটের সামনে এসে ঢেউয়ের এক ধাক্কায় আছড়ে পড়ল বিচের উপর। নৌকোর উপর তিন-চার-জন লোক। তার মধ্যে একজন বেশ দীর্ঘদেহী, লম্বা লম্বা চুল, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। প্রায় জিশুর মতো দেখতে। তিনি এসে হঠাৎ আমাকে কোলে তুলে নিলেন।

শুনতে শুনতে ভিভিয়েন আশ্চর্য হল, স্ট্রেঞ্জ। সত্যিই কি একরকম কোনও ঘটনা ঘটেছিল তোমার জীবনে!

পল ঘাড় নাড়ে, নাহ্। কিন্তু ছবিটা এখনও আমার মনে জীবন্ত হয়ে আছে।

সমুদ্রতীরে বিচের উপর হাত পা ছড়িয়ে বসে পল আবার বলল, আমার নিজেরও ভারি অবাক লাগছে। হঠাৎ এরকম একটা ছবি আমার মাথার ভিতর হুস্ত করে উঠল কেন! ইয়েস, ইয়েস, পল হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে গেল নিজের ভিতর, মনে পড়েছে, অভিজ্ঞতাটা আমার নিজের নয়, আমার বাবা খুব ছোটবেলায় হঠাৎ এরকম একটা গল্প আমাকে বলেছিলেন। অভিজ্ঞতাটা কিন্তু তাঁরও নয়। তিনি আবার শুনেছিলেন তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার ঠাকুর্দার কাছ থেকে। আমার ঠাকুর্দারা থাকতেন এরকম একটা নারকেল-বনের ভিতর। সমুদ্রের ধারে। তাঁর বাবা নাকি নৌকোয় করে সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে গিয়েছিলেন, বহুদিন যাবৎ ফিরতে পারেননি। ঝড়ের মধ্যে পড়ে অন্য কোথাও, কোনও দ্বীপে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর ফিরে এসেছিলেন চার-পাঁচ বছর পরে। সেই ফেরার দৃশ্যটি এমনই অসাধারণ হয়ে গেঁথে ছিল ঠাকুর্দার মনের ভিতর। ঠাকুর্দা বড় হয়ে গল্পটা বলেছিলেন বাবাকে। বাবাও আমাকে ছোটবেলায় গল্পটা বলেছিলেন বহুবার। তাঁর বর্ণনা এতই জীবন্ত ছিল যে ছবিটা এখনও হুবহু মনের ভিতর রয়ে গেছে। গেছে নয়, ছিল। হঠাৎ এই দৃশ্যের ভিতর সে পড়তেই ঘাই দিয়ে উঠল মগজের ক্যানভাসে।

ভিভিয়েনের চোখের পলক পড়ছিল না, তাহলে তোমার ঠাকুর্দা এখানে বসবাস করতেন বলছ? পল ঘাড় নাড়ল, সেইরকমই শুনেছি আমি। তারপর থেকেই বারবার আমার মনে হচ্ছে ঠাকুর্দার বাবা কিংবা তার বাবাও নিশ্চই চিরকাল এই সমুদ্রতীরে থাকেননি। হয়তো অন্য কোথাও, কোনও পাহাড়ে, কিংবা কোনও উপত্যকায় থাকতেন। তাঁর পূর্বপুরুষ হয়তো আর

pathagar.net

কোনখানে, আরও দূরে, হয়তো মরুভূমিতেও থাকতেন। হয়তো বেদুইন কিংবা তাতার, কিংবা অন্য কিছু ছিলেন। ব্যাপারটা ভাবতে দারুণ ভাল লাগে আমার।

ভিভিয়েন সম্মোহিতের মতো বলল, অদ্ভুত, অদ্ভুত। ইটস স্ট্রেঞ্জ। আচ্ছা, এই বিষয়টি নিয়েই তো আমরা একটা গবেষণা করতে পারি।

দু'জনে তখন অনেক পরিকল্পনা করল, কীভাবে শুরু করবে তাদের গবেষণা। আলোচনা করতে করতে একসময় সমুদ্রতীরে ভোর হয়ে গেল। লাল বলের মতো একটা সূর্য লাফিয়ে উঠতে লাগল নীল সমুদ্রের ভেতর থেকে।

গল্পটা সম্মোহিতের মতো শুনছিল গার্গীও। হঠাৎ চমক ভেঙে বলল, কিন্তু কলকাতায় এখনও ভোর হয়নি—

সায়ন প্রায় ঘোরের মধ্যে থেকে কথা বলছিল, ঘড়িতে চোখ রেখে বলল, এখন রাত দুটো। রাস্তায় দিকে চোখ রেখে দ্যাখো গার্গী, কলকাতায় এখনও পথে লোক চলছে। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, কলকাতায় সারারাত কেউ না কেউ জেগে থাকে। কলকাতা কখনও পুরোপুরি ঘুমিয়ে পড়ে না। তবে যাই হোক, আমার গল্প কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। এবার এই কাহিনীর পরিপূরক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি—

তখনও স্কুলে পড়ি। একদিন বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা, আমাদের এই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি হয়েছে পঞ্চাশ সালের পর। তার আগে আমাদের বাড়ি কোথায় ছিল? তখন জানতে পারি, ঠাকুর্দা তাঁর খুব ছোটবেলায় চলে এসেছিলেন কলকাতায়। একটা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন উত্তর কলকাতার দিকে। তারও আগে থাকতেন বাঁকুড়া জেলার কোথাও। তবে বাঁকুড়াই যে আদি নিবাস ছিল তাও নয়। বাবাকে কথাপ্রসঙ্গে একবার ঠাকুর্দা বলেছিলেন, তাঁদের আদি বসত ছিল বিহারে। পাটনা থেকে সতেরো মাইল দূরে দ্বারশিলা নামের একটি গ্রামে। বাবা কিন্তু কখনও মাথা ঘামাননি দ্বারশিলা নিয়ে। কিন্তু পল-ভিভিয়েনের গল্প পড়ার পর আমার একদিন মনে হল, দ্বারশিলা যেতে হবে। আমার পূর্বপুরুষেরা যখন যেখানে বসবাস করতেন, তাহলে এখনও আমাদের বংশের কেউ-না-কেউ সেখানে থাকবেই। হঠাৎ একদিন একা-একা চলে গেলাম পাটনা। সেখান থেকে বাসে করে দ্বারশিলা। সেখান থেকে টাঙা নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম এক গাঁয়ে। অনেককেই জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ আমার পূর্বপুরুষদের খোঁজ দিতে পারে কি না। কিন্তু কেউই বলতে পারেনি। চৌধুরী পদবিধারী কয়েকটি পরিবারকে খুঁজে বার করলাম। আশ্চর্য, তারা কেউ বাংলা জানে না। তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়েছিল আমরা তাদের বংশেরই মানুষ। সেখানে একজন বয়স্ক মানুষ আমাকে বলেছিলেন, রাজস্থান বা অন্য কোথাও তাঁদের আদি নিবাস ছিল। সেখানে একবার খরা হতে তাঁরা বাস তুলে নিয়ে চলে এসেছিলেন দ্বারশিলায়।

বলতে বলতে সায়ন হাসল, যদি সত্যিই প্রত্যেক মানুষ তার পূর্বপুরুষের উৎস খুঁজতে বেরোয়, তাহলে কোথায় যে তার শেষ, তা বলা খুবই দুষ্কর।

শুনতে শুনতে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা অর্জন করছিল গার্গীও। কতক্ষণ এভাবে সম্মোহিতের মতো শুনেছে তা জানে না। একসময় অবাক হয়ে দেখল, এবারে ফর্সা হয়ে আসছে আকাশ, লাল হয়ে উঠেছে পূর্বকোণ, দীর্ঘ রাত শেষ হয়ে কলকাতার বুকে এসে পৌঁছাল আরও একটি কর্মব্যস্ত দিন। সায়নও যেন ফিরে পেল তার সম্বিত, ব্যস্ত হয়ে বলল, চলো, নিচে চলো, কী আশ্চর্য, সত্যিই না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম রাতটা!

গার্গী বলে উঠল, ঘুমের জন্য অবশ্য একটুও আফসোস নেই আমার, অন্তত একটি রাতের জন্য আমরাও পল আর ভিভিয়েন হয়ে গিয়েছিলাম।

pathagar.net

সায়ন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল বারবার, হয়তো তার অফিসের কথা ভেবে। ছাদ থেকে নিচে নামতে নামতে বলল, আজ কিন্তু আমাকে একবার অফিসে যেতেই হবে।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, এই সারারাত না-ঘুমের পরও!

—কোনও উপায় নেই গার্গী। ভীষণ টেনশনে আছি অফিস নিয়ে। যা ঘটনা ঘটে চলেছে—

নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি কাটাতে এই ভোরেই স্নান সেরে এল গার্গী, তারপর দু'কাপ চা করে ধীর পায়ে চলে এল বাইরের ঘরে। রাখল সেন্টার-টেবিলে। দু'জন মুখোমুখি বসে চায়ের কাপে লম্বা-লম্বা চুমুক দিয়ে শরীর থেকে ক্লান্তি ঝরিয়ে ফেলতে চাইল দ্রুত। তার মধ্যে গার্গী হঠাৎই বলে ফেলল, আচ্ছা, হিমনকে তোমার কীরকম মনে হয়, বলো তো?

—হিমন! কখন যে গার্গী আপনি থেকে তুমিতে এসেছে তা মনে করতে পারে না সায়ন। প্রথম দু-একবার কানে লেগেছিল, এখন স্বাভাবিক লাগছে। সব মেয়েদেরই বোধহয় এটা সহজাত। কিছুক্ষণ আন্‌মনা থেকে বলল, আমার তো কিছুই মনে হয় না। একটা জড় বস্তুই যেন। কিন্তু ঐন্দ্রিলা বলত, যতই ওকে দেখছি, ততই অদ্ভুত লাগছে আমার।

—তাই নাকি? গার্গীর ভুরুতে কোঁচ পড়ে, এরকম বলত নাকি? আশ্চর্য তো। তারপর নিজেই হেসে ফেলল আবার, মনে হওয়াটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

সায়ন অবাক হল, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করলে কেন?

—না এমনিই, বলে গার্গী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মনে হচ্ছে, পাশের বাড়ি থেকে সারাক্ষণ কেউ এই ফ্ল্যাটের উপর নজর রাখে।

—তাই! সায়ন আশ্চর্য হল, ঐন্দ্রিলাও কিন্তু ঠিক এরকমই বলত। কিন্তু কে?

—জানি না তো। তোমার মা-ও হতে পারেন। অথবা হিমন। অথবা রবার্ট। যে কেউই। আচ্ছা, দীয়া নাকি এ বাড়িতে এখন আর থাকে না?

সায়ন অন্যমনস্ক হয়ে বলল, না।

—কিন্তু কেন?

—কি জানি, সায়ন ঘাড় নাড়তে থাকে, ওদের বোধহয় অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না। অথবা অন্য কোনও কারণেও হতে পারে।

গার্গী গোটা ব্যাপারটা নিয়ে কেন যেন কদিন ধরে ভাবছে। একই বাড়িতে একটি বউ খুন হচ্ছে, অন্য বউ চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। এর মধ্যে কোথাও কি একটা যোগসূত্র আছে?

চায়ের টেবিলেই কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছাল সেদিনকার সংবাদপত্র। গার্গী একবুক আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল প্রথম পৃষ্ঠার নিচের দিকে, যেখানে ঐন্দ্রিলা-হত্যাকাহিনীর ঘটনাগুলো ছাপা হয় রোজ। আজ সংবাদপত্র অবশ্য তেমন রসালো করে তাদের বিয়ের খবর লিখতে পারেনি। আলোদার কথাই তাহলে ঠিক। কিন্তু কাগজে জানিয়েছে, ঐন্দ্রিলা হত্যা-রহস্য নতুন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। পুলিশ এমন প্রমাণাদি হাতে পেয়েছে,তাতে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে যে, এই হত্যার পেছনে জড়িত আছে কোনও নারী। তবে কে খুনি তা এই মুহূর্তে প্রকাশ করতে নারাজ। আরও তদন্ত চলছে।

খবরটা পড়তে পড়তে গার্গী মুখখানা হঠাৎ কালো হয়ে গেল। বুঝি একটু দিশেহারাও। পুলিশ কি তাহলে তাকেই সন্দেহ করছে! তাকেই! চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাতেই হঠাৎ কেমন তিতকুটে মনে হল চা-টা। কাপটা ঠক্‌ করে নামিয়ে রাখল সেন্টার-টেবিলে।

কিন্তু সায়ন খবরটা পড়ে বিড়বিড় করে বলল, রাবিশ! এদের তদন্তের মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সারারাত না-ঘুমের পর গার্গীর অনুরোধ সত্ত্বেও সায়ন গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল অফিসে। এখন এই দীর্ঘ দুপুর কীভাবে একা কাটাবে এই ফ্ল্যাটে এমন ভাবনায় যখন জেরবার হচ্ছে গার্গী, ঠিক সে মুহূর্তে ফোন বেজে উঠল তার ঘরে। হয়তো সায়নেরই ফোন ভেবে রিসিভার তুলতেই ওপাশ থেকে শুনল, আমি দেবাদ্রি সান্যাল বলছি। আপনাকে আরও একবার ইনটারোগেট করতে চাই। এখনই—

গার্গী সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, এখন তো মিঃ চৌধুরী বাড়ি নেই। অফিসে বেরিয়ে গেলেন। সন্ধের পর আসবেন।

—মিঃ চৌধুরীকে নয়। আপনাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করতে যাচ্ছি। আপনি একা আছেন বলেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছাচ্ছি আমরা।

গার্গী তার বুকের ভেতর ধকধক শব্দ শুনতে পেল।

ঐন্দ্রিলা-হত্যার রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে যেমন এক অসম্ভব জটিলতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন দেবাদ্রি সান্যাল, তেমনই উৎকণ্ঠায় ডুবে যাচ্ছেন ক্রমাগত। দশ বছরেরও বেশি হয়ে গেছে তাঁর চাকরির বয়স। এই দশ বছরে কত যে জটিল কেস তদন্ত করতে হয়েছে তাঁকে, আর তা সমাধান করতে গিয়ে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর, মুখোমুখি হয়েছেন কত না বিপদের, তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে এক ভয়ঙ্কর স্টোনম্যানের আতঙ্কে যখন সমস্ত কলকাতা টানটান, তখন কত কত রাত সতর্ক দৃষ্টি ফেলে টহল দিয়ে বেড়িয়েছেন শহরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত অবধি। গত বছর এক ইন্টারন্যাশানাল স্মাগলার তাঁর এলাকায় আত্মগোপন করে আছে খবর পেয়ে তার পেছনে ঘুরেছেন পাক্কা দেড় মাস। তাঁর একজন হায়ার অফিসার কার কাছে যেন বলেছিলেন, সান্যালের টেনশিটি বুলডগের মতো।

সেই দেবাদ্রি সান্যালের এবার গ্যালন-গ্যালন ঘাম ঝড়ে যাচ্ছে এই গৃহবধু-হত্যার কেসটি তদন্ত করতে গিয়ে। সেই ঘামবিন্দু আরও কিছু ফুটে উঠল আজ এই মুহূর্তে 'ব্লু-ওয়ান্ডার' নামে এই দোতলা বাড়িটির ডোরবেলে হাত দিয়ে। ভেতরে এক চমৎকার জলতরঙ্গের শব্দ।

কেন যেন দেবাদ্রি আজ ভীষণ উত্তেজনায় ভুগছেন। তাঁর উচ্চতা পাঁচ-আটের ওপরে। চমৎকার সুপুরুষ চেহারা, প্রায়শ একটা রোদ-চশমা চোখে লাগানো থাকে বলে বেশ রহস্যময় হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব। আপাতত সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় রোদ-চশমাটা খুলে নিয়েছেন হাতে। তবু কড়কড়ে ইস্ত্রি-করা ঝকঝকে ইউনিফর্ম আর স্মার্ট চেহারার জন্য তাঁর উপস্থিতিই একটা অন্যরকম সম্ভ্রমের উদ্রেক করে। পুলিশ-ইনস্পেক্টরের চাকরিতে এই ধরনের সপ্রতিভতা, শাণিত কথাবার্তা, অনুসন্ধিৎসু চোখ, প্রবল বুদ্ধিমত্তা— সবকিছুরই একান্ত প্রয়োজন। কলকাতার মতো জটিল শহরের ভয়ঙ্কর আন্ডার-ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে অনবরত টক্কর দেওয়ার জন্য আরও চাই চিতার মতো ক্ষিপ্রতা, রয়েল বেঙ্গলের মতো সাহস ও ক্ষমতা, বুলডগের মতো টেনশিটি। প্রায় সবটাই আছে দেবাদ্রির।

কিন্তু এই মুহূর্তে যাকে ইন্টাররোগেট করতে এসেছেন, তার সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর ইতিমধ্যে নিয়ে উঠতে পেরেছেন, তাতে এই যুবতীর দুঃসাহস, চৌখস কথাবার্তা, চালচলন তাঁকেও সমীহ করতে বাধ্য করেছে। জমা হয়েছে যথেষ্ট কৌতূহলও। এমন একজন চৌখস

pathagar.net

বুদ্ধিমতীর কাছ থেকে কথা আদায় করতে হলে তার ওপর সৃষ্টি করতে হবে এক অপরিসীম চাপ। অপেক্ষা করতে হবে দুর্বল মুহূর্তটির।

ডোরবেলের আওয়াজ শেষ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর দরজার ওপাশে ছিটকিনি খোলার শব্দ। অন্য পুলিশ অফিসারদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে তিনি মাথার টুপিটি খুললেন, তারপর গার্গীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, মে আই কাম ইন, মিসেস চৌধুরী?

—আসুন, বলে গার্গী দেবাদ্রিকে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। ড্রয়িংরুমের সোফায় বসতে বলে সে মুখোমুখি অন্য সোফাটিতে আসীন হল। তাকাল রীতিমতো জিজ্ঞাসু-চোখে।

গার্গীর পরনে হালকা আকাশ রঙের একটি ছাপা শাড়ি, সেই রঙেরই একটি ব্লাউজ চুল সাধারণভাবে বেণী করা, কপালে ছোট্ট একটি নীল টিপ। দেবাদ্রি নজর চালিয়ে দেখলে সিঁথির রেখা বরাবর আজ সরু সিঁদুর-ঢালা পথ। তাতে কয়েকদিন আগের গার্গীর সঙ্গে আজকের গার্গীর অনেকখানি ফারাক। আজ আরও অভিজ্ঞ লাগছে, একটু অন্যরকম সুন্দরীও। তার চাউনিটিও আজ একটু বেশিই প্রখর। সেই দৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ হয়ে আছড়ে পড়ল দেবাদ্রির ওপর, হঠাৎ কী এমন জরুরি ব্যাপার ঘটল, মিঃ সান্যাল, যে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করার আর তর সইল না আপনাদের?

দেবাদ্রি হাসলেন, পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়-গলা-মুখের ঘামবিন্দুগুলো মুছতে মুছতে বললেন, আসলে প্রশ্নগুলো শুধু আপনাকেই করতে চাই, এবং একদম একা। তাই এমন একটা সময় বেছে নিয়েছি যখন মিঃ চৌধুরী থাকবেন না।

গার্গী কড়া চোখে তাকাচ্ছিল দেবাদ্রির দিকে, হুঁ, তা যে প্রশ্নগুলো আগের বার করেছিলেন, নিশ্চয় সেগুলো আর রিপিট করবেন না?

দেবাদ্রি আবার হাসলেন, মিসেস চৌধুরী, দরকার হলে পুলিশ-অফিসারদের একই প্রশ্ন দশবার রিপিট করতে হয়। তাতে প্রায়ই দেখা যায়, দশবার দশ রকম উত্তর আসছে। অর্থাৎ সত্য ঘটনা গোপন করতে গিয়ে এক-একবার এক-একরকম মিথ্যে বলতে হয় উত্তরদাতাকে। এক মিথ্যা চাপা দিতে গিয়ে আরও হাজারও মিথ্যে বলতে হয়। এভাবেই ধরা পড়ে অপরাধী।

গার্গী মুচকি হেসে বলল, সেভাবেই কি আপনারা আমাকে ধরতে এসেছেন আজ!

—না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা খুঁজে বার করতে আপনার সাহায্য চাইছি। আপনি যে নিরপরাধ সেটা প্রমাণ করার জন্য সত্য ঘটনাটা বলা প্রয়োজন আপনারই। আচ্ছা বলুন তো মিসেস চৌধুরী, আগেরবার আপনি বলেছিলেন, সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে অনেকদিন আগে থেকেই আপনার আলাপ। আপনিই সম্বন্ধ করে ঐন্দ্রিলাদেবীর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ তাঁকেই বিয়ে করলেন কেন?

এহেন সব কূট প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তা যেন জানতই গার্গী, খুব সহজভাবেই উত্তর দিল, প্রায় নির্লিপ্ত গলায়, বলতে পারেন, ইটস জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট। নিতান্তই একটি দুর্ঘটনা।

দেবাদ্রি লক্ষ করছিলেন গার্গীর নিস্পৃহতা। খুবই শক্ত নার্ভ এই যুবতীর তা জানতেন, এখন মনে হল স্টিলের মতো। সতর্কভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নটি রাখলেন, কিন্তু এই দুর্ঘটনাটি ঘটানোর জন্য কতদিন আগে থেকে আপনারা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, ছ'মাস, একবছর, নাকি আরও আগে থেকে?

গার্গী অবলীলায় উড়িয়ে দিল দেবাদ্রির প্রশ্ন, সহজভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, কোনও প্রস্তুতিই ছিল না। থাকার কথাও নয়। পরশু সকালেও জানা ছিল না বিয়েটা হয়ে যাবে এভাবে।

pathagar.net

দেবাদ্রি হেসে উঠে বললেন, বলছেন একেবারে ধূমকেতুর মতো হঠাৎই?

—হ্যাঁ, তাইই। এখন মনে হচ্ছে, ভালই হয়েছে তাতে। দরকারও ছিল। আপনাদের এবং খবরের কাগজওলাদের নিত্যনতুন গসিপ রচনা বন্ধ করতে পেরেছি অন্তত।

—কিন্তু তাতে সমস্ত মানুষের সন্দেহের তির যে আপনাদের দুজনের ওপরই গভীরভাবে ধাবিত হচ্ছে তা কি আন্দাজ করতে পেরেছেন?

গার্গী হেসে ফেলল, দুজনেরই ওপর? তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দেবাদ্রি এবার গম্ভীর হলেন, আমরা কিন্তু এতদিনে নিশ্চিত হয়েছি, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত আছেন একজন নয়, দুজন। এতদিন সায়ন চৌধুরীই ছিলেন আমাদের ইনভেস্টিগেশনের কেন্দ্রবিন্দু। এখন—

দেবাদ্রিকে থামিয়ে দিয়ে গার্গী হঠাৎ প্রশ্ন করল, আচ্ছা, মিঃ সান্যাল, আউট অব অল পিপল, ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী হিসেবে হঠাৎ একমাত্র মিঃ চৌধুরীকেই আপনারা বেছে নিলেন কেন?

—একমাত্র নয়, বলতে পারেন, হি ইজ ওয়ান অব দা সাসপেক্টস্। র‍্যাদার, নাম্বার ওয়ার সাসপেক্ট।

যদি কিছু মনে না করেন, তা হলে জিজ্ঞাসা করি, ওঁকে সাসপেক্ট হিসেবে ভাবার কী কী কারণ খুঁজে পেয়েছেন আপনারা?

দেবাদ্রি তীক্ষ্ণ চোখমুখ করে বললেন, এ তো একেবারে জলের মতো সোজা। মাত্র দু'বছর বিয়ে হয়েছে সায়ন চৌধুরীর। এর মধ্যে একাধিক নারী তার জীবনে এসেছে, যাদের কাউকে না কাউকে পাওয়ার জন্য ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড করার দরকার হয়ে পড়েছিল তাঁর।

—কিন্তু তিনি তো সে রাতে কলকাতাতেই ছিলেন না।

—একশোবার ছিলেন, মিসেস চৌধুরী। অবশ্য না থাকার অ্যালিবাই হিসেবে তিনি একটি চমৎকার গল্প তৈরি করে শুনিয়েছেন আমাদের, কিন্তু সেটি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। বিশ্বাসযোগ্য নয়, তার অনেকগুলি প্রমাণও আমাদের হাতে এসেছে।

— কী প্রমাণ? গার্গীকে সামান্য উত্তেজিত দেখায় যেন।

—আমাদের ধারণা, ট্রেনের টিকিটের তারিখ অনুযায়ী তিনি পাঁচুই এপ্রিল সকালেই কলকাতা এসে পৌঁছেছিলেন। সারাদিন হয় বাড়িতেই ছিলেন অথবা অন্য কারও সঙ্গে, সম্ভবত তিনি একজন মহিলাই হবেন, বেরিয়েছিলেন বাইরে। সন্ধের পর বাড়ি ফিরেছিলেন তাঁকেই নিয়ে। গভীর রাত পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কিছু কাজকর্ম করেছিলেন। তারপর ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। সম্ভবত সঙ্গী মহিলার কারণেই। বচসার পরিণতিতেই খুন হতে হয় ঐন্দ্রিলাকে। হত্যাকাণ্ড সারা হলে ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ একটা ফোন যায় থানায়। তাতে জানানো হয়, ঐন্দ্রিলাদেবী খুন হয়েছেন। সে স্বর একটু ফ্যাসফেসে হলেও আমাদের ধারণা, তা সায়ন চৌধুরীই।

গার্গী তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে, তারপর বলল, কোনও মহিলা তাঁর সঙ্গী ছিল বলছেন? হঠাৎ একজন মহিলার উপস্থিতি সম্পর্কে কী করে নিঃসন্দেহ হলেন?

—কোনও একজন মহিলা যে সে রাতে উপস্থিত ছিলেন, তার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে।

—তাই? কাকে সন্দেহ করছেন আপনারা?

দেবাদ্রি আলতো হাসি ঠোঁটের ডগায় ঝুলিয়ে রেখে গার্গীর ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করতে

pathagar.net

বললেন, অনেককেই সন্দেহ করছি, কারণ সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে তো অনেক মহিলারই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ইদানীং। তার মধ্যে প্রথম জন—, দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন, হুঁ, আপনিই।

গার্গী হঠাৎ যেন কেঁপে উঠল নিজের ভেতরে, বলে ফেলল, আশ্চর্য আপনাদের কল্পনাশক্তি।

—মোটেই আশ্চর্য নয়। কারণ সায়ন চৌধুরীকে পেতে হলে ঐন্দ্রিলাদেবীকে সরিয়ে দেওয়াটা খুব জরুরি ছিল আপনার কাছে।

—তাই? কিন্তু তা হলে এ কথাটা কেন ভাবছেন না যদি মিঃ চৌধুরীকে বিয়ে করতেই চাইতাম, তবে অনেক আগেই বিয়ে করার সুযোগ ছিল আমার। নিজে উদ্যোগী হয়ে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতাম না।

দেবাদ্রি হেসে উঠল, বুঝলেন গার্গী দেবী, প্রেমের অঙ্কটা যদি এতই সহজ হত, তাহলে পৃথিবীটা এত জটিল হয়ে উঠত না। দু'বছর আগে হয়তো আপনার বা সায়ন চৌধুরীর কারওরই মনে হয়নি যে পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাওয়া দরকার। দু'বছরে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে। এই দু'বছরে আপনারা পরস্পরকে আরও ভালভাবে আরও গভীরভাবে জেনে ফেলেছেন। তারপর একটা সময় এসেছে, যখন কেউ আর কাউকে ছেড়ে থাকতে পারছিলেন না। তখনই দরকার হয়ে ওঠে দুজনের প্রেমের মধ্যে যে বাধা তাকে সরিয়ে দেওয়ার।

—চমৎকার ব্যাখ্যাটি তো আপনার, গার্গী হেসে ফেলল।

—তা ছাড়া, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমাদের হাতে এসেছে। আপনি আগের দিন আমাদের বলেছিলেন, সাধারণত রাত নটা-সাড়ে নটার মধ্যে আপনি বাড়ি ফেরেন। পাঁচুই এপ্রিল অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের দিনও তো তা-ই ফিরেছিলেন। কিন্তু আপনারা দাদার কাছে খবর নিতে যেতে উনি বললেন, আমার বোনের খবর আমি রাখি না। রাত দশটা-এগারোটা-বারোটা যখন খুশি ফেরে ও। আপনার বউদিও তা-ই সমর্থন করলেন। ইদানীং নাকি আপনি বাড়িও ফিরছিলেন না রাতে।

গার্গী বুঝিবা একটু অবাক হল, সে রাতে কিন্তু সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিলাম।

—আমাদের ধারণা অবশ্য অন্য রকম। রাতে বেশ দেরি করেই বাড়ি ফিরেছিলেন। অথবা ফেরেননি তাও হতে পারে। কারণ যে সোসিও ইকোনকিম রিসার্চ আকাদেমিতে আপনি কাজ করেন, সেদিন তাদের একটি বিশেষ সমীক্ষার কাজে আপনারা কয়েকজন গিয়েছিলেন তিলজলার কাছে একটা বস্তিতে। ফেরার সময় আপনার এক বান্ধবীর সঙ্গে গড়িয়াহাট থেকে ট্রামে উঠেছিলেন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ, আপনার নামার কথা ছিল রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ক্রশিংয়ে, সেখান থেকে টালিগঞ্জের ট্রাম ধরবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এসে আপনি নেমে যান। আপনার বান্ধবীকে বলেছিলেন, বিশেষ দরকারে নামছেন। এক্ষেত্রে আমরা ধরেই নিতে পারি, আপনি নিশ্চয় সে রাতে এই শরৎ বসু রোডের অর্থাৎ সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটেই এসেছিলেন, হয়তো সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে সে রকমই অ্যাপিয়েন্টমেন্ট ছিল আপনার।

—তারপর আমরা দুজনে মিলে ঐন্দ্রিলাকে—, বলতে বলতে হেসে ফেলল গার্গী, বোধহয় গলাটা ধরেও এল তার। তারপর বলল, আপনাদের ইনভেস্টিগেশনের প্রশংসা করতেই হয়, মিঃ সান্যাল। এত সব খবর জোগাড় করেছেন?

দেবাদ্রি সান্যালও হাসলেন, করতেই হয়, গার্গীদেবী।

pathagar.net

—তাহলে তো দুই মার্ডারারকে পেয়েই গেছেন আপনারা। অ্যারেস্ট করে চার্জশিট দাখিল করে দিন।

এমনই কৌতুক করে সহজ গলায় কথাটা বলল গার্গী যে দুঁদে পুলিশ ইনস্পেক্টর সামান্য থমকে গেলেন। তারপর কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, না। সায়ন চৌধুরীর সহযোগী হিসেবে আরও কয়েকজন মহিলাও আমাদের সাসপেক্টের তালিকায় আছেন। তাঁদের গতিবিধিও আমরা খতিয়ে দেখছি।

—যেমন?

—কঙ্কা রায়কেও আমরা ইন্টারোগেট করেছি। ইদানীং তাঁর সঙ্গে সায়ন চৌধুরীর একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। যে কোনও সেমিনারে কিংবা কনফারেন্সে যাওয়ার সময় কঙ্কা রায়কে প্রতিবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন মিঃ চৌধুরী। তাদের দুজনকে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল ইদানীং।

গার্গীর বুকের ভেতরে একটা চিনচিনে ব্যথা গড়িয়ে গেল সহসা। যন্ত্রণা গোপন রেখে সে বলল, তারপর?

— পাঁচুই এপ্রিল কঙ্কা রায়ের অ্যাপয়েন্টমেন্ট-নোটের পৃষ্ঠায় লেখা আছে: টু মিট মাই বস অ্যাট টেন থার্টি। টেন থার্টির পর এ এম বা পি এম কিছুই লেখা নেই। যদি ওটা এ এম হত, তাহলে ডায়েরিতে লেখার দরকারই হত না, কারণ সকাল সাড়ে দশটায় তো এমনিতেই সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে কঙ্কা রায়ের দেখা হওয়ার কথা। নিশ্চই রাত সাড়ে দশটায় —বলতে বলতে দেবাদ্রি বেশ স্বচ্ছন্ত ভঙ্গিতে পকেট থেকে বার করলেন তাঁর সিগারেটের প্যাকেট। বেশ দামি সিগারেটের প্যাকেট। তার একটা ঠোঁটে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, উইথ ইয়োর প্যারমিশান—

—ওহ্, শিওর, গার্গী সপ্রতিভ হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই দেবাদ্রির কথার উত্তরে বলল, ওটা দিন সাড়ে দশটাই হবে। ওদিনে সকালেই তো বিলাসপুর থেকে ফেরার কথা ছিল মিঃ চৌধুরীর, তাই-ই। যাই হোক, কঙ্কা রায়ের সঙ্গে তার বসের এতটা ঘনিষ্ঠতা যদি হয়েই থাকবে, তাহলে কার্যসিদ্ধির পর অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড হয়ে গেলে কঙ্কা রায় চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন?

—কঙ্কা রায় চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে নাকি? তাহলে তো আমার অনুমান মিলে গেল, বলতে বলতে তাঁর হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিলেন গার্গীর দিকে, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আপনার চলে?

গার্গী একটু কুঁকড়ে গেল, না, না, বলেই সামান্য সময় থমকে গিয়ে পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করল, কী অনুমান মিলে গেল?

—কঙ্কা রায় এতদিন সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করছিল কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর যখন যে ভাবতে শুরু করেছে, এবার সায়ন চৌধুরীকে সে পাবে, ঠিক তখনই তার বাড়া ভাতে ছাই দিয়ে গার্গী মুখার্জি এসে গেল সায়ন চৌধুরীর জীবনে। অগত্যা কঙ্কা রায়কে তো পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই হবে।

গার্গী ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে বলল হু, আর কেউ?

দেবাদ্রি তখন ফের তাঁর পকেট হাতড়াচ্ছেন কিসের যেন খোঁজে, বললেন, আমরা নজর রেখেছি প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদারের ওপর।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, তিনিও?

pathagar.net

—হ্যাঁ, ব্যক্তিগত জীবনে খুবই অসুখী মধুমন্তী। অথচ সম্প্রতি ঐন্দ্রিলা খুন হওয়ার পর ভারি উৎফুল্ল দেখাচ্ছে মধুমন্তীকে। তাঁর সাজপোশাক, চালচলন বদলে গিয়েছে আমূল। আমরা তাঁর গতিবিধির খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছি, পাঁচুই এপ্রিল রাতে তিনি বাড়িতে ছিলেন না। কোনও একজন পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে আউটিঙে গিয়েছিলেন। রাতে ফেরার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত ফেলেননি। মধুমন্তীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি মুখে কুলুপ এঁটে আছেন।

গার্গীর মুখটা হঠাৎই কেমন যেন কালো হয়ে গেল। পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। সামান্য অস্পষ্ট গলায় বলল, আর কেউ?

—হুঁ, বলতে বলতে দেবাদ্রি হঠাৎ তাঁর পকেট থেকে অন্য একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করলেন, সে প্যাকেটটা দেখতে একটু অন্যরকম। বললেন, এটা লেডিজ সিগারেট, সঙ্গে রেখেছি অনেক মহিলা পছন্দ করেন বলে, এটা থেকেও নিতে পারেন, ইফ ইউ সো লাইক—

গার্গীকে বেশ বিস্মিত দেখাল, না, না, আমার কখনই এসব অভ্যেস নেই। কেন, হঠাৎ আমাকে দেখে কি আপনার মনে হল, আমি স্মোক করি?

—না, দেবাদ্রি তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের প্যাকেট ঢুকিয়ে ফেললেন পকেটে, আসলে আজকাল কোনও কোনও অভিজাত ঘরের মহিলারা একটু-আধটু স্মোক করেন, তাইই। যাই হোক, আমরা কিন্তু আর একজন মহিলাকেও খুঁজছি। তিনি আলো বোস। এই মহিলার হদিশ এখনও আমরা পাইনি। যে ঠিকানা সায়ন চৌধুরী আমাদের দিয়েছিলেন, চার-পাঁচদিন আগে সেখানে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখেছি, অনেকদিন ধরে তালাবন্ধ হয়ে রয়েছে বাড়িটা। বাড়িটা জনৈক এ এম বোসের। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর নাম শুনলাম সুচন্দনী, আলো নয়। নতুন বাড়ি করে এসেছেন ওঁরা। আশেপাশের লোক ভাল করে বলতেও পারল না কেউ—

এবার প্রবল কৌতুকে, যেন ভীষণ মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে খিলখিল করে হেসে উঠল গার্গী, হাসতে হাসতেই বলল, দারুণ জমেছে তো ব্যাপারটা!

দেবাদ্রি গার্গীর এই অকারণ হাসির কোনও অর্থ খুঁজে পেলেন না, তবে সামান্য অপ্রতিভ হলেন, কিন্তু নিখুঁতভাবে মনে-মনে নোট করে নিচ্ছিলেন। গার্গীর মুখের অভিব্যক্তি। গার্গীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করাই তো তাঁর প্রতিটি সংলাপের উদ্দেশ্য। চাপের পর চাপ সৃষ্টি করছেন তাঁর উপর। কিন্তু একটি কথাও বেরোচ্ছে না। কিন্তু কথা তো বার করতেই হবে এবার কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তাঁর মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লেন, আসলে আমার সন্দেহের তালিকায় যেসব মহিলারা আছেন, তাঁদের কেউ স্মোক করেন কি না বাজিয়ে দেখছি। কারণ ঐন্দ্রিলাদেবীর মৃত্যুর পর যখন আমরা তাঁর ঘরে ঢুকি, তখন ড্রয়িংরুমের অ্যাশট্রেতে একটা আধপোড়া সিগারেট দেখতে পাই। সারপ্রাইজিংলি ইট ওয়াজ আ লেডিজ সিগারেট। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি ঐন্দ্রিলাদেবীর সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস ছিল না। সে জন্যেই আধপোড়া সিগারেট পেলাম, কিন্তু সিগারেটের প্যাকেট ছিল না। অর্থাৎ সিগারেট খেয়েছিলেন অন্য মহিলা, যিনি সেদিন রাতে এই ফ্ল্যাটে ছিলেন। প্যাকেটটি ছিল তাঁর ব্যাগে। হত্যার পর ব্যাগ নিয়ে সরে পড়েছিলেন বলেই প্যাকেট পাওয়া যায়নি।

—ও, গার্গী অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তাই আপনি বার বার সিগারেট অফার করছিলেন?

—হ্যাঁ, দেবাদ্রি তাঁর কণ্ঠস্বর এবার ঘন করলেন, যাঁদের আমরা সন্দেহ করছি, তাঁদের মধ্যে সেদিন রাতে যাঁরা নির্বিঘ্নে ঐন্দ্রিলাদেবীর সঙ্গে থাকার সম্ভাবনা, তিনি হলেন আপনিই—

pathagar.net

কয়েক ঘন্টা হল এক নতুন ভূমিকা পালন করতে ব্লু-ওয়ান্ডারে প্রবেশ করেছে গার্গী, এরই মধ্যে তার ওপর কে প্রলয় বয়ে চলেছে যেন। দুঁদে পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল, তিনি জানেন স্টিলের মতো শক্ত নার্ভকেও কীভাবে ব্লাস্ট-ফার্নেসে ফেলে গলিয়ে ফেলতে হয়। সেরকমই বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে এই সদ্য-বিবাহিতা যুবতী এমনই ভেবেছিলেন, কিন্তু গার্গী বোধহয় অন্য ধাতুতে তৈরি। বরং সুপুরুষ পুলিশ অফিসারটির চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, তাহলে এই জটিল কেসটির স্কেপগোট হিসেবে এক সায়ন চৌধুরী আর গার্গীকেই বেছে নিয়েছেন, মিঃ সান্যাল?

দেবাদ্রি হাসলেন, না, আমি আগেই বলেছি। মিঃ চৌধুরী হলেন নাম্বার ওয়ান সাসপেক্ট। আমাদের তালিকায় যিনি নাম্বার টু, তিনি হলেন রবার্ট ও নীল।

—তাই?

—হ্যাঁ, আমরা জানতে পেরেছি, কোনও একজন পুরুষ মাঝেমধ্যে ঐন্দ্রিলার কাছে এমন সময়ে আসতেন, যখন তিনি একা থাকতেন। আমাদের ধারণা, তিনি রবার্ট ও নীল হওয়াই সম্ভব। কারণ তাঁর অন্যতম হবিই হল, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া। হয়তো ঐন্দ্রিলা তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। তারপর নিশ্চই সেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রবার্ট তার শিকারকে সহজে হাতছাড়া করে না, এমন আরও অসংখ্য যুবতী তার কামনার শিকার হয়েছে, তাইই শেষপর্যন্ত প্রাণ দিতে হল ঐন্দ্রিলাকে। এ-ব্যাপারে তাঁর মহিলা সহযোগী হিসেবে চন্দ্রাদেবীর কথাই ভেবেছি আমরা।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, চন্দ্রদেবীর মোটিভ?

—রবার্টের সঙ্গে ঐন্দ্রিলার এই ঘনিষ্ঠতা নিশ্চই চন্দ্রাদেবীর নজরে পড়ে থাকবে। চন্দ্রাদেবী একজন জবরদস্ত জাহাঁবাজ ধরনের মহিলা। তাঁর চরিত্রের সুনাম কোনও কালে ছিল না, এখনও নেই। স্বামীর জীবিতকালেই ব্যভিচার করেছেন যে পুরুষের সঙ্গে, সে এখন ঐন্দ্রিলার সাহচর্য পাচ্ছে তা নিশ্চই মেনে নিতে পারবেন না। এমনিতেই তাঁর ধারণা ঘরের বউরা তাঁর হুকুমমাফিক চলবে। দীয়ার ওপর হুকুম চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন এর আগে—

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, ব্যর্থ?

—হ্যাঁ, আপনিও বোধহয় জানেন না। দীয়া ইতিমধ্যে ডিভোর্সের নোটিস দিয়েছেন। গার্গী জানত না, নড়েচড়ে উঠে বলল, তাই নাকি?

—ইয়েস, দীয়া অনেকদিন ধরেই এ বাড়িতে ঠিকমতো থাকে না। কখনও দুপুরে আসে, বিকেলেই চলে যায়। কখনও সকালে আসে, দুপুরের আগেই চলে যায়। কখনও চন্দ্রাদেবীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে চলে আসত ঐন্দ্রিলার কাছেও। দু-এক ঘন্টা সুখদুঃখের কথা বলে চলে যেত ফের। তাই দীয়ার ওপর একটা আক্রোশ ছিল চন্দ্রাদেবীর। তখন তিনি ভেবেছিলেন, ঐন্দ্রিলা নরমসরম মেয়ে, সে অন্তত তাঁর কথা শুনবে। সায়নের সঙ্গে তাঁর বনিবনা না থাকলেও ঐন্দ্রিলার ওপর হুকুম চালানোর চেষ্টা করেছিলেন প্রথম প্রথম। কিন্তু সায়নের নির্দেশে ঐন্দ্রিলাও কখনও ঘেঁসেনি চন্দ্রাদেবীর কাছে। সেই রাগ, উপরন্তু রবার্টের সঙ্গে ঐন্দ্রিলার ঘনিষ্ঠতা তাঁকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল।

—বাহ্, গার্গী যেন খুব তারিফ করল দেবাদ্রির প্রাঞ্জল বিশ্লেষণে, তারপর বড় বড় চোখ করে বলল, আর কেউ?

—হিমনের নামও আমাদের তালিকায় আছে। হয়তো রবার্ট নয়, চন্দ্রাদেবী হিমনের সাহায্যেই ঐন্দ্রিলাকে—, বলতে বলতে থামলেন দেবাদ্রি, তারপর আবার বললেন, হিমন, অন্য কোনও কারণেও এ কাজ করতে পারে। তার সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আমরা জানতে পেরেছি, তার এক বান্ধবী আছে, চেন-স্মোকার, কলকাতার এক নামী হোটেলে নাচে। স্মোকার বলেই তার খোঁজ করছি আমরা। তার পেছনে অনেক টাকা চলে যাচ্ছে হিমনের। হয়তো টাকার জন্যেও—

—বাহ, আর কেউ?

দেবাদ্রি তাঁর যুক্তিতে, বিশ্লেষণে ভারি তৃপ্ত, আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, আপাতত একই.ঢের। তবে আরও তদন্ত চলছে, বলে হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলেন এতক্ষণ কার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন এই ভেবে। তিনি এসেছিলেন গার্গীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। গার্গী তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কখন যে সে-ই পালটা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে দেবাদ্রিকে, তা খেয়াল করতে পারেননি। বোধহয় আনমনে নিজের যুক্তিজালকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলতে আলোচনার মধ্যে। যে আলোচনা কোনও হায়ার অফিসার কিংবা সহকর্মীর সঙ্গে করার কথা, তা কিনা করে বসলেন এই মামলার অন্যতম সন্দেহভাজনের সঙ্গে! চিন্তাটা মাথায় রোল করতেই সোফা থেকে উঠতে চাইলেন হঠাৎ, ঠিক আছে, মিসেস চৌধুরী, তাহলে আজ—

—বসুন, গার্গী এতক্ষণে নিজেকে যেন প্রস্তুত করে নিয়েছে মনে মনে। আরও শক্ত দেখাচ্ছে তার চোখমুখ, আপনার সন্দেহের তালিকায় লাইম ইন্ডিয়ার কেউ নেই? দুই কোম্পানির বহু মানুষই তো পরস্পরের শত্রু, এঁদের মধ্যে কারও পক্ষে ষড়যন্ত্র করে এই হত্যাকান্ডটি ঘটিয়ে দেওয়াও তো অসম্ভব নয়।

—হ্যাঁ, সে সম্ভাবনাও মাথায় আছে আমাদের। কিন্তু কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ এখনও হাতে আসেনি। প্রমাণ না থাকলে তাকে মামলায় জড়ানো যায় না।

—ও, কিন্তু প্যারাডাইস প্রোডাক্টসে এতসব স্যাবোটেজ হচ্ছে—, প্রথমে মেশিন বার্স্ট করল, তারপর গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটি গেল না বিদেশে, তার কোনও কারণ খুঁজে বার করলেন না?

—না, দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন, এগুলো সবই আমাদের মনে হচ্ছে, সায়ন চৌধুরীর গট-আপ কেস। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের সযত্নে গার্ড করছেন উনি, যাকে তারও কোনও ক্ষতি না হয়। তাতেই ধারণা হচ্ছে—

এতক্ষণ বেশ সহজ, স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছিল গার্গী। কখনও তার কণ্ঠস্বরে উপচে পড়ছিল শ্লেষ কখনও কৌতুকও, হঠাৎ বেশ শক্ত হয়ে গেল যেন, দেবাদ্রির আত্মতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন মিঃ সান্যাল, আপনাদের মনে প্রথম থেকেই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে সায়ন চৌধুরীই হত্যাকারী, তাই চারপাশে আরও অংশ্য ঘটনা ঘটে চলেছে সেগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আপনার কেস এমনভাবে সাজাচ্ছেন যাতে আপনাদের ধারণাটাই কোর্টে বহাল থাকে।

দেবাদ্রি মুচকি হেসে বললেন, আপনার তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

—হওয়ার তো কথাই। কারণ তদন্তে যে ভুলপথে চলছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। সমস্ত ব্যাপারটার আরও গভীরে ঢুকতে হবে। আরও বহু তদন্ত বাকি। সমস্ত ঘটনা না খতিয়ে

pathagar.net

দেখে আপনি শুধু টার্গেট করেছেন সায়ন চৌধুরী আর এই গার্গীকে। বন্যার রচনা পড়েছে পরীক্ষায়, আপনারা ঘুরেফিরে সেই গোরুর রচনা লিখতে বসেছেন।

দেবাদ্রি সান্যালের মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠল। বিস্মিত হচ্ছিলেন গার্গীর সাহস ও স্পর্ধা বিবেচনা করে, বললেন, সে নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমাদের ভাবতে দিন।

গার্গী আরও শক্ত হয়ে বলল, ভুল বললেন, মিঃ সান্যাল। আমাদেরও ভাবতে দিতে হবে। আপনি বিনা তদন্তে আমাদের অভিযুক্ত করছেন। অত্যন্ত অন্যায়ভাবেই। তা মেনে নেওয়া যায় না।

দেবাদ্রি সান্যাল হঠাৎ রেগে উঠলেন, আপনি আপনার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছেন কিন্তু। আমরা ঘটনার প্রতিটি পদক্ষেপ নোট করে যাচ্ছি। ভুল কি ঠিক, তা কোর্টেই প্রমাণিত হবে।

—কিন্তু নোট করাই সার হচ্ছে, বলতে বলতে বাঘা পুলিশ ইন্সপেক্টরের রোষদীপ্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল গার্গী, এত সহজে উত্তেজিত হলে কি চলে মিঃ সান্যাল। আপনি আমাদের খুনের আসমি বানাতে চাইছেন! আর তা নির্বিবাদে আমরা হজম করে নেব বলতে চান! দরকার হলে আমাদেরই উদ্যোগী হয়ে খুঁজে বার করতে হবে হত্যাকারীকে।

—কী বলতে চাইছেন আপনি?

গার্গী গম্ভীর হয়ে বলল, বলতে চাইছি, সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোনও গভীর ষড়যন্ত্র আছে। আপনারা ধরতে পারছেন না।

—আছে নাকি? দেবাদ্রি অবজ্ঞার হাসি হাসলেন, তাহলে দেখুন তদন্ত করে—

বলতে বলতে উঠে পড়লেন সোফা থেকে, দরজার বাইরে বেরিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আপনি তদন্ত করুন, আবার দেখা হবে।

গার্গী হাসি-হাসি মুখে বলল, হবে তো নিশ্চই। যখন কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন ঠিক করেই ফেলেছেন।

দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর দলবল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর এতক্ষণে অবসন্ন বোধ করল গার্গী। কাল রাতে ঘুম হয়নি, আগের দিনও প্রবল টেনশনে কেটেছে। তার উপর পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে যেরকম ঝড় তুলে গেলেন তার ভিতরে, এখন আর দাঁড়ানোর ক্ষমতাই নেই যেন। তবু ক্লান্ত ক্ষুব্ধ শরীরে সে আবারও ভাবতে চাইল গোটা ব্যাপারটা। অভিমন্যুর মতো সে ঢুকে পড়েছে এই জটিল ঘটনার মধ্যে। তাকেই এখন বেরোবার পথ ভাবতে হবে। বেশ কৌতুকও অনুভব করল এই ভেবে যে, দেবাদ্রি সান্যাল এসেছিলেন তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে, উল্টে সে-ই প্রায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে পুলিশ-কর্তৃপক্ষকে। এখন তার সামনে বিশাল দায়িত্ব।

তখনও মধ্য দুপুর গড়ায়নি। বাইরে ঝমঝম করছে বৈশাখের গা-ঝলসানো রোদ্দুর। এ হেন দাবদাহের দিনে গার্গীর সমস্ত শরীর জুড়ে এল একগলা জ্বর। গতকাল অসম্ভব এক ঘোরের ভেতর তাকে ডুবিয়ে দিয়েছেন আলোদা, তারপর থেকেই তুমুল ঝড়ের ভেতর উথালপাথাল হচ্ছে ক্রমাগত। এই জটিলতার ভেতর এক অত্যাশ্চর্য বাসর জাগার স্মৃতি কাল তাকে উপহার দিয়েছে সায়ন। সে স্মৃতি জুড়োতেই পুলিশের উপদ্রব। উত্তেজনার মধ্যে যেভাবে সে কড়কে দিয়েছে দেবাদ্রিকে, চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে পুলিশের তদন্তকে, এখন বুঝে উঠতে পারছে না সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা কি সত্যিই তার পক্ষে সম্ভব!

pathagar.net

একটু থিতু হতেই সে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল ঐন্দ্রিলার ব্যবহৃত ঘর। এ ফ্ল্যাটের সর্বত্রই ঐন্দ্রিলার স্মৃতি। সে স্মৃতি সহসা সহস্র চক্ষু মেলে ঘিরে ধরল তার সমগ্র অস্তিত্ব। ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী কে, তা যদি খুঁজে বার করতেই হয়, তাহলে এর পর প্রতিটি মুহূর্ত সন্ধানী হয়ে উঠতে হবে তাকে। মুখোমুখি হতে হবে আরও অনেক বিপদের। জটিল হয়ে উঠবে জীবনযাত্রা।

কোথায় ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটা পাওয়া গিয়েছিল, কীভাবে শোয়ানো ছিল, তা সায়নের কাছ থেকে এর মধ্যে জেনে নিয়েছিল গার্গী। এখন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল সেই জায়গাটা। ঘরের চারপাশে ঐন্দ্রিলার স্মৃতিবহ জিনিসপত্র। তার ব্যবহৃত শাড়িগুলো এতদিনেও রয়ে গেছে আলনায়। ড্রেসিং টেবিলের ওপর তার বাঁধানো ছোট্ট ছবি, বিয়ের রাতে তোলা। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে সায়ন আর ঐন্দ্রিলার একসঙ্গে তোলা ছবি। সারা ঘরেই তার একটা নিঃশব্দ উপস্থিতি।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই গার্গী চলে এল দেওয়াল আলমারিটার কাছে। ভেতরে কিছু বই, সবই বাংলা গল্প-উপন্যাস, গার্গী জানে এগুলো ঐন্দ্রিলারই। কৌতূহলবশত আলমারিটা খুলে ফেলল সে। ভেতরে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই তার হাতে উঠে এল একটা বাঁধানো খাতা। খাতাটা খুলতেই সে অবাক, বস্তুত সে যা আশা করছিল তাইই। খাতাটা ঐন্দ্রিলার সেই ফরাসি ভাষা শেখার প্রমাণপত্র। খুব বেশিদিন পড়ার সুযোগ ঘটেনি বেচারির। তার বাবা বন্ধ করে দিয়েছিলেন মেয়ের এই অদ্ভুত ইচ্ছেটা।

ফরাসি ভাষা গার্গীর কাছে অবশ্যই গ্রিক কিংবা ল্যাটিনের মতোই দুর্বোধ্য। পৃষ্ঠা ওলটাতে ওলটাতে শুধু চমকে দিল তাকে তা হল, খাতার ভেতরে লেখা একটি নাম, রৌণক মুখার্জি, তার পাশে লেখা একটি টেলিফোন নম্বর। খুদে খুদে অক্ষরে লেখা, প্রায় পড়া যায় না এমন, তবু তা গার্গীর কাছে এই মুহূর্তে এক বিশালপ্রাপ্তি। হতবাক হয়ে সে ভাবল, তাহলে এই রৌণকই কি সেই রুনু, রুনু মুখার্জি! ঐন্দ্রিলার সেই রুনুদা? রুনুদাকে কখনও দেখেনি গার্গী, কিন্তু ঐন্দ্রিলা দু-একবার তার কাছে বলেছিল রুনুদার কথা, বিয়ের অনেক আগে। তার কথা বলতে বলতে প্রায়ই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত ঐন্দ্রিলা। গার্গী একদিন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী রে, তুই কি ওর প্রেমে পড়েছিস? ঐন্দ্রিলা হাসত, না রে, ওর একজন প্রেমিকা আছে, সে নাকি ভারি মিষ্টি। গার্গী বিস্মিত হয়েছিল, সে কী! তোর চেয়েও মিষ্টি? ঐন্দ্রিলা কিছু বলত না, কিন্তু কেমন বিষণ্ণ, মেঘলা হয়ে উঠত তার মুখ। গার্গী পরে অবাক হয়েছিল এই খবর পেয়ে যে, সেই রুনুদাই ঐন্দ্রিলাকে প্রেমপত্র লিখেছিল ফরাসি ভাষায়। কী অদ্ভুত মানুষ!

আজ সকালেও একবার সায়ন জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি জানো গার্গী, রুনু কে? গার্গী আবার মাথা ঝাঁকিয়েছিল, না। তবে সেসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কীই বা লাভ এখন। আসলে সুন্দরী মেয়েদের অনেক প্রেমিক থাকে, থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু সেই মেয়ে কারও প্রেমিকা ছিল কি না সেটাই বিবেচ্য। আমি জানি, ঐন্দ্রিলা কারও প্রেমিকা ছিল না।

এরকম বলেছিল বটে গার্গী, কিন্তু সে জানত, ঐন্দ্রিলা মনে মনে দারুণ পছন্দ করত তার রুনুদাকে। ফরাসি ভাষা শেখা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে সে যত না অখুশি হয়েছিল, তার চেয়ে ঢের ঢের মনমরা হয়েছিল রুনুদার কাছে তার যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। এখন মনে হচ্ছে, সত্যিই কি বন্ধ হয়েছিল মেলামেশা? নাকি গোপনে তার যোগাযোগ ছিল রুনুদার সঙ্গে! তবে কি বিয়ের এতদিন পরেও সে যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি? রুনুদাই কি তাহলে মাঝে মধ্যে এ বাড়িতে যাতায়াত করত সায়নের অনুপস্থিতির দিনগুলোতে? তা কি আদৌ সম্ভব?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল গার্গী। ফোনের নম্বরটি দেখে খুবই ইচ্ছে হল ডায়াল ঘুরিয়ে একবার বিষয়টি পরখ করতে। কে রৌণক মুখার্জি? ঐন্দ্রিলার সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কী ছিল এতদিন? কতদূর গভীরে সেই সম্পর্কের শিকড়!

এমন নিবিড় ভাবনার আবর্তে ওতপ্রোত হয়ে কখন যে সে ডায়াল ঘুরিয়েছে তা মনে নেই। ওপাশ থেকে সুরেলা নারীকণ্ঠে যে শব্দটি ধ্বনিত হল তা শুনে প্রায় ছিটকে উঠল গার্গী।

—ইয়েস, লাইম·ইন্ডিয়া—

লাইম ইন্ডিয়া! এটা কি লাইম প্রাইভেট লিমিটেডের ফোন-নম্বর? তাহলে কি রৌণক মুখার্জির নম্বর নয়? ভাবতে ভাবতে গার্গী পরবর্তী প্রশ্ন করে ফেলল, এখানে রৌণক মুখার্জি কেউ আছেন?

—প্লিজ হোল্ড অন—, বলতে বলতে টেলিফোন অপারেটর লাইন সংযোগ করে দিল অন্য ঘরে। পরমুহূর্তে ভারী পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল রিসিভারে, রৌণক মুখার্জি স্পিকিং—

গার্গী চমকে উঠে পট করে রেখে দিল রিসিভারটা। তার বুকের ভেতর একঝলক রক্ত দুলাৎ করে উঠল যেন। রৌণক মুখার্জি তাহলে লাইম ইন্ডিয়ার কাজ করে? তার সঙ্গে এতকাল এক গোপন সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে ঐন্দ্রিলা? কিন্তু কেনই বা? তার মূলে কি শুধুই প্রেম? আর সেই যোগাযোগ বজায় রাখার কারণেই কি শেষপর্যন্ত তাকে প্রাণ দিতে হল! নাকি অন্য কোনও গভীরতর কারণ? যার শিকড় নিহিত আছে লাইম ইন্ডিয়া আর প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের পারস্পরিক বিদ্বেষ, অসূয়া, প্রতিযোগিতা!

সারাটা দুপুর এমন অজস্র প্রশ্নে তোলপাড়, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল গার্গী। কোথায় যে এই রহস্যের শিকড় তার থই পেতে গিয়ে সে নিজেই হারিয়ে ফেলল ভাবনার যোগসূত্র। ভীষণ একা লাগছিল তার। অফিসে যাওয়ার মুহূর্তে সায়নকে বারবার বলে দিয়েছিল সকালসকাল বাড়ি ফিরতে। কিন্তু সায়ন একবার অফিসে গেলে বোধহয় বাড়ির কথা মনে রাখতে পারে না। বারতিনেক টেলিফোন করার পর ফিরে এল সাড়ে সাতটা নাগাদ। কিন্তু তখন সে ভীষণ চিন্তাক্লিষ্ট। বুঁদ হয়ে কিছু যেন ভাবছে। গার্গী বারবার জিজ্ঞাসা করল, নতুন কোনও সমস্যা হয়েছে?

সায়ন ঘাড় নাড়ল, তেমন কিছু নয়। তবে সকাল সকাল খেয়ে নিতে হবে।

নটার মধ্যেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে বলল, আজ আমাদের কালরাত্রি, খেয়াল আছে তো? রাতে কেউ আর কারও মুখ দেখব না। তুমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি ল্যাবরেটরি ঘরে যাচ্ছি। নতুন একটা ফর্মুলা বার করতে হবে। পুরানো প্রোডাক্টের সেল ফল করেছে। অতএব নতুন প্রোডাক্ট বাজারে না ছাড়লে প্যারাডাইস আর স্বর্গ থাকবে না, ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। ব্যাপারটা তুমি বুঝবে আশা করি। কাজ শেষ হলেই ওখানে যে কটা পাতা আছে, তাতেই শুয়ে পড়ব। কাল সকালে আবার দেখা হবে—

বলেই গার্গীকে কথা বলার কোনও সুযোগ না দিয়ে সে ল্যাবরেটরি ঘরে তালা খুলে ঢুকে পড়ল তার ভেতর। ভেতরে প্রশস্ত ঘর, অনেক র‍্যাক, বইপত্র, টেস্টটিউব, ফানেল, বিকার, কেমিক্যালের স্তূপ। খুবই অগোছালো। ঐন্দ্রিলাও নাকি কখনও ঢুকত না ও ঘরে। সায়ন তার ভেতর ঢুকে, 'গুডনাইট' বলে দরজা বন্ধ করে দিল আচমকা।

সমস্ত ব্যাপারটা এমন দ্রুত, প্রস্তুতিবিহীনভাবে ঘটে গেল যে গার্গী হকচকিয়ে গেল। আলো না নিভিয়ে অনেকক্ষণ একা বসে রইল বিমূঢ় হয়ে। যত দেখছে সায়নকে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে। প্রথম রাত জেগে কাটাল বাসর-জাগার মতো। দ্বিতীয় রাত কালরাত্রি। এ পর্যন্ত

pathagar.net

একবারও সে তার কামনার বাঁধ ভেঙে গার্গীর হাতটা পর্যন্ত ছোঁয়নি। ভারি অদ্ভুত আর অন্যরকম পুরুষ। হয়তো ঐন্দ্রিলার স্মৃতিই তাকে আড়ষ্ট, অসহায় করে রেখেছে। এ সায়নকে গার্গী চেনে না। অফিস থেকে আজ ফেরার পর ভারি অন্যমনস্ক আর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লাগছিল তাকে। তার কোম্পানির সেল দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। যে কলঙ্ক তার চরিত্রে লেগে গেছে, তা ছুঁয়ে ফেলেছে তার কোম্পানিটিকেও। পরপর নানারকম বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পড়ে তার কোম্পানির কর্মীরাও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সায়নের সঙ্গে সহজ হয়ে কথাই বলতে পারছে না কেউ। তাদের আচার-আচরণ দেখে সায়নও হতাশ, বিষাদে ডুবে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে অন্য নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে না ছাড়লে কোম্পানির সামনে সমূহ বিপদ। গতরাত জেগে কাটিয়েছে সায়ন, হয়তো আজও জেগে কাটাবে।

কিন্তু গার্গী এই বন্ধ ঘরে একা-একা সারারাত কাটাবে কী করে! চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো ঐন্দ্রিলার স্মৃতি তাকেও বারবার বিহ্বল করে তুলছে। এ কদিন কী এক প্রবল ঘোরের ভেতর বাস করছিল, হঠাৎ আজ এ বাড়িতে এসে চমকে চমকে উঠছে বারবার। কিছুক্ষণ স্পন্দনহীন বসে থাকতে থাকতে তার হঠাৎই মনে হল সে যেন ঐন্দ্রিলার গলা শুনতে পেল, কী রে মিতুন, তুই এখনও বাড়ি যাসনি। অনেক রাত হয়ে গেল যে!

গার্গী শিউরে উঠে আশেপাশে তাকাল। না, কেউ কথাটা তাকে বলেনি। তার অবচেতন মন থেকেই উঠে এসেছে বাক্যটি। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল তার। সেই মুহূর্তে কেউ তাদের ফ্ল্যাটের দরজায় বেল টিপল, টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ—

গার্গী চমকে উঠল, ভয়ও পেয়ে গেল খুব। রাতের এমন নিশুতি প্রহরে তাদের ফ্ল্যাটে আবার কার আগমন! সায়নের কোনও পরিচিত লোকজন, অথবা গার্গীর চেনাজানা কেউ! দ্রুত উঁকি দিয়ে দেখল, ওদিকে ল্যাবরেটরি ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু দরজা বন্ধ ভেতর থেকে। এক-লহমা দাঁড়িয়ে ভাবল, সায়নকে ডাকবে কি না, কিন্তু সায়ন বলে গেছে, আজ কালরাত্রি, আজ সে গার্গীর মুখ দেখবে না। তাহলে কী করবে সে? কী করা উচিত, এমন ভাবতে ভাবতে আবার বেল বাজার শব্দ, টিঙ নানা, টিঙ নানা, টিঙ নানা,—

কোনও দিশে না পেয়ে গার্গী দ্রুত গিয়ে তাদের ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিল। আর বাইরের দিকে তাকাতেই আবারও চমকে উঠল সে।

দাঁড়িয়ে রয়েছে রবার্ট। রবার্ট ও নীল।

এত রাতে রবার্ট ও নীলকে দেখার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিল না গার্গী। একমুখ দাড়িগোঁফের জঙ্গলে মৃদু মৃদু হাসছিলেন রবার্ট, গার্গীকে দেখে বললেন, তোমাদের বিয়েতে শুভকামনা জানাতে এলাম—

গার্গী বিস্ময়ে তখনও থ। এক প্রবল টেনশন ক্রমশ চারিয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত শরীরে। শ্মশ্রুগুল্ফময় এই যুবকপ্রতিম বিদেশিটিকে সে অনেকবার দেখেছে এ বাড়িতে। যখনই গার্গীর দিকে তাকিয়েছেন এরকমই এক অদ্ভুত রহস্যময় হাসি মাখানো থাকত তার মুখে। কখনও কোনও কথা হয়নি, তবু বলা যায় তারা পরস্পরের পরিচিতই। মানুষটিকে যত না দেখেছে গার্গী, শুনেছে তার চেয়ে ঢের বেশি। কিন্তু অনেককিছু হয়তো না-শোনাও আছে এখনও।

গার্গীর আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই রবার্ট ও নীল সোজা ঢুকে এলেন তাদের ড্রয়িংরুমে, বললেন, হোয়ার ইজ দ্যাট ব্রাইডগ্রুম? কাউকে কিছু বলা নেই, নিমন্ত্রণ নেই, হঠাৎ চুপিচুপি বিয়ে করে ফেললে, তাও জানতে হল খবরের কাগজ পড়ে, এ আবার কীরকম কাণ্ড! উই শুড্ সেলিব্রেট সাচ অকেশন।

এতক্ষণে চোখে পড়ল গার্গীর, তাঁর হাতে একটা ফুলের বোকে, ঢাউস সাইজের, তার ভেতর উপচে পড়ছে লাল-হলুদ-সবুজের উম্‌সুম্‌ সৌন্দর্য।

ভীষণ অবাক হয়ে যাচ্ছিল গার্গী, ঠিক বুঝতেও পারছিল না রবার্টের হঠাৎ উদয় হওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী! অথচ রবার্ট এমনভাবে কথা বলছেন, এত স্বাভাবিকভাবে, যেন এ ফ্ল্যাটে তাঁর দীর্ঘদিনের যাতায়াত। ঐন্দ্রিলার কাছেও এভাবে হুটহাট চলে আসতেন নাকি! লম্বা চুরুটটি এক-একবার মুখে দিচ্ছেন, আবার নামিয়ে নিচ্ছেন পরক্ষণেই। গার্গী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ও তো ল্যাবরেটরি রুমে, কীসব কাজ করছে।

রবার্ট বিস্মিত হয়ে বললেন, মাই ড্রেসাস! বিয়ের পরদিন নতুন যুবতী বউকে একা এ ঘরে রেখে দ্যাট চাইল্ড ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করতে ঢুকেছে! অ্যাম আই টু বিলিভ দিস! কল্‌ হিম—

'কল্‌ হিম' শব্দদুটোয় বেশ আদেশের সুর জড়ানো, ধমকই বলা যায়, অথচ তার মধ্যে একটা স্নেহের স্বরও মিলমিশ।

গার্গী কী করবে ভেবে পেল না। এক অদ্ভুত উত্তেজনায়, তীব্র শিরানিতে বুকের ভেতরটা কাঁপছে তার। সায়নকে ডাকবে কি ডাকবে না এই দোলাচলে কিছুক্ষণ টালমাটাল হল। সায়ন যখন ল্যাবরেটরিতে থাকে, তখন সে দারুণ আত্মমগ্ন, নিবিষ্ট, তাকে ডাকবার হুকুম নেই। রাতের বেলা কাজ করতে করতে নাকি ভোর করে ফেলে প্রায়শ। রাতে অবশ্য কখনও তাকে ল্যাবরেটরি রুমে দেখার সৌভাগ্য হয়নি গার্গীর, দিনের বেলাতেই দেখেছে। সে তখন এমন আচ্ছন্ন, বুঁদ হয়ে থাকে কাজের ভেতর যে, অনেকসময় ডেকেও সাড় ফেরাতেও পারেনি তার। একটু আগেই দুবার ডোরবেল বাজানোর শব্দ হয়েছে, শুনেছে কি শোনেনি কে জানে, দরজা খোলেনি সে। বাধ্য হয়ে মাথা নিচু করে গার্গী বলল, ও বলছিল, আজ কালরাত্রি।

কালরাত্রি! একমুহূর্ত থমকালেন নীল, তারপর হঠাৎ হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন, কালরাত্রি! দ্য আইডিয়া! ছেলেটা তো লেখাপড়া, ল্যাবরেটরি আর তার কোম্পানি নিয়েই মেতে থাকত জানতাম, এসব সামাজিক রীতি-আচার সম্পর্কেও যে ওয়াকিবহাল তা তো বুঝতে পারিনি, ইটস রিয়্যালি স্ট্রেঞ্জ!

বলে আর একদফা হো হো করে হাসতেই গার্গীর বুকের ভেতর বিদ্যুৎ খেলা করে গেল যেন। সে বুঝতে পারছে না, সায়ন কেন তার ল্যাবরেটরি-রুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে না। এখন রাত্রি অনেক, চারপাশ শুনশান, তার মধ্যে রহস্যময় বিদেশি মানুষটির এমন বুক-কাঁপানো হাসি শুনে তার এখন ভয়ঙ্কর দিশেহারা অবস্থা।

পরক্ষণেই রবার্ট আবার বললেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন সারারাত ধরেই কি ল্যাবরেটরিতেই কাটাবে নাকি? সেদিন পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল বললেন, মার্ডারের পরদিন ভোরবেলা এসে তারা ল্যাবরেটরি রুমের মেঝেয় বহু কাগজপত্র ছড়ানো-ছিটানো দেখতে পেয়েছিলেন। টেবিলের ড্রয়ার খোলা, তার ভেতরও সব কাগজ ওলটপালট। সে নাকি এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই নাকি? হঠাৎ ল্যাবরেটরি রুমের কাগজপত্র কার দরকার পড়ল?

—কে জানে কার দরকার? সেজন্যই বোধহয় সে রাতে পার্ক সার্কাস মিউজিক কনফারেন্স থেকে ফিরে অত রাতে ল্যাবরেটরি রুমে আলো জ্বলতে দেখছিলাম আমরা। বলতে বলতে তাঁর কোটের পকেট থেকে যে কালো রঙের বস্তুটি হঠাৎ বার করলেন, সে দিকে রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাকিয়ে রইল গার্গী। যেন হৃৎপিণ্ড থেমে গেল একলহমা। কী থাকতে পারে ওর মধ্যে?

আর- ডি-এক্সের মতো কোনও শক্তিশালী বিস্ফোরক!

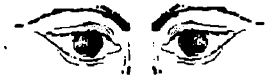

বিহ্বল, ভয়ত্রস্ত চোখে গার্গী ভাল করে তাকিয়ে দেখল রবার্টের হাতের দিকে। কালো কাগজে মোড়া একটা মাঝারি আকারের প্যাকেট। রবার্ট সযত্নে মোড়কটি খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল চমৎকার একটি পারফিউমের শিশি। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল হাওয়ায়। সে-গন্ধ এতই মনোরম যে কিছুক্ষণের মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে গেল সে। গন্ধটা চেনা-চেনা। একটু ভাবতেই মনে পড়ল, কাঁঠালিচাঁপা ফুলের গন্ধ। গার্গী অবাক হল, খুশি হল, পরমুহূর্তে দ্বিধান্বিত হল। তার বুকের কাঁপুনি এখনও যায়নি। এমন অদ্ভুত চেহারার একটা মানুষের সামনে একা রাতের বেলা এভাবে বসে থাকাটা ভারি বিচিত্র মনে হচ্ছে তার। বুঝে উঠতে পারছে না কি উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা তার কাছে এসেছে। হঠাৎ যদি কোনও খারাপ মতলব প্রকাশ করার চেষ্টা করে, তবে প্রস্তুত থাকতে হবে তার জন্য। তার ক্যারাটের বিদ্যেটা জাহির করতে হতে পারে আজ। গার্গীর চমক ভাঙিয়ে রবার্ট বললেন, তুমি হয়তো শুনেছ, কলকাতায় অসংখ্য বন্ধু আছে আমার। আমার সৌভাগ্য এই যে তারা প্রায় সবাই বিভিন্ন অকেশনে নিমন্ত্রণ করে আমাকে, অনেক নব-বিবাহিত দম্পতিও। বিশেষ করে নব-বিবাহিতদের অনুষ্ঠানে গেলে আমি অবশ্যই এক সামান্য উপহারটুকু দিতে চেষ্টা করি— এক শিশি পারফিউমের আর একটি ফুলের বোকে। তার সঙ্গে প্রার্থনা করি, নববিবাহিত দম্পতির সমস্ত জীবন যেন এমনই সুগন্ধে ভরে থাকে। লেট ইউ অলসো বি হ্যাপি, বলতে বলতে চুরুটের ধোঁয়া আবার খানিকটা ছাড়লেন ও'নীল, হয়তো তুমি কিছুটা সারপ্রাইজড হয়েছে, হাউ দিস ওল্ড ফেলো কুড কাম টু ইয়োর ফ্ল্যাট উইদাউট এনি ইনভেটিশন, বাট—, ও'নীল হাসলেন, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মনোরম, আমি তার কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করি, ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে অনেক ঝড়ঝাপটা, অনেক শোক, দুঃখ, অনেক রক্তপাত— তা পেরিয়ে সুন্দরের কাছে পৌঁছানো জীবনের এক পরম প্রাপ্তি। অনেক অসুন্দরের মধ্যে থেকে সুন্দর খুঁজে বার করে তাকে পুজো করতে পারার মতো আনন্দ তো। জীবনে আর কিছু নেই। আমার জীবনের মন্ত্রই হল, যা কিছু সুন্দর তার পুজো করা। ভাল একটা ছবি, তার দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকো। ভাল একটা বই, তার মধ্যে বুঁদ হয়ে থেকে তার সৌন্দর্য আহরণ করো। ভাল একটি দৃশ্য, তার দিকে তাকাও, তার ভেতরের চমৎকারিত্ব হৃদয়ের ভেতরে নিঃশেষে ভরে নাও।

ও'নীল আবার একটু থামলেন, হাসলেন গার্গীর দিকে তাকিয়ে, পৃথিবী ভারি সুন্দর জায়গা। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথম সূর্যের দিকে তাকাবে। লালবর্ণ সূর্যের রূপ, ভোরবেলাকার কুয়াশার রঙ পৃথিবী, সবুজ গাছের ঘুম ভাঙা রূপ, সব মিলিয়ে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য। সেই সৌন্দর্য দেখার পর মনে হবে, এই পৃথিবীতে আরও কিছুকাল বেঁচে থাকি। জীবন একটাই, অথচ তার পরমায়ু কত কম। আই হ্যাভ অলরেডি ক্রশ্‌ড্ সিক্সটি, তবু আমার মনে হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখা হয়নি, ভালবাসা হয়নি অনেক সৌন্দর্যকে। হয়তো মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাইই মনে হয় সমস্ত মানুষের। মানুষের দ্বিতীয় জন্ম আছে কি না তা জানা নেই আমার। আর জন্মালেও কোনও লাভ নেই, কারণ তখন তাকে আবার সবকিছু নতুনভাবে জানতে হয়, শিখতে হয়। নতুন করে এ বি সি ডি শিখে চিনতে হবে এই সুন্দর পৃথিবীটা।

আগের জন্মের সবকিছুই তার কাছে তখন অদৃশ্য। অতএব যা কিছু জানার, চেনার, শেখার, পাওয়ার—তা এক জীবনের মধ্যেই শেষ করতে হবে।

বলতে বলতে নিজের ভেতর তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন রবার্ট ও'নীল। হঠাৎ চমক ভেঙে বললেন, ওই যা, একা একা কত কিছু বকবক করে চলেছি। তোমার নিশ্চয় খুব ঘুম পেয়ে গেছে। ভাবছ বুড়ো মানুষটা বকে যাচ্ছে পাগলের মতো। কিন্তু রাগ করো না, বয়স হলে মানুষের কথা বলার প্রবণতা বাড়ে। হাউএভার, বিয়ের পর হনিমুনে যাওয়ার একটা প্রথা আছে। তোমরা কোথাও বেরোচ্ছ নিশ্চয়?

রবার্টের প্রশ্নে একটা ঝাঁকুনি খেল গার্গী। হঠাৎ হনিমুনের কথা জানতে চাইছেন কেন তা আঁচ করতে পারল না। রবার্ট এত রাতে তাদের ফ্ল্যাটে কেন এসেছেন, এতক্ষণের কথাবার্তা থেকে তারও কিছু হদিশ করতে ব্যর্থ হল। সমস্ত ব্যাপারটা এখন ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে তার কাছে। কথার পৃষ্ঠে কথা জিইয়ে রাখতে বলল, কোনও বিশেষ সাজেশন আছে নাকি আপনার? কোনও বিশেষ স্পট?

উঁহু, ও'নীলের চোখ হঠাৎ স্বপ্নময় হয়ে উঠল, আমি প্রচলিত টুরিস্ট-স্পটগুলোতে যাওয়ার কথা ভাবি না। আই অলওয়েজ প্রেফার আনকমন প্লেসেস। সে পাহাড় হোক, সমুদ্র হোক, অথবা কোনও জঙ্গলই হোক। অথবা—, ও'নীলের গলায় ঈষৎ কৌতুক, মরুভূমি হলেও আপত্তি নেই, যদি সঙ্গে জল, খাদ্য আর একটা তাঁবু থাকে। সঙ্গে একটা উট হলে আরও চমৎকার। এমনকি কোনও অপরিচিত মফস্বল শহরে যদি দিন-সাতেক কাটিয়ে আসো, তাহলেও দেখবে চমৎকার লাগছে। কলকাতা থেকে একটু অন্যরকম জীবনযাপন। সেখানে এত ব্যস্ততা নেই, ট্রাফিক-জ্যাম নেই, সে জীবনটা এত মেকানিক্যাল নয়। আমি মাঝেমধ্যেই কলকাতা থেকে হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাই, একটা অন্য জীবনের স্বাদ নিয়ে ফ্রেস হয়ে ফিরে আসি কলকাতার ব্যস্ততায়। আমার অনুভূতিতে এক-এক জায়গার জীবনযাপন এক-একরকম।

গার্গীর ঘুম আসছিল, জুড়ে আসছিল দুচোখের পাতা, কাল রাতে ঘুম হয়নি, আজ যদি না ঘুমোতে পারে—, কিন্তু রবার্ট ও'নীলের কথায় এমন এক অদ্ভুত মাদকতা আছে, তার সঙ্গে একটা টেনশন এমন শিরিয়ে উঠছে রক্তের ভেতর যে, ঘুমদেবী তার চোখ ছুঁইয়ে ফের সরে যাচ্ছিল। মুখে আগ্রহ দেখিয়ে সে আবার জানতে চাইল, কীরকম?

—ধরো নীল সমুদ্রের ধারে বসে আছে সারা বিকেল, চারপাশে অখণ্ড নির্জনতা, দূরে নীল জলে কয়েকটা নৌকা ঢেউয়ের দোলায় উঠছে নামছে। পরম একাগ্রতায় তার মাঝিমাল্লারা মাছ ধরছে জাল ফেলে, শুধু দূরে দিকচক্রবাল ছাড়া দিগন্তরে জনমনিষ্যি নেই, তখন দেখবে, তোমার মনটা কী বিশাল কী উদার হয়ে উঠছে সহসা। মনে হবে, এই চরাচরের অধীশ্বর তুমিই। মনটা এত্ত বড় হয়ে যায় যে, তখন জাগতিক সমস্ত সুখদুঃখ, টানাপোড়েন সব তুচ্ছ হয়ে যায়। কিংবা ধরো, একটা পাহাড়ের উপর, ছ' হাজার কি আট হাজার ফিট উপরে বসে আছে দূরে-দূরে আরও সব পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত স্পর্ধায়, কেউ কেউ মাথা বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছে আকাশ, চারদিকে শুধু অহঙ্কার আর অহঙ্কার। কিছুক্ষণ এই উপলব্ধির ভেতর থাকলে দেখবে এই অহঙ্কার ক্রমশ চারিত হচ্ছে তোমার মধ্যেও।—

গার্গী হেসে উঠল, আর জঙ্গল? রবার্ট ও'নীল এবার দুষ্টু-দুষ্টু মুখ করে মিটিমিটি হাসলেন, ফরেস্ট ইজ আ প্লেস অব্ লাভ। জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা নিবিড় ব্যাপার আছে যা শরীরে একটা অদ্ভুত ফিলিংস নিয়ে আসে। সে এক অনন্য অনুভূতি, অনির্বচনীয়, বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন, রবার্ট ও'নীল, ফিসফিস করে বললেন, ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। সে এক গভীর,

pathagar.com

গভীরতম প্রেম। যাক্, প্রথমদিন এর চেয়ে আর বেশি কিছু বলব না। আজ রাত যখন কালরাত তখন আপাতত এ আলোচনায় ইতি, বরং আগামীকাল মনে রেখো, হাউ টু মেক লাভ উইথ আ ম্যান।

রবার্টের শেষ বাক্যটিতে এমন এক অদৃশ্য জাদু জাড়িয়ে ছিল যা ভেতরে সেঁধুতেই গার্গীর সমস্ত শরীরে এক বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। সে থমকে গেল সহসা, কিন্তু ততক্ষণে তার ভেতরে অন্য এক অনুসন্ধিৎসা চাগাড় দিয়ে উঠেছে। একটু আগের কথার সূত্র ধরে রবার্টের দিকে ফের ছুড়ে দিল তার ভেতরে উথলে ওঠা প্রশ্নাবলি, আচ্ছা, রবার্ট, আপনি নিশ্চয় পুলিশের অজস্র জিজ্ঞাসাবাদে জেরবার হয়ে গিয়েছেন ইতিমধ্যে। তবু আমাকেও যদি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেন—

রবার্ট চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, বিস্মিত হয়ে থমকালেন, কী প্রশ্ন?

—আমি ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর দিনের কথা বলছি। সেদিন চন্দ্রদেবীকে নিয়ে আপনি সন্ধের সময় বেরিয়ে গিয়েছিলেন পার্ক-সার্কাস মিউজিক কনফারেন্সে। আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই কি মোহন ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছিল, না পরে?

—তার আগেই।

—আচ্ছা, আপনারা যখন বেরিয়ে যান, তখন আপনাদের ফ্ল্যাটে আর কেউ ছিল?

—না।

—সেদিন আপনারা বাড়ি থাকাকালীন আর কেউ কি এসেছিলেন আপনাদের ফ্ল্যাটে?

—বাইরের কেউ আসেনি, একমাত্র দীয়াই এসেছিল দুপুরের দিকে। বিকেলে আমরা বেরিয়ে যাওয়ার একটু আগেই সেও চলে গিয়েছিল।

—তখন মোহন বাড়িতে ছিল?

—ছিল। কারণ মোহনই গেটের তালা খুলে দিয়েছিল, তারপরে সেও চলে যায় ছুটি নিয়ে।

—তা হলে আপনারা দুজন যখন বেরিয়েছিলেন, তখন এ বাড়িতে ঐন্দ্রিলা ছাড়া আর কেউ ছিল না?

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হয়।

—আচ্ছা, সে-রাতে ল্যাবরেটরি রুমে আলো জ্বলতে দেখে কী মনে হয়েছিল আপনাদের?

—ভেবেছিলাম, হয়তো সায়নই ছিল।

—কিংবা এও হতে পারে ঐন্দ্রিলা নিজেই ছিল। অথবা অন্য কেউ, যে ঐন্দ্রিলার চেনা?

—হ্যাঁ, তাও হতে পারে।

—আচ্ছা রবার্ট, মোহন যখন ছুটিতে যায়, তখন গেটের ডুপ্লিকেট চাবি আপনাদের ফ্ল্যাটে কার কার কাছে থাকে?

—একটা চন্দ্রার কাছে। অন্যটা হিমনের কাছে।

—মোহন আমাকে বলেছে, সে যতক্ষণ এ বাড়িতে পাহারায় ছিল, বাইরের কোনও লোক সেদিন আসেনি। আপনিও তাইই বললেন একটু আগে। তাহলে আপনারা বেরিয়ে যাওয়ার পর একমাত্র হিমনই তার কাছে থাকা ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছিল?

রবার্ট এবার হাসলেন, তুমি তো প্রায় গোয়েন্দাদের মতো প্রশ্ন করছ দেখছি। যাইহোক, এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, হিমন এসেছিল রাত সাড়ে নটা নাগাদ, তার আগে বা পরে অন্য কেউও আসতে পারে যে ঐন্দ্রিলার চেনা। ঐন্দ্রিলাদের ফ্ল্যাটেও তো একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। তাহলে সায়ন, কিংবা অন্য কেউ হয়তো এসেছিল।

pathagar.net

গার্গী একটুখানি কেঁপে উঠল যেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তার, অন্য কেউ যদি এসেই থাকে, তা হলে সে কে?

—নিশ্চই তার চেনা কেউ। বলে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে রবার্ট বললেন, ঠিক আছে, তাহলে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। সায়নকে কাল সকালে বোলো, আমি এসেছিলাম, আর তোমাদের বিবাহে শুভকামনা জানিয়েছি। ফুলের এই তোড়াটি কাল আমার হয়ে তুমিই ওকে প্রেজেন্ট করবে। গুড্ নাইট।

গার্গীকে প্রায় হতবাক করে দিয়ে যেমন হঠাৎ এসেছিলেন ও'নীল,তেমনই দ্রুত নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে গার্গী যখন ফিরে আসছে ঘরের ভেতর, হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাটে চোখ পড়তেই সে চমকে দেখল, এক জোড়া চোখ এতক্ষণ যেন নজর রাখছিল তাদের দিকে। বিস্মিত হয়ে দ্রুত জানালার পর্দাটা টেনে নিয়ে পাল্লা বন্ধ করে দিল। ব্যাপারটা আশ্চর্যই! কিন্তু কে ওখানে দাঁড়িয়ে! চন্দ্রাদেবী? না কি হিমন! কেন নজরদারি করছে তাদের ফ্ল্যাটে!

পরদিন ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেল গার্গীর। ঘুম ভাঙতে দেখল, ভোরের কুয়াশা-রং আজ যেন একটু অন্য রকম। সায়ন এই ভোরেই শেভ্ করে স্নান করে ফিটফাট। কিচেনে ঢুকে চা বসিয়েছে গ্যাসে। গার্গীকে দেখে হাসল, গুড্ মর্নিং ম্যাডাম। খুব ঘুমিয়েছ যা-হোক।

—আর তুমি নিশ্চই ঘুমোওনি। সারারাত কাজ করেছ ল্যাবরেটরিতে?

—প্রায় তাই। ভোরের দিকে শুয়েছিলাম একটু। এক ঘণ্টাও ঘুমোইনি, হঠাৎ দেখলাম, চোখে আলো লাগল জানলা দিয়ে। কাগজওয়ালা বেল বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে রাস্তায়। আজকাল আর খবরের কাগজে চোখ রাখতে ইচ্ছে করে না, তবু পুরানো অভ্যাসবশত ঘুম ভেঙে গেল। খুব ক্লান্ত লাগছিল, কিন্তু স্নান করে এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বলতে বলতে গ্যাস-ওভেন থেকে চায়ের পাত্র নামিয়ে ফেলল, গার্গীকে বলল, যাও মুখ ধুয়ে এসো, নইলে চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। গো, কুইক।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, রোজ কি তুমিই চা করবে নাকি?

—উঁহু, কখনও করিনি। আজ হঠাৎ ইচ্ছে হল। শুধু আজই। কাল থেকে তোমার দায়িত্ব। আরও ভোরে উঠতে হবে।

চায়ের টেবিলে বসে হঠাৎ সায়নের নজর পড়ল ঘরের একপাশে রাখা ফুলের বোকেটির দিকে। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল কী ব্যাপার, হঠাৎ ফুলের বোকে এল কোত্থেকে?

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর একটা কথাই গার্গীর মনের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছিল, সে রাতে ঐন্দ্রিলা ছাড়া সত্যিই আর কেউ ছিল এ ফ্ল্যাটে? থাকলে সে কে? ফুলের ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল প্রায়। হেসে বলল, সে এক মজার কাণ্ড হয়েছে। কাল তুমি যখন ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে গেলে, তখনই হঠাৎ দরজায় কলিং বেল—

—তাই নাকি? শুনতে পাইনি তো?

গোটা ঘটনাটা বেশ বিস্তৃতভাবে সায়নের কাছে বিবৃত করে গার্গী বলল, কী অদ্ভুত মানুষ, বুঝলে?

সায়ন কিন্তু শুনতে শুনতে স্তব্ধ হয়ে গেল, ওই স্কাউন্ড্রেলটা এসে কলিং বেল বাজাল, আর তুমি দরজা খুলে দিল? আমাকে ডাকোনি?

—বাহ্, আমি কী করব? তুমি তো কালরাত্রি বলে দিব্যি ঢুকে গেলে ল্যাবরেটরি রুমে। তখন ডাকলে যদি রেগে যাও। দরজা খোলা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল আমার?

pathagar.net

সায়ন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল মুহূর্তে, মুখ লাল করে বলল, তুমি জানো না, লোকটা একটা আস্ত শয়তান। আমার বাবার লাইফটাকে একেবারে হেল করে দিয়েছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসে বসে থাকত এ বাড়িতে। মায়ের সঙ্গে গল্প করত। বাবা তাঁর চেম্বার অ্যাটেন্ড করে যাও বা দু-তিন ঘন্টার জন্য ঘরে আসতেন, মাকে কাছে পেতেন না। মা তখন হয়তো রবার্টের পপ গান শুনতে ব্যস্ত। শেষের দিকে বাবা প্রায় আসতেনই না চেম্বার ছেড়ে। তাঁর লাঞ্চ, ডিনার পর্যন্ত দিয়ে আসা হত চেম্বারে। ঐন্দ্রিলার কাছেও এভাবে একদিন এসেছিল বোকে নিয়ে। কিন্তু ঐন্দ্রিলা তাকে পাত্তা দেয়নি। তারপর লোকটা আর ঘেঁসেনি এ ফ্ল্যাটে।

—ঘেঁসেনি! গার্গীর কিন্তু মনে হয়েছিল রবার্ট আরও অনেকবার এসেছে। যাইহোক, মুখে গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিক আছে, আমিও আর পাত্তা দেব না। প্রথম দিন বলেই—। তা ছাড়া, এমন একটা অকেশনের কথা বলে এল, ফেরাতে পারলাম না।

—লোকটা মেয়েদের সাইকোলজি ভীষণভাবে বোঝে। আর বোঝে বলেই নানান্ বয়সি মেয়েদের ভোলাতে একনম্বরের এক্সপার্ট। কত মেয়েকে যে এভাবে নষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এখনও নাকি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়েদের নিয়ে বারে পর্যন্ত যায়—

গার্গী বলতে যাচ্ছিল, বাহ্, লোকটার তাহলে এলেম আছে, কিন্তু বলল না। সায়নকে এখন ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে, ক্ষুব্ধও। তাকে ঠাণ্ডা করতে বলল, আসলে লোকটা অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে মেয়েদের বশ করে ফেলে। আমাকেও—

—তোমাকেও বলেছে বুঝি? সায়ন উত্তেজিত হয়ে বলল, লোকটার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি বাড়ি আছি জেনেও—

গার্গী স্থির চোখে লক্ষ করছিল সায়নের অভিব্যক্তি। ঐন্দ্রিলার কাছেও এভাবে আসত নাকি রবার্ট! তাই-ই সায়নের এত রাগ? আস্তে আস্তে বলল, আর একটু চা দেব?

—নাহ্।

কথা ঘোরানোর জন্য গার্গী হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে ফেলল, পর পর দু' রাত ঘুমোওনি কিন্তু। অফিসে কাজের চাপ কি খুব বেশি? না গেলে হয় না?

অফিসের প্রসঙ্গ তুলতেই সায়ন বেমালুম ভুলে গেল সব, চিন্তিত হয়ে বলল, উঁহু, খুব জরুরি অনেক ব্যাপার আটকে আছে। ডিটারজেন্ট পাউডারের ব্যাপারটা তো পণ্ড হয়েই গেল, নতুন স্নানের সাবান তৈরি করব বলে ঠিক করেছি, তাও কেউ বা কারা যেন চাইছে না। পর পর একটা অদৃশ্য হাত সে যেন বাদ সাধছে।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, কে, তা বুঝতে পারছ?

সায়ন মাথা নাড়ল, না। তবে হঠাৎ প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত প্রায়ই অ্যাবসেন্ট হচ্ছে কাজে। সেদিন এসে বলল, আমি একটা ফর্মুলা বার করেছি। একবার ট্রাই করে দেখুন না। কিন্তু সেটা আমার পছন্দ হয়নি বলাতে ভীষণ রেগে গেল হঠাৎ। লোকটার চালচলন আমার ভাল ঠেকছে না। হয়তো এত সব স্যাবোটেজের পেছনে তার হাত থাকতে পারে।

—তাই? তাহলে লোকটাকে সরিয়ে দিলেই তো হয়?

—সে ভাবনাও না ভেবেছি তা নয়। কিন্তু কোম্পানির এই সঙ্কটের মুহূর্তে প্রোডাকশন ম্যানেজারের রোল খুব ভাইট্যাল। প্রোডাকশনের অনেক খুঁটিনাটি তার জানা হয়ে গেছে। এ সময় তাকে ছেড়ে দিলে ক্ষতিই হবে।

—তাহলে কৌশিক দত্তকে ট্যাক্‌কফুলি কাজকর্ম থেকে সরিয়ে একদম সাইফার করে দাও, যাতে নতুন প্রোডাকশনের ব্যাপারে কোনও ঝামেলা পাকাতে না পারে।

pathagar.net

সায়ন হেসে বলল, আইডিয়াটা ভালই দিয়েছ তো। মনে হচ্ছে তোমাকেই শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ম্যানেজিরিয়াল ফাংশনে নিয়ে আসতে হবে। আমি একা আর পেরে উঠছি না। যাই হোক, আপাতত সমস্যা হচ্ছে, প্রোডাকশন ম্যানেজার নিজেই কাজ ছেড়ে দেবে মনে হচ্ছে। ছেড়ে দিলে এই মুহূর্তে একু মুশকিলেই পড়ব। ফ্যাক্টরির লোকজন ওকে খুব মানে। ওর খুব হোল্ড আছে কর্মীদের ওপর।

একটু ভেবে নিয়ে গার্গী বলল, প্রোডাকশন ম্যানেজারের দু-একজন ডেপুটি আছে না? তাদের মধ্যে কেউ চৌখস নয়? যদি কৌশিক দত্ত কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে তাদেরই কেউ কাজ চালিয়ে দিতে পারবে না? তুমি নিজেই যখন টেকনিক্যাল এক্সপার্ট—

সায়ন অবাক হয়ে শুনছিল গার্গীর কথাবার্তা। সে ঐন্দ্রিলার মতো নিরীহ মুখ করে তাকিয়ে থাকে না। তার সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে কোম্পানির ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করছে। একটু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, বেশ বলেছ যা হোক। তুমি যখন অভয় দিচ্ছ, মনে হয় ক্রাইসিসটা কাটিয়ে উঠতে পারব।

—ও হ্যাঁ। কাল সারারাত ল্যাবরেটরিতে কাটালে, কিছু সূত্র পাওয়া গেল? তোমার নতুন প্রোডাক্টের?

—কিছুটা। নতুন একটা সেন্ট আনার চেষ্টা করছি গায়ে-মাখা সাবানে। জুঁইফলের গন্ধ। গন্ধটা এমন মিষ্টি যে সারাদিন লেগে থাকবে গায়ে। সে খুব ফ্যান্টাস্টিক হবে। ব্যাপারটা আপাতত কারও কাছে প্রকাশ করছি না। দেখা যাক—

বলতে বলতে সায়নের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যখনই সে তার নিজের তৈরি প্রোডাকশনের কথা বলে সহসা তার চেহারায় এক অন্য দীপ্তি ফুটে চঠে। দু-দুটো রাত সে যে ঘুমোয়নি, তার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি তার শরীরে লেগে নেই। সৃষ্টির আনন্দই বোধহয় এরকম। গার্গী তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল সে মনোরম আনন্দ। ছুঁতে চাইল সায়নের হৃদয়।

কিন্তু সায়ন কাজের মানুষ। তার ততক্ষণে মনে পড়ে গেছে, অফিসে আরও একশো কাজ বাকি। ব্যস্ত হয়ে বলল, সকাল-সকাল বেরোতে হবে কিন্তু—

ঝকঝকে পোশাকে প্রস্তুত হয়ে, হাসি-হাসি মুখে সায়ন যখন বেরোবার উদ্যোগ করছে, সে সময় কী যেন মনে পড়ল গার্গীর, জিজ্ঞাসা করল, ল্যাবরেটরি রুম থেকে কোনও কাগজপত্র কি খোয়া গেছে এর মধ্যে?

সায়ন চমকে উঠে বলল, তুমি কী করে জানলে?

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, সত্যিই গেছে নাকি? কেন যেন মনে হল আমার—

সায়ন স্তব্ধ হয়ে বলল, সত্যিই গেছে কিন্তু। হঠাৎ কে বা কারা যেন লণ্ডভণ্ড করে গেছে আমার যাবতীয় গবেষণার কাগজপত্র। কাল গোছাতে গোছাতে দেখি অনেক কাগজ নেই।

গার্গী তার অনুমানে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, আমারও সেরকম মনে হয়েছিল। রবার্ট কাল যখন বললেন কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে মেঝেয়—, বলতে বলতে গার্গী আবার জিজ্ঞাসা করল, খুব দরকারি কাগজপত্র খোয়া গেছে?

সায়ন এতক্ষণে হাসল, না। ভাগ্যক্রমে দরকারি কাগজপত্রে হাত দেয়নি লোকটা। যেগুলো নিয়ে গেছে তা ওদের কোনও কাজে লাগবে না।

pathagar.net

গাড়ি নিয়ে সায়ন বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গী অনেকক্ষণ চুপচাপ নিথর হয়ে রইল। কার দরকার হতে পারে কাগজপত্রগুলো? কে ঐন্দ্রিলার কাছে হাজির হতে পারে গবেষণার দরকারি কাগজপত্র হাতাতে! কিন্তু নিয়ে গেছে অদরকারি কাগজ। তার মনে লোকটা আনাড়ি, বিজ্ঞানমনস্ক নয়।

বিশাল বেডরুমের মস্ত খাটটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে শুয়ে একলা-একা সারাটি দুপুর সেদিনকার সংবাদপত্র উল্টেপাল্টে দেখছিল গার্গী। লাইম ইন্ডিয়ার তরফ থেকে আজ আরও একটি মারাত্মক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে আক্রমণ করে। আকারে-ইঙ্গিতে হলে তো প্যারাডাইসের পক্ষে দারুণ ক্ষতিকারক। একেই তো সায়নের কোম্পানিতে বিক্রি কমে গেছে প্রায় অর্ধেক, তার ওপর এই বিজ্ঞাপন যে আরও ভয়ঙ্কর প্রভাব ছড়াবে, তাতে গার্গী নিঃসন্দেহে। বিজ্ঞাপনটি যতবার দেখছিল, ততই ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল নিজের ভেতর, আর ভাবছিল কী করেই বা এই অশ্লীল আক্রমণের মোকাবিলা করা যায়। লাইম ইন্ডিয়া হঠাৎ এহেন রণকৌশল গ্রহণ করলেন বা কেন!

ইতিমধ্যে খবর নিয়ে সে জেনেছে, লাইম ইন্ডিয়ার অ্যাডভার্টাজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জিই এহেন সব বিজ্ঞাপনের নেপথ্য-নায়ক। সেই রৌণক মুখার্জি, যাকে একদা ঐন্দ্রিলা পাগলের মতো ভালবেসেছিল, খুবই নীরবে অবশ্য। সেই রৌণক মুখার্জি যে একসময় কবিতা লিখত, ঐন্দ্রিলা যার কাছে ফরাসি ভাষা শিখতে গিয়ে উপহার পেয়েছিল প্রেমপত্র। সেই রোমান্টিক যুবকটির মনে হঠাৎ কী এমন প্রতিহিংসার সৃষ্টি হল, যার জন্য প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে বারবার এতখানি আঘাত হানছে! তাহলে কি সমস্ত বিষয়টির মধ্যে কোনও গভীরতর রহস্য লুকিয়ে আছে! প্রেম কখনও রূপান্তরিত হয় প্রতিহিংসায়, প্রতিহিংসা থেকেই হতে পারে হত্যাকাণ্ড। ঐন্দ্রিলা-হত্যার পেছনে কি তাহলে এই প্রতিহিংসাই! কিন্তু সেই হত্যার পরেও কি নিবৃত্ত হয়নি প্রতিহিংসার কামড়! কিন্তু প্রেমে ব্যর্থতার পরিণতিতেই যদি ঐন্দ্রিলা খুন হয়ে থাকবে, তাহলে ল্যাবরেটরি রুমের কাগজপত্র খোয়া গেল কেন? কাগজগুলো যে নিতে এসেছিল, সায়নের মতে সে নিতান্তই অজ্ঞ, আনাড়ি, গবেষণার কোন কাগজটি জরুরি তো উপলব্ধি করার ক্ষমতাই নেই তার। তবে কি রৌণক মুখার্জিই—

ঘটনাটা বারদুই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাবতেই খুবই উত্তেজিত, শিহরিত হল গার্গী। দু-একদিনের মধ্যেই রৌণক মুখার্জির সঙ্গে তার একবার অবশ্যই দেখা হওয়া দরকার। এমন অবস্থায় টানটান হয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল, কিন্তু ভেবেই পেল না কীভাবে তা সম্ভব। কী পরিচয়েই বা যাবে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে! অবশ্য যেতে পারলেই কোনও ছলছুতোয় সে জিজ্ঞাসা করবে ঐন্দ্রিলার কথা। ঐন্দ্রিলার কাছে তিনি আসতেন কি না মাঝেমধ্যে। ঐন্দ্রিলা কি সত্যিই আজও ভালবাসত তাঁকে! এবং রৌণকও কি!

দেবাদ্রি সান্যাল সেদিন বলেছিলেন, হত্যাকাণ্ডের রাতে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে নির্বিঘ্নে উপস্থিত থাকার যার সম্ভাবনা বেশি ছিল, সে গার্গীই।

দেবাদ্রির কথা নাড়াচাড়া করে এখন গার্গীর ধারণা, সে রাতে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে যদি কেউ নিশ্চিন্তে প্রবেশাধিকার পেয়ে থাকে তিনি হয়তো রৌণক। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই

হবে গার্গীকে। কিন্তু কীভাবে! সেই মুহূর্তে তার মনে হল, একটাই উপায় আছে। সে যদি পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে লাইম ইন্ডিয়ার ওপর একটা রাইট-আপ তৈরি করার ছলছুতোয় যায় ওদের অফিসে, তাহলে দেখা হতে পারে রৌণকের সঙ্গে। রৌণক তো ওদের পি. আর. ও-ও বটে।

কিন্তু তাতে ঝুঁকিও কম নয়। আজ গার্গীর প্রধান পরিচয় সে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের কর্ণধার সায়ন চৌধুরীর স্ত্রী। লাইম ইন্ডিয়ার অফিসে গেলে কেউ না কেউ চিনে ফেলতেই পারে তাকে। তাহলে কি তার উপস্থিতি মুহূর্তে শোরগোল তুলবে সেখানে? পরক্ষণেই মনে হল, তাকে না চেনাই সম্ভব। সংবাদপত্রের দৌলতে গার্গী চৌধুরীর নাম বিখ্যাত হলেও তার ছবি তো আর ছাপা হয়নি কাগজে। সে বরং নামব বলে মিতুন মুখার্জি হয়ে সাক্ষাৎকার নিতে যাবে রৌণকের। ব্যাপারটা দুঃসাহসিক হবে,তবু তাতে উত্তেজনাও কম নয়। এক ধরনের মজাও আছে।

সায়ন অফিসে বেরিয়ে গেছে সেই সাতসকালেই। রোজই যায় এমন। একবারও ভাবেও না এমন পেল্লাই দুপুরগুলো কীভাবে কাটাবে গার্গী। কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঐন্দ্রিলার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছিল সায়নের সঙ্গে। সব শুনে সায়ন অবাক হয়েছে, তুমি এই রহস্যের কিনারা করতে চাও?

গার্গী হেসে বলেছে, একটা কিছু তো করতে হবে। কাঁহাতক আর দুপুরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মোটা হওয়া যায়? নাকি আমাদের সোসিও-ইকোনমিক-রিসার্চ আকাদেমিতে আবার যোগ দেব? কতদিন সে যাইনি সেখানে এত সব ঝড়-ঝঞ্ঝাটে পড়ে। ওরা সব কী ভাবছে আমার সম্পর্কে কে জানে!

সায়ন হেসে উড়িয়ে দিয়েছে তার প্রস্তাব, ধুর, তোমার ওই হিজিবিজি চাকরিটা ছেড়ে দাও। আগে কয়েকটা টাকার দরকার ছিল বলেই না ওই জনসেবার প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়েছিলে। এখন তো আর সে দরকার নেই।

তবু সায়ন অফিসে চলে যাওয়ার পর যখন সে একা ভেবে আন্দোলিত হচ্ছে তার আকাদেমির অফিসে যাবে কি যাবে না, ঠিক তখনই ফোনটা এল সায়নের। হ্যালো, গার্গী, তুমি কি ফ্রি আছ। চট করে আমার অফিসে চলে এসো তো। খুব ঝামেলায় পড়েছি হঠাৎ। কুইক। একটা ট্যাক্সি নিয়ে—, ওপাশে মুহূর্তে ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। তাতে আরও ঘাবড়ে গেল গার্গী। অফিসে গিয়ে তার হঠাৎ কী এমন বিপদ হতে পারে যাতে গার্গীকে এই মুহূর্তে ছুটতে হবে!

কিন্তু ভাবার আর সময় পেল না। দ্রুত তৈরি হয়ে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করে বাইরে এল তৎক্ষণাৎ। ট্যাক্সিতে গেলেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু আপাতত ধারে কাছে কোনও ট্যাক্সির টিকিটিও দেখতে না পেয়ে উঠে পড়ল একটা মিনিবাসে। কিন্তু দুপুরের দিকে মিনিবাস যেন আর চলতেই চায় না। তাতে ক্রমাগত টেনশন বাড়তে থাকে তার। তবু ভাগ্যি, বসার একটা জায়গা পেয়ে গেল। বসেই ভাবতে আরম্ভ করল, সায়ন সম্ভাব্য কী কী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারে। পর-পর যেরকম অঘটন ঘটে চলেছে তাতে নতুন কোনও বিপর্যয় ঘটে যাওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নিশ্চয় কোনও বড় রকমের অঘটনই—

মিনিবাস ততক্ষণে শরৎ বোস রোড পার হয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়ে এসে পৌঁছেছে ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়ে। হঠাৎ সেখানে কীভাবে যেন জ্যাম হয়ে আটকে পড়ল মিনিট দশেকের মতো। সে জট ছাড়িয়ে আরও মিনিটও কুড়ি পর পৌঁছাতে পারল সায়নের অফিসে।

pathagar.net

পৌঁছাতেই চারিদিকের ব্যাপারস্যাপার দেখে বেশ হকচকিয়ে গেল গার্গী। বোধহয় তার একটু দেরিই হয়ে গেছে, তাই তার অপেক্ষায় না থেকে একটা বড়সড় মিটিং শুরু করে দিয়েছে সায়ন।

গার্গী নজর করে দেখল, গত দু'বছরের মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে সায়নের অফিসে। আরও অনেকটা ঝকমকে হয়েছে ভেতরের চেহারা। আরও খানিকটা কেতাদুরস্ত। সায়নের বসার চেয়ারটিও এখন বিশাল, সিংহাসনপ্রতিম। সামনে বড় আকারের অর্ধচন্দ্রাকৃতি টেবিল। তাতে কাঠের রঙের সানমাইকা লাগানো। তার উপর পেন-স্ট্যান্ড, ডেস্ক-ক্যালেন্ডার, পেপারওয়েট, পিনকুশন পর-পর সাজানো। টেবিলের এদিকে খানপাঁচেক গদি-আঁটা ঝকঝকে স্টিল ফ্রেমের চেয়ার। তার সব কটিই আজ ভর্তি। বসে আছেন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজারিয়াল র‍্যাঙ্কের সব কজন অফিসার। গার্গী ভেতরে ঢুকে বেশ অস্বস্তিতে পড়ল। তার বসার মতো একটি চেয়ারও খালি নেই।

সায়ন অবশ্য তাকে ডাকল, এদিকে এসো—

এতক্ষণে নজরে পড়ল গার্গীর, সায়নের বিশাল চেয়ারটির ঠিক পাশেই আরও একটি কাঁধ উঁচু সুদৃশ্য চেয়ার পাতা। সেই খালি চেয়ারটির দিকে ঈঙ্গিত করে গার্গীকে বলল, এখানে বোসো। একটা জরুরি মিটিং ডেকেছি আজ সব অফিসারদের নিয়ে। এ মিটিংয়ে তোমারও থাকা দরকার।

গার্গী তখনও বুঝতে পারছে না, হঠাৎ এই জরুরি তলবের কী কারণ থাকতে পারে। অন্য সব অফিসারই অবশ্য টেনশ্ হয়ে বসে আছে পর-পর। সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। তাতে তার উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল প্রবলভাবে। এর আগে ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে সে কয়েকবার এসেছে এ অফিসে। দু-তিনবার নিতান্তই খোলামেলা আড্ডা দিতে, তাও বছর দুয়েক আগে। বলা যায়, বন্ধু হিসেবেই। আজ সে অফিসে এসেছে আর এক পরিচয়ে। যে খালি চেয়ারগুলির কোনও একটিতে সে এসে আগে বসত, সেখানে এখন পর-পর বসে আছেন প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত, কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্র, অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্ত্রী রায়মজুমদার, ওয়ার্কস্ ম্যানেজার বরুণ নন্দী, এমনকি এরিয়া ম্যানেজার প্রীতীশ মজুমদারও। সায়নই পরিচয় করিয়ে দিল সবার সঙ্গে।

গার্গী হঠাৎ বলতে চাইল, কী ব্যাপার, হঠাৎ এমন জরুরি মিটিং-এ আমাকে—

কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনও স্বরই বেরোল না যেন। কেন যে হঠাৎ সে এত নার্ভাস হয়ে পড়ল।

সায়ন নিশ্চয় ব্যাপারটা খেয়াল করে থাকবে। গার্গীকে আরও সহজ করে তোলার জন্য বলল, বুঝলে, আমাদের অফিসে প্রতি মাসেই সব অফিসারদের নিয়ে একটা কনফারেন্স হয়। তাতে গত একমাসের কাজের হিসেবনিকেশ যেমন হয়, তেমনই আলোচনা হয় আগামী একমাসের প্ল্যান্স্ অ্যাণ্ড প্রোগ্রামস্। আজ মিটিং আরম্ভ হওয়ার আগেই হঠাৎ এসে পৌঁছাল একটা রেজিগনেশন লেটার। পাঠিয়েছেন আমার পি. এ. কঙ্কা রায়। কঙ্কা গত কয়েকদিন ধরে অফিসে আসছিলেন না। কে যেন আমাকে বলেওছিলেন, কঙ্কা রায় অন্য একটা কনসার্নে কাজের অফার পেয়েছেন। আজ চিঠি আসতেই সেটা কনফার্মড হল। যাই হোক, কোম্পানির এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কঙ্কা রায় আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় কিছুটা ক্ষতি হল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এরকম নানা ওঠা-পড়ার ভেতর দিয়েই তো কোম্পানিকে এগিয়ে চলতে হয়।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে বলে সায়ন একমুহূর্তের জন্য থামল। ততক্ষণে সুদৃশ্য কাপ-প্লেটে

pathagar.net

ফার্স্ট রাউন্ড চা সার্ভ করা হয়েছে প্রত্যেকের সামনে। গরম চায়ে একটা বড় করে চুমুক দিয়ে সায়ন বলতে শুরু করল আবার, গত কয়েকদিন ধরে আমি চেষ্টা করছি নতুন একটা প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ার। খুব চমকপ্রদ হবে আমাদের এবারকার সাবানটা। যদিও কী ধরনের ফ্লেভার হবে, কোন সাইজের—তা এখনও ঠিক হয়নি। তবু আশা করি, এই প্রোডাক্টটিও আমাদের কোম্পানির অন্য প্রোডাক্টগুলির মতোই জনপ্রিয় হবে। সুতরাং—

চায়ের কাপে আর একটি চুমুক দিয়ে সায়ন বলে চলল, আমাদের সবাইকে এবারও ফ্রেশ চ্যালেঞ্জ নিয়ে তৈরি হতে হবে। কোম্পানির প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ, কোম্পানিতে যে সাময়িক সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে, তা এই মুহূর্তে কাটিয়ে ওঠার জন্য আমরা সবাই সমবেতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ি। নতুন প্রোডাক্টটিকে বাজারে ঠিকমতো ধরিয়ে দিতে পারলেই দেখবেন, আমাদের কোম্পানির টার্নওভার আবার হু-হু করে বাড়তে থাকবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, প্রোডাক্ট বিক্রি হয় তার কোয়ালিটির গুণে। আমাদের এতাবদ এত প্রোডাক্ট বাজারে বেরিয়েছে, তার গুণমান অন্য কোম্পানির থেকে অনেক অনেক ভাল বলেই বিক্রি বেশি ছিল। শুধু, একটা দুর্ঘটনার জন্যই সাময়িকভাবে ধাক্কা খেয়েছে বিক্রি। কিন্তু এই নতুন প্রোডাক্ট ছাপিয়ে যাবে বাকি সব সাবানকে। শুধু আপনাদের সম্মিলিত প্রয়াস আর তৎপরতা থাকলেই দেখবেন—

চায়ের কাপে আবারও চুমুক দিয়ে সায়ন এবার চলে এল অন্য প্রসঙ্গে, আর—, নতুন করে কোম্পানিতে রক্ত সঞ্চার করার জন্য আপনাদের আমি একটা সারপ্রাইজ দিচ্ছি আজ—

সায়নের কথায় এমন একটা সাসপেন্স ছিল যে উত্তেজনায় অন্য সব অফিসাররা একবার চোখাচোখি করে নিলেন নিজেদের মধ্যে। হয়তো নিজেদের অজান্তেই। গার্গী তখনও বুঝতে পারছে না, সায়ন আসলে কী বলতে চায়, কেনই বা হঠাৎ তাকে এমন টেলি-বার্তায় প্রায় হাইজ্যাক করে আনল অফিসে!

কিন্তু সায়নের পরবর্তী কথায় সে হতচকিত, স্তম্ভিত হয়ে গেল মুহূর্তে। যেন অবিশ্বাস মনে হল কথাগুলো।

সায়ন তখন বলছে, আপনারা জানেন, এই কোম্পানিতে আমিই এতদিন চেয়ারম্যান কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গত দু-তিনবছরে কোম্পানির কাজ যেমন বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ, তেমনি এক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে আমি নিজেও ভীষণভাবে বিব্রত, বিপর্যস্ত হয়ে আছি। ঠিকমতো মনই বসাতে পারিনি বেশ কয়েকদিন। তাতে কোম্পানি যে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছে তা আপনারা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছেন। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করে, আজ থেকে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিয়োগ করা হল কোম্পানিতে। অ্যান্ড মিট হার, সি ইজ গার্গী চৌধুরী, দ্য নিউ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ প্রাইভেট লিমিটেড। আজ থেকে গার্গী চৌধুরী কোম্পানির কাজে সবরকমভাবে সহায়তা করবে আমাকে।

সায়নের এই আকস্মিক, প্রায়-শকিং ঘোষণায় শুধু গার্গীই নয়, কোম্পানির সমস্ত ম্যানেজার স্তব্ধ, বাকরহিত। এহেন অদ্ভুত সিদ্ধান্তে বোধহয় কেউই আশা করতে পারেনি, সামান্যতম আন্দাজও করেনি কেউ। প্রতেকেই আরও একবার চোখাচোখি করে নিল নিজেদের মধ্যে।

অতঃপর আর কোনও আলোচনা, কোনও মন্তব্য ঝড়ে পড়ার আগেই হঠাৎ চমৎকার সুবাসে ঘর ভরিয়ে দিয়ে চেম্বারে ঢুকে পড়ল বিশাল আকারের সব খাবারের প্যাকেটে। প্রতিবারেই মাস্থলি কনফারেন্সের দিন একটা মস্ত আয়োজন থাকে খাওয়ার। আজ আরও বড়

আকারের আয়োজন, বোধহয় আজকের এই আকস্মিকতা কাটিয়ে দেওয়ার জন্যই। অথবা কোম্পানির নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনারেও হতে পারে।

গার্গীর শরীর তখনও অবশ, যদিও গত কয়েকদিন যাবৎ সায়নের অফিসে আসার একটা ছুতো খুঁজছিল গার্গী। তার মনে হচ্ছিল, কেন পর-পর স্যাবোটেজ চলছে অফিসে, কারা এর পেছনে আছে, কী তাদের উদ্দেশ্য, সেগুলো খুঁজে বার করার জন্য দিনকয়েক এই অফিসে আসাটা তার প্রয়োজন। সেই সুযোগ হঠাৎ এভাবে পেয়ে যাবে তা অবশ্য আদৌ আঁচ করতে পারেনি। এভাবে চায়ওনি সে। তাই যেমন ভেতরে ভেতরে উল্লসিত বোধ করেছিল, তেমনই এত বড় দায়িত্ব তার কাঁধে বর্তানোয় নার্ভাসও হয়ে গেল ভীষণ। মিটিং ভেঙে যাওয়ার পর প্রায় সম্মোহিতের মতো সায়নের চেম্বারে এসে বসল গার্গী। অন্য অফিসারদের ভেতর তখন সামান্য গুঞ্জন, ফিসফাস, অস্বস্তিও। সায়নের সামনে কারও মুখ খোলার প্রশ্নই নেই। কিন্তু তার আড়ালে যে কানাকানির ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাতে তাবৎ অফিস উত্তাল, তা স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিল সে। সায়নের জীবনে গার্গীর আকস্মিক প্রবেশ যেমন ইতিমধ্যে ঝড় তুলেছে সমাজে, পুলিশমহলে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, তেমনই প্যারাডাইস প্রোডাক্টসে তার এই দায়িত্বভার যে কোম্পানির গুডউইলের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল তাই-ই। তা ছাড়া, হঠাৎ একজন মহিলা বসের অধীনে কাজ করতে বোধ হয় সব পুরুষের পৌরুষেও কিছুটা আঘাত লাগে।

সায়ন অবশ্য ব্যাপারটাকে কোনও আমলই দিল না। কিন্তু রাতে একান্ত হতেই গার্গী প্রশ্ন তুলল, হঠাৎ এরকম ডিসিশন নিলে যে—

—আসলে কিছুদিন ধরেই ভীষণ একটা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলাম অফিসে। মনে হচ্ছে, সবাই-ই কেমন একটা দূরত্ব রচনা করেছে আমার কাছ থেকে। কেউ সহজ হতে পারছে না। তার ওপর কঙ্কা রায় আমার খুব হেল্পিং-হ্যান্ড ছিল। সেও চলে যাওয়ায় মনে হল, খুব একা হয়ে গেছি। এরকম সঙ্কটময় মুহূর্তে কোম্পানিতে আমার নিজস্ব একজন কাউকে খুব দরকার। অতএব এই ডিসিশনটা না নিয়ে কোনও উপায় ছিল না। এখন তোমার হাতেই কোম্পানির ভাগ্য।

গার্গী অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কিন্তু আমি কি পারব?

—না পারার কিছু নেই গার্গী। আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীর ছেলেও প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। চেয়ার মেকস আ পারসন। প্রথম কদিন একটু অসুবিধে হবে। হয়তো সাত দিন, কি বড়জোর পনেরো দিন। তারপর দেখো, বল একবার রোল করিয়ে দিলে ঠিক চলতে শুরু করবে আপন গতিতে। কয়েকদিন আগে তোমার কিছু-কিছু সাজেশনস শুনে আমার মনে হয়েছিল, তুমি এই কাজের জন্য উপযুক্ত। তাছাড়া তোমার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে, যখন কঙ্কা রায়কে আমার পি.এ. হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে, আগে জানলে তুমি ওই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে। আমি তখনই বলেছিলাম, পি. এ. কেন, তোমাকে আমার অফিসের এম. ডি. হিসাবেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি। আশ্চর্য, এতদিন পরে সে কথাই সত্যি করে তুলতে হল! আজ থেকে তুমি কোম্পানির এম. ডি., পি. এ. নয়। এম. ডি. হিসেবেই আমার সব কাজে সাহায্য করবে।

গার্গী তখনও প্রবল দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে, কী সাহায্য করতে হবে?

—অফিসে একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকলে আমি নিজেকে কিছুটা ফ্রি করে নিতে পারি। আরও অনেক বেশি সময় দিতে পারি ফ্যাক্টরিতে। প্রোডাকশনটা নিজের হাতে

pathagar.net

পুরোপুরি রাখতে পারলে আরও বেটার কোয়ালিটির মাল তৈরি হবে। তাছাড়া ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্টগুলোতে আরও বেশি করে ঘুরতে পারি। যত ঘুরতে পারব, তত ভাল সুপারভিশন হবে। তত বিক্রি বাড়বে। তুমি যদি অফিসটা সামলাতে পার—

—কিন্তু একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অনেক রেশপনসিবিলিটি!

—হ্যাঁ, তা অনেক, সায়ন যেন তন্ময় হয়ে বিড়বিড় করল, এম. ডি.-ই কার্যত হেড অব্ দ্য অফিস। হেড্ অব্ দ্য অফিস হওয়াটা যেমন অনেক সুখের, তেমনই তার যন্ত্রণাও কম নয়। তোমার হাতে এখন কর্তৃত্বের লাগাম। অনেক ক্ষমতা, অনেক পার্ক্স্। তোমার চেম্বারে সবাই আসবে, বসবে, কথা বলবে, কিন্তু তাদের সঙ্গে তোমার অজান্তেই একটা বিরাট দূরত্ব রচনা হয়ে যাবে। তুমি সবসময় একা, বান্ধবহীন, চাইলেও কেউ তোমার কাছাকাছি হতে পারবে না। সর্বক্ষণ একটা কাচের দেওয়াল থাকবে মাঝখানে।

গার্গী হিম হয়ে গিয়ে বলল, তাই!

—হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর থাকবেন তাঁর চেম্বারের মধ্যে, অথচ তাঁর চোখ ছড়ানো থাকবে সমস্ত দফতরে। একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ দিয়ে অলক্ষ্যে নজরদারি করতে হয় অফিসের কাজকর্ম। যেমন অনেকগুলো চোখ দিয়ে কাজ তদারকি করতে হয়, তেমনই অনেকগুলো কানও থাকে এম. ডি.-র। নানান জনে এসে নানান কথা বলবে। কেউ তোশামোদ করবে, কেউ কান-ভাঙেনি দেবে, কেউবা এসে নালিশ করবে অন্যের নামে। কখনও একজনের কথা শুনে ডিসিশন নেবে না। আগে যাচাই করার চেষ্টা করবে ব্যাপারটা, সমস্যাটা নিয়ে ভাববে, অপরপক্ষের বক্তব্য শুনবে, তারপর সিদ্ধান্ত তোমার—

এখন আরও অনেক কথাই অনর্গল বলে যেতে লাগল সায়ন, কিন্তু গার্গী যেন আর ভাবতে পারল না। সে তখন একা-একা খাবি খেয়ে চলেছে এক অতলস্পর্শী সমুদ্রের মাঝখানে।

পরদিন থেকে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অফিসে একেবারে হই-রই কাণ্ড। এতকাল সায়ন চৌধুরীর ঘরের সামনে নেমপ্লেট লেখা থাকত, 'চেয়ার-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর'। সেখানে এখন ঝুলতে শুরু করল শুধুই 'চেয়ারম্যান' শব্দটি। চেয়ারম্যানের ঘরের পাশে অনেকখানি জায়গা বার করে নিয়ে সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি করা হল আর একটি মস্ত চেম্বার। তার দরজার পাশে টাঙানো হল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নেমপ্লেট। চেম্বারের ভেতর সাজানো হল দামি-দামি চেয়ার-টেবিল দিয়ে। টেবিলের উপর যথারীতি ঝকঝকে পেন-স্ট্যান্ড, টেবিল-ল্যাম্প, ডেস্ক ক্যালেন্ডার, পেপার-ওয়েট, পিন কুশন, লেটার-ডেস্ক, আরও কত কি। তার সঙ্গে দরজায় জানলায় চমৎকার রঙের পর্দাও। সমস্ত ব্যাপার দেখেশুনে গার্গী একেবারে হতভম্ব।

এমন আকস্মিকতায় থ হয়ে গেলেও কাজের ব্যাপারে গার্গী বরাবরই ভীষণ সিরিয়াস। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের যাবতীয় খুঁটিনাটি সে বুঝে নিতে লাগল বাধ্য ছাত্রীর মতোই। যখন তখন তার চেম্বার ছেড়ে বিভিন্ন অফিসারদের ঘরে ঢুকে পড়ে আলোচনার মাধ্যমে জানতে শুরু করল কোম্পানির বর্তমান অবস্থা, তার সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য কে কি ভাবছেন, মোকাবিলাই বা করছেন কিভাবে। হঠাৎ-হঠাৎ অফিসের বিভিন্ন সেকশনে ঢুকে পড়তে লাগল। সুপারভাইজার থেকে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রত্যেকের টেবিলে ঘুরে-ঘুরে যেমন কাজ শিখতে লাগল, তেমনই তাদের অজান্তে কাজের হিসেবও বুঝে নিতে শুরু করল নানারকম প্রশ্ন করে। তার এই সিনসিয়ারিটি আর অসম্ভব মোবিলিটিতে সাড়া পড়ে গেল কোম্পানিতে।

আর এই গতিময়তার অন্তরালে আসলে গার্গী তীক্ষ্ণ নজর রাখতে লাগল সমস্ত অফিসার

pathagar.net

আর কর্মীদের চালচলন, গতিবিধির ওপর। কে কীভাবে স্যাবোটেজ করেছিল, বা ভবিষ্যতে আবারও করতে পারে কি না, তার সঙ্গে ঐন্দ্রিলা-হত্যা রহস্যের কোনও সম্পর্ক আছে অথবা নেই, তা যাচাই করাই তার মূল উদ্দেশ্য।

প্রথম কয়েকদিন সে আর সায়ন একই গাড়িতে যাতায়াত করল অফিসে, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারল, সেটা রোজ সম্ভব হবে না। সায়ন প্রায়ই অফিস থেকে দুপুরের দিকে বেরিয়ে যায় ফ্যাক্টরিতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসে ফিরতে পারে না, ফ্যাক্টরি থেকেই ফোন করে বলে গার্গীকে, 'প্লিজ, আজকের দিনটা ট্যাক্সি করে চলে যেও। এখানে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।' বিকেলে, অফিস ছুটির পর, ট্যাক্সি পাওয়া খুবই কঠিন। ফলে গার্গীর জন্য একটা আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিল সায়ন।

কিছুদিন যাতায়াত করতেই গার্গী বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেল তার এই নতুন কর্মভারে।

সেদিনও সায়ন ফ্যাক্টরিতে চলে গেল দুপুরের পর, গার্গীকে বলে গেল, ফিরতে রাত হবে, তার জন্য যেন চিন্তা না করে। নতুন প্রোডাক্ট তৈরির ব্যাপারে ভীষণ ব্যস্ত রয়েছে সে। সতর্কও থাকতে হচ্ছে যাতে আবার স্যাবোটেজ না হয় ফ্যাক্টরিতে।

কিন্তু বিপদটা এল সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে। সন্ধের অনেকটা পর গার্গী অফিসের কাজ শেষ করে নেমে এল নিচে। তার গাড়ি পার্ক করানো থাকে অনেকটা দূরে, সিধু-কানহু- ডহরে। একা হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে এগোচ্ছে। হঠাৎই একটা মোটর-সাইকেল প্রচণ্ড শব্দে ছুটে এল পেছন দিক থেকে। গার্গী সতর্কই ছিল, শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে না দাঁড়ালে তাকে রাস্তায় সপাটে ছিটকে ফেলে চুরমুর করে দিয়ে যেত সাইকেল-আরোহী। প্রায় তার গায়ের কাছ ঘেঁসে চলে গেল মহিষপ্রতিম বাইকটি। একচুলের জন্য প্রাণ ফিরে পেল।

সম্বিত ফিরতে কয়েক মুহূর্ত দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল গার্গী। নিতান্ত দুর্ঘটনা নয়, সে বুঝতে পারল তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চক্রান্ত ফেঁদেছিল কেউ। সে সতর্ক না থাকলে—। কিন্তু কে ছিল মোটরবাইকে? তাদের অফিসের কেউ?

খুবই দুশ্চিন্তা নিয়ে দ্রুত গিয়ে তার নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠে বসল। একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলও। সায়নকে এই মুহূর্তে বলা যাবে না ব্যাপারটা। বললেই হয়তো বলবে, তাহলে তোমার অফিসে গিয়ে আর কাজ নেই। অথচ এখন অফিসে তার নিয়মিত যাওয়াটা খুবই দরকার। হয়তো তাদের অফিসেই ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে সমস্ত ষড়যন্ত্রের শিকড়।

তাছাড়া এই নতুনত্ব কাজটি ভালই লাগছে তার। অফিসে সারাদিন কাজের ধকলে সে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও এই দায়িত্বভার পেয়ে সে কিছুটা থ্রিল্‌ড্‌ও বটে। কোম্পানির বিক্রি বাড়ানোর জন্য সে আজ নিজেই দু-দুটো মিটিং করছে নিজের চেম্বারে। সুপারভাইজার, এরিয়া ম্যানেজাররা সবাই খোলা মনে তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানিয়েছে। কেউ কেউ বলেওছে, ঠিক বলেছেন, ম্যাডাম। এভাবে আমরা কখনও ভাবিনি।

সেদিন লেক-মার্কেটে মার্কেটিং সেরে যখন ফ্ল্যাটে ফিরল, তখন রাত সাড়ে আটটার মতো। কিন্তু বাড়ি ফিরতে আরও দু-দুটো ঘটনা যে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল তা অনুমানে ছিল না তার। দুর্ঘটনাও বলা যায়—

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে উঠতে যেতেই হঠাৎ সে মুখোমুখি হিমনের। উপর থেকে ধীর পায়ে নেমে আসছিল হিমন। হঠাৎ গার্গীকে দেখে যেন চমকে উঠল, কেমন সম্মোহিতের মতো পিছু হঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। পিছোতে পিছোতে পট করে দোতলায় তাদের ঘরে সেঁধিয়ে গেল। যেন কোনও বাঘিনির সামনে পড়ে ভয়ে পালিয়ে গেল সহসা। গার্গী অবাক

হল, কেন তাকে দেখে কুঁকড়ে গেল হিমন, পালিয়েই বা গেল কেন বুঝতে উঠতে পারল না। তার হাঁটাচলা এমন জড়গ্রস্তের মতোই বা কেন!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটল সে ঘরে ঢোকার পর। সায়ন তখনও ফেরেনি। গার্গী ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে সবে ফ্যান, লাইট অন করেছে, সেসময় বাইরে কলিং বেলের আওয়াজ। বিস্মিত হয়ে দরজা খুলতে এবার গার্গীই চমকে উঠল ভীষণভাবে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর কেউ না, দীয়া।

দীয়ার চোখেমুখে জড়িয়ে রয়েছে কি এক প্রবল বিষণ্ণতা। তা থাকাটাই স্বাভাবিক। তার সঙ্গে আজ কিছুটা ত্রাসও। গার্গী দরজা খুলতেই সে চট করে চলে এল ভেতরে, ফিসফিস করে, বলল, সরকার আছে। বলে নিজেই দরজা বন্ধ করে আবারও ফিসফিসায়, সব জেনেশুনেও তুমি এ বাড়িতে এলে?

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, কেন?

—সে অনেক কথা। এ বাড়িতে কোনও বউ বাস করতে পারেনি। ঐন্দ্রিলা পারেনি, আমিও পারিনি, তুমিও পারবে না।

স্তম্ভিত গার্গী আবার বলল, কেন?

দীয়ার চোখ তখনও ভয়ত্রস্ত, কি এক শঙ্কায় সে চমকে-চমকে উঠছে যেন। ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে, হয়তো তার নজর পড়েছে ঘরের মেঝেয়, যেখানে ঐন্দ্রিলার পোড়া শরীরটা পড়েছিল অসহায়ভাবে। তাতে আরও আতঙ্কিত দেখাল তাকে। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কখনও সময় পেলে তোমাকে সব বলব। কিন্তু আজ নয়। আজ আমি এ বাড়িতে এতক্ষণ ছিলাম তোমাকে সাবধান করে দিয়ে যাব বলেই। রাতে আমি কখনও এ বাড়িতে থাকি না—

—কেন? রাতে কি অসুবিধা?

—সেসব পরে বলব। এখন সময় নেই। রাত বেশি হওয়ার আগেই চলে যেতে হবে আমাকে। পারলে তুমিও এ বাড়িতে রাত কাটিয়ো না। যত শিগগির সম্ভব পালিয়ে যাও। নইলে তুমিও এদের হাতে মারা পড়বে।

আর দাঁড়াল না দীয়া। ঘরের মেঝেয় নজর রাখতে রাখতে বেরিয়ে গেল সহসা। তার গলায় এমন এক ভয়ঙ্কর ত্রাসের সুর, যা কানে যেতে আপাদমস্তক কেঁপে উঠল গার্গীর। ততক্ষণে দীয়া দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে গেট পার হয়ে নেমে গেছে রাস্তায়।

একা ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে হিম হতে লাগল গার্গী।

মিতুন মুখার্জি নামে একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক ঠিক সোয়া দশটায় ফোন করেছিল রৌণককে। লাইম ইন্ডিয়ার উৎপাদন, তার সেল, টার্ন-ওভার, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী— এই সব নিয়ে একটা আর্টিকেল ছাপাতে চায় তাদের পত্রিকায়। বেশি সময় নেবে না। মাত্র দশ মিনিট। তাকে আসতে বলে তারই অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে রৌণক অপেক্ষা করছিল তার চেম্বারে। কোম্পানির এই টালমাটাল অবস্থায় যদি কোনও পত্রিকা ভাল কভারেজ পাওয়া যায়, তাদের সেল কিছুটা বাড়াতে পারে এই আশায় তৎক্ষণাৎ মহিলা সাংবাদিকটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

pathagar.net

এ হেন অপেক্ষার মুহূর্তে তার চেম্বারে এসে ঢুকলেন সেল্‌স ম্যাজেনার অনঙ্গ চক্রবর্তী, চোখ পিট পিট করতে করতে বললেন অবস্থা ভাল ঠেকছে না, মুখার্জি সাহেব।

রৌণক চোখ ফেলল অনঙ্গ চক্রবর্তীর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে। কিছু বলার আগেই অনঙ্গ চক্রবর্তী ফের বললেন, দিস কোম্পানি ইজ নাউ আ সিঙ্কিং শিপ। জাহাজ সমুদ্রে অসহায়ের মতো ডুবছে, সবাই দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে, চ্যাঁচাবে, উপদেশ দেবে, কিন্তু কেউ বাঁচাতে ছুটে আসবে না। এদিকে জাহাজের লাইফবেল্টও কাজ করছে না। তার ওপর আজ আর এক বিপদ।

রৌণক ভুরু কোঁচকাল, কী বিপদ?

—পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল কাল আসছে আবার। নতুন করে ইন্টারোগেট করবে সবাইকে।

—তাই নাকি! কিছুটা থতমত খেয়ে রৌণক বলল, এই তো কদিন আগেই একবার ঘুরে গেল। আবার কেন?

—সেবার তো শুধু চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকেছিল। তাঁকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিল। এবার নাকি প্রত্যেক অফিসার, কর্মী— সবাইকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করবে।

কেন যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল রৌণক। সবে সে ভাবছিল, সেল্‌স্ ম্যানেজারকে আশ্বাস দেবে এই বলে যে, এত ভেঙে পড়ছেন কেন আপনি! সব কোম্পানিরই তো এরকম ওঠা-পড়া আছে। কখনও তর তর করে উপরে উঠতে থাকে, কখনও পা হড়কে পিছলে পড়ে যায়। একদা প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চমকপ্রদ উত্থানে লাইম ইন্ডিয়ার পতন শুরু হয়েছিল, এখন প্যারাডাইসের দুর্দিনে নিশ্চয় সুসময় ফিরে আসছে লাইম ইন্ডিয়ার। কিছুদিন ধৈর্য ধরুন না।

কিন্তু বলতে পারল না। হঠাৎ পুলিশ এসে কেন লাইম ইন্ডিয়ার অফিসারদের ইন্টারোগেট করবে তা ভাবতে সময় নিল। অবাক হয়ে বলল, কেন?

—সেইটেই তো কেউ বুঝতে পারছে না। ফিন্যান্স অফিসার তো শুনেই ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছেন। বললেন, কাল অফিসে আসবে না। আর প্রোডাকশন ম্যানেজার রাহুল রায় হেসে বলেছে, বাহ্, ভারি ইন্টারেস্টিং তো। নিজের স্ত্রীকে খুন করল সায়ন চৌধুরী, আর পুলিশ এসে কিনা হাতকড়া পড়াবে লাইম ইন্ডিয়ার অফিসারদের। ভাল শার্লক হোমসের পাল্লায় পড়েছি।

হাতকড়ার কথা শুনে রৌণকের বুকের ভেতর এক ধরনের শব্দ হচ্ছিল। যেন হঠাৎ ছলাৎ করে চলকে উঠল তার শরীরের রক্ত। কি এক ঘোরের মধ্যে পরমুহূর্তে শুনল অনঙ্গ চক্রবর্তী বলছেন, আজ সাড়ে বারোটায় চেয়্যারম্যান সাহেব ডেকেছেন তাঁর ঘরে। বোধহয় এই পুলিশি তদন্তের ব্যাপারেই কথা বলবেন।

আরও কিছুক্ষণ বকবক করে অনঙ্গ চক্রবর্তী উঠে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও রৌণক থম্ হয়ে বসে রইল। কিছুটা অস্থিরতা, কিছুটা মন-খারাপ, কিছুটা আশঙ্কা নিয়ে হাতের কব্জিতে চোখ রেখে দেখল, আরও চল্লিশ মিনিটের মতো সময় আছে চেয়ারম্যানের ঘরে যেতে। সেখানে কী আলোচনা হবে, পুলিশ-অফিসার বাকি জিজ্ঞাসা করবে এই ভেবে ভীষণ মুষড়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও সেই মহিলা-সাংবাদিকের দেখা না পেয়ে আরও চঞ্চল হয়ে উঠছিল রৌণক। মহিলা টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, একটু পরেই আসছি, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় কিছু জানাননি। সে চেয়ারম্যানের ঘরে যাওয়ার পর যদি এসে পড়েন—

pathagar.net

ভাবনার মধ্যে সেই মুহূর্তে টেলিফোন বেজে ওঠায় সাগ্রহে রিসিভারের দিকে সে হাত বাড়াল, হ্যালো, রৌণক মুখার্জি স্পিকিং—

—আমি দেবাশিস মজুমদার। আপনি তিনটের দিকে কি ফ্রি আছেন? বেশি সময় নেব না। জাস্ট কার্টসি ভিজিট।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চলে আসুন।

দেবাশিস কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিকের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, বিজ্ঞাপন দফতরে আছেন। স্মার্ট চেহারা, মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক, চিবুকে ফ্রেঞ্চকাট, তাতে চেহারায় একটু লেনিন-লেনিন টাচ্ এসেছে। কথাবার্তায় দারুণ তুখোড়। মাঝেমধ্যে রৌণকের চেম্বারে এসে আড্ডা দিয়ে যান। বিজ্ঞাপন জগতের এইসব এক্সিকিউটিভদের অন্যতম কাজই হল, বড় বড় কোম্পানির পি. আর. ও কিংবা অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের ঘরে মাঝেমধ্যে যাতায়াত করা, কিছুক্ষণ আড্ডা মারা— অর্থাৎ কিনা তাঁদের গুড হিউমারে রাখা। তাতে পত্রিকায় নিঃসন্দেহে একটু বেশি বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। আর বিজ্ঞাপন মানেই পত্রিকার পক্ষে লক্ষ্মীবিশেষ।

দেবাশিস মজুমদারের ফোন পেয়ে একটু যেন স্বস্তি পেল রৌণক। এই সব মন-খারাপের মুহূর্তে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করলে টেনশনমুক্ত হওয়া যায়।

ভাবতে ভাবতে ঘড়িতে চোখ পড়তেই রৌণক উঠে পড়ল চেয়ারম্যানের ঘরে যাবে বলে। চেম্বারের বাইরে বেরোতেই দেখা রাহুল রায়ের সঙ্গে। রাহুল রায় বেশ খোশ মেজাজেই আছেন মনে হল। রৌণককে দেখেই বললেন, আপনি এক-একখানা যা বিজ্ঞাপন ছাড়ছেন প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্‌কে আক্রমণ করে, তাতেই টনক নড়েছে পুলিশের। ভাবছে, লাইম ইন্ডিয়া হঠাৎ এভাবে উঠে-পড়ে লেগেছে কেন প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে। তা হলে ডাল্‌মে কুছ্ কালা হ্যায়। তাই-ই তো হঠাৎ তড়িঘড়ি করে ছুটে আসছে দেবাদ্রি সান্যাল। খুব ঘাগু পুলিশ অফিসার, বুঝলেন? সাবধানে থাকবেন কিন্তু।

রাহুল রায়ের কথায় এমন একটা তীব্র কামড় যে রৌণক ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ল। প্রতিবাদ করে বলল, বিজ্ঞাপন কি আমার একার ইচ্ছেয় বেরিয়েছে?

রাহুল রায় হা হা করে হাসল, কিন্তু সোল্ রেশপনসিবিলিটি তো বিজ্ঞাপন দফতরের, তাই না?

অন্য দিনকার মতো আজও চেয়ারম্যানের দারুণ উত্তেজনা। এমনিতেই বিক্রি কমে যাওয়ার পর থেকে চেয়ারম্যানের ঘরে আসা মানেই ফায়ারিং স্কোয়াডের সম্মুখীন হওয়া, তার ওপর আবার পুলিশ উপদ্রব। বোঝাই যাচ্ছে খুবই হেনস্তা কপালে আছে অফিসারদের।

কিন্তু আজ অবশ্য তেমন বীভৎস মেজাজে দেখা গেল না চেয়ারম্যানকে। বরং চায়ের সঙ্গে সামান্য স্ন্যাকসের ব্যবস্থাও করেছেন। মনে হচ্ছে তিনিও কিছুটা ভাবনায় আছেন। প্রথমে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে কোম্পানির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করলেন সবাইকে, তারপর বললেন, কিছু রদবদল হচ্ছে খুব শিগগির। কিছু গুরুত্বপূর্ণ শহর থেকে বদলি করা হচ্ছে কয়েকজন এরিয়া-ম্যানেজারকে। দু-একজন নতুন লোককে আনাও হচ্ছে কোম্পানিতে। আর কেউ কেউ হয়তো যাচ্ছেও। আরও হদিশ দিলেন, কীভাবে মার্কেট বাড়াতে হবে। কোন সিজনে কোন প্রোডাক্টের উপর জোর দিতে হবে তার একটা প্ল্যানিং করা দরকার। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দোকানে দোকানে মাল পৌঁছে দিতে হবে। কখন কোন এলাকায় কোন প্রোডাক্টের চাহিদা বাড়ছে, কোথায় কমছে তার হিসেব রাখতে হবে। যেখানে চাহিদা বাড়ছে,

সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরও প্রোডাক্ট পৌঁছে দিতে হবে। যেখানে চাহিদা কমছে, কেন কমছে সেখানে বাজার ঘুরে অ্যানালাইজ করতে হবে। তার ফলাফল জেনে সেখানে সেল বাড়ানোর জন্য আলাদাভাবে ক্যাম্পেন করতে হবে।

এই পর্যন্ত বলার পর হঠাৎ চেয়ারম্যান থামলেন, তারপর প্রায় অপ্রত্যাশিতের মতো দুম্ করে বললেন, কী ব্যাপার, হঠাৎ পুলিশ আসছে কেন? আপনারা কেউ খুনটুন করেছেন নাকি?

এমন কৌতুকময় ভঙ্গিতে বললেন, এত সহজভাবে যে, কারও কারও মুখে চিলতে হাসির রেখাও খেলা করে গেল। কিন্তু রৌণকের শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একরাশ গরম রক্তস্রোত বয়ে গেল লহমায়। চেয়ারম্যান ততক্ষণে বলছেন, পুলিশের সঙ্গে বেশি কথা বলার দরকার নেই। যতটুকু না বললে নয়, ততটুকুই বলবেন।

আরও অনেক কিছু বললেন চেয়ারম্যান, কিন্তু সব কথা রৌণকের কানে গেল না। মিটিং রুম থেকে সে বেরিয়ে এল আচ্ছন্নের মতো। নিজের চেম্বারে ফিরে এসে শুনল, এক মহিলা এসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন তার চেম্বারে, তার দেরি দেখে ফিরে গেলেন একটু আগে। রৌণক জিভে চুক চুক শব্দ করে বলল, এহ্, তাই নাকি? অবাক হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতে বুঝল, প্রায় এক ঘন্টারও বেশি মিটিং করেছেন চেয়ারম্যান। এতক্ষণ অপেক্ষা করা কোনও মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। যাই হোক, লাইম ইন্ডিয়া তার কাভারেজ বোধ হয় আর পেলই না।

ফোমের চেয়ারটিতে মনমরা হয়ে বসে হাতের ফাইলগুলো সেরে ফেলল রৌণক। শেষ ফাইলটিতে সই করে সবে মুখ তুলেছে দেখল অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী ঠিক কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় তার চেম্বারের দরজা ঠেলে লেনিন-মুখ বাড়ালেন দেবাশিস, মে আই কাম ইন—

রৌণক দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে হাসল। যে দু-একজন মানুষের সব সময় একটা প্লিজিং অ্যাপিয়ারেন্স থাকে, দেবাশিস নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একজন, তাকে বসতে বলে বলল, আপনি কিন্তু অনেকদিন আসেননি মিঃ মজুমদার।

দেবাশিসও মৃদু হাসলেন, আর বলবেন না। আমাদের কোম্পানিতে একটা নতুন ফোর্টনাইলটি চালু হয়েছে, মেয়েদের কাগজ, তার জন্য খুব ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। আমাদের চিফ্ অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার বলেছেন, আমাকে অন্তত প্রতি ইস্যুতে পাঁচটা করে কালার ফুলপেজ জোগাড় করতে হবে। তাই ক'দিনে র জন্য বোম্বে চলে গিয়েছিলাম।

—বিজ্ঞাপনের বাজার তো বোম্বেতেই। কলকাতায় আর ক'টা ভালো কোম্পানি আছে যে তারা বিজ্ঞাপন জোগাবে রোজ রোজ।

—তা ঠিক, দেবাশিস মাথা নাড়লেন, তবু আপনাদের মতো দু-চারটে বাঙালি কনসার্ন কলকাতায় আছে বলেই তো আমাদের ভরসা। আপনারা তো বছরে কম বিজ্ঞাপন দেন না আমাদের।

—সে একসময় দিতাম ঠিকই, রৌণক তার ম্লানহাসিতে বুঝিবা একটু ধূসর হল। কিন্তু এখন তো বিজ্ঞাপন অনেক কমে গেছে আগের তুলনায়। বরং আজকাল বোধহয় প্রচুর বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন প্যারাডাইসের কাছ থেকে।

—তা অবশ্য পাচ্ছি।

—ওদের এখন প্রচুর বিজ্ঞাপন না দিয়েও কোনও উপায় নেই। কারণ ওদের এম. ডি.-র পার্সোন্যাল ক্রাইসিসটা হঠাৎ এমন করে আছড়ে পড়ল কোম্পানির ঘাড়ে।। জানেন তো ওদের সেলও ফল করেছে—

pathagar.net

—আমরা কাগজের লোক, আমরা সব খবরই পাই। যা সব স্টোরি ছাপা হচ্ছে গত একমাস ধরে, তাতে অটোমেটিক সেল ফল করবে। তা ছাড়া, আরও অনেক কিছুই ঘটবে খুব শিগগির। যা সব ইনফর্মেশন পাচ্ছি—

রৌণক হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল, তাই নাকি? কিরকম?

দেবাশিস মজুমদার হঠাৎ গলাটা নামালেন, বুঝলেন, পুলিশ-অফিসার দেবাদ্রি সান্যাল আমার অনেকদিনের বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়তাম। আমাদের এতই বন্ধুত্ব ছিল যে ক্লাসের অন্য ছেলেরা আমাদের দেবস্কোয়ার বলত। তা সেদিন দেবাদ্রির সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ওই তো এই কেসটার ইনভেস্টিগেশন অফিসার। সে বলছিল, ফ্যান্টাস্কিক সব ক্লু পেয়েছে নাকি ইনভেস্টিগেট্ করতে গিয়ে। আপনাদের রাইভ্যাল কোম্পানি, প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের চেয়ারম্যান সায়ন চৌধুরীর সেকেণ্ড ম্যারেজটাই ওদের তদন্তে অনেক সুবিধে করে দিয়েছে। অনেক জটিল ব্যাপার, যা আগে ওরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না, এখন তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

রৌণক প্রায় হামড়ে পড়ল, সায়ন চৌধুরী ফেঁসে যাবে মনে হচ্ছে?

দেবাশিস হাসলেন, অত ডিটেল্‌সে আমাকে বলল না। পুলিশের লোক তো, কিন্তু বলল, নারীঘটিত ব্যাপার, খুব মিস্টেরিয়াস। সেদিন নাকি সায়ন চৌধুরীর সেকেন্ড ওয়াইফকে ইন্টারোগেট করতে গিয়েছিল। একদম একা। ভদ্রমহিলা নাকি খুবই ইনরেস্টিং ক্যারেক্টারের। দেবাদ্রির সঙ্গে নিজেই নাকি এই মার্ডারের ব্যাপার নিয়ে অনেক অ্যানলিসিস করেছে। অনেক মতামতও দিয়েছে। অথচ দেবাদ্রি বলছিল, এই ভদ্রমহিলা কেসের অন্যতম সাসপেক্ট্।

—খুব ইন্টারেস্টিং তো।

—আরও ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে। আপনি শুনেছেন, মিসেস চৌধুরীই এখন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর?

রৌণক চমকে উঠল কথাটা শুনে, বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দেবাশিস তাঁর গলা আরও খাদে নামালেন, এতে ওদের অফিসের অনেকেই ক্ষুব্ধ। সেদিন ওদের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী তো বলেই ফেললেন, কোম্পানির যেটুকু গুডউইল ছিল, তাও এবার শেষ হয়ে যাবে।

—স্ট্রেঞ্জ!

—এ খবরে আপনাদের তো উল্লসিত হওয়ার কথা, মিঃ মুখার্জি, প্যারাডাইস ডুবলে তো লাইম ইন্ডিয়ার কপাল ঘিরে যাবে। এখন যেমন ওরা বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে তখন তো আপনাকেই এমন ঢালাও বিজ্ঞাপন দিয়ে যেতে হবে। আপনার বাজেট দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

কিছুদিন ধরে ব্যাপারটা রৌণককে একেবারে না ভাবাচ্ছে তা নয়। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের বিজনেস ওঠানামার সঙ্গে তাদের কোম্পানির ভাগ্য নিঃসন্দেহে জড়িত। গত তিনবছর ধরে তাদের সেল অস্বাভাবিক রকম পড়ে যাওয়ায় তাদের সমস্ত ডিপার্টমেন্টের বাজেট কমিয়ে ফেলতে হয়েছে। বিজ্ঞাপন নিয়ে গত ছ'সাত বছর যাবৎ সে যে রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এখন তাতেও ভাটা পড়েছে। আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্যারাডাইসের সেল ফল্ করলেও তাদের বিক্রির কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। দুই কোম্পানিরই যে দুরবস্থা চলছে, তার সুযোগ নিয়ে বাজারে কায়েম হয়ে বসছে বোম্বের কোম্পানিগুলো। এই মুহূর্তে তাদের দরকার আরও আরও বিজ্ঞাপন। কয়েকদিন আগে, চেয়ারম্যানের মিটিং এর

পরিপ্রেক্ষিতে সে কয়েকটা নতুন পরিকল্পনা দিয়েছে এম. ডি-র কাছে। শুধু খবরের কাগজেই নয়, টি. ভি-তেও যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেওয়া দরকার। টি. ভি-ই এ কালের বেস্ট মিডিয়া। বিশেষ করে বাংলা বা হিন্দি সিনেমার আগে লক্ষ লক্ষ ভিউয়ার পাওয়া যায়। একবার বিজ্ঞাপন দিলেই পৌঁছানো যায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে। আরও ভালো হয়, যদি কোনও একটা ভালো সিরিয়ালের স্পনশর করতে পারলে কম খরচে অনেক বেশি পাব্‌লিসিটি হয়। বঙ্কিম কিংবা শরৎচন্দ্রের বই হলে সবচেয়ে সুবিধে। এই দু'জনই এখনও বেস্ট মিডিয়া ক্যাচার। এ বছর সে যা বাজেট করে দিয়েছে, যদি সব টাকাটা পাওয়া যায়, তাহলে—

আবার নিজের ভাবনার মধ্যে তন্ময় হয়ে গেল রৌণক। তবে রাহুল রায় যেমন বলেছিল সেদিন, অ্যাট দ্য কস্ট অব্ প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্, সেরকম পারস্পরিক বিদ্বেষের বীজ পোঁতাটা তার অভিপ্রেত নয়। দুটো প্যারালাল কোম্পানির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকতে পারে বা থাকা উচিত। সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে জিতলে জেতার একটা আলাদা আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু ঈর্ষা যদি ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে আসে—

আসলে লাইম ইন্ডিয়ার এখন যা অবস্থা, তাতে সুস্থ প্রতিযোগিতা চললে যে তারা জিততে পারবে না তা জেনে গেছে কোম্পানির চেয়ারম্যান থেকে সেল্‌স্ রিপ্রেজেন্টেটিভ পর্যন্ত সবাই। তাই প্যারাডাইসের এই দুর্ঘটনায় সবাইকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। সবচেয়ে উৎফুল্ল হয়েছেন রাহুল রায়। মাত্র কালই তিনি রৌণকের চেম্বারে এসে বলে গেছেন, এর পরও যদি লাইম ইন্ডিয়া না দাঁড়াতে পারে, তা হলে শুধু প্রোডাকশন ম্যানেজারকে দোষী করলে চলবে না। এই ভাইটাল টাইমে সেল্‌স্ ম্যানেজারের ভূমিকাই প্রধান হওয়া উচিত। সেল্‌স্ উইং যদি দোকানে দোকানে গিয়ে ঠিকমতো ক্যাম্পেন করতে পারে—

কয়েকদিন পরে তীব্র সংকটের মধ্যে ডুবে আছেন রাহুল রায়। চেয়ারম্যান তাঁকে বসিয়ে রেখেছেন প্রায় একটা ত্রিফলা বর্শার নিচে। যে কোনও দিন তিনমাসের স্যালারি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে পারেন, ইওর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকয়ার্ড ইন আওয়ার কোম্পানি। সেই আতঙ্কে রাহুল রায় এখন চরম ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছেন।

আর রৌণক নিজেও কি খুব স্বস্তিতে আছে! তাকে যদি কোনও দিন এভাবে—

দুশ্চিন্তার পাহাড় টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে রৌণক হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, আপনি এই পত্রিকায় কতদিন বিজ্ঞাপনে কাজ করছেন, মিঃ মজুমদার?

—তা প্রায় বছর তিনেক।

—মাত্র! রৌণক বেশ আশ্চর্য হয়, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি তো বেশ সিনিয়র পোস্টে চলে গেছেন। আপনার আন্ডারেই তো একঝাঁক তরুণী কাজ করছে। সেদিনও চম্পা রায় বলে একটা মেয়ে এসেছিল আমার কাছে। কদমফুলের মতো ফাঁপানো চুল। তার আগে একজন আসত। খুব সুন্দরী বিদিশা চ্যাটার্জি না কি যেন নাম। বিয়ে হয়ে আমেরিকায় চলে গেল। কয়েক দিন আগে আরও একটি যুবতী এসেছিল আপনাদের অফিস থেকে, তপতী—

—আসলে মিঃ মুখার্জি, প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে ওপরে ওঠা-না-ওঠা সবই নির্ভর করে পারফরমেন্সের উপর, সে তো আপনি ভালো করে জানেন। আমাদের পত্রিকার ম্যানেজমেন্ট হল গিয়ে ইন্ডিয়ার অন্যতম টপ ম্যানেজমেন্ট। আমাদের ম্যানেজমেন্ট এইসব এক্সিকিউটিভ র‍্যাঙ্কের অফিসারদের বাছাই করেন অনেক বেছেবুছে, অনেক ভেবেচিন্তে, আগের কোম্পানিতে থাকার সময় আমার যোগ্যতা দেখেই ডেকে এনেছিল এঁরা—

—এর আগে কোন কোম্পানিতে ছিলেন আপনি?

pathagar.net

—তিনবছর আগে ছিলাম অন্য একটা নতুন ফোর্টনাইটলি 'দিনক্ষণ'এ। খুব ইন্টেলেকচুয়্যাল পত্রিকা, দেখে থাকবেন নিশ্চই। এই পত্রিকাতেই আমার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের প্রথম হাতে-খড়ি হয়। পত্রিকাটি এমন চমৎকার সব আর্টিকেল নিয়ে বেরোতে আরম্ভ করল, ছাপাও এমন ঝকঝকে যে পড়ার পর আমি নিজেই তার প্রেমে পড়ে গেলাম। যে সমস্ত কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয়, তাদের দরজায় গিয়ে হানা দিতে শুরু করলাম। পত্রিকাটি সম্পর্কে তাদের বোঝাতে শুরু করলাম, বললাম, এতদিন পরে বাংলায় একটা ভালো পাক্ষিক বেরিয়েছে। ওই পত্রিকাটিকে আপনাদের বাঁচিয়ে রাখা উচিত। তা বেশ সাড়াও মিলল। তারপর, কে যেন আমাকে বলল, বিজ্ঞাপন পেতে হলে তোমাকে বোম্বে যেতে হবে। সমস্ত বড়-বড় কোম্পানির হেড-অফিস বোম্বে। শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। তার আগে আমি কখনও বোম্বে যাইনি। তবু বুকে একরাশ কাঁপ নিয়ে একদিন পাড়ি দিলাম বোম্বের উদ্দেশে, হাতে শুধু একটা ব্রিফকেস—তাতে দু-সেট জামা-প্যান্ট, আর 'দিনক্ষণ' এর কয়েকটি সংখ্যা। কিন্তু বম্বে পৌঁছে বুঝলাম, কাজটা কি ভীষণ কঠিন। হিন্দি-বেল্টে গিয়ে একটা বাংলা পত্রিকা, একেবারে, নতুন, তার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা যে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা অনুভব করতে পারলাম প্রতিমুহূর্তে। দাঁতের মাজনের কোম্পানি, শেভিং ক্রিমের কোম্পানি, সাবান-কোম্পানি, রেফ্রিজারেটর কোম্পানি, টি.ভি. সবাই মিলে সেখানে একটা দুর্ভেদ্য পাঁচিল তৈরি করে রেখেছে।

আমি অবশ্য হতোদ্যম হইনি। খুঁজতে লাগলাম, এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে কোথায় বড়-বড় পোস্টে বাঙালি আছে। এক বাঙালি ছাড়া সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ আর কোথায় পাওয়া যাবে। একমাত্র বাঙালিরাই তো সাহিত্যপ্রেমিক হয়। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম শেভিং ক্রিম কোম্পানির চিফ অ্যাকাউন্টস অফিসার মিঃ সেনকে, এক সাবান কোম্পানির এরিয়া ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তীকে, এক টুথপেস্ট কোম্পানির জেনারেল মিঃ বক্সীকে। এঁদের কারও সঙ্গেই বিজ্ঞাপন বিভাগের কোনও সম্পর্ক নেই। সে কোম্পানিতে বিজ্ঞাপন দেখছেন হয় তো একজন দুঁদে মারাঠি, কিংবা পোড়-খাওয়া পাঞ্জাবি, কিংবা জাঁদরেল সাউথ ইন্ডিয়ান। তারা এই নতুন বাংলা পাক্ষিকের নামই শোনেনি। তাদের কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়ার বাসনাও নেই সেখানে। সুতরাং ভেবে দেখলাম তাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করে কোনও লাভ নেই। আমি তাই বেছে-বেছে এইসব কোম্পানির কি-পজিশনে থাকা বাঙালিদের গিয়ে ধরলাম। পত্রিকার কপি দেখিয়ে বললাম, এই পত্রিকাটি বাঙালি সংস্কৃতির ধারক-বাহক, একে আপনাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আপনারা তো বিজ্ঞাপনের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। টি.ভি.তে দিল্লি নেটওয়ার্কে মাত্র কুড়ি সেকেন্ডে দু-আড়াই লাখ টাকা বেরিয়ে যায় আপনাদের। আর আমাদের একটা কালার ফুলপেজ মাত্র পনেরো হাজার টাকা। এ টাকা আপনাদের কোম্পানির কাছে নস্যি।

এভাবে ঘুরে ঘুরে পাঁচটা কালার, সাতটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট নিয়ে কলকাতা ফিরলাম। আরম্ভ হিসেবে খুব একটা খারাপ নয়। তারপর ক্রমশ প্রতিমাসেই ভালো টাকার বিজ্ঞাপন পেতে শুরু করলাম। আর আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন, যেসব বাঙালিরা এইসব কোম্পানির কি-পজিশনে আছেন, তাঁরা বহুদিন বিজনেসের মধ্যে জীবন-মন সমর্পণ করে বিজনেস মাইন্ডেড হয়ে গেলেও মনের এক গোপন কোণে বাংলা সংস্কৃতি-সাহিত্যের প্রতি একটা অনুরাগ জমা করে রেখেছেন। এমনকি দু-একজনের বাড়িতে গিয়েও দেখেছি তাদের স্ত্রী ছেলে-মেয়ে বাংলার বাইরে থেকে থেকে আরও বাংলা-মনস্ক হয়ে পড়েছে। নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনে, পুজো সংখ্যা কিনে এনে আঁতিপাতি পড়ে।

pathagar.net

—চমৎকার, রৌণক উচ্ছ্বসিত হল, আপনি যে একজন এ লাইনের কৃতী মানুষ তাতে সন্দেহ নেই।

—তারপর আমার পারফরমেন্স দেখে আমার বর্তমান কোম্পানি এই চাকরিটা অফার করেছে। এখানে চাকরি করাটা অবশ্য আগের চেয়ে অনেক সহজ। এদের মস্ত গুডউইল আছে বাজারে। শুধু টেলিফোন করলেই অনেক বিজ্ঞাপন চলে আসে।

—হুঁ, আমরা যারা মানুষের ডেইলি নিড্‌স্‌-এর প্রোডাক্ট তৈরি করি, তারাও জানি, আপনাদের কাগজে বিজ্ঞাপন না দিলে আমাদের সেল বাড়বে না।

—তাহলে, এবার পুজোয় আমাদের শারদীয়ায় আপনাদের কালার অ্যাড্‌ যাচ্ছে তো? সুযোগ বুঝে দেবাশিস মজুমদার তাঁর কাজের কথায় আসেন, গতবার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পেয়েছিলাম, এবারে কালার চাইই চাই।

রৌণক হাসল, দেখা যাক, যদি কোম্পানির বাজেটে কুলোতে পারি। আমাদেরও তো ইচ্ছে করে কালার বিজ্ঞাপন দিতে। তাতে কোম্পানির ইজ্জত বাড়ে তো—

—কুলোবে কুলোবে দেবাশিস মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন, মনে হচ্ছে লাইম ইন্ডিয়ার ভাগ্য ফিরছে। অন্তত দেবাদ্রি যা বলল আমাকে।

নিজের ভেতর একা মগ্ন হয়ে সব কিছু ভাবছিল রৌণক, সেই মুহূর্তে দেবাশিস মজুমদার হঠাৎ বললেন, বুঝবেন মিঃ মুখার্জি, দেবাদ্রি সেদিন আরও একটা খবর শোনাল। তদন্তের সময় নাকি জানা গেলে, ঐন্দ্রিলা বিয়ের আগে এক কবির প্রেমে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে বিয়ে হয়নি, কিন্তু বিয়ের পরেও নাকি তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ঐন্দ্রিলার।

রৌণক চমকে উঠল যেন, অস্ফুটকণ্ঠে বলল, কে বলল যোগাযোগ ছিল?

—দেবাদ্রিই বলল, তারা অনুমান করছে। সেই ব্যর্থ প্রেমিককে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো সে-ই-ই—

রৌণক স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে, ঝাপসা হয়ে উঠল তার দৃষ্টি, যেন একপশলা মেঘ আড়াল করে দাঁড়াল তার চোখের সামনে। শরীর জুড়ে ঘনিয়ে আসা প্রবল অস্বস্তি কাটাতে সে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল মুহূর্তে, বলল, নতুন যে ফোর্টনাইটলিটা বেরিয়েছে বললেন, কেমন চলছে পত্রিকাটা?

দেবাশিস মজুমদার সঙ্গে সঙ্গে মগ্ন হয়ে গেলেন তাঁর নিজের জগতে, দারুণ চলছে। সার্কুলেশন শিগগির একলাখে পৌঁছাবে শুনতে পাচ্ছি।

দেবাশিস প্রায় এক ঘন্টা নানা কথা বললেন। তারপর বললেন, আজ চলি। তিনি চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে যেতে না যেতেই হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল তার টেবিলে, কানে রিসিভার লাগাতেই শুনল, হ্যালো, মিতুন মুখার্জি বলছি—

—আরে, আপনি সে ফিরে গেলেন কেন? একটু বসতে পারতেন তো।

—প্রায় পৌনে একঘন্টা অপেক্ষা করেছি। তারপর ভাবলাম, টেলিফোনেই তো হতে পারে সাক্ষাৎকারটা। আমার মাত্র তিনটি প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।

—টেলিফোনে কি হবে? রৌণক তার সামনে রাখা কোম্পানির টার্ন-ওভার, সেল-ফিগার ইত্যাদিতে চোখ রাখল, হুঁ বলুন, কি জানতে চান! ভাল করে লিখবেন কিন্তু—

—আমার প্রথম প্রশ্ন, আপনি ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্য নামে কাউকে চিনতেন, মিঃ মুখার্জি? ধরুন, আজ থেকে দু-তিনবছর আগে—

রৌণক ভীষণ চমকে উঠল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় শুধু বলতে পারল, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

pathagar.net

—যা জিজ্ঞাসা করছি, তার জবাব দিন।

—হুঁ, অস্ফুট গলায় রৌণক বলল, চিনতাম একসময়।

—আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিয়ের পরও তার সঙ্গে আপনার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, অথচ সায়ন চৌধুরী তা জানতেন না কেন?

রৌণক চুপ করে রইল। তার শরীরের ভেতর তখন ঝড় বয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সাংবাদিকদের নজর তার ওপর পড়ল কী করে? কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে বলল, সে অনেক কথা। সব এই মুহূর্তে বলা যাবে না।

—আমার তৃতীয় প্রশ্ন, পাঁচই এপ্রিল সন্ধে সাতটার পর আপনি ঐন্দ্রিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন? আপনি নিশ্চয় মনে করতে পারেন সেদিন রাতেই ঐন্দ্রিলা খুন হয়।

মাথায় বজ্রপাত হবার মতোই চমকে উঠল রৌণক। তার হাতের টেলিফোন ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আপনি কী করে জানলেন? তৎক্ষণাৎ ওপাশ থেকে নারীকণ্ঠের হাসির আওয়াজ শুনল রৌণক, একটু পরে ভেসে এল, ঠিক আছে, পরে একসময় এর উত্তর জেনে নেব আপনার কাছ থেকে। আপনি যে ব্লু-ওয়ান্ডারে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ আজই পেয়েছি, আপনার চেম্বারে গিয়েই।

ওপাশে টেলিফোন রেখে দেওয়ার শব্দ। রিসিভার হাতে দিয়ে রৌণক কিছুক্ষণ হতভম্ব। বিমূঢ় হয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ কি খেয়াল হতে তার টেবিলের ডেস্ক-ক্যালেন্ডারটির পৃষ্ঠা উল্টে দেখল, পাঁচই এপ্রিলের পৃষ্ঠাটি কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। কী লেখা ছিল পৃষ্ঠাটিতে তা এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না। তার অনুপস্থিতিতে সাংবাদিকটি এমন একটি মোক্ষম অস্ত্র নিয়ে গেল ভাবতেই গায়ে যেন জ্বর এসে গেল তার। মনে হল, সে এক ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি। কী করে এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে তা বুঝে উঠতে পারল না।

প্রবল আচ্ছন্নতার ভেতর শুধু মনে পড়ল, কয়েকদিন ধরেই একটি বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে কাগজে, তাতে লেখা, 'আপনার বয়স যদি হঠাৎ পাঁচ, দশ বা পনেরো বছর কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে আপনি কী করবেন?' ব্যস, আর কিছু নেই। প্রথমদিন বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল ছোট্ট করে, তার পরদিন বেরোল একটু বড় করে, পরদিন আরও একটু বড় আকারে—পনেরো সেন্টিমিটার বাই তিন কলাম। আজ বেরিয়েছে একেবারে কোয়ার্টার পেজ জুড়ে।

বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়তেই রৌণকের মনে হল, অন্তত বছর পাঁচেক বয়সও যদি কমে যেত তার, তাহলে এমন অক্টোপাসের মুখোমুখি হতে হত না। সে বড় সুখের সময় ছিল।

প্রায় সারাটা রাত না ঘুমিয়ে ল্যাবরেটরিরুমে কাজ করেছে সায়ন। যে নতুন গায়ে-মাখা সাবানটি সে এবার মার্কেটে ছাড়তে চলেছে, তাতে ওতপ্রোত হয়ে থাকবে এমন একটি চমৎকার ফ্লেভার, যা শুধু এ রাজ্যে নয়, অল ইন্ডিয়া মার্কেটেও সাড়া জাগাবে বলে তার বিশ্বাস। তারই জন্য এত ব্যস্ততা, এত পরিশ্রম— কখনও গভীর রাত পর্যন্ত, কোনও দিন বা সারারাত। সকালে চায়ের আসরে বসে গার্গীকে বলল, আজ আমি সোজা ফ্যাক্টরিতে যাব, তুমি অফিসটা একাই সামলিয়ো। ফ্যাক্টরি হয়ে অফিস ফিরতে আমার বেলা তিনটে-টিনটে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যে গার্গী তার অফিসের কাজকর্ম এত দ্রুত পিকআপ করে নিয়েছে যে তা দেখে সায়ন খুবই অবাক, উৎফুল্লও। এই অল্প সময়ের মধ্যে অফিসের সব ব্যাপারেই একটা নিজস্ব মতামত গড়ে উঠেছে গার্গীর। চমৎকার সব সাজেশনও দিচ্ছে একের পর এক। তা ছাড়াও তার চালচলনে, কথাবার্তায়, চাউনিতে সামান্য কম্যান্ডের ছোঁয়াও দেখতে পাচ্ছে সায়ন, যে কম্যান্ডটুকু না থাকলে এত বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাজ সামলানো সম্ভব নয়। এতদিন গার্গীকে ঠিক এ ভাবে চেনেনি সায়ন। ঐন্দ্রিলা ছিল শান্ত, নরম স্বভাবের, মৃদুবাক। পাশাপাশি গার্গীর তুখোড় ব্যক্তিত্ব নজর কাড়ে সহজেই।

বিশেষ করে গার্গীর একটা বড় গুণ, সে অফিসের সর্বস্তরের কর্মীর সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছে এক আশ্চর্য দক্ষতায়। যে কোনও স্তরের কর্মীর সঙ্গে দেখা হলেই তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে নড করছে, অর্থাৎ ইঙ্গিতে বলা, কি, কেমন চলছে। তাতে সবার সঙ্গে গড়ে উঠেছে এক হার্দ্য সম্পর্ক। সেদিন অ্যাকাউন্টস সেকশনের কে একজন যেন সায়নের ঘরে এসে খুব প্রশংসাও করছিল ম্যাডামের। ম্যাডাম তার টেবিলে গিয়ে নিজে হাতে অ্যাকাউন্টসের কাজকর্ম শিখেছেন।

গার্গীকে সে কথা বলতেই সে হাসল, আসলে আমি অফিসের ভেতর ঘুরে ঘুরে নজর রাখছি, আবার কেউ স্যাবোটেজ করার উদ্যোগ নিচ্ছে কি না। সেদিন কালীজীবনবাবুর টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, একজন বাইরের লোক দাঁড়িয়ে। লোকটা নাকি প্রায়ই আসে। পরে কালীজীবনবাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেই বললেন, ওর নাম লোটন। খুব ভাল ছেলে। ওঁদেরই পাড়ায় থাকে। যে রাতে মেশিন বার্স্ট করেছিল, সেদিন নাকি ওকেই সঙ্গে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে টেলিফোন করতে গিয়েছিলেন। অথচ লোটন নাকি লাইম ইন্ডিয়ায় চাকরি করে।

সায়ন আশ্চর্য হয়ে বলল, সে কি! লোকটা কালীজীবনবাবুর কাছে আসে কেন?

—সে কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাতে উনি বললেন, লোটন খুব বিশ্বাসী ছেলে। লাইম ইন্ডিয়ার অনেক খবরাখবর তাঁর কাছে এনে দেয়। লাইম ইন্ডিয়া যে হুইস্পারিং ক্যাম্পেন শুরু করেছে প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে, সে খবর লোটনই এনে দিয়েছিল।

—মাই গুডনেস! সায়ন বিস্মিত হল।

গার্গী চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আমি কালীজীবনবাবুকে মৃদু ধমক দিয়েছি। বলেছি, উল্টোটাও তো হতে পারে। লোটন হয়তো প্যারাডাইসের খবরও নিয়ে যাচ্ছে লাইম ইন্ডিয়ায়। তাতে কালীজীবনবাবু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, না ম্যাডাম, তা হতে পারে না। লোটন খুবই বোকাসোকা ছেলে। তবু আমি কালীজীবনবাবুকে বলে দিয়েছি, আপাতত লোটন যেন এ অফিসে না আসে।

—ফাইন! সায়ন চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগছে আমার, তুমি এ-দফতরে ও-দফতরে চরকির মতো ঘোরো বলেই লোটনকে তোমার নজরে পড়েছে। আমি তা জানতেই পারিনি এতদিন। কেমন মনে হল লোটনকে?

সেই মুহূর্তে পাশের ফ্ল্যাট থেকে একটা পপসঙের সুর ভেসে আসতেই সায়নের মুখখানা শক্ত হয়ে গেল সহসা। গার্গীও অবাক হল। এই সাতসকালেই না রবার্ট এসে পড়েছে চন্দ্রাদেবীর কাছে! লোকটা আজকাল যেন একটু বেশিই আসছে, অসময়েও আসছে। কি এত দরকার থাকে তার এ বাড়িতে কে জানে। কদিন ধরে গার্গীর এও নজরে পড়ছে, কে যেন ওদের ফ্ল্যাট থেকে ক্রমাগত নজরদারি করছে তাকে, বড় ভীষণভাবে লক্ষ করছে একজোড়া তীক্ষ্ণ চোখ।

pathagar.net

ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে আটটার মধ্যেই ফ্যাক্টরির দিকে বেরিয়ে গেল সায়ন। তার গাড়ি সে নিজেই ড্রাইভ করে যায়। গার্গীর জন্য অন্য একটি গাড়ি আসে সাড়ে নটায়। এই অল্প সময়ের মধ্যে গার্গী নিজে খেয়ে সায়নের জন্য লাঞ্চ নিয়ে যাবে অফিসে। এতএব নির্বিঘ্নমনে দ্রুত ফ্যাক্টরিতে পৌঁছেই একটা মিটিং সেরে নিল প্রোডাকশন ম্যানেজার আর ওয়ার্কস ম্যানেজারের সঙ্গে।

আজকাল ফ্যাক্টরিতেও জোর কর্মতৎপরতা। সবাই বুঝতে পারছে এই নতুন প্রোডাক্টটির সাফল্য ব্যর্থতার উপর অনেকখানি নির্ভর করছে কোম্পানির অস্তিত্ব। সায়ন সবাইকে বলে দিয়েছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাজারে নতুন প্রোডাক্ট পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ এর একটি তথ্যও যেন বাইরে লিক-আউট না হয়ে যায়। কেন এই গোপনীয়তা, তা কাউকে বলেনি, তবু সবাই মোটামুটি আঁচ করে নিয়েছে ব্যাপারটা। কোম্পানির যে সংকট চলছে, তার আঁচ যেন নতুন প্রোডাক্টের গায়ে না লাগে। এমনকি মধুমন্তী রায়মজুমদারকেও বলে দেওয়া হয়েছে, প্রোডাক্ট তৈরি না হওয়া পর্যন্ত কোনও অ্যাড যেন না দেওয়া হয় কাগজে।

এত গোপনীয়তা সত্ত্বেও গার্গী একদিন সায়নকে বলেছে, সে প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তকে বিশ্বাস করছে না। তার চালচলন, মতিগতি ভাল ঠেকছে না তার কাছে। সায়ন অবশ্য বলেছে, প্রোডাকশনের ব্যাপারে এটকু বিশ্বাস রাখতেই হবে তার উপর। আর সেই জন্যেই কৌশিক দত্তকে ইদানীং বেশ গুড হিউমারে রেখেছে। নানান জটিল ব্যাপার নিয়ে আলোচনাও করছে তার সঙ্গে, যাতে কৌশিক দত্তর ধারণা হয়, সে কোম্পানির যথেষ্ট আস্থাভাজন অফিসার।

ফ্যাক্টরি সেরে সায়ন অফিসে ফিরে এল তিনটের একটু আগেই। ফিরে এসে দেখল, অফিসেও দারুণ তৎপরতা। হঠাৎ যেন কাজের জোয়ার এসেছে। গার্গী তার নিজের চেম্বারে নেই, বসে আছে কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রের সামনে। খুব গভীরভাবে আলোচনা করছে তাদের পরবর্তী পরিকল্পনা, যাতে একই দিনে সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া যায় তাদের নতুন প্রোডাক্ট। এই সাবানটি বাজারে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত গাত্রদাহ শুরু হয়ে যাবে লাইম ইন্ডিয়ার ম্যানেজমেন্টের। তারা হয়তো আবারও আজেবাজে অ্যাড দিয়ে এই প্রোডাক্টটিরও গুডউইল নষ্ট করার চেষ্টা করবে। তাদের দাঁত ও নখ বাড়িয়ে দেওয়ার আগেই বাজারে ধরিয়ে দিতে হবে নতুন সাবানটি। সায়নের ধারণা, একবার প্রোডাক্ট বাজারে ধরে গেলে তার বাজার নষ্ট করে দেওয়া একটু কঠিন। করলেও সময় লাগবে। তার মধ্যে হু-হু করে সেল বাড়িয়ে নিতে হবে। আর তার জন্যেই প্রোডাকশন এবং মার্কেটিং—দু'ক্ষেত্রেই তাকে এগোতে হচ্ছে টায়েটায়ে অঙ্ক কষে।

আগে একবার প্রবল ধাক্কা খেয়েছে বলেই এবারে এমন কড়া সতর্কতা। মাইক্রো-সিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশনে হঠাৎ যেভাবে মার খেয়ে গেল তারা, তা আগে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। ইতিমধ্যে বোম্বের মার্কেট থেকে এ ধরনেরই একটা ডিটারজেন্ট পাউডার এসে দারুণ রমরমা ব্যাবসা করছে কলকাতায়। সায়ন নিশ্চিত, তার মগজ থেকে যে ফর্মুলাটা বেরিয়েছে, তা দিয়ে তৈরি ডিটারজেন্ট পাউডার বেরোলে বোম্বের প্রোডাক্টকেও তারা হারিয়ে দিতে পারত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায়ন ভাবল, অতএব নতুন গায়ে-মাখা সাবানটিই এখন তাদের কোম্পানির ট্রাম্পকার্ড। রোজবেরি, ড্রিমবাথের পাশাপাশি তাদের নতুন সাবান....

না, নতুন সাবানটির নাম সে এখনও প্রকাশ করেনি কারও কাছে। একমাত্র গার্গীর সঙ্গেই

pathagar.net

কাল রাতে শোবার আগে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেছে প্রোডাক্টটি নিয়ে। তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু তা নিয়েও।

এতসব ভাবতে ভাবতে লাঞ্চ-আওয়ারের পর তার কাজে মন দেবে বলে সবে প্রস্তুত হয়েছে সায়ন, ঠিক সে সময় হঠাৎ গার্গীর প্রবেশ, স্যর, আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি আলোচনা ছিল—

সায়ন বড় করে হাসল। গার্গী মাঝেমধ্যে এভাবেই তাকে চেম্বারে একা পেলে রসিকতা সুরে কথা বলে। সেও গম্ভীরভাবে বলল, বলুন এম. ডি সাহেব।

—আমার মনে হয়, এই স্টেটে যখন আমাদের প্রোডাক্টের সেল নিয়ে কিছু সমস্যা হচ্ছে, তখন একইসঙ্গে বাইরের স্টেটগুলোতেও আমরা প্রোডাক্ট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

—রাইট ইউ আর, সায়ন অ্যাপ্রুভ করার ভঙ্গিতে বলল, কথাটা আমিও ভাবছিলাম কদিন ধরে। অন্তত প্রথম দফায় বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্র— এ রকম কয়েকটা স্টেটে যদি সেলস ক্যাম্পেন করি—

—আমি কমার্শিয়াল ম্যানেজারের সঙ্গে সেই অলোচনাই করে এলাম এক্ষুনি। মিঃ মিত্রও রাজি হলেন সঙ্গে সঙ্গে। বললেন, তিনি নিজে অন্তত দুটো স্টেট ঘুরবেন। এক্সটেনসিভলি—

—বাহ্, সায়ন চমৎকৃত হল। গার্গী এর মধ্যে অনেক ডিসিশন নিজেই নিচ্ছে, সায়নের সঙ্গে পরামর্শের অপেক্ষা না করেই, যাতে পরিকল্পনাটা রূপায়িত হতে পারে যত দ্রুত সম্ভব। হেসে বলল, তা হলে চলো, বাকি স্টেটগুলো তুমি আর আমি মিলে ঘুরে আসি কয়েকদিন। একটু বেড়ানোও হবে—

গার্গী হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, দুজনেই! কিন্তু একবার বেরোলে তো সাত-দশদিনের আগে কলকাতা ফেরা যাবে না। এ মুহূর্তে অফিস ছেড়ে দুজনেরই চলে যাওয়া কি ঠিক হবে? একেই তো স্যাবোটেজের আশঙ্কায় ঘুম হচ্ছে না আমাদের।

—তা হলে কী বলছ? আমি একাই ঘুরে আসব?

—হ্যাঁ, একাই তো যাওয়া উচিত, বলেই গার্গী সহসা কুঁকড়ে গেল, সে ক্ষেত্রে একা আমিই বা থাকব কোথায়?

—ঠিকই, আসন্ন সমস্যার কথা উপলব্ধি করে সায়নও থমকে গেল মুহূর্তে। মাসদেড়েক আগে শেষবারের মতো যখন ট্যুরে বেরিয়েছিল বিলাসপুরে, ঐন্দ্রিলা একাই ছিল বাড়িতে। সেই ট্যুর থেকে ফেরার মুহূর্তেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তার সর্বনাশের পালা, যার রেশ তার জীবন থেকে এখনও কাটেনি, সে জানে কাটবেও না আর কোনও দিন, এ কলঙ্কদাগ একবার গায়ে লাগবে তা লেগে থাকে বাকি জীবন। সে এও জানে, এখন কলকাতার তাবৎ মানুষ তাদের শরৎ বোস রোডের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে আঙুল তুলে দেখায়, এই দ্যাখো, এই সেই বাড়ি, যেখানে ঐন্দ্রিলা নামে এক ভারি সুন্দরী বউ—

গার্গীর কথার উত্তরে অন্যমনস্কের মতো সায়ন ঘাড় নাড়ল, ঠিকই তো, কোথায় থাকবে তুমি একা-একা।

গার্গী তার চেম্বারে ফিরে যাওয়ার একটু পরেই সায়নের চেম্বারে এসে ঢুকলেন মধুমন্তী রায় মজুমদার। মধুমন্তী আজকাল প্রায়ই টুকটাক কাজ নিয়ে তার কাছে আসেন, একটু প্রগলভও হয়ে ওঠে কখনও-সখনও। হঠাৎ করেই যেন বেশ বদলে গিয়েছেন মধুমন্তী। কদিন আগেও যিনি ছিলেন বিষণ্ণতার প্রতীক, মুখের হাসিটি ছিল ম্লান, এখন হঠাৎ তাঁর চলনে বলনে হাসিতে এক ধরনের প্রাণচাঞ্চল্য। এই মুহূর্তে তাঁর পরনে প্রিন্টেড রঙিন সিল্ক শাড়ি, স্লিভলেস

ব্লাউজ গায়ে, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। তার সামনে বসে মিষ্টি করে হেসে বললেন, স্যর আপনি কিন্তু এখনও নতুন প্রোডাক্টের নাম বলেননি আমাকে। নাম না জানলে অ্যাডের কপি লেখা যাচ্ছে না। অ্যাড-এজেন্সি থেকে রোজই লোক আসছে—

সায়ন হাসে, দেব দেব। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা একটু সিক্রেট রাখছি। সমস্ত প্রোডাক্ট আগে মার্কেটে পৌঁছে যাক, তারপর বড় করে বিজ্ঞাপন বেরোবে কাগজে। হই-হই করে।

—স্যর, আমাদের নতুন এম.ডি. কাল আমার চেম্বারে এসেছিলেন। অনেক খোঁজখবর নিলেন বিজ্ঞাপন সম্পর্কে। কয়েকদিন আগেও আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে জানতে চেয়েছিলেন, অ্যানুয়াল বাজেট কত, কোন সিজনে কত টাকার অ্যাড কাগজে দেওয়া হয়, কোন প্রোডাক্টকে আমরা বেশি হাইলাইট করি ইত্যাদি।

—তাই নাকি? সায়ন যেন ব্যাপারটা জানতই না এমন মুখভঙ্গি করল, আসলে কাল রাতে গার্গীই তাকে মধুমন্তী সম্পর্কে সতর্ক হতে বলেছে। হঠাৎই নাকি গার্গী কাল ঢুকে পড়েছিল মধুমন্তীর চেম্বারে। ঢুকে একটু হতচকিতেই হয়ে পড়েছিল, কারণ সে মুহূর্তে মধুমন্তীর সামনে বসেছিলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্ত, খুব নিচু গলায় কথা বলছিলেন দুজনে, হঠাৎ গার্গীকে দেখে চমকে উঠেছিলেন। আরও আশ্চর্য এই যে, দুজনে তখন বেশ মৌজ করে সিগারেট খাচ্ছিল। সায়ন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, মধুমন্তীও! গার্গী উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম। আমাকে দেখেই অবশ্য সিগারেট নিভিয়ে ফেলেছিল ওরা। একটু থতমতও খেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু গার্গীর মুখে যে কথাটা শুনে সত্যিই অবাক হয়েছিল সায়ন, তা হল পুলিশ অফিসার দেবাদ্রি সান্যালের তদন্তের হদিশ পেয়ে। ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর তার ঘরে নাকি একটি আধপোড়া সিগারেট পাওয়া গিয়েছিল অ্যাশট্রের ভিতর, লেডিজ সিগারেট। ঐন্দ্রিলা কখনও শখ করেও সিগারেট খায়নি সংবাদটি জানানোয় দেবাদ্রি সান্যালের অনুমান, তাহলে হত্যাকারীদের কেউ একজন মহিলা ছিলেন এবং সিগারেট খেয়েছিলেন তিনিই। সেই মহিলা কি তাহলে—

কৌশিক দত্তের সঙ্গে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন মধুমন্তী, এ খবর জেনে ভুরুতে কোঁচ পড়েছিল সায়নেরও। পরক্ষণেই গার্গী তার সহজাত ক্ষমতায় অদ্ভুতভাবে বিশ্লেষণ করেছিল মধুমন্তীর ইদানীংকার চালচলন সম্পর্কে। মধুমন্তী সম্পর্কে সে দিন সন্দেহ প্রকাশ করেছিল দেবাদ্রি সান্যালও। গার্গীও কড়া নজর রেখেছে তার ওপর। সে খবর নিয়ে জেনেছে মধুমন্তীর সম্ভবত একটা গোপন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কৌশিক দত্তের সঙ্গে। আজকাল প্রায়ই নাকি দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে। হয়তো তাইই মধুমন্তীকে ঘিরে গার্গীর এ হেন সন্দেহ। সেদিন দেবাদ্রি সান্যাল গার্গীকে বলেছিলেন। পাঁচই এপ্রিল মধুমন্তী তাঁর এক পুরুষবন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন আউটিঙে। রাতে ফেরার কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত আর ফিরতে পারেননি। অতএব মধুমন্তীর পক্ষে সে রাত্রে ঐন্দ্রিলার কাছে পৌঁছানোটা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। হয়তো ঐন্দ্রিলা চিনত প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারকে। তার সঙ্গে সেই পুরুষ বন্ধু অর্থাৎ কৌশিক দত্তের থাকাটাও হয়তো সম্ভব। যে কৌশিক দত্তের চালচলনও ইদানীং সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে, ফ্যাক্টরি কিংবা অফিসে স্যাবোটেজের পেছনে তার হাত আছে বলে ভাবছে সায়ন, তার পক্ষে মধুমন্তীর সহযোগিতায় ঐন্দ্রিলাকে—

এমন ভাবনার মধ্যেই মধুমন্তী হঠাৎ সহযোগিতায় ঐন্দ্রিলাকে—

pathagar.net

এমন ভাবনার মধ্যেই মধুমন্তী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, স্যর, আবার নাকি ট্যুরে বেরোচ্ছেন?

কৌশিক-মধুমন্তীর ভাবনায় এমনই ডুবেছিল সায়ন যে, মধুমন্তী তার সামনে বসে আছে খেয়ালই ছিল না। সম্বিত ফিরতে ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ।

—এ বারও নাকি একা যাচ্ছেন?

সায়ন চমকে উঠল হঠাৎ। কেনই বা এ কথা জানতে চাইছে মধুমন্তী, বুঝতে পারল না। কি এক অজানা আশঙ্কায় তার বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল যেন।

—স্যর, বলছিলাম ম্যাড়ামকেও সঙ্গে নিয়ে যান। একা থাকতে হয়তো ওঁর অসুবিধে হতে পারে।

আবারও বিস্মিত হয়ে মধুমন্তীর কথার অর্থ বুঝতে চাইল সায়ন। মধুমন্তী কি চাইছে, গার্গী তার সঙ্গে ট্যুরে যাক! ফাঁকা হয়ে যাক অফিসটা! তা হলে তাদের পক্ষে আবারও একটা স্যাবোটেজ করতে সুবিধে হবে! হেসে বলল, ঠিক আছে, ভেবে দেখি।

কাল আরও একটা খবর পেয়েছে সায়ন। লাইম ইন্ডিয়ার রাহুল রায়কে বরখাস্ত করেছেন ওদের চেয়ারম্যান। একেবারে অতর্কিতেই চিঠিটা ধরানো হয়েছে তাকে। তার জায়গায় কৌশিক দত্ত নাকি জয়েন করতে চায়। তাইই কি যাওয়ার আগে কৌশিক দত্ত একটা চরম আঘাত দিয়ে যাবে বলে ভেবে রেখেছে! তাইই কি গার্গীকে নিয়ে যেতে বলছে মধুমন্তী।

ভাবতে ভাবতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল সায়ন, হঠাৎ চমক ভাঙল মধুমন্তীরই কথায়, স্যর, আজকাল খুব অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড হয়ে পড়ছেন—

সায়ন সম্বিত ফিরে পেয়ে মধুমন্তীর দিকে তাকায়। লিপস্টিক-রঞ্জিত লাল ঠোঁটের ভেতর সাদা ধবধবে দাঁতের সারি বার করে হাসছে মধুমন্তী। আজকের হাসির ধরনই যেন একটু আলাদা। সে হাসিতে সায়নের মতো অবিচল পুরুষের মনেও বোধহয় চাঞ্চল্য জাগায়। থিতু হতে সে বলল, আসলে খুব টেনশনে আছি, বুঝলেন। এমনিতেই টার্নওভার ফল করেছে। তার ওপর বহু টাকা ইনভেস্ট করে নতুন প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়া হচ্ছে, এটাতেও লস খেলে কোম্পানির মাজা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়বে। উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই থাকবে না।

—এসব নিয়ে আপনি এত কিছু ভাববেন না, স্যর, মধুমন্তী আবার চমৎকার হাসিতে তার শরীরে ঝঙ্কার তুলল, এ বার অ্যাডের যা স্কিমিং হয়েছে, তাতে দেখবেন, হু-হু করে বাজার ধরে নিয়েছে প্যারাডাইসের নতুন প্রোডাক্ট।

—ঠিক আছে, কাল-পরশু একবার দেখাবেন তো স্কিমটা। অ্যাডর্ভাটাইজমেন্টের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে এ বারের সাফল্য।

পরদিন সকাল-সকাল ফ্যাক্টরিতে যেতেই ভারি চমৎকৃত সায়ন। একটা উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল তার শরীরে। সারা ফ্যাক্টরির হাওয়ায় তখন উড়ে বেড়াচ্ছে জুঁইফুলের গন্ধ। কারখানার লেবার থেকে ওয়ার্কস ম্যানেজার সবাই ওতপ্রোত হয়ে ডুবে আছে জুঁইয়ের চমৎকার সুবাসে। তার কয়েক রাত্রির জাগরণের ফলে এই নতুন ফর্মুলাটি আবিষ্কৃত হয়েছে। তারই জের হিসেবে জুঁইফুলের গন্ধমাখা এই নতুন প্রোডাক্ট।

গন্ধটা নাকে শুঁকতে শুঁকতে বেশ কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে রইল সায়ন নিজেই। তা হলে তার ফর্মুলা ঠিক ঠিক রূপায়িত হয়েছে ফ্যাক্টরিতে। দু-একদিনের মধ্যেই নতুন প্যাকে মুড়ে ঝকঝকে চেহারায় বেরিয়ে আসবে তাদের কোম্পানির নতুন সাবান।

ওয়ার্কস ম্যানেজারকে একটা মস্ত থ্যাঙ্কস জানিয়ে অফিসের দিকে ফিরে চলল সে। প্রোডাকশন ম্যানেজার আজ আসেননি এখানে। অবশ্য তাঁর না আসার কারণ সায়ন নিজেই।

pathagar.net

দিনদুয়েক আগে গার্গী সতর্ক করে দিয়েছে সায়নকে, প্রোডাক্ট ফাইনাল হয়ে যেদিন বেরোবে সেদিন কৌশিক দত্তকে কোনও একটা কাজ দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিতে। সে ভাবেই কাল কৌশিক দত্তকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে নর্থ বেঙ্গলে। দিন চারেকের ট্যুর দিয়ে বলেছে, আমার নিজেরই নর্থ বেঙ্গলে যাওয়ার দরকার ছিল মিঃ দত্ত, কিন্তু এই মুহূর্তে যেতে পারছি না। আপনি আমার হয়ে কাজটা মিটিয়ে আসুন। ফ্যাক্টরির দিকটা আমি ওয়াকর্স ম্যানেজারকে দিয়ে চালিয়ে নেব।

অফিসে এসেও জুঁইফুলের গন্ধের ব্যাপারটা কারও কাছে ভাঙল না সে। বলবে, আর দু-একদিন পরে। অবশ্য সে জানে, ফ্যাক্টরির কোনও এমপ্লয়ী নিশ্চয় চাউর করে দেবে কাল অথবা পরশু। তবু যতক্ষণ পারা যায়—

পরদিন সকালে চায়ে চুমুক দিতে দিতে হঠাৎ কাগজে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে নজর পড়তে বেশ চমকে উঠল সায়ন। গত কয়েকদিন ধরেই ক্রমাগত একটা বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছিল কাগজে: আপনার বয়স যদি হঠাৎ পাঁচ, দশ কিংবা পনেরো বছর কমিয়ে দেওয়া যায় তা হলে আপনি কী করবেন?

সায়ন বুঝতে পারেনি কারা দিচ্ছে বিজ্ঞাপনটা। বিজ্ঞাপনের নিচে কোনও কোম্পানির নাম ছাপা হচ্ছিল না। আজ দেখল, সেই একই বিজ্ঞাপন, শুধু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে আরও কয়েকটি লাইন: যদি আপনার ত্বক আরও মোলায়েম আরও মসৃণ হয়, যদি আপনার স্নানের পর সারাদিন ধরে গায়ে ফুরফুর করে জুঁইফুলের গন্ধ......

বিজ্ঞাপনটা পড়ে ভুরু দুটোয় অনেকক্ষণ কোঁচ পড়ে রইল সায়নের। কারা প্রতিদিন এই অ্যাডটা দিচ্ছে তা এখনও বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা হয়নি। অ্যাড-এজেন্সিও নতুন। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে তার, হয়তো কোনও সাবানের বিজ্ঞাপনই এটা।

ভাবনাটা তার মগজে চক্কর দিতেই হঠাৎ প্রবল একটা ধাক্কা খেল সে। হু-হু করে রক্তচাপ বেড়ে গেল যেন। তা হলে কি অন্য কোনও কোম্পানি প্যারাডাইসের আগেই তৈরি করে ফেলল জুঁইফুলের গন্ধভরা সাবান! তাইই যদি হয়, তবে তো ভীষণ সর্বনাশ হয়ে যাবে তাদের কোম্পানির। তা হলে তার এতদিনকার ল্যাবরেটরিতে না-ঘুম পরিশ্রম, তার আবিষ্কৃত ফর্মুলা সবই ব্যর্থ, নিষ্ফল। এত্ত টাকা সে ইনভেস্ট করেছে এবার—

তবে কি তার ফর্মুলা কোনও ভাবে পাচার হয়ে গেছে অন্য কারও কাছে। হয়তো লাইম ইন্ডিয়ারই কেউ গোপন জেনে গেছে তার পরিশ্রমের ফল।

সহসা শরীরের ভেতর কি এক কাঁপুনি শুরু হল সায়নের। গার্গীর কাছে সে তো বড় মুখ করে বলছিল, দেখো, এ বার যা একখানা প্রোডাক্ট বাজারে ছাড়ছি—

চা খেতে খেতে হঠাৎ আড়চোখে একবার গার্গীর দিকে তাকাল সে। গার্গী একমনে তাদের কোম্পানির লস অ্যান্ড প্রফিটের ব্যালান্স-শিটটা দেখছে। কালই নাকি চিফ অ্যাকাউন্টস্ অফিসারকে বলে সে তিন বছরের ব্যালান্স-শিট আনিয়ে নিয়েছে। সায়ন একবার ভাবল, বিষয়টি নিয়ে গার্গীর সঙ্গে আলোচনা করবে কি না। কিন্তু তাতে নিশ্চিত শক পাবে গার্গী।

খুবই অন্যমনস্কভাবে সেদিন ফ্যাক্টরি ঘুরে দুপুরবেলা অফিস পৌঁছেই মধুমন্তীকে ডেকে পাঠাল সায়ন, অ্যাটাচি খুলে সেদিনকার খবরের কাগজটা বার করে মেলে ধরল মধুমন্তীর সামনে, দেখুন তো মিসেস রায় মজুমদার, এটা কাদের বিজ্ঞাপন। যে অ্যাড-এজেন্সির নাম দেওয়া আছে বিজ্ঞাপনের নিচে ছোট্ট করে, সে এজেন্সি কাদের আপনি নিশ্চয় জানেন। এটা তো লাইম ইন্ডিয়ার বিজ্ঞাপনও নয়!

pathagar.net

মধুমন্তী হঠাৎ মুচকি-মুচকি হাসতে লাগল সায়নের দিকে তাকিয়ে। তার হাসির রকম দেখে হঠাৎ খুবই রাগ হয়ে গেল সায়নের। ভদ্রমহিলা কয়েকদিন ধরে যেন অতিরিক্ত প্রগলভতা দেখাচ্ছেন তার ঘরে এসে। আজও একটা থ্রি কোয়ার্টার ব্লাউজ পরে এসেছেন। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। কথায় কথায় শুধু হেসে উঠছেন।

হাসতে হাসতেই বললেন মধুমন্তী, স্যর, আপনি কিছু জানেন না?

সায়ন আশ্চর্য হয়ে বলল, না—

—স্যর এটা তো আমাদেরই ফ্যাক্টরিতে, তারই।

—সে কি, সাতদিন ধরে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে, অথচ আমিই জানলাম না। তা ছাড়া, সাবানে যে জুঁইফুলের গন্ধ মেশানো হচ্ছে, সেটা তো মাত্র কালই ফ্যাক্টরিতে জানাজানি হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা আমি স্ট্রিক্টলি কনফিডেন্সিয়াল রেখেছিলাম—। আপনি কখন সে খবর জোগাড় করে কাগজে অ্যাড দিলেন?

—স্যর, আর কেউ না জানলেও আমাদের এম. ডি তো জানেন। তিনিই তো সাতদিন ধরে এই বিজ্ঞাপন বেরোবে এমন প্ল্যানিং করেছেন। এমনকি এ বারের বিজ্ঞাপনের কপিও তাঁর নিজের হাতে করা। এই যে, আপনার বয়স যদি হঠাৎ—

—স্ট্রেঞ্জ, সায়নের চোখের পলক পড়ছে না। গার্গী তা হলে ব্যাপারটা তার কাছেও চেপে গিয়েছে! তার অগোচরে মধুমন্তীকে দিয়ে এত কাণ্ড করিয়েছে! তাইই মধুমন্তী এ কদিন ধরে খুব এনজয় করছে ব্যাপারটা!

মধুমন্তী আবার বললেন আরও আছে স্যর। কাল এই বিজ্ঞাপনটাই আবার রিপিট হবে। আমাদের কোম্পানির নাম না দিয়েই। কেবল পরশু বেরোবে এর সঙ্গে আর এক লাইন : মসৃণ ত্বকের জন্য নতুন সাবান : জেসমিন ফ্লেভার সোপ। এই দেখুন স্যর, লে-আউট।

সায়ন থমমত খেয়ে গেল, নতুন সাবানের নামও তো সে কারও কাছে প্রকাশ করেনি। একমাত্র গার্গীর কাছে ছাড়া। অথচ সেই সাবানের নাম দিয়ে বিজ্ঞাপনের লে-আউট পর্যন্ত তৈরি হয়ে গিয়েছে!

—স্যর এ বারের বিজ্ঞাপনের ক্যাপসন কিন্তু দারুণ হয়েছে। কারা বিজ্ঞাপনটা দিচ্ছে কেউ জানে না, অথচ সর্বত্র এক মজার আলোচনা হচ্ছে। যদি বয়স সত্যিই কমে যায় তা হলে কে কী করবে। এমনকি আমাদের অফিসের এক টাইপিস্ট বলছে, যদি বয়সটা কমে যেত, তা হলে সে আর একবার পি. এস. সি-তে কমপিট করে ক্লার্ক হওয়ার চেষ্টা করত, যাতে আর টাইপ না করতে হয় তাকে। আবার একজন বলছে, বয়স কমে গেলে সে ফুটবলার হওয়ার চেষ্টা করত। এমনকি অ্যাকাউন্টস সেকশনের বয়স্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট হরিগোপালবাবু বলছেন,বছর পনেরো বয়স কমে গেলে আমি অন্য কোনও একটা মেয়েকে বিয়ে করতাম। আমার এই বউটা একদম বাজে, বলতে বলতে হেসে উঠল মধুমন্তী, অথচ কেউ কিন্তু জানে না এটা আমাদের কোম্পানির বিজ্ঞাপন। সিক্রেসি বজায় রাখার জন্য আমরা অ্যাড-এজেন্সি পর্যন্ত বদলে ফেলেছি এবার।

শুনতে শুনতে অবাক হল সায়ন। মুগ্ধ, উল্লসিতও হল। গার্গী তা হলে সবার অগোচরে এমন অদ্ভুত সব প্ল্যানিং করেছে! সায়নের সঙ্গে কোনও রকম পরামর্শ না করেই। সারপ্রাইজিং তো!

সেদিন বিকেলের দিকে তার চেম্বারে একলাটি বসে আছে, হঠাৎই তার কাছে একজন অচেনা লোক একটা চিঠি দিয়ে গেল। সিল করা ব্রাউন রঙের খাম। সায়ন চিঠিটা খুলতেই

pathagar.net

বেশ আশ্চর্য, স্তম্ভিতও। কৌশিক দত্তের রেজিগনেশন লেটার। তাতে লেখা, আপনার কোম্পানিতে কাজ করে কোনও দিনই জব স্যাটিশফেকশন পাইনি। কোম্পানির সব প্রোডাক্টেরই এ বি সি থেকে জেড পর্যন্ত আপনার নিজের হাতে তৈরি। প্রোডাকশন ম্যানেজারের কোনও রোলই নেই তার মধ্যে। শুধু অন্যের ফর্মুলা ইমপ্লিমেন্ট করতে কারই বা পছন্দ হয় বা ভাল লাগে। নিজের সৃষ্টির রূপায়ণও তো দেখতে ইচ্ছে হয়। তাইই

চিঠিটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে বসে রইল সায়ন। এ রকম একটা আশঙ্কা সে একেবারে না করেনি তা নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হল অভাবিত। হঠাৎ কৌশিক দত্ত চলে গেলে খুবই অসুবিধে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের চূড়ান্ত রহস্যটুকু সায়নের হাতে থাকলেও, কৌশিক দত্ত এই কোম্পানির অনেক কিছুই জানে, অনেক ফর্মুলা, গোপন তথ্য। এ হেন সংকটময় মুহূর্তে তার চলে যাওয়ার পেছনে কি কোনও উদ্দেশ্য আছে?

সকালে অভ্যাসমতো ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে হঠাৎ খাটের তলায় এক দুরূহ কোণ থেকে একটুকরো পাথর উঠে এল গার্গীর হাতে। বেগুনি রঙের একখণ্ড স্ফটিক, স্বচ্ছ ও ঝকঝকে, হাতের তেলোয় রেখে উঠে দাঁড়াতেই সকালের চিকন রোদ লেগে ঝলমল করে উঠল। প্রাপ্তিটি চমৎকার, কিন্তু গার্গী ভেবেই পেল না এহেন একটি স্ফটিকখণ্ড কেনই বা পড়েছিল খাটের নিচে, কার এটা, সবার নজর এড়িয়ে কতদিন ধরে পড়ে আছে। জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেই অবশ্য মনে হল, কোনও আঁটিতে সেট করে আঙুলে পরলে ভারি সুন্দর দেখাবে।

তাহলে কি রুক্কা অর্থাৎ ঐন্দ্রিলার কোনও আংটি থেকে খুলে পড়ে গিয়েছিল কখনও, আর খুঁজে পায়নি! না কি সায়নের? ভাবতে ভাবতে সহসা তার স্মৃতিতে ঝলক দিয়ে উঠল, ঠিক এই রূপের পাথর সেট-করা দুল সে কারও কানে দেখেছে গত দু-তিনদিনের মধ্যে। কিন্তু কার কানে তা মনে পড়ল না এই মুহূর্তে। আংটি নয়, কানের দুলেই ভাল মানাবে স্ফটিকখণ্ডটি। এরকম মনে হতেই পরক্ষণে ভাবল, ঐন্দ্রিলার যে এরকম কোনও পাথর-বসানো দুল ছিল না সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত। ঐন্দ্রিলার সমস্ত শাড়ি, গহনাগাটি, যা যা আছে তার, তা গার্গী মোটামুটি সবই জানে। ঐন্দ্রিলাই দেখিয়েছে বা শুনিয়েছে কতবার। নতুন কোনও গহনা তৈরি করালে গার্গীকেই আগে ডেকে দেখাত, এই দ্যাখ, মিতুন—

কিন্তু পাথরটা যদি ঐন্দ্রিলার না হয়ে থাকে, তা হলে কার! অন্য কারও হয়ে থাকলে তা এ ফ্ল্যাটের খাটের নিচে পড়ে রইল কী করে! তবে কি কারও কানের দুল থেকে ছিটকে পড়ে গেছে এটা? তাহলে কেনই বা খোঁজেনি কেউ? নাকি খুঁজেও পায়নি! অথবা খোঁজার সময়ই পায়নি?

শেষ বাক্যটি মাথায় চলকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বিশ্বরূপ দর্শন হল গার্গীর। পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল তাকে বলেছিলেন, কোনও মহিলা জড়িত আছেন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে, তার প্রমাণ হিসেবে অ্যাশট্রের ভেতর পাওয়া আধপোড়া লেডিজ সিগারেটের কথা বলেছিলেন সেদিন। এই মুহূর্তে গার্গীরও মনে হল, দেবাদ্রি সান্যালের কথাই বোধ হয় ঠিক, আর তাইই এই বেগুনিরঙের পাথরটি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম ক্লু হিসেবে এতদিন সবার

অগোচরে জিরোচ্ছিল খাটের নিচে, ঝুম হয়ে বসেছিল পেছনের পায়ার কোণ ঘেঁসে। পাথরটি নিশ্চয় ছিটকে পড়েছিল সেই মহিলার কানের দুল থেকে। হয়তো হত্যাকাণ্ডের পূর্বমুহূর্তে ঐন্দ্রিলা, যত নরমসরম মেয়েই সে হোক না কেন, কিছু প্রতিরোধ নিশ্চই সৃষ্টি করেছিল বা অন্তত করতে চেষ্টা করেছিল, হয়তো সে সময়েই ধস্তাধস্তিতে বা কোনও কারণে কানের দুল থেকে এই মধুর বিচ্যুতিটুকু বিশ্বস্ত প্রমাণ হিসেবে ধরা দিয়েছে গার্গীর কাছে। উল্লসিত হল, কিছুটা স্বস্তিও যেন।

কিন্তু বেগুনিরঙের স্বচ্ছ ছকোনা এই স্ফটিক খণ্ডটি তাহলে কার!

খুবই অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ কুড়িয়ে-পাওয়া পাথরটি কাগজের মোড়কে যত্ন করে ভরে আলমারির এক গোপন আস্তানায় রেখে দিল সে। পরে সুবিধেমতো সময়ে কাজে লাগানো যাবে। আপাতত সকালের এই ব্যস্তসমস্ত মুহূর্তে তার সামনে আরও দু' লক্ষ কাজ।

ঐন্দ্রিলা কাজের লোক রাখেনি বলে গার্গী প্রথমে বলেছিল, থাক, আমারও দরকার নেই। তখন অবশ্য তার ঘাড়ে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের মতো একটা ভারী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দায়িত্ব চাপেনি। এখন বুঝতে পারছে ঘরসংসারের হাজারো ঝামেলা চুকিয়ে সাড়ে নটার মধ্যে অফিসে বেরোনো কী দুঃসাধ্য কাজ। আজ অবশ্য বেরোবে দশটায়, প্রথমে ফ্যাক্টরিতে যাবে। তবু ঘড়ি কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে কিচেনে ঢুকে পড়ল ত্রাস্তপায়ে। কিচেন থেকে পাশের ফ্ল্যাটের অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যায়। প্রায়ই চোখে পড়ে একজোড়া চোখ কী গভীর সন্ধিৎসায় সর্বদা অনুসরণ করছে তাকে। সে দৃশ্যে কখনও গা ছমছম করে ওঠে তার। কখনও মনে হয় ওই চোখজোড়ার রহস্য আবিষ্কার করতে পারলেই হয়তো ধরা পড়ে যাবে ঐন্দ্রিলার হত্যাকারী। কিন্তু সে অমনভাবে সর্বক্ষণ নজর রাখছে তার ওপর! চন্দ্রাদেবী! হিমন, না কি রবার্ট ও'নীল? না কি অন্য কেউ?

রবার্ট ও'নীল ছাড়াও আরও বহু মানুষের আনাগোনা সে দেখতে পায় পাশের ফ্ল্যাটে। চন্দ্রদেবীর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাই বেশি। বান্ধবীও আসেন কেউ-কেউ। সর্বক্ষণ গমগম করছে ঘর। কখনও রবার্ট সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কোনও রূপসী তরুণীকে। চন্দ্রীদেবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, জরুরি পরামর্শও সেরে, কখনও চায়ের কাপে ঠোঁট ডুবোতে ডুবোতে হা হা করে হেসে উঠে, চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে আবার ফিরে যান তাঁর নীল মারুতিতে চড়ে। কয়েকদিন আগে গার্গীদের ফ্ল্যাটে খবর এসেছিল, একজন জাঁদরেল ল ইয়ার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন রবার্ট, সায়নকে একবার যেতে হবে ওঁদের ফ্ল্যাটে। সায়ন অবশ্য গিয়েওছিল। কী কথা হয়েছিল তা আর শোনা হয়নি গার্গীর। সায়নও বলেনি।

রাঁধতে রাঁধতে হঠাৎ গার্গীর চোখও আজকাল প্রায়ই অনুসরণ করে পাশের ফ্ল্যাটের কার্যকলাপ। কাল সে দেখেছিল, দুটো চোখ একটা জাফরির ভেতর নিয়ে নজর রাখছে তার ওপর। সে তৎক্ষণাৎ রান্না ফেলে দ্রুত এসে দাঁড়িয়েছিল ব্যালকনিতে। চোখজোড়া অমনি সরে গিয়েছিল, যেন তার তাড়া খেয়ে লুকিয়েছিল নিজেকে। কয়েকদিন ধরে খুবই রহস্যময় লাগছে ব্যাপারটা। একবার ভেবেছিল, সে নিজেই চলে যাবে পাশের ফ্ল্যাটে। গিয়ে দেখবে, আসল ব্যাপারটা কী। কিন্তু পরে নিবৃত্ত করেছিল তার এই উপচে ওঠা কৌতূহল। এখনও সময় হয়নি, আরও পরে, তার এই অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করবে। আরও একটু গড়াতে দিতে হবে ব্যাপারটা।

আজ কিন্তু সেই চোখ দুটো আর দেখা যাচ্ছে না, হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, সে যেমন অনুসরণ করছে গার্গীকে, গার্গীও তাকে অনুসরণ করে চলেছে অলক্ষ্যে, বড় তীব্রভাবে।

pathagar.net

তবে সুখের কথা, কয়েকদিন যাবৎ পুলিশের নজরদারি থেকে কিছুটা রেহাই পেয়েছে তারা। সাংবাদিকদের হাত থেকেও। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে হচ্ছে তাদের বিয়েটাই আপাতত জল ঢেলে দিয়েছে পুলিশ, সাংবাদিক ও আপামর জনগণের অপার কৌতূহলের আঁচে। পুলিশ হয়তো ব্যস্ত তাদের চার্জশিট তৈরি করতে। সাংবাদিকরাও তাদের নিস্তরঙ্গ বিবাহিত জীবনে আর কোনও উত্তেজনার আগুন আবিষ্কার করতে না পেরে ছোটাছুটি করছে অন্য সংবাদের পেছনে। অতএব আপাতত তাদের সামনে কিছুটা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন, যদিও অফিস নিয়ে, বেশ একটা টেনশন রয়েই গেছে। সে তো প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস, থাকবেই।

সায়ন আগেই বেরিয়ে যাচ্ছে আজকাল। গার্গী একটু পরে। আজও সে তৈরি হয়ে দরজায় লক করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল তরতর করে, হঠাৎ মুখোমুখি হল চন্দ্রদেবীর। লন পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে দ্রুত পদক্ষেপে আসছিলেন চন্দ্রাদেবী। পেছনে রবার্ট ও'নীল। এর আগেও চন্দ্রদেবীর মুখোমুখি এভাবে হয়নি তা নয়, তবে আজ চন্দ্রাদেবীর মুখের দিকে তাকাতেই গার্গী কেমন যেন চমকে উঠল। কেমন হিংস্র, খরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন চন্দ্রাদেবী। সে তীব্র চাউনি এমনই প্রখর যেন পারলে তাকে ভস্ম করে দেবেন। বেশ ঝলমলে একটা সিল্কের শাড়ি পরেছেন, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, এই বয়সেও চন্দ্রা প্রায় তরুণীর সাজ পছন্দ করেন, কিন্তু চাউনিতে, চলনে বলনে, ভঙ্গিমায় এক ভয়ঙ্কর জাহাঁবাজ মহিলা, তাঁকে দেখে গার্গীর বুকের ভেতর একধরনের ভীরু কাঁপন। ঐন্দ্রিলার কাছেও সে শুনেছিল, তার দিকেও এভাবে বিষদৃষ্টিতে তাকাতেন মহিলা। ঐন্দ্রিলা বলত, বুঝলি, এক সংসারে থাকলে কী যে হাল হত আমার!

এক সংসারে না থেকেও ঐন্দ্রিলার হাল যে কী হয়েছে তা তো দেখতেই পেয়েছে সবাই। দীয়াও বিপদ বুঝে পালিয়ে নিস্তার পেয়েছে। তাহলে কি চন্দ্রাদেবীই—

পেছনেই রবার্ট ও'নীল ছিলেন, গার্গীর দিকে নজর পড়তেই একঝলক হাসলেন যেন। হাসিতে একধরনের স্বর্গীয় দীপ্তিই যেন বা। গার্গীও তার মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসি ফুটলই না যেন। শুধু চন্দ্রাদেবীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হল গরম ছ্যাঁকা লাগল গায়ে। শিরশির করে উঠল তার শরীর।

গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। তার ড্রাইভারের নামটি ভারি অদ্ভুত, ফুট্টুস। নামের মতোই তার চেহারাটি ছোটখাটো, কিন্তু বেশ শক্তপোক্ত গড়ন। প্রতিদিন সে টায়েটায়ে সাড়ে নটায় এসে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে হর্ন দেয়। আজ অবশ্য দশটায় আসার কথা ছিল। গার্গীকে দেখে চট করে স্টিয়ারিং ছেড়ে নেমে খুলে ধরল পেছনের দরজা।

গাড়ির ভেতর নিজেকে বিন্যস্ত করতে করতে গার্গীর মাথায় চন্দ্রাদেবী আর রবার্টের ভাবনাই ভিড় করে রইল। দুজনে এই সাতসকালে কোথায় বেরিয়েছিলেন! এই পড়ন্ত বয়সেও দুজনের ভেতর কী করে এতখানি ভাব থাকে!

এমন নানান ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকতে থাকতে সে একসময়ে এসে পৌঁছাল ফ্যাক্টরিতে। দেখল, খুবই ব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে সায়ন। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সাবানগুলি প্যাকিং হচ্ছে একটা বড় শেডের নিচে। রোজবেরির রং ছিল গোলাপি। নতুন প্রোডাক্ট জেসমিন ফ্লেভারের রং ধবধবে সাদা। জুঁইফুলের মতো রং, জুঁইফুলের মতো গন্ধ। সাদা ডিম্বাকৃতি সাবানের মাঝখানে লেখা : জেসমিন ফ্লেভার। ইচ্ছে করেই এবার প্যারাডাইসের নাম লেখা হয়নি সাবানের গায়ে। তবে মোড়কের উপর এক জায়গায় অন্যরকম লেটারিঙে ছোট্ট করে লেখা আছে : প্যারাডাইস প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড। গার্গীরই প্রস্তাব ছিল এরকম।

pathagar.net

সায়ন তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করেছিল তার প্রস্তাব, ইয়েস, অ্যাজ প্রোপোজ্‌ড্‌। নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর যেমন ভেবেছেন, তাই হবে।

তারপর হেসেছিল গার্গীর দিকে তাকিয়ে, জেসমিন ফ্লেভারের অনেক কিছুই তো তোমার। বিজ্ঞাপন, প্যাকিং, মার্কেটিং। জেসমিন ফ্লেবার যদি মার্কেট ধরে ফেলে, তা তোমারই কৃতিত্বে।

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করেছিল গার্গী, ফর্মুলা বেরোল তোমার মাথা থেকে, আর কৃতিত্ব হবে আমার?

দুজনের ঝগড়া এভাবে চলেছিল কিছুক্ষণ। ঝগড়া, না কি পারস্পরিক কমপ্লিমেন্ট!

আজ ফ্যাক্টরিতে পৌঁছেই চারপাশে বিপুল তৎপরতা দেখে কিছুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে রইল গার্গী। প্যাকিং কমপ্লিট হলে সাবানগুলো ভরা হচ্ছে মোটা পিচবোর্ডের বাক্সে। বাক্স ভর্তি হলে পরক্ষণেই তা চলে যাচ্ছে ট্রাকে লোড হবে বলে।

সায়নের মুখে তখন উপছে পড়ছে এক স্বর্গীয় দীপ্তি। বারবার ঘুরে ঘুরে দেখছে বিভিন্ন সেকশনের কর্মকুশলতা। বোধ হয় এরই নাম সৃষ্টির আনন্দ। এক-একটি সোপকেক প্রায় একটি সন্তানের মতোই। নিজস্ব ফমুর্লায় তৈরি নতুন রঙের নতুন গন্ধের সাবান। মোড়কে ভরা হয়ে গেলে হেসে উঠছে ঝকমকে চেহারায়। কয়েকদিনের মধ্যেই এই হাজার হাজার মোড়ক ট্রাকে ট্রাকে ছড়িয়ে পড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। অন্য কয়েকটি রাজ্যেও। সেখান থেকে চলে যাবে গৃহস্থের ঘরে। সবাই ঝলমলে চেহারায় মোড়কটি হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলবে, বাহ্‌, দারুণ তো সাবানটা, কী সুন্দর জুঁইফুলের গন্ধ! নতুন বেরোল বুঝি? কেউ বা বাথরুমে ফেনা তুলে গায়ে মাখতে মাখতে ভাববে, যদি আপনার বয়স পাঁচ, দশ কিংবা পনেরো বছর কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে—

সায়নের খুশিতে উমসুম মুখের দিকে তাকিয়ে গার্গী দেখল, তার বয়সও যেন এক ঝটকায় অনেকখানি কমে গেছে নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে গত কয়েকদিন তার টেনশনের শেষ ছিল না। কেবলই ভাবনা, যদি আবার কোনও স্যাবোটেজ হয়! বাধা পড়ে যায় কোনওভাবে।

তবু যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছে জেলায় জেলায়, অন্য রাজ্যে, ততক্ষণ চিন্তা একটা থেকেই যাবে। অবশ্য যে-কোন ব্যবসায়ে এ ধরনের চিন্তা, টেনশন, আশঙ্কা তো সর্বক্ষণের সঙ্গী। আর চিন্তা থাকে বলেই তো তার সাফল্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করা যায় এভাবে।

প্যাকিংয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমনি অবস্থায় দুজনে ফ্যাক্টরি থেকে বেরিয়ে চলে এল অফিসে। এখন অনেক কাজ গার্গীর। কাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রকে বলে রেখেছিল, একটা মিটিং ডাকবেন তো, মিঃ মিত্র। সব সেলস সুপারভাইজারদের নিয়ে। বেলা চারটেয়। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময় তার চেম্বার ভরিয়ে দিলেন রোহিতাশ্ব মিত্র। সেল সুপারভাইজারদের নিয়ে বসে গার্গী পরিষ্কার একটা ছক তৈরি করে দিল ঘন্টাখানেকের মধ্যে। কাল ভোরে উঠে সবাই একযোগে ছড়িয়ে যাবে জেলায় জেলায়, যোগাযোগ করবে ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে। বড় বড় এজেন্ট, হোলসেলারদের সঙ্গে। ইতিমধ্যে ট্রাকে ট্রাকে ভর্তি হয়ে হাজার হাজার জেসমিন ফ্লেভার পৌঁছে যাবে স্টকিং এজেন্টদের গোডাউনে। দু-তিনটে রাজ্য জুড়ে তুমুল গতিতে চলবে সেলস ক্যাম্পেন।

মিটিং শেষ হতেই অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার মধুমন্তী রায় মজুমদার ঢুকলেন একগোছা পোস্টার, প্যাম্পলেট নিয়ে। ভাল একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্টকে দিয়ে চমৎকার কয়েকটা ডিজাইন করানো হয়েছে এবার। সেগুলো গার্গীর সামনে মেলে ধরতেই চমৎকৃত হল সে।

pathagar.net

তাতে বড় করে দু-দুটো জেসমিন ফ্লেভারের ছবি আঁকা, দুধ-সাদা রঙের, পাশেই খোলা মোড়ক, তাতে জুঁইফুলের ছবি। প্যাম্পলেট, পোস্টারগুলো দোকানের দরজায় সেঁটে দেওয়া হবে। কোথাও বা দড়ি টাঙিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে শক্ত কাগজের উপর ছাপানো প্যাম্পলেটগুলো। সব মিলিয়ে কদিন শুধু জেসমিন ফ্লেভারের জয়জয়কার। তারপর কয়েকদিন টেনশন নিয়ে অপেক্ষা করা, জেসমিন ফ্লেভার বাজারে ক্লিক করল কি করল না। সে এক টানটান অপেক্ষার দিন।

মধুমন্তীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎই প্রবলভাবে চমকে উঠল গার্গী। বুকের ভেতর ছলাৎ করে উঠল একঝলক রক্তের ঢেউ। মধুমন্তীর কানেই তো দুলছে বেগুনিরঙের পাথর-বসানো চমৎকার দুটো দুল। সকাল থেকে সে মনেই করতে পারছিল না কার কানে এরকম দুল দুলছে। দেখতে দেখতে তার নজরে পড়ল মধুমন্তীর আঙুলেও বেগুনিরঙের পাথর-বসানো আংটি। তার মানে ম্যাচিং করিয়ে তৈরি করেছে এ দুটো। রোজকার মতো আজও বেশ সুন্দর করে সেজেছে মধুমন্তী। সায়নও সেদিন বলেছিল, মধুমন্তী আগে এমন সাজত না। আজকাল খুব সাজে পেয়েছে তাকে।

অন্যমনস্কভাবেই গার্গী জিজ্ঞাসা করে বসল, বেশ রং মিলিয়ে দুল আংটি পরেছেন তো, মিসেস রায় মজুমদার। নতুন গড়ালেন নাকি এগুলো?

মধুমন্তী প্রথমটায় বেশ অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ তাদের এম ডি অফিসের কাজের কথা ছেড়ে গয়নার গল্প করতে বসলেন তার সঙ্গে! হেসে উত্তর দিলেন, না, অনেকদিনের। তবে পাথরগুলো বদলে ফেললাম হঠাৎ।

গার্গীর মুখ থেকে তার অজান্তেই বেরিয়ে পড়ল, তাই নাকি। কেন বলুন তো?

বোধ হয় কথাগুলো একটু জোরেই বেরিয়ে এসেছিল গার্গীর মুখ থেকে। আরও বিস্মিত হয়ে মধুমন্তী জবাব দিল, এমনিই। তারপর হেসে ফেলে বলল, পুরানো অনেককিছুই বদলে ফেলছি আস্তে আস্তে। হয়তো আরও বদলাব।

মধুমন্তীর কথাগুলো কেমন হেঁয়ালির মতো লাগল। কেন যেন হঠাৎ দুর্বোধ্য মনে হল তাদের অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের চাউনি, হাবভাব, হাসিও। তার দুলে বেগুনিরঙের পাথর, তাও সম্প্রতি বদলেছে, তার সঙ্গে তার সেদিনকার সিগারেট খাওয়ার দৃশ্য— সব মিলিয়ে কীসের যেন একটা সঙ্কেত দিয়ে গেল গার্গীর ভেতর।

সেদিন রৌণক মুখার্জির ইন্টারভিউ নিতে গিয়েও একবার প্রবল ধাক্কা খেয়ে ফিরে এসেছে। কেন যেন তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সেদিন তাকে বলেছিল, রৌণক মুখার্জির সঙ্গে দেখা হলেই একটা অমোঘ ক্লু হাজির হবে তার সামনে। গার্গী চৌধুরী থেকে হঠাৎ মিতুন মুখার্জি হতে গিয়ে তাই সামান্য বলতে ফেলেছিল তার চেহারা, সাজ। শাড়ির বলদে সালোয়ার কামিজ, সিঁথির ভেতর লুকিয়ে ফেলেছিল সিঁদুরচিহ্নটুকু, হেয়ারস্টাইল বদলে হঠাৎ ববড্ করে নিয়েছিল চিরুনির সামান্য কারসাজিতে, তার সঙ্গে চোখে এমন চশমা যার কাচে সামান্য আলো-আঁধারি ভাব, তাতে চোখ দুটো তেমন স্পষ্ট হয় না বাইরে থেকে। এমন অদ্ভুত প্রায়-ছদ্মবেশে সেদিন গিয়েছিল রৌণক মুখার্জির সাক্ষাৎকার নিতে। কিন্তু সৌভাগ্যই হোক, অথবা দুর্ভাগ্যই, একঘন্টা বসেও দেখা পায়নি তাঁর। তবে তাঁর চেম্বারে একা বসে থাকতে চকিতে ডেস্ক-ক্যালেন্ডারের পৃষ্ঠা উলটে পাঁচই এপ্রিলের দিনটিতে চোখ পড়তেই চমকে উঠেছিল। সেখানে লেখা ? টু মিট রুঙ্কা অ্যাট সেভেন থার্টি। সেদিন বেকেলেই টেলিফোনে তাই প্রায় লিডিং কোশ্চেনের মতো রৌণক মুখার্জিকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন গিযেছিলেন ঐন্দ্রিলার সঙ্গে দেখা করতে? সে

জিজ্ঞাসায় এমন আকস্মিকতা ছিল যে, 'না, যাইনি' না বলে কাঁপা গলায় রৌণক বলেছিলেন, আপনি কী করে জানলেন?

সেদিন রিসিভার রেখে দেওয়ার বহুক্ষণ পর পর্যন্ত গার্গী নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভেবেছিল, তাহলে রৌণক মুখার্জিই! যদি তাই-ই হবে,তবে সেদিন তাঁর সঙ্গে কোনও মহিলা কি ছিলেন? তাহলে কে সেই মহিলা, যিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সহযোগী হয়েছিলেন রৌণকের। তিনি কি সেই মেয়েটিই, যে রৌণকের প্রেমিকা ছিল, পরে স্ত্রী হয়েছে, যাকে ভালবাসত বলেই রৌণক সেসময়ে উপেক্ষা করেছিল ঐন্দ্রিলাকে! কিন্তু হঠাৎ এই মুহূর্তে গার্গীর মনে হল, হয়তো সেই মেয়েটি না, মধুমন্তীই সেই মহিলা। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানির দুই অ্যাডভার্টাজিং ম্যানেজারের মধ্যে হয়তো এমন কোনও যোগসাজশ আছে, এমন কোনও কার্যকারণও, যার পরিণামে ঐন্দ্রিলাকে—

রৌণক মুখার্জির কথা এখনও ঘুণাক্ষরেও সায়নের কাছে বলেনি গার্গী। সায়ন হয়তো কষ্ট পাবে এমন আশঙ্কা করেই। পরে সময় হলে সব কথা খুলে বলতে হবে। সব প্রমাণ হাতে এসে গেলে। তখন না বলে উপায়ই বা কী।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথেও এইসব কূট ভাবনাগুলো মাথার ভেতর ঘুলিয়ে উঠছিল গার্গীর। হঠাৎ একটা বাস স্টপের কাছে কী যেন দেখতে পেয়ে চমকে উঠে ফুট্রুসকে বলল, একটু দাঁড়াও তো—

গাড়ি ক্যাঁচ করে থেমে গেল বাস স্টপের কাছে। গার্গী মুখ বাড়িয়ে বলল, তুমি এখানে?

খুব অবাক হয়েছে দীয়াও, ম্লান হেসে বলল, একটা দরকারে এসেছিলাম। বাড়ি ফিরব, তাই বাসের জন্য দাঁড়িয়ে—

জায়গাটা ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়। বাড়ি বলতে দীয়া কোন বাড়ি বলছে তা বুঝে উঠতে পারল না গার্গী। বলল, কোনদিকে যাবে তুমি?

—যাদবপুর।

—ঠিক আছে, উঠে এসো। তেমার আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

দীয়া সজোরে ঘাড় নাড়ল, না, না। বাস এসে যাবে এক্ষুনি—

গার্গী হাসল, না হয় ওদের বাড়ির ওপর রাগ আছে, তাই বলে আমার ওপরও কি তোমার রাগ?

দীয়ার আর না করার কোনও উপায় রইল না। গার্গী দরজা খুলে দিতেই এসে বসল তার পাশে।

—এখানে কোথায়?

ইতস্তত করে দীয়া বলল, একটা চাকরির সন্ধানে আছি। একজন বলেছিল দেখা করতে।

—তাই!

দেশপ্রিয় পার্ক পার হয়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরল ওরা। ঢাকুরিয়া ব্রিজ পার হয়ে কিছুক্ষণ হু হু করে যেতেই যাদবপুর এইট বি স্ট্যান্ড। তৎক্ষণাৎ দীয়া বলল, এখানেই নামব।

— কেন, এখানে কেন? বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। দীয়ার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও গার্গী তার গাড়ি ঢুকিয়ে দিল সেন্ট্রাল রোডে। দীয়া বোধহয় কিছুতেই চাইছিল না গার্গী তার বাড়িতে যাক। কিন্তু গার্গীর ভারি কৌতূহল হচ্ছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে এসে কেমন আছে দীয়া। সে অবশ্য খুব একটা সুখে নেই তা তার বিষণ্ণ চোখমুখ দেখেই বোঝা যায়।

সেন্ট্রাল রোড থেকে অনেকটা ভেতরে দেড়খানা ঘর নিয়ে থাকে দীয়া। মনে হল, একাই। বাইরের আধখানা ঘরে একটা লম্বা সোফা রাখার পর সেন্টার টেবিল সেট করার জায়গাই নেই। ঘরটা বেশ সাজানো-গোছানো। একদিকের দেওয়ালে পুরুলিয়া থেকে আনা ছো-নাচের মুখোশ। অন্যদিকের দেওয়ালে একটা পেইন্টিং, বেশ বড় আর চমৎকার।

—বোসো, আমি আসছি, বলে পর্দা সরিয়ে ভেতরের ঘুরে ঢুকে গেল দীয়া। এক মুহূর্ত পর্দা সরে যেতেই গার্গী দেখল, ভেতরের ঘরটা বেশ বড়ই, একটা ডাবল-বেডেড খাট। খাটের উপরে দামি বেডকভার। পর্দার সঙ্গে রং মিলিয়ে ঘরটা বেশ ঝকঝকেও। গার্গী তারিফ করল, দীয়ার বেশ রুচিজ্ঞান আছে। কিন্তু—, চারপাশে একটু নজর চালাতেই গার্গীর হঠাৎ মনে হল, দীয়ার এখানে আর কেউ যেন আসে। সম্ভবত একজন পুরুষই। সোফার পাশে ছোট্ট একটা টুল। তার ওপর একটা অ্যাশট্রে। তার ভেতরে সিগারেটের ছাই, টুকরো সিগারেটও। অদ্ভুত কাণ্ড তো! কে আসে দীয়ার বাড়িতে? ডবল-বেডেড খাট কেন?

একটু পরেই একটা ঢিলেঢালা ম্যাক্সি পরে দীয়া ও ঘরে ঢুকতেই যে কৌতূহলটা অনেকক্ষণ ধরে গার্গীর মনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, সেটাই বলে ফেলল শেষপর্যন্ত, ঠিক কী হয়েছিল বলো তো ও বাড়িতে? হঠাৎ চলে আসতে হল কেন তোমাকে? একটা ব্যাপার অবশ্য বুঝতে পারছি, এরকম জাঁদরেল শাশুড়ি থাকলে সে বাড়িতে থাকা খুবই মুশকিল। তবু শাশুড়িই তো সব নয়—

হঠাৎ দীয়ার মুখের চেহারা বদলে গেল, চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল, বলল, উফ, ওরা কী ডেঞ্জারাস, তুমি জানো না।

গার্গী লক্ষ করছিল দীয়ার পরিবর্তন, সে তো শাশুড়ি সম্পর্কে না হয় বলা যায়, কিন্তু হিমন, তোমার হাজব্যান্ড?

দীয়া যেন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল, না, সে কথা বলা যাবে না—

গার্গী অবাক হয়ে বলল, কী বলা যাবে না?

—হি ইজ—

দীয়া থেমে যেতে গার্গী আরও বিস্মিত হয়, বলল, দেখে একটু মর্বিড মনে হয় ওকে। কিংবা একটু ইমম্যাচিওরড।

—শুধু তাই?

—বুঝলে দীয়া, কারও মা যদি ছোট থেকে ছেলের উপর বেশি ডমিনেট করে, তাহলে এরকমটা হয়। এ ক্ষেত্রে তোমার উচিত ছিল প্রব্লেমটাকে অন্যভাবে ট্যাকল করা—

দীয়া হঠাৎ চ্যাঁচিয়ে উঠল, হবে না, হবে না, হবে না, কোনওভাবেই কিছু করা যাবে না। হি ইজ— হি ইজ ইমপোটেন্ট। কথাটা এমন অতর্কিতে বলল দীয়া যে, দারুণ একটা শক খেল গার্গী। এতটা সে ভাবেনি হিমনকে দেখে। হিমনের চেহারা সায়নের মতোই লম্বাচওড়া, ওয়েল-বিল্ট। শুধু তফাত এই যে, সায়ন প্রচণ্ড স্মার্ট, কথাবার্তায় তুখোড়। প্রবল পার্সোন্যালিটির জন্য তার উপস্থিতিটাই কেমন পৌরুষময়। পাশাপাশি হিমন চুপচাপ, শান্ত, জড়ভরতের মতো ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে। ভাবতে ভাবতে আরও দু-একটা কথা বলে হঠাৎ উঠে পড়ল গার্গী, ঠিক আছে, আজ চলি।

বাড়ির গেটে পৌঁছে গাড়িটা ছেড়ে দিল। ফুটুসকে বলল, কাল বেলা দশটায় এসো—

আজকের ঘটনাটা তার ভুরুতে একটা কোঁচ ফেলেছিল। গেট খুলে সেরকম অন্যমনস্কভাবেই ঢুকতে যাচ্ছিল হনহন করে। গেটের মুখে দেখল, যথারীতি নীল মারুতিটা

pathagar.net

দাঁড়িয়ে। তার মনে রবার্ট ও'নীল এসেছেন রোজকার মতোই। সেদিন কয়েক মুহূর্ত কথা বলে মনে হয়েছিল লোকটা খারাপ নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে মনে পড়ে, লোকটা চন্দ্রাদেবীর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে, তার সঙ্গে একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে, তখনই রবার্ট ও'নীল সম্পর্কে একটা বিরক্তি এসে ভিড় করে মনের মধ্যে। কেমন একটা ইরিটেশন হয়।

গেট খুলে সিঁড়ির মুখে ঢুকতে না ঢুকতে হঠাৎই দুম করে লোডশেডিং। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে কলকাতার নিকষ অন্ধকার। অনেকক্ষণ আগেই সন্ধে পেরিয়ে গেছে। তাতে ওঠার সিঁড়িটাও ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না, আস্তে করে একবার ডাকল, মোহন, মোহন। কিন্তু সময়মতো মোহনও কাছাকাছি নেই। বাধ্য হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। পার্স হাতড়ে বার করল দরজার চাবিটা। দরজা খুলে সবে ভেতরে ঢুকেছে, হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে সজোরে জাপটে ধরল তাকে। এমন জোরে চেপে ধরেছে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

চারপাশে মিশ অন্ধকার, কিচ্ছুটি দেখা যাচ্ছে না কোনও দিকে, কেউ যেন ভুসোকালি ঢেলে দিয়েছে দুই চোখে। এ হেন পরিস্থিতিতে হঠাৎ পেছন থেকে কেউ এসে তাকে জড়িয়ে ধরতেই হৃৎপিণ্ড থেমে গেল গার্গীর। প্রবল আতঙ্কে চ্যাঁচিয়ে উঠতে চাইল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোল না এতটুকু, কেননা লোকটার এক হাত চেপে ধরেছে তার মুখ, অন্য হাতে শরীরটা বেড় দিয়ে ধরেছে, তাতে ঘাড়ের ওপর গরম নিঃশ্বাস পড়ছে তার। গার্গী এক ঝটকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চাইল লোকটাকে, কিন্তু প্রথম দফায় পারল না। বরং লোকটার মুখ থেকে কী যেন একটা গন্ধ ভেসে আসতেই তার শরীরের ভেতর বমি পাক দিয়ে উঠল।

ঝটকা খেয়ে লোকটা আরও জোরে চেপে ধরতে চাইল তাকে, তার ঠোঁট দুটো নেমে এসেছে গার্গীর ঘাড়ের কাছে, আর সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, তার হাতের ব্যাগটা ধরে টানাটানি করছে লোকটা।

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, কী চায় লোকটা। তার ব্যাগটা! তার ব্যাগটাই নিতে চাইছে, নাকি মেরেই ফেলবে বলে জড়িয়ে ধরেছে এমন দুর্দান্তভাবে, অথবা কোনও পাশবিক ইচ্ছেয়—

হঠাৎ গার্গী তার কনুই দিয়ে প্রবল একটা গোঁত্তা মারল লোকটার পাঁজরের নিচে। তাতে কোঁক করে একটা বিশ্রী শব্দ বেরোল তার মুখে থেকে। পরক্ষণেই গার্গী পা দিয়ে আর এক ধাক্কা। ক্যারাটের নিখুঁত কায়দায় মুহূর্তে কাবু করে ফেলল লোকটাকে। প্রায় ছিটকে পড়তে পড়তে কোনও ক্রমে লোকটা সামলে নিল নিজেকে, তারপর দুদ্দাড় শব্দ তুলে নেমে গেল নিচের দিকে। পালিয়ে বাঁচলই যেন বা।

ভয়ে তখনও থর থর করে কাঁপছে গার্গী। তার ঘাড়, গলা, মুখ, পিঠে তখনও জানান দিচ্ছে লোকটার অস্তিত্ব। শেষ মুহূর্তে বুঝতে পারছিল, তার মুখে ভর্তি দাড়ি গোঁফ, লোকটা তার ঘাড়ের কাছে মুখটা নামিয়ে নিয়ে এসেছিল বলে দাড়ি গোঁফের ঘষা লেগে জ্বালা করছে এখনও।

pathagar.net

গার্গী বুঝতে পারছে না, ঠিক কোথায় ওত পেতে বসেছিল লোকটা। সিঁড়ির নিচে, নাকি সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখেই। হঠাৎ লোডশেডিং হল বলেই এমন একটি চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেল তাকে আক্রমণ করার। কিন্তু লোকটা আসলে কে? ঐন্দ্রিলার মতো তাকেও খুন করার জন্য এসেছিল, নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করাই ছিল তার বাসনা? ব্যাগটা ধরে কেন টানাটানি করছিল তা ভেবেও বিস্ময় যাচ্ছিল না তার। কিন্তু সত্যিই কী দুঃসাহস লোকটার! ভাগ্যিস ক্যারাটের কিছু প্যাঁচপোঁচ জানা ছিল তার। তাই এ যাত্রা বেঁচে গেল মনে হচ্ছে। হঠাৎ সায়নের ওপর মনে মনে ভীষণ রাগ হয়ে গেল তার। এতটা রাত হয়ে গেল তবু এখনও বাড়ি ফেরেনি কেন! ফিরলে তো আর এরকম একটা অঘটন ঘটত না আজ। রোজই কি রাত করে ফিরতে হবে!

দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ফেলল সে। ভেতরে ঢুকে এমার্জেন্সি আলোর সুইচ হাতড়ে বেড়াচ্ছে অন্ধের মতো, ঠিক সে মুহূর্তেই আলো জ্বলে উঠল দপ্ করে। টিউব উদ্ভাসিত হতেই তার বুকে আবার ফিরে এল সাহস। একবার ভাবল, পলকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে দেখে আসে লোকটা এখনও সেখানে আছে কি না। পরমুহূর্তে মনে হল, নাঃ, লোকটা যে এখনও থাকবে না তা তো নিশ্চিতই। কোথায় জনারণ্যে মিশে গিয়েছে এতক্ষণে। যা গোঁত্তা খেয়েছে কটা।

কিছুক্ষণ সোফায় বসে দম নেওয়ার পর হঠাৎ কী মনে হতে গার্গী উঠে দাঁড়াল জানালার সামনে। পাশের ফ্ল্যাটের জানালাও খোলা, ভেতরে উমসুম উষ্ণতা ছড়িয়ে জ্বলছে অদ্ভুত নীলচে আলো। সেই স্বপ্ন স্বপ্ন আলোয় দেখতে পেল, মুখ জ্বলন্ত চুরুট নিয়ে ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন রবার্ট ও'নীল। কী যেন বলতে বলতে হাসছেন হা হা করে, আর কাঁধ ঝাঁকাচ্ছেন স্রাগের ভঙ্গিতে। ঘরের এককোণে হাসি হাসি মুখে সোফায় বসে আছেন চন্দ্রাদেবী। চন্দ্রদেবীর মুখে হাসি, ভাবতেই পারছে না গার্গী। আরও আশ্চর্য চন্দ্রাদেবীর মুখেও সিগারেট। পাশে রঙিন পানীয় ভর্তি গেলাস। কিন্তু কী সিগারেট খাচ্ছেন চন্দ্রাদেবী? উনি কি লেডিজ সিগারেট খান?

পরক্ষণেই রবার্টের মুখে ধূসর দাড়ির জঙ্গল দেখে ভুরুতে কোঁচ ঘনিয়ে এল গার্গীর। লোকটার হাইট, শক্তপোক্ত গড়ন দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠল। যে লোকটা তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিল, তার মুখ থেকে মৃদু একধরনের গন্ধ বেরোচ্ছিল, সেটা কি রবার্টের হাতেধরা অভিনব চুরুটটির, নাকি পানীয়ের! অথবা অন্য কোনও গন্ধ ছিল সেটা? তা হলে কি রবার্ট ও'নীলই—

সেদিন রাতে সায়ন বাড়ি ফেরার পরও সন্ধের সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না গার্গী। সায়নকে ঘটনাটা বললে সে কীভাবে নেবে, কীই বা হবে তার প্রতিক্রিয়া কে জানে। বরং এখন নয়, সময় হলে সবই বলবে তাকে এমন ভাবতে ভাবতে ঘুমে ও না -ঘুমে অত বড় রাত কাবার করে ফেলল।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সায়নকে বলল, আমার অফিস যেতে একটু দেরি হবে আজ—

ছুরি-কাঁটা দিয়ে ডবল ডিমের মস্ত ওমলেটটা ম্যানেজ করতে করতে সায়ন বলল, ও.কে। নো প্রবলেম।

সায়নের একটা বড় গুণ এই যে, সে কখনও গার্গীর ব্যাপারে অযথা নাক গলায় না। একবার জিজ্ঞাসাও করল না, কেন। গার্গী অফিসে কোনও ডিসিশন নিলেও বলে না, উঁহু,

এভাবে করলে ভাল হত। কিংবা না, এটা করো। বরং উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে বলে ওঠে, বাহ্, দারুণ ভেবেছ তো। আমি তো এভাবে ভাবিনি।

তবে একটু পরেই বলল, তা হলে আমি কিন্তু ভুবনেশ্বর যাওয়ার টিকিট কাটতে দিচ্ছি। তুমি কি তোমার আগের সিদ্ধান্তেই অনড় আছ? আমার সঙ্গে যাচ্ছ না?

—দুজনে একসঙ্গে অফিস ছেড়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? অন্তত এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে?

—কিন্তু তুমি একা থাকতে পারবে ফ্ল্যাটে? ভেবে দ্যাখো।

—একা! গার্গী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল যেন, উঁহু। একা থাকতে পারব না।

কাল সন্ধের ঘটনাটা সায়ন জানে না বলেই জিজ্ঞাসা করতে পারল, সে একা থাকতে পারবে কি না। জানলে নিশ্চয় তার একা থাকার কথা ভাবতই না। কিন্তু গার্গী এখনও আতঙ্কে নীল হয়ে আছে। আর একটু সুযোগ পেলেই হয়তো চৌধুরীবাড়িতে আরও একটি বধূহত্যার ঘটনা জানতে পারত লোকে।

গার্গী অস্ফুট কণ্ঠের জবাব শুনে সায়ন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, তা হলে!

'তা হলে' শব্দটা গার্গীর ভেতরেও তখন তুমুল হয়ে তোলপাড় করছে। সত্যিই তো, তা হলে গার্গী থাকবে কোথায়! দাদার বাড়ি থেকে একবস্ত্রে বেরিয়ে এসেছিল যেদিন, পিত্রালয় শব্দটি তার অভিধান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে তার এমন কোনও বান্ধবীও নেই যার বাড়িতে দু-তিন রাত 'অগত্যা আশ্রয়' প্রার্থনা করতে পারে। আসলে যেদিন থেকে সে সায়নের জীবনের দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে নিজেকে, সায়নের সুখদুঃখের শরিক হয়েছে, তখন থেকে তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি সভ্য জগতের তাবৎ মানুষের কাছেই সে অচ্ছুত, অনাদৃত, অপাংক্তেয়।

সায়ন একটু ভেবে তৎক্ষণাৎ সমাধান করে দিল কূট প্রশ্নটির, যেভাবে কয়েকদিন আগেও মোকাবিলা করেছিল এ হেন সমস্যার, বলল, তাহলে ভরসা সেই আলোদা।

গার্গী তবু খুঁতখুঁত করতে লাগল, আবার সেই আলোদার বাসায়!

—তা ছাড়া আর উপায় কী? দুটো-তিনটে রাত তো মোটে।

সায়ন অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গী এবার ঐন্দ্রিলার আলমারি খুলে বসল। প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হচ্ছিল, অন্যের সম্পত্তি খুলে দেখা মোটেই শোভন না। কিন্তু আজ নারীসুলভ কৌতূহলে নয়, নিতান্তই গোয়েন্দার দৃষ্টিতে সে লকারের ভেতর থেকে বার করল গয়নাগাটির বাক্সটি। কী দারুণ সব গয়না, দেখলে চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু গার্গীকে তার তাপ স্পর্শও করল না, সে বরং তন্নতন্ন খুঁজে উদ্ধার করতে চাইল সেই বেগুনি পাথরের রহস্য। কিন্তু হতাশ হতে হল তাকে, রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। এরকম কোনও দুল নেই ঐন্দ্রিলার.....।

আলমারির ভেতর থরে থরে সাজানো রয়েছে কয়েকশো শাড়ি-জামা। যে শাড়িই চোখে পড়ে, প্রত্যেকটিই এক চোখ-জুড়োনো দৃশ্য। এর মধ্যে অনেক শাড়িই গার্গীর চেনা, এক-একটি শাড়িতে ঐন্দ্রিলার এক-একরকম স্মৃতি। সেগুলো ঝলমল করে উঠতেই গার্গীর মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল সেইসব উজ্জ্বল দিন, যখন ঐন্দ্রিলাই ছিল ঘটনার মধ্যমণি। অনেকগুলো শাড়ি তখন গার্গী পরেওছে। যখনই গার্গী আসত, ঐন্দ্রিলা তার আলমারি খুলে এক-একটা দামি শাড়ি এগিয়ে দিয়েছে, নে, আজ এটা পর। এ শাড়িটা তো তোর ভারি পছন্দের।

পুরানো শাড়িগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে গার্গী বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। হঠাৎই একটা শাড়ির আড়াল থেকে ঝপ করে খসে পড়ল একটা ছোট্ট ডায়েরি। খুলে দেখল,

তার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ঐন্দ্রিলার মুক্তোর মতো হস্তাক্ষর। কত কিছুই না লেখা তাতে। কত ঘটনা, কত মন্তব্য। আশ্চর্য, ঐন্দ্রিলা ডায়েরিও লিখত নাকি! কিন্তু তার দু-চার পৃষ্ঠায় চোখ বুলোতেই অবাক হয়ে গেল। কী অদ্ভুত! কার সম্পর্কে লেখা রয়েছে ডায়েরিতে? তো কোনও পুরুষ সম্পর্কেই, কিন্তু যা মনে হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে, সায়নকে নিয়ে নয়। তা হলে কে সেই পুরুষ যার সম্পর্কে এত কৌতূহল ঐন্দ্রিলা উপচে দিয়েছে প্রতি পৃষ্ঠায়! সে কে রৌণক, না কি—রবার্ট! এক জায়গায় লেখা, 'জড়িয়ে ধরেছিল পেছন থেকে। মুখময় দাড়ির জঙ্গল।' তা হলে কি রবার্টই!

নিবিষ্ট হয়ে পড়তে পড়তে সহসা শিরশির করে উঠল গার্গীর শরীর। কাল লোডশেডিং -এ যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার, ঐন্দ্রিলারও কি সে রকম কিছু ঘটেছিল! সেই ঘটনার পরিণতিতে অবশেষে একদিন মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাকে!

ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ ঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠল, এ হে, প্রায় এগারোটা বাজতে চলল যে। ফুট্রুস অনেকক্ষণ আগে এসে হর্ন দিয়েছে গাড়ির। অফিসে যে তার আজ অনেক কাজ।

গার্গী দ্রুত তৈরি হয়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে তরতর করে নেমে এল সিঁড়ি বেয়ে। কাল রাতে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ চমৎকার রোদ ঝলমলে দিন। আকাশে সাদা মেঘের সামান্য কারিকুরি থাকলে রোদের চেহারা বদলে যায়। এরকম দিনে কাজ করতে ভারি ভাল লাগে তার। সে অফিসে পৌঁছাতেই অন্য সবাই ভীষণ অবাক। তাদের ম্যাডামের তো অফিসে পৌঁছাতে এত লেট হয় না কোনও দিন।

অফিসে তখন পুরোদমে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পর পর কয়েকদিন মিটিং করে গোটা অফিসটাকেই চনমনে করে তুলেছে গার্গী। সবাইকে বুঝিয়েছে, সামনে ঘোর সংকট। একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এই কাজটাকে সাকসেসফুল করে তুলতে না পারলে সমূহ বিপদ। এখন দরকার টিম-ওয়ার্ক। যদি অফিসের সবাই একযোগে কাজ করে, জেসমিন ফ্লেভার বাজার ধরে নেবে নির্ঘাত। তাহলেই প্যারাডাইস প্রোডাক্টস আবার ফিরে পাবে তার হারানো গুডউইল। সেক্ষেত্রে পুজোর মরশুমে বাড়তি হারে বোনাস। আরও সুযোগসুবিধা, আরও ইনসেনটিভ।

সারাদিন পুরোদমে কাজ করে বিকেল পাঁচটার মধ্যে বেরিয়ে এল অফিস ছেড়ে। এর মধ্যে একবারও সায়নের সঙ্গে কথা বলার ফুরসত হয়নি। সায়ন আজ গোটা দিন ব্যস্ত থেকেছে ডিসট্রিবিউশনের তদারকি করতে। সায়নের থিয়োরি হল, চেয়ারম্যান নিজেই যদি কাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে গোটা অফিস কাজে উদ্বুদ্ধ হবেই।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে ঢুকে হঠাৎই তার চোখ আটকে গেল মিন্টো পার্কের সামনে এসে। আরে, দীয়াই তো! কিন্তু দীয়া আজ একা নয়। সঙ্গে আর একজন পুরুষ। পরনে নীলরঙের গেঞ্জি, অফ-হোয়াইট রঙের প্যান্ট। গার্গী তৎক্ষণাৎ বলল, ফুট্রুস, একটু দাঁড়াও তো।

ফুট্রুস একটু এগিয়ে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করাল। গার্গী গাড়ি থেকে নামল না, পিছনের কাচে চোখ লাগিয়ে দেখতে লাগল ওরা কী করে, কোথায় যায়। সেদিন দীয়ার বাসায় গিয়েই বুঝতে পেরেছিল, অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে তার একটা গোপন সম্পর্ক আছে। ইনিই কি তা হলে সেই পুরুষ!

একটু পরেই পুরুষটি হাত দেখিয়ে দাঁড় করাল একটা ট্যাক্সিকে। দুজনে ট্যাক্সিতে উঠতেই গার্গী বলল, ফুট্রুস, ট্যাক্সিটাকে ফলো করো তো।

pathagar.net

ফুট্রুস এই অভিনব ডিউটি পেয়ে ভারি রোমাঞ্চিত। ট্যাক্সিটা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড পেরিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে এসে দাঁড়াল একটা রেস্তোরাঁর সামনে। দীয়াদের থেকে সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে তাদের পিছু পিছু এসে ফুট্রুসকে অপেক্ষা করতে বলে গার্গীও ঢুকে পড়ল রেস্তোরাঁয়।

রেস্তোরাঁর ভিতরে খুবই অস্পষ্ট আলো, চারপাশে আলো-আঁধারি পরিবেশে দীয়া আর তার সঙ্গী পুরুষটি একটা কোণের টেবিলে গিয়ে বসে পড়েছে। যথাসম্ভব নিজেকে আড়ালে রেখে গার্গীও গিয়ে দখল করল তাদের পাশের টেবিলটি। রোস্তোরাঁটিতে সুবিধে এই যে প্রতি দুই টেবিলের মাঝখানে জাফরি ডিজাইনের কাঠের পার্টিশন দাঁড় করানো।

গার্গীর ভেতরে তখন উপছে পড়ছে প্রবল কৌতূহল। সম্পর্কে জা বলেই হয়তো নারীসুলভ সন্ধিৎসায় সে জেনে ফেলতে চাইছে, হিমনের সঙ্গে সম্পর্কের ছেদ করে দীয়া কোন পুরুষের সঙ্গে গড়ে তুলতে চাইছে তার ভাবী জীবনের চালচিত্র।

প্রায় আধঘন্টায় দু-কাপ কফি নিয়ে ফেলল গার্গী। কপির কাপে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে কান পেতে আছে পাশের টেবিলের কথাবার্তায়। নতুন কোনও কারখানা খোলার কথা বলছে ওরা। হিমন আর চন্দ্রাদেবীর নামও উচ্চারিত হল একবার। আরও আশ্চর্য, একবার গার্গীর নামও। শুনে বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগল গার্গীর। সেদিন গার্গী তার বাসায় গিয়েছিল। সেই আলোচনাই কি হচ্ছে তা হলে? গার্গী জেনে ফেলেছে দীয়ার কোনও প্রেমিকের অস্তিত্ব, সে কথাই।

হঠাৎ একবাক্স রোমাঞ্চের ভেতর কীভাবে ঢুকে পড়ল তা ভাবতে গিয়ে অবাক হয়ে যাচ্ছিল গার্গী। বেশ উত্তেজিতও।

আধঘণ্টাটাক পর সঙ্গী পুরুষটি উঠে গেল প্রথমে। বিল মিটিয়ে সে বেরিয়ে যেতেই দীয়া উঠে দাঁড়াল। ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিল গার্গী। যেন এখনই সে রেস্তোরাঁয় ঢুকছে এমন মুখ করে দীয়ার সামনে এসে দাঁড়াল, আরে, তুমি এখানে?

দীয়া প্রথমে চমকে উঠেছিল গার্গীকে দেখে। চট করে দরজার দিকে নজর ফেলে দেখে নিল তার সঙ্গী পুরুষটিকে দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসি ফোটাল মুখে, কী আর করব, এদিকে এসেছিলাম একটা কাজে। হঠাৎ চায়ের তেষ্টা পেয়ে গেল।

—চা খেয়েছ?

—হ্যাঁ, তা তুমি একা কেন? বর কোথায়?

'বর' শব্দটি কেমন খট করে গার্গীর কানে বাজল। গায়ে না মেখে বলল, আর বলো কেন। তিনি অফিস নিয়ে বেজায় ব্যস্ত।

—সে তো তুমিও শুনছি।

—ওই আর কি, সময় কাটানো। এদিকে মিঃ চৌধুরী আবার বাইরে ট্যুরে যাচ্ছেন।

—সে কি, কোথায়?

—ভুবনেশ্বর। দু-তিনদিনের জন্য। আমার হয়েছে বিপদ। একা ও-বাড়ি থাকতে ভীষণ ভয় করবে। কিন্তু সে কদিন কোথায় থাকব বুঝে উঠতে পারছি না।

—কবে যাচ্ছেন?

—এই তো, আঠারোই মে।

দীয়ার চোখে শঙ্কা ফুটে ওঠে, হঠাৎ ফিস ফিস করে বলে ওঠে, খবরদার ও বাড়িতে একলা থেকো না কিন্তু। থাকলেই অবধারিত বিপদ, বরং—, কিছুক্ষণ থেমে কী যেন ভাবতে ভাবতে

pathagar.net

দীয়া বলে ফেলে, তবে অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা না হলে আমাকে বোলো। আমি না হয় তোমার সঙ্গে দু-তিন দিন থাকব।

—তাই, কী ভাল হয় তা হলে। তুমি তো ওদের বাড়িতে এখনও যাও মাঝে মাঝে।

—যাই, কিন্তু রাতে থাকি না। তবে তোমার কাছে হলে থাকতে পারি।

ভীষণ নিশ্চিন্ত হয়ে গার্গী স্বস্তির শ্বাস ফেলল, আহ্ বাঁচলাম। কদিন ধরে কী যে টেনশনে ছিলাম একা থাকতে হবে এই ভাবনায়।

দীয়া ঘাড় নেড়ে বলল, ভাবনার কথাই তো। আমি তো ওই জন্যেই পালিয়ে এসেছি ও বাড়ি থেকে, বলতে বলতে গলা নামাল দীয়া, রাতের বেলা যা সব ঘটনা ঘটে না রোজ—

— কী ঘটে? গার্গীর চোখেও ঘনিয়ে আসে শঙ্কা।

—ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে দু-তিনদিন থাকব তো। সব বলব সে-সময়।

দুজনে আরও দুকাপ কফি খেল এতসব কথোপকথনের ফাঁকে। বিল মিটিয়ে বাইরে বেরোতেই গার্গী বলল, বাড়ি যাবে তো, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

দীয়া আগের দিনের মতোই আপত্তি করে, না, না। রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে আমার একটা কাজ আছে। সেখানে থেকে অন্য জায়গায় যেতে হবে। বাড়ি ফিরতে রাত হবে আমার।

—ঠিক আছে, তাহলে অন্তত রাসবিহারী অ্যাভেনিউ পর্যন্ত পৌঁছে দি।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউতে একটা দোকানের সামনে নেমে গেল দীয়া। তাকে নামিয়ে দিয়ে আরও কিছুটা এগিয়েও কী মনে হতে গার্গী বলল, দাঁড়াও তো ফুটুস। গাড়িটা থামতেই হাঁটতে হাঁটতে গার্গী ফিরে এল সে দোকানে যেখানে দীয়াকে নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সে পৌঁছাবার আগেই দীয়া কাজ মিটিয়ে বেরিয়ে এসেছে দোকান থেকে। তাকে ধরতে বাস স্টপে ছুটল গার্গী, কিন্তু সেখানেও পেল না, দেখল, এসপ্ল্যানেডগামী একটা বাসে উঠে পড়েছে দীয়া। কথাটা বলা হল না বলে খুব আফসোস হল তার।

ফ্লাটে ফেরার মুখে হঠাৎ কেন যেন মাথার ভেতর একটা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। ভীষণ টেনশান হচ্ছে তার। অস্থির-অস্থির লাগছে ভেতরটায়। সন্ধের পর ফ্ল্যাটে ঢুকতে গেলেই এমন হচ্ছে আজকাল। সেই ভয়ঙ্কর সন্ধের কথা স্মরণ করেই বোধহয়। পাছে ফের লোডশেডিংয়ের খপ্পরে পড়ে তাই একটা পেন্সিল-টর্চ রেখে দিয়েছে, ব্যাগের ভিতর। কিন্তু টর্চ লাগল না আজ। ঘরে ঢোকার পরও কিন্তু সে অস্থিরতার একচুলও উপশম হল না। আর তা নজরে পড়ল সায়নের, জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে তোমার? শরীর ভালো নেই?

—ঠিকই আছে, গার্গী তার অস্থিরতা গোপন করল।

—জানো তো, দুদিনেই দারুণ অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে আমাদের। কলকাতার প্রায় নাইনটি পার্সেন্টি দোকানে জেসমিন ফ্লেভার সাপ্লাই হয়ে গেছে। গোটা দশেক ডেলাও কাভার করে ফেলছি আমরা। মনে হচ্ছে ভালই রেশপনস্ পাব।

—তাই! গার্গীর চোখ খুশিতে টইটম্বুর হয়ে ওঠে এতক্ষণে, হবে নাই বা কেন? যা একখানা প্রোডাক্ট এবার ছেড়েছ বাজারে?

—কী করে বুঝলে? তুমি তো আর মাখোনি।

—না মাখিনি। তবে আজ একপিস ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে ভরে এনেছি। কমার্শিয়াল ম্যানেজারই বললেন, ম্যাডাম, একবার মেখে দেখুন আমাদের সাহেবের তৈরি সাবান। আপনি সার্টিফাই না করলে জেসমিন ফ্লেভার জাতে উঠছে না।

সায়ন হেসে উঠল, তাই নাকি।

pathagar.net

—হুঁ। এখন অফিস থেকে ফিরে মনে হচ্ছে, সমস্ত শরীর ঘাম আর ধুলোয় মিশে চটচট করছে। দেখা যাক, জেসমিন ফ্লেভার কোনও উপকারে আসে কিনা।

—বাহ্, এই না হলে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঠিক আছে, ভাল করে সারা শরীর জুঁইফুলের গন্ধে ভরিয়ে এস। আজ সারারাত জুঁইফুলের গন্ধ শুঁকে কাটিয়ে দেব।

গার্গী ভ্রূকুটি করে হাসল, কী ব্যাপার চেয়ারম্যানসাহেব, প্রোডাক্টের ভাল কাটতি হবে ভেবে মনমেজাজ বেশ খুশিয়াল মনে হচ্ছে!

সায়ন হঠাৎ অন্যমনস্ক হল, আসলে এবারের ভেঞ্চার আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এক স্টেকে না জিততে পারলে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস ফতুর হয়ে যাবে, গার্গী। বহু টাকা ওভারড্রাফট নিয়েছি।

গার্গীও অন্যমনস্ক হল, ঠিকই বলেছ, আমার কাছেও এটা একটা বিরাট স্টেক। এ যুদ্ধে জিততেই হবে।

গার্গীর মনে হল অন্য একটা যুদ্ধের কথা সে ভাবছিল।

পরের দুটো দিন আরও ব্যস্ততায় কাটল ওদের। ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশনের হারও যেমন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তেমনই ডিসিট্রিবিশন পয়েন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তৎপরতা। যেন কী এক অলৌকিক স্পর্শে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে গোটা অফিসে।

সেদিন সন্ধের পর অফিস থেকে বেরোবার সময় গার্গী শুনল, অনেক আগেই বেরিয়ে গেছে সায়ন। তাকে বলেও যেতে পারেনি ব্যস্ততায়। ফুট্রুস তার জন্য অপেক্ষা করছে গাড়ি নিয়ে। কিন্তু গাড়িটা সেদিন দু-তিনশো গজ যেতে না যেতেই হঠাৎ বিগড়ে গেল, কোনও নোটিস না দিয়েই। বহু আয়াশেও তার গাড়িতে হৃদ্‌স্পন্দন ফিরিয়ে আনতে পারল না ফুট্রুস। প্রায় আধঘণ্টা পরে হতাশ হয়ে বলল, একটা ট্যাক্সি ডেকে দি, ম্যাডাম?

মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল গার্গী। হয়তো সে বাড়ি পৌঁছোবার আগেই ফিরে আসবে সায়ন। তাকে দেখতে না পেলে বসে থাকবে ভারি বিষণ্ণ, মনমরা হয়ে। ঠিক ঠিক সময়ে কফির কাপ না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠাটাও বিচিত্র নয়।

গাড়ি থেকে নেমে ট্যাক্সির জন্য কিছুক্ষণ বৃথা চেষ্টা করল ফুট্রুস। বাধ্য হয়ে গার্গী বলল, তাহলে বাসেই উঠে পড়ি।

—আপনি বাসে ফিরবেন, ম্যাডাম? ফুট্রুসের চোখে একরাশ বিস্ময়, যেন এমন কথা সে জন্মেও ভাবেনি।

তার হাঁ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই বাসস্টপে পৌঁছে গেল গার্গী। ফুট্রুসের উৎকণ্ঠা দেখে মনে মনে হাসল, স্বগত কণ্ঠে বলল, বুঝলে ফুট্রুস, গাড়ি তো চড়ছি মাত্র এই কদিন। এতকাল ট্রামে-বাসে চড়েই বিশ্ব পরিক্রমা করেছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটা স্পেশাল-বাস পেতে তাতে কোনও ক্রমে উঠে পড়ল। আর কী ভাগ্য, ভেতরে ঠেলে ঢুকবার মুখে একটা কাটা-সিট থেকেএকজন উঠতেই একেবারে জানালার কাছে বসতে পেল সে। এক মুহূর্তে হু-হু হাওয়ায় তার শরীর থেকে লহমায় মিলিয়ে গেল এতক্ষণের পরিশ্রম আর উৎকণ্ঠা।

সবে স্বস্তির শ্বাস ফেলেছে, হঠাৎ তার নজর আটকে গেল গাড়ির গেটের কাছে। পরবর্তী স্টপেজে নামবার তোড়জোড় করছে আর কেউ নয়, হিমন। আরে, কোথায় নামছে হিমন, পার্ক স্ট্রিটে! কেন পার্ক স্ট্রিটে কেন? তার তো অফিস-ফেরত বাড়ি ফেরার কথা। না কি—

দেবাদ্রি সান্যালের কাছেই শুনেছিল গার্গী, হিমন নাকি প্রায়ই এক নাইট-ক্লাবে যায়।

সেখানে তার এক বান্ধবী আছে, যে চেন-স্মোকার। কথাটা শুনে সেদিন অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। যে হিমন একটা জড় পদার্থের মতো জীবনযাপন করে, যার প্রতিটি পদক্ষেপেই এলোমেলো, ভারসাম্যহীন, মানুষ দেখলেই যে জুবুথুবু হয়ে যায়, তার কিনা এক বান্ধবী আছে নাইট ক্লাবে! তা কি কখনও সম্ভব! যদি সম্ভবই হয় তাহলে হিমনের এই অস্বাভাবিক জীবনযাপন সবটাই কি বানানো, সবই তার অভিনয়! হিমন কি এখন সেই ক্লাবেই চলেছে!

ভাবনাটা ভিতরে চারিয়ে যেতেই সে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো জানালার হাওয়ার স্নিগ্ধ ঝাপট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ। দুদ্দাড় করে ভিড় ঠেলে নেমে পড়ল হিমনের পিছু পিছু। হিমন অবশ্য আচ্ছন্নের মতো পথ হাঁটছে, গার্গীকে নজরই করল না। হিমন সম্পর্কে কদিন ধরেই তার ভিতরে চাগাড় দিয়ে উঠছে এক অপর্যাপ্ত কৌতূহল। তার সম্পর্কে দীয়া একরকম বলেছে, আর দেবাদ্রি সান্যাল বলেছে ঠিক তার বিপরীত, এই দুইয়ের মধ্যে কোনটা ঠিক।

বেশ অনেকখানি পথ এলোমেলোভাবে হেঁটে হিমন এসে দাঁড়াল একটা মস্ত দোতলা বাড়ির সামনে, যার সামনে ছোট্ট সবুজ লন, লনের দুপাশে কিছু ঝাউ, পাতাবাহার গাছ। লন পেরোলে বাড়ির দরজা, তার সামনে তার দাঁড়িয়ে দুই মোচ্‌ওলা দারোয়ান। হিমনকে দেখেই সেলাম ঠুকে দরজা খুলে ধরল তারা। হিমন ভেতরে ঢুকতেই কী করবে দিশে না পেয়ে দারুণ ফাঁপরে পড়ল গার্গী। সেও কি ভিতরে ঢুকবে, না ঢুকবে না? তারপর হঠাৎ সাহস করে সেই হাজির দরজার সামনে।

ঠিক একরকমই ভাবে সেলাম ঠুকে দারোয়ান দুজন দরজা খুলে ধরতেই একরাশ রোমাঞ্চ নিয়ে ভেতরে সেঁধুল গার্গী। ঢুকতেই ধাঁধিয়ে গেল তার চোখ। ভেতরে মস্ত-এক রেস্তোরাঁর মতো, অসংখ্য, টেবিল, চারপাশে চেয়ার। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে লোকজন। সবার সামনেই পানীয়। গার্গী উত্তেজনায় ঢং হয়ে কি করবে ভাবতে না ভাবতে হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল গোটা রেস্তোরাঁ। পরক্ষণেই ভেসে এল অর্কেস্ট্রার দামাল সুর।

অর্কেস্ট্রার চমৎকার মিঠেন সুর কোথা থেকে ভেসে আসছে, কী ভাবে আসছে তা কয়েক মুহূর্ত বুঝে উঠতে পারল না গার্গী। তার চারপাশ তখন গাঢ় অন্ধকারে চুরচুর হয়ে আছে। সে নিজেও লীন হয়ে আছে এক ভয়ঙ্কর আতঙ্কে। একটা অচেনা রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে পড়ে কোনও টেবিলে বসে পড়ার আগেই এ ভাবে পট করে আলো নিভে যাওয়া, হঠাৎ একগলা আঁধারের ভেতর রহস্যময় সুরের মূর্ছনা মৃদু থেকে তীব্র, তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠা,এ সবই তার কাছে দুর্বোধ্য, একটা অদ্ভুত হেঁয়ালির মতো।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, হঠাৎ একটা নীল আলোর উদ্ভাস হল এক প্রান্তে। সেখানে মনে হল একটা মঞ্চ, তার উপর নীলচে আলো হঠাৎ মিহি হয়ে জ্বলে উঠল বিপুল রহস্য ছড়িয়ে। সেই আব্‌ছা আলোয় এতক্ষণে মস্ত হলঘরটার ভেতর সার সার আগুনতি টেবিল, প্রতি টেবিলের চারপাশে বিছানো চেয়ার, লোকজন, সবই নজরে এল গার্গীর। মঞ্চের ঠিক উলটোদিকে বিশাল কাউন্টার, কাউন্টারে সাজানো রকমারি অসংখ্য বোতল, তার ওপাশে মোটাসোটা একজন গোঁফওলা লোক। অর্থাৎ এটি একটি বড়সড় বার, যার অভ্যন্তরে গার্গী আপাতত দণ্ডায়মান।

pathagar.net

মঞ্চের উপর নীল আলো তখন ক্রমশ জেগে উঠছে ঘুম থেকে। তাতে আরও দৃশ্যমান হয়ে উঠছে হলঘরের ভেতরকার পটভূমিকা। অজস্র লোক বসে আছে পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে। গেলাস-বোতল-প্লেট-চামচের শব্দ হচ্ছে টুংটাং। বিস্ময় কাটতে-না-কাটতে হঠাৎ সে খেয়াল করল, হলঘরের মাঝখানে বিশাল একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে সে যে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ ধরে তা নজরে পড়েছে অনেকের। টেবিলে টেবিলে পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে তারা এতক্ষণ হাঁ করে অপেক্ষা করছিল, কখন মঞ্চে নীল আলোর আবির্ভাব ঘটে। মঞ্চে নীল আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু সে রোমাঞ্চময় আকর্ষণ ছেড়ে তারা এখন তাকিয়ে রয়েছে গার্গীর দিকেই।

ব্যাপারটা দ্রুত অনুধাবন করে সে তৎক্ষণাৎ একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে বসে পড়ল ধুপ করে। বসে আত্মগোপনই করতে চাইল। ব্যাগ থেকে দ্রুত তার ঘোলাটে-কাচের চশমাটা বার করে পরে নিল চোখে। চোখ ঢাকা পড়লে তা অনেকখানি ছদ্মবেশের কাজ করে। চোখই তো মানুষকে চেনার সবচেয়ে সহজ অস্ত্র।

ছদ্মবেশ ধারণ করল কেননা তার টেবিলের খুব কাছেই অন্য একটা টেবিলে বসে আছে হিমন। নিস্পৃহ, উদাসীন ভঙ্গিতে হলঘরের ভেতর নীল আলো একটু চোখ-সওয়া হতেই একজন ওয়েটার এসে গার্গীর কাছে নিচু হয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলল, ড্রিঙ্কস্, ম্যাডাম?

গার্গী ফাঁপরে পড়ল। হঠাৎ হিমনকে অনুসরণ করতে করতে সে ঢুকে পড়েছে এই অদ্ভুত পরিবেশের ভেতর। কিন্তু একটা বারে ঢুকে কোনও পানীয় না নিয়ে চুপচাপ হিমনের গতিবিধি লক্ষ করবে তা তো হতে পারে না, বাধ্য হয়ে ফিসফিস করে বলল, সফ্ট্।

ওয়েটার তৎক্ষণাৎ ছুটল কাউন্টারের দিকে।

তখন অর্কেস্ট্রার সুর চড়ায় উঠছিল ক্রমশ। হঠাৎ তীব্র হয়ে উঠে পরমুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। যাকে বলে পিন্‌পতন নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই অ্যামপ্লিফায়ারে মৃদু ভরাট কণ্ঠে শোনা গেল,'এই চমৎকার সন্ধ্যায় আপনারা এখন উপভোগ করবেন মিস লিজার পপসং।'

তৎক্ষণাৎ আবার অর্কেস্ট্রার সুর। সেই সঙ্গে মঞ্চের নীল আলোয় বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে নাচতে নাচতে ঢুকে পড়ল এক যুবতী। যেমন অভব্য তার পোশাক, তেমনই অশ্লীল তার নাচ। শরীর দুলিয়ে তীব্রকণ্ঠে গাইতে লাগল, 'আই অ্যাম অ্যাভেইলেব্‌ল টু-নাইট.....'

গার্গীর টেবিল থেকে মঞ্চ খুব একটা দূরে নয় বলে যুবতীটিকে ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে সে, তার চুল পুরোপুরি সোনালি, চোখের মণির রং তুঁতবর্ণ, ঠোঁটে রক্তবর্ণ লিপস্টিক, চোখের পাতায় সবুজ আইশ্যাডো। এহেন যুবতীর অশালীন নাচ দেখতে দেখতে শরীরের ভেতরটা প্রবল অস্বস্তিতে ভরে উঠল গার্গীর। একবার ভাবল, চট করে উঠে বেরিয়ে যায় বাইরে, কিন্তু তার আগেই ওয়েটার এসে পানীয়ের সরঞ্জাম ভরে দিল টেবিলে।

অর্থাৎ গার্গীকে এখন এই ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর পরিবেশে আরও দীর্ঘক্ষণ কাটাতে হবে, যতক্ষণ না তার পানীয়ের গেলাস শেষ হয়, যতক্ষণ না তার টেবিলে বিল নিয়ে আসে ওয়েটার। ব্যাপারটা এইমুহূর্তে তার কাছে খুবই কষ্টকর, অসহনীয়। কিন্তু কী-ই বা করার আছে এখন। অতএব হালকা পানীয়ের গেলাসে ঠোঁট ছুঁইয়ে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল নৃত্যরত যুবতীর দিকে নয়, তার অদূরে বসে থাকা হিমনের দিকে।

হিমন থম্ হয়ে বসে আছে একা। নিরুদ্বিগ্ন, চুপ-চাপ। যেন অপেক্ষা করছে কারও জন্য।

একটু পরেই একটা লোক হিমনের কাছে এসে নিচু হয়ে কিছু যেন বলল ফিসফিস করে। হিমন ঘাড় নাড়তেই সে যেমন দ্রুত এসেছিল, তেমনই চলে গেল তাড়াহুড়ো করে। একমুহূর্তে

মনে হল গার্গীর, লোকটা সেদিন তার অফিসে দেখা সেই লোটন নয় তো! কিন্তু লোটন হঠাৎ বারে আসবে কেন, এলেও হিমনকে তার চেনার কথা নয়। পরমুহূর্তে মনে হল, সেদিন কালীজীবনবাবু বলেছিলেন, লোটন লাইম ইন্ডিয়ার চাকরি করে। লাইম ইন্ডিয়ার রৌণক মুখার্জিকে এখন ঘোরতরভাবে সন্দেহ করছে গার্গী, সেদিন সন্ধের পর রৌণক কেন গিয়েছিলেন ঐন্দ্রিলার কাছে, গভীর রাত পর্যন্ত তিনি ছিলেন কি না ঐন্দ্রিলার কাছে, তিনিই ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর জন্য দায়ী কি না, এ সব ভাবনা বারবার রোল করছে গার্গীর মগজে। রৌণকই তার সন্দেহের তালিকায় এখন প্রথম, কিন্তু তাকে অভিযুক্ত করার আগে নিশ্চিন্ত প্রমাণ চাই তার। সেই রৌণকের সঙ্গে নিশ্চই লোটনের যোগাযোগ আছে। কিন্তু লোটন হঠাৎ হিমনের কাছে কেন! রৌণকের দূত হয়েই কি লোটন এসেছে হিমনের কাছে? নিচু হয়ে সে কী বলল হিমনের কানে কানে? গার্গী যে হিমনকে ফলো করতে করতে ঢুকে পড়েছে এই বারে, সেই সংবাদই কি! তাহলে গার্গীকে কি নজরে রেখেছে ওরা?

প্রথম থেকেই কেন যেন হিমনকে ভারি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে গার্গীর। বাড়িতে এমন গোবেচারার মতো নিরীহ জীবটি হয়ে থাকে যেন কিছুই জানে না, অথচ সে বারে আসে। ক্যাসিনো খেলে, স্মোকার বান্ধবী আছে— অর্থাৎ তার গোটা জীবনযাপনটাই গাঢ় রহস্যে আবৃত।

একটু পরেই একজন ওয়েটার এসে সেই রহস্যময় হিমনের সামনে পানীয়ের গেলাস ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম রেখে গেল। হিমন সেদিকে তাকিয়ে দেখল নিতান্ত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। একবার হাইও তুলল হঠাৎ। যেন আজ পানীয়ে তার ইচ্ছে নেই।

সোনালি চুলের মেয়েটা তখন আরও উদ্দাম হয়ে নাচছে। এহন কুৎসিত দৃশ্যের ভেতর গার্গী তখন আর বসে থাকতে পারছে না। অথচ উঠে যাবে তাও সায় দিচ্ছে না মন, কেননা হিমনকে ফলো করে এতদূর এসেছে, তার স্বরূপ আসলে কী, জানতেই হবে তাকে। নিপাট বোকাসোকা চেহারার অন্তরালে সে কি সত্যিই ভয়ঙ্কর! সেদিন সন্ধের পর লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল সে কি হিমন! হিমন, না রবার্ট, না অন্য কেউ?

যত দিন যাচ্ছে, ততই আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে হিমনকে, তার সোনালি দাড়ি আরও যেন ঘন হয়েছে, চিবুক ছাড়িয়ে নেমে এসেছে বুক পর্যন্ত। লাল্‌চে ঝাঁকড়া চুল ছুঁয়ে ফেলেছে ঘাড়। চোখের দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক। তেমনই অসহায় চাউনি দিয়ে দেখছে যুবতীর নাচ। মাঝে-মধ্যে সামনে রাখা পানীয়ের গেলাস ধরার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঠিকমতো ধরতেই পারছে না যেন, চুমুকও দিচ্ছে না একবারও।

তাহলে কেনই বা এখানে এসেছে হিমন! বোধহয় প্রায়ই আসে, নাকি রোজই! কিন্তু কী উদ্দেশ্যে, কার সঙ্গে দেখা করতে, তারই সন্ধানে এসে টানটান হয়ে বসে আছে গার্গী। কাছেই একটা টেবিলে একটু কোনাচে হয়ে বসে আছে হিমন, মুখটা ঘোরানো সামনের দিকে, ফলে গার্গীকে দেখে ফেলবে এমন সম্ভাবনা নেই। পেছন ফিরলেও এই আলো-আঁধারি পরিবেশে ঘোলাকাচের চশমা-পরা গার্গীকে চিনতেও পারবে না। এমন সব ভাবনায় লাট খাচ্ছে একা-একা, সেই মুহূর্তে একজন লোক হঠাৎ গার্গীর পাশে এসে একটা খালি চেয়ার দখল করল। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মাঝারি হাইট, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, নিচুতলার কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, নাম্বার প্লিজ।

হঠাৎ এহেন অভাবনীয় ঘটনায় গার্গী রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে উঠল। অচেনা লোকটি কেমন বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে তার দিকে, হাসছেও দাঁত মেলে, তার দিকে ঝুঁকে পড়ে

জানতে চাইছে নম্বর কত। কিসের নম্বর, জেনে তার কী হবে, গার্গী কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বলে ফেলল, সরি।

কী বুঝল লোকটা কে জানে। তার উত্তর শুনে দ্রুত উঠে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। গার্গী পেছন ফিরে তাকিয়েও তার গতিবিধি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হল। লোকটার চাউনি এমনই লোলুপ, ক্রূর ধরনের ছিল যে এবার একটু একটু ভয় চারিয়ে যেতে লাগল গার্গীর ভেতরে। মনে হল, এভাবে হুট করে এহেন উৎকট, জঘন্য পরিবেশে তার ঢুকে পড়াটা মোটেই উচিত হয়নি।

ততক্ষণে আরও অনেক টেবিল থেকে জোড়ায় জোড়ায় চোখ নজর রাখছে তার দিকে। তার মতো একটি আকর্ষণীয় যুবতী একলা বসে আছে, সঙ্গী ছাড়াই, এ দৃশ্য এখানে সবার কাছই ভারি লোভনীয়। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ বসে থাকা খুবই ঝুঁকির কাজ। কিন্তু উঠতেও পারছে না হিমনের কথা ভেবে। পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, হিমন অফিসের পর প্রায়ই 'বেল ক্লাবে' যায়। সেখানে তাকে দেখা যায় এক বান্ধবীর সঙ্গে, ক্যাসিনো খেলে কখনও কখনও। দেবাদ্রির অভিযোগ কতটা সত্যি তা যাচাই করতেই আজ গার্গীর এই অভিযান। কিন্তু এ-ক্লাবটা তো বেল ক্লাব নয়, গার্গী দেখে নিয়েছে ঢোকার আগে। গেটের বাঁদিকে প্রস্তরফলকে লেখা ছিল, 'দি আইডিয়াল নেস্ট।' তারই মানে, হিমন একাধিক ক্লাবে যাতায়াত করে! শুধু কি ক্যাসিনো খেলায় তার উদ্দেশ্য! নাকি তার বান্ধবীর জন্যে আসে। তাহলে তার বান্ধবীর এখনও দেখা নেই কেন? তারই জন্যে কি হিমন অপেক্ষায় রয়েছে? স্বর্ণকেশী যুবতী তখনও নাচতে নাচতে গেয়ে চলেছে, 'আই অ্যাম অ্যাভেইলেবল টু-নাইট.....।' 'গানটা শুনতে শুনতে হঠাৎ গার্গীর মনে হল, পপসঙের এই সুরটি সে কোথায় যেন শুনেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই শুনেছে, কোথায় তা চট করে মনে পড়ল না। যুবতীর দিকে তাকিয়ে দেখল, সোনালি চুল, আর নীলাভ সবুজ চোখের মণির সমন্বয়ে তাকে বিদেশি যুবতী বলে মনে হলেও কোথাও যেন এদেশি ছাপ আছে তার চাউনিতে, মুখমণ্ডলে। হয় তো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হবে মেয়েটি। তার চাউনিতে যতটা না লাস্য, তার চেয়ে কুটিলতা বেশি। মিস লিজা নাম শুনে মনে হয় হয়তো তার নাম এলিজাবেথ বা ওই ধরনের কিছু। পার্ক স্ট্রিট এলাকায় এধরনের অ্যাংলো ইন্ডিয়া মেয়ের ছড়াছড়ি। অনেকেই নর্তকির কিংবা গায়িকার ভূমিকা পালন করে এ ধরনের বারে বা রেস্তোরাঁয়।

মেয়েটিকে বেশ কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখল গার্গী, হঠাৎ কেন যেন মনে হল কোথাও দেখেছে এই ডিম-ছাঁদের মুখখানা। হয়তো এই মেয়েটিই কোনও সাহেব-কোম্পানিতে চাকরি করে দিনের বেলা। গার্গীর চোখে পড়েছে সেসব অফিসের কোথাও, পথেঘাটেও দেখতে পারে। এমন অদ্ভুত সাজপোশাক, চাউনি, সবই চোখে পড়ার মতো।

গার্গী তখন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে গোটা বারটা। কিন্তু দেখার ফুরসত, পেল না, কারণ তাকে প্রবলভাবে শঙ্কিত করে হঠাৎ তার দুপাশের চেয়ারে দুই বিকট বলশালী পুরুষ এসে জাঁকিয়ে বসল। দুজনেরই চেহারা প্রকাণ্ড, গায়ে চকরাবকরা জামা, পরনে জিনসের ঢোলা প্যান্ট, একজনের মাথায় আবার ঝাঁকড়া চুল। দুজনে একই সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল তার দিকে, নাম্বার প্লিজ—, কিসের নম্বর জানতে চাইছে, কেনই বা, তা গার্গীর বুদ্ধিতে কিছুতেই সেঁধুল না। দুজন পুরুষ তাকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে দুদিক থেকে যে গার্গীর মনে হল তাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। সে এখন ইচ্ছে করলেই এই বেড়াজাল থেকে উঠে পালাতে পারবে না। দুজনের

pathagar.net

জ্বলন্ত চাউনি, লোলুপ অঙ্গভঙ্গি দেখে বুকের ভেতর কাঁপ ধরে গেল তার। যেন রণক্ষেত্রে সে ঢুকে পড়েছে অভিমন্যুর মতো, বেরোবার মন্ত্র জানে না, দুই মহারথী এখন তাকে নিয়ে—

অসহায়ভাবে চারপাশে তাকাতে গিয়ে সে আরও দেখল, শুধু এই দুই মহারথীই নয়, আরও বহু মহারথী এখন তার দিকে তাকিয়ে। প্রায় হায়নার মতো চাটছে তাকে। মঞ্চে নৃত্যরতা মিস লিজার যা আকর্ষণ, তার চেয়ে ঢের বেশি মনোযোগ কেড়েছে ঘোলাকাচের চশমা পরে থাকা এই রহস্যময়ী গার্গী চৌধুরী। এখানে তার পরিচিত বলতে একমাত্র হিমন। কিন্তু হিমনের আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা, শূন্য চাউনি দেখে বোঝা যায় সে নিজেই টালমাটাল। গার্গীর কোনও সাহায্যেই সে আসতে পারবে না।

অর্কেস্ট্রার চড়া সুর তখন তুমুল হয়ে ঝড়ে পড়ছে বারের ভেতর। মিস লিজার পপ সঙও তখন তীব্র ধ্বনিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে পানরতদের শিরায় শিরায়। 'আই অ্যাম অ্যাভেইলেবল...' এর মাদকতায় দুলছে তাদের টলমল শরীর। গানের কলিগুলো বেশ কয়েকবার শুনতেই হঠাৎ গার্গীর মনে পড়ে গেল, সেদিন সকালে রবার্ট ও'নীলের কণ্ঠেই গুনগুন স্বরে শুনেছিল এই গানটি। হঠাৎ কীভাবে রবার্ট ও'নীলের গান এসে বাসা বাঁধল মিস লিজার কণ্ঠে, তা ভেবে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। এমন তো নয় যে এই গানটি কোনও বিখ্যাত গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠের রেকর্ড আছে, একেবারে নতুন গান, সম্ভবত রবার্ট ও'নীলই এর স্রষ্টা, সে গান কিনা মিস লিজার গলায়!

গার্গীকে নিরুত্তর দেখে যমদূতের মতো দুপাশে বসে থাকা দুজন লোক পরস্পর চোখোচোখি করল, কী যেন ইশারাও করল মনে হল, তারপর একই সঙ্গে ফের ঝুঁকে পড়ল তার দিকে। ইয়োর নাম্বার প্লিজ—

গার্গী আগেই মতোই বলল, স্যরি।

ভেবেছিল 'স্যরি' বললেই এবারও উঠে যাবে লোক দুটো। কিন্তু আশ্চর্য তারা উঠল না। বরং পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা এক ওয়েটারকে কর্কশ কণ্ঠে বলল, হুইস্কি—, বলে দুজনেই দুটো সিগারেট ধরাল।

গার্গী প্রমাদ গুনল। বিলের জন্য বসে অপেক্ষা করা আর ঠিক হবে না। উঠে গিয়ে কাউন্টারে টাকা মিটিয়ে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে বাইরে। দুপাশে লোক দুটো তখন কাছেই আর একটা টেবিলের দিকে হাত নেড়ে কী সব বলছে, তারাও কটমট করে তাকাচ্ছে গার্গীর দিকে। গার্গী বুঝতে পারছে, সে খুব বড় একটা ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছে আজ। এখন উঠে পালাতে চাইলেও এরা তাকে এখান থেকে বেরোতে দেবে কি না কে জানে। যতই সে ক্যারাটে জানুক, এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়াই দেওয়া কোনও ক্রমেই তার পক্ষে সম্ভব নয়।

গার্গীর দু পাশে দুজন লোক তখন গার্গীকেই নিয়েই যেন আলোচনা শুরু করল নিজেদের মধ্যে। লম্বা, সারা মুখে কাটা-দাগ লোকটার, সে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বলল, মেয়েটা নয়া আমদানি, তাই না গুরু?

এপাশের ধুমসো লোকটা হেসে উঠল খিকখিক করে।

প্রথম লোকটি গার্গীর দিকে একপলক তাকিয়ে বলল, খাঁচায় তুলে নেব নাকি, গুরু।

গুরু তেমনই বিশ্রীভাবে হেসে বলল, দ্যাখ তো খোল্‌সা করে, নয়া না পুরানা?

প্রথম লোকটি ধন্দে পড়ে বলল, নয়াই মনে হচ্ছে, আগে তো কখনও দেখিনি। কী চুল, কী চোখ। খাপসুরত চেহারা।

pathagar.net

শুনতে শুনতে গার্গীর ভেতরে কাঁপ শুরু হয়ে গেল। এ কাদের পাল্লায় পড়ে গেল কে জানে! হিমনকে বাস থেকে পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে নামতে দেখে কেন যে তাকে অনুসরণ করার ভূত চাপল তার মাথায়! ফুট্টুসের গাড়িটা খারাপ না হলে এতসব রহস্যের ভেতর তার তো ঢোকার কথাই ছিল না।

একটু পরেই ধুমসো লোকটা উত্তর দিল, মেয়েটাকে আগে দেখেছিস। শুধু ভোল বদলেছে এই যা।

—তাই নাকি! কোথায় দেখেছি বল তো?

—মেয়েটা বেল ক্লাবে নাচত আগে। তখন এর নাম ছিল মিস বেবি।

প্রথম লোকটি জিভে স্‌স্‌স্‌ শব্দ তুলে বলল, হুর র র র..., তাই বল। চোখ দুটো দেখেই তাই মনে হচ্ছিল, চিনি চিনি চিনি, ওগো বিদেশিনী।

শেষ বাক্যগুলো অদ্ভুত সুর করে গাইল লোকটা। গার্গী একটু যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তাহলে তাকে নিয়ে নয়, মিস লিজাকে নিয়েই কথাবার্তা চলছে দুজনের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ভুরুতে ভাঁজ পড়ে, এই মেয়েটাই বেল ক্লাবে নাচত আগে? বিশ্রী চেহারার লোক দুটোর বিচিত্র কথোপকথনের ফাঁকে এই অদ্ভুত অথচ জরুরি তথ্যটি জেনে ফেলে যেন ভারি সুবিধে হল গার্গীর। হিমন তখনও বসে আছে ঝুম্ হয়ে। বোধহয় এখনও অপেক্ষা করছে কারও জন্য। তার সেই বান্ধবীর জন্যই হয়তো। কিন্তু কে তার সেই বান্ধবী, যার সম্পর্কে দেবাদ্রি সান্যাল বলেছিলেন, চেন-স্মোকার! সে এই মিস্ লিজাই নাকি, যে আগে মিস বেবি নামে বেল ক্লাবে নাচত, এখন মিস লিজা হয়ে নাচছে এই 'দি আইডিয়াল নেস্ট'এ তাও কি সম্ভব!

মঞ্চের উপর মিস লিজার গান তখন শেষ হয়ে এসেছে। হলঘরের আলো কমে আসছে ফের। মৃদু হয়ে আসছে অর্কেস্ট্রার সুরও। তাতে চঞ্চল হয়ে উঠল হিমন। সে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত কাউন্টারের দিকে গেল। মুহূর্ত দেরি না করে গার্গীও টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল চকিতে। লোক দুজনকে একটুও বুঝতে না দিয়ে বিল মেটাতে সেও কাউন্টারের কাছাকাছি গেল। হিমনের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল আড়াল খুঁজে। হিমন কিন্তু কাউন্টারে গেল না, তার পাশ দিয়ে চলে গেল কিছুটা, সেখানে একটা দরজা। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিল মেটাচ্ছে, আর কালচে-চশমার আড়াল থেকে নজর রাখছে হিমনের দিকে। বুঝতে পারছে না, দরজায় নক করে কাকে ডাকছে হিমন।

একটু পরেই বন্ধ দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ। সঙ্গে সঙ্গে হিমন ঢুকে গেল তার ভেতর।

গার্গীর বিল মেটানো হয়ে গিয়েছিল। কাউন্টারের ম্যানেজারের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেও প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সেঁধিয়ে গেল দরজার ওদিকে। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। অন্ধকার ভেদ করে হিমন কোন দিকে গেল তা ঠাহর করে উঠতে পারল না। কিছুক্ষণ হিম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একা। চোখে অন্ধকার সয়ে এলে নজরে পড়ল, একটা সরু গলি। সাহস করে গলি বরাবর কিছুটা এগোল। গলির ঠিক শেষ মুখে একটা ঘর। দরজার ফাঁক দিয়ে তার ভেতরে তাকাতেই ভীষণ চমকে উঠল গার্গী। সেই স্বর্ণকেশী যুবতীর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে হিমন। নাচ শেষ করে যুবতী তখন সিগারেট ধরিয়েছে একটা। দেবাদ্রি সান্যাল যেমন বলেছিলেন, সেরকমই মিলে যাচ্ছে ঠিক-ঠিক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চেন-স্মোকারই মেয়েটা। হিমনকে কিছু যেন বলছে অনুচ্চকণ্ঠে। তারপর কাছেই একটা আলমারি খুলে একটা মোড়ক তুলে দিল হিমনের হাতে।

সেটা হাতে পেতেই হিমন অমনি ঘুরে দাঁড়াল। তাকে দরজার দিকে আসতে দেখেই গার্গী

চট করে চলে এল আড়াল খুঁজে নিয়ে। তার ভিতরে তখন উপচে পড়ছে প্রবল কৌতূহল। যুবতীর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল হিমনের! কিছু একটা চাইছিল যেন, কী চাইছিল! আলমারির ভেতর থেকে যেটা বার করে দিতেই ভারি খুশি দেখাল হিমনকে। কিন্তু কী এমন মহার্ঘ বস্তু যা হিমনের কাছে খুবই জরুরি! এই স্বর্ণকেশীই কি তাহলে হিমনের বান্ধবী? ভারি অদ্ভুত কাণ্ড তো; যে হিমনের স্ত্রী স্বামীর পঙ্গুত্বের দোহাই দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, ডিভোর্সের নোটিস পাঠায়, তারপর সম্পর্ক স্থাপন করে অন্য পুরুষের সঙ্গে, সেই হিমনই আবার এহেন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বান্ধবী জোটায় কীভাবে তা সত্যিই এক জটিল রহস্য। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ভারি গোলমেলে হয়ে উঠছে ক্রমশ।

হিমন কিন্তু দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও না। কৌতূহলী গার্গী দরজা দিয়ে উঁকি মারতে গিয়ে দেখল, এবার দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ভিতর থেকে, তার মানে ওরা দুজনেই এখন ঘরের মধ্যে। কী করছে ওরা এখন তা আর না ভেবে গার্গী এবার ফিরে আসতে চাইল অন্য দরজা দিয়ে। সেই মুহূর্তে অন্ধকারে কে যেন তাকে ধাক্কা মারল। গার্গী সপাটে পড়ে যেতে যেতেও কোনও ক্রমে সামলে নিল। নিশ্চয় কেউ তাকে অনুসরণ করে এসেছে তার পিছু পিছু। ভীষণ ভয় পেয়ে প্রায় দুদ্দাড় করে যে দরজা দিয়ে এই গলির অন্ধকারে ঢুকেছিল সেই দরজার দিকে ছুটে গেল। দরজাটা খোলা পেয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। দরজা পেরোতেই হলঘর। মঞ্চে ততক্ষণে আবার নীল আলোর বিচ্ছুরণ শুরু হয়েছে। নাচ শুরু করেছে অন্য একটি মেয়ে। সঙ্গে সেরকম বিশ্রী গান। কোনও ক্রমে টেবিলগুলো পার হতে গিয়ে দেখল, অনেকগুলো চোখ তাকে অনুসরণ করছে। কেউ কেউ যেন উঠে দাঁড়াল তাকে দেখে। গার্গী তখন হুড়মুড় করে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে মনে হল, বেশ কয়েকজন লোক বড় বড় পা ফেলে ধাওয়া করেছে তার পিছনে। হলঘর পেরোতেই ওপাশে সেই লন। কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটা। দুপাশে গাছগুলো ঝুপসি দেখাচ্ছে। ঘাসে পা দিতেই হঠাৎ একটা বড় ইটের টুকরো তার শরীরের কাছ ঘেঁসে তীব্রবেগে গিয়ে পড়ল লনের মাঝখানে। গার্গী কেঁপে উঠল ফের। তৎক্ষণাৎ তার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। পেছনে তখনও কেউ কেউ আসছে দ্রুত পায়ে। লন পেরিয়ে গেট খুলে রাস্তায় নামতেই কিছুটা আলোর হদিশ পেল। পেছন তাকিয়ে দেখল, তিন-চার জন লোক ধাওয়া করেছে তার পিছু পিছু, রাত অনেকটা হয়ে গেছে। পথে লোকজন, গাড়ি ঘোড়া থাকলেও সংখ্যায় কম। পরিবেশটাই কেমন গা ছমছমে। তিন-চারজন লোক তার মতো একজন একলা যুবতীকে হঠাৎ কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। এই অঞ্চলে।

কোনও কিছু না পেয়ে সামনেই একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে তাকেই ডাক দিল গার্গী। এদিককার ট্যাক্সিঅলারা ভাল হয় না, তবু ট্যাক্সিটা থামতেই প্রায় লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তাতে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল, লোকগুলোও উঠছে সেখানে দাঁড় করানো একাট অ্যাম্বাসাডারে। তারা উঠে বসতেই অ্যাম্বাসাডারটা বিদ্যুৎবেগে রওনা দিল তার ট্যাক্সির পিছু পিছু। গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, লোকগুলো কী করতে চায়। সে ক্রমাগত ট্যাক্সিওয়ালাকে একবার বাঁয়ের গলি একবার ডাইনের গলিতে ঢুকতে নির্দেশ দিয়ে যেতে লাগল রুদ্ধশ্বাস হয়ে। মধ্য কলকাতার এই অঞ্চলে এত রাস্তা আছে, এত তার লেন-বাইলেন যে অনেকক্ষণ লড়াই চালানো যায় এ-পথ ও-পথ ঘুরে। ট্যাক্সিওয়ালাও অবাক হয়েছিল, তারপর বাংলায় বলল, কোনও বিপদে পড়েছেন নাকি, মাইজি?

pathagar.net

গার্গী তখনও উত্তেজনায়, ভয়ে, আতঙ্কে হাঁপাচ্ছে। কোনও ক্রমে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

—আপনার ভয় নেই, মাইজি, বলে ট্যাক্সিওয়ালা নানান অলিগলি পার হয়ে কিছুক্ষণ পর সিধে ঢুকে পড়ল ল্যান্সডাউন ওরফে শরৎ বসু রোডে। স্বস্তির শ্বাস ফেলে তখন গার্গী বুঝতে চাইছে সমস্ত ব্যাপারটা। তাহলে একটা বিরাট চক্র কাজ করছে এত সব ঘটনার পেছনে! কারা তারা? হিমনই বা এদের সঙ্গে জুটল কী করে?

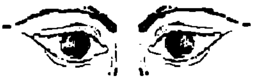

রুদ্ধশ্বাসে ট্যাক্সি থেকে নেমে, ট্যাক্সিওলাকে ভাড়ার দ্বিগুণ বকশিশ দিয়ে একছুটে ব্লু-ওয়ান্ডারের গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল গার্গী। ঘড়িতে তখন প্রায় রাত এগারোটার মতো। এত রাতে একা কখনও বাড়ি ফেরেনি সে। নিশ্চই সায়ন তার জন্য উৎকণ্ঠিত, উদগ্রীব হয়ে ঘরময় পায়চারি করছে বহুক্ষণ ধরে। অফিস থেকে বেরিয়ে হঠাৎ কোথায় হাওয়া হয়ে গেল গার্গী ভেবে হয়তো তোলপাড় করছে চারদিক। কী জানি থানা-পুলিশও করে ফেলল কি না এতক্ষণে।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সে আরও তাজ্জব। ঘর তালাবন্ধ, অর্থাৎ সায়নও ফেরেনি। ফেরেনি, নাকি ফিরে গার্গীকে না দেখে গার্গীর খোঁজ করতে টুঁড়ে বেড়াচ্ছে সারা কলকাতা!

একেই তো সারা সন্ধে এক বিচিত্র রোমাঞ্চ, রহস্য আর আতঙ্কে ওতপ্রোত হয়ে কাটিয়ে এখনও নীল হয়ে আছে, তার জের কাটেনি, রেলগাড়ি চলছে গোটা হৃৎপিণ্ড জুড়ে, তার ওপর সায়ন ঘরে নেই দেখে আরও এক উৎকণ্ঠা ঘিরে ধরল তার শরীর। দ্রুত অফিসে ফোন করে জানল সেখানে নেই। ফ্যাক্টরিতে ডায়াল ঘুরিয়েও হদিশ পাওয়া গেল না। সম্ভাব্য আর কোন গন্তব্য যোগাযোগ করলে তাকে পাওয়া যাবে বুঝে উঠতে না পেরে একে প্রবল হতাশায় সহসা ঝুম্ হয়ে গেল।

তা হলে এখন সে কী করবে!

নিজের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল হঠাৎ। শুধুমাত্র তার এক অ্যাডভঞ্চারের জন্যই, হঠকারিতাই বলা যায়, সায়নের এমন হয়রানি। এত রাত পর্যন্ত গার্গী না ফেরায় কী জানি কোথায় খুঁজছে, কত না ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে বেচারিকে! নাকি—

নাকি সায়ন নিজেই কোনও সমস্যার মধ্যে পড়েছে!

এহেন নানান দুর্ভাবনায় হিম হয়ে যেতে যেতে গার্গী একসময় দেখল, ঘড়ির কাঁটা আরও একঘণ্টা অতিক্রম করেছে। কলকাতা এখন মধ্যরাতের মুখোমুখি। শ্লথ হয়ে আসছে কলকাতার জীবনযাপন, কমে আসছে গাড়ি-চলাচলের পরিমাণ। কলকাতা ঢলে পড়ছে ঘুমের দিকে। একা এত বড় একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে থাকতে থাকতে গার্গীর হঠাৎ মনে হল, কারও যেন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে। কারও যেন ফিসফিস আওয়াজ। হঠাৎ প্রবল হর্ন বাজিয়ে একটি ভারী ট্রাক গাঁক গাঁক করে শরৎ বসু রোড কাঁপিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে বুকের ভেতর কাঁপ ধরিয়ে দিয়ে গেল। কেন যেন ভীষণ একটা অস্বস্তি শুরু হয়ে গেল তার ভেতর। মধ্যরাতে বিপুল একাকীত্বের ত্রাস হঠাৎ তাড়া করে এল তাকে। ভয়ঙ্করভাবে।

সেই মুহূর্তে হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠতে গার্গী লাফ দিয়ে ছুটে গেল ধরতে। নিশ্চই সায়নের ফোন।

pathagar.net

রিসিভার তুলতেই কিন্তু হতাশ হল, ম্যাডাম, কালীজীবন বলছি; হঠাৎ খুব একটা বিপদ হয়েছে—

—বিপদ! গার্গী চমকে উঠল। কেঁপেও উঠল ভীষণ।

—আমাদের একটা ট্রাক সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট করছে, বালি ব্রিজ পেরিয়ে আরও তিন কিলোমিটার দূরে, অন্য একটা ট্রাকের সঙ্গে।

—কখন হয়েছে অ্যাকসিডেন্টটা!

—সন্ধের দিকে। খবর পেয়েই আমাদের সাহেব চলে গেলেন ঘটনাস্থলে। যাওয়ার সময় আমাকে বলে গেলেন খবরটা আপনাকে দিতে। কিন্তু সন্ধে থেকে আপনাকে অনেকবার রিং করেও পাইনি। ফোন বেজেই যাচ্ছিল।

গার্গীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল প্রায়, কোনও ক্রমে বলল, এনি মিসহ্যাপ?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম। ড্রাইভার সিরিয়াসলি ইনজিওরড্। অন্য ট্রাকটা অ্যাক্সিডেন্ট করেই পালিয়ে গেছে। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। এখনও ধরা পড়েনি। এদিকে মালবোঝাই ট্রাক খাদে বহুক্ষণ কাত হয়ে পড়ে থাকায় বেশিরভাগ মাল লুট হয়ে গেছে।

গার্গীর হাত ঠকঠক করে কাঁপছিল। রিসিভার ধরেই রাখতে পারছিল না যেন। জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

—ফ্যাক্টরি থেকে, ম্যাডাম। সাহেব বলেছেন, ওঁর ফিরতে দেরি হবে।

রিসিভার যথাস্থানে রেখে বহুক্ষণ নিজের ভেতর তোলপাড় হল গার্গী। নিশ্চই এ নিছক দুর্ঘটনা নয়। অফিসে ও ফ্যাক্টরিতে তারা নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়ায় সেখানে অন্তর্ঘাত সম্ভব হয়নি বলে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের দাঁত আর নখ এখন বাড়িয়ে দিয়েছে রাস্তায়। গার্গীর ওপর পর-পর আক্রমণ তো চলেইছে, এখন নানানভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে প্যারাডাইসকে যে কোনও ভাবেই হোক শেষ করে দিতে। কিন্তু অত সহজে গার্গী ছাড়লে না তাদের, যে বা যারা এই যড়যন্ত্র সংঘটিত করে চলেছে, শাস্তি তাদের পেতে হবেই।

কিন্তু সায়ন হঠাৎ নিজেই বা কেন ছুটে গেল ঘটনাস্থলে। তার এখন পায়ে পায়ে বিপদ। তাবৎ পৃথিবী এখন তাকে ধ্বংস করতে ছুটে আসছে চক্ষু রক্তবর্ণ করে। তারা তো এরকম দুর্ঘটনা ঘটিয়ে চাইবেই সায়ন ছুটে আসুক সেখানে। তাহলে তার উপরও আক্রমণ চালাবে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে।

ভাবতে ভাবতে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠল গার্গী। নিজের অজান্তেই ফাঁদে পা দিয়েছে সায়ন। একটু আগেই গার্গী বুঝে এসেছে কী ভয়ঙ্কর জাল বিছানো রয়েছে তাদের চারদিকে। কী নৃশংস তাদের চাউনি, তবু সে এখনও বুঝতে পারছে না, হিমন কেন রোজ ওই বারে যায়, তার ওই অদ্ভুত বান্ধবীটিই বা কে—। সেই বিদেশিনী যার মাথায় সোনালি চুল, চোখের পাতায় সবুজ আইশ্যাডো, দুটি মণি কপার সালফেটের মতো নীলাভ সবুজ। সেখানে ভীষণদর্শন সব উটকো লোক গার্গীকে বাগে পেয়েছিল আজ। জীবন মুঠোয় নিয়ে ফিরে গার্গী এখনও দুঃস্বপ্ন দেখছে সেই সব দৃশ্যের। এর মধ্যে সায়ন হঠাৎ আরও কোন বিপদের মধ্যে পা দিয়ে ফেলল!

আর কিছু ভাবতে পারল না সে। তার আছে এখন কোনও বাহনও নেই যে সায়নের খোঁজে ছুটে যাবে। সায়ন বিপদে পড়লে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধার করবে, তা এই মুহূর্তে দুঃসাধ্য। কিছুই করার নেই তার একমাত্র দুশ্চিন্তায় ক্ষয় হওয়া ছাড়া।

সেই সময় হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে প্রথমে চমকে উঠল, পরমুহূর্তে স্বস্তির শ্বাস ফেলে ছুটল দরজার দিকে। নিশ্চই সায়ন এসেছে' এই ভেবে দুদ্দাড় করে ছিটকিনি খুলতে গিয়েও

একলহমা থমকে গেল, আই-হোলে চোখ দিতেই ধড়াস করে উঠল বুকের ভেতরটা। কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত!

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রবার্ট ও'নীল।

এত রাতে আবার রবার্ট ও'নীল কেন এসেছেন তাদের ফ্ল্যাটে!

ঠকঠক শব্দের রাশ বুকে নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল গার্গী। সে দরজা খুলবে না আজ, কিছুতেই খুলবে না। নিশ্চই সায়ন ঘরে নেই খবর নিয়েই এসেছেন রবার্ট। তাহলে নিশ্চই কোনও গভীর উদ্দেশ্য আছে এর মধ্যে। কী উদ্দেশ্য তা এখনও তার কাছে স্পষ্ট নয়, তবু—

বাইরে দাঁড়িয়ে আরও একবার কলিং বেলে হাত ছোঁয়ালেন রবার্ট। হয়তো ভাবছেন, নিশ্চই দরজা খুলে যাবে এরপর। গার্গী নিশ্চই আগের দিনের মতোই হাসিতে, উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। রবার্টের চেনা আরও অনেক নারীর মতো তারও মুখে ছড়িয়ে পড়বে এক স্বর্গীয় দ্যুতি।

কিন্তু না, দ্বিতীয়বারের ধ্বনিতেও দরজা খুলল না আজ।

একটু পরেই দরজার এপাশে স্তব্ধ, আতঙ্কিত গার্গী শুনতে পেল, সিঁড়ি দিয়ে ভারী জুতোর নেমে যাওয়ার শব্দ। সে শব্দের রেশ গার্গী অনুসরণ করল গেট অবধি। গেটের কাছে নীল মারুতিটা যে দাঁড়িয়ে ছিল তা এতক্ষণে খেয়ালে এল তার।

গার্গীর বুক থেকে একটা পাষাণভারও যেন নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। স্বস্তির শ্বাস ফেলল বড় করে, চোখ বুজল একলহমা, কিন্তু বিষণ্ণও হয়ে রইল কেন যেন। রবার্ট মানুষটাকে সেদিন রাতে এক বিচিত্র, প্রাণময় পুরুষ বলে মনে হয়েছিল তার। তাকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে হঠাৎ খুব কষ্ট হল আজ। হয়তো মানুষটা সত্যিই ভাল। সে শুধু শুধু সন্দেহ করছে তাকে।

কিন্তু সন্দেহ হওয়ার কারণও তো রয়েছে। তার গলায় পপসঙ হঠাৎ কীভাবে গিয়ে ভর করল 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর এক বিদেশিনী নর্তকির কণ্ঠে।

একই সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেল গার্গীর ভাবনায়। এদিকে ক্রমশ গভীর হয়ে আসছে রাত। নিশুতি হয়ে আসছে গোটা কলকাতা। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঐন্দ্রিলার কথা মনে পড়ে গেল তার। এখনও ঘরে একলা হলেই ঐন্দ্রিলার একটা নিঃশব্দ উপস্থিতি বড় বেশি টের পায় যেন। পাশের ঘরে খ্‌সখস্‌ শব্দ হলেই মনে হয়, ঐন্দ্রিলা পা টিপে টিপে হাঁটছে। খুবই নরম-সরম ছিল ঐন্দ্রিলা। তার হাঁটাচলা, তাকানো, উপস্থিতি সবখানেই এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য। তার কথা বলাও ছিল মৃদু, সায়ন বলত মনোসিলেবিক। সেরকমই মৃদু কণ্ঠস্বর যেন কোথাও ধ্বনিত হল এই গাঢ় নিশুতির ভেতর, কী রে, মিতুন—

পরক্ষণেই টেলিফোনের আবারও পিঁক পিঁক পিঁক। গার্গী দৌড়ে চলে গেল রিসিভার তুলতে। এবার নিশ্চই সায়নের, এমন ভেবে কানে লাগাতেই এক ধরনের ঘড়ঘড় কণ্ঠস্বরে হাত-পা হিম হয়ে গেল তার।

—সাপের লেজে পা দিচ্ছেন, ম্যাডাম। যে পর্যন্ত এগিয়েছেন, ওখানেই থামুন। নইলে আপনাকেও ঐন্দ্রিলা চৌধুরীর মতো একতাল পোড়া মাংস হয়ে শুয়ে থাকতে হবে ঘরের মেঝেয়।

রিসিভারটা ঝপাং করে খসে পড়ল গার্গীর হাত থেকে। পরিষ্কার শাসানি। ঘড়ঘড়ে পুরুষ কণ্ঠ স্পষ্ট ধমক দিয়ে নিবৃত্ত করতে চাইল তাকে। গার্গী যে অনুসন্ধানের কাজে এগিয়ে গিয়েছে

অনেকটা, ফলে ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে রহস্য, এই ভূতুড়ে-কণ্ঠ তাই-ই বোধহয় মনে করিয়ে দিল তাকে। কিন্তু গার্গী তবুও ধন্দে আছে সে সত্যিই কতটুকু এগিয়েছে। সে একবার রৌণক মুখার্জির পিছনে পিছনে ধাওয়া করেছে, একবার 'দি আইডিয়াল নেস্টে' হিমনের পিছু পিছু, কখনও দৃষ্টি রাখছে তাদের পাশের ফ্ল্যাটে চোখজোড়ার দিকে। কখনও নজরদারি করছে তার অফিসের প্রতিটি সেকশনে। এর মধ্যে প্রকৃত রহস্যের চাবিকাঠি কোথায়? কীভাবেই বা সে উদঘাটিত করবে ঐন্দ্রিলার হত্যারহস্য। ঠিকঠাক প্রমাণ না পেলে শুধুমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করেই কি হত্যাকারীকে শনাক্ত করা যায়!

মধ্যরাত পর্যন্ত এহেন হাজারো ভাবনায়, দুর্ভাবনা ও আশঙ্কায় টালমাটাল হয়ে রইল। উত্তেজনায়, ভয়ে তার শরীরে খিদে পর্যন্ত নেই। সায়ন একরাশ বিপদের মধ্যে কোথায় সেই জি টি রোডে নাস্তানাবুদ হচ্ছে, তার কী হচ্ছে কিছুই ভেবে থই পাচ্ছে না, খিদে পায়ই বা কী করে!

'ম্যাডাম, সাপের লেজে পা দিয়েছেন' শব্দবন্ধটি তাকে এখনও ঘোর চিন্তায় রেখেছে। এই ঘড়ঘড়ে কণ্ঠস্বর কি সেই স্বর যা ছয়ই এপ্রিল ভোররাতে ঘুম ভাঙিয়েছিল থানার অফিসারদের, ঐন্দ্রিলার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে দিয়েছিল জল্লাদের মতো! সেই কণ্ঠস্বর কি আজ গার্গীর মৃত্যুদণ্ডও ঘোষণা করল পরম নিরাসক্ত ভঙ্গিতে!

গার্গী একমুহূর্ত ভাবল, ফোন করে পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালকে সব কিছু ইন-টো-টো জানাবে কি না। জি টি রোডে অ্যাক্সিডেন্টের খবর, সায়নের ঘটনাস্থলে ছুটে যাওয়া, বারে গিয়ে গার্গীর বিপদে পড়া, টেলিফোনের হুমকি—সব।

পরক্ষণেই অবশ্য থমকে গেল। সায়নের জন্য আরও একটু অপেক্ষা করবে। তারপর না হয়—

পরবর্তী কলিং বেল যখন বেজে উঠল, ঘড়িতে তখন রাত দুটো। এবার আই-হোলে চোখ রাখতেই লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁ, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে সায়নই। দরজা খুলতেই পরিশ্রমে টেনশনে, পর্যাপ্ত ক্লান্তিতে...চুরমুর হওয়া সায়ন প্রায় টলতে টলতে ঘরে ঢুকল।

তার চেহারা দেখে গার্গীও টাল খেয়ে গেল যেন।

ঘরে পা দিয়েই প্রথম যে কথাটা সায়নের মুখে উচ্চারিত হল, একটা বড় দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলাম না, গার্গী।

গার্গী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, ড্রাইভার? সায়ন মাথা নাড়ল, কলকাতা পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম ওখানকার হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে। কিন্তু ইনটারনাল হেমারেজ। তা ছাড়া লাংসও ড্যামেজড হয়ে গিয়েছিল স্টিয়ারিং বসে গিয়ে। একটা পা-ও অ্যামপুট করতে হত—

গার্গী আর ভাবতে পারল না। যে বীভৎস দৃশ্য সে দেখেনি, তা শুধু কল্পনা করে যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ। কী সাংঘাতিক, কী ভয়ঙ্কর!

—বুঝলে, একটা আফসোস রয়ে গেল। লোকটার নাম বিষেনচাঁদ। মাত্র গত সপ্তাহে এসেছিল ছুটি চাইতে। এক বছর হয়ে গেল দেশে যায়নি, বালবাচ্চা দ্যাখেনি। বলেছিলাম, আর কটা দিন অপেক্ষা করতে। মাল ডেসপ্যাচ হয়ে গেলেই—

বলতে বলতে সায়ন থামল। কথা বলতে গিয়ে গলা ধরে আসছে তার। একটু পরে আবার বলল, আজ বিকেলে যখন ট্রাক লোড হচ্ছিল, লোকটা কী উৎসাহে পিঠ চাপড়ে শক্তি জোগাচ্ছিল লোডারদের। তখনও ভাবতে পারেনি আজই তার শেষ দিন।

pathagar.net

সে রাতে অনেকক্ষণ দু-চোখের পাতা এক করতে পারল না গার্গী। সায়নের কষ্টটা অনুভব করতে পারছিল। সেও যে সায়নের মতো এই মধ্যরাত পর্যন্ত আর এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়েছে তা একবারও জানতে দিল না সায়নকে। এর মধ্যে ভোর রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি। যখন ঘুম ভাঙল, বেলা হয়ে গেছে অনেকটা। ধড়মড় করে উঠে দেখল, ভোরের দিকে কখন যে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে তা অগোচরে থেকে গিয়েছিল তাদের। বাতাসে সামান্য আর্দ্রতা। মেঘও আছে আকাশে, ফলে রোদের আভাসমাত্র নেই। দ্রুত বিছানা থেকে উঠে ব্যস্ত হয়ে পড়ল চা করতে।

চায়ের টেবিলে বসে দুজনে অনেকক্ষণ কালকের দুর্ঘটনার কথাই নাড়াচাড়া করল বিষণ্ণ গলায়। এক সময় সায়ন বলল, কৌশিক দত্ত চলে যাওয়ার পর প্রোডাকশন ম্যানেজারের পোস্টটা ভেকেন্টই রয়ে গেল।

গার্গী চোখ তুলল। সায়ন কী বলতে চায় বোধহয় তাইই অনুমান করার চেষ্টা করল।

—তুমি বোধহয় শুনেছ, রাহুল রায় হ্যাজ বিন স্যাক্‌ড্। লাইম ইন্ডিয়াতে আর নেই।

গার্গী মাত্র গতকালই পেয়েছিল খবরটা। লাইম ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান শেষ পর্যন্ত তাঁর কোম্পানির টলমল অবস্থা সামাল দিতে বরখাস্ত করেছেন প্রোডাকশন ম্যানেজারকে। সে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আস্তে করে ঘাড় নাড়ল শুনেছি।

—রাহুল রায় প্যারাডাইসে জয়েন করতে চায়।

গার্গী এতক্ষণে বিস্ময় প্রকাশ করল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ভাবছি, নিয়ে নেব কি না। তেমন ভাল কাউকে যখন হাতের কাছে পাচ্ছি না—

গার্গীর ভুরুতে কোঁচ পড়ল, নিজেই এসেছিল নাকি?

—না। কালীজীবনবাবুই কাল আমার কাছে এসে বললেন।

—কালীজীবনবাবু! গার্গীর কাপ থেকে কিছু চা চলকে পড়ল যেন। একটু ভেবে নিয়ে বলল, রাহুল রায় সম্পর্কে সব খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে?

—তা ঠিক নিইনি। কিন্তু লাইম ইন্ডিয়ায় বহুদিন ধরে আছে। ওর সম্পর্কে একমাত্র অভিযোগ হল, ভাল প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। কোনও নতুন ফর্মুলা বার করতে পারেনি বলেই চলে যেতে হল ওকে। সে প্রব্লেম তো আমার কোম্পানিতে নেই। শুধু ফ্যাক্টরি সামাল দিতে পারলেই হবে।

গার্গী তবু একমত হতে পারল না, আস্তে করে বলল, এখনই কোনও ডিসিশন নিতে হবে না। আরও কয়েকদিন যাক।

সায়ন অবাক হয়ে তাকাল গার্গীর দিকে, কী বুঝল কে জানে, তারপর মৃদু হেসে বলল, ঠিক আছে, এম.ডি যখন চাইছেন না, তাহলে থাক।

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, সায়ন তার এই সিদ্ধান্তে অখুশি হয়েছে কি না। বলল, প্রোডাকশন ম্যানেজার না থাকায় তোমার উপর খুব চাপ বেড়ে গেছে, তাই না?

—সে আমি ঠিক সামলে নেব। কিন্তু কাল অফিসে কানে এল, হয়তো মধুমন্তী রায় মজুমদারও চাকরি ছেড়ে দেবে।

—তাই নাকি? গার্গী এবার সত্যিই আশ্চর্য হল, কেন?

—ঠিক অনুমান করতে পারছি না। তবে কৌশিক দত্তের রেজিগনেশনের সঙ্গে হয়তো মধুমন্তীর চাকরি ছাড়ার কোনও সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। এর আগে কঙ্কা রায় চলে গেছে, তারপর পি.এম। এখন যদি অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারও যায়, খুব সমস্যা হবে।

pathagar.net

খুব অবাক হয়ে গার্গী ভাবতে বসল, কাল দুপুরেও মধুমন্তীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে পরবর্তী বিজ্ঞাপনের লে-আউট নিয়ে, কই, তখন তো একটুও বুঝতে পারেনি। হেসে বলল, ঠিক আছে, দেখা যাক কী করা যায়।

সেদিন একটু দেরিতে অফিসে পৌঁছে গার্গী দেখল, সারা অফিসে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা। সেকশনে সেকশনে গুঞ্জন, ফিসফাস চলছেই। কোথাও কোথাও তর্কবিতর্ক চলছে মৃদু স্বরে। এও খবর পেল, ফ্যাক্টরিতে উত্তেজনা আরও বেশি। কালকের ট্রাক দুর্ঘটনায় অল্পবিস্তর সবাই-ই বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, কেউ বা আতঙ্কিতও। পরপর এত সব দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাদের প্যারাডাইস যে বেশ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তাতে কারওরই সন্দেহ নেই। যে ড্রাইভারটি মারা গিয়েছে তার পরিবারের কথা ভেবে অনেকেই বিষণ্ণ হয়ে আছে।

এক সময় মধুমন্তী রায় মজুমদার গার্গীর চেম্বারে ঢুকল হাতে একরাশ নতুন লে-আউট নিয়ে। জেসমিন ফ্লেভারের ওপর রঙিন সব অ্যাড তৈরি করা হয়েছে। কোনওটা কুড়ি সে.মি. বাই চার কলম। কোনওটা বা সাপ্তাহিকে কিংবা পাক্ষিকে। জোর ক্যাম্পেন চলবে কয়েক সপ্তাহ।

কথা বলতে বলতে গার্গী মধুমন্তীর কানের দিকে তাকাল। আজ আর বেগুনি পাথর নেই মধুমন্তীর দুলে। পরিবর্তে সবুজ পাথর। যাকে বলে এমারেল্ড গ্রিন। কিন্তু সবুজ রংটা আজ হঠাৎ কেন যেন চোখে লাগছে তার। মধুমন্তী আঙুলে যে আংটিটা পরেছে তাতেও সবুজ পাথর বসানো। মধুমন্তী যে খুবই শৌখিন তা তার পোশাক-আশাক, সাজগোজ, অলঙ্কার দেখলেই অনুমিত হয়। হয়তো আগেও এমনই সাজতেন, মাঝখানে বোধহয় ডিভোর্সের কারণেই বিষণ্ণ দেখাত তাঁকে। এখন আবার ফিরে এসেছে সাজ।

গার্গী লে-আউটগুলো দেখতে দেখতে তার ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করছিল মধুমন্তীর সঙ্গে। মধুমন্তী যে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে তা কিন্তু একবারের জন্যও তার কথাবার্তা শুনে আঁচ করা গেল না। তার মানে মধুমন্তী খুবই চাপা। তার ভেতরে যে আঁচ আছে তার উত্তাপ চেপে রাখতে পারে খুব সহজে। এ ধরনের মেয়ে কিন্তু খুব সহজ হয় না।

বিকেলের দিকে ফ্যাক্টরি থেকে একটা বিপজ্জনক খবর এল, ট্রাক ড্রাইভাররা কেউই মাল লোড করতে চাইছে না। একযোগে বেঁকে বসেছে সবাই। তারা বলছে, প্যারাডাইসের কপালে এখন শনি লেগেছে। কোন ট্রাক কখন অ্যাকসিডেন্টের কবলে পড়বে তা কেউ জানেনা। এমনকি ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি যে ট্রাকগুলো পাঠিয়েছিল, তারাও প্যারাডাইসের মাল নিয়ে রাস্তায় বেরোবে না বলেছে।

গার্গী বুঝে উঠতে পারল না, ড্রাইভাররা হঠাৎ একযোগে খেপে উঠল কেন। অ্যাকসিডেন্টের উপর তো কারও হাত নেই। তা হলে কি কেউ বা কারা খেপিয়ে তুলছে ড্রাইভারদের? স্যাবোটেজ! ষড়যন্ত্র! এবার খোলাখুলি আক্রমণ করছে যাতে আর মাল ডেসপ্যাচ না হতে পারে!

সায়নের চেম্বারে গিয়ে দেখল, সংবাদ পেয়েই সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ফ্যাক্টরিতে। অনেক রাত পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেল তাতে জানা গেছে কোনও সুরাহা হয়নি। কোনও ট্রাকই আর প্যারাডাইসের মাল নিয়ে ডিউটিতে বেরোবে না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছে।

তার মানে প্রোডাক্ট আর পৌঁছাবে না মার্কেটে! তাহলে তো প্যারাডাইসের সামনে সমূহ বিপদ!

pathagar.net

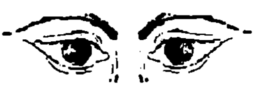

গভীর রাতে হতাশ, বিষণ্ণ মুখে ফিরে এসে সায়ন জানাল, সারাদিন তার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ, কোনও ট্রাক-ড্রাইভারই আর প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের সাবান বহন করবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। তাদের এই জোট বেঁধে মাল বইতে অস্বীকার করা—এটা অন্তর্ঘাত, উদ্দেশ্যমূলক, নাকি স্বতঃপ্রণোদিত, তা না-সায়ন না-গার্গী কেউই বুঝে উঠতে পারল না। অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করেও কীভাবে এই কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করা যায় তার কোনও উপায়ও খুঁজে পেল না ওরা। শুধু মনে হল, তাদের এত উদ্যোগ, পরিশ্রম, সবই হার মানছে কোনও প্রবল শক্তির কাছে।

প্রায় মাঝরাতের দিকে, যখন তাদের কারও চোখেই ঘুম নেই, হঠাৎ পাশের ফ্ল্যাট থেকে চন্দ্রাদেবীর চিৎকার শোনা গেল। সেই জাহাঁবাজি গলার তুমুল দাপানি নয়, ক্রুদ্ধ, অথচ উৎকণ্ঠা মেশানো। গার্গী বিছানা থেকে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ঘটনাটা। রবার্ট ও'নীল অন্যদিনকার মতো ফিরে যাননি আজ। অনুচ্চকণ্ঠে এটা-ওটা বলে তিনি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন চন্দ্রাদেবীকে, তবু তাঁর উচ্চকিত স্বর, কথাবার্তার ধরন শুনে মনে হল, এমন কোনও ঘটনা, যা-ব্লু-ওয়ান্ডারের জীবনযাত্রার পক্ষে অস্বাভাবিক শুধু নয়, অসম্ভব কোনও কিছু।

জিজ্ঞাসু চোখে গার্গী তাকাল সায়নের দিকে, কী ব্যাপার বলো তো?

সায়ন ঠোঁট ওল্টাল, কী আবার! নিশ্চয় রবার্ট আবার নতুন কোনও রূপসী বান্ধবী জুটিয়েছেন, অতএব পুরানো বান্ধবী পুনরায় ঈর্ষায় জরজর। মাঝরাতে হই-রই কাণ্ড করে নতুন অ্যাফেয়ারটিতে ব্রেক কষতে চাইছেন।

—সত্যিই আশ্চর্য এই জুটি। দম্পতি না হয়েও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দাম্পত্যকলহ চালিয়ে গেলেন।

—কিন্তু ও সব ভাবনা এখন থাক। ট্রাক-ড্রাইভারদের গাড়ি চালাতে রাজি না করাতে পারলে নতুন প্রোডাক্ট সব জমে যাবে স্টোরে। সেক্ষেত্রে ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশনও বন্ধ করে দিতে হবে কাল থেকে।

গার্গী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল তার অভ্যাসমতো, ঠিক আছে, তাহলে কাল আমিই না হয় একবার চেষ্টা করব মেটাতে। অফিসে না গিয়ে ফ্যাক্টরিতেই যাব প্রথমে।

সায়ন অবাক হল, তারপর স্বস্তির শ্বাস ফেলে একটু হাসল, দেখা যাক। চেয়ারম্যান যে কাজে ব্যর্থ হল, সে কাজ ম্যানেজিং ডিরেক্টর পারেন কি না।

সায়ন স্বস্তির শ্বাস ফেলল মানে দায়িত্বটি চেপে বসল গার্গীর কাঁধে। সেও হেসে বলল, শুধু সাবানের ফর্মুলা বার করেই প্যারাডাইসের নিস্তার নেই, এত সব অন্তর্ঘাত, দুর্ঘটনা থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যাবে তারও ফর্মুলা বার করতে হবে এবার।

বাকি রাতটুকু কীভাবে ট্রান্সপোর্টের এহেন ঝামেলা মেটানো যাবে তাই-ই শুধু ভাবল না গার্গী, মনঃসংযোগ করল পাশের ফ্ল্যাটের ঘটনাবলিতেও। চন্দ্রাদেবীর কণ্ঠস্বর শুনে দাম্পত্য-কলহই মনে হয়নি তার। নিশ্চয় পিছনে আছে এমন কোনও অভাবিত ঘটনা যা চন্দ্রাদেবীকে উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে। কী সেই উৎকণ্ঠা, কেনই বা, এমন প্রশ্নে কৌতূহলী হয়ে

কাক-ভোরে উঠেই প্রথমে মোহনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে, বলো তো মোহন? সারারাত এত চ্যাঁচামেচি হয়েছে ও-ফ্ল্যাটে!

মোহন খুবই চাপা ধরনের লোক। বিশেষ করে পাশের ফ্ল্যাটেরই সে বেশি আজ্ঞাবহ বলে গার্গীদের কাছে চট করে কিছু প্রকাশ করতে চায় না। কিন্তু গার্গী সুকৌশলে গত কয়েকদিন বেশ পটিয়ে নিয়েছে মোহনকে। মোহন এখন অনেক কথাই অবসর সময়ে গার্গীকে বলে। আজ অবশ্য সে নিজেই খুব শঙ্কিত, গার্গীকে জানাল, হিমন কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি।

গার্গী সামান্য চমকে উঠল। হিমন একেবারেই বাড়ি ফেরেনি এমন ঘটনা নাকি কখনওই ঘটেনি এর আগে। তার বাড়ি না ফেরার সম্ভাব্য কারণ কী কী হতে পারে, কোনও গূঢ় রহস্য এর ভেতর থাকতে পারে কি না তা খতিয়ে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সেদিনের খবরের কাগজে প্রকাশিত ছোট্ট একটি সংবাদের দিকে চোখ পড়ল তার। এবং বলাবাহুল্য স্তম্ভিত হল।

পার্ক স্ট্রিটের একটি বারে আগের দিন সন্ধেয় প্রবল গোলমাল হয়েছে। সামান্য কথা-কাটাকাটি থেকে বচসা, তারপর সংঘর্ষ, সংঘর্ষের কারণে খুন হয়েছে একজন অবাঙালি ব্যবসায়ী। বচসার কারণ যতদূর জানা গেছে একজন নর্তকিকে কেন্দ্র করেই।

ঘটনার এই পর্যন্ত পড়ে তেমন বিস্ময়ের কিছু ছিল না, কারণ এসব বারে সন্ধের পর এ ধরনের ঝগড়া, মারামারি, এমনকি খুনোখুনিও তেমন নতুন কিছু নয়। গার্গীকে যা চমকে দিল, তা হল বারটির নাম। 'দি আইডিয়াল নেস্ট।'

সংবাদটি হয়তো সায়নের চোখেও পড়েছে, কিন্তু সে 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নয়, ফলে ঘটনাটি তাকে বিচলিত করেনি বিন্দুমাত্র। কিন্তু গার্গী তো এই বার-কাম-রেস্তোরাঁটিকে হাড়ে-হাড়ে চিনে এসেছে সেদিন। তৎক্ষণাৎ ভীষণ একটা টেনশন আক্রান্ত করল গার্গীকে। হিমন নিশ্চই তার অভ্যাসমতো কাল সন্ধেয় গিয়েছিল 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ। সংঘর্ষের সময় হয়তো উপস্থিতও ছিল সেখানে। তারপর তার এহেন আকস্মিক অন্তর্ধান রীতিমতো আশঙ্কার কথা। সঙ্গে সঙ্গে যে দুটি প্রশ্ন গার্গীর মগজে চক্কর দিয়ে উঠল, তা হল যারা অবাঙালি ব্যবসায়ীকে খুন করেছে, তারাই হিমনকে গুম করে ফেলেছে কি না, অথবা দুই, হিমন নিজেই এই খুনের সঙ্গে জড়িত, খুনের পরই সে গা-ঢাকা দিয়েছে কোথাও।

দুটো ভাবনাই প্রবলভাবে আলোড়িত করল গার্গীকে। এ বাড়ির বাকি কেউই হিমনের অন্তর্ধানের আসল কারণ ধারণাই করতে পারছে না। পারেনি বলেই এখনও তেমন শোরগোল ওঠেনি। নইলে ঐন্দ্রিলা-হত্যা রহস্যের মতো এ ঘটনাটাও প্রতিবেশী, পুলিশ ও সাংবাদিকদের চমকে দেওয়ারই মতো।

সেদিন সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে গার্গীর মনে হল, ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং তার এই মুহূর্তে একবার 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ যাওয়া দরকার। পরশু রাতে জায়গাটিকে ভারি রহস্যময় বলে মনে হয়েছিল। বিশেষ করে হিমনের চালচলন, তার গতিবিধি সম্পর্কে এখনও কিছুই জানা হয়ে ওঠেনি। সংবাদের নর্তকি বলতে কি তার সেদিনকার দেখা সেই স্বর্ণকেশী মিস লিজাই! নাকি 'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এর আরও এমন বহু নর্তকি আছে, তাদের কাউকে কেন্দ্র করেই সংঘর্ষ ঘটেছে গতকাল সন্ধেয়! হিমনই বা কোথায় গেল। হিমন বেঁচে আছে তো! না থাকাটাও অস্বাভাবিক নয় এই কারণে যে, অমন একটি বীভৎস পরিবেশে সে রোজ যায়, সেখানে তার কিছু অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে,

অতএব তার চরিত্রগত দিকটি ভারি রহস্যে মোড়া, এ ধরনের জায়গায় যে-কোনও মুহূর্তে যা কিছু ঘটাই সম্ভব। অবৈধ যে-কোনও ব্যাপারেই মানুষকে অকারণ জটিলতায় নিয়ে যায় শেষপর্যন্ত। যার পরিণতিতে এহেন খেসারত।

'দি আইডিয়াল নেস্ট'-এ যাওয়ার ভাবনাটা খুবই ভাবিত করল গার্গীকে। দিনের বেলায় তো নয়ই, সন্ধের পর ছদ্মবেশে যাওয়াও বোধহয় খুবই ঝুঁকির কাজ হবে। বিশেষ করে একা কোনও মহিলার পক্ষে ওরকম জঘন্য পটভূমিকায় পা দেওয়া মানেই হাজারো বিপদ ডেকে আনা। কিন্তু কেন যেন গার্গীর কেবলই মনে হচ্ছে এই ছোট্ট অথচ নৃশংস ঘটনাটি থেকে রহস্যের কোনও হালহদিশ উন্মোচিত হলেও হতে পারে। অতএব—

অতএব আরও একবার আজ সন্ধেয় সে এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় রত হবে। অতএব—

সম্ভাব্য যে বিপদই তার সামনে আসুক না কেন, আবারও সাপের লেজে পা দিতে হবে সব জেনেশুনেই।

কিন্তু তার আগে আপাতত তাকে যেতে হবে ফ্যাক্টরিতে। ট্রাক-ড্রাইভারদের নারাজ হওয়ার অন্তরালে কার হাত কাজ করছে তাও খুঁজে বার করা জরুরি। যে অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে পরশু প্যারাডাইসের একটি ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল, যার পরিণতিতে মারা গেল বিষেনচাঁদ নামে ড্রাইভারটি, লুট হয়ে গেল এক ট্রাক জেসমিন ফ্লেভার, সম্ভবত সেই একই বিরুদ্ধ শক্তি সুচতুরভাবে কাজ করে চলেছে ট্রাক-ধর্মঘটের পিছনেও। সেই শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে না পারলেই তো ডাহা হেরে ভূত হয়ে যাবে গার্গীরা।

সায়ন খুবই বিষণ্ণ হয়েছিল। সে খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ে। আসলে মেধাবী, উদ্যমী পুরুষ ব্যস্ত থাকতে ভালবাসে তার উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ডে, নতুন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়াটাই তাদের পছন্দ, কিন্তু বিপক্ষশক্তির সঙ্গে লড়াই দিতে হলেই ঘাবড়ে যায়, পিছু হটে আসতে চায় তৎক্ষণাৎ। গার্গী বোধহয় ঠিক তার বিপরীত, তার মেধা তেমন নেই যে নতুন কিছু আবিষ্কার করে চমকে দিতে পারে পৃথিবীকে, কিন্তু প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে পিছপা হয় না। যে ভয়ঙ্কর শক্তিই এতসব রহস্যের অন্তরালে থাকুক না কেন, যত শাসানিই দিক না কেন, একটা কিছু এসপার-ওসপার করতেই হবে এবার।

খুবই চিন্তামগ্ন হয়ে ফ্যাক্টরিতে বেরোবার মুখে সায়ন হঠাৎ বলল, একজন প্রোডাকশন ম্যানেজার থাকলে হয়তো ফ্যাক্টরির এই সব ঝুট-ঝামেলা সামাল দিতে পারত।

গার্গী সায়নের দিকে তাকাল একবার, গম্ভীর মুখে বলল, তুমি কি রাহুল রায়কে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে কি না তাইই বলতে চাইছ?

সায়ন ইতস্তত করল, কিন্তু কিছু বলল না।

—রাহুল রায়ের ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবিই থাক। আর একটু খোঁজখবর নিই। অত তাড়াহুড়োর কী আছে?

সায়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে থাক।

সেদিন ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে আরও এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মুখোমুখি হল তারা। কাল গভীররাতে কে যেন ফোন করেছিল ফ্যাক্টরিতে। ফোন ধরেছিল নাইটগার্ড এতওয়ারি। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ তুলে সেই পুরুষ বলেছে, ফ্যাক্টরির ভেতর ভীষণ শক্তিশালী একটা বোমা রেখে দেওয়া হয়েছে, যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণে উড়ে যাবে গোটা ফ্যাক্টরি। এতওয়ারি ভয় পেয়ে সে রাতেই খবর দেয় ওয়ার্কস ম্যানেজার বরুণ নন্দীকে। তৎক্ষণাৎ বরুণ নন্দী কয়েকজন

pathagar.net

লেবার নিয়ে এসে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে ফ্যাক্টরির সর্বত্র। কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কোনও প্যাকেট বা বস্তা পাওয়া যায়নি। ঘটনাটা তারা রাতেই চেয়ারম্যানকে জানায়নি এই ভেবে যে, ফোনটা যেহেতু নিতান্তই ভূতুড়ে, শুধু শুধু তাঁকে এই রাতদুপুরে বিরক্ত করার দরকার নেই।

কিন্তু এখন সে কথা শুনে সায়ন বিরক্তই হল যেন। বলল, তবু ব্যাপারটা জানানো উচিত ছিল। সত্যিই যদি কোনও মিস্‌হ্যাপ হত আগের বারের মতো। বিশেষ করে পরপর এত সব দুর্ঘটনা যখন ঘটেই চলেছে। একটা ক্যাজুয়ালটি মানে কোম্পানির ওপর ভীষণ চাপ বেড়ে যায়।

সায়নের কথায় অবশ্য সত্যতা আছে। যে-কোনও দুর্ঘটনা আবারও ঘটতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। ট্রাক-ড্রাইভারদের নিয়ে যা জট পাকিয়েছে তা ছাড়াতে গিয়ে কাল সারাদিন হিমশিম খেয়েছে সায়ন, তবু সফল হয়নি। আজও সবাই জোট পাকিয়ে রয়েছে। সকাল থেকে একটি ট্রাকও ছাড়েনি ফ্যাক্টরির গেট থেকে। কাল থেকে মাল লোডই হয়নি তো!

গার্গী বহুক্ষণ ধরে ভেবে চলেছিল, কীভাবে এই ঝামেলার ফয়সালা করা যায়। ফ্যাক্টরির কোনও অফিসারকে না ডেকে সে একাই বসল সমস্ত ট্রাক-ড্রাইভারকে নিয়ে। দীর্ঘ সময় ধরে তাদের কথা মন দিয়ে শুনল। অন্তত ঘণ্টাদেড়েক। যার মনে যত শঙ্কা, ভীতি জমা হয়েছিল সব মন উজাড় করে বলতে দিল একে-একে। আশঙ্কা ও ভয়ের সঙ্গে কিছু অভিযোগ, কিছু দাবিদাওয়ার কথাও শুনল ধৈর্য ধরে। এসব ক্ষেত্রে 'পেশেন্ট হিয়ারিং' একটা মস্ত ওষুধ। যখন সব কথা নিঃশেষ করে বলা হয়ে যাবে, মনের ক্ষোভও কমে যায় অনেকখানি, সমাধানের ক্ষেত্রেও অমনই প্রস্তুত হয়ে যায়। দাবিদাওয়ার কথাই প্রথমে মেনে নিল গার্গী, অভিযোগের প্রতিকারও করবে এমন আশ্বাস দিল। সবশেষে বলল, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ যে ঘোর প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি, তা এভাবে চলতে দিলে হয়তো কোম্পানি বন্ধই হয়ে যাবে এরপর। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তা রোজ রোজ ঘটে না। বিষেনচাঁদের পরিবারকে শুধু এককালীন ক্ষতিপূরণই দেওয়া হবে তা নয়, তার পরিবারের একজনকে তারা কোম্পানিতে এখনই বহাল করবে।

কিন্তু এতোও যখন কোনও কোনও ড্রাইভার বলল, তারা রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছে, গার্গী দমে না গিয়ে বলল, ঠিক আছে, কাল সকালে মাত্র একটি ট্রিপই হবে। কৃষ্ণনগর যাওয়ার জন্য যে ট্রাকটি গত দুদিন ধরে মাল লোড হয়ে অপেক্ষা করছে, আমি সেই ট্রাকের সামনের সিটে বসে যাব। যদি দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে আমার ওপর দিয়েই হোক।

ড্রাইভাররা পরস্পর চোখাচোখি করল। কোম্পানির মালকান নিজেই ট্রাকের সওয়ারি হতে চাইছেন, সেটা হয় কি না, হওয়া সম্ভব কি না তারা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

গার্গী পুনর্বার বলল, তাহলে কাল ভোর ছটায় রওনা হব, যাতে সন্ধের আগেই মাল খালাস করে ফিরে আসা যায়? যদি তার পরেও কারও দ্বিধা থাকে, তাহলে পরশু আবার বেরোব অন্যদিকে। কাটোয়া, কিংবা বনগাঁ, অথবা কাকদ্বীপ।

জীবনলাল নামে এক ড্রাইভার বলল, আমরা একটু ভেবে দেখি।

—ভাবাভাবির তো কিছু নেই, জীবনলাল। তোমাদের সব দাবিদাওয়াই তো মেনে নেওয়া হয়েছে। একমাত্র ভয় ছিল দুর্ঘটনার। আমি সঙ্গে থাকলে কোনও দুর্ঘটনাই ঘটবে না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। অতএব কাল ভোর থেকেই ডেসপ্যাচ শুরু হোক। দিনসাতেকের মধ্যে সমস্ত ডেলিভারি করে ফেলতে পারলে একদিন ফ্যাক্টরিতে সবাই মিলে ভোজ হবে।

আরও আধঘণ্টা তুমুল কচকচানির পর সবাইকার প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল একসঙ্গে। ঠিক হল, ট্রাকের সঙ্গে মালকানের যাওয়ার দরকার নেই। তবে কাল ভোরে গার্গী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একে-একে সব ট্রাককেই রওনা করিয়ে দেবে ফ্যাক্টরির গেট থেকে। শুধু মালকানের অনুরোধেই তারা কাল পথে ট্রাক নামাবে। কিন্তু যদি আবার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে—

গার্গী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তারা বা তাদের পরিবার যে সুযোগ-সুবিধা চাইবে, কোম্পানি তা-ই মঞ্জুর করবে।

আবেগের বশে অনেকটাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলল গার্গী। সায়ন এতক্ষণ ফ্যাক্টরির ভেতর প্রোডাকশনের কাজ দেখতে ব্যস্ত ছিল। তাকে এতক্ষণের সমস্ত আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধারাবিবরণীর মতো বলে গেল গার্গী। সায়ন মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, যা-হোক অসম্ভবকে সম্ভব যখন করেছ, আশা করা যায় শেষরক্ষা হবে।

অসম্ভবকে সম্ভব করে উঠতে পারলেও ভেতরে-ভেতরে ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিল গার্গী। তার এত মেহনতের পরও যদি কোন মিস্‌হ্যাপ হয়, কোম্পানির কারও কাছেই সে মুখ দেখাতে পারবে না। প্রবল গোলমালও দেখা দেবে কর্মীদের ভেতর। কর্মীদের তো ধারণাই আছে, মালিকপক্ষ নানান প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় স্বল্প বেতনের শ্রমিকপক্ষকে।

এ ছাড়া আরও একটি বিপজ্জনক কারণে টেনশন চারিয়ে যাচ্ছিল গার্গীর ভেতর। সে ফ্যাক্টরি থেকে অফিস যাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা 'দি আইডিয়াল নেস্ট'। জেনেশুনেই সে বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে শুধু এই আশায় যে হয়তো কোনও সত্য উদঘাটিত হতে পারে ওখান থেকে।

অফিসে গিয়ে অবশ্য একটা স্বস্তির সংবাদ পাওয়া গেল। মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরির মেশিনটি রিপেয়ারের জন্য যে পার্টসটি বিদেশ থেকে আসার কথা ছিল, এতদিনে সেটি রওনা দিয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের উদ্দেশে। খবরটি পেয়ে ভারি উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল সায়নকে। গার্গীকে তার চেম্বারে ডেকে বলল, যদি সব ঠিকঠাক চলে, তাহলে দিন পনেরোর মধ্যেই ডিটারজেন্ট পাউডারে উৎপাদনও শুরু করে দিতে পারব। জেসমিন ফ্লেভারের পর আরও একটি নতুন উপহার দেবে প্যারাডাইস। ভাল দেখে তার একটা নাম ভেবে ফেল দেখি।

আজ সায়নকে বলে একটু আগে-আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল গার্গী। গাড়িতে উঠেই ফুট্টুসকে বলল, পার্ক স্ট্রিট।

পার্ক স্ট্রিটে এসে যে বাড়িটির সামনে ফুট্টুসকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল গার্গী, তার সামনে 'বার' শব্দটি লেখা দেখে বোধহয় বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না ফুট্টুসের। তার মেমসাহেব কিনা বারে ঢুকছে হঠাৎ। তারপর হয়তো ভাবল, বড়লোক বাড়ির কেতা তো এরকমই হবে।

গার্গীর ভেতর তখন এক অন্যরকম কাঁপ। সেদিন যে বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল, আজও হয়তো সেরকমই কোনও ভয়ঙ্করের সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে। হয়তো তার চেয়েও কোনও বড় কিছু। কিন্তু আজ সে প্রস্তুত হয়েই এসেছে। বিপদ কোন দিক থেকে আসবে জানা থাকলে তার সম্মুখীন হওয়া ঢের সহজতর কাজ। হয়তো হিমন এখানেই কোথাও আছে, আত্মগোপন করে।

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলে সবুজ ঘাসের লন পার হল গার্গী। ভেতরটা তার কাঁপছে তখন। কাল সন্ধেয় এখানেই খুন হয়ে গেছে একটি। নিশ্চই তার জের আজও থাকবে।

কিন্তু বারের গেটের কাছে পৌঁছে ভারি অবাক হল গার্গী। দরজায় মস্ত একটি তালা ঝোলানো। বাইরে অপেক্ষামান দারোয়ান দুজনকে না দেখে একটু সন্দেহ হচ্ছিল তার। তালা দেখে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হল যে সম্ভবত থানা থেকেই সিল করে দিয়েছে বারটি।

'দি আইডিয়াল নেস্ট' বন্ধ দেখে যেমন হতাশ হল, তেমনই বহুক্ষণ জমে থাকা এক বিপুল টেনশনের হাত থেকেও মুক্তি পেল গার্গী। যে ভয়ঙ্কর অভিযানের পথে পা বাড়িয়েছিল, তাতে প্রবল ঝুঁকি ছিল নিঃসন্দেহে, জীবন সংশয় হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না, এমন মনে হল কাঁধের ওপর থেকে নেমে গেল গোটা মন্দার পর্বত। কিন্তু বিশল্যকরণীর খোঁজ পাওয়া গেল না দেখে এক অদ্ভুত নৈরাশ্যও ঘিরে ধরল তাকে। কালকের খুনের ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতি কী দাঁড়িয়েছে, তা জানতে কৌতূহল উপচে পড়ছিল তার ভেতরে, একবার ক্ষীণ ইচ্ছেও হল কাছেই পার্ক স্ট্রিট থানায় যায়, গিয়ে খোঁজ নেয় ঘটনাটার। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করল। থানার অফিসাররা তার এই অনাবশ্যক কৌতূহলকে নিশ্চয় সাদা চোখে দেখবেন না, ভাববেন নিশ্চয় এর ভেতর কোনও গোলমাল আছে, গার্গীই হয়তো সেই আন্ডারওয়ার্ল্ডের মক্ষিরানি।

হিমনের অন্তর্ধান রহস্য একবার পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে আলোচনা করবে কি না এমন ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে গার্গী আরও অবাক। সম্ভবত রবার্ট ও নীলই খবর দিয়েছিলেন থানায়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেবাদ্রি এসেছিলেন ব্লু-ওয়ান্ডারে হিমন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। কথাবার্তা সেরে নেমে আসছেন সিঁড়ি বেয়ে, ঠিক তখনই গার্গী ঢুকছে গেট পেরিয়ে। দেখা হতেই মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, কী খবর, মিঃ সান্যাল? নিশ্চয় হিমনের ব্যাপারেই এসেছিলেন?

মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন দেবাদ্রি। কোনও কথাই বললেন না। সম্ভবত আগের দিন দেবাদ্রির কাছে তার ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জের কথা মনে পড়তেই এই রাগ-রাগ মুখ।

—কোনও ট্রেস পাওয়া গেল?

সংক্ষিপ্ত উত্তর 'না' বলেই দেবাদ্রি উঠতে যাচ্ছিলেন গেটের বাইরে দাঁড় করানো জিপে। গার্গী ধাওয়া করল পিছু, আগের কেসটার চার্জশিট দিতে আর কত দেরি, মিঃ সান্যাল?

কোনও উত্তরই দিলেন না দেবাদ্রি। ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, চলো। ঐন্দ্রিলা-হত্যার কেসের সাসপেক্টদের সঙ্গে বেশি কথা বলা পছন্দ নয় ওঁর।

দেবাদ্রি চলে যেতেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল গার্গী। সন্ধের এত আগে সে আজকাল কোনও দিন ফিরতে পারে না। এখন এই একলা-মুহূর্তগুলি কী ভাবে কাটাবে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, ঐন্দ্রিলার লেখা ডায়েরিটা ভাল করে পড়া হয়নি এখনও। সেদিন কয়েকটি পৃষ্ঠা উলটে-পালটে দেখে মনে হয়েছিল, ঐন্দ্রিলা কোনও একজন পুরুষ সম্পর্কে তার অনেক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিল। কে সেই পুরুষ, সেদিন অল্প সময়ের পাঠে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। ব্যাপারটা ঠিকঠাক পরিষ্কার হলে হয়তো হত্যাকারী কে সে সম্পর্কে একটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে। ঐন্দ্রিলার লেখার মধ্যেও যেন বেশ রহস্যময়তা রয়েছে। তা থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ ডায়েরিটা যদি কোনও দিন সায়নের চোখে পড়ে যায় এমন একটা আশঙ্কা তার ছিলই। হয়তো তাইই গোপন করতে চেয়েছে। কিন্তু সায়ন অন্য ধরনের পুরুষ। নিজের

pathagar.net

কর্মকাণ্ডের পরিধির মধ্যেই ব্যাপৃত থাকতে পছন্দ করে। সে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি ঐন্দ্রিলা অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে পারে।

ফ্ল্যাটের চাবি খুলে সবে ভেতরে ঢুকেছে, হঠাৎ দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল, বাড়ির গেট খুলে ভিতরে ঢুকছে দীয়া। দীয়া অবশ্য তরতর করে চলে গেল তাদের ফ্ল্যাটের দিকেই। এতই অন্যমনস্ক আর ব্যস্ত ছিল যে গার্গীদের ফ্ল্যাটের দিকে নজরই দিল না।

গার্গী তার দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে এসেছে, হঠাৎ চমকে উঠল পাশের ফ্ল্যাটে চন্দ্রাদেবীর চিৎকার শুনে। চিৎকার নয়, প্রায় গর্জন। তুমুল চ্যাঁচামেচি করে কী যেন বলছেন, মনে হল, দীয়াকেই। এমন শব্দও পেল গার্গী যাতে মনে হয় হয়তো বা মারছেনই কাউকে। পরক্ষণেই বাইরের সিঁড়ির কাছে হইচই শুনে সে ছুটে গেল দরজার কাছে। দরজা আধভেজা করে যে দৃশ্য দেখল তাতে রক্ত চলকে উঠল তার হৃৎপিণ্ডে।

দীয়াকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছেন চন্দ্রাদেবী। শুধু দরজার বাইরে বার করে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। তাকে ঠেলতে ঠেলতে, ধাক্কা দিতে দিতে নামিয়ে নিয়ে এলেন সিঁড়ির নিচে পর্যন্ত। তারপর ঘাড়ে এমন ধাক্কা দিলেন যে দীয়া লনের উপর পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। চন্দ্রাদেবীকে তখন দেখাচ্ছে ক্রুদ্ধা বাঘিনির মতো, যেন রক্ত ঠিকরে বেরোচ্ছে তাঁর গনগনে দুই চোখ দিয়ে। চিৎকার করে বলছেন, বেরো, বেরো এ বাড়ি থেকে, ইউ আর আ উইচ। তোকে আমি, তোকে আমি মেরেই ফেলব আজ। বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন দ্রুত। সিঁড়ির উপরে বিব্রত, বিভ্রান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রবার্ট ও'নীল। তাঁকে দেখেই বললেন, পিস্তলটা বার করো তো। কোথায় রেখেছ সেটা? আই উইল শুট হার, বলতে বলতে তিরের বেগে ঢুকে গেলেন ঘরের ভেতর।

দীয়া স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল লনের ঘাসে। চন্দ্রাদেবী পিস্তল খুঁজছেন শুনে সে ভয়ার্ত মুখে উঠে দাঁড়াল ঘাসের উপর। তারপর দুদ্দাড় করে গেট খুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগল প্রাণের ভয়ে।

রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের উপর লেক-মার্কেটের সামনের রাস্তায় তাঁর লম্বা-চওড়া শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দেবাদ্রি সান্যাল। চোখে কালো গগল্‌স, পরনে পুলিশি ইউনিফর্ম, হাতে একটি ওয়াকিটকি। ওয়াকিটকিটা মুখের কাছে তুলে ধরে যথাসম্ভব মোলায়েম স্বরে কথা বলছিলেন, দ্য রোড ইজ নাউ ক্লিয়ার, স্যর। ওভার।

ওয়াকিটকিতে এরপর কিছু হিজ্‌বিজ্‌বিজ্‌ শব্দ। দেবাদ্রি কী বুঝলেন কে জানে, একটু পরেই আবার বললেন, নাথিং সিরিয়াস, স্যর। মাইল্ড লাঠিচার্জ। নান্‌ উন্ডেড, স্যর। ওভার।

আবার কিছুক্ষণ হিজবিজবিজ হিজবিজবিজ। ট্রানজিস্‌টার খারাপ হয়ে গেলে যেরকম অদ্ভুত কণ্ঠস্বর সংবাদ-পাঠ শুনতে পাওয়া যায়, ওয়াকিটকির ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে ঠিক তেমনই কিছু শব্দ। কিছুক্ষণ এ হেন দুর্বোধ্য সংলাপ শোনার পর দেবাদ্রি ঘাড় নাড়লেন, অ্যান্ডারস্টুড, স্যর। রাইট, স্যর। ও-কে, স্যর। রজার।

আর কোনও শব্দ ভেসে না আসায় দেবাদ্রি এবার ওয়াকিটকি বন্ধ করে প্রায় ফাঁকা হয়ে

আসা রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের দিকে তাকালেন। একটু আগেই তাঁর বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন ক্রাউড সামলাতে। এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত। এটা কলকাতার অন্যতম পশ-এলাকা। কলকাতার এককালের বনেদি মানুষদের বাস। সে বনেদিয়ানা এখনও অটুট রাস্তার দুপাশের বাড়িঘরগুলোর চেহারায়, এখানকার মানুষদের পোশাকে-আশাকে, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায়। এরকমই হাজারখানেক মানুষ আজ রবিবারের সকালে চেয়ার-বেঞ্চি পেতে বসে রোড-ব্লকেড করেছিলেন। কোনও বস্তি এলাকার রোড-ব্লকেড একেবারে ভিন্ন মেরুর সমস্যা। এসব এলাকায় কেউ আহত-টাহত হলে হেডলাইন হয়ে যাবে সংবাদপত্রে। ক্যাজুয়ালটি হলে তো কথাই নেই। সুখের কথা তার কিছুই হয়নি। সামান্য একটু ঝাড়পিট করতে হয়েছে এই যা।

নিশ্চিন্ত, আত্মতৃপ্ত দেবাদ্রি এবার এগোতে লাগলেন একটু দূরে দাঁড়ানো তাঁর ঝকঝকে জিপটার দিকে। পাশাপাশি আরও কয়েকখানা পুলিশের জিপ। দু-তিনটে জাল-ঢাকা বড় ধরনের কালো গাড়িও। অবরোধের জায়গায় এখন কিছু পুলিশ-অফিসার আর কনস্টেবল ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে অবশ্য উঁকিঝুঁকি মারছে কিছু কৌতূহলী দর্শক। দেবাদ্রি ইঙ্গিত করতেই রাস্তার দুদিকে বহুক্ষণ অপেক্ষারত বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি, টু-হুইলার হু-হু শব্দ তুলে চলতে আরম্ভ করল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আর বোঝার উপায় রইল না একটু আগেই এখানে বহুক্ষণ ধরে পথ-অবরোধ হয়েছিল।

কিছুটা রিল্যাক্সড্ হতেই এবার ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালেন দেবাদ্রি। বেশ মৌজ করে ধোঁয়া ছেড়ে জিপে উঠতে যাবেন এমন সময় পাশে ঘ্যাচ্ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা চকোলেট রঙের মারুতি, হ্যালো, মিঃ সান্যাল—

নারীকণ্ঠ শুনে দেবাদ্রি আশ্চর্য হয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে মারুতি পার্ক করে নেমে এসেছে গার্গী, কী ব্যাপার, পুলিশে পুলিশে একেবারে ছয়লাপ করে ফেলেছেন দেখছি।

গগল্স্‌টা খুলে নিয়ে দেবাদ্রি তাকালেন গার্গীর দিকে। যথারীতি একটু শক্ত হয়ে গেল মুখখানা।

গার্গী একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, আমাদের সেই কেসটায় চার্জশিট কি দেওয়া হয়ে গেছে, মিঃ সান্যাল?

দেবাদ্রি কিছুটা অবাক হলেন, একটু বিরক্তও। কেসের সাসপেক্ট বারবার চার্জশিটের জন্য তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে, এটা তাঁর কাছে ভারি অভিনব। নিস্পৃহভঙ্গিতে বললেন, না। এখনও ইনভেস্টিগেশন চলছে।

খুবই বিস্মিত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে গার্গী বলল, এখনও চলছে। ফেলুদা, কাকাবাবু কিংবা কর্নেল হলে এতদিনে কিন্তু আসামিদের হাতকড়া পরিয়ে হাজতে ঢোকাত—

দেবাদ্রি গম্ভীর হয়ে বললেন, ওসব গল্প উপন্যাসেই মানায়। বাস্তবের তদন্ত খুবই কঠিন। তা—, বলে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন একটু, ওইসব বাচ্চাদের লেখাগুলো আপনি পড়েন নাকি?

—না পড়ার কী আছে। আসলে ভেতরে-ভেতরে সব মানুষই এক-একটি বাচ্চাই। বাচ্চাদের বই দেখলেই তো আমার পড়তে ভীষণ লোভ লাগে। সেই ছেলেবেলাটা আবার ফিরে পাওয়া যায় যেন। কেন, আপনি কখনও এসব বই পড়েননি?

—হ্যাঁ, একেবারে পড়িনি তা নয়, দেবাদ্রি এবার আমতা-আমতা করলেন, তবে আমরা অন্য কারণে পড়ে দেখি। শখের গোয়েন্দারা কীভাবে কেসগুলো সমাধান করে—

pathagar.net

গার্গী গম্ভীর হল হঠাৎ, হ্যাঁ পড়াই উচিত। পড়ে ইনভেস্টিগেশনের কায়দাগুলো শেখা দরকার। আপনার চার্জশিটে নিশ্চই যথারীতি সায়ন আর গার্গী চৌধুরীকে হাতকড়া পরানোর কথাই লেখা থাকছে। তা কবে হাতকড়া পরাচ্ছেন আমাদের?

খোঁচা খেয়ে দেবাদ্রির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। মহিলার সাহস একটু বেশিই। পুলিশের সঙ্গে টক্কর দিতে একটুও পিছপা হয় না। হঠাৎ মুখ বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিও তো ইনভেস্টিগেট করবেন বলেছিলেন, তার কী হল?

গার্গী অনায়াসে বলল, অনেকটা এগিয়েছি। কে হত্যাকারী তা অনুমান করতে পারছি, কিন্তু সব প্রমাণ এখনও হাতে এসে পৌঁছায়নি। আর কয়েকদিন লাগবে বড়জোর। তারপরই আপনার হাতে সমর্পণ করব খুনিদের।

দেবাদ্রি হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলেন, ব্যঙ্গের হাসিই, তাই নাকি। ভারি ইন্টারেস্টিং। তা হলে তো আমাদের চাকরিবাকরি সব ছেড়ে দিতে হবে। তা কোথায় ঘুমিয়ে আছেন তাঁরা?

—আমার-আপনার চোখের সামনেই। তবে তারা সায়ন কিংবা গার্গী নয় কিন্তু। আপনি বোধহয় এখনও এই দুজনকেই হত্যাকারী বলে কেস সাজিয়ে চলেছেন?

—অবশ্যই। কারণ, আরও নতুন নতুন প্রমাণ প্রতিদিন আমাদের তদন্তে ধরা পড়ছে। এমনকি আজ সকালেও এমন ঘটনা ঘটেছে যা অবশ্যই সায়ন চৌধুরীর বিরুদ্ধে যাবে।

গার্গী একটু হতচকিত হয়ে পড়ল যেন, আজ সকালে? কী ঘটনা!

—সেসব যথাসময়ে জানতে পারবেন। গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল দেবাদ্রির দিকে, যে ঘটনাই ঘটে থাকুক, পুলিশ ইচ্ছে করলে সায়ন চৌধুরীর বিরুদ্ধে কেস সাজিয়ে নিতে পারে। কেস সাজাতে তো আপনাদের জুড়ি নেই। যেভাবে আলো বোসের নাম জড়িয়েছেন আপনারা সায়ন চৌধুরীর বিরুদ্ধে—

দেবাদ্রি মুখ পাথরের মতো করলেন, কী বলতে চান আপনি?

—আপনারা কি আলো বোসের সন্ধান পেয়েছেন, মিঃ সান্যাল?

—না, পাইনি। অবশ্য তারপর আর চেষ্টাও করিনি। সায়ন চৌধুরীর জীবনে আপনি এসে যাওয়ার পর আলো বোসের চ্যাপ্টার যখন শেষ, তখন আর পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কী লাভ।

—তবু আলো বোসের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা আপনার দরকার। করবেন নাকি আলাপ?

দেবাদ্রি বিস্মিত হয়ে বললেন, চেনেন নাকি তাঁকে? চলুন তো আলাপ করে আসি—

—এখনই! গার্গী সামান্য বিপদে পড়ে গেল। সকালে উঠেই ফ্যাক্টরি থেকে হঠাৎ একটা জরুরি ফোন আসায় তড়িঘড়ি ফুটুসের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে সায়ন। গার্গী অতএব মারুতিটা নিয়ে বেরিয়েছে কিছু মার্কেটিং করতে। মার্কেটিং সেরে ফেরার পথে কোনও হোটেল থেকে নিয়ে নেবে দুপুরের খাবার। কাল রাতে কথায় কথায় সায়ন হঠাৎ বলেছিল, রবিবার দুপুরে একটা অন্য রকম লাঞ্চ খেলে কেমন হয়। গার্গী তখনই ভেবেছিল হোটেলের খাবারের কথা। কিন্তু এখন দেবাদ্রির সঙ্গে গেলে তো তছনছ হয়ে যাবে তার আজকের রোজনামচা।

হাতের ঘড়িতে নজর রেখে দেখল বেলা প্রায় দশটার মতো। সল্টলেকে যাতায়াত, আলোদার সঙ্গে আলাপ, কথোপকথন ইত্যাদি সেরে বেলা দেড়টা-দুটোর মধ্যেই ফিরে আসতে পারবে—এমন একটা ভাবনা ছকে নিল মনে মনে। মার্কেটিং, না হয় অন্যদিন হবে। শুধু হোটেলের খাবারটাই। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল, চলুন—

দেবাদ্রি হাসল হঠাৎ, ফাইন। তা হলে উঠে পড়ুন আমার জিপে।

pathagar.net

—পুলিশের জিপে! উঁহু, গার্গীর অহমিকায় হঠাৎ ঘা লাগল যেন, সে যেদিন হাতকড়া পরাতে আসবেন, সেদিনই উঠব। এখন নয়। আপনি বরং আমার গাড়িতেই আসুন। আমার গাড়ি চালানোর হাত খুব একটা খারাপ নয়।

ঐন্দ্রিলা-মার্ডার কেসের একজন সন্দেহভাজন গার্গী, তার গাড়িতে উঠবেন কি উঠবেন না এমন একটা ভাবনায় কিছুক্ষণ আন্দোলিত হলেন দেবাদ্রি। একটু ইতস্তত করে তাঁর জিপের ড্রাইভারকে কিছু নির্দেশ দিলেন নিচুগলায়। তারপর ফিরে এসে পট করে উঠে পড়লেন গার্গীর পাশে। দরজা বন্ধ করতেই গার্গী হু-হু করে চালিয়ে দিল মারুতি। তারপর শব্দ করে হেসে উঠে বলল, আপনার তরফেও অবশ্য এ গাড়িতে উঠতে আপত্তি থাকারই কথা। হঠাৎ কোনও একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে হয়তো তদন্তকারি অফিসারকে মেরে দিতে পারি—

দেবাদ্রি এতক্ষণে হাসলেন, সাইকোলজিস্টদের যা থিয়োরি, তাতে বোধহয় আপনি সেটা পারবেন না।

—তাই! বলতে বলতে গাড়িতে আরও স্পিড তুলে দিল গার্গী। গড়িয়াহাট মোড় পেরিয়ে উঠে এল বিজন সেতুর উপর। তারপর কসবা পেরিয়ে ধরে ফেলল ব্যস্তসমস্ত ইস্টার্ন বাইপাস। এই রাস্তাটা আজ রবিবারেও প্রচণ্ড যানবহুল। অনেকেই সপরিবারে আউটিঙে চলেছেন। কেউ কেউ ন্যাশনাল হাইওয়ে থার্টিফোর বরাবর চলে যাবেন বহু দূর। কেউ বা যশোর রোড কিংবা টাকি রোড ধরবে। কেউ সামনেই সল্টলেক যাবেন কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে।

দেবাদ্রি বেশ অবাক হয়ে গার্গীর ড্রাইভিং দেখছিলেন। প্রায় আশির ওপরে স্পিডোমিটারের কাঁটা দুলছে। অথচ কী নিখুঁতভাবে একের পর এক গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলেছে। সুযোগ পেলে ওভারটেকও করছে চকিতে হর্ন বাজিয়ে।

সল্টলেকে দ্রুত ঢুকে পড়ে অনেক আইল্যান্ডস অনেক জলের ট্যাঙ্ক, পাখির খাঁচা, অনেক এ-বি-সি-ডি-ই পার হয়ে একটা একতলা ছোট্ট বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল গার্গী। দেবাদ্রির দিকে তাকিয়ে হাসল, আসুন—

গার্গী চৌধুরীর সঙ্গে হঠাৎ এমন আচমকা বেরিয়ে পড়ার ব্যাপারে বেশ সংশয়ে ছিলেন দেবাদ্রি। শুধু রাজি হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, আরও ভাল করে স্টাডি করার দরকার এই সাহসী, বুদ্ধিমতী অথচ রহস্যময়ী মহিলাটিকে। এর আগে দুচারদিন ইন্টারোগেট করেছেন বাড়ি গিয়ে। কিন্তু এভাবে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটালে কথা বলাবলির মধ্যে হঠাৎ আচমকা বেরিয়ে পড়তে পারে কোনও অজানা অথচ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

অবশ্য গাড়ি চালানোর সময় গোটা রাস্তাটাই প্রায় চুপচাপ ছিলেন মহিলা। দেবাদ্রিও অবশ্য নিঃশব্দে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিচ্ছিলেন, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বলবেন আলো বোসের সঙ্গে। নিশ্চয় পাঁচই এপ্রিল ভোরে বাড়িতে না ফিরে কেন ছয়ই এপ্রিল শেষ রাতে পৌঁছেছিলেন সায়ন, তার একটা জুতসই অ্যালিবাই তৈরি করে ফেলেছেন এতদিনে।

ভাবতে ভাবতে দেবাদ্রি গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। ওদিকে গার্গী কলিং বেল বার দুই বাজিয়ে অপেক্ষা করছে গম্ভীর মুখে। বেল শুনে গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরনে একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক এসে গেট খুলে দিলেন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথায় সামনের দিকে মস্ত টাক। গার্গীকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, আরে তুমি? সায়ন কোথায়।

পরক্ষণে দেবাদ্রির দিকে নজর পড়তেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। মুখে কথাই

Pathagar.net

সরল না আর। দেবাদ্রিকে দেখিয়ে কাঁচুমাচু মুখে গার্গী বলল, আলোদা, আই অ্যাম আন্ডার অ্যারেস্ট। তাতে আরও ঘাবড়ে গেলেন ভদ্রলোক, বিস্মিত হয়ে বললেন, সেকি!

দেবাদ্রি তখনও বুঝে উঠতে পারেননি আসল ব্যাপারটা। আজ সকাল থেকেই খুবই হালকা মেজাজে আছে গার্গী। দেবাদ্রির সঙ্গেও জোক করেছে কিছুক্ষণ। এখন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার বলল, শুধু আমাকেই নয়, আলোদা, ইনি পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল, আপনাকেও অ্যারেস্ট করতে এসেছেন।

ইউনিফর্ম পরলে দেবাদ্রিকে রীতিমতো একজন জাঁদরেল পুলিশ অফিসারের মতো দেখায়। তাঁর দিকে তাকিয়ে আলোদা তখন রীতিমতো শঙ্কিত, বিভ্রান্ত। গার্গীর কাঁচুমাচু মুখ দেখে আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন।

ততক্ষণে জিপের হর্ন, কলিং বেলের শব্দ, হাঁক-ডাক, কথাবার্তা শুনে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন সুচন্দনী। ব্যাপারস্যাপার দেখে তাঁরও মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল।

পরিস্থিতি ঘোরালো দেখে গার্গী হেসে উঠল হঠাৎ, মিঃ সান্যাল, ইনিই হলেন মিঃ আলোকময় বোস ওরফে আলো বোস। আপনার চার্জশিটের বয়ান অনুযায়ী মিস আলো বোস নন। আর তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আলোদার একমাত্র সহধর্মিণী সুচন্দনী বউদি।

দেবাদ্রি বিস্মিত, স্তম্ভিত, তখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না ঘটনাটা। আলোদার দিকে তাকিয়ে আছেন দারুণ সংশয়ের চোখে। তাঁর সমস্ত শরীর জুড়ে শুধু অবিশ্বাস আর সন্দেহ। তাকে অমন এক বাক্স সন্দেহের মধ্যে পুরে, অন্যদিকে আলোদাকে প্রবল উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে গার্গী আবার এগিয়ে গেল সুচন্দনীর কাছে, হাঁ করে দেখছেন কি বউদি, শিগগির চা করুন। দুপুর রোদ্দুরে গলা শুকিয়ে ডা-ডা করছে। চা পেতে দেরি হলে হয়তো আপনিও অ্যারেস্ট হয়ে যাবেন।

অতঃপর দেবাদ্রির দিকে ফিরে বলল, আসুন মিঃ সান্যাল, বাইরে দাঁড়িয়ে তো আর ইন্টারোগেট করা যাবে না। ভেতরে আসতে হবে।

সম্বিত ভেঙে আলোদাও যেন তৎপর হলেন হ্যাঁ, হ্যাঁ আসুন, আসুন। কী আশ্চর্য, এতক্ষণ বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি আপনাদের।

কোনও কথা বলার ফুরসত না পেয়ে, হয়তো বা ভয়েই আধখানা হয়ে সুচন্দনী ততক্ষণে সেঁধিয়ে গেছেন রান্নাঘরে। দেবাদ্রি ঘরে ঢুকে সোফায় বসতে বসতে আলো বোসকে সংশয়ের গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি সেই আলো বোস যিনি সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে বিলাসপুর গিয়েছিলেন?

আলোদা একটু একটু করে সাহস ফিরে পাচ্ছেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, ঠিক তাই।

দেবাদ্রির বিস্ময় তখনও কাটেনি, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন। হয়তো তাঁর এতদিন ধরে তৈরি চার্জশিটের বয়ান হঠাৎ একটা ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ পুলিশি-রীতিতে চলে এলেন মূল প্রশ্নে, যদি তা-ই হয়, তা হলে বলুন তো, সায়ন চৌধুরী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন, আপনারা বিলাসপুর থেকে কলকাতা ফিরেছেন ছয় এপ্রিল ভোর রাতে। অর্থাৎ ঐন্দ্রিলা হত্যার অব্যবহিত পরেই। অথচ ট্রেনের টিকিট অনুযায়ী আপনারা বিলাসপুর থেকে ট্রেনে চেপেছিলেন চৌঠা এপ্রিল বিকালে, তাতে কলকাতা পৌঁছানোর কথা পাঁচ তারিখ সকালের দিকে। এই যে, গোটা একটা দিন, প্রায় কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা সময় উনি হাপিস করে ফেলতে চাইছেন জীবন থেকে, এবং সেই সময়টুকু এই কেসের মেরিটের পক্ষে অত্যন্ত ভাইট্যাল, সেটা কী করে সম্ভব হল?

pathagar.net

আলো বোস এতক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন যেন, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, বুঝলেন, মিঃ সান্যাল, এরই নাম নিয়তি। যদি ট্রেনের টিকিট অনুযায়ী কলকাতায় পৌঁছাতাম, তা হলে এত বড় দুর্ঘটনাটা নিশ্চয় ঘটত না। অথচ এই একদিন দেরির জন্য মূলত আমিই দায়ী। বলতে পারেন, ঐন্দ্রিলার মৃত্যু হয়েছে আমার কারণেই। সারা জীবনেও বোধহয় আমার এই অপরাধের কোনও প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

জিজ্ঞাসু চোখে দেবাদ্রি তাকালেন, কী রকম?

এরপর আলো বোস যে কাহিনী একটু একটু করে শোনালেন, তা যেমনই অদ্ভুত, তেমনই দুর্ভাগ্যের, আর তা ঘটতে পারে একমাত্র নিয়তির টানেই। সুচন্দনীর চায়ের সঙ্গে দেবাদ্রি শুনতে লাগলেন কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফেলে।

পাঁচই এপ্রিল বোম্বে মেল ভায়া নাগপুর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাবার কথা সকাল আটটায়, কিন্তু চার তারিখে বিলাসপুরে ওঠার সময় থেকেই প্রায় দু-আড়াই ঘন্টা লেট ছিল ট্রেন। ট্রেন চলতে চলতে ক্রমশ লেট বাড়তে থাকল। খড়্গাপুরে যখন এসে পৌঁছাল, তখনই বেলা দশটা। সেখানে কোনও কারণে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল বোম্বে মেল। আধঘন্টাটাক পরে শোনা গেল সামনেই মাদপুর স্টেশনে রেল-লাইন অবরোধ। দু-আড়াই হাজার মব্ ঘেরাও করে রয়েছে সেখানে। ঘন্টা তিনেক খড়্গাপুরে ঠায় বসে থাকার পরও ট্রেন ছাড়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। হঠাৎ খবর এল, পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে মবের উপর, তাতে আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। বিকেলের আগে ট্রেন ছাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সায়ন বলেছিল, চলুন আলোদা, বাসেই চলে যাই কলকাতায়। ট্রেন থেকে নেমেও কিন্তু কোনও সুরাহা হল না, কারণ অবরোধ তখন ছড়িয়ে পড়েছে বোম্বে রোডে। বাধ্য হয়ে আলো বোস তখন বলেছিলেন, খড়্গাপুরে তাঁর এক বন্ধু আছে, তার ওখানে দুপুরটা কাটানো যাক। বন্ধুর একটা মারুতি আছে। যদি অবরোধ উঠে যায়, তবে বিকেলে মারুতিতে কলকাতা ফেরা যাবে। বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখা দিল আর এক বিপত্তি। বিপত্তিই, কেননা সেখানে গিয়ে ফেঁসে গেলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কার্যক্রমের মধ্যে। বন্ধুর বাড়ির কাছাকাছি একটা আদিবাসী গাঁ আছে। সেদিন একটা পরব ছিল তাদের। দুপুরে বন্ধুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার পর বন্ধুই প্রস্তাব দিয়েছিলেন, অবরোধ যখন এখনও ওঠেনি, তখন চলো, সবাই মিলে পরব দেখে আসি। পরবের দিন ভারি জাঁকজমক উৎসব হয় ওদের। দুপুরে তির-ধনুক নিয়ে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার পর সন্ধে থেকে সারা রাত নাচগান। সায়নরা সেখানে পৌঁছাতে এতই খুশি হয়ে উঠেছিল আদিবাসীরা যে রীতি অনুযায়ী তাদের শুধু অতিথি হিসেবে বরণই করে নিল তা-ই নয়, উৎসবের অন্যতম বিচারক করে দিল দুজনকেই। সায়ন অবশ্য ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল ঐন্দ্রিলার কথা ভেবে। অবরোধ উঠে গিয়েছিল বিকেলেই, কিন্তু উৎসব প্রাঙ্গণ থেকে ছাড়া পেতে বেশ রাত হয়ে গেল। যাই হোক, তবু মারুতিটা ঠিকঠাক চললে হয়তো রাত এগারোটার মধ্যেই পৌঁছে যেতেন ওঁরা। কিন্তু নিয়তি বাদ সাধল ফের। কোলাঘাট পেরোবার বেশ কিছুটা পরেই ঘড় ঘড় শব্দ করে বিগড়ে গেল গাড়িটা। অনেকক্ষণ ঘাম ঝরিয়েও ছোকরা ড্রাইভার তার গাড়ির রোগ ধরতে পারল না। সেই গাড়ি তিনজনে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসা হল হাইওয়ের ধারেই একটা রিপেয়ারিং শপে। বাগনানের একটু আগেই দোকানটা। মিস্ত্রিরা পরীক্ষা করে বলল, ইঞ্জিনেই গোলমাল, মেরামত করতে দেরি হবে।

এত সব ঝামেলার পর গাড়ি যখন কলকাতা পৌঁছাল, তখনই প্রায় শেষ রাত, ড্রাইভারও ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাকে আবার সল্টলেক পর্যন্ত যেতে হবে, এই ভেবে আলো বোস

pathagar.net

হাওড়া থেকে একটা ট্যাক্সি ধরে নিলেন। সায়ন যখন মারুতিতে করে পৌঁছেছিল শরৎ বসু রোডের বাড়িতে, তখন ভোর হয়ে এসেছে প্রায়। তাকে নামিয়ে দিয়েই মারুতি ফের রওনা দিয়েছিল খড়গপুরের দিকে। তার পরের ঘটনা সবই তো জানেন দেবাদ্রি সান্যাল।

আলো বোসের কাহিনী শেষ হয়নি তখনও। তিনি ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার পর মুখোমুখি হলেন আর এক বিপদের। সুচন্দনী ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলেন স্বামীর জন্য। গুজরাত থেকে তার আগের দিনই টেলিগ্রাম এসে পৌঁছেছে, সুচন্দনীর বাড়িতে ভীষণ বিপদ। সায়নদের বিপদের কথা জানতেই পারেননি আলোদা। তার আগেই সুচন্দনীকে নিয়ে সেদিনই রওনা দিয়েছিলেন আমেদাবাদের পথে।

—আপনি সমস্ত তথ্যগুলো মিলিয়ে নিতে পারেন, মিঃ সান্যাল। পাঁচ তারিখে মাদপুর স্টেশন এবং বোম্বে রোড অবরোধ হয়েছিল কি না। সায়ন আর আমি সারাদিন কাটিয়েছিলাম কি না খড়গপুরের আদিবাসী গাঁয়ে। সেদিন মধ্যরাতে বাগনানের রিপেয়ারিং শপে একটা লাল মারুতি রিপেয়ার হয়েছিল কি হয়নি। আমি আর সুচন্দনী ছ' তারিখ হাওড়া থেকে ট্রেনে চেপেছিলাম কি চাপিনি। এতগুলো তথ্য ঠিক ঠিক মিলে যাওয়ার পর আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন সায়নের কলকাতা ফেরার সঠিক তারিখ এবং সময় কী ছিল। প্রমাণ হিসেবে দুটো ডকুমেন্ট আমাদের কাছে আছে। এক, পাঁচই এপ্রিল আদিবাসী গাঁয়ের উৎসবের ছাপানো কার্ড, দুই, বাগনান রিপেয়ারিং শপের মেরামতির বিল। আর এই জন্যেই আমরা সাক্ষী হিসেবে কয়েকজন আদিবাসী এবং রিপেয়ারিং শপের মিস্ত্রিদের নাম আদালতে পেশ করেছি, হয়তো আপনি খেয়াল করে থাকবেন।

দেবাদ্রি সান্যাল ইতিমধ্যে একটি সিগারেট ধরিয়ে ছিলেন। আলো বোসের কাহিনী শুনে তাঁর কপালের ভাঁজ আরও গাঢ় হল। বললেন, সায়ন চৌধুরী এতদিন এ-সব কথা তো আমাদের বলেননি। হঠাৎ কি গল্পটা তৈরি করলেন আপনার?

আলো বোস একটুও না দমে গিয়ে বললেন, গল্প যদি তৈরিই করব, মিঃ সান্যাল, তা হলে এত সব সাক্ষ্যপ্রমাণ সব কি মিথ্যে বলতে চান? সায়ন এতদিন কথাগুলো ডিটেলসে বলতে পারেনি, তার কারণ ও মনে-মনে খুব লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। লজ্জা এই কারণেই যে, খড়গপুর স্টেশনে সামান্য একটা সিদ্ধান্তের ভুলে তাকে জীবনের সবচেয়ে বড় খেসারতটি দিতে হল।

হাতের ঢাউস ডায়েরিটিতে খসখস করে কিছুক্ষণ নোট করে নিয়ে পট করে উঠে দাঁড়ালেন দেবাদ্রি। চায়ের কাপ তখনও নিঃশেষ হয়নি। গার্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন—

গার্গীও অবশ্য খুব বেশিক্ষণ কাটাতে চাইছিল না। বেলা এখন মধ্যদুপুর। আজ রোদের তাপ একটু বেশিই। দেবাদ্রির কথা শুনে উঠে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ, আলোদা, মিঃ সান্যালের যা কিছু জানার দরকার নিশ্চই জেনে গেছেন আপনার কথায়। অনেক বেলা হয়ে গেল, এবার উঠতেই হবে আমাদের।

আলো বোস ও সুচন্দনীকে যেমন প্রবলভাবে বিস্মিত করে ঢুকেছিল গার্গীরা তেমনই হঠাৎ অবাক করে বেরিয়ে গেল দ্রুত। ফেরার পথে স্টিয়ারিংয়ে মোচড় দিতে দিতে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, আলোদার গল্পটা কি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না আপনার কাছে?

দেবাদ্রি তখনও ভেবে চলেছিলেন ব্যাপারটা। সামান্য হেসে বললেন, গল্পটা এতই আষাড়ে যে, বিশ্বাস করা খুবই শক্ত। তবে সব সাক্ষ্যপ্রমাণ আগে আমার ফাইলে জড়ো হোক, তারপর ভাবা যাবে—

pathagar.net

গার্গী এক লহমা তাকিয়ে নিল দেবাদ্রির দিকে, বলল, মিঃ সান্যাল, পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে হুইচ আর স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন্স। আপনাকে এখন এমনই একটা গল্প শোনাই যা বাস্তবিকই অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে। কিছুকাল আগে বোম্বে শহরে এ সিরিজ অব এক্সপ্লোশন্স হয়েছিল আপনার বোধহয় মনে আছে। সে সময় এক ভদ্রলোক, ধরা যাক তার নাম মিঃ কাপুর বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে ঢুকেছিলেন কোনও বিশেষ কাজে। কাজ মিটিয়ে তিনি সেখান থেকে বেরোবার দু'মিনিটের মধ্যেই সে বাড়িতে বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে যায়। মুহূর্তে বেশ কিছু মানুষের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল বিস্ফোরণের ফলে। বাড়িটির কাছেই দাঁড়িয়ে মিঃ কাপুর তখন থর থর করে কাঁপছেন। বোমার দু'চারটে স্প্লিন্টার তাঁর গায়েও এসে লেগেছিল। এমন অভাবিতভাবে বেঁচে যাওয়ায় তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন মিঃ কাপুর। পরক্ষণেই ভাবলেন, বিস্ফোরণের খবর এক্ষুনি প্রচারিত হবে রেডিও কিংবা টি.ভিতে। তাঁর বাড়ির সবাই জানতেন তিনি আজ এই সময়ে স্টক এক্সচেঞ্জে যাবেন। খবর শুনে নিশ্চই দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে তারা। তৎক্ষণাৎ কাছাকাছি টেলিফোন বুথ থেকে ফোন করে বাড়িতে জানিয়ে দিলেন তিনি জীবিত এবং ঈশ্বর তাঁকে এক অনিবার্য দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করেছেন। টেলিফোন রেখে মিঃ কাপুর তাঁর পরবর্তী কাজের ব্যাপারে ঢুকে পড়লেন বোম্বে শহরের অন্য একটি কর্মব্যস্ত বিল্ডিংয়ে। আর কী আশ্চর্য, সে বাড়িতে প্রবেশ করার পরমুহূর্তে আর একটি বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল তাঁর শরীরটা।

দেবাদ্রি সামান্য বিস্মিত হলেন হয়তো, কিন্তু দুঁদে পুলিশ-অফিসারের মতো তাঁর প্রত্যয় থেকে একচুল সরে এলেন না। বরং হেসে উঠে বললেন, তা হলে আমিও এরকম দু-একটি গল্প আপনাকে শোনাই মিসেস চৌধুরী। আপনি হয়তো জানেন, হিমন চৌধুরী হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছেন তাঁর বাড়ি থেকে। আমরা তদন্ত করতে শুরু করেছি, হঠাৎ লাইম ইন্ডিয়ার একজন অফিসার আমাকে ফোন করে জানালেন, তার আগের দিন সন্ধেবেলা হিমন চৌধুরীকে তিনি দেখেছেন সায়ন চৌধুরীর সঙ্গে একই ট্যাক্সিতে যেতে।

গার্গীর হাতের স্টিয়ারিং হঠাৎ টালমাটাল হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ ফুঁসে উঠে প্রতিবাদ করল ইম্পশিবল।

—হ্যাঁ, আরও শুনে রাখুন, আজই ভোরবেলা টেলিফোন এসেছিল থানায়, লাইম ইন্ডিয়ার একজন কর্মচারী, তার নাম লোটন, সে কাল রাতে খুন হয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ফ্যাক্টরির ঠিক পিছনেই। আমাদের অনুমান, এক্ষেত্রেও সায়ন চৌধুরী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। গার্গীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কী বলছেন কী আপনি?

লোটন খুন হয়েছে কাল গভীর রাতে, আর তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ফ্যাক্টরির ঠিক পিছনেই, এই খবরটাই আমূল কাঁপিয়ে দিল গার্গীকে। দেবাদ্রি সান্যালের কথা প্রথমে তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, কিন্তু অন্য কোনও খবরে সন্দেহের অবকাশ যদিও বা থেকে থাকে, একটা টাটকা হত্যার সংবাদ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক গলা উৎকণ্ঠা আর বিস্ময়ের ভেতর গার্গীকে ডুবিয়ে রেখে দেবাদ্রি নেমে গেলেন তাঁর কোয়ার্টারের সামনে। অতঃপর কী করবে গার্গী, কোথায় যাবে, ফ্ল্যাটে ফিরবে, নাকি গাড়ি

pathagar.net

নিয়ে চলে যাবে ফ্যাক্টরির দিকে, তা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। স্টিয়ারিংয়ে শ্লথ হয়ে আসছে তার হাত, অ্যাকসিলেটর-ব্রেক-ক্লাচে মন্থর হয়ে আসছে তার পা-দুটো, ভাবনার শক্তিটাই কমে আসছে ক্রমশ। এত বড় খবরটা এতক্ষণ কী অসীম নিরাসক্তিতে চেপেছিলেন দেবাদ্রি। সল্ট লোকে যাওয়া থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত কম সময় তো নয়। পুলিশ অফিসার বলেই এমন নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সম্ভব। কত খুনই তো হয় কলকাতায়, পুলিশ অফিসারদের কি তাই নিয়ে টেনশনে ভোগা চলে!

কিন্তু গার্গীর কাছে সংবাদটি তো খুবই গুরুতর। এতক্ষণে বুঝতে পারছে কেন সকালে উঠেই ফ্যাক্টরি থেকে দুঃসংবাদটি পেয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল সায়ন। পাছে গার্গী শঙ্কিত হয়ে পড়ে তাই তাকে কিচ্ছুটি বুঝতে দেয়নি। কিন্তু গার্গী তাতে খুবই বিচলিত, ক্ষুব্ধ এবং ক্রুদ্ধও। সায়নের অবশ্যই উচিত ছিল ঘটনাটা তাকে বলা। সে তো এখন সায়নের সহধর্মিণীই শুধু নয়, তার কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরও। এতবড় একটি ঘটনা তাকে কিছুমাত্র না জানিয়েই চলে গেল সায়ন এটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। খুনের সংবাদে নিশ্চই খুবই শোরগোল হয়েছে ফ্যাক্টরির আশেপাশে। নেহাত ছুটির দিন বলে ফ্যাক্টরি বন্ধ আজ। কিন্তু আশেপাশের লোকজন নিশ্চয় ছুটে এসে শান্ত পরিস্থিতি ঘুলিয়ে তুলবে অনিবার্য কারণে। একা সায়ন কি সামলাতে পারবে সে ঝোড়ো ঝাপট!

কিন্তু সায়ন তাকে বলল না-ই বা কেন, সে প্রশ্নও তাকে ভাবিয়ে তুলল অবধারিতভাবে। বিশেষ করে দেবাদ্রি সান্যালের শেষ কথাটা সহসা পিন ফুটিয়ে দিল তার হৃৎপিণ্ডের কোনও গোপন অন্তঃপুরে। পুলিশের অনুমান, সায়ন চৌধুরীই—

গার্গী কেঁপে উঠল নিজের অজান্তেই। লোটনের খুন, তার আগে হিমনের অন্তর্ধান, এই দুয়ের সঙ্গেই নাকি সায়ন জড়িত। যেদিন হিমন অন্তর্হিত হয় সেদিন ট্যাক্সিতে হিমনের সঙ্গে নাকি দেখা গেছে সায়নকে। গার্গী যতটুকু স্মরণ করতে পারে, প্রায় সারাদিনই অফিসে ছিল সায়ন, কেবল বিকেলের দিকে কিছুক্ষণের জন্য 'ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছি' বলে বেরিয়েছিল। ফিরে এসেছিল ঘণ্টাখানেক পরেই, বলেছিল 'যাওয়া গেল না, গোটা শিয়ালদহ, আমহার্স্ট স্ট্রিট জুড়ে বিশাল জ্যাম।' মারুতিটাই সঙ্গে ছিল তার, ট্যাক্সিতে তাকে দেখতে পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নাকি মারুতি কোথাও পার্ক করে রেখে ট্যাক্সিতে হিমনকে নিয়ে—!

কিছুক্ষণের জন্য গার্গী প্রবল এলোমেলো হয়ে গেল নিজের ভেতর। পরক্ষেণই ভীষণ তিরস্কৃত করল নিজেকে। ছি ছি, এ সব কী ভাবছে সে! সায়নকে নিয়ে এ হেন ভাবনা ভাবাই উচিত হয়নি তার। সে যতটা সায়নকে চিনেছে—

আসলে ঐন্দ্রিলা-হত্যারহস্যের জট খুলতে পারছেন না দেখে দেবাদ্রি সান্যাল এখন অনুমানের পর অনুমান করে চলেছেন। তাঁর সেই অনুমানের বিষ কিছুটা এইমাত্র ঢেলে দিয়ে গেলেন গার্গীর ভেতর। যাতে গার্গীও আর খুনের অন্য কোনও কারণ ভাবতে না পারে। তবে সবচেয়ে যা আশ্চর্য লাগছে তার, সায়নের সঙ্গে দেখা গেছে হিমনকে এ খবরটা দেবাদ্রিকে ফোন করে জানিয়েছেন আর কেউ নয়, লাইম ইন্ডিয়ারই একজন অফিসার। অফিসারটি কে তা দেবাদ্রি স্পষ্ট করে বলতে চাননি। না বললেও গার্গী বুঝে নিয়েছে, তিনি নিশ্চয় রৌণক মুখার্জি। হয়তো তিনিই অপরাধী, তাই নিজের অপরাধ অন্যের ঘাড়ে চাপাবার জন্যই দেবাদ্রিকে ভুল পথে চালিত করতে চাইছেন। অথচ দেবাদ্রি তা বুঝতেই পারছেন না। পারছেন না বলেই যাবতীয় সন্দেহের তির ছুড়ে দিচ্ছেন সায়নের দিকেই।

অতএব সায়নকে বাঁচাতে এখন উদ্যোগী হতে হবে গার্গীকেই। গার্গীর স্থির বিশ্বাস, 'দি

pathagar.net

আইডিয়াল নেস্ট’-এর যে ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন তার সঙ্গে হিমনের অন্তর্ধান এবং লোটনের খুন, সবই একই বৃত্তের মধ্যে আবর্তিত। সেই বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থান করছে একজন নর্তকি। রহস্য উদঘাটন করতে হলে ‘দি আইডিয়াল নেস্ট’ সম্পর্কে অনেক কিছু খবরাখবর তার এই মুহূর্তে দরকার। ‘বার’টি যেহেতু আপাতত বন্ধ, কিছু জানতে হলে পার্ক স্ট্রিট থানাতেই যেতে হবে তাকে, কিন্তু কী পরিচয়েই বা সেখানে যাওয়া যায়!

দেবাদ্রিকে নামিয়ে দেওয়ার পর এতসব এলোপাথাড়ি ভাবনা দ্রুত চক্কর মেরে গেল গার্গীর মগজে। তবু তার যাবতীয় উৎকণ্ঠা এখন সায়নকে ঘিরেই। ব্লু-ওয়ান্ডারে পৌঁছে গাড়ি যথাস্থানে রেখে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখল, তখনও বাড়ি ফেরেনি সায়ন। অথচ ঘড়িতে দুটো বেজে দশ। তৎক্ষণাৎ নানান দুর্ভাবনায় বুকের ভেতরটা ছাঁত করে উঠল তার। নিশ্চই ফ্যাক্টরিতে গিয়ে সায়ন কোনও বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, দেবাদ্রি সান্যাল এতখানি পথ যাতায়াত করার সময় একবারও ভাঙেননি খবরটা। তাহলে সে সল্টলেক যেতই না আজ, তার চেয়ে ফ্যাক্টরিতে যাওয়াটাই জরুরি ছিল। অন্তত সল্টলেক থেকে ফেরার পথে দেবাদ্রিকে সঙ্গে নিয়েই একবার ঘুরে আসতে পারত ভি আই পি রোডের ওদিকে তাদের ফ্যাক্টরিতে। ভাবতে ভাবতে দ্রুত দরজা খুলে হোটেল থেকে আনা টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল। ফোন তুলতেই ওপাশে সায়নেরই গলা, কিন্তু কী ভীষণ উদ্বিগ্ন তার কণ্ঠস্বর!

ফোনে যা জানাল সায়ন, ফ্যাক্টিরিতে সকালে এসেই এক প্রবল বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছিল। ফ্যাক্টরির আশেপাশে যে লোকালয় আছে, সেখান থেকে শ-দেড়েক লোক এসে দাবি করে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টই এই খুনের সঙ্গে জড়িত। কারণ লোটন প্রায়ই প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অফিসে আসত কালীজীবনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু সেটা পছন্দ করছিলেন না প্যারাডাইসের কর্মকর্তারা। বিশেষ করে নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি সে কথা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিলেন কালীজীবনবাবুকে। লোটন তারপর আর কোনও দিনই প্যারাডাইসের অফিসে যায়নি। গতকাল সন্ধের পর সে হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে গিয়ে বলে, তার খুব বিপদ, এক্ষুনি একবার ফোন করবে তার এক আত্মীয়কে। অন্যদিন কালীজীবনবাবু সঙ্গে থাকেন, কাল তিনি ছিলেন না বলে এতওয়ারি তাকে ফোন করতে দেয়নি। তাতে এতওয়ারির সঙ্গে তার কিছু বচসা হয়। লোটন রেগেমেগে চলে গিয়েছিল তার পর। এর পরে কী হয়েছিল সে খবর এতওয়ারি রাখে না, কিন্তু ভোরে ফ্যাক্টরির পিছনে চ্যাঁচামেচি শুনে সে বেরিয়ে এসে দেখতে পায়, ফ্যাক্টরির বাইরে দেওয়াল ঘেঁসে জংলাঝোপের ভেতর পড়ে আছে লোটনের লাশ। তার গলার নলি কেউ দু-ফাল করে দিয়েছে ক্ষুর বা অমনি কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে।

গার্গীর বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছিল। রিসিভার ধরে রাখা হাতটিও কেঁপে উঠছিল থরথর করে, বুজে আসছিল কণ্ঠস্বর, কেবল বলতে পারল, ব্যস, তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল, প্যারাডাইসের কারণেই সে খুন হয়েছে।

—আমি ফ্যাক্টরিতে পৌঁছাতেই হঠাৎ পিলপিল করে চলে এল একদঙ্গল লোক। প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টা ঘেরাও করে রেখেছিল। অজস্র গালিগালাজ, অশ্রাব্য শব্দ উচ্চারণ করেছে এতক্ষণ।

—তারপর! এখন চলে গেছে? গার্গীর উৎকণ্ঠিত স্বর।

—হ্যাঁ, থানা থেকে পুলিশ এসে দু-ঘন্টা বৈঠক করে সিদ্ধান্ত হয়েছে এক লক্ষ টাকা

ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সেই সঙ্গে লোটনের ভাইকে চাকরিও দিতে হবে ফ্যাক্টরিতে। না হলে আমার বিরুদ্ধে খুনের মামলা করবে ওরা।

—বাহ! সেই সিদ্ধান্ত তুমি মেনে নিলে?

—এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। যারা ঘেরাও করেছিল যে কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত আমার ওপর। প্রাণে না মেরে ছেড়ে দিয়েছে এই যা রক্ষা।

গার্গী কাঁপছিল ভীষণভাবে, এ তো রীতিমতো ব্ল্যাকমেলিং। যে ঘটনার জন্য প্যারাডাইস দায়ী নয়, তার জন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে? যাই হোক, তুমি কখন আসছ?

—এখনই বেরোচ্ছি।

রিসিভার রেখে গার্গী একা-একা ফুঁসছিল।

কী আশ্চর্য, তাকেও কিনা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল ঘেরাওকারীরা! সে লোটনকে প্যারাডাইসে আসতে নিষেধ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার যথোচিত কারণও ছিল।

সায়ন ফ্ল্যাটে ফিরে এল আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। বিধ্বস্ত, ক্লান্ত সায়নের দিকে তাকাতেই পারছিল না গার্গী। কেবলই মনে হচ্ছে তারই একটা সিদ্ধান্তের জন্যই আজ এত হেনস্তা সায়নের। সে যদি লোটনকে তখন আসতে বারণ না করত, তাহলে হয়তো—

হোটেল থেকে নিয়ে আসা সুস্বাদু খাবারগুলোও তেমন রুচল না সায়নের মুখে। আঘাতের পর আঘাতে ক্রমশই ভেঙে পড়ছে সে। যতবারই মনে হচ্ছে, হয়তো এইবার ক্রাইসিস কাটিয়ে উঠতে পারবে, ঠিক তার পরক্ষণেই এসে পড়ছে কোনও অন্তর্ঘাত কিংবা দুর্ঘটনার সংবাদ। এত ঝড়-ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে প্যারাডাইসকে সুখের মুখ দেখানো সত্যিই কঠিন ব্যাপার।

খেতে খেতে আবার নতুন খবর শোনাল সায়ন, জানো, কালীজীবনবাবু সময়মতো এসে না পড়লে হয়তো হেকল্‌ড হতে হত আজ। তাঁর সঙ্গে হঠাৎই এসে পড়েছিলেন রাহুল রায়।

—রাহুল রায়! গার্গী বিস্মিত হল।

—ওই যে, লাইম ইন্ডিয়ার যিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার ছিলেন। চাকরি হারিয়ে ভারি বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোক। হঠাৎ কী কারণে যেন এসেছিলেন ওদিকে। কালীজীবনবাবু তখন ফ্যাক্টরিতে হইহই শুনে ছুটে আসছিলেন, রাহুল রায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল পথে। দুজনে একসঙ্গে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই রক্ষা পেয়ে গেছি। রাহুল রায়ের বেশ এলেম আছে কিন্তু। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বক্তৃতাটক্তৃতা দিয়ে অতগুলো লোককে বেশ থামিয়ে দিল। আসলে যারা ঝামেলা করছিল, তাদের দু-একজনের সঙ্গে রাহুল রায়ের পরিচয় আছে বলে মনে হল। তাতেই দ্রুত কব্জা করে ফেলল মবকে। তারপর পুলিশ আসার পর নিগোসিয়েশনেও সাহায্য করল খুব।

গার্গী একেবারেই সন্তুষ্ট হল না, কী আর সাহায্য করল? একলক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। সে কি মুখের কথা?

—তিনলক্ষ টাকা চেয়েছিল প্রথমে। অনেক দর কষাকষির পর—

—রাখো তো, গার্গী হঠাৎ রেগে উঠল খুবই, যে লোকটা খুন হয়েছে তার জীবনের দাম তিনলক্ষ টাকা! তুমি তো জানো না লোটনের ব্যাকগ্রাউন্ড, তাই ভাবছ খুব জিতে গেছ। বেরোবার আগে আমাকে যদি একবার বলতে ঘটনাটা তাহলে এর কোনও কিছুই ঘটত না। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নই উঠত না। তবে এও শুনে রাখো, একপয়সাও দেব না ওদের।

সায়ন আশ্চর্য হল, সে কী! কেন?

—সেটা পরে শুনলেও চলবে। ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও।

—কী করতে চাও তুমি?

—লোটনের খুনের দায়ভাগ প্যারাডাইসকে নিতে হবে কেন? লোটনের খুনের কারণ একেবারেই অন্য।

বলতে বলতে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল গার্গী। সায়ন থতমত, হতভম্ব। বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ সময় পার হয়ে গেল দু-জনের মধ্যে। খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরের বাকি সময়টা বেশ কিছুক্ষণ গার্গী ভাবল একা-একা। কয়েকদিন ধরে চন্দ্রাদেবীর সেই হিংস্র মূর্তি, দীয়ার পলায়ন নিয়ে কেবলই ভাবছিল, তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। ভাবতে ভাবতে সন্ধের আগে হঠাৎ দ্রুত বেশবাস বদলাতে শুরু করল। সায়ন অবাক হয়ে দেখল, সালোয়ার কামিজের সাজে অনেকখানি বয়স কমে গেছে গার্গীর। হেয়ারস্টাইল একেবারে ভিন্ন ধরনের করে চোখে পরে নিল তার প্রিয় ঘোলাকাচের চশমাটা। গার্গী তখন কুড়ি বছরে সদ্য তরুণীতে উত্তীর্ণ এক সাংবাদিক। হাতে একটি ডটপেন আর নোটবই। পরক্ষণেই সায়নকে 'একটু বেরুচ্ছি' বলে বেরিয়ে গেল ফুট্টুসের গাড়ি নিয়ে। ফুট্টুসকে বলল, পার্ক স্ট্রিট থানা—

পার্ক স্ট্রিট থানার কোনও অফিসারের পক্ষে যদিও গার্গী চৌধুরীকে চেনার কথা নয়, তবু গার্গী চেহারাটা সামান্য বদল করে নিল এই ভেবে যে, হয়তো পরে কখনও দেখা হলেও হতে পারে। থানার ভেতর গিয়ে কোনও দ্বিধা না করেই গার্গী তরতর করে ঢুকে গেল পুলিশ ইনস্পেক্টরের ঘরে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, আমি একটি দৈনিক পত্রিকার তরফ থেকে আসছি। সেদিন 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এ যে ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন, সে ব্যাপারে কিছু জানতে চাই। একটা স্টোরি করব।

পুলিশ অফিসাররা একমাত্র সাংবাদিকদেরই যা কিছুটা রেয়াত করে চলেন। আসলে সাংবাদিকরা কখন কাকে ফাঁসিয়ে দেবে তা কেউই আগে থেকে আন্দাজ করতে পারে না। ফলত গার্গী বেশ সদয় ব্যবহারই পেল পুলিশ ইনস্পেক্টর অনিন্দ্য শাসমলের কাছ থেকে। বেশ স্টাউট চেহারার মাঝবয়সি পুলিশ অফিসার বললেন, এখনও কাউকেই ধরতে পারিনি। যেদিন সন্ধেয় খুন হয়, তার পরেই বারের মালিক বার বন্ধ করে বেপাত্তা। দু-চারজন ওয়েটারকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাতে যতদূর মনে হয়েছে, খদ্দেরে খদ্দেরে মাতাল অবস্থায় ঝগড়া হলে এরকম খুনখারাপি প্রায়ই হয়ে থাকে এ -ধরনের বারে।

গার্গী ইনস্পেক্টরের চোখের দিকে তাকাল, আপনি বোধহয় দেখেছেন, কাগজে বেরিয়েছে, ঝগড়া হয়েছিল একজন নর্তকিকে কেন্দ্র করে। সে ব্যাপারে কিছু ইনভেস্টিগেশন হয়েছে?

—হ্যাঁ, সেদিন দুজন ড্যান্সারের প্রোগ্রাম ছিল, একজন মিস পলি আর একজন মিস লিজা। মিস পলিকে আমরা ইন্টারোগেট করেছি। সে জানিয়েছে খুন হয়েছিল যে-সময়, তার অনেক আগেই প্রোগ্রাম সেরে সে বেরিয়ে গিয়েছিল বার থেকে। খুনের ব্যাপারে কিছুই জানে না।

—ঠিক কটার সময় খুনটা হয়েছিল?

—তদন্তে যা পেয়েছি রাত দশটার একটু আগে। তার দশ মিনিট আগে মিস লিজার নাচ শেষ হয়েছিল। সম্ভবত সে ড্রেসিংরুমে যাওয়ার পরেই কোনও গোলমাল বেধেছিল বারে।

—এ ব্যাপারে মিস লিজার বক্তব্য কী?

পুলিশ ইনস্পেক্টর হঠাৎ হাসলেন, মিস লিজাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমরা বারের রেজিস্টার থেকে তার ঠিকানা নিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখি, ওটা ভুয়ো ঠিকানা। আমরা অবশ্য খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যাচ্ছি।

—তাই! গার্গী বোধহয় কিছুটা অবাক হল, ঠিকানাটা একবার আমাকে দেবেন?

pathagar.net

—ঠিকানা পেলে কোনও লাভ হবে না আপনার। জায়গাটা খুব খারাপ।

গার্গী হেসে উঠল, সাংবাদিকদের কাছে কোনও জায়গাই খারাপ নয়। বরং খারাপ জায়গা থেকেই ভাল ভাল স্টোরিগুলো উঠে আসে।

পুলিশ ইনস্পেক্টর অনিন্দ্য শাসমল জরিপ করছিলেন গার্গীকে। আজকাল প্রায়ই বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে এরকম অল্পবয়সি তরুণ-তরুণীরা খবরের খোঁজে এসে হাজির হয়। তরুণীদের উৎসাহই যেন বেশি। রাতবিরেতেও কখনও একা, কখনও কোনও সঙ্গী বা সঙ্গিনীসহ ঘুরে বেড়াচ্ছে খাতা আর ডটপেন হাতে। এই তো কিছুদিন আগেই বউবাজারে বিশাল বোমা-বিস্ফোরণের পর রাত দশ-এগারোটাতেও দেখেছিলেন পাঁচ-ছজন তরুণ-তরুণী মহাউৎসাহে ঘোরাঘুরি করছে ধ্বংসস্তূপের আশেপাশে। ভাঙা ইট-পাথরের ভেতর থেকে এক-একটা ডেডবডি বেরোচ্ছে, আর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে তার ওপর। হু-হু করে নোট করে নিচ্ছে যারা শনাক্ত করতে আসছে সেই নিকট-আত্মীয় বা আত্মীয়াদের কথা। ঠিক মনে করতে পারলেন না, তাঁর সামনে বসা এই তরুণীটিও সেদিন বউবাজারে ছিল কি না। কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইনস্পেক্টর ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের ঠিকানাটি নোট করিয়ে দিলেন গার্গীর খাতায়। ঠিকানাটা যে ভুয়ো হবে তা মনে মনে আঁচ করেছিল গার্গী। কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে তাকাল পুলিশ ইনস্পেক্টরের দিকে, আচ্ছা, যে ব্যবসায়ী খুন হয়েছিল, তার সম্পর্কে ডিটেল্‌স্‌টা একটু নোট করে নিই।

অনিন্দ্য শাসমল খুবই সহযোগিতা করলেন গার্গীর সঙ্গে। তাঁর কেস-ডায়েরির পৃষ্ঠা খুলে জানালেন, ব্যবসায়ীর নাম কমলাপ্রসাদ জৈন। বয়স চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশের মতো। বড়বাজারে তাদের মস্ত গদি আছে। রেডিমেড গারমেন্টসের ব্যাবসা দু-তিন পুরুষের। তাছাড়াও কী সব নাকি সাপ্লাইয়ের কাজকর্মও আছে।

শেষ কথাটায় জোর দিল গার্গী, কী সাপ্লাই করেন সে ব্যাপারে কোনও খোঁজ নেওয়া হয়েছে?

পুলিশ ইনস্পেক্টর মাথা নাড়লেন, খোঁজ নিয়েছি, বাড়ির লোকজন বলেছে, স্পেয়ার-পার্টস্‌ সাপ্লাই করত বিভিন্ন মোটর রিপেয়ারিং কোম্পানিতে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার কোনও কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। ইনভেস্টিগেশন চলছে। হয়তো কোনও গোল্‌মেলে ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে।

গার্গী দ্রুত নোট করে নিচ্ছিল তার ছোট্ট খাতাটিতে। লেখা শেষ হতেই পৃষ্ঠাগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল একবার। নিশ্চিন্ত হতেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, ইনস্পেক্টরকে একটা মস্ত 'থ্যাঙ্কস', দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমিও বড়বাজারে একবার খোঁজ নিয়ে দেখব। তবু কাল সন্ধের পর আপনাকে একবার টেলিফোন করে জেনে নেব, কোনও হদিশ পেলেন কি না।

থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ইনস্পেক্টর অবশ্য বারবার তাকে বলে দিলেন, দেখবেন, আমাকে যেন কোট করবেন না। সাংবাদিকদের খবর দেওয়া হয় লালবাজার থেকেই।

গার্গী হেসে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে বেরিয়ে এল বাইরে। মিস লিজার খোঁজ নেওয়াটাই তার দরকার ছিল। ঠিকানা ভুয়ো জেনেও সে ফেরার পথে সোজা চলে এল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে, লিজার সন্ধানেই। পুলিশ যাকে খুঁজে পায়নি, চেষ্টা করলে হয়তো গার্গী তার খোঁজ জোগাড় করে ফেলতে পারে।

তদন্তের নেশাটা এমন গভীরভাবে চারিয়ে গিয়েছে তার মজ্জায় যে খেয়ালই হয়নি সন্ধের

pathagar.net

পর রাত্রির প্রথম প্রহরে এসব এলাকায় একজন যুবতীর পক্ষে ঘোরাফেরা করা বেশ বিপজ্জনক। পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে যে ঠিকানাটি জোগাড় করে এনেছে, খুঁজে পেতে তার হদিশ করতে গিয়ে বড় একটা ধাক্কার সম্মুখীন হল। তখন ঠিক বুঝতে পারেনি, কতটা খারাপ জায়গাটা। বুঝতে পেরে পিছিয়ে এল। সিঁড়ির গোড়ায় সিল্কের পাঞ্জাবি পরা একটা লোক তাকে ডাকছিল হাতছানি দিয়ে।

তৎক্ষণাৎ দ্রুত ফিরে এসে উঠে বসল তার গাড়িতে। আজ নয়, কাল সকালে অথবা দুপুরের দিকে আসতে হবে, যখন এ-পাড়ার বাসিন্দারা কিছুটা 'খালি' থাকে। এখন সবাই এত ব্যস্ত—

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ওপাশেই নিউ মার্কেট। অতএব সকালের বকেয়া মার্কেটিং সেরে ঘরে ফিরতে একটু রাতই করে ফেলল সেদিন। ফিরতেই সায়ন ঠাট্টা করল একটু, কদিন ধরে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে এম-ডি সাহেব।

গার্গী হেসে উঠে বলল, কদিন ধরে সাহেব-সাহেব করে যাচ্ছ। আমি তো সাহেব নই, বিবি।

তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করল সায়ন, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ইস্কাপনের বিবি।

—তবে তোমার কোম্পানির এম ডি হিসেবে কিন্তু ব্যস্ত নই এখন। আপাতত আমি একজন ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক। খবরের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি এখানে ওখানে।

সায়ন একটু গম্ভীর হল, তবে দেখো, কোনও বিপদে পড়ো না কিন্তু। শখের গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ালে পায়ে-পায়ে বিপদও ঘুরে বেড়ায়।

গার্গী এক নজর তাকাল সায়নের দিকে। সায়ন কি তার এই খোঁজাখুঁজি পছন্দ করছে না! সে তো প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে আরও বড় বিপদ থেকে বাঁচাতেই ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝুঁকি নিয়ে, তা ছাড়া হত্যা রহস্যও উদঘাটিত করতে হবে তাকে।

পরদিন সকালে অন্য দিনকার চেয়ে একটু আগেই বেরিয়ে পড়ল গার্গী। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের এই বাড়িগুলোতে এ-অঞ্চলের নামডাকওলা পতিতারা থাকে। কাল ঠিকানা মিলিয়ে বাড়িটা দেখে গিয়েছিল। ভেতরে ঢুকতে পারেনি। আজ সিঁড়ি বেয়ে সটান উঠে গেল দোতলায়। বাড়িটা বাইবের দিকে পুরানো। পলেস্তারা-খসে-পড়া চেহারা, কিন্তু সিঁড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলে বেশ ঝকঝকে, আধুনিক-ডিজাইনের। হঠাৎ গার্গীকে সেখানে দেখে বেশ হই-চই পড়ে গেল 'বাসিন্দা'দের ভেতর। বাসিন্দা মানে অধিকাংশই তরুণী, যারা কলকাতায় নিজেদের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে পরিচয় দেয় এমন শ্রেণীর। মেমসাহেব-মেমসাহেব চেহারা, বেশির ভাগই স্কার্ট-ব্লাউজ পরে আছে, কেউ-কেউ জিন্‌সের উপর পাতলা শার্ট, অনেকেরই বেশবাস শিথিল, কিন্তু তাতে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই।

সাংবাদিক শুনে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল তার চারপাশে। গার্গী জানাল, সে মিস লিজার খোঁজে এখানে এসেছে। সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেই চলে যাবে।

যে পাঁচ-সাতজন যুবতী ভিড় করে আছে, তাদের কারও নাম এলিনা। কারও রিচি, কারও ডেলা বা বিউটি, কারও বা জুলিয়েন। ডেলা নামের মেয়েটি বলল, কাল পুলিশও এসেছিল লিজাকে খুঁজতে, কিন্তু ওই নামে কোনও মেয়ে এখানে থাকে না।

থাকে না তা তো জানতই গার্গী। তবু যে কৌতূহলে সে এহেন একটি পরিবেশে ঝুঁকি নিয়ে এসেছে তা হল, হঠাৎ লিজা নামের সেই স্বর্ণকেশী নর্তকি কেনই বা এই বাড়িটির ঠিকানা ব্যবহার করেছে 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এর নথিপত্রে। নিশ্চই সে এই ফ্ল্যাটের অন্য কোথাও—

pathagar.net

এলিনা নামের মেয়েটি বেশ জোর দিয়ে জানাল, লিজা নামের কোনও মেয়ে এ অঞ্চলে কোথাও থাকে না। থাকলে তারা কেউ না কেউ জানতই। তবে এও হতে পারে, হয়তো এ পাড়ারই কেউ নাম বদলে হোটেলে গিয়ে নাচে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই এতক্ষণ কথা বলছিল গার্গী। হঠাৎ অন্য একটি মেয়ে উপর থেকে নেমে এসে গার্গীকে বলল গ্র্যান্ডমা তোমাকে ডাকছে।

গ্র্যাণ্ডমা। গার্গী বিস্মিত হল কম নয়। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে তিনতলার ছোট্ট একটি ঘরে ঢুকে যে অভিজ্ঞতা হল তা, তা যেমনই অদ্ভুত তেমনই রহস্যময়। আলোবাতাসহীন এমন ঘরটিতে ভাঙা চৌকির ওপর বসে আছে প্রাগৈতিহাসিক চেহারার, এক বৃদ্ধা, কলকাতার প্রায় বিলুপ্ত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রজন্মের এই উত্তরাধিকারিণী, সাদা বাংলায় যাকে এই পতিতাকুলের মাসি বলেই মনে হল তার। গতকাল পুলিশ এসে লিজার খোঁজ করেছিল সে খবর বুড়ি জানে। আজ আবার গার্গী সেই একই কারণে এ বাড়িতে এসেছে শুনে বুড়ি একবার দেখতে চেয়েছে তাকে।

অন্তত বছর আশি বয়স হবে বৃদ্ধার। মুখ তোবড়ানো, , চোখ গর্তে বসা, চামড়ায় হাজারো কোঁচ, চুল ধবধবে সাদা গায়ে ঢোলা ফ্রক এহেন এক প্রাচীনার কাছে বসতেই গার্গী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। বৃদ্ধা ভাঙা-ভাঙা স্বরে বলল, হঠাৎ লিজার খোঁজ করছ কেন তোমরা?

সামান্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে গার্গী জানাল, সে একজন সাংবাদিক। পুলিশ কেন লিজাকে খুঁজছে সে জানে না। হোটেল ড্যান্সারদের নিয়ে সে একটা স্টোরি করতে চায়। লিজার সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এর বারে। তাই-ই—

বৃদ্ধার নাম লিলি মরিশন। গার্গীর কথা শুনে ফোক্‌লা দাঁতে হেসে বলল তাহলে আমাকে নিয়েই একটা গল্প লেখো না। কচিবয়সে আমিও নাচতাম হোটেলে।

—তাই? গার্গী চমকে উঠল, কৌতূহলী হল। সত্যিই যখন সে সাংবাদিকতা করত এরকম চরিত্র পেলে তৎক্ষণাৎ দিনদুয়েক ঘোরাঘুরি করে একটা দুর্দান্ত ফিচার লিখে ফেলত এ বৃদ্ধাকে নিয়ে। কিন্তু আজ তার হাতে সময় কম, আপাতত ভূমিকাও অন্য। বুড়ির আত্মকাহিনী, তা যত রোমাঞ্চকরই হোক না কেন,তা শোনার বা লেখার মতো তার মানসিক স্থিরতা এখন নেই।

কিন্তু বৃদ্ধার পরের কথায় সে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। ফোকলা দাঁতের একরাশ হাসি উপহার দিয়ে বলল, জানো এক বাঙালিবাবু এ বাড়িতে আসে মাঝেমাঝে। আমার মেয়েদের কাছেই। সে কখনও ওপরে এসে আমাকে আদর করে ডাকে মিস লিজা বলে।

—তাই নাকি ! গার্গী হুমড়ি খেয়ে পড়ল বৃদ্ধার দিকে, কে তিনি? কী নাম তাঁর?

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়ে। তার নাম কখনও শুধোয়নি তারা। খদ্দেরদের নাম নিয়ে তাদের মাথা ব্যথাও নেই। মেয়েরা এক-একজনকে এক-এক নামে ডাকে। এই বাঙালিবাবুর আঙুলে অনেকগুলো আংটি পরা থাকে বলে আংটিবাবু নামেই এ তল্লাটে পরিচিত। তবে দুবছর আরো এই আংটিবাবু বৃদ্ধাকে ভালবেসে একটা ডায়েরি উপহার দিয়েছিল। তাতে তার নাম লেখা থাকলেও থাকতে পারে।

গার্গী আগ্রহ প্রকাশ করতেই খুঁজে পেতে ডায়েরিটা বার করে বুড়ি এগিয়ে দিল গার্গীর দিকে। পৃষ্ঠাগুলো উল্টেপাল্টে কোথাও উপহারদাতার নাম খুঁজে না পেলেও গার্গী নিথর হয়ে গেল ডায়েরির প্রস্তুতকারকের পরিচয় পেয়ে। ডায়েরিটা লাইম ইন্ডিয়ারই কেউ প্রেজেন্ট করেছে এটা। কে তিনি? হয়তো লোটন হতে পারে। নাকি রৌণক মুখার্জি?

গার্গী কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিল আংটিবাবুর বিবরণ। মাঝারি ধরনের হাইট, রং ময়লার দিকেই, ব্যাকব্রাশ করা চুল, গলার স্বর একটু ভারী। লোটনকে একদিন দেখেছে গার্গী।

pathagar.net

মিলেও যেন মিলছে না তার সঙ্গে। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, রৌণক মুখার্জির সঙ্গে তার একবার দেখা হওয়া দরকার। কতকাল আর লোকটাকে চোখের আড়ালে রেখে গার্গী তদন্ত চালিয়ে যাবে।

সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পটভূমিকায়, প্রায় আচমকাই রৌণক মুখার্জির সঙ্গে গার্গীর আলাপ হয়ে গেল।

'দি হিড্‌ন আর্ট' নামে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা চমকপ্রদ এক সেমিনারের আয়োজন করেছিল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের 'রজনীগন্ধা' হলে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে সেখানে বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান জানাল সংস্থাটি। বিষয় ঃ রোল অব্ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন মর্ডান সোসাইটি। খুবই পুরানো বিষয়, কিন্তু সায়ন গার্গীকে বলল, দ্যাখো না, কোনও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উপর যদি আলোকপাত করতে পারো—

অনেক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে 'ভারতীয় গণতন্ত্র' নিয়ে বক্তৃতা করে প্রথম হয়েছিল গার্গী। বেশ হইচই পড়ে গিয়েছি ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে। হঠাৎ কত কাল পরে, সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় সেমিনার যেতে হবে শুনে সে দ্বিধান্বিত হল। বলল, আসলে তোমাকেই চায় ওরা, আমাকে নয়। কার্ডের ওপর ভুল করে এম. ডি. লিখে ফেলেছে।

সায়ন তবু ঘাড় নাড়ল, উঁহু। ইণ্ডাস্ট্রি জগতে প্যারাডাইসের নতুন এ. ডি. এখন একটি বহু আলোচিত নাম। হয়তো মহিলা বলেই ব্যাপারটা এখন নতুন মাত্রা পেয়েছে। বেশ ফাটাফাটি একটা বক্তৃতা করে এসো।

ফাটাফাটি কি না তা গার্গী জানে না। সে কয়েকদিন ধরে খেটেখুটে যে লেখাটি তৈরি করল, তা যথেষ্ট প্রশংসা করল সমবেত সুধীমণ্ডলীর। গার্গীর বাচনভঙ্গি চমৎকার, তার কণ্ঠস্বর যথেষ্ট মনোযোগ কাড়ার মতো। রচনাটি সাবলীল ভঙ্গিতে লেখা, দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বচ্ছ। তার বক্তৃতা শেষ হতেই যাঁকে পরবর্তী বক্তা হিসেবে ডাকা হল, গার্গী স্তম্ভিত হয়ে দেখল, তিনি রৌণক মুখার্জি, লাইম ইণ্ডিয়ার অ্যাডভর্টাইজিং ম্যানেজার, এতক্ষণ তার পাশেই যে সুর্দশন শান্তশিষ্ট ব্যক্তিটি চুপচাপ বসেছিলেন, তিনিই।

গার্গী এতক্ষণ খেয়ালই করেননি রৌণককে। হল ভর্তি শ্রোতা ডায়াসে বিজ্ঞাপন জগতের কয়েকজন নামীদামি হর্তা-কতা, পাশেই লম্বভাবে রাখা কয়েকটি চেয়ার, চেয়ারগুলির সামনে রঙিন চাদর ঢাকা লম্বা টেবিল , তাতে ফুল উপচে পড়া ফুলদানি। এ চেয়ারগুলো আমন্ত্রিত বক্তাদের জন্যই —যেখানে আজকের সেমিনারের জন্য পাঁচেক বক্তার মধ্যে গার্গী বসেছিল সামান্য দুরু দুরু বুকে। এখন সে নেহাত একজন ছাত্রী নয়, একটা বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অন্তত সমীহ করার মতো কিছু বলতেই হবে তাকে।

পরবর্তী বক্তা হিসেবে মঞ্চে যাওয়ার আগে রৌণক শুধু তাকে বলে গেল, দারুণ বলেছেন কিন্তু আপনি।' অভাবিত প্রশংসায় অভিভূত হল গার্গী ইনিই যে রৌণক মুখার্জি তা এতক্ষণ বুঝতে পারেনি সে। অ্যামপ্লিফায়ারে নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রৌণক ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন মাইকের দিকে। বেশ স্মার্ট সপ্রতিভ ভঙ্গিতে শুরু করলেন। গার্গী তখন বিস্মিত হয়ে শুনছে রৌণকের বক্তব্য। বিজ্ঞাপন যে শুধু প্রচারই নয়, তা এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম রুচিমান

pathagar.net

শিল্প মাধ্যমও কখন কখনও তার কাব্যময়তা আধুনিক মানুষের হৃদয়কে এমন গভীরভাবে স্পর্শ করে যে রুচি বদলে দেয় সমগ্র মানবসভ্যতারই।

প্রায় কবিতার মতোই রৌণকের ভাষা। গৌরবর্ণ সৌম্য চেহারার রৌণক , হাইট সাধারণ বাঙালির তুলনায় একটু বেশিই, মাথার চুল কোঁকড়া, এ হেন রৌণকের কাব্যময় নিবেদন শুনতে শুনতে গার্গীর কেবলই মনে হচ্ছিল, ইনিই সেই পুরুষ একদা যার প্রেমে পড়েছিল ঐন্দ্রিলা, নিঃশব্দ প্রেমই, তবু ভালবাসায় ঘাটতি ছিল না একটুও কিন্তু বিনিময়ে উপেক্ষা ছাড়া কিছুই পায়নি বেচারি। অন্য এক নারীর প্রেমে এতই ওতপ্রোত ছিলেন রৌণক যে, নিঃশব্দে সরে আসতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে। তা অবশ্য হতেই পারে, প্রেমের নিয়মই তাই, কিন্তু আশ্চর্যের এই যে, বিয়ের পরও ঐন্দ্রিলা একটা সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিল রৌণক মুখার্জির সঙ্গে। কী সে সম্পর্ক তা গার্গী পুরোপুরি বুঝতে পারেনি এখনও। ঐন্দ্রিলার সেই ডায়েরিটিতে কতটুকুই বা লেখা ছিল, তা এমনই দুর্বোধ্য ও দ্ব্যর্থবোধক যে সেই পুরুষটি রৌণকই কি না তা বোঝা সম্ভব হয়নি গার্গীর পক্ষে।

গার্গী আরও আশ্চর্য হচ্ছিল এই ভেবে যে, রৌণকই এক সময়ে কবিতা লিখতেন (এখনও লেখেন কি না তা অবশ্য জানে না,) ফরাসি ভাষা শেখাতেন ঐন্দ্রিলাকে, তা নিয়ে গোলমাল হওয়ার পর স্বাভাবিক হত, যদি তাঁদের মধ্যে আর কোনও যোগাযোগ না থাকত, অন্তত ঐন্দ্রিলার বিয়ের পর অবশ্যই, কিন্তু তার পরও কেন রৌণক যেতেন ঐন্দ্রিলার কাছে, সেটাই ভারি রহস্যময়। বিশেষ করে যে রাতে ঐন্দ্রিলা খুন হয়, সেদিন সন্ধের পর তার কাছে গিয়েছিলেন এই পুরুষটি কেন গিয়েছিলেন তা একমাত্র রৌণকই এখন বলতে পারেন।

ভাবতে ভাবতে গার্গী সিদ্ধান্ত নিল, যে করেই হোক, রৌণকের সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ঐন্দ্রিলা হত্যা রহস্যের উৎস খুঁজতে গিয়ে গত কয়েকদিন হাজারো সমস্যার গভীরে তাকে প্রবেশ করতে হয়েছে। একদিকে চন্দ্রাদেবী-রবার্ট হিমন-দীয়াকে নিয়ে একরকম জটিলতা, অন্যদিকে প্যারাডাইসের সঙ্গে লাইম ইণ্ডিয়ার সম্পর্ক নিয়ে ভিন্ন রকম টানাপোড়েন, তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে 'দি আইডিয়াল নেস্ট।' এতসব গূঢ় রহস্যের ভেতর রৌণকের প্রকৃত ভূমিকা কী, সেটা না জানা পর্যন্ত কে হত্যাকারী তা রহস্যই থেকে যাবে। অতএব এই রৌণক-রহস্য ভেদ করাই তার এখন প্রথম দায়িত্ব। অতএব এর বক্তৃতা শেষ করে রৌণক তার পাশে এসে বসতেই গার্গী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল তার বক্তৃতার। শুধু তা-ই নয়, এও বলল, বিজ্ঞাপনের আর্টকে যে এভাবে ভাবা যায় তা গার্গী জানতই না এতদিন। আরও বলল, আপনাদের কোম্পানির বিজ্ঞাপন আমি নিয়মিত ফলো করি। শুনেছি সবই নাকি আপনার মাথা থেকে বেরোয়।

বক্তৃতার সময় কিছুটা নার্ভাস ছিল রৌণক, তাই অ্যামপ্লিফায়ার ছেড়ে সিটে এসে বসতেই একরাশ স্তুতির সম্মুখীন হবে তা ভাবতেই পারেনি, তাও কিনা তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের খোদ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মুখ থেকে। আর শুধু তার বক্তৃতাই নয়, তার বিজ্ঞাপনের প্রশংসাও। রৌণক আপ্লুত হয়ে গেল, আপনি বিজ্ঞাপনগুলো দেখেন নাকি!

—দেখতেই হয়, কারণ দুই কনসার্নের একই তো প্রোডাক্ট। তাকে আর এক কনসার্ন কত আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপিত করছে, তা দেখাও তো এক অন্য অভিজ্ঞতা।

সেদিন আর দু-তিনজন বক্তা ছিলেন সেমিনারে। তাঁর কী বললেন না বললেন তা গার্গীর মগজে সেঁধুল না। সে তখন নিচু গলায় রৌণকের সঙ্গে তৈরি করে নিচ্ছে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা। সেমিনার শেষ হলে বাইরে বেরিয়ে রৌণক যখন তার গাড়ি খুঁজছে, গার্গী নিজেই

pathagar.net

প্রস্তাব দিল, নিশ্চয় এই বিকেলবেলা আর অফিসে যাবেন না। তাহলে গাড়িটা ছেড়ে দিন। আপনাকে আমিই পৌঁছে দিই।

ক্রমশ অভিভূত হচ্ছিল রৌণক। বেশ কিছুদিন ধরে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ঘটনাবলি দূর থেকে শুনে যাচ্ছিল তারা, পল্লবিত অনেক কাহিনীও বিশেষ করে সায়নের জীবনে গার্গীর প্রবেশও কয়েকদিন পরেই তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ নানান রসালো গল্পের জোগান দিয়েছিল লাইম ইণ্ডিয়ার দফতরের। সেই গার্গীর সঙ্গে অভাবিতভাবে যোগাযোগ হওয়ার পর তিনিই লিফ্‌ট দিতে চাইছেন রৌণককে, তা সে ভাবতেই পারছিল না।

সেদিন নিজেই মারুতি চালিয়ে সেমিনারে এসেছিল গার্গী । সামনের সিটে রৌণক বসতেই সেলফের চাবি ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় পৌঁছাতে হবে?

চেতলার রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব রোডে রৌণকের ছোট ফ্ল্যাট। গার্গীকে তা বলতেই সে দ্রুত স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বেরিয়ে এল গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সামনে থেকে। দুরন্ত বেগে রেড রোড দিয়ে প্রায় উড়ে যেতে যেতে বলল, বিজ্ঞাপনের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আপনি খুব ভাবেন, তাই না?

—খুবই, সামান্য হাসল রৌণক, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি ওগুলো লক্ষ করেছেন এবং প্রশংসাও করলেন তার।

গার্গী ঠোঁট টিপে হাসল, ভাল যে কোনও কিছুরই প্রশংসা করা উচিত।

—তা হয়তো উচিত। কিন্তু কোনও প্রতিযোগী কনসার্নের এম. ডি. তার প্রশংসা করছেন এটা আমাদের দেশে অন্তত ভাবা যায় না। এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে পরস্পরের মধ্যে—

—প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাক কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু ঈর্ষা থাকা ভাল নয়, গার্গী হঠাৎ দুম্ করে বলে ফেলল। বলেই একবার রৌণকের মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল।

রৌণকের অবশ্য কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। বরং হেসে বলল, রাইট ইউ আর, ম্যাডাম। আমিও তাই মনে করি। কিন্তু আপনার বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যানের বক্তব্যের কত তফাত। তাঁর মুখ দিয়ে কখনই প্যারাডাইস সম্পর্কে এক পংক্তি প্রশংসাও বেরোবে না। তিনি—

উচ্ছ্বাসের বশে আরও কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রৌণক। মুহূর্তে হেমজ্যোতি সিংহ রায়ের বেঁটেখাটো গোল শরীর আর ক্রুদ্ধ মুখখানা ভেসে উঠতেই তার জিভ জড়িয়ে গেল হঠাৎ।

—হাউ ইজ ইয়োর চেয়ারম্যান? শুনছি তিনি খুব কড়া ধাতের মানুষ?

—খুবই কড়া ধাতের, রৌণক এতক্ষণে বলেই ফেলল এমনই কড়া যে কখন আমাদের চাকরি আছে কখন নেই তা আমরা কেউই জানি না।

—সেদিন শুনলাম, আপনাদের প্রোডাকশন ম্যানেজারকে হঠাৎ স্যাক করেছেন চেয়ারম্যান?

—হ্যাঁ। শুধু তাঁকেই নয়, চেয়ারম্যান এখন এমন বিধ্বংসী মূর্তিতে আছেন, যে কোনও অফিসারকে যে-কোনও সময় স্যাক করতে পারেন। এইসব প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করা যে কী ঝকমারি তা যারা কাজ করে তারাই জানে। প্রতিদিন সকালে অফিসে বেরোবার সময় মনে হয়, সন্ধেবেলা চাকরি নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে তো! যে কোনও মুহূর্তেই হয়তো ডিসচার্জ লেটার ধরিয়ে দেওয়া হবে, ইয়োর সার্ভিস ইজ নো লঙ্গার রিকয়ার্ড ইন কোম্পানি।

রেসকোর্সের পাশ দিয়ে তুমুল বেগে ছুটতে ছুটতে গার্গী বলল, তাহলে তো খুবই টেনশন কাটাতে হচ্ছে আপনাদের?

pathagar.net

—ভীষণ। চেয়ারম্যানের মুখখানা যদি কোনও দিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে মনে পড়ে, সেদিন চোখে আর ঘুমই আসে না। ঘুম যদিও বা আসে, সঙ্গে দুঃস্বপ্ন।

গার্গীর হাসিও পাচ্ছিল, কষ্টও হচ্ছিল তাহলে তো বেশ ভীতিপ্রদ ব্যাপার। মানে, আপনাদের চেয়ারম্যান—

রৌণক হড়হড় করে তার .ক্ষাভ উপচে দিল গার্গীর কাছে বলতে পারেন একবারে গ্রে হাউণ্ডের মতো। পারলে ঝাঁি য়ে পড়ে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলেন। রাহল রায় স্যাক্‌ড হয়ে বেঁচেই গেছেন মনে হচ্ছে।

—আপনিও কি চাকরি চেঞ্জ করার কথা ভাবছেন?

গার্গীর প্রশ্নে এবার বিভ্রান্ত হল রৌণক, চাকরি চাইলেই কি পাওয়া যায় নাকি।

গার্গী ঘাড় ফেরাল রৌণকের দিকে, যদি পাওয়া যায়, তা হলে করবেন!

রৌণক কিছু উত্তর দেবার আগেই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করতে হল গার্গীকে। ততক্ষণে জুলজিক্যাল গার্ডেনের সামনে এসে পৌঁছেছে তারা। বিকেলে চিড়িয়াখানা থেকে পিলপিল করে লোক বেরোচ্ছে, তাতে সামান্য জ্যাম হয়েছে এখানটায়। হঠাৎ কাকে যেন দেখে রৌণক চ্যাঁচাল আরে রায় সাহেব।

হালকা ব্লু-রঙের শার্ট ডিপ ব্ল্যাক প্যান্ট পরনে একজন অনতিচল্লিশ ব্যক্তির উদ্দেশে হাত বাড়াল রৌণক, কী ব্যাপার, এখানে—

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল গার্গী, আরে, খুব চেনা চেনা মুখ। কোথায় দেখেছে যেন কদিন আগে। লোকটি কিছু বলার আগেই গার্গীর সামনে ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে। পেছনের গাড়ি পিঁক পিঁক শব্দ করতেই গার্গী গাড়ি চালাতে শুরু করে রৌণককে জিজ্ঞাসা করল, গাড়ি সাইড করে দাঁড়াব? কথা বলবেন?

রৌণক জানলা দিয়ে বাড়িয়ে হাত নাড়ল ভদ্রলোককে। তারপর গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, নাহ্ কালই দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে। নিশ্চয় কোনও কাজে এসেছিলেন এদিকে।

কৌতূহল চাপতে পারল না গার্গী, কে ভদ্রলোক?

—চেনেন না ওঁকে। উনিই তো রাহুল রায়। চাকরি হারিয়ে ভারি বিপদে পড়েছেন। প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল গার্গী। ইনিই রাহুল রায় নাকি, কী অদ্ভুত। কিন্তু নিজেকে যথাসম্ভব উদাসীন রেখে বলল, এখন কী করছেন ভদ্রলোক?

—একটা নতুন ফ্যাক্টরি করতে চাইছেন। তারই চেষ্টা এখানে-ওখানে ঘুরে। গার্গী হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, ইজ হি অ্যা ফ্যামেলি ম্যান?

রৌণক বিস্মিত হল, হ্যাঁ। ওঁর এক ছেলে, এক মেয়ে।

পরক্ষণেই কী যেন ভেবে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল গার্গী আচ্ছা, আপনি তো জব চেঞ্জ করতে চাইছেন। যদি প্যারাডাইস প্রোডাক্টস আপনাকে চাকরি অফার করে, তাহলে আপনি কি অ্যাকসেপ্ট করবেন?

—প্যারাডাইস? রৌণক আচমকা ধাক্কা খেয়ে নড়ে চড়ে বসল যেন। হয়তো সেই মুহূর্তে মারুতির চাকার তলায় একটা পট্‌হোল পড়ায় গাড়িটা উঠেছিল বলেও হতে পারে, অথবা প্রস্তাবটা তার কাছে এতই আকস্মিক, তাই-ই। চমক কাটিয়ে বলল, কিন্তু আপনাদের তো অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার আছেন। মধুমন্তী—

—মধুমন্তী চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারে তো।

—মধুমন্তী চাকরি ছেড়ে দেবে? অমন লিউক্রেটিভ স্যালারি ছেড়ে। আপনার মতো ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সায়ন চৌধুরীর মতো চেয়ারম্যানকে ছেড়ে—

pathagar.net

—আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন প্যারাডাইস? গার্গী আবার আগের প্রশ্নে ফিরে গেল।

তখনও প্রবল বিস্ময়ে ডুবে আছে রৌণক। গার্গী এমনই আচমকা তাকে প্রস্তাবটি দিয়েছে যে, সামান্যতম সময়ও নেই ভাববার। বলে ফেলল, নিশ্চই। আপনার মতো এম. ডি-র কাছে কাজ করতে পারাটা নিঃসন্দেহে এক অন্য অভিজ্ঞতা।

—এতক্ষণ কথা বলে তাই বুঝলেন নাকি। আমাদের কোম্পানিতে প্রথমে কিন্তু অন্য রি-অ্যাকশন হয়েছিল। অনেকেই মহিলা ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে মেনে নেওয়ার বিষয়ে আড়ালে কানাকানি করেছিলেন। আপনার সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না?

রৌণক হাসল, না আমার সেরকম খুঁতখুঁতানি নেই। আমি যেখানেই কাজ করি, যাঁর কাছেই কাজ করি, আমার যতটুকু মেধা সবটুকুই ঢেলে দিই কাজে, সেক্ষেত্রে আমার বস্ মহিলা, না পুরুষ, সে ব্যাপারে আমার আলাদা কোনও রি-অ্যাকশন নেই। অন্তত আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তো মোটেই নেই। যদিং আজ আপনাকে না চিনতাম, মানে একেবারে অপরিচিত হলে হয়তো আপনার সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতাম।

—কীরকম খোঁজখবর নিতেন?

রৌণক ইতস্তত করে বলল আসলে মহিলারা অনেক সময় ডমিনেটিং হন, সেক্ষেত্রে তাঁর অধীনে কাজ করাটা কিছুটা অস্বস্তিকর। তবে আপনি সেরকম নন।

—আমাকে একদিন দেখেই বুঝতে পারলেন, আমি ডমিনেটিং নই?

—মহিলাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন আমি বুঝতে পারি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অ্যাভেনিউ ক্রশ করে গার্গী তখন এসে পড়েছে আলিপুর ট্রামরাস্তার ক্রশিংয়ে। আবার একটু জ্যামের মুখোমুখি। গাড়ি থামিয়ে হেসে উঠল গার্গী, বাহ্ তা হলে তো আপনাকে একজন মহিলা বিশেষজ্ঞ বলা যায়।

রৌণক হঠাৎ ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। কথাটা তার একটু অন্যভাবে বলা উচিত ছিল। অন্তত একজন মহিলার সামনে। হেসে বলল, যদি কিছু মনে না করেন তো জিজ্ঞাসা করি, চাকরির ব্যাপারটা কি সত্যিই বললেন, না জোক করলেন?

গার্গী সামান্য গম্ভীর হল।

রৌণক তৎক্ষণাৎ বলল না, মানে আমার চাকরির সত্যিই দরকার। লাইম ইণ্ডিয়ায় বোধহয় আর বেশি দিন চাকরি করা যাবে না। কোম্পানির অবস্থা টালমাটাল।

তেমনই গম্ভীর হয়ে গার্গী উত্তর দিল, অন্তত চাকরির ব্যাপারে কারও সঙ্গে জোক করতে নেই। চাকরি মানে একজন বেঁচে থাকার, রুজিরোজগারের ব্যাপারে। মধুমন্তী চাকরিটা ছেড়ে দেবে শিগগির, অন্তত আমার কাছে সেরকই রিপোর্ট এসেছে। দু-চারদিনের মধ্যেই জানতে পারব বলে মনে হচ্ছে, তাই আপনার ভিউজিটা নিয়ে রাখলাম। তবে কোম্পানির অবস্থার কথা যদি বলেন, জেনে রাখুন প্যারাডাইসের অবস্থাও খুব ভাল নয়।

—লাইম ইণ্ডিয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

—আপাতত তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু পরপর এমন ঝড়ঝাপটা আসছে, কতদিন কোম্পানির টিকবে বলা মুশকিল।

রৌণক আশ্চর্য হল যেন, তাই!

—কেন আপনি কিছু শোনেননি? গার্গী এবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকাল রৌণকের দিকে।

—হ্যাঁ কিছু কিছু কানে আসে। সেদিন একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে জি. টি. রোডের ওপর। এক ট্রাক মাল লুট হয়েছে।

pathagar.net

—আর কিছু শোনেননি?

—হ্যাঁ আমাদের কোম্পানির একজন সুপারভাইজার খুন হয়েছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ফ্যাক্টরির ঠিক পেছনে। তাই নিয়ে ও খুব গোলমাল হয়েছে—

জ্যামে আটকে পড়ে তখন গরমে হাঁসফাঁস করছে সবাই। রৌণক পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়-গলা মুছছে। গার্গী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল রৌণকের দিকে, গরমে ঘামছে, নাকি উত্তেজনায়। গার্গীর প্রশ্নগুলো তো তাকেই লক্ষ করে।

—এসব নিয়ে আপনাদের কোম্পানিতে কোনও আলোচনা হয় না?

—হয় না আবার। আমাদের কিছু কিছু লোক আছে যারা প্যারাডাইসের বিপদে খুশি হয়। সমৃদ্ধিতে বিমর্ষ হয়।

—আপনার কী মনে হয়। কেন এতসব ঘটছে প্যারাডাইসে? বলে গার্গী তার এক্স-রে আই সেঁধিয়ে দিল রৌণকের মুখের প্রতিক্রিয়া বুঝতে।

রৌণক অবাক হয়ে তাকাল গার্গীর দিকে, বলল, কী আর মনে হবে? কখনও কখনও এরকম খারাপ সময় সব কোম্পানিতেই আসে।

—প্যারাডাইসের খারাপ সময় এলে তো লাইম ইন্ডিয়ারই লাভ, তাই না? মাঝখানে শুনলাম লাইম ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে হুইসপারিং ক্যাম্পেন চলেছে প্যারাডাইসের বিরুদ্ধে।

রৌণক গার্গীর দিকে তাকাল, ঠিকই শুনেছেন। আমাদের চেয়ারম্যান তো একদিন মিটিংয়েই বললেন, প্যারাডাইস বসে গেলেই লাইম ইণ্ডিয়ার লাভ। এ ব্যাপারে আমাদের প্রোডাকশন ম্যানেজার, মানে রাহুল রায়, ওই একটু আগে যাঁকে দেখলেন, চেয়ারম্যানকে খুব তাতিয়েছিলেন সে সময়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ আমাকেও তাতাতেন খুব। বলতেন ক্র্যাশ দেম। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিন প্যারাডাইসের স্বর্গ। আসলে রাহুল রায় তখন চেয়ারম্যানের চক্ষুশূল। আমাদের প্রোডাক্ট তখন প্যারাডাইসের প্রোডাক্টের পাশে মার খাচ্ছে। বিক্রি ডাউন হচ্ছে রোজ। চেয়ারম্যান রোজই ধমকাচ্ছেন রাহুল রায়কে। বলতেন, কী মশাই আপনিও তো কানাডা না আমেরিকা কোথা থেকে যেন ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন তা এ রকম ভূসিমাল বেরোচ্ছে কেন ফ্যাক্টরি থেকে?

—তাই, গার্গী হেসে ফেলল, সেইজন্যেই রাহুল রায়ের চাকরি গেল নাকি।

—একজ্যাক্টলি। সে সময় রাহুল রায় একদিন আমাদের বললেন, ওঃ এর চেয়ে প্যারাডাইসে কাজ করা অনেক আরামের ছিল। চেয়ারম্যান নিজেই সব ফর্মুলা বার করেন। সেখানে শুধু কত প্রোডাকশন করব, সেটা ভাবলেই যথেষ্ট ছিল, কী প্রোডাকশন করব তাতে আমার মাথাব্যথা থাকত না।

—তাই! গার্গী ভুরু কুঁচকে একলহমা কী যেন ভাবল। তারপর হেসে বলল সত্যিই এখানে কী প্রোডাকশন করব তা নিয়ে ভাবতে হয় না। কিন্তু তাতেও কোন সুরাহা হচ্ছে না। প্যারাডাইসের পায়ে পায়ে বিপদ।

রৌণক এতক্ষণে ঘাড় নাড়ল, তাই তো দেখছি। আসলে সায়ন চৌধুরীর সেই মিসহ্যাপটা ঘটে যাওয়ার পর থেকেই বিপদ চলছে তাই না?

গার্গী চকিতে একবার রৌণকের মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠা ভাষাটি পড়ে নিল। মিসহ্যাপ শব্দটি উচ্চারণ করার সময় তার অভিব্যক্তি কি বদলে গেল। ট্রামলাইন ফাঁকা পেতেই গার্গী হু হু পার হয়ে গেল জাজেস কোর্টের পাশের রাস্তাটা। একটু এগিয়ে বাঁদিকে বাঁক নিলেই চেতলার পথ।

pathagar.net

চেতলায় গাড়ি ঢুকতেই রৌণক হঠাৎ বলল, এতদূর যখন এলেনই তখন একবার আসুন না আমার ফ্ল্যাটে?

—আপনার ফ্ল্যাটে। গার্গী একটু অবাক হল, কিন্তু সুযোগটা ছাড়ল না। তার আগেও অনেক কথা বাকি আছে রৌণক মুখার্জির সঙ্গে। তা ছাড়া তার বহুদিনের ইচ্ছে, রৌণকের স্ত্রীর সঙ্গে একবার আলাপিত হওয়ার। সেই প্রেমিকা, যার আকর্ষণে রৌণক উপেক্ষা করেছিলেন ঐন্দ্রিলার মতো অসামান্য রূপসীকে। তৎক্ষণাৎ সে রাজি হয়ে গেল চলুন, আপনার স্ত্রীর হাতে এককাপ চা খেয়ে আসি। আপনার স্ত্রী নাকি দারুণ সুন্দরী।

রৌণক অবাক হয়ে বলল, আপনি কী করে জানলেন?

—জেনেছি, গার্গী হাসতে হাসতে বলল, ছেলেদের টাকা আর মেয়েদের রূপের খবর বাতাসে ওড়ে।

রৌণক খুবই বিস্মিত হচ্ছিল, হঠাৎ চ্যাঁচিয়ে বলল, এই যে এই গলিটার মুখেই গাড়ি রাখতে হবে। গলির ভেতর তিনটে বাড়ি পরেই আমার আস্তানা।

গার্গী অভ্যস্ত ভঙ্গিতে আর মারুতির পার্ক করে নেমে এল রাস্তায়। গাড়ির জানলা বন্ধ করে লক এঁটে বলল, আরও অনেক কিছুই জেনেছি আপনার সম্পর্কে। যেমন আপনি এককালে কবিতা লিখতেন। ফরাসি ভাষা জানেন। যেমন—

রৌণক বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞাসা করল, সে কী। এতসব খবর কোত্থেকে পেলেন?

গার্গী চোখে দুষ্টু দুষ্টু অভিব্যক্তি ফোটাল, কয়েক দিন আগে একজন সাংবাদিক এসেছিল আমার চেম্বারে। নাম বলল, মিতুন মুখার্জি। এসেছিল প্যারাডাইস প্রোডাক্টস সম্পর্কে একটা রাইট আপ তৈরি করতে। এইসব সাংবাদিকরা ভারি বিচ্ছু হয়। টুকটাক ঘোরাফেরা করে নাড়ির খবর টেনে বার করে। সে সময় কথায় কথায় বলল, জানেন, লাইম ইণ্ডিয়ার অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজার রৌণক মুখার্জি ঐন্দ্রিলাকে চিনতেন—

রৌণকের আর পা বাড়ানোর ক্ষমতাই রইল না। কিন্তু সে এখনও জানে না, গার্গী আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব প্রশ্ন এরপর জিজ্ঞাসা করবে তাকে।

দোতলা বাড়িটার সিঁড়িতে ওঠার মুখে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে গার্গীর দিকে তাকাল রৌণক, তা হলে মিতুন মুখার্জি আপনার কাছেও গিয়েছিল?

গার্গী হাসল হ্যাঁ। তারপর দেখি প্যারাডাইসের কথাবার্তা ছেড়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারস্যাপার জানতে চাইছে। আমি যতই এড়িয়ে যেতে চাই, ঘুরে ফিরে কেবলই জিজ্ঞাসা করে সায়নের কথা। তারপর হঠাৎ বলল, আপনি কি জানেন, ঐন্দ্রিলা ফরাসি ভাষা শিখতে যেতেন রৌণক মুখার্জির কাছে। তাই নিয়ে এত গোলমাল—

রৌণক ততক্ষণে বেল বাজিয়ে ফেলেছে দরজা খুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু শরীরটা যেন আর তার বশে নেই। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার সম্পর্কে আর কতকিছু জেনে ফেলেছেন তা অনুমান করে উঠতে পারছিল না।

বেল শুনে ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে ঋতবৃতা। অন্যদিনকার মতোই রৌণককে দেখে কলকল করে উঠতে যাচ্ছিল, কী লোক তুমি? রোজ রোজ এত দেরি করে ফেরো—

কিন্তু বলা হল না, রৌণকের সঙ্গে আর এক অপরিচিতা মহিলাকে দেখে বিব্রত হল। তার পরনের পোশাকটি ঠিক বাইরের লোকের সামনে আসার মতো নয়। সে জিভ কেটে ছুটে পালাবার আগেই রৌণক বলে উঠল, ঋতু, ইনি হলেন গার্গী চৌধুরী। প্যারাডাইসের—

গার্গী অবাক হয়ে দেখছিল ভারি কচি-কচি মুখের ঋতবৃতাকে। বেশ মিষ্টি লালিত্যময় চেহারা। ঐন্দ্রিলার সৌন্দর্যের প্রখরতা তার নেই বটে, কিন্তু তার সর্বাঙ্গ ছড়িয়ে আছে এক কিশোরীসুলভ চটক। ঋতবৃত্তা কোনক্রমে দু'হাতজোড় করে তার ম্যাক্সি সামলে ছুটল সিঁড়ি বেয়ে। নিশ্চয় পোশাক বদলানোই তার এখন প্রাথমিক কাজ।

দোতলায় রৌণক ফ্ল্যাটটি আকারে বেশ বড়ই। যে ঘরটিতে গার্গীকে বসাল, সেই লিভিংরুমে বাইশ-বাই চোদ্দো এরকম বিশাল সাইজের। এককোণে সুদৃশ্য সোফাসেটে গা এলিয়ে. দিতে দিতে গার্গী তাকাল রৌণকের দিকে, বেশ বড় ফ্ল্যাট তো!

—হ্যাঁ ওপাশে একটা বেডরুম আছে। সেটাও বেশ বড়। সামনে যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছেন, ওটা ডাইনিং। তার ওপাশে কিচেন। মডার্ন ফ্ল্যাটগুলোর তুলনায় বেশ বড়ই।

ছিমছাম ঘরখানায় নজর রাখতে গার্গী হঠাৎ বলল, ঐন্দ্রিলা কি এখানেই আসত ফরাসি ভাষা শিখতে?

প্রায় বজ্রপাত হওয়ার মতোই চমকে উঠল রৌণক। চকিতে একবার তার বেড়রুমের দিকে তাকাল। ঋতবৃতা নিশ্চয় পোশাক বদলাতে ঢুকছে ও ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তবু গার্গী চৌধুরী এখনও সেই আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন দেখে ভীষণ সন্ত্রস্ত হল। আস্তে করে বলল, মিতুন মুখার্জি এতসব খবর জানল কী করে?

রৌণককে বিব্রত হতে দেখে গার্গী ভীষণ কৌতুক অনুভব করছিল। রৌণককে এখন তোপের মুখে বসিয়ে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করবে বলেই প্রসঙ্গটা সে তুলেছে আবার। রৌণক নিশ্চয়ই চাইবে না তার স্ত্রীর কানে এসব আলোচনা ঢুকুক। গার্গী চায় না, রৌণককে চাপে রাখতে হলে ঋতবৃতকে এভাবে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে রেখেই পরের পর তির ছুড়তে হবে তাকে। একমাত্র এরকম ব্ল্যাকমেলেই তার পেট থেকে কথা বার করা সম্ভব। সরলভাবে হেসে বলল, বললাম না, সাংবাদিকরা ডেঞ্জরাস হয়। আমার সম্পর্কেও অনেক কথা জেনেছে। কী করে জানল ভেবে আমিও অবাক হয়ে গেছি। যেমন আপনি অবাক হচ্ছেন। আরও কী বলল জানেন! বলল, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আপনার একটা লাগ্‌ভাগ্‌ ছিল।

রৌণক চমকে উঠে বলল, লাগ্‌ভাগ্‌ মানে?

—শব্দটা আমার কানেও নতুন লেগেছিল। বলল, তার মানে একটা ভালবাসাবাসির মতো ব্যাপার, অথচ ঠিক বৈধ নয়—

রৌণক প্রতিবাদ করল, যদিও নিচু স্বরে, মিতুন মুখার্জি তা হলে ঠিক বলেনি। ঐন্দ্রিলার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল শিক্ষক এবং ছাত্রীর। ঐন্দিলা শ্রদ্ধাই করতে আমাকে। তাকে ভালবাসা বলে না।

গার্গী তীক্ষ্ন চোখে তাকাল রৌণকের দিকে আর আপনি?

—আমিও তাকে ছাত্রীর মতোই দেখেছি বরাবর।

জিভে চুকচুক শব্দ করল গার্গী, এহ, কী মিথ্যুক দেখেছেন সাংবাদিকগুলো। কিন্তু জানেন আমাকে বলল, রৌণক মুখার্জি ফরাসি ভাষায় চিঠি লিখেছিলেন ঐন্দিলাকে। ঐন্দ্রিলার বাবা চিঠির সম্বোধন পড়েই বুঝেছিলেন সেটি প্রেমপত্র। তারপর ঐন্দ্রিলাকে আর ফরাসি ভাষা শিখতে দেননি। ঘটনাটা কি ঠিক, মিঃ মুখার্জি?

pathagar.net

রৌণক ভীষণ বিব্রত হয়ে পড়ছিল ক্রমশ। এখন যে কোন মুহূর্তে ঋতবৃতা বেরিয়ে আসবে ও ঘর থেকে। সন্ত্রস্ত চোখে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলল, ও ঘটনাও ঠিক নয়। যে কাগজের টুকরোটিকে ঐন্দ্রিলার বাবা চিঠি বলে মনে করেছিলেন, আসলে তাতে লেখা ছিল, একটি ফরাসি কবিতা। কবিতাটির নাম ছিল, 'মন আমুর'। বাংলায় যার অর্থ হয় আমার ভালবাসা। কবিতার শিরোনাম দেখেই উনি ধরে নিয়েছিলেন একটি সম্বোধন। পুরো কবিতাটি বুঝতে পারলে কখনই সেটি প্রেমপত্র বলে ভাবা যেত না।

—তাই ! গার্গী অবাক হল, পরক্ষণেই সে তার পরবর্তী প্রশ্নে চলে গেল, তা হল মিতুন মুখার্জি বলল কেন, বিয়ের পরেও ঐন্দ্রিলা আপনার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করত। আপনি নাকি যেতেন তার বাড়ি—

—মিথ্যে কথা, রৌণক এতক্ষণ নিচু খাদে কথা বলছিল হঠাৎ নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না, মিতুন মুখার্জি ইজ আ ড্যাম লায়ার। আপনাকে সমস্ত বাজেবাজে কথা বলেছে। আমি কখনওই ঐন্দ্রিলার বাড়িতে যাইনি। ও-ই কখন-সখনও ফোন করতে আমাকে।

—কেন, ফোন করতে কেন? গার্গী রৌণকের অভিব্যক্তি জরিপ করছিল প্রখর দৃষ্টিতে।

—সে অনেক ব্যাপার। কে একজন লোক নাকি প্রায়ই বিরক্ত করত তাকে। কিছুতেই তার হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছে না।

গার্গী হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আপনি জানেন কে বিরক্ত করত তাকে?

—তা কখনও বলেনি। কিন্তু প্রায়ই বলত, কী করি বলো তো রুনুদা। সময় নেই অসময় নেই, সায়ন বাড়ি না থাকলেই দরজায় এসে ঘা দেবে।

—কিন্তু লোকটা কে, তা বলেনি?

রৌণক কিছু জবাব দেবার আগেই হঠাৎ ওদিকের ঘর থেকে সামান্য বিব্রত অথচ হাসি হাসি মুখ করে বেরিয়ে এল ঋতুবৃতা। গাঢ় ম্যাজেন্টা রঙের একটি শিফন শাড়িতে ওতপ্রোত হয়ে এসে বলল, স্যরি মিসেস চৌধুরী, মিঃ মুখার্জি আমাকে একবারও জানায়নি যে আপনি সঙ্গে আসবেন।

গার্গী হাসল, মুহূর্তে ঠিক করে নিল, ঋতবৃতাকে আরও কিছুক্ষণ পর্দার আড়ালে রাখা দরকার। বলল, স্যরি হওয়ার কিছু নেই। কারণ আমার এখানে আসাটা একেবারেই আকস্মিক। তবে বেশিক্ষণ বসতে পারব না, তার আগে এক কাপ চা খাওয়াবেন।

—অবশ্যই , ঋতবৃতা মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অবাকও হল কিছুটা, কারণ অতিথি নিজেই উদ্যোগী হয়ে চা খেতে চাইছেন।

রৌণককেও তৎপর হয়ে উঠতে হল, শুধু চা নয় কিন্তু সেমিনার হল থেকে সোজা এসেছেন উনি—

ঋতবৃতা আর বসে গল্প করার সময় পেল না। চা এবং টায়ের আয়োজন করতে ছুটতে হল কিচেন। তাতে গার্গী নিশ্চিন্ত হল। অন্তত মিনিট পনেরো কুড়ির আগে এ চত্বরে ঋতবৃতাকে আর আসতে হচ্ছে না। বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে সেজেগুজে বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে ঋতবৃতাকে । গার্গী বারবার ঐন্দ্রিলার পাশে রাখছিল রৌণকের প্রাক্তন প্রেমিকা ওরফে আপাতত স্ত্রীকে। ঐন্দ্রিলা যদি শান্ত টলটলে দিঘি হয় তো ঋতবৃতা ফাল্গুনের এক ঝলক মিষ্টি হাওয়া।

ঋতবৃতা কিচেনে অদৃশ্য হতেই গার্গী আবার পড়ল রৌণককে নিয়ে, কিন্তু লোকটি কেন বিরক্ত করত ঐন্দ্রিলাকে, তা ও কখনও আপনাকে বলেনি?

রৌণক ঘাড় নাড়ল, না। শুধু বলত, একদিন এসো না, রুনুদা। এলে তোমাকে সব বলব।

pathagar.net

—এতবার আপনাকে যেতে বলেছে, তবু কোনও দিন আপনি তার কাছে যাননি।

রৌণক বিব্রত হল, না, আমি ঐন্দ্রিলাকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলাম। সে এখন বিবাহিতা। পাশে আমি গেলে তার সাংসারিক জীবনে কোনও অসুবিধা দেখা দেয়, তাই ই—

গার্গী তাকাল রৌণকের মুখের দিকে, ঐন্দ্রিলা কিন্তু আপনাকে শুধু শ্রদ্ধাই করত তা নয়, সে আপনাকে ভালও বাসত। বলুন, বাসত কি না?

শেষ কথাটায় বেশ জোর দিল গার্গী। তাতে রৌণক সামান্য ইতস্তত করে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ বাসত।

—তবু আপনি তার ডাকে সাড়া দেননি কখনও?

রৌণক এবার দুদিকে মাথা নাড়ল, না।

গার্গী এতক্ষণে একটু কড়া গলায় বলল, এতক্ষণ মিতুন মুখার্জিকে ড্যাম লায়ার বলেছিলেন, কিন্তু আপনিও মিথ্যে বলেছেন, মিঃ মুখার্জি। আমি জানি আপনি তার কাছে একদিন দুপুরবেলা গিয়েছিলেন।

রৌণক একমুহূর্তে থমকে গেল, পরক্ষণে বলল, সেটা আপনি কী করে জানলেন?

—মিতুন মুখার্জিই আমাকে বলেছে। আপনি হয়তো জানেন না, মিতুন ঐন্দ্রিলার একটি ডায়েরি খুঁজে পেয়েছে, তাতে আপনার বিষয়ে অনেক কথাই লেখা আছে।

রৌণকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কী লেখা আছে?

—লেখা আছে, আপনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

রৌণক ভয়ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে রইল গার্গীর মুখের দিকে। এবার যেন প্রতিবাদ করার আর সাহস নেই তার।

—তা হলে ঘটনাটা আর একবার মনে করিয়ে দিই, মিঃ মুখার্জি। তখন ঐন্দ্রিলার বিয়ে হয়ে গেছে প্রায় এক বছর। সে সময় একদিন সকাল থেকে মেঘ করে আছে গোটা আকাশ।

যেরকম মেঘলা হয়ে থাকলে মন খারাপ লাগে মানুষের। ঠিক দুপুরের দিকে হঠাৎ ঝির ঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। একনাগাড়ে ঘ্যানঘেনে বৃষ্টি, যেরকম বৃষ্টি হলে আর থামতে চায় না। বহুক্ষণ বৃষ্টি হয়ে চলেছে, সে সময় আপনার অফিসে, একটা ফোন এল হঠাৎ। বাড়িতে একা হয়ে গেলে আপনাকে এরকমই প্রায়ই ফোন করত ঐন্দ্রিলা। আপনার সঙ্গে ফোনে দু'দণ্ড কথা বলতে পারলে কী যে খুশি হয়ে উঠত ও। সেদিন ফোন করে বলল, খুব ভয় করছে রুনুদা, সেই লোকটা একটু আগে এসে একবার দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেছে। বলেছে, আবার আসবে। আগেও এরকম দু'চারবার আপনাকে ডেকেছে ঐন্দ্রিলা, কিন্তু আপনি কখন যাননি। সেদিন ঝিরঝির বৃষ্টির দিনে আপনি কিন্তু আর এড়াতে পারেননি তার ডাক। তা ছাড়া তার কণ্ঠস্বর হয়তো কিছুটা ভয়ের রেশ ছিল যা শুনে আপনি স্থির থাকতে পারেননি? ব্লু ওয়াণ্ডারে তার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি শুনেছিলেন , সায়ন কোথাও ট্যুরে গিয়েছে দুদিনের জন্য। দুদিনে লোকটা বারবার বিরক্ত করেছে ঐন্দ্রিলাকে। যাই হোক, আপনাকে কাছে পেয়ে সেদিন দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা। বলেছিল, কী রুনুদা ঋতুকে পেয়ে আপনি একবারেই ভুলে গেলেন আমাকে! আমি যে এত বছর আপনাকে ভালবাসলাম তার কোনও মর্যাদাই আমি পাব না। আপনি তখন চুপ করে ছিলেন। কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। একই সঙ্গে দুজন নারীকে ভালবাসা যায় কি না তাইই ভাবছিলেন হয়তো। কিন্তু সেই একলা নিঃসঙ্গ ঘরে হঠাৎ আপনাকে পেয়ে পাগল হয়ে উঠেছিল ঐন্দ্রিলা। এক নিরিবিলি মুহূর্তে সহসা তুমুল হয়ে আপনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, মুখ তুলে আপনার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, অন্তত

একবার তুমি আমার হও, রুনুদা , অন্তত আজ, এই মুহূর্তে। আর কখনও তোমার কাছে কিছু চাইব না। আপনি কিন্তু আর সংযম রোধ করতে পারেননি। সেদিন বৃষ্টির দুপুরে আপনি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। কয়েকটি নির্জন মুহূর্তে কেবল ঐন্দ্রিলারই হয়েছিলেন আপনি। আপনি ফিরে যাওয়ার পর ঐন্দ্রিলা তার ডায়েরিতে লিখেছিল, 'এক বছর বিয়ের পরও কোন নারী যে কুমারী থাকতে পারে তা আজই প্রথম জানলাম। আষাঢ়ের এই তৃতীয় দিবসটিই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। এরকম দুরন্ত দুপুর হয়তো জীবনে আর কোনও দিনই আসবে না।'

থেমে থেমে, একটু একটু করে প্রায় ফিসফিস করে গোটা ঘটনাটাই বলে গেল গার্গী। শুনতে শুনতে ক্রমশ নিজের ভেতর গুটিয়ে যাচ্ছিল রৌণক। থরথর করে কাঁপছিল তার গোটা শরীর। প্রতিবাদ তো নয়ই, একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বেরুল না। গার্গী তার মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, এরকম কি মাঝেমাঝেই তার কাছে যেতেন, মিঃ মুখার্জি?

রৌণক প্রায় ভেঙে পড়ল, বিশ্বাস করুন, এরপর আর কোনও দিনই যাইনি।

ওদিকে কিচেন থেকে তখন কড়াইতে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ ভেসে আসছে। যেন রৌণকই ভাজা- ভাজা হচ্ছে গার্গীর চোখে আগুনে। ঋতবৃতা নিশ্চই মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনায় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে আছে খুবই । হয়তো একটু পরেই লোভনীয় খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আর্বিভূত হবে মঞ্চে, তার আগেই গার্গী সর্তক দৃষ্টিতে হামলে পড়ল তার সামনে বসা শিকারের উপর, অন্তত আরও একদিন আপনি তার কাছে গিয়েছিলেন, মিঃ মুখার্জি, এ বছর পাঁচই এপ্রিল সন্ধের পর। আর সে রাতেই খুন ঐন্দ্রিলা।

রৌণক ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল বিশ্বাস করুন, সেদিন ঐন্দ্রিলার কাছে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমি তাকে খুন করিনি।

—বলুন তো, ঠিক কটার সময় আপনি গিয়েছিলেন ওদের বাড়িতে।

গলা শুকিয়ে আসছে রৌণকের, বুকের ভেতর হাতুড়ির শব্দ, তার মধ্যে ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, রাত আটটার একটু পরেই। দুপুরের দিকে ফোন করে বলেছিল, মিঃ চৌধুরীর ফেরার কথা ছিল আজ সকালে , এখনও ফেরেনি। ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছে রুনুদা। তা ছাড়া সেই লোকটা আবার আসবে রাতের দিকে তুমি থাকলে একটু সাহস হয়।

গার্গীর চোখ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠেছে, তারপর?

রৌণক মাথা নাড়ল, ব্লু ওয়াণ্ডারের সামনে পৌঁছে গেট খুলে ভেতর ঢুকতে যাব, হঠাৎ দেখলাম ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটের সিঁড়ি বেয়ে আর একজন লোক উঠে যাচ্ছে দ্রুত।

গার্গীর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তারপর?

—আমি থমকে দাঁড়ালাম গেটের কাছে। মনে হল সায়ন চৌধুরীই ফিরে এসেছেন ট্যুর থেকে। এসময় আমার পক্ষে ভেতরে যাওয়াটা একেবারে বিস্ফোরণের মতো হবে।

—সায়ন চৌধুরী! এবার গার্গী কাঁপতে লাগল প্রবলভাবে, কী বলছেন, কী , মিঃ মুখার্জি?

—গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম, লোকটি সটান উঠে গিয়ে ঐন্দ্রিলাদের ফ্ল্যাটের বেল বাজল। একবার, দুবার, তিনবার। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে বেল বাজাতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল লোকটি। বেশ কয়েকবার বাজাবার পর ঐন্দ্রিলা এসে দরজা খুলে দিল।

—তারপর? গার্গীর বুক এতক্ষণে হাপরের মতো ওঠানামা করেছে। সে যেন শ্বাস নিতেই পারছে না আর।

—ঐন্দ্রিলা প্রথমে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ ঝগড়া করল। লোকটা অনুনয়-বিনয় করছিল বারবার। ভেতর ঢুকতে চাইছিল, কিন্তু ঐন্দ্রিলা বলেছিল চলে যেতে।

pathagar.net

লোকটা চলে গেল?

—না একটু পরেই ঐন্দ্রিলা তাকে পথ ছেড়ে দিল। লোকটা ভেতরে যেতেই ঐন্দ্রিলা ভেজিয়ে দিল দরজা।

গার্গী এবার তীব্র শব্দে আছড়ে পড়ল রৌণকের উপর, আপনি ঠিক দেখেছেন, সে সায়ন চৌধুরী।

রৌণক গার্গীর দিকে তাকাল, সায়ন চৌধুরীকে আমি কখনও চাক্ষুষ দেখিনি। যেদিন প্রথম ঐন্দ্রিলার কাছে গিয়েছিলাম, ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা সায়ন-ঐন্দ্রিলার একটি ফোটোতে তাকে যেটুকু চিনেছি। কিন্তু সায়নের মুখে তো দাড়ি নেই। ঐন্দ্রিলা সেদিন দরজা খোলার পর ঘরের আলোয় যেটুকু সামান্য দেখতে পেয়েছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, লোকটির মুখময় দাড়ির জঙ্গল।

এতক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ করে রৌণকের কথা শুনছিল, গার্গী, হঠাৎ যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, দাড়ি ছিল, আপনি ঠিক দেখেছেন?

রৌণক ঘাড় নাড়ল হ্যাঁ ছিল।

গার্গী হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ল রৌণকের দিকে দাড়ির রং আপনার মনে আছে। ধূসর না সোনালি?

রৌণক একটু হকচকিয়ে গেল, চোখ বুজে মনে করার চেষ্টা করল কিছুক্ষণ তারপর হতাশ হয়ে বলল, অত দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারিনি। তা ছাড়া বাইরেটা এত অন্ধকার ছিল—

গার্গী সমস্ত ব্যাপারটা নিজের মনে ভাবল কিছুক্ষণ, একটু পরে বলল, লোকটা আর বেরোয়নি ঘর থেকে?

—আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। ঐন্দ্রিলা দরজাটা পুরো ভেজায়ওনি।

—তা আপনি ঢুকে পড়লেন না কেন ভেতরে? লোকটা কী কারণে এসেছে জানতে ইচ্ছে হল না?

—না, তার কারণ আমার একবার মনে হয়েছিল, লোকটা যদি সায়ন চৌধুরী হন। তিনি নিশ্চয় আমার উপস্থিতি পছন্দ করবেন না। তা ছাড়া যদি কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হত তা হলে ঐন্দ্রিলা কেনই বা তাকে ঘরে ঢুকতে দিল। কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ভাবলাম, এভাবে গেটের কাছে অন্ধকার দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক নয়। আমি চলে এলাম পরক্ষণেই। কিন্তু তখন যদি জানতাম, ঐন্দ্রিলা খুন হবে সে রাতে—

গার্গী আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর সময় দিল না ঋতুবৃতা। প্লেটভর্তি খাবার আর গরম চায়ের কাপ নিয়ে ঢুকল ফুরফুর করে, বলল , স্যরি, খুব দেরি করে ফেললাম কিন্তু নিশ্চই খুব খিদে পেয়েছে আপনার—

একবিন্দু খিদে তো নেইই গার্গীর, বরং তার ভেতরে এক মহাপ্রলয় বয়ে চলেছে তখন। কে ঢুকেছিল সে রাতে ঐন্দ্রিলার ঘরে! সে কি রবার্ট না হিমন! দাড়ির রং সোনালি, না ধূসর তা বলতে পারলেন না রৌণক। নাকি কালোই! ঐন্দ্রিলার চেনা অন্য কারও কি ও বাড়িতে সে রাতে আসা সম্ভব?

এমন নানা ভাবনার চক্কর খেতে খেতে গার্গী হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হল ঋতবৃতার কথা শুনে, প্লেটটা যা সাজিয়েছেন, তা দেখেই কিন্তু খিদে আরও বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে মাঝেমাঝেই আপনার বাড়িতে গেস্ট হতে হবে।

এইটুকু প্রশংসাতেই দারুণ খুশি হল ঋতবৃতা। এখনও মুখে না দিয়েই সাটিফিকেট দিয়ে দিলেন।

pathagar.net

কাঁটাচামচ দিয়ে অত বড় ভেজিটেবিল কাটলেটটি ভাঙতে ভাঙতে গার্গী বলল, কিন্তু কিছু আহার্য আছে যা মুখে না দিয়েও বলে দেওয়া যায়, সুস্বাদু কি না। বলতে বলতে কাটলেটের খণ্ডটি মুখে ফেলে দ্বিতীয়বার প্রশংসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে তার নজরে পড়ল, ঋতবৃতা তার ম্যাজেন্টা রঙের শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে কপালের টিপ, ঠোঁটের লিপস্টিক, এমনকি কানের দুলের পাথরটি পর্যন্ত ম্যাচ করিয়েছে। পাথরের রংটি যেন ডালিমের কোয়াই এক একটি। দেখতে দেখতে কেন যেন সহসা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, আপনার কানের দুলটি তো বেশ। কী দারুণ ম্যাচ করেছে শাড়ি-ব্লাউজের সঙ্গে।

খুব খুশি হল ঋতবৃতা। বলল, পছন্দটা কিন্তু আমার নয়, ওর। কবিতা লিখতে তো তাই রঙের ব্যাপারটা বেশ ভালই মিলিয়ে কিনে দেয় সবকিছু।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আরও অনেক রঙের দুল আছে নাকি এরকম ম্যাচ করে পরার জন্য।

ঋতবৃতা ডগোমগো হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আরও দুটো রঙের আছে। একটা সমুদ্র নীল, অন্যটা হালকা ফিরোজা—

—ইস্ আর বেগুনি নেই? বেগুনি রং আমার ভীষণ পছন্দ, গার্গী হঠাৎ বলে ফেলল। ঋতবৃতা আশ্চর্য হল, তাই?

—হ্যাঁ, আমার এক জোড়া বেগুনি পাথর সেট করা দুল ছিল। জানেন, তার একটা পাথর হঠাৎ কোথায় যে ছিটকে পড়ে গেল। আর খুঁজে পাচ্ছি না। অম্লাবদনে মিথ্যেটা বলল গার্গী।

ঋতবৃতার ভারী কষ্ট হল শুনে, বলল তা হলে কোনও স্যাকরার দোকান থেকে সেট করে নিন না—

গার্গী আবার বলল, কত খুঁজেছি । কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না।

ঋতবৃতার হঠাৎ রৌণকের দিকে তাকাল তোমাদের ওই রায়সাহেবের তো পাথর নিয়ে কারবার। পাথর নিয়ে গবেষণা টবেষণা করছেন। দ্যাখো না, যদি ওঁর কাছে পাওয়া যায়।

বেগুনি পাথরও খুঁজছিলেন একবার।

রৌণক তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়ল, রায়সাহেব তো গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। সে পাথর আর এ পাথর তো এক নয়।

গার্গী উৎসুক হল, কোন রায়সাহেব?

রৌণক হাসল, ওই যে আমাদের এক্স প্রোডাকশন্ ম্যানেজার। বেচারির এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। চাকরি হারিয়ে এখন আরও বেশি করে গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে পড়েছেন। সেদিন আমাদের বাড়ি এসে বোঝাচ্ছিলেন কোন পাথরের কী উপকার। ওঁর রাহু শুনি সবই নাকি এক বছর ধরে বক্রী।

গার্গী গম্ভীর হল, তাই নাকি? বেচারা!

ঋতবৃতা খিল খিল করে হেসে উঠল প্রায় কিশোরীর মতো। বলল, জানেন, সেদিন রায় সাহেব চলে যেতেই মিঃ মুখার্জি বললেন, দাঁড়াও ঋতু একটা কবিতা লিখে ফেলি, রাহুল রায়ের রাহু' নাম দিয়ে। অনেক দিন পরে একটা আইডিয়া এসেছে—

গার্গীর ঠোঁটে একটুকরো চোরাহাসি ঢেউ খেলে গেল, বলল, তা পাথরে কোনও কাজ হচ্ছে?

রৌণক জবাব দিল নাহ, এতদিন আমাদের চেয়ারম্যান ওঁকে বলতেন ধুর মশাই, প্যারাডাইসের চেয়ারম্যান এত এত গবেষণা করে কী দারুণ সব প্রোডাক্ট তৈরি করছে, আর আপনি একটা ফর্মুলা তৈরি করতে পারলেন না? তারপর চাকরি যেতে এখন নিজেই একটা

ফ্যাক্টরি তৈরি করবেন বলে এগিয়েছিলেন, কিন্তু সেই একই সমস্যা তো রয়েই গেছে, ভাল প্রোডাক্ট না হলে কোম্পানি চালাবেন কী করে, তাতে ওঁর বান্ধবীও এখন নাকি দুবেলা ঠুসছেন ওঁকে, বলেছেন, ধুস, তোমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

—বান্ধবী! গার্গী অবাক হলো।

ঋতবৃতা হেসে গড়িয়ে পড়ল, এবার, বুঝলেন, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। এই বয়সে আবার নতুন করে—

বলতে বলতে ঋতবৃতার হাসির দমক এমনই যে কথা শেষ করতেই পারল না। বাধ্য হয়ে তার কথার শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে এল রৌণক, আসলে কী জানেন, ভদ্রলোক চল্লিশ বছরের কাছাকাছি পৌঁছে আবার নতুন করে প্রেমে পড়েছেন। তার পর থেকে একটা থিয়োরি বলে বেড়াচ্ছেন, প্রেম করলে নাকি শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে। একদিন আমাকেও বললেন, জানেন, সব মানুষেরই উচিত, চল্লিশ পৌঁছে আর একবার প্রেমে পড়া। তাতে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয়, শরীরের জোর বাড়ে, মনের জোর বাড়ে, আয়ুও নাকি বেড়ে যায়। বলতে বলতে রৌণকও হেসে উঠল হঠাৎ।

গার্গী সামান্য হেসে বলল, সাহেবদের দেশে নাকি একটা কথা প্রচলিত আছে। লাইফ স্টার্টস অ্যাট ফর্টি। বোধহয় তাইই—

গার্গীর প্লেট ততক্ষণে নিঃশেষ। চায়ে চুমুক দিতে শুরু করেছিল, হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠে বলল, এ হে, এত রাত হয়ে গেল নাকি? আমাকে কিন্তু এখনই উঠতে হবে। যা যত্ন করলেন দুজনে মিলে, পরে একদিন আবার হুট করে চলে আসবে—

সেদিন একরাশ চিন্তার মোড়কে ঢুকে ব্লু ওয়াণ্ডারে ফিরে এল গার্গী। সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাচ্ছে, হঠাৎ দেখল, ও পাশের ফ্ল্যাট থেকে নেমে আসছে হিমন! গার্গী বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল, হিমন কখন ফিরে এল তার অন্তর্ধান থেকে।

গার্গীকে দেখে যথারীতি পায়ে পায়ে পিছু হাঁটছিল হিমন। কিন্তু গার্গী আজ ছাড়ল না তাকে, হঠাৎ তার দিকে ধাওয়া করল। একেবারে উপরের ধাপে পৌঁছেই সপাটে, একখানা থাপ্পড় কষাল হিমনের গালে, আর আশ্চর্য অত বড় শরীরটা গার্গীর একঘায়েই আছড়ে পড়ল দরজার গায়ে। সে সামলে ওঠার আগেই গার্গী বাঘিনির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। কলার চেপে ধরে বলল, যা জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক ঠিক জবাব দও। একটু এদিক ওদিক হলেই—

হিমন জড়ানো গলায় হড়হড় করে উত্তর দিতে লাগল তার এক লক্ষ প্রশ্নের।

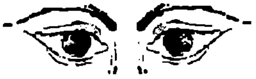

ঐন্দ্রিলার ডায়েরিটি পড়তে গিয়ে খুবই দ্ব্যর্থবোধক মনে হয়েছিল গার্গীর। পরে নিখুঁত বিশ্লেষণের পর অনুধাবন করেছিল, আসলে দুজন পুরুষের কথা লেখা আছে ডায়েরির পৃষ্ঠায় তাদের কেউই অবশ্য সায়ন নয়। দুজনের একজনকে ঐন্দ্রিলা চেয়েছিল মনে প্রাণে, আর অপর জন প্রবলভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিল ঐন্দ্রিলাকে। ঐন্দ্রিলা লিখেছে, 'কাল সন্ধের পর আবার এসেছিল ও, খুব করে চাইছিল, আমি কিন্তু আজও ফিরিয়ে দিয়েছি।' অথবা 'ও যে বারবার আসে, চায়, আমার খুব বিশ্রী লাগে।' কিংবা আমি ওকে কতবার ফেরাতে পারি। একজন পুরুষমানুষ, এভাবে কাকুতিমিনতি করে, দেখলে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি জানি এটা ভাল নয়।'

বারবার, অনেকবার পড়েও উদ্ধার করতে পারেনি, গার্গী এই পুরুষটি আসলে কে । সে

কি রবার্ট ও'নীল, , না কি হিমন অথবা অন্য কেউ ! প্রথম পুরুষটি যদি রৌণক মুখার্জি হয়, তাহলে দ্বিতীয় পুরুষটি কোনজন? কেনই বা তাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল ঐন্দ্রিলা।

কাল সন্ধের পর দুর্দান্ত সাহসে ভর করে হিমনকে প্রায় গিলোটিনের নিচে দাঁড় করিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ছুড়ে জানতে চেয়েছিল, ঐন্দ্রিলার এই অপর পুরষটি সে-ই কি না। হিমন বিভ্রান্তের মতো ঘাড় নেড়েছে। সে মাঝে মধ্যে ঐন্দ্রিলার কাছে গিয়ে থাকলেও তার সঙ্গে এমন কোনও অবৈধ সম্পর্ক ছিল না।

আরও অনেক কথাই হিমনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে গার্গী, তার মা চন্দ্রাবতী কিংবা রবার্ট ও নীল সম্পর্কে অনেক তথ্য, অথবা দীয়া তার সঙ্গে কেনই বা থাকে না, সে কেন 'দি আইডিয়াল নেস্ট এ প্রায়ই যেত সন্ধের পর, হঠাৎ দীয়াকে ছেড়ে কেন মিস লিজার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তার এমন হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে যেমন জেরবার হয়ে গিয়েছিল হিমন, তেমনই সন্ত্রস্ত।

আর সেই মুহূর্তে গার্গীর মনে হয়েছিল, তাহলে ঠিকই বলেছিল দীয়া, এহেন পুরুষের সঙ্গে বেশিদিন ঘর করা যায় না।

আজ অফিসের চেম্বারে বসে খুবই একটা জরুরি ফাইল খুলে যতবার গার্গী মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করছিল, ততবারই হিমনের কথাগুলি তোলপাড় করছিল তার ভেতর। মনে হচ্ছিল, একটি অগ্নিস্তুপের ভেতর সে বাস করছে এতদিন, শুধু পুড়ে ভস্ম হয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা।

ভাবতে ভাবতে ফাইলে দু-লাইন লিখেছে কি লেখেনি, হঠাৎ তার চেম্বারের সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল সায়ন, এম ডি সাহেবা খুব ব্যস্ত আছেন মনে হচ্ছে।

সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল গার্গী, চেয়ারম্যান চেম্বারে ঢুকলে যেরকম দাঁড়াতে হয়, হেসে বলল, আপনি ডেকে পাঠাতে পারতেন স্যর। কষ্ট করে আমার চেম্বারে আসার দরকার হত না।

টেবিলের ওপাশে একগুচ্ছ চেয়ারের একখানা টেনে নিয়ে বসতে বসতে সায়ন বলল, খুব ভাল খবর আছে, গার্গী। জেসমিন ফ্লেভার হু হু করে মার্কেট ধরে নিয়েছে। যে ডিস্ট্রিবিউটারের কাছেই যাই, সর্বত্র জুঁইফুলের গন্ধ। এরপর মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশন শুরু হলেই দেখবে, প্যারাডাইস কোথায় উঠে গিয়েছে।

হাসি ছড়িয়ে পড়ল গার্গীর মুখে, সেজন্যেই চেয়ারম্যান সাহেবকে আজ এত রিল্যাক্সড্ মনে হচ্ছে।

—মোটেই রিল্যাক্স্‌ড নই গার্গী, ভুবনেশ্বরের টিকিট কাটা রয়েছে আজ রাতের ট্রেনে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। ভাবছি, টিকিটটা ক্যানসেল করে দিই।

গার্গী অবাক হয়ে বলল, কেন?

—ফ্ল্যাটে তোমাকে একলা রেখে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। এতসব বিপদ যখন আসছে চারদিকে থেকে—

—উঁহু। গার্গী আশ্বস্ত করে সায়নকে, তুমি নিশ্চিন্তমনে ঘুরে এসো, গার্গী চৌধুরী মোটেই অবলা নারী নয়। সে ক্যারাটে জানে। জুজুৎসুর দু-চারটে প্যাঁচও শিখেছিল কলেজে পড়াকালীন। অতএব চট করে কাবু হয়ে যাওয়ার পাত্রী সে নয়।

খুবই নির্লিপ্তির সঙ্গে গার্গী কথাগুলো সায়নকে শোনালেও আজ সকাল থেকে একটা প্রবল টেনশন তার ভেতর চারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বেশ কয়েকদিন আগে ভুবনেশ্বর যাওয়ার টিকিট কেটেছিল সায়ন, অতএব তার যাওয়ার একটা প্রস্তুতি ছিলই কদিন ধরে, কিন্তু সেই যাত্রার

mybanglapdf.net

দিনক্ষণ যে এত দ্রুত পৌঁছে যাবে, যেন এখন আর বিশ্বাসই হচ্ছে না। তবু তার উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, চাপা ভয় সে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতে চাইল সায়নের কাছে।

—হুঁ আর একটা খবর আছে, কৌশিক দত্ত লাইম ইন্ডিয়ায় জয়েন করেছে তো বোধহয় জানো। আজ মধুমন্তীও আমাকে জানিয়েছে সেও ওখানে যাচ্ছে।

—তাই! খবরটা প্রায় জানাই ছিল গার্গীর , তবু যেন আশ্চর্য হল। কিছু না বলে সে অপেক্ষা করল সায়নের পরবর্তী সংলাপের জন্য।

—রাহুল রায় আমাকে কাল ফোন করেছিল, সে একবার দেখা দেখাতে চায়।

—তাই! গার্গী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সায়নের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে করে বলল, এলে সোজা আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিয়ো।

—কালীজীবনবাবুই খুবই ধরেছেন যাতে ওকে আমাদের কোম্পানিতে নিয়ে নেওয়া হয়। গার্গী গম্ভীরস্বরে বলল, আগে তো তার সঙ্গে কথা বলি, তারপর ভেবে দেখব নেওয়া যায় কি না।

সায়ন তার চেম্বার থেকে উঠে যাওয়ার প্রায় ঘন্টাখানেক পর রাহুল রায়ের স্লিপ পেল গার্গী। ভেতরে ডেকে পাঠাতেই যিনি প্রবেশ করলেন, সেই মাঝারি উচ্চতার শ্যামবর্ণ লোকটিকে এ কদিনে প্রায় চেনাই হয়ে গেছে তার। রাহুল রায় হাসি-হাসি মুখে চেয়ারে বসেই বললেন, চেয়ারম্যান সাহেবের ঘরে গিয়েছিলাম। উনি বললেন, এম. ডি-ই আপনার ইন্টারভিউ নেবেন।

—ইন্টারভিউ! গার্গী হাসল, লাইম ইণ্ডিয়ার এতদিনের অভিজ্ঞতা আপনার। আপনাকে আর কী ইন্টারভিউ নেব? আসলে কদিন ধরে আপনার সম্পর্কে এত শুনেছি। ভাবলাম মানুষটার সঙ্গে একবার আলাপ করা যাক। এমনকি মিঃ চৌধুরীও কদিন ধরে আপনার প্রশংসা করে চলেছেন।

—তাই? রাহুল রায় একটু শব্দ করে হাসলেন, ইটস ভেরি গুড অব হিম। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অতখানি প্রশংসার যোগ্য আমি নই। যাই হোক, কিন্তু কী শুনেছেন আমার সম্পর্কে।

—শুনেছি, ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারদের সঙ্গে আপনার খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল, তাদের উপর আপনার যথেষ্ট হোল্ড, অফিসার হিসেবে আপনি যথেষ্ঠ নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী, এমনকি সেদিন মিঃ চৌধুরী প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে ঘেরাও হয়ে থাকার সময় আপনি নাকি ভাল বক্তৃতাটক্তৃতা করে ক্ষিপ্ত মব্‌কে কন্ট্রোল করে ফেলেছিলেন—

—থাক-থাক্ রাহুল রায় লজ্জিত হয়ে পড়লেন যেন আপনি আমার সম্পর্কে এত সার্টিফিকেট দিয়ে ফেললেন যে অস্বস্তি হচ্ছে শুনতে।

গার্গী হেসে বলল, বড় মানুষের স্বভাবই এই যে, তাঁর নিজের প্রশংসা শুনতে পছন্দ করেন না। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, লাইম ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান কেন আপনাকে পছন্দ করলেন না।

—সেটা আমার ব্যাড্‌লাক, ম্যাডাম। আমার তৈরি প্রোডাক্ট কোনও দিনই খুশি করতে পারেনি ওঁকে। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম ওখানে আর চাকরি করা যাবে না।

—তাহ-ই বুঝি নতুন একটা ফ্যাক্টরি খুলতে চাইছিলেন মিঃ রায়?

রাহুল রায় সামান্য চমকে উঠে বলল, আপনি কী করে জানলেন?

গার্গী হেসে বলল, জেনেছি। জায়গাটা কিন্তু ভালই বেছেছেন। ইস্টার্ন বাই পাসের ওদিকটায় দারুণ ফ্যাক্টরি হবে। তা কত পড়ল জমিটা কিনতে?

রাহুল রায় বেশ আশ্চর্যই হলেন, এতসব খবর কী করে জানলেন, ম্যাডাম?

pathagar.net

—জানতে হয়, মিঃ রায়। এত বড একটা সাবানের ফ্যাক্টরি তৈরি হতে চলেছে, তার খবর বাতাসে অমনি ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া প্যারাডাই্সের প্রতিদ্বন্দ্বী একটা কনসার্নের খবর তো প্যারাডাইসের এম. ডি. র কানে পৌঁছাবেই।

রাহুল রায় অবাক হয়ে বললেন, প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন! কী বলেছেন আপনি ম্যাডাম? প্যারাডাইস এখন কত উঁচুতে পৌঁছে গেছে। লাইম ইণ্ডিয়ার মতো পুরানো কনসার্নও তার দাপটে খাবি খাচ্ছে এখন। তার পাশে এই নতুন কোম্পানির কোনও তুলনাই হয় না। তা ছাড়া ফ্যাক্টরি আর হল না শেষ পর্যন্ত।

আশ্চর্য হয়ে গার্গী বলল কেন?

—সে কাহিনী আর নাই বা শুনলেন, ম্যাডাম।

—সে কী! এতদূর এগিয়ে এখন বলছেন, ফ্যাক্টরি হবে না? লাইসেন্সও নাকি পেয়ে গেছেন?

—আসলে কি জানেন, ম্যাডাম সায়ন চৌধুরি যে সব প্রোডাক্ট ম্যানুফেকচার করেছেন, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পেরে উঠব না বুঝতে পেরেই আইডিয়াটা শেষ পর্যন্ত ড্রপ করে দিচ্ছি। বরং প্যারাডাইসের সায়ন চৌধুরীর কাছে কাজ করাই সবচেয়ে নিরাপদ।

—জমিটা কত পড়ল কিনতে?

কিছুটা ইতস্তত করে রাহুল রায় বললেন, তার প্রায় আট লাখের মতো।

আট লাখ!

গার্গী বিস্মিত হল, তার সঙ্গে ওদিক করে আরও অন্তত লাখদুয়েক খরচ হয়েছে নিশ্চই? এত টাকা ইনভেস্ট করার পর এখন পিছিয়ে আসতে চাইছেন?

রাহুল রায় ম্লান হাসলেন কিছু করার নেই, ম্যাডাম। জমিটা বরং বিক্রি করে দেওয়া যাবে। কিন্তু এরপর আরও কয়েক লাখ খরচ করে একটা লুজিং কনসার্ন ফেঁদে বসে মার খাওয়ার কোনও মানে হয় না।

গার্গী কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রাহুল রায়ের দিকে, তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, আপনি নাকি খুবই গ্রহ নক্ষত্রে বিশ্বাস করেন, মিঃ রায়?

রাহুল রায় অবাক হলেন, এসব খবর আবার কোত্থেকে জোগাড় করলেন, ম্যাডাম? নিশ্চয় রৌণক মুখার্জি বলেছে?

গার্গী হাসল, আপনি তো অনেকরকম পাথর ধারণ করেছেন দেখছি। একসময় এ ব্যাপারে আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল। কতরকম পাথর আছে, কার কী গুণ, কখন কোন গ্রহ বক্রী হলে কী পাথর ধারণ করতে হয়, খুব জানতে ইচ্ছে করে আমার।

রাহুল রায় খুব উৎসাহিত হলেন, আসলে পাথর নয় এগুলো, রত্ন। নবরত্ন সম্পর্কে একটা শ্লোক, আছে—

মণিমাণিক্য বৈদুর্য গোমেদা বজ্রবিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগবে মরকতং নীলশ্চেতি যথাক্রম।

গার্গী সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, এতসব শক্ত শক্ত শ্লোক বললে আমার সমস্ত গুলিয়ে যাবে। আমি বরং দেখছি আপনার আঙুলে কোনওটা লাল, কোনওটা নীল, কোনওটা বিড়ালের চোখের মতো রং কোনওটা—

গার্গীর অজ্ঞতায় খুবই কৌতুক অনুভব করলেন রাহুল রায়। বৈদুর্য গোমেদ, প্রবাল ইত্যাদি রত্নের রং, গুণাগুণ বোঝাতে শুরু করতেই গার্গী হঠাৎ বলল, কত রঙের কথাই তো বললেন, বেগুনিরঙের রত্ন হয় না?

pathagar.net

রাহুল ঘাড় নাড়লেন না।

—কিন্তু জানেন, আমার কাছে একটা বেগুনিরঙের রত্ন আছে। আমার খুব ইচ্ছে, ওটা দিয়ে একটি আংটি বানাব।

রাহুল রায় একটু গম্ভীর হলেন, ওটা বোধহয় রত্ন হয়, পাথর।

—তাই! গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তাহলে কদিন আগে আপনি একটা বেগুনিরঙের পাথর খুঁজছিলেন কেন?

রাহুল রায় সচকিত হলেন, কে বলল আপনাকে?

সেদিন রৌণক মুখার্জির বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানেই শুনলাম। ওঁরাই বলেছিলেন—

রাহুল রায় হেসে উঠলেন শব্দ করে, ওঁরা নিশ্চই ভুল করেছিলেন, আমি যা খুঁজছিলাম, তা হল একটা ভাল নীলা , বলে তার আঙুলে পরা গাঢ়নীল রঙের পাথরটা দেখিয়ে বললেন, এই দেখুন এটা নীলা। নীলা যদি কারও সহ্য হয়ে যায় তাহলে সে রাজা হয়ে যাবে, আর সহ্য না হলে ভিখারি। তার আচমকা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। হয় এসপার, নয় ওসপার।

গার্গী একটু হেসে বলল, তা আপনার সহ্য হল?

ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে খারাপও কিছু যখন এ পর্যন্ত হয়নি—, বলে রাহুল রায় হাসলেন, এখন আপনি যদি প্যারাডাইসে একটা কাজের সুযোগ করে দেন তাহলে নিশ্চয় ভাল সময় আসবে।

গার্গী আবার তাকাল রাহুল রায়ের চোখের দিকে, সামান্য গম্ভীর হয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে তো আলাপ হল। আজ রাতে মিঃ চৌধুরী ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন, দু-তিনদিন পরে ফিরবেন। উনি ফিরে এলেই আমরা একটা ডিসিশন নিয়ে নেব।

রাহুল রায় আশ্চর্য হয়ে বললেন মিঃ চৌধুরী ভুবনেশ্বর যাচ্ছেন নাকি? কাল তো অনেকক্ষণ টেলিফোনে কথা হল ওঁর সঙ্গে। কই, কিছু বললেন না তো—

—আসলে ওঁর যাওয়ার ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, ওঁর ভাই হিমন কয়েকদিন আগে নিরুদ্দেশ হয়। পুলিশ সন্দেহ করেছিল, হয়তো এর পেছনে সায়ন চৌধুরীর কোনও ভূমিকা আছে। পুলিশ ইনস্পেক্টর ফোন করে বলেছিলেন এখন মিঃ চৌধুরী যেন বাইরে না যান, বলে গার্গী থামল এক মুহূর্ত আপনি কি হিমনকে চেনেন? হিমন বা দীয়া, ওদের কাউকে?

রাহুল রায় ঘাড় নাড়লেন। না। তবে খবরের কাগজে ওঁদের নাম দেখেছি। তা, এখন কি পুলিশ পারমিশন দিল?

—হ্যাঁ। কাল রাতে হিমন ফিরে আসায়—

রাহুল রায় যেন চমকে উঠলেন, হিমন চৌধুরী ফিরে এসেছে নাকি?

গার্গী নিখুঁতভাবে লক্ষ ররল রাহুল রায়ের চমকানি, তারপর হঠাৎই জিজ্ঞাসা করে বলল, লোটন যেদিন খুন হয় তার পরদিন অত সকালে ভি আই পি রোডে কী করে পৌঁছে গেলেন, মিঃ রায়? আপনি তো থাকেন টালিগঞ্জের নেতাজিনগরে—

রাহুল রায় ঠিক এ ধরনের প্রশ্ন আশা করেননি যেন, থমকে গিয়ে বললেন, আসলে লোটনের বাড়ি মাঝেমধ্যে আমি যেতাম। লোটন খুন হয়েছে আগের রাতে তা জানতাম না। হঠাৎ গিয়ে শুনি এরকম একটা দুর্ঘটনা।

—তাই? লোটনের সঙ্গে তাহলে খুবই ইন্টিমেসি ছিল আপনার? না হলে লাইম ইণ্ডিয়ার চাকরি চলে যাওয়ার পরও লাইম ইন্ডিয়ার একজন কর্মচারীর বাড়িতে প্রায়ই যেতেন—

pathagar.net

রাহুল রায় খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, আসলে তখন তো আমি ফ্যাক্টরিটা শুরু করব বলে ঠিক করেছিলাম। লোটন ওয়াজ আ গুড সুপারভাইজার। ওকে আমার ফ্যাক্টরিতে চাকরি দেব ঠিক করেছিলাম। সেজন্যই ওকে দরকার ছিল আমার।

—তাই? গার্গী এবার হাসল, কিছুটা রিলাক্সড্ ভঙ্গিতেই ঠিক আছে, মিঃ রায়। তাহলে মিঃ চৌধুরী ভুবনেশ্বর থেকে ফিরলেই—

রাহুল রায় চেম্বার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর গার্গী কিছুক্ষণ নিজের মনে হাসল। কিছু উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে বেশ বিপাকে ফেলেছিল রাহুল রায়কে। ইচ্ছে ছিল আরও অনেকক্ষণ খেলানোর, কিন্তু বিকেল হয়ে আসছে সায়ন বাড়ি ফিরেই বেরিয়ে পড়বে জগন্নাথ এক্সপ্রেস ধরতে। মাত্র দুরাত্রি থাকবে না সায়ন। দুরাত্রি দুদিন। অথচ সেই দুটো রাত্রিই ক্রমশ পাথর হয়ে চেপে বসেছে তার বুকে। যত সন্ধে এগিয়ে আসছে, ততই টেনশনে অবশ হয়ে আসছে তার শরীর। তার ভেতরে ভর করছে এক অদ্ভুত দুশ্চিন্তা, ভয়, উৎকণ্ঠা। কেবলই মনে হচ্ছে যাই, আলোদার বাসাতেই না হয় থেকে যাই দুরাত্রি। নইলে গভীর রাত্রে কেউ হয়তো এসে কলিং বেল বাজাবে তার দরজায়, বলবে, দরজা খোলো—

সাড়ে চারটেয় বাড়ি ফিরে প্রস্তুত হয়ে আবার ছটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ওরা। ঠিক সন্ধে সাতটায় জগন্নাথ এক্সপ্রেস। যাওয়ার সময় নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে গেল সায়ন। স্ট্র্যাণ্ড রোডের জ্যামজট কাটিয়ে হাওড়া ব্রিজের ওপর খারাপ হয়ে যাওয়া একটি ট্রামের হার্ডল, পেরিয়ে ঠিক পৌনে সাতটার মধ্যে পৌঁছে গেল স্টেশন। তখনও সায়ন বারবার বলছিল, তোমাকে একলা রেখে যেতে খুবই টেনশন হচ্ছে, গার্গী। কিন্তু গার্গী প্রতিবারই বলেছে নো টেনশন প্লিজ। ডেল কার্নেগির উপদেশগুলো মাঝেমধ্যে আউড়ে নিয়ো। দেখবে সব টেনশন কেটে যাবে। তোমাকে ছাড়াই যখন এতকাল বেঁচে বত্তে, ছিলাম এ যাত্রাও থাকব আশা করি।

প্রায় বীরাঙ্গনার মতো প্রবল সাহস দেখিয়ে সায়নকে ট্রেনে তুলে দিল গার্গী। তীব্র হুইস্‌ল বাজিয়ে প্ল্যাটফর্ম দাপিয়ে জগন্নাথ এক্সপ্রেস ছেড়ে যেতেই সহসা তার বুকের ভেতরটা একদম হালকা হয়ে গেল। এতক্ষণ সায়ন ছিল বলে বুঝতেই পারেনি কী বিপুল ঝুঁকি নিয়েছে সে। এখন শিরশির করে উঠছে তার সারা শরীর। হাঁটুদুটো অল্পঅল্প কাঁপতে শুরু করেছে। তবু জোর করে নিজেকে শক্ত করে তুলতে চাইল। এখনই যদি এতটা নার্ভাস হয়ে পড়ে, তাহলে হাওড়া থেকে শরৎ বসু রোড, এতখানি পথ ড্রাইভ করে ফিরবে কী করে। তারপর সারাটা রাত তো পড়েই আছে।

দ্রুত ড্রাইভ করে হাওড়া ব্রিজ পেরোতে পেরোতে আলো ঝলমল গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখল সে। চমৎকার একরাশ দৃশ্যের দিকে নিজেকে সমর্পণ করে ভেতরে উথাল-দিয়ে ওঠা উত্তেজনা কমাতে চাইল। এক দঙ্গল জাহাজের মাস্তুল, তার ডেক, নৌকার লণ্ঠন—সবকিছু নজরে পড়তেই সহসা উদাস হয়ে গেল কয়েক লহমা। দৃশ্যগুলো রোজ একইরকম দেখতে লাগে ব্রিজের ওপর থেকে। কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায়, প্রতিদিনই তাদের চরিত্রের অদলবদল ঘটে যাচ্ছে। কাল যেসব নৌকা এখানে ছিল, তাদের অধিকাংশই আজ নেই, এসে পৌঁছেছে অন্য নৌকা, অন্য মাঝি-মাল্লারা। যে জাহাজ কাল এখানে ছিল, চলে যাওয়ার মুহূর্তে গুনছিল তার নাবিকেরা, আজ সকালেই হয়তো তারা যাত্রা শুরু করেছে অন্য বন্দরের উদ্দেশে, হয়তো এতক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে স্যাণ্ডহেডের কাছাকাছি। যারা এখনও নোঙর করে আছে, হয়তো কাল, কিংবা পরশু তারাও চলে যাবে। এসে পৌঁছাবে অন্য জাহাজ, অন্য নাবিক, অন্য খালাসিরা। দৃশ্য প্রতিদিনই এক, কিন্তু চরিত্র বদল হয়ে যাচ্ছে অবিরত, অবিশ্রান্তভাবে।

pathagar.net

সব কিছুই বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন। বদলে যাচ্ছে কলকাতার অনেককিছুই। বদলে যাচ্ছে গোটা পৃথিবীর ইতিহাস। গার্গী নিজেও কি কম বদলেছে এ'কদিনে. তার ভূমিকা এতদিন ছিল গার্গী মুখার্জির। তার বাড়ির পরিবেশ, পটভূমিও বদলে গেছে। বদলে গেছে তার চাকুরিস্থলের পটভূমিকা। এ গার্গী এখন নিজেকেই চিনতে পারে না ঠিক। আজ রাতেও হয়তো তাকে দেখা দিতে হবে অন্য এক ভূমিকায়। ব্রেবোর্ন রোড পার হয়ে দ্রুত ক্রশ করে গেল বিবাদি বাগের জনবহুল এলাকা। রেড রোড দিয়ে হু হু করে ছুটে চলল রেসকোর্সের দিকে। বাঁয়ে বাঁক নিয়ে রবীন্দ্রসদন, ক্যামাক স্ট্রিটের মোড়। পরক্ষণেই ডানদিকে ঢুকে পড়ল শরৎ বসু রোডের প্রশস্ত রাস্তায়।

যতই তার ফ্ল্যাটের দিকে এগোচ্ছে, ততই এক অজানা, অদ্ভুত আশঙ্কা ঘিরে ধরছে তার উৎকণ্ঠিত শরীর। এই তো কদিন আগে ঐন্দ্রিলাও ঠিক এভাবেই একলা একা রাতে কাটিয়েছিল তাদের ফ্ল্যাটে। নরম স্বভাবের মেয়েটির জীবনে হঠাৎ কী এমন ঘটেছিল যে তার জীবনটা আহুতি দিতে হল একরাশ হিংস্র দাঁতনখের সামনে।

সেই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ তার ডানপায়ের পাতা শক্ত হয়ে চেপে ধরল ব্রেক। অন্যমনস্ক তার ভেতর কখন যে সে এসে পৌঁছেছে ব্লু ওয়াণ্ডারের সামনে তা খেয়ালই করেনি। এমন সম্বিতহীনতার ভেতর কী একটা রিফ্লেক্স যেন কাজ করে। সেই রিফ্লেক্সই জানান দেয়, তোমার বাড়ির গেট পার হয়ে যাচ্ছে, এক্ষুনি ব্রেকে পা দাও।

গেট খুলে লনে গাড়ি ঢোকানোর মুহূর্তে হঠাৎই তার মনে হল, দূরে কৃষ্ণচূড়া গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া মানুষ। জায়গাটা সামান্য অন্ধকার। দুজনে গাছের আড়াল খুঁজে নিয়ে দাঁড়িয়েছে সম্ভবত। দৃশ্যটা নজরে পড়তেই বুকের ভেতরে ছাঁত করে উঠল তার।

আজ অবশ্য লোডশেডিং নেই। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও তবু তার শরীরটা শিরশির করছে। ঘড়িতে প্রায় আটটার মতো। ফ্ল্যাটে ঢুকে আলো জ্বালাতেই একটু সাহসে যেন ভর করে এল মনে। দরজা বন্ধ করার আগে গোটা বাড়িটার একোণে-ওকোণে, খাটের তলা, কিচেন সবই দেখে নিল তন্নতন্ন করে। নিঃসংশয় হতেই দরজা বন্ধ করতে যাবে, হঠাৎ দেখল সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় করে উঠে আসছে দীয়া।

—আরে দীয়া তুমি?

দীয়া অবাক হল, বা রে তোমার সঙ্গে তো রাতে থাকার কথা ছিল আজ।

গার্গীও বিস্মিত হল কম নয়, সে কী। তোমার মনে ছিল সে কথা! কতদিন আগে তো কথা হয়েছিল।

—বা রে মনে থাকবে না? এ বাড়িতে একলা থাকবে তুমি। আমি তো ভেবেই মরছি রাতে কী না কী হতে পারে হয়তো—

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে ওঠে গার্গীর । দীয়ার চোখ মুখেও সেই ভয়ত্রস্ততা। কিন্তু কীসের এত ভয় দীয়ার। হিমনের জন্য? চন্দ্রাদেবী কিংবা রবার্ট ও নীলের জন্য? নাকি আরও ভয়াল কিছু অদৃশ্য হয়ে আছে এ বাড়িতে, যা গার্গী এখনও জানে না। যে ভয়ালের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে ঐন্দ্রিলাকে, বাড়ি ছাড়তে হয়েছে দীয়াকে, বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েও যে দীয়া এখনও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে সর্বদা। কিন্তু কে সেই অদৃশ্য ঘাতক। যে একজোড়া চোখ সবসময় ও ফ্ল্যাটের জাফরি থেকে অনুসরণ করে চলেছে, সে-ই কি? সেদিন সন্ধের পর লোডশেডিং হতেই যে জড়িয়ে ধরেছিল গার্গীকে সে-ই কি?

গার্গী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন, আঃ, তুমি এসে বাঁচালে আমাকে। যা ভয় করছিল এতক্ষণ?

pathagar.net

দীয়ার গলা হঠাৎ কেমন ফ্যাসফেসে শোনায়, বুঝলে এ বাড়িতে রাত কাটাতে এখনও এত ভয় করে আমাকে। শুধু তোমার জন্যেই আবার—

সবে পোশাক-টোশাক বদলে একটু আটপৌরে হতে যাবে তারা, হঠাৎ টেলিফোনে শুরু হয়ে পিঁক পিঁকা পিঁপ শব্দ। এরকম সময়ে কে টেলিফোন করতে পারে বুঝে উঠতে পারল না গার্গী, রিসিভার তুলতেই শুনল, ম্যাডাম, আমি এতওয়ারি বলছি—

—কী হয়েছে এতওয়ারি?

অতঃপর রিসিভারের ভেতর দিয়ে যা শুনল গার্গী, তাকে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার। ফ্যাক্টরির ভেতরে হঠাৎই বিশাল এক শব্দ হয়েছে। মেশিনের একদিকে জ্বলে উঠেছে আগুন। চারদিকে ধোঁয়ায় ধোঁয়া। এক্ষুনি একবার যেতে হবে গার্গীকে।

সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল গার্গীর। সায়ন বাড়িতে নেই, দীয়া সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে, এহেন সময়ে সে এখন বাড়ি ঘরদোর ছেড়ে কীভাবে যাবে ফ্যাক্টরিতে।

—আগুন কি এখনও জ্বলছে এতওয়ারি।

—না ম্যাডাম, আগুন নিভে গেছে। শুধু চারদিকে ধোঁয়া।

গার্গীর গায়ে তখন ঘাম ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু। আগুন নিভে গেলে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। কতখানি ড্যামেজ হয়েছে ফ্যাক্টরিতে সেটা দেখতে যাওয়াই এখন জরুরি। তাদের কোন প্রোডাকশন ম্যানেজারও নেই যে তাকে ফোন করে যেতে বলবে এক্ষুনি। সায়নের প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও রাহুল রায়কে এখনও প্যারাডাইসে যোগ দিতে দেয়নি সে। সায়ন ফিরে এসে নিশ্চয় তাকেই দোষারোপ করবে।

তাহলে এখন কী করা উচিত তার? সে কি এক্ষুনি ছুটে যাবে ফ্যাক্টরিতে। যাওয়ার পথে তুলে নিয়ে যাবে ওয়ার্কস ম্যানেজার বরুণ নন্দীকে? এত রাতে তারা গিয়ে কিছু কি করতে পারবে? কিন্তু তাতে তো যেতেই হবে। দীয়াকে এই বাড়িতে একলা রেখে—

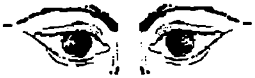

আরও একবার ফ্যাক্টরির প্ল্যান্ট বার্স্ট করেছে শুনে গার্গী স্থাণু হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ।

সাময়িক বিড়ম্বনা কাটিয়ে ক্রমশ একরাশ ক্রোধ ধক ধক করে উঠল তার দু'চোখে। সায়ন ট্যুরে বেরিয়ে গেছে জানতে পেরেই সেই ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ শক্তি আবার দাঁত নখ নিয়ে হামলা করেছে তাদের ওপর। একা, অসহায় গার্গী এখন কীভাবে মোকাবিলা করবে তাদের সঙ্গে! তারা নিশ্চই একা নয়। দীয়া ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, কী হয়েছে?

—একটা বিরাট দুর্ঘটনা ঘটেছে ফ্যাক্টরিতে। এক্ষুনি যেতে হবে বলেছে।

—তাই ! দীয়াও ঘাবড়ে গেল তাহলে এক্ষুনি যাও। ব্যাপারটা যখন এতই সিরিয়াস।

কিন্তু তোমাকে একা রেখে যাই কী করে? সবে প্রথম দিন এসেছ আমার এখানে, একবার বেরোলে হয়তো ফিরতেই পারলাম না সারারাত।

—তা আর কী করা যাবে। আমার তো একা থাকাই অভ্যেস। ওদের ফ্ল্যাটেও বরাবর একা শুয়েছি এখান যেখানে থাকি, সেখানেও একা না হয় আজও একা থাকব। কিন্তু এতবড় একটা ঘটনার সংবাদ শোনার পর তোমার পক্ষে চুপ করে থাকা তো সম্ভব না।

—এ বাড়িতে তোমার একা থাকতে ভয় করবে না?

pathagar.net

—হয়তো করবে। কিন্তু আপাতত করারও তো কিছু নেই।

—তুমিও আমার সঙ্গে চলো না।

দীয়া ভয়ত্রস্ত চোখে তাকাল, নাহ্ অত ঝামেলার মধ্যে যেতে আমার ভয় করে। ওসব তোমার মতো শক্ত মেয়ের পক্ষেই মানায়। আমি ভীষণ ভীতু।

—তা হলে বলছ, যাব?

—যাও। ঠিক সেই মুহূর্তে একবার ফোন বেজে উঠল তাদের ঘরে। উদভ্রান্ত গার্গী আবারও দ্রুত রিসিভার তুলতেই ওদিকে কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রের গলা। সায়ন ঠিকমতো রওনা হয়ে গেছেন কি না জেনে নিয়ে ম্যাডামের খোঁজখবর নিতে লাগলেন নম্র কণ্ঠস্বরে। চেয়ারম্যান সাহেব বেরোবার আগে তাঁকে ম্যাডামের খোঁজ খবর নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তাঁর ফোন পেতেই হঠাৎ খড়কুটো পেয়ে গেল গার্গী। খড়কুটো নয়, হাতে স্বর্গই যেন বা। তৎক্ষণাৎ বলল, মিঃ মিত্র ফ্যাক্টরি থেকে একটা খারাপ খবর এসেছে এই মাত্র। আগুন ধরে গিয়েছিল প্ল্যান্টে। এখনও ধোঁয়ায় ভরে আছে ফ্যাক্টরি। আপনি এক্ষুনি একবার ফ্যাক্টরিতে যান। তেমন দরকার হলে আমাকে ফোন করবেন ওখান থেকে।

রোহিতাশ্ব মিত্র ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন, ব্যস্ত হয়ে বললেন, তাই নাকি? কী ভয়ানক খবর। আমি এখনই যাচ্ছি। আপনি বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না, ম্যাডাম। সমস্ত পরিস্থিতি দেখে শুনে আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফোন করব আপনাকে।

এতবড় খবরটা শোনার পরও গার্গী নিজে গেল না, অন্য অফিসারকে স্পটে পাঠাল দেখে ঠিক যেন সন্তুষ্ট হল না দীয়া। বলল, বরং একবার ঘুরে এলেই পারতে—

গার্গী তাকাল দীয়ার দিকে দরকার হলে নিশ্চই যাব। মিঃ মিত্রের ফোন পেলেই—

—তা হলে বরং একটু চা করি। আমার যা টেনশন হচ্ছে—

গার্গী তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হল, দাঁড়াও আমিই করছি। চা করতে গিয়ে তবু কিছুটা টেনশন কাটানো যাবে।

দ্রুত দু'কাপ চা করে এনে তাতে চুমুক দিয়ে ভেতরের উত্তেজনা কমাতে চাইল। দীয়ার দিকেও তাকাল কয়েকবার। এর আগে যে কবার দেখেছে, কেমন অদ্ভুত মনে হয়েছে দীয়াকে। আজও তার ঠোঁটে লিপস্টিক, কানে ঝুলমুল করছে পুঁতি বসানো দুল। নতুন ধরনের কপালে আধখানা চাঁদের মতো টিপ। বেশ সাজগোজের বাহার আছে তার। পরনের শাড়িটিও খুব দামি। এমনকি চোখের পাতায় আইশ্যাডোও।

প্রায় মিনিট পঁয়ত্রিশেক পর ফ্যাক্টরি থেকে ফোন এল রোহিতাশ্ব মিত্রের হুড়মুড় করে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরতেই গার্গী শুনল, কই ম্যাডাম, কোনও দুর্ঘটনাই তো ঘটেনি এখানে। এতওয়ারি ঘুমোচ্ছিল, ডাকাডাকি করতেই উঠে এসে বলল, সে কোনও ফোন করেনি আপনাকে।

—সে কী। গার্গী স্তম্ভিত হল। প্রাথমিক বিস্ময় কাটিয়ে বলল, স্যরি মিঃ মিত্র। তাহলে ভূতুড়ে ফোনই হবে, আপনাকে এত রাতে বিরক্ত করার জন্য খুবই লজ্জিত হচ্ছি।

—না, না ম্যাডাম গুড নাইট।

রিসিভার রেখে প্রবল এক দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেল গার্গী। কিন্তু সে এখনও বুঝে উঠতে পারছে না, ভূতুড়ে ফোনের কণ্ঠস্বরটি তাহলে কার। গলাটা কি তার চেনা চেনা মনে হল? এতওয়ারির গলা নকল করে কে এত রাতে তাকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যেতে চাইছিল ফ্যাক্টরির দিকে? ফ্যাক্টরিতে গেলে তাকে কি লোটনের মতো—

pathagar.net

কিছু আর ভাবতে হল না সে। এমনিতেই সায়ন চলে যেতে ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। তার ওপর হঠাৎ এ রকম ভয়ঙ্কর ফোন তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলল দ্বিগুণ আতঙ্কে। বুঝতে পারছে না, আজ রাতে তার সামনে আরও কী বীভৎস সময় ঘনিয়ে আসছে।

দীয়াও হাঁপ ছেড়ে বলল, কিন্তু কে এমন মিথ্যে খবরটা দিল বলো তো?

—সেটা তো আমিও ভাবছি। বলতে বলতে উঠে পড়ল গার্গী। তার সামনে এখন অনেক গার্হস্থ্য ঝামেলা । ফ্রিজে যা খাবার আছে তাতে তার একার পক্ষে যথেষ্ট হলেও দীয়ার হবে না। অতএব এই মুহূর্তে তাকে কিচেনে ঢুকে পরিপাটি করে রাঁধতে হবে অনেক কিছু। তা ছাড়া আছে আরও টুকিটাকি তেত্রিশ রকম গৃহস্থালি।

তার এতসব কাজে ব্যস্ত থাকার সময় দীয়া উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগাল এ-ঘর ও-ঘর।

সায়নের বইয়ের আলমারির সামনেও দাঁড়াল কিছুক্ষণ। কিছুটা সময় কাটাল সায়ন আর ঐন্দ্রিলার ফটোটির সামনে। কী যেন দেখল খুবই গভীর পর্যবেক্ষণ। তারপর হঠাৎ গার্গীকে জিজ্ঞাসা করল, মিঃ চৌধুরী খুব পড়াশুনো করেন, তাই না?

—হ্যাঁ, করতেই তো হয়।

—আচ্ছা, এই যে এতসব প্রোডাক্ট তৈরি হয় প্যারাডাইসের সবই ওঁর তৈরি?

গার্গী আবার মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

—এই যে নতুন একটা সাবান বেরোল সেটাও।

—হ্যাঁ।

দীয়া হঠাৎ খুব উৎসাহিত হয়ে পড়ল, আচ্ছা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, কী ভাবে এ সব মাথা খাটিয়ে বার করেন।

—কেন, রিসার্চ করে।

—কোথায় রিসার্চ করেন?

—ল্যাবরেটরিরুমে।

—তোমাদের ওপাশে একটা ল্যাবরেটরিরুম আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, আছে।

—আচ্ছা শুনছিলাম আরও একটা নতুন কী ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন উনি। তাতে দারুণ একটা ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি হবে। মাইক্রোসিস্টেম না কী যেন। সেটা বেরোল নাকি হই-হই পড়ে যাবে।

গার্গী হেসে ফেলে বলল, তুমি কোত্থেকে শুনলে? দীয়া ভাববার চেষ্টা করে বলল, শুনেছি কার কাছে যেন। সে রকম ডিটারজেন্ট পাউডার নাকি এখনও এ দেশে তৈরি করতে পারেনি কেউ। বড় বড় কোম্পানিও নাকি ডাউন খেয়ে যাবে।

গার্গী দীয়ার দিকে তাকাল, এত কিছু শুনে ফেলেছ?

দীয়া হঠাৎ বলল, ল্যাবরেটরি ঘরটা একটু দেখব? আমার এসব খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

গার্গী একটু শক্ত হল. না। মিঃ চৌধুরী আমাকেও ও ঘরে ঢুকতে দেন না। ও ঘরটা ওঁর এক্সক্লুসিভ।

—তাই? দীয়া হঠাৎ নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর বলল, রাতের রান্নাটা আমি করব?

গার্গী অবাক হয়ে মাথা নাড়ল না, না। তুমি দু-একদিনের জন্য এসেছ, তুমি করবে কেন?

দ্যাখো না, আমি কীরকম রান্না শিখেছি।

pathagar.net

যতক্ষণ গার্গী কিচেন ব্যস্ত রইল, দীয়া কেবলই ঘুরঘুর করতে লাগল এ-ঘরে ও-ঘরে। কখনও সায়নের আলমারির সামনে, কখনও ব্যালকনিতে, কখনও ল্যাবরেটরি ঘরের সামনেও। কিছুক্ষণ পর পর টুঁ দিতে লাগল কিচেনেও। একবার এসে বলল, দারুণ গন্ধ বেরোচ্ছে কিন্তু জোর খাওয়া হবে বলে মনে হচ্ছে।

গার্গী হাসল, দ্যাখো খেতে পার কি না—

দীয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তুমিও কখনও ল্যাবরেটরি ঘরে ঢোকোনি?

—না।

—ঐন্দ্রিলাও বলত সেও কখনও ও ঘরে ঢোকেনি। ঢুকতে নাকি মানা আছে?

—হ্যাঁ।

—কেন কী আছে ও ঘরে? তোমাদের কখনও জানতে ইচ্ছে হয়নি, কী আছে ল্যাবরেটরি রুমে! কেনই বা মানা আছে।

গার্গী তাকাল দীয়ার দিকে, গম্ভীর হয়ে বলল, আমি যে জিনিসটা জানি না, বুঝব না তা নিয়ে অহেতুক কৌতূহল আমার নেই।

দীয়া তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল।

রাতের খাওয়াদাওয়া সেরে কাজ মিটিয়ে ফ্রি হতে হতে প্রায় পৌনে বারোটার মতো। যত রাত হয়ে আসছে, ততই উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে গার্গী। শোয়ার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হতেই দীয়া বলে উঠল, আমাকে পাশের ঘরে বিছানা করে দিয়ো, আমি আবার কারও সঙ্গে শুতে পারি না।

শেষ কথাটা খট্ করে কানে বাজল গার্গীর। যদি সে নিজেও এতক্ষণ দ্বিধায় ছিল এ বিষয়ে, যে বিছানায় সায়ন শোয় সেখানেই দীয়ার শোয়ার ব্যবস্থা করতে একটুও সায় ছিল না তার বরং ভেবেছিল বাইরের ঘরেই বিছানা করে নেবে দুজনের। এখন দীয়ার কথায় অবশ্য কিছুটা আশ্বস্তই হল। কিন্তু পুরোপুরি কি হল।

শোয়ার ঠিক আগে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরঘুর করতে দীয়া হঠাৎ বলল, এ ঘরে একটা অ্যাশট্রে থাকত না, সেটা কোথায় গেল?

গার্গী দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, অ্যাশট্রে কী হবে?

দীয়া কেমন লাজুক হাসল, মানে, আমার একটা বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে, বলে তার বিছানার পাশে রাখা একটা সিগারেটের প্যাকেট তুলে দেখাল।

গার্গীর বুকের ভেতর একটা রেলগাড়ি দমকা হাওয়ার ঘূর্ণি তুলে তীব্র বেগে ছুটে গেল, ঝম ঝম শব্দে মাথাটা টলেই যাচ্ছিল তার, কোনও ক্রমে সামলে নিয়ে বলল, দাঁড়াও দিচ্ছি—

অ্যাশট্রেটা পরিষ্কার করতে সরিয়ে রেখেছিল, মুছেটুছে দিয়ে এল ও-ঘরে। দীয়ার চোখে দিকে তাকিয়ে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল, এ চোখ তার ভারি চেনা। হঠাৎ মনে হল একটা ভয়ঙ্কর দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে আজ। এখন এই রাতের বেলা সে একদম একা। একা, অসহায়।

কিন্তু এখন তো তির বেরিয়ে গেছে হাত থেকে। ফেরানোর কোনও উপায় নেই—

দীয়া ও ঘরে দুটো দরজার মাঝখানে পর্দা টেনে দিয়ে সিগারেট ধরাল। তার ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে গার্গীর ঘরেও ঢুকে পড়ল কিছুটা। ধোঁয়া নয়, কুণ্ডলি পাকানো সাপই মনে হল গার্গীর।

এ-ঘরে আলো নিভিয়ে তখন এক বিপুল আতঙ্কে ক্রমশ নীল হয়ে যাচ্ছে গার্গী। একটু আগেই ঘুম আসছিল তার চোখে। এখন সে ঘুম উঠে গিয়ে তার সমস্ত শরীর ভয়ে, ক্ষোভে,

pathagar.net

ক্রোধে সহসা টান টান। একা জেগে জেগে কেবলই উসিবিসি করতে থাকে বিছানায়। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই ফ্ল্যাটে শুধু সে আর দীয়া নয়, আরও কেউ অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছে কোনও গোপন কুঠুরিতে। রাত্রি গভীর হলেই সে বেরিয়ে আসবে হা হা শব্দে ঘর কাঁপিয়ে।

একটা সিগারেট শেষ হতে আরও একটা সিগারেট ধরাল দীয়া। পর পর দুটো! তার মানে বেশ নেশা আছে ওর। গার্গী আতঙ্কিত হয়ে শুধু দেখছে ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ভরে যাচ্ছে তার ঘর। সমস্ত ধোঁয়া জমে যেন একটু পরেই জন্ম দেবে এক বিশাল দৈত্যের।

দ্বিতীয় সিগারেটটি শেষ হওয়ার মিনিটখানেক পরে দীয়ার ঘরের লাইটটা নিভে গেল। হঠাৎ। তৎক্ষণাৎ মিশ অন্ধকার তার ভয়াল ডানা বিছিয়ে নেমে এল সমস্ত বাড়িটায়। মুহূর্তে গার্গীর বুকের ভেতর একটা মহিষ চেহারার দাপুটে মোটর সাইকেল একটানা ভট ভট শব্দ তুলে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল ভয়ঙ্কর গতিতে। তার শরীর জুড়ে তখন এক তীব্র কাঁপ, জ্বালা করছে চোখ দুটো শুকিয়ে আসছে জিভ, শব্দহীন জেগে শুধু এক দুই তিন করে রাত্রি প্রতিটি মুহূর্ত গুনে যাচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছে এ তার জীবনের দীর্ঘতম রাত। এমন ভয়ঙ্কর রাত, এ হেন দুঃস্বপ্নের রাত তার জীবনে আর কখনও আসেনি।

বাইরে শরৎ বসু রোডে তখনও ভেসে আসছে দু—একটা গাড়ির হুস হুস করে চলে যাওয়ার শব্দ। শোনা যাচ্ছে একলা কোনও মাতালের জড়ানো কণ্ঠস্বরের গান। অনেক দূরে কয়েকজন মানুষে হই হল্লাও শোনা গেল কিছুক্ষণের জন্য। তার একটু পরেই কয়েকটা কুকুরের তুমুল ঝগড়া।

তার একটু পরে—

হঠাৎ গার্গীর মনে হল , দু'ঘরের মাঝখানের পর্দাটা দুলে উঠল যেন। দম বন্ধ করে তার নজর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুহূর্তে। পর্দা সরিয়ে কেউ কি এ ঘরে ঢুকতে চাইছে। দীয়াই কি মুখ বাড়াল ওখানে। গার্গীর হৃৎপিণ্ডের গভীরে সেই দুর্দান্ত মোট সাইকেলটা চলতে শুরু করল আরও দ্বিগুণ গতিতে। ধড়মড় করে সে উঠে বসতে গিয়েও দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। বালিশের পাশে রাখা তিন ব্যাটারির টর্চটা নিঃশব্দে মুঠো করে ধরল, কিন্তু না, বোধহয় কেউ নয়। অন্ধকারে দৃষ্টি চালিয়ে দেখল, পর্দাটা একবার দুলে উঠেই ফের শান্ত হয়ে গেল। হয়তো তাহলে সবটাই তার মনের ভুল।

এক মুহূর্তের জন্য তার মনে পড়ে গেল ঐন্দ্রিলাকে। মনে হল, ঐন্দ্রিলাই যেন ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে একা একা। তার শান্ত অথচ গভীর চোখ দুটো মেলে গার্গীকে বলছে, মিতুন, তুই পালা, নইলে আমারই মতো—

কিন্তু না, গার্গী তো পালাবে না—বিপদের মুখোমুখি হওয়ার জন্যই তো সে আজ এই ফাঁদ পেতেছে। অন্য যে কোন মেয়ের তুলনায় তার শক্তি অনেক বেশি। সে ঐন্দ্রিলার মতো নরমসরম মেয়ে নয়। সুখী রাজকন্যা হতে কখনও চায়ওনি সে। তার সামনে এখন অপেক্ষা করছে এক দুর্দান্ত এলোঝড়।

সহসা গার্গী একেবারে অন্যভাবে জেগে উঠল। টান টান ছিলার মতো হয়ে উঠল তার শরীর। ইস্পাতের মতো শক্ত হয়ে গেল সমস্ত নার্ভ। অস্পষ্ট অন্ধকারে বুঝতে পারল, পাশের ঘর থেকে উঠে এসেছে দীয়া। পর্দা সরিয়ে সত্যিই ঢুকে পড়েছে এ ঘরে। খুব ধীরে, নিঃসাড়ে এসে দাঁড়াল গার্গীর বিছানার পাশে। দাঁতে দাঁত চেপে তখন গার্গী পড়ে আছে বিছানায়। চোখ বন্ধ, নিঃশ্বাস স্থির। বুঝতে পারছে, দীয়া ঝুঁকে পড়ে পরখ করছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। তার নিঃশ্বাসের স্পর্শও যেন ছুঁয়ে যাচ্ছে গার্গীর কানের লতি। তাতে সিগারেটের হালকা মিষ্টি গন্ধ। চোখ বুজে নিঃসাড় গার্গী প্রবলভাবে ছটফট করে উঠল নিজের ভেতর।

একটু পরে, গার্গী ঘুমিয়ে পড়েছে নিঃসন্দেহ হতেই দীয়া গিয়ে দাঁড়াল সায়নের আলমারির কাছে। আলমারির ওপর থেকে চট করে কিছু একটা তুলে নিল। তার ঝন ঝন শব্দ একলহমা শিরিয়ে দিল গার্গীকে।

দীয়া ততক্ষণ চলে গিয়েছে ব্যালকনির দিকে। দূরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইশারা করল। যেন কাউকে ডাকছে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ল্যাবরেটরি রুমের দিকে।

গার্গী তখন গল গল করে ঘেমেই চলেছে বিছানায়। দীয়া ওপাশে চলে যেতেই সে তড়াক করে উঠে বসল নিঃশব্দে। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখল, দীয়ার হাতে ল্যাবরেটরি রুমের চাবি। চাবিটা যে সায়নের বইয়ের আলমারির ওপরে থাকে, তা নিশ্চয় জানত দীয়া। সেই জন্যেই তখন থেকে সে ঘুর ঘুর করছিল আলমারির সামনে।

চাবি ঘুরিয়ে দীয়া ততক্ষণে খুলে ফেলেছে সায়নের ল্যাবরেটরি রুম।

গার্গী তখন ক্ষোভে, ক্রোধে দারুণভাবে ফুঁসছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে চারপাশের তাকিয়ে দেখল, আর কেউ ঘরের মধ্যে আছে কি না। যে কোনও মুহূর্তেই হয়তো আর একজন বেরিয়ে আসবে তার সামনে।

দীয়া তখন ঢুকে পড়েছে ল্যাবরেটরি রুমের ভেতরে। ঢুকে একবার পেছন ফিরে তাকাল। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা গার্গীকে চোখেই পড়ল না তার।

কেউ নেই দেখে আশ্বস্ত গার্গী পট করে সুইচ অন করে দিল। টিউবের আলো ঝকঝক করে উঠতেই গার্গী মুহূর্তে নিজেকে আড়াল করে ফেলল দরজার ওপাশে। তখনও সে বুঝে উঠতে পারছে না তার কী করা উচিত।

দীয়া ল্যাবরেটরি ঘরে ঢুকে খুটখাট শব্দ করছে ক্রমাগত। এটা-ওটা সরাচ্ছে। ড্রয়ারগুলো খুলছে একের পর এক। খুলে ফেলল আলমারিটাও। খসখস করে কী সব টেনে বার করতে লাগল।

বারান্দার পাশে দাঁতে দাঁত চেপে নিঃসাড়ে মুহূর্ত গুনছে গার্গী। রাগে সমস্ত শরীর রি রি করছে তার। যে-ঘরে আজ পর্যন্ত গার্গী নিজেই কোনও কিছু স্পর্শ করেনি, সেখানে দীয়া কিনা তার ইচ্ছেমতো নাড়াচাড়া করছে কাগজ-পত্র, রিসার্চের যাবতীয় সরঞ্জাম! কী সাহস ওর। কী ভয়ঙ্কর ওর দুঃসাহস!

গার্গীর একবার মনে হল সেও ঢুকে পড়ে ল্যাবরেটরি রুমে। একঝটকায় কেড়ে নেয় —। পরক্ষণেই নিবৃত্ত করল নিজেকে। ঠিক এই মুহূর্তে নয়, আরও একটু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা দরকার। যে অপরাধী তাকে অপরাধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। দীয়া এখনও একমনে খুঁজে চলেছে ড্রয়ার আলমারির প্রতিটি কোণে। যাবতীয় কাগজপত্র বার করছে টেনে টেনে।

আগেই আন্দাজ করেছিল গার্গী, এখন পরিষ্কার হয়ে গেল দীয়ার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি কী। আসলে প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল দীয়ার। তার অভীষ্ট পূরণ করতে এখন মরিয়া হয়ে সে আরও একবার হানা দিয়েছে সায়নের ল্যাবরেটরি রুমে। বাইরে অপেক্ষা করছে তার সঙ্গী। সে সবার চোখের সামনে বসে করে, অথচ পর্দার আড়ালে থেকে মূল চক্রী হিসেবে ঘটিয়ে গেছে এতসব ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ কাগজগুলোর জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে এই গাঢ় রাত্রির অন্ধকারে। তার হাতে এই কাগজগুলো তুলে দিতে পারলেই দুজনের এতকালের ইচ্ছেটা পূরণ হবে।

নিজেকে শক্ত রেখে গার্গী হঠাৎ দ্রুত ফিরে এল তার ঘরের ভেতর। টেলিফোনের বোতাম টিপল পর পর। কানেকশন পেতেই অনুচ্চকণ্ঠে কথা বলল মিনিটখানেক। রিসিভার রেখে খালি ক্যাসেটভরা তার টেপরেকর্ডরটা অন করে চলে এল ল্যাবরেটরিরুমের সামনে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সেকেণ্ড মিনিট গুনতে থাকল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। হয়তো দশ মিনিট, কিন্তু মনে হল দশ ঘণ্টা। হঠাৎ সম্বিত ফিরতে দেখল, আলোটা নিভিয়ে দীয়া বেরিয়ে আসছে ল্যাবরেটরি রুম থেকে। তার হাতে ছাপাছাপি কয়েক তাড়া কাগজ। সেগুলো সাপটে তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল ব্যালকনির কাছে, বোধহয় কাউকে খুঁজছে এদিকে-ওদিকে।

গার্গী তখন টগবগ করে ফুটছে এক অসম সাহসে। হঠাৎ সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিল বারান্দার আলো। আলো জ্বলে উঠতেই দীয়া কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে তাকাল গার্গীর দিকে।

গার্গী দ্রুত গিয়ে টেনে ধরল দীয়াকে, হিসহিস করে বলল, কী করছ?

দীয়ার মুখটা প্রথমে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পর মুহূর্তে জ্বলে উঠল এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। দ্রুত তার হাতের কাগজগুলো ফেলে দিতে চাইল ব্যালকনি থেকে নিচের দিকে। কিন্তু গার্গী তা হতে দিল না। হিড়হিড় করে তাকে টেনে নিয়ে আসতেই কিছু কাগজ পড়ে গেল নিচে, কিছু পড়ল বারান্দার ওপর, কিছু তার হাতে।

দীয়ার মুখখানা ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠল তৎক্ষণাৎ। এত দ্রুত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার অভিব্যক্তি যে গার্গী শিউরে উঠল। কিন্তু গার্গীও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। একটা কিছু ঘটবেই আজ রাতে তা তো জানতই সে। দীয়া সাপ্টে ধরে রয়েছে বাকি কাগজের তাড়া। গার্গী তার হাত থেকে সেগুলো কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই দীয়া কাগজগুলো একপাশে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল গার্গীর ওপর।

গার্গী ছিটকে সরে এল ঘরের ভেতর, যেখানে সে অন করে রেখেছে টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেট।

সে সরে আসতেই দীয়া হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল কোনওক্রমে। ঘরে ভেতরে দ্রুত ছুটে এসে গার্গীর ওপর আবার লাফ দিয়ে পড়ে বলল, তাহলে তোরও মরার সাধ হয়েছে।

গার্গী চট করে আবার সরে গেল ওপাশে, গিয়ে দীয়াকে জাপটে ধরে ফেলল পেছন থেকে। তার হাতদুটো পেছনে নিয়ে গিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল দুমুঠোয় আর হিসহিস করে বলল, আমি কিন্তু ঐন্দ্রিলা নই, অত সহজে আমার হাত থেকে তুমি নিস্তার পাবে না দীয়া।

দীয়ার গায়েও বেশ জোর। সে তার হাত ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। শরীর মুচড়িয়ে চেষ্টা করল হাতদুটো ছাড়িয়ে নিতে। বলল, ছাড় বলছি তুই আমাকে চিনিস না। তোকেও ঐন্দ্রিলার মতো আজ—

হাত ছাড়াতে অপারগ হয়ে শেষে পা ছুড়তে লাগল দীয়া। সেই মুহূর্তে গার্গী তার হাঁটু দিয়ে মস্ত একখানা গোঁত্তা মারল দীয়ার কোমরের কাছে। দীয়া কোঁক করে উঠল।

গার্গী এবার তার হাতদুটো মুচড়ে দিয়ে বলল, এখন তোমাকে কী করা উচিত, জানো?

ঠিক যেভাবে ঐন্দ্রিলাকে গলা টিপে মেরে কেরোসিন ঢেলে পুরিয়ে মেরেছিলে, ঠিক সেভাবেই মেরে ফেলা।

দীয়া ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। প্রথমবার সে ভুল কাগজপত্র নিয়ে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। এবার তাই সায়নের গবেষণার প্রতিটি কাগজ সংগ্রহ করেছে ল্যাবরেটরি রুম থেকে। দ্বিতীয়

[watermark]

দফায়ও ব্যর্থ হতে তার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলে উঠছে এক ঘাতকের চাউনি। সে পুনর্বার শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করতেই তার কোমরে আর একখানা গোঁত্তা মারল গার্গী। গলা থেকে এবার আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়তেই গার্গী বলল, এরকম আর গোটা কয়েক মারলে তোমার কোমর ভেঙে পড়ে যাবে।

দীয়া তবু শেষ চেষ্টা করতে ছাড়ল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে গার্গীর চুলের রাশ টেনে ধরল হঠাৎ, দ্যাখো না এবার তোমার হাল কী হয়—

গার্গী এক মুহূর্ত অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল সামলে নিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বলল, আমি ক্যারাটে শিখেছিলাম বুঝলে? আপাতত তোমাকে আধঘণ্টার জন্য অজ্ঞান করে রাখছি। তারপর যা করার পুলিশ করবে—

মুহূর্তে সে হাতে অদ্ভুত ভঙ্গি করে দীয়ার ঘাড়ের মোক্ষম জায়গায় সজোরে চপারের মতো বসিয়ে দিল তার ডান হাত। দীয়ার গলা থেকে কোনও শব্দই বেরোল না আর, শুধু তার অত বড় শরীরটা কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়ল মেঝেয়। গার্গী নিচু হয়ে দেখল, দীয়া অচেতন।

একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে গার্গী প্রথমে বন্ধ করল টেপরেকর্ডারের সুইচ। পরমুহূর্তে সিঁড়ির কাছে পদশব্দ শুনে আই হোলে চোখ লাগিয়ে দেখল একটা লোক। এতক্ষণ বোধহয় ব্যালকনির নিচে, লনের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন কলিং বেল টিপে হয়তো ডাকতে চেয়েছিল গার্গীকেই নয় দীয়াকে। সে বুঝতে পেরেছিল, দীয়া ঝামেলায় পড়েছে।

কিন্তু কলিং বেল টেপা হল না তার। তার আগেই ব্লু ওয়াণ্ডারের বাইরে জিপের শব্দ। গার্গী টেলিফোন করছিল, তার উত্তরে বিশাল বাহিনী নিয়ে ছুটে এসেছেন পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল।

কিন্তু লোকটি তখন পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। দেবাদ্রি সান্যাল ঢুকে পড়েছেন গেটের ভেতরে। ঢুকেই সপাটে পাকড়ে ফেললেন লোকটিকে।

গার্গী স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল, যাক নাটের গুরুটিকে ধরতে পেরেছেন তাহলে। পর্দার আড়ালে থেকে খুব জ্বালিয়েছে আমাদের।

বিস্মিত দেবাদ্রি তখনও বুঝে উঠতে পারছেন না গোটা ব্যাপারাটা। গার্গী তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তাহলে ওপরে আসুন মিঃ সান্যাল, আপনাকে শোনাই কেনই বা খুন হতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে, আর তার পেছনে কী ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিল এরা দুজন। আপনি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন দীয়ার জীবন-যাপনের স্বরূপ জানতে পারলে—

ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল যখন তাঁর বাহিনী নিয়ে দোতলায় গার্গীদের ফ্ল্যাটে উঠে এলেন, ঘরের ভেতর তখন ঝড়-বিধ্বস্ত অবস্থা। মেঝেয় ছত্রখান হয়ে রয়েছে ঘরের জিনিসপত্র, ছড়িয়ে রয়েছে সায়নের ল্যাবরেটরি, রুমের কাগজ, ভেঙে চুরমার হয়ে রয়েছে একটা কাচের গেলাস, একপাশে পড়ে আছে দীয়ার এলোমেলো সংজ্ঞাহীন দেহ।

গার্গী তখনও শ্বাস নিচ্ছে বড় বড় করে হাপরের মতো উঠছে নামছে তার বুক, চারদিকে তাকিয়ে সে নিজেও তখন বিশ্বাস করতে পারছে না মাত্র তিরিশ-পঁয়ত্রিশ মিনিটের ধস্তাধস্তিতে

কীভাবে এমন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল ঘরের আসবাবপত্রও। তার মানে রীতিমতো বুঝতে হয়েছে দীয়ার সঙ্গে।

অচেতন দীয়াকে দেখে দেবাদ্রি হতবাক হয়ে গেলেন, কিছুই তো বুঝতে পারছি না, মিসেস চৌধুরী। এ সব কী কাণ্ড।

গার্গীর তখন হাসারও ক্ষমতা নেই, বলল, সব বলছি। তার আগে জল খেয়ে একটু থিতুবিতু হয়ে নিই। যা ঝড় গেল আজ সন্ধে থেকে—

জল খেয়ে মিনিট দশেক বিশ্রাম নিয়ে সহজ হয়ে নিল গার্গী। বলল, তা হলে শুনুন, কীভাবে ঝুঁকিটা নিয়েছিলাম আজ। সায়ন চৌধুরী ভুবনেশ্বর চলে যাওয়ার পর ঠিক সেই পটভূমিই তৈরি হল, যা কিছুদিন আগে সায়ন বিলাসপুর যেতে ঘটেছিল ঐন্দ্রিলার ক্ষেত্রেও। আমারই মতো ঐন্দ্রিলা সেদিন একা ছিল এই ফ্ল্যাটে। শুধু পার্থক্য এই যে, ঐন্দ্রিলা জানত না, তার একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে এসে অপহরণ করতে চাইবে তার স্বামীর তিল তিল করে গড়ে তোলা এক কোম্পানির মূল চাবিকাঠি। তাই সে কাজে বাধা দিতে গিয়ে খোয়াতে হল তার প্রাণ। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিলাম, তাই ঠাণ্ডা মাথায়, অনেক হিসাব কষে আজ ফাঁদ পেতেছিলাম দীয়ার জন্যে। প্রবল ঝুঁকি আছে তা জেনেও।

আসলে শৈশব থেকে যে কোনও কাজে ঝুঁকি নেওয়াটাই আমার অভ্যাস। আজকের ঝুঁকিটা কিন্তু মারাত্মক ছিল। হিসেব একটু ভুলচুক হলে আমার প্রাণটাও হারাতে হত বেঘোরে; বলে গার্গী সন্ধে থেকে যা-যা ঘটেছে, তা আনুপূর্বিক বিবৃত করল দেবাদ্রির কাছে। টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটটি রি-ওয়াইণ্ড করে যে ঝড়টুকু বয়ে গেছে তাও একবার শুনিয়ে দিল আগাগোড়া।

দীয়ার সংলাপগুলো শুনতে শুনতে দেবাদ্রি বিড়বিড় করলেন, সত্যিই খুব ঝুঁকি নিয়েছিলেন—

গার্গী এতক্ষণে হাসতে পারলে, কিন্তু মিঃ সান্যাল, এর থেকেও বড় ঝুঁকি নিয়েছিলাম সেদিন, যে মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ব্লুওয়াগুারের ফ্ল্যাটে সায়নের স্ত্রী হিসেবে প্রবেশ করব। জানতাম, এই একটি সিদ্ধান্তের ফলে আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সমাজ, পুলিশ, সাংবাদিক সবারই স্পষ্ট ধারণা হবে, ঐন্দ্রিলা হত্যার পেছনে তা হলে গার্গীই রয়েছে এক প্রধান ভূমিকায়। যখন সমস্ত পরিপার্শ্বে বলছে, সায়ন চৌধুরীই খুনি, সমাজের প্রতিটি মানুষের আঙুল উদ্যত হয়ে বিঁধতে চাইছে এক সায়ন চৌধুরীকেই, এমনকি তার পরিচিতজনও বিশ্বাস করছে না এই খুনটা অন্য কেউও করতে পারে, সেই মুহূর্তেও এহেন একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম কিছুটা আবেগের বশে হলেও তার জন্য চিন্তাভাবনাও কম করিনি।

আসলে ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর অন্য সবাইকার মতো প্রথমে আমারও ধারণা হয়েছিল, সায়ন চৌধুরীই এর জন্য দায়ী। পাশের ফ্ল্যাটের চন্দ্রাদেবী কিংবা হিমন এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকলেও থাকতে পারেন। কিন্তু সায়নকে খুনি হিসেবে ভাবতে গিয়ে মনে হল কোথাও যেন লুকিয়ে আছে একটা বড় কিন্তু। যে সায়নকে আমি ক বছর এত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি, চিনেছি, জেনেছি, আমিই নিশ্চিন্ত হয়ে ঐন্দ্রিলাকে সমর্পণ করেছি তার হাতে বিয়ের দু'বছরের মধ্যে যে সায়ন কখনও এক মুহূর্তের জন্যও অবহেলা করেনি, ঐন্দ্রিলাকে, তাতে কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি সেই মানুষ এতখানি হিংস্র হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে তার সুন্দরী বউকে। জেল-হাজত থেকে যেদিন সায়ন জামিনে মুক্তি পায়, তার উদ্‌ভ্রান্ত বিধ্বস্ত চেহারা দেখে তখনই বেশ খট্‌কা লেগেছিল। সেদিন তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কদিন পরে তার ফ্ল্যাটে খোঁজ নিতে গিয়ে যে বিপর্যস্ত অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করেছিলাম, আমার মন

বলেছিল, এই মানুষ কখনও তার স্ত্রীকে খুন করতে পারেন না। সে যদি তার নিজের স্ত্রীকে খুনই করে থাকবে, তা হলে মুক্তি পাওয়ার পর কেউ কি এমনভাবে নিজের উপর অত্যাচার করে দিনের পর দিন! তার জীবনে তখন এক অসীম শূন্যতা, এক পরিপূর্ণ অর্থহীনতা।

সমস্ত ঘটনাগুলো পর-পর কয়েকদিন মনের ভেতর নাড়াচাড়া করে মনে হল, এই ঘটনার মধ্যে একটা রহস্য লুকিয়ে আছে কোথাও। আর সে রহস্যের কিনারা করতে হলে সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে হবে নিজেকে। সেই মুহূর্তে পরিস্থিতিও এমন হয়ে পড়েছিল যে, সায়নকে বিয়ে না করে কোনও উপায়ও ছিল না আমার। অতএব এক প্রচণ্ড দুঃসাহস দেখিয়ে নিজের জীবনকে জড়িয়ে ফেললাম, সায়নের জীবনের সঙ্গে। সায়নকে পুলিশের চার্জশিট থেকে বাঁচানোর তাগিদে তো বটেই, সমাজের মুখ চাপা দেওয়ার জন্যও নিশ্চই।

বিয়ের পর আরও গভীরভাবে জানতে পারি সায়নকে। আসলে বলতে কি, কোনও পুরুষকে বাইরে থেকে চেনা, আর স্বামী হিসেবে চেনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। যতটা ভাবতাম, দেখলাম, সায়ন তার চেয়েও সংযমী সুসংবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তার ব্যক্তিত্বও আসাধারণ। কাগজে তাকে জড়িয়ে যে নানারকম নারীঘটিত কেলেঙ্কারির কথা ছাপা হচ্ছিল সেগুলোর সবই যে ভুল, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তা বুঝতেও দেরি হয়নি একবিন্দু।

যে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে শুধু নিজের মেধা, পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফলে তুলে এনেছিল সাফল্যের চূড়ায়, তাতে এত বড় একটা আঘাত এসে পড়ায় সায়ন তখন চূড়ান্ত বির্পযস্ত। সংবাদপত্র আর পুলিশ-রিপোর্টের কল্যাণে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছিল দুর্নামের আড়ালে। একই সঙ্গে তার নিজের, তার পরিবারের, তার প্রতিষ্ঠানের সুনাম ধুলোয় মিশে যেতে থাকায় সে চূর্ণ ছিন্নভিন্ন, বিধ্বস্ত। নিঃশেষিত সায়নের পাশে সেই মুহূর্তে আমি প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে না দাঁড়ালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না, তার প্যারাডাইস প্রোডাক্টসকে তো নয়ই।

পুলিশ তখন সন্দেহ করে চলেছে একমাত্র সায়ন চৌধুরীকেই, তারপর বিয়েটা হয়ে যেতে আমাকেও। ঠিক তখনই আমি ঠিক করেছিলাম, পুলিশের এই ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে হলে তদন্ত করতে হবে তাদের সন্দেহভাজন এই আমাকেই। অন্তত নিজেদের বাঁচার স্বার্থে। মিঃ সান্যাল আমি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই, শখের গোয়েন্দা নই, কিন্তু কোন বিষয়ের গভীরে ঢুকে তাকে তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করা আমার বরাবরের স্বভাব। এক্ষেত্রেও সেভাবে এগিয়ে গিয়েছি। ঘটনার উৎস খুঁজতে । প্রতি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনার চুলচেরা আলোচনা করে বুঝতে চেয়েছি কীভাবে হয়ে গেল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি।

মিঃ সান্যাল, আপনি নিশ্চই স্বীকার করবেন বিষয়টি খুবই জটিল, এক গৃহবধূ তার ফ্ল্যাটের ভেতর গভীর রাতের অন্ধকারে খুন হল যখন সে একা। তাদের ফ্ল্যাটে কেউ তো নেইই, তাদের বাড়ির দারোয়ান মোহন চলে গেছে সন্ধের ঠিক পরেই। পাশের ফ্ল্যাটে হিমন হয়তো ফিরে এসেছে মোহন চলে যাওয়ার পর। চন্দ্রাদেবী আর রবার্ট সন্ধের আগেই গিয়েছিলেন পার্কসার্কাসে এক মিউজিক কনফারেন্সে, যেখানে থাকার কথা ছিল সারা রাত, কিন্তু হঠাৎই ফিরে এসেছিলেন রাত একটায়।

অর্থাৎ সে রাতে ঐন্দ্রিলা খুনের দায় প্রাথমিকভাবে গিয়ে পড়ে হিমন, চন্দ্রাদেবী কিংবা রবার্ট ও নীলের ওপর। ঐন্দ্রিলা আমাকে প্রায়ই বলত, 'জানিস মিতুন, ভদ্রমহিলা ভীষণ ডেঞ্জারাস, বিয়ের পর একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওঁদের ফ্ল্যাটে। কিন্তু সায়ন আমাকে প্রথম দিনই বারণ করে দিয়েছিল ওদের কাছে না যাওয়ার জন্য। আমি না যাওয়ায় ভদ্রমহিলা প্রচণ্ডভাবে খেপে গিয়েছিলেন আমার ওপর। তারপর থেকে আমার দিকে এমন ভাবে

pathagar.net

তাকাতেন যেন পারলে খুনই করে ফেলেন আমাকে। ঐন্দ্রিলার কথাটা তার বারবার মনে পড়ত, কারণ চন্দ্রাদেবী আমার দিকেও তাকাতেন ঠিকই একই দৃষ্টিতে। তা ছাড়া জাফরির ভেতর দিয়েও ফ্ল্যাটের কেউ না কেউ সারাক্ষণ নজরদারি করত আমাকে, কখন হিমন, কখনও চন্দ্রাদেবী, কখনও দীয়া এ বাড়িতে এলে সে-ও। এক-একজন এক এক কারণে বা কৌতূহলে।

মূলত দীয়াই নজরদারি করত বেশি। যখনই সে এ বাড়িতে আসত, লক্ষ করত আমার গতিবিধির, তার পাপকর্মটি আমি বুঝে ফেলেছি কি না। তার চাউনি বরাবরই কেমন ভয়ঙ্কর মনে হত এই নজরদারির সময়। হিমনও তাকাত কখনও কখনও। তারও মনে একধরনের আতঙ্ক কাজ করত এই ভেবে, আমি জেনে ফেলছি কি না সব। আর চন্দ্রাদেবী দেখতেন এক ধরনের কড়া চোখে, হঠাৎ কোত্থেকে এসে জুড়ে বসল এই মেয়েটা।

আমার সামনে হত্যাকাণ্ডের তখন একটাই ক্লু, ঐন্দ্রিলার ঘরের অ্যাশট্রের ভিতর একটি আধপোড়া লেডিজ সিগারেট।

এরপর চন্দ্রাদেবীকে একদিন তাঁর ফ্ল্যাটে সিগারেট খেতে দেখে কেমন যেন খটকা লাগল আমার মনে। কিন্তু প্রশ্ন হল, হত্যার পেছনে চন্দ্রাদেবীর মোটিভ কী? ঘরের বউ তাঁর অধীনে নেই শুধু এই কারণেই? তবে দীয়াকে যেদিন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিলেন ঘরের বাইরে, সেদিন তাঁর হিংস্রমূর্তি দেখে চমকে উঠেছিলাম।

এ ধরনের শাশুড়ি নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে গিয়ে হয়তো ঘরের বউকে খুনও করতে পারেন। তবে অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। হিমন কিংবা রবার্ট কেউ একজন ফ্ল্যাটে যাতায়াত করে এটা মনে হয়েছিল ঐন্দ্রিলার ডায়েরি পড়ে। দুই ক্ষেত্রেই দুই ভিন্ন কারণে চন্দ্রাদেবীর ক্রোধ হওয়াটা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে একজনকে সহযোগী করে চন্দ্রাদেবীর পক্ষে বধূ হত্যা করাটা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না।

হিমন আমার সন্দেহের তালিকায় প্রথম থেকেই ছিল। অমন শরীর-স্বাস্থ্যের এক পূর্ণবয়স্ক যুবক, কিন্তু তার ভাব-ভঙ্গি কেমন মেয়েলি ধরনের, মায়ের কথায় ওঠে বসে, তার বিয়ে করা বউ তার সঙ্গে থাকতে না পেরে পালিয়ে যায়, দেখে মনে হত এ আবার কী ধরনের পুরুষ! তখন এটাও মনে হয়েছিল, এই ধরনের পুরুষরাই মায়ের কথায় খুনও করতে পারে।

সেই সঙ্গে আমার ভারি, রহস্যময় মনে হত ওদের বাড়ির নিত্যসঙ্গী রবার্ট ও নীলকেও। ও নীল নিয়ে বিয়ে করেননি, তাঁর পরিচিতির গণ্ডি ব্যাপক, কলকাতার বিশিষ্ট সব বাড়িতে তাঁর আনাগোনা , বিশেষ করে তাঁর হৃদ্যতা এই সব অভিজাত বাড়ির সুন্দরীদের সঙ্গে। লোকটির এক অসাধারণ ক্ষমতা হল, খুব দ্রুত যে কোনও বয়সি রমণীকে বশ করে ফেলতে পারেন তাঁর সাহেবি চেহারা, চৌখস কথাবার্তা ও অনায়াস অন্তরঙ্গতায়। এই সময় হত্যাকাণ্ডের আর একটি ক্লু হিসেবে আমার হাতে পড়ে যায় ঐন্দ্রিলার একটি ডায়েরি। তার কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে মনে হয়েছিল, রবার্ট ও নীলই মাঝেমধ্যে এসে হাজির হতেন ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে এবং আশ্চর্য সায়নের অনুপস্থিতিতেই। হয়তো তিনি চেষ্টা করতেন, ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, একটা শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করতে। ডায়েরি পড়ে আরও মনে হয়েছিল, পুরুষটি সম্পর্কে ঐন্দ্রিলারও যথেষ্ট কৌতূহল, এক ধরনের সহানুভূতিও, কিন্তু তার এই অবৈধ ইচ্ছেটাকে সযত্নে এড়িয়ে চলেছিল সে। লিখেছিল 'আমি জানি এটা ভাল নয়।' এমনকি আমার বিয়ের পরদিনও রবার্ট হঠাৎ রাতের বেলা এসে হাজির হয়েছিলেন আমার কাছে, অনেক চমৎকার সব মোড়কবন্ধ উপহার দিয়েছিলেন। তারও কিছুদিন পর একদিন লোডশেডিংয়ের সুযোগে পেছন থেকে আমাকে যে পুরুষ জড়িয়ে ধরেছিল, তার মুখে দাড়ির জঙ্গল। ঐন্দ্রিলাকেও একদিন এরকমই একজন

pathagar.net

জড়িয়ে ধরেছিল পেছন থেকে। সব তথ্য প্রমাণ মিলিয়ে আমার মনে হয়, রবার্ট ও'নীল নিজের কামনা চরিতার্থ করতে পারেননি বলেই ভীষণ খেপে উঠেছিলেন ভেতরে ভেতরে, তারপর চন্দ্রাদেবীর ইন্ধন পেতেই সেদিন রাতে। পার্কসার্কাসে মিউজিক কনফারেন্স থেকে তাদের রাত একটায় বাড়ি ফেরাটাই আমার সন্দেহের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল।

কিন্তু পরে ডায়েরিটি আদ্যোপান্ত পড়ার পর বুঝতে পারি, ঐন্দ্রিলা-উল্লেখিত দ্বিতীয় পুরুষটি রবার্ট ও'নীল নয়, হিমন।

ইতিমধ্যে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসে পর পর দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটে যায়, যা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে ধারণা হয়। যে নতুন মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারটির প্রোডাকশন সবে শুরু হয়েছিল, একদিন রাতে তার প্ল্যান্টটি বার্স্ট হয়ে যায় হঠাৎ। প্ল্যান্টটি ছিল বিদেশ থেকে অনা যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি, ফলে তা মেরামত করতে হলে বিদেশ থেকেই স্পেয়ার পার্টস আনতে হবে। সায়ন পরদিনই তার জন্য চিঠি লেখে বিদেশে। আর আশ্চর্য এই যে, সে চিঠিটিও ডেসপ্যাচ হল না এক ভূতুড়ে ফোন আসায়। ডেসপ্যাচের দায়িত্ব ছিল যে ঋষিতা তালুকদার, তাকে ঠিক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ফোন করে বাড়ি চলে যেতে বলা হল, আর শুধু তাই নয়, তাকে রাস্তায় এমনভাবে আহত করা হল যাতে সে সাত দশদিনের মধ্যে আর অফিসে না আসতে পারে।

ঠিক তখনই মনে হল, এ বাড়ির বাইরেও কেউ বা কারা থাকতে পারেন, যাঁরা সায়নের শুভার্থী নন। তাঁরা চাইছেন এই ডিটারজেন্ট পাউডারটি যেন বাজারে না বেরোতে পারে।

এহেন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সায়ন আমাকে প্রায় হাইজ্যাক করে ধরে নিয়ে গিয়ে যুক্ত করে দিয়েছে তার কোম্পানির সঙ্গে। আমি তখন চেষ্টা করে চলেছি, কী করে তার প্রতিষ্ঠানটির শরীরে পুনর্বার রক্ত সঞ্চার করা যায়। জানতাম, প্রতিষ্ঠান বাঁচলে সায়নও বাঁচবে। সেখানে কাজ করতে গিয়ে মনে হল, গোটা ব্যাপারটা আরও জটিল। হঠাৎ সায়নের জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তার অফিসের লোকজন বিভ্রান্ত। তার মধ্যে কোনও কোনও অফিসার বা স্টাফের ব্যবহার বেশ রহস্যময়। কেবলই মনে হচ্ছে, প্ল্যান্ট বার্স্ট করা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটা ডেসপ্যাচ না হওয়াটা পুরোপুরি স্যাবোটেজ।

এ ব্যাপারে প্রথমেই আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ে প্যারাডাইসের প্রোডাকশন ম্যানেজার কৌশিক দত্তের উপর, কৌশিক দত্ত অনেকদিন ধরেই প্রোডাকশনের ব্যাপারে কেমন গা ছাড়া ভাব দেখাচ্ছিলেন। ফ্যাক্টরিতে এত বড় একটা বিস্ফোরণ ঘটার পরও কোনও ভাবান্তর নেই। উপরন্তু শোনা যাচ্ছিল, এখানে চাকরি করে কোনও জব-স্যাটিশফেকশন নেই এই অজুহাতে চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছে। নিজের তৈরি কয়েকটা নতুন ফর্মুলা দিয়ে সাবান তৈরি করার জন্য অনুরোধও জানাচ্ছিলেন সায়নকে। এরই মধ্যে রবার্ট ও নীলের মুখ থেকে জানতে পারলাম, যে রাতে ঐন্দ্রিলা খুন হয়, সে রাতে কেউ ঢুকেছিল সায়নের ল্যাবরেটরি রুমে, সেখানে লণ্ডভণ্ড করেছে তার গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র, কিছু কাগজপত্র খোয়াও গেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লুটি রহস্যের কিনারা করার পক্ষে খুবই প্রয়োজনে লেগেছে পরবর্তী সময়ে।

কিন্তু তখন মনে হয়েছিল, হয়তো কৌশিক দত্তই চেয়েছিলেন মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডারের মূল্যবান ফর্মুলা নষ্ট করে ফেলতে, সে কাজে ব্যর্থ হওয়ার বার্স্ট করিয়ে দিয়েছেন প্ল্যান্ট।

তাঁর সহযোগী হিসেবে মধুমন্তী রায় মজুমদারের নাম মনে হচ্ছিল বারবার। মধুমন্তীর আচার-আচরণ যেন খুবই রহস্যময়। ডিভোর্সি বলে আগে বরাবর বিষণ্ন থাকতেন অফিসে,

pathagar.net

ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর হঠাৎ অতিরিক্ত উচ্ছল হয়ে মেলামেশা করতে শুরু করলেন কৌশিক দত্তের সঙ্গে, এদিকে সায়নের কাছেও অতিরিক্ত প্রগল্‌ভতা দেখাতে শুরু করলেন। সব মিলিয়ে তাঁর পরিবর্তন বেশ চোখে পড়ার মতো।

ঠিক এ সময়ে খাটের নিচে একটা বেগুনি পাথর খুঁজে পাওয়ার মধুমন্তীর উপর আমার সন্দেহ তীব্র হয়ে দেখা দিল। প্রথমত, তাঁর সঙ্গে কৌশিক দত্তের ঘনিষ্ঠতা, দ্বিতীয়ত, তাঁর সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস, তৃতীয়ত, তাঁর কানের দুলে বেগুনি রঙের পাথর। কৌশিক দত্ত প্যারাডাইস ছেড়ে লাইম ইণ্ডিয়ায় চলে যেতে সে সন্দেহ দৃঢ় হল আরও। একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল, যদি প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ক্ষতি করা যায়, তাহলে সবচেয়ে লাইম ইণ্ডিয়ার।

লাইম ইণ্ডিয়া তখন সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে, যাতে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের গুডউইল আর ফিরে না আসে। লাইম ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় তখন পাগলের মতো চেষ্টা করছেন, যাতে সায়ন চৌধুরীর জীবনের দুর্ঘটনাকে জড়িয়ে দেওয়া যায় প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের গুডউইলের সঙ্গে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাঁর সে চেষ্টা করলেন। কাগজের রিপোর্টারিদের নানান তথ্য জোগান দিয়ে মিথ্যে গল্পও ছাপালেন অনেক। তাঁদের সে প্রচেষ্টা সফলও হল আংশিকভাবে। প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের সেল ফল করে গেল হু-হু করে।

সে সময় দুটো সম্ভাবনার কথা মনে হল। এক, হয় কৌশিক দত্তই লাইম ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যোগসাজশ করে ডোবাতে চাইছেন সায়ন চৌধুরীকে। দুই, লাইম ইণ্ডিয়াই চাইছে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস ধ্বংস হয়ে যাক, তা যে-কোনও ভাবেই হোক।

প্রথমে শুরু করলাম, কৌশিক দত্ত আর মধুমন্তী রায় মজুমদারের ওপর নজরদারি। কাজে ছলছুতোয় তাদের চেম্বারে ঢুকে পড়তে লাগলাম সময়ে-অসময়ে। বুঝতে পারলাম কৌশিক দত্ত এই কোম্পানিতে খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড, আর তার ওপর সহানুভূতির ঢেউ গিয়ে পড়েছে ডিভোর্সি মধুমন্তী। প্রায়শই এক ঘরে সিগারেট খেতে খেতে দুজনে কী যেন ফিসফিস করে সারাক্ষণ। মধুমন্তী সায়নেরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইছিল বোধহয় এই কারণে যে, সায়ন তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা কতখানি বুঝতে পারছে তা যাচাই করতেই।

আমার তখন দ্বিতীয় ভাবনা, লাইম ইণ্ডিয়ার কেউ সায়নের বিরুদ্ধে এতসব চক্রান্ত করে চলেছে কি না। এ কথা ঠিক, কয়েক বছরের মধ্যেই প্যারাডাইস প্রোডাক্টস উঠে গিয়েছিল সাফল্যের চূড়ায়। তার ফলে বহুদিনের পুরানো প্রতিষ্ঠান লাইম ইণ্ডিয়ার তখন নাভিশ্বাস উঠেছে। লাইম ইণ্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ বহু চেষ্টা করেও যেমন ব্যর্থ হলেন প্যারাডাইসের উন্নতি ঠেকাতে, তেমনই অপরাগ হলেন নিজেদের কোম্পানির পতন রোধ করতে। তাতে কোম্পানির চেয়ারম্যান উত্তরোত্তর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে লাগলেন তাঁর অফিসারদের উপর। যে-কোনও অফিসারকে যখন তখন ধরিয়ে দিতে পারেন ডিসচার্জ লেটার। অতএব লাইম ইণ্ডিয়ার কেউ নিশ্চই—

লাইম ইণ্ডিয়া সে সময় যে মারাত্মক বিজ্ঞাপনগুলো কাগজে প্রকাশ করে চলেছিল প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের বিরুদ্ধে, সেগুলো হঠাৎ চমক লাগিয়ে দেয় আমাকে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, লাইম ইণ্ডিয়ার বিজ্ঞাপন দফতর দেখাশুনো করেন যে রৌণক মুখার্জি, তিনি একসময় ঐন্দ্রিলাকে ফরাসি ভাষা শেখাতেন, ঐন্দ্রিলা প্রেমেও পড়েছিল তাঁর এমন কি বিয়ের পরও তাঁর সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ রেখে চলেছিল। ঐন্দ্রিলার ডায়েরিতে লেখা আছে, তিনি ঐন্দ্রিলার কাছে এসেছিলেন এক বর্ষণমুখর দুপুরে। শুধু তাই নয়, ঐন্দ্রিলা তাঁর কাছে সমর্পণ করেছিল নিজেকে। সেই রৌণক মুখার্জি ঘটনাক্রমে এসে হাজির হয়েছিলেন পাঁচই এপ্রিল

সন্ধের কিছুটা পর ঐন্দ্রিলার কাছে, তারই ফোন পেয়ে। আষাঢের সেই তৃতীয় দিবসে এক দুরন্ত ভালবাসার পর দুজনের মধ্যে কী টানাপোড়েন হয়েছিল তা জানতে পারিনি, কিন্তু তাদের সেই অবৈধ প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতিতে এহেন কোনও হত্যাকাণ্ড হওয়া সম্ভব কি না, সেটা আমার ভাবনায় ছিল। ঐন্দ্রিলার ডায়েরি পড়ে বুঝতে পারি, সায়নের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় একটুও অসুখী হয়নি সে, বস্তুত সায়নের মতো পুরুষের স্ত্রী হওয়াটা তার কাছে গৌরবের ঘটনাই ছিল, তবু মেয়েরা তাদের জীবনের প্রথম প্রেম বোধহয় সারা জীবন মনে রাখে। সেই ভালবাসার স্মৃতি তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় সারাটা জীবন, তবে আরও সে অস্থির হয়ে পড়েছিল রৌণকের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায়। রৌণক যে তাকে ভাল না বেসে ঋতবৃতাকে নিয়ে সুখী হয়েছিল তা ঐন্দ্রিলা তার বিয়ের পরও ভুলতে পারেনি। ডায়েরিটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল, হয়তো এমনও হতে পারে রৌণককে বাধ্য হতে হয়েছিল ঐন্দ্রিলাকে সরিয়ে ফেলতে। হয়তো ঐন্দ্রিলা তার উপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, রৌণক তার পারিবারিক জীবন যাতে ব্যাহত না হয় সে জন্যই খুন করে ঐন্দ্রিলাকে। তা ছাড়া, সে রাতে সায়নের অনুপস্থিতিতে একমাত্র রৌণকের পক্ষেই সম্ভব ছিল ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে ঢোকা।

রৌণক ছাড়া লাইম ইণ্ডিয়ার আর একজন লোক—তাদের সুপারভাইজার লোটন আমার সন্দেহের তালিকায় হঠাৎ ঢুকে এল যেদিন জানলাম সে প্রায়ই চলে আসে প্যারাডাইসের অফিসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে কালীজীবনবাবুর পাশে। বিশেষ করে যেদিন প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে প্ল্যান্ট বার্স্ট করে সেদিন লোটন কালীজীবনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে রাতে টেলিফোন করতে গিয়েছিল ফ্যাক্টরিতে, তখন মনে হল লোটনের ভূমিকাই এই রহস্যের কিনারার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লু।

কিন্তু পরে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল লোটনের খুন হয়ে যাওয়াটা। মিঃ সান্যাল, আপনি যে বলেছিলেন, এর পেছনে সায়ন চৌধুরীর হাত আছে, সেই বিষয়টি আমার রক্তকে হঠাৎ নীল করে দিয়ে গেল। আমার অজান্তেই সায়নের ওপর দ্বিতীয়বার সন্দেহ পড়ল সেদিন। হঠাৎই মনে হল, কী ব্যাপার, সায়ন এত বড় একটা ঘটনা আমাকে গোপন করে এত ভোরে উঠে ফ্যাক্টরিতে চলে গেল কেন? আর গেলই যদি ফিরে এল দারুণ ঝড় বিধ্বস্ত অবস্থায়। আরও আশ্চর্য এই যে, যারা ঘেরাও করেছিল, তাদের চাপে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং লোটনের ভাইকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এল। ব্যাপারটা আমাকে অবাক করল এই জন্যে যে, নিরপরাধ লোক পুলিশের উপস্থিতিতে শুধু খুনের মামলায় জড়াবার ভয়ে এতগুলো টাকা দিতে রাজি হয়ে গেল। তা হলে কি লোটনের খুনের ব্যাপারে তার কোনও ভূমিকা আছে! এই সময় একদিন সায়ন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, শখের গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে গার্গী। কথাটা কেন যেন ভাল লাগল না আমার। হঠাৎ মনে হল, পর-পর এমন সব প্রমাণ হাতে আসছে, যাতে সন্দেহের তির ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে সায়নের দিকেই। সায়ন ধরা পড়ে যাবে এই ভয়েই কি আমার এই গোয়েন্দাগিরি পছন্দ করছে না! তারপর আরও ভয় পেয়ে গেলাম সেদিন রৌণক মুখার্জির কথায়। রৌণক পাঁচই এপ্রিল সন্ধের পর ব্লু-ওয়াণ্ডারের গেটে এসে দেখেছিলেন, তাঁর ঠিক আগেই একজন পুরুষ উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে, ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটেই গিয়ে বেল বাজালেন, ঐন্দ্রিলা দরজা খুলতেই তার কাছে কিছু একটা অনুনয় বিনয় করে বলল , কিন্তু ঐন্দ্রিলা ফিরিয়ে দিতে চাইছিল, তাকে, আবার একটু পরেই তাকে নিয়ে ঢুকে গেল ফ্ল্যাটের ভেতর। নিশ্চই দেরি করে ফিরেছে বলেই ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল সায়নের। পরে সেই ঝগড়ার পরিণতিতেই—

রৌণক তাঁর মুখে দাড়ি দেখেছিলেন, কিন্তু কী রঙের দাড়ি, সোনালি না ধূসর সিঁড়ির ওপরটা অন্ধকার ছিল বলে বলতে পারেননি।

সোনালি হলে হিমন, ধূসর হলে রবার্ট। কিন্তু পরে মনে হল, যদি অন্ধকারে রৌণক ভুল দেখে থাকেন। হয়তো লোকটার মুখে আদৌ দাড়ি ছিল না, অন্ধকারের ছায়া পড়ে ওরকম মনে হয়েছিল তাঁর। তা হলে হয়তো সায়নই—

সত্যি বলতে কি, মিঃ সান্যাল, তারপর কয়েকদিন সায়নের পাশে শুয়েও চোখে ঘুম আসেনি আমার। মনে হল, আপনি যা সন্দেহ করেছেন হয়তো সবটাই ঠিক। আলো বোসের বলা সমস্ত কাহিনীই আসলে বানানো গল্প। হয়তো হিমনের অর্ন্তধান, লোটন-খুন এমনকি প্ল্যান্ট বার্স্ট করানো, চিঠি ডেসপ্যাচ না হওয়া, সবই ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছে সায়ন। হয়তো শেষ মুহূর্তে সে জানতে পেরে গিয়েছিল, রৌণকের সঙ্গে ঐন্দ্রিলার অবৈধ সম্পর্কের কথা। তাই ঈর্ষায় ক্রোধে অন্ধ হয়ে—

যাই হোক, একদিন ফ্রট্রুসের গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার একটা স্পেশ্যাল বাস ধরে ফিরছিলাম বাড়ির দিকে বাসে হিমনকে দেখতে পাওয়াটাই এই রহস্যের জট খোলার প্রথম টার্নিং পয়েন্ট। মনে হল হিমন গোটা বিষয় জানলেও জানতে পারে। তার পিছু পিছু অনুসরণ করে গিয়ে পৌঁছালাম পার্ক স্ট্রিটের সেই রেস্তোরাঁ দি আইডিয়াল নেস্ট-এ'। তার ভেতরে ঢুকে আবিষ্কার করলাম পৃথিবীর নবম আশ্চর্য, সেই নর্তকি মিস লিজাকে। কিছুক্ষণ তাকে খুঁটিয়ে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, আরে, এ তো আমাদের দীয়ার মতোই দেখতে , দীয়াই নাচে নাকি এভাবে ছদ্মবেশে, নাম বদলে।

তখনও ভাবতে পারিনি, যে দীয়া ব্লু ওয়াণ্ডারে আসে বিষণ্ণতার প্রতীক হয়ে, সে আসলে ভয়ঙ্কর আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের একজন মক্ষিরানি। দীয়াকে অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু এভাবে তাকে আবিষ্কার করতেই আমার তদন্তের ধারাই বদলে গেল। জানতে পেরেছিলাম, তার একজন পুরুষসঙ্গী আছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল দীয়া ও তার পুরুষ,-সহচর কীভাবে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছিল এতসব, ঘটনা ও দুর্ঘটনার। সেই কাহিনীই এবার চলি—

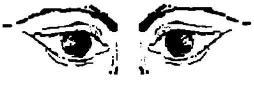

সায়ন চৌধুরীর ফ্ল্যাটের বিশাল ড্রয়িংরুমে বসে গার্গী প্রায় পাকা গোয়েন্দার মতো বলে চলেছিল তার এ কদিনের শিহরন জাগানো অভিজ্ঞতা। বাইরে কলকাতায় তখন রাত্রির শেষ প্রহর, চারপাশে ঘুরঘুট্টি নিশুতি। ঘরের ভেতর দেবাদ্রি সান্যাল ও তাঁর পুলিশবাহিনী অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছেন গার্গীর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও উপসংহার পৌঁছানোর পর্যায়গুলি।

—আসলে মিঃ সান্যাল, প্রথম থেকেই হিমনকে আমার কেন যেন সন্দেহ হত, মনে হয়েছিল এই জটিল রহস্যের ভেতর এক জটিলতার চরিত্র। অশৈশব তার মা চন্দ্রাদেবী তার উপর এমনভাবে ডমিনেট করে এসেছেন যে, একেবারেই পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল হিমনের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব। তার উপস্থিতিকে পাত্তা না দিয়ে, তার সঙ্গে সব সময় ধমক দিয়ে কথা বলে, তার উপর সারাক্ষণ আদেশ চাপিয়ে দিয়ে কখনওই তাকে পূর্ণ মানুষ বলে ভাবতে দেওয়া হয়নি। বাইরের মানুষ দেখলেই তাই ভয়ে কুঁকড়ে থাকে সে। কারও মুখোমুখি হলেই চেষ্টা

pathagar.net

করে পিছু হঠে পালিয়ে যাওয়ার। তার চাউনি, ব্যবহার , জীবনযাপন সবই কেমন অস্বাভাবিক, অথর্বের মতো। এহেন প্রায়-পঙ্গু যুবকের সঙ্গে দীয়ার বিয়ে হল কী করে সেই প্রশ্নটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল ক্রমশ।

প্রথম দিকে দীয়া সম্পর্কে আমার মনে ছিল এক প্রবল সহানুভূতি। হিমনকে নিয়ে যা যা বলেছিল, ওসব শোনার পর মনে হয়েছিল সত্যিই দুর্ভাগ্য বেচারির, নইলে এরকম স্মার্ট, সুন্দরী মেয়ের এরকম পঙ্গু স্বামী হয়! একদিন শুনলাম, ডিভোর্সের নোটিস পাঠিয়েছি দীয়া। মনে মনে ভেবেছিলাম, ঠিকই করেছে, না করেই বা উপায় কী তার। কিন্তু তার পরেও লক্ষ করি, এ বাড়িতে সে প্রায়ই আসে, দিনের বেলা অনেকখানি করে সময় কাটায়, কিন্তু রাতে কখনওই থাকে না, বিকেল বা সন্ধের পরই চলে যায়। দীয়া আমাকে বলেছিল, রাতের বেলা এ বাড়িতে থাকা যায় না, তার ভয় করে। কিন্তু আমার মনে তখন একটাই প্রশ্ন, ডিভোর্সের নোটিসই যদি দিয়ে থাকবে, তাহলে এ বাড়িতে তার এত যাওয়া-আসা করার কী দরকার! এ নয় সে হিমনের টানে সে এ বাড়িতে আসে, অন্য কোনও আর্কষণও তার নেই, এখানে, চন্দ্রাদেবীর জন্য আসার কথা তো ভাবাই যায় না। তাহলে!

তখন থেকেই আমার সন্দেহ দীয়ার উপর। এ বাড়িতে দুঃখী দুঃখী মুখ করে থাকে, ওটাই ছিল তার ছদ্মবেশ। অতএব আমি সহানুভূতি দেখানোর ছুতোয় তার সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হওযার চেষ্টা করি। গাড়িতে লিফট দেওয়ার ভান করে একদিন প্রায় জোর করেই গেলাম ওর বাড়িতে। দেখলাম, তার জীবনযাপন একেবারে অন্য ধরনের। তার বাড়িতে অন্য পুরুষের যাওয়া আসা। তার অ্যাশট্রের ভেতর ছাই, আধপোড়া সিগারেটের টুকরো। তাহলে নিশ্চই কেউ আসে তার ঘরে। কিন্তু কে আসে। হঠাৎ একলহমা মনে হল, আচ্ছা, দীয়া নিজেও সিগারেট খায় না তো!

সঙ্গে সঙ্গে দীয়া সম্পর্কে আরও তন্ন তন্ন খোঁজ নিতে শুরু করি। তার জীবন-যাপন, যাওয়া -আসা, রাত্রিবাস—এইসব। আর সুযোগও ঘটে গেল আচমকা। মিন্টোপার্কের কাছে তার সঙ্গে একজন পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি একদিন বিকেলে। দুজনে কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ করে একসঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতেই তাদের পিছু পিছু অনুসরণ করে গেলাম বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এক রেস্তোরাঁয়। সেখানে তাদের কথাবার্তার ধরনে, আলোচনার বিষয়বস্তুতে আমি আশ্চর্য স্তম্ভিত।

ঠিক এর পরে হিমনের সঙ্গে বাসে দেখা হতে তাকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেলাম, 'দি আইডিয়াল নেস্ট' -এ। সেটা আসলে একটা নাইট ক্লাবই।

চরম ঝুঁকি নিয়েছিলাম, সেদিন হয়তো খুনই হয়ে যেতে হত সেখানে, নেহাত কপালজোরে বেঁচে ফিরেছিলাম। সেখানেই দেখে ফেললাম মিস লিজাকে। তাহলে দীয়াই রোজ সন্ধের পর এই বারে নাচে। এরকম অশ্লীল ভঙ্গিতে। অনেক রাত পর্যন্ত তাকে কাটাতে হয় এখানে। সেজন্যই রোজ সন্ধ্যের আগেই তাকে বেরিয়ে আসতে হয় ব্লু-ওয়াণ্ডার থেকে।

সেদিন সন্ধেয় মিস লিজার গলায় পপসঙ শুনে আমার আর একদফা চমকে ওঠার পালা। যে পপ-সঙ রবার্ট ও'নীল গেয়ে থাকেন, সে-গান হঠাৎ মিস লিজার গলায় কেন। খোঁজখবর নিয়ে জেনে ফেললাম, হিমনের সঙ্গে দীয়ার বিবাহের পূর্ব ইতিহাস। দীয়া তার কৈশোরে পপ সঙের তালিম নিত রবার্ট ও'নীলের কাছে। দু' চারটে ফাংশনে পপসঙ গেয়ে হাততালিও কুড়িয়েছিল তখন। তেমন অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে ছিল না দীয়া। কিন্তু হাই সোসাইটিতে তার কিছু বন্ধুবান্ধব থাকায় সে দ্রুত পরিচিত হয়ে উঠতে চাইছিল একজন মডগার্ল হিসেবে।

ঠিক সে সময় চন্দ্রাদেবী রবার্টের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন হিমনের জন্য একটা ভাল পাত্রী খুঁজে দিতে। হিমনের ব্যাপারে রবার্টেরও ছিল এক অন্য দুর্বলতা । তিনিও চাইছিলেন হিমনকে সমাজে যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠা দিতে। অতএব দীয়ার কথাই সেই মুহূর্তে মনে পড়ল তাঁর। ব্লু ওয়াণ্ডারের খ্যাতি, চন্দ্রাদেবীর ব্যাপক পরিচিতি, সেই সঙ্গে হিমনের দাদা সায়নের মেধা ও প্রতিষ্ঠা দেখে দীয়া ধারণা করেছিল, হিমনও নিশ্চয় পাত্র হিসেবে তার উপযুক্তই হবে। সব মডগার্লদের মতো দীয়ারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অপরিসীম। তার স্বামী হলে সোসাইটির গণ্যমান্য কেউ, তার শ্বশুরকুল হবে অভিজাত, অর্থের কোনও অভাব থাকবে না তাদের। সেই সঙ্গে গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদির যাবতীয় স্ট্যাট্যাস সহ ঈর্ষণীয় হয়ে উঠবে সমাজের অন্য পরিবারের চোখে। কিন্তু বিয়ের পরই দীয়া বুঝতে পারল, তার জীবনের চরম ভুলটি সংঘটিত হয়ে গেছে সামান্য অসাবধানতায়। হিমন ব্যক্তিত্বহীন, নির্জীব পুরুষ, মায়ের কথায় ওঠে বসে, নিজস্ব কোনও বক্তব্যও নেই বাড়িতে। এহেন স্বামীর সঙ্গে একদণ্ডও বাস করা যায় না।

ক্রমেই দীয়ার মনে জড়ো হল এক চরম ফ্রাস্ট্রেশন। পাশের ফ্ল্যাটে আর এক বউ ঐন্দ্রিলা পরমাসুন্দরী, তার স্বামী কলকাতার সফলতম যুবকদের অন্যতম, তার ফ্যাক্টরি তখন ফ্লারিশ করছে হু হু করে, তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতায়, কলকাতা থেকে সারা রাজ্যে, রাজ্যের বাইরেও, তার ঘরে ঐন্দ্রিলা বাস করে রাজেন্দ্রাণীর মতো!

সেই ঐন্দ্রিলার পাশে দীয়ার ভূমিকা প্রায় নিতান্ত ভিখারির। সে রিক্ত, নিঃস্ব, কপর্দকহীন। হিমন একটা সংস্থায় চাকরি করে বটে, কিন্তু তার মাইনের সবটাই তুলে দিতে হয় তার মা চন্দ্রাদেবীর হাতে। চন্দ্রাদেবী প্রতিদিন হিসেব করে পথ-খরচা দেন হিমনকে, যাকে হিমন কোনওরম বাজে খরচ না করতে পারে। ফলে দীয়ার অবস্থা তখন করুণা করার মতো। ইচ্ছেমতো টাকা ওড়ানোর কথা তো দূরের ব্যাপার, হিমনের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেও মায়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে, টাকা দেয়ে নিয়ে তবে যেতে হয়।

সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে দীয়া প্রায় উন্মাদ হয়ে গেল। তার তখন একটাই ভাবনা, এই পরিবেশ থেকে কী ভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের বাড়িতে ফিরে গেলে সেটা যেমন হাস্যকর হবে তেমনি তার সম্মানের পক্ষে অবমাননাকর। অতএব সে চাকরির সন্ধানে বেরোতে শুরু করল, রোজ। আর পেলও, তবে ভদ্রস্থ কোনও চাকরি নয়, ‘বেল ক্লাবে’ পপ সঙ গায়িকার কাজ। নাচও জানত দীয়া, ফলে প্রতিদিন সন্ধের পর জনমনোরঞ্জনের কাজে ব্যস্ত হতে তাকে। তার তখন প্রচুর টাকা চাই। আর টাকার সন্ধান পেল সে, আচমকা এইসব নাইট-ক্লাবে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের মাফিয়ারা যাতায়াত করে নিয়মিত, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল দীয়ার। টাকায় খিদেয় সে জড়িত হয়ে পড়ল ড্রাগ চোরাচালানিদের সঙ্গেও। তাতে অনেক টাকাও জমিয়ে ফেলল দ্রুত, কিন্তু সোসাইটিতে স্ট্যাটাসের কোনও উন্নতি হল না। সেও ঐন্দ্রিলার মতো কোনও সফল পুরুষের ঘরনি হতে চায়।

এমন একটি মুহূর্তে তার সঙ্গে একদিন ‘বেল ক্লাবে’ দেখা হয়ে গেল রাহুল রায়ের। টেবিলে তখন ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে মিস বেবির নাচ দেখছিল রাহুল রায় হঠাৎ মনে হল, মেয়েটি তার চেনা। নাচ শেষে হতে দীয়ার সঙ্গে পুনর্মিলন হল রাহুল রায়ের। অনেককাল আগে তারা পরস্পর পরিচিত ছিল, হয়তো কিছুটা ঘনিষ্ঠও, তারপর মাঝে বহুকাল দেখা হয়নি, হঠাৎ আবার দেখা হতে দীয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

রাহুল রায় তখন খুবই ঝামেলার মধ্যে আছে লাইম ইণ্ডিয়ায়। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টস তখন নতুন নতুন সাবান তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে গৃহস্থকে, তার

পাশে লাইম ইণ্ডিয়ার কোনও প্রোডাক্টই দাঁড়াতে পারছে না। চেয়ারম্যান হেমজ্যোতি সিংহরায় কাজের মানুষ, হি মিনস বিজনেস, রোজই রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন রাহুল রায়কে, বলছেন, কী মশাই, আমেরিকা কানাডার ডিগ্রি নিয়ে কী সব ভুসিমাল প্রোডাকশন করছেন ফ্যাক্টরিতে।

আসলে খবর নিয়ে জেনেছি রাহুল রায় একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট মাত্র। প্রথম জীবনে চাকরি শুরু করেছিলেন একটি ছোট্ট সাবান কোম্পানিতে। সেখানে কাজ করতে করতে একদিন সংবাদপত্রের এ্কটি বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, লাইম ইণ্ডিয়া নামের এক কোম্পানিতে প্রোডাকশন ম্যানেজার চাই। বিজ্ঞাপনটি দেখে ভুরুতে কোঁচ পড়ল রাহুল রায়ের। তিনি ততদিনে এখানে-ওখানে ঘোরাঘুরি করে জোগাড় করে ফেলেছেন কয়েকটি জাল সার্টিফিকেট। তার মধ্যে আমেরিকা, কানাডার সার্টিফিকেটও। কলকাতায় বসে এ ধরনের সার্টিফিকেট জোগাড় করাও আজকাল কোনও বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কিছু ভুয়ো প্রতিষ্ঠানকে টাকা পয়সা দিলে তারা সবই এনে দেবে অল্প কমাসের মধ্যেই। এমনই কিছু ভুয়ো সার্টিফিকেটের বিনিময়ে রাহুল রায় জোগাড় করে ফেললেন লাইম ইণ্ডিয়ার প্রোডাকশন ম্যানেজারের পদ। লাইম ইণ্ডিয়া তখন তাদের প্রাক্তন ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রাণকৃষ্ণ বটব্যালের চেষ্টায় কিছু সুনাম অর্জন করেছে। তাদের প্রোডাকশনের বিক্রিও বেশ। কিন্তু রাহুল রায় এসে সেই সুনাম বজায় রাখতে পারলেন না, উপরন্তু নতুন প্রোডাকশনের সেল পড়ে যেতে লাগল দিন দিন।

তার ওপর কলকাতার এক নতুন কনসার্ন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের আকস্মিক উত্থানে রাহুল রায়ের অবস্থা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ল। তখন যে কোনও মুহূর্তেই চাকরি যাবে তাঁর। চাকরি গেলে তাঁর সংসারে একেবারে অকূল পাথারে।

ঠিক এরকম মুহূর্তে বেল ক্লাবে দীয়ার সঙ্গে দেখা হতেই রাহুল রায় খুঁজে পেলেন খড়-কুটো। দ্রুত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হল দুজনের মধ্যে। দুজনেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু একজনের চাকরি তখন টলমল, অন্যজনের স্বামী পঙ্গু, অকর্মণ্য, অপদার্থ।

দীয়ারও মনে হল, রাহুল রায়ের মাধ্যমেই সে পূরণ করতে পারবে তার অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে-ই তখন রাহুল রায়কে বোঝাল, তারাও তো সায়ন চৌধুরীর মতো নতুন একটা কোম্পানি খুলতে পারে। রাহুল রায়ও তা-ই চাইল, কিন্তু ব্যাবসা শুরু করার প্রথম অন্তরায় ছিল টাকা, দ্বিতীয় বাধা তার তৈরি নিম্নমানের প্রোডাক্ট।

দীয়ার হাতে তখন টাকার অভাব নেই। কিন্তু ভাল প্রোডাক্ট তৈরির কাজে সে আর কীভাবে সাহায্য করবে। অতএব লাইম ইণ্ডিয়ায় থাকাকালীন যে সমস্যা ছিল রাহুল রায়ের, নতুন কোম্পানি খুললেও তা দূর হবে না। নিজের মেধার দৌড় কতদূর তা জানাই ছিল তার। কিন্তু এতদিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, অন্যের তৈরি উপযুক্ত ফর্মুলা পেলে ভাল প্রোডাক্ট তৈরি করার এলেম আছে তার। ঠিক সেই সময় সায়ন চৌধুরী তার নিজস্ব ফর্মুলায় মাইক্রোসিস্টেম ডিটারজেন্ট পাউডার তৈরি করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। রাহুল রায় জানত এই ফর্মুলাটির অভিনবত্ব। একবার এই প্রোডাক্ট বাজারে ফেললে তা হু হু করে ধরে নেবে অল ইণ্ডিয়া মার্কেট। অতএব রাহুল রায় দীয়াকে জানাল, এই ফর্মুলাটি যদি সে জোগাড় করে দিতে পারে, একমাত্র তাহলেই তাদের কোম্পানি দাঁড়িয়ে যাবে রাতারাতি।

দীয়া বলল, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এ ব্যাপারে।

অতএব হিমনের সঙ্গে বনিবনা না হলেও ব্লু ওয়াণ্ডার ত্যাগ করে চলে আসতে পারল না দীয়া। এদিকে বেল ক্লাবের ডিউটিতে তাকে হাজির দিতে হয় সন্ধের মধ্যে, সেখানে প্রায়ই

pathagar.net

এত রাত হয়ে যায় যে, অত রাতে ব্লু ওয়াণ্ডারে ফেরাটা লোকচক্ষে বেমানান। বাধ্য হয়েই তাকে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিতে হল যাদবপুরে। রাহুল রায় প্রায়ই আসে সেখানে, হয়তো রাতও কাটায় কখনও কখনও।

দীয়া তখন দিনের বেলায় ব্লু ওয়াণ্ডারে এসে ভাব পাতাতে শুরু করেছে ঐন্দ্রিলার সঙ্গে। তার দুঃখের কাহিনী শোনার ইনিয়ে-বিনিয়ে যাতে ঐন্দ্রিলার সহানুভূতি আদায় করতে পারে। তারই মধ্যে চেষ্টা করে, কী করে সায়নের ল্যাবরেটরি রুমে ঢোকা যায়। ভেবেছিল, ঐন্দ্রিলার সারল্যের সুযোগ নিয়ে একদিন চুরি করে নিয়ে আসবে সায়নের গবেষণার কাগজপত্র। কিন্তু ঐন্দ্রিলা নিজেও কখনও সায়নের ল্যাবরেটরিতে ঢোকেনি। সায়ন বার বার সাবধান করত, দেখো কোনও কাগজপত্র যেন খোয়া না যায়, এই ল্যাবরেটরির মধ্যেই রয়েছে প্যারাডাইসের প্রাণ-ভোমরা। ফলে ঐন্দ্রিলা এড়িয়ে যেতে লাগল দীয়ার অনুরোধ। তাতে দীয়া প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ হল তার ফর্মুলা সংগ্রহের অভিযানে।

ওদিকে লাইম ইণ্ডিয়ার রাহুল রায় যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, ততই দীয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করল ফর্মুলার জন্যে। এর মধ্যে বিরাট অঙ্কের টাকা দিয়ে তার ইস্টার্ন বাইপাসের পাশে কিনে ফেলেছে ফ্যাক্টরি তৈরির জমিও। জমি কেনার ফলে তাদের আকাঙ্ক্ষা তখন আকাশচুম্বী।

দীয়ার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি হওয়াতে সে বাধ্য হয়ে ঠিক করল, যে করেই হোক, ফর্মুলাগুলো নিয়ে আসতে হবে সায়নের ল্যাবরেটরি থেকে। অতএব সে সুযোগ খুঁজতে শুরু করল সায়নের অনুপস্থিতির।

পাঁচই এপ্রিল দুপুরে সে হঠাৎ ব্লু-ওয়াণ্ডারে এসে জানতে পারল, সেদিন ভোরে সায়নের ফেরার কথা থাকলেও ফিরতে পারেনি। ঐন্দ্রিলা তখন পর পর দুরাত একলা থেকে একেবারে অধৈর্য। দীয়ার মনে হল, এই তো সুযোগ ঐন্দ্রিলাকে জানাল, সায়ন যদি রাতে না ফেরে তাহলে সে ঐন্দ্রিলার কাছে থাকবে। ঐন্দ্রিলা সরল বিশ্বাসে দীয়াকে থাকতে দিয়েছিল তার কাছে। তারপর সেই ঘটনাটিই ঘটেছিল যা গতকাল আমার ঘরেও ঘটেছে। মাঝরাতে খুটখাট শব্দ শুনে ঐন্দ্রিলার ঘুম ভেঙে যায়। দীয়া তখন ল্যাবরেটরি রুমের দরজা খুলে ভেতর থেকে টেনে বার করছিল গবেষণার কাগজপত্র। তাতে ঐন্দ্রিলাও বাধা দিয়েছিল তৎক্ষণাৎ। শুধু একটাই পার্থক্য, ঐন্দ্রিলা গার্গী নয়। সে নরম স্বভাবের মেয়ে। বেপরোয়া দীয়ার কাছে সে রাতে কিছুতেই পেরে ওঠেনি, পারা সম্ভবও নয় কারণ সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না এরকম ভয়াবহ কোনও অঘটনের জন্য। ফলে কিছু প্রতিরোধ গড়ে তোলার পর তাকে খুন হতে হয়। দীয়াও অবশ্য ভাবতে পারেনি এতদূর যেতে হবে তাকে। কিন্তু তার এই ভয়ঙ্কর উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করা ছাড়াও উপায়ও ছিল না তার। গলা টিপে মেরে ফেলার পর সে ভীষণ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল সহসা। অন্তত ঐন্দ্রিলার গলায় তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রমাণিত হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নেয়, ঐন্দ্রিলার মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলবে।

কিন্তু এত ঘটনার মধ্যে আসল উদ্দেশ্যটি সফল হয়নি দীয়ার। ঐন্দ্রিলাকে হত্যার পর তাড়াহুড়োয় যে কাগজগুলো ল্যাবরেটরি রুম থেকে সে বার করে নিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো সায়নের গবেষণার কিছু বাতিল লেখাজোখা, তা রাহুল রায়ের কোনও কাজেই লাগেনি। রাহুল রায় সে রাতেও বাড়ির বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছিল দীয়ার জন্য। আচমকা এলেন বীভৎস ঘটনা ঘটে যেতে সে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা বিকৃত কণ্ঠস্বর ফোনে জানিয়ে দেয় থানায়, বলে সায়ন চৌধুরীই ঐন্দ্রিলাকে হত্যা করে পালিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত সায়ন তার একটু পরেই ট্যুর

pathagar.net

থেকে ফিরে এসে হাজির হয়েছিল বাড়িতে। তাতে পুলিশের সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় তার উপর, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতারও করে।

কিন্তু হত্যাকারী একটি ক্লু রেখে গেল পালিয়ে যাওয়ার আগে। ঐন্দ্রিলার সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় দীয়ার কানের দুল থেকে ছিটকে পড়েছিল একটি বেগুনি রঙের পাথর।

আশ্চর্যের কথা এই যে, সে রাতে ঐন্দ্রিলা একাই ছিল তার ফ্ল্যাটে। তাকে খুন করে পুড়িয়ে হত্যাকারী পালিয়ে গেলে কারও সাধ্য নেই হ্যতাকারীকে খুঁজে বার করা। কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ তো নেইই, ক্লুও থাকার কথা নয়, তবু হত্যা এমনই একটি অপরাধ যেখানে কোন না কোনও প্রমাণ থেকেই যায়। হয়তো তাইই সেই বেগুনি পাথরটিকে কেন্দ্র করে আমাকে শুরু করতে হয় ঐন্দ্রিলা হত্যার তদন্ত, আর কী অদ্ভুত , তারপর সামনে এসে গেল আরও অনেকগুলো ক্লু।

দীয়াকে দ্বিতীয় দিন যখন আমার গাড়িতে তুলেছিলাম লিফ্‌ট দিতে, বাড়িতে না ফিরে সে নেমে গিয়েছিল রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের একটি দোকানের সামনে। তাকে নামিয়ে দেওয়ার একটু পরেই তার খোঁজে পুনর্বার ফিরে আসি সেখানেই। গাড়িটা একটু দূরে রেখে হেঁটে এলাম দীয়ার সন্ধানে। সেটা একটা স্যাকরার দোকান ছিল বলেই সন্দেহ হয়েছিল সেদিন। দোকানিকে কৌশলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিয়েছিলাম, তার হারানো বেগুনি পাথরটির মতো একটি পাথর এ-দোকানে ও-দোকানে খুঁজে চলেছে দীয়া। কিন্তু রং মিলছে না। রং মেলে তো কোয়ালিটি মেলে না।

তার আগেই একদিন দীয়ার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখেছিলাম, তার অ্যাশট্রের ভেতর সিগারেটের পোড়া অবশেষ। যদিও তার মধ্যে লেডিস সিগারেট ছিল না, তবু মনে হয়েছিল, যেসব মহিলা সিগারেট খায়, সবসময়েই যে লেডিস সিগারেট খাবে তা নাও হতে পারে।

দীয়ার উপস্থিতির আর একটি ক্লু হল হিমন। পাঁচই এপ্রিল সন্ধেয়, রৌণক মুখার্জি ব্লু ওয়াণ্ডারের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেন, আর একজন পুরুষ সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাটে। তিনি চিনতে না পারলেও আমি পরে বুঝতে পেরে যাই, সে হিমন। আগেই বলেছি, সে শৈশব থেকেই মানসিকভাবে কিছুটা পঙ্গু। দীয়ার সঙ্গে বিয়ে হওযার পর আরও পঙ্গু হয়ে গেল মানসিক যন্ত্রণায়। দীয়া তখন ব্লু ওয়াণ্ডার থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে, তার জন্য হিমনকে 'ইমপোটেন্ট' প্রতিপন্ন করাটাই তার কাছে ছিল জরুরি। তা ছাড়াও হিমনকে পাকাপাকিভাবে ধ্বংস করে দিতে দীয়া তাকে ধরিয়ে দিল ড্রাগের নেশা। নিজে ড্রাগ চোরা চালানকারীদের সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রতিদিন নিয়ম করে হিমনকে ড্রাগ সরবরাহ করা সবচেয়ে সহজ ছিল তার কাছে। কখনও ব্লু-ওয়াণ্ডারে এসে দিয়ে যেত, কখনও হিমন নিজেই চলে যেত দীয়ার নাইট ক্লাবে। হিমনের অস্বাভাবিক চাউনি, তার এলোমেলো হাঁটা, হাতের কাঁপুনি ইত্যাদি দেখে ব্যাপারটা প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। তারপর যখন শুনলাম, লাইট-ক্লাবে তার এক চেন স্মোকার মড্‌ বান্ধবী আছে, তখন কৌতূহল উপছে পড়ল আরও। ইমপোটেন্ট হিমনের আবার বান্ধবী। তারপর 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এ গিয়ে আবিষ্কার করি, মিস লিজা একটা মোড়ক তুলে দিচ্ছে হিমনের হাতে। কিন্তু কী সেই মোড়ক যা হাতে পেতে দারুণ খুশি হয়ে উঠতে পারে হিমন! তখনই বুঝেছিলাম, ড্রাগ।

আসলে হিমনকে অথর্ব করে তোলার ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল শুধু এই কারণে যে, সে রাতে ঐন্দ্রিলার দীয়ার উপস্থিতির একমাত্র সাক্ষী ছিল হিমন। হিমনই সে রাতে দেখেছিল, সে ঐন্দ্রিলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার পর দীয়া উঠে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। ঐন্দ্রিলার কাছে

pathagar.net

থাকবে বলে। অতএব হিমনকে বশীভূত করতে তাকে ড্রাগ দিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখা খুবই দরকার।

ড্রাগে আসক্ত হওয়ার পর থেকে হিমনের সমস্ত সত্তা বিলীন হয়ে গেল ড্রাগের ভেতর। ড্রাগ না পেলে পাগল হয়ে যেত সে। ড্রাগ না নিলে কী নিদারুণ যন্ত্রণা হয় শরীরে তা আরও বেশি করে বোঝানোর জন্যই দীয়া কখনও ইচ্ছে করেই ড্রাগ দেওয়া বন্ধ করে দিত, যাতে দীয়ার ওপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে হিমন। এভাবে পর-পর দু-তিন দিন ড্রাগ না পাওয়ার বাধ্য হয়ে সে শরণাপন্ন হয়েছিল ঐন্দ্রিলার। চন্দ্রাদেবী তাকে টাকা দেবেন না জানত বলেই হিমন বারবার বিরক্ত করত ঐন্দ্রিলাকে। ঐন্দ্রিলা যে তার ডায়েরিতে লিখেছে, ও বারবার চাইতে আসে, কিন্তু রোজ রোজ কী করে ফেরাই তাকে, আমি জানি এটা খুব খারাপ' তা আসলে হিমনকে নিয়েই।

শরীর চাইতে যেত না হিমন। তার দরকার ছিল টাকায়। এন্দ্রিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও টাকা দিত তাকে। পাঁচই এপ্রিল সন্ধের পর অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সোজা ঐন্দ্রিলার কাছে টাকা চাইতেই গিয়েছিল হিমন। ঐন্দ্রিলাও দেবে না, হিমনও কাকুতি-মিনতি করেছিল তার কাছে। শেষে বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাটের ভেতর তাকে নিয়ে যায়। হিমনকে বেরোতে না দেখে নানান সন্দেহে দোলাচল হয়ে অবশেষে গেটের কাছ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন রৌণক।

সে রাতে ঐন্দ্রিলা হত্যার জন্য দীয়াই যে দায়ী তাও অনুমান করেছিল হিমন। কদিন আগে হিমনকে সিঁড়ির উপর এক থাপ্পড় কষাতেই ড্রাগ আসক্ত দুর্বল হিমন হুড়হুড় করে সব কথাই বলে দিয়েছে আমাকে। এতসব ঘটনা জানত বলেই বাইরের লোকের সামনে এত আড়ষ্ট হয়ে থাকত সে। হঠাৎ কাউকে সিঁড়িতে দেখলে পিছু হটে পালিয়ে যেত এক প্রবল আতঙ্কে।

ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর আমি ব্লু ওয়াণ্ডারের জীবনে প্রবেশ করতেই দীয়া ভয় পেয়ে গেল হঠাৎ, ভাবল, সব হয়তো জেনে ফেলব আমি। অতএব একদিন সাবধানও করল আমাকে, এ বাড়িতে থেকো না, পালিয়ে যাও, নইলে ওরা তোমাকেও খুন করে ফেলবে।

ইতিমধ্যে পুলিশ বেল-ক্লাবের মিস বেবিকে খোঁজাখুঁজি করতে থাকায় দীয়া ওখানকার কাজ ছেড়ে নতুন কাজ নেয়, 'দি আইডিয়াল নেস্ট' -এ। নাম বদলে, ছদ্মবেশ বদলে সোনালি চুলের উইগ পরে হয়ে ওঠে মিস লিজা। হিমনও বেল ক্লাবে না গিয়ে যেতে শুরু করে 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এ। ড্রাগ-মাফিয়ার লোকজনও যুক্ত হয়ে যায় এখানে। তারপর একদিন টাকাপয়সায় ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়ার কারণে খুন হয়ে যায় কমলাপতি জৈন নামে এক ব্যবসায়ী। তখনও রাহুল রায়কে আমি ঠিক চিহ্নিত করতে পারিনি। পার্ক স্ট্রিট থানা থেকে মিস লিজার ঠিকানা সংগ্রহ করে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে তাকে খুঁজতে গিয়ে খবর পেয়ে যাই এক আংটিবাবুর। তার সঙ্গে লাইম ইণ্ডিয়ার একটি ডায়েরি।

লাইম ইণ্ডিয়ার কেউ না কেউ যে এই রহস্যকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত তা আমার নজরে এসেছিল আরও দুটি কারণে। এক, বিশ্রী সব বিজ্ঞাপন দিয়ে লাইম ইণ্ডিয়া ক্ষতি করতে চাইছিল প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের গুডউইল, দুই, লোটন নামে লাইম ইণ্ডিয়ার এক সুপারভাইজার এসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকত কালীজীবনবাবুর কাছে। দুটো ঘটনাই আমাকে ভাবতে বাধ্য করেছিল রৌণক মুখার্জির কথা। পরে রৌণক মুখার্জির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর বুঝতে পারি, তাঁর মতো সাদাসিধে, নরম স্বভাবের প্রেমিক মানুষের পক্ষে মানুষ খুন করা অসম্ভব। তাঁর কাছেই হদিশ পেলাম আংটিবাবুর যিনি গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পছন্দ করেন। পরে রাহুল রায়ের সঙ্গে আলাপ হতে দেখি তাঁর হাতে চার-পাঁচটি রত্নখচিত আংটি।

pathagar.net

অতএব রাহুল রায়ের সঙ্গে মিস লিজার যে একটা সম্পর্ক আছে সে সম্পর্ক সচেতন হই। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের পতিতালয়ে যাওয়া আসা ছিল তাঁর। এক বৃদ্ধকে আদর করে মিস লিজা নামে ডাকতেন রাহুল রায়। লোটন তাঁরই লোক। কালীজীবনবাবুর পাড়াতেই বাস করত লোটন। নিতান্ত ভালমানুষ কালীজীবনবাবুর মাথায় হাত বুলিয়ে সে-ই প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে প্ল্যান্ট বার্স্ট করানোর কারিকুরি করেছিল সে রাতে, টেলিফোন করার ছুতোয়। কালীজীবনবাবু তা ধরতেও পারেননি। গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ডেসপ্যাচ না করানো, ঋষিতা তালুকদারকে আহত করা, এমনকি মোটর সাইকেলে ছুটে এসে অফিসের কাছেই আমাকে আহত করার চেষ্টা, সবই লোটন পর পর করে গিয়েছে রাহুল রায়ের নির্দেশে। রাতের বেলা টেলিফোনে ঘড়ঘড়ে গলায় আমাকে শাসিয়েছিল এই লোটনই। এহেন বশংবদ লোটনকে শেষপর্যন্ত খুন হতে হল রাহুল রায়ের হাতেই, কারণ 'দি আইডিয়াল নেস্ট' এ যে ব্যবসায়ীটি খুন হয়েছিল টাকাপয়সা নিয়ে বখরা এদিকে ওদিকে করায়, তাতে রাহুল রায় আর দীয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল লোটন। লোটনই খুন করে ব্যবসায়ীকে, তারপর অতিরিক্ত বখরার জন্য চাপ সৃষ্টি করে রাহুল রায়ের উপর। হয়তো শাসিয়েও ছিল, বেশি টাকা না পেলে সব ফাঁস করে দেবে পুলিশের কাছে। অতএব রাহুল রায় তাকে খুন করে রেখে এল প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ফ্যাক্টরির পেছনে। তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল রাহুল রায়। লোটনও সরে গেল পথ থেকে। তার দায়ও চাপল সায়ন চৌধুরীর কাঁধে। প্যারাডাইসের ট্রাক-দুর্ঘটনা, তার ফলে ট্রাক-ড্রাইভারদের ধর্মঘট, এগুলো রাহুল রায়ের কীর্তি কি না তার প্রমাণ পাইনি। হয়তো দুর্ঘটনাটা এমনিই ঘটেছিল, যেমন অনেকসময় ঘটে থাকে।

ফর্মুলাটা পাওয়ার জন্য রাহুল রায় তখন মরিয়া। লোটনের সাহায্যেই প্যারাডাইসের ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনাও ঘটাল যাতে ডিটারজেন্ট পাউডারের প্রোডাকশন পিছিয়ে যায়। তারপর চেষ্টা করতে লাগাল প্যারাডাইসে যদি একটা চাকরি পায় সে। প্রথমে সায়নের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পরে কালীজীবনবাবুকে দিয়ে সুপারিশ করে, শেষে নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে চাকরির চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আমি তখন তার মধ্যে বিপদের গন্ধ পেয়েছি। মনে হচ্ছিল এখানে ঢুকে কিছু একটা গোলমাল পাকাতে চায় রাহুল রায়।

চাকরি না পাওয়ায় সে আবার চাপ দিতে লাগল দীয়ার উপর। সেই সঙ্গে অপহরণ করতে হল হিমনকে হিমন হয়তো খুনও হতে পারত, কিন্তু সেটা মুলতুবি রেখে তাকে রেখে এল এক গোপন আস্থানায়, তাকে আরও বেশি করে ড্রাগ দিয়ে ড্রাগজনিত কারণে মৃত্যু ঘটানোই শ্রেয় মনে করে সেদিন মারেনি হিমনকে। পরে হিমন পালিয়ে আসায় তাকে থাপ্পড় মেরে যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লু তার কাছে থেকে পেয়েছিলাম তা হল, এক দীয়াই তাকে নিয়মিত ড্রাগ জোগায়, দুই, দীয়াই মিস লিজা হয়ে হোটেলে নাচে, যা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম তিন, রাহুল রায়ই তাকে ট্যাক্সিতে করে রেখে এসেছিল এক গোপন আস্তানায়। পরে রাহুল রায় থানায় ফোন করে জানায়, সায়ন চৌধুরীই ট্যাক্সিতে নিয়ে গিয়েছে হিমনকে।

হিমনের ড্রাগ আসক্ত বা তার অন্তর্ধানের মূলে যে দীয়া জড়িত তা বোধহয় বুঝলে পেরেছিলেন চন্দ্রাদেবী। তাইই কদিন আগে দীয়া এ বাড়িতে আসতেই তাকে উন্মত্তের মতো মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন গেটের বাইরে।

যাই হোক ফর্মূলাগুলো উদ্ধারের শেষ চেষ্টা করল দীয়া কাল রাতে আমার কাছে থাকার ছুতোয়। ফাঁদটা আমিই পেতেছিলাম। সে এসে প্রথমেই চেষ্টা করল, একটি উড়ো-ফোনে ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়ে আমাকে বাড়ির বাইরে পাঠিয়ে দিত। তাতে ধীরেসুস্থে। সে

pathagar.net

বার করে নিতে পারত ল্যাবরেটরি রুমের কাগজ। রাহুল রায়ই বাইরে থেকে ফোনটা করেছিল। আমি তার কণ্ঠস্বর বুঝতে না পারায় আর একটু হলেই তাদের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছিলাম। ভাগ্যিস রোহিতাশ্ব মিত্র ফোনটা করেছিলেন সে সময়ে। তার পরের ঘটনা তো শুনলেই সব, কীভাবে দীয়া—

আসলে মিঃ সান্যাল,দীয়ার অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষাই এতসব ঘটনার জন্য দায়ী। সব হিসেবে পেয়েছিল রাহুল রায়ের মতো একজন নিষ্ঠুর দোসর। প্রথমে ঐন্দ্রিলা, পরে গার্গীর সৌভাগ্যের দীয়া ক্রমশ জর্জরিত হয়ে পড়েছিল চরম ঈর্ষার। সেই ঈর্ষার প্রতিফলন দেখেছিলাম সেদিন মিস লিজার সাজসজ্জার বহরে। তার চোখের পাতায় সবুজ আইশ্যাডো দেখে হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল 'ওথেলো ' নাটকের একটি সংলাপ। ঈর্ষা-জর্জর ওথেলোর উদ্দেশে ইয়াগো সেদিন বলেছিলেন,

ও বিওয়্যার, মাই লর্ড, অফ জেলাসি;
ইট ইজ দ্য গ্রি-আইড মনস্টার হুইচ ডাথ
মক
দি মিট ইট ফিড্স্ অন...

সেই সবুজ চোখের দৈত্যই যেন ভর করেছিল ঈর্ষান্বিত মিস লিজা ওরফে দীয়ার শরীরে। সত্যিই কী ভয়ঙ্কর দীয়ার সবুজ চাউনি।

pathagar.net

বহে বিষ বাতাস

pathagar.net

উৎসর্গ

প্রিয় লেখক

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

শ্রদ্ধাভাজনেষু

রচনাকাল : মার্চ-মে ১৯৯২—অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৯৪

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬, মাঘ ১৪০২

pathagar.net

'ঈর্ষার সবুজ চোখ' যাঁরা পড়েছেন, তরুণী গোয়েন্দা গার্গী মুখার্জীর নাম একেবারে অপরিচিত নয় তাঁদের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন গার্গী তার জীবনের প্রথম যে জটিল রহস্যটি উন্মোচন করেছিল, সেই কাহিনীই 'বহে বিষ বাতাস'। এই রহস্য উপন্যাসটির কিছু অংশ অধুনা লুপ্ত একটি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছিল ধারাবাহিকভাবে, তবে অনিবার্যকারণবশত লেখকের 'বীথিন মুখোপাধ্যায়' এই ছদ্মনামে। দীর্ঘকাল পর উপন্যাসটির খোলনলচে আমূল বদলে এবার প্রকাশিত হল লেখকের স্বনামে।

pathagar.net

হঠাৎই আজ একটু ভোরে ঘুম ভেঙে গেল গার্গীর। জানালার দিকে চোখ মেলতেই দেখল, বাইরের পৃথিবীতে তখন ধোঁয়ারং আলোর উদ্ভাস খুব ধীরে, খুবই নরমভাবে জন্ম দিচ্ছে কলকাতার বুকে আরও একটি মোলায়েম সকাল। জুবিলি পার্কের যে দোতলা বাড়িটিতে তারা বহুকাল ধরে ভাড়াটে হিসেবে আছে, তার সামনের নাতিপ্রশস্ত মরচেধরা পিচরাস্তাটি ক্রমশ মুখর হয়ে উঠতে থাকে এই ব্রাহ্মসময় থেকেই। রোদের সোনালি তুলি দিয়ে যতই একটু একটু করে মুছতে থাকবে ভোরের কুয়াশা, জুবিলি পার্ক হয়ে উঠবে আরও কোলাহলময়।

সবদিন এমন ভোরেই ঘুম ভাঙে না গার্গীর। তবে সে লেট রাইজার তাও ও নয়। ভোর ও সকালের সন্ধিসময়েই সাধারণত বিছানা ছাড়ে সে। ভোরে ঘুম ভাঙলেও সেই সন্ধিক্ষণ না আসা তক্ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকাটা তার বহুদিনের অভ্যাস। আজও সে দৃশ্য অবলোকনের মুহূর্তগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে গিয়েই কী যেন মনে পড়ল তার। পরক্ষণেই তার শরীর জুড়ে যা প্রবলভাবে ঘনিয়ে এল, তার নাম টেনশন।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল, আজ বেলা দুটোয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে যে ডিবেট কমপিটিশনের আয়োজন হয়েছে, তাতে সে একজন পার্টিসিপ্যান্ট। কয়েকদিন আগে মুহূর্তের এক দুর্বলতায় এই বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছিল। বিতর্কের বিষয়বস্তুটি তার খুব রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল বলেই তার এই আকস্মিক অ্যাডভেঞ্চার। কিন্তু তারপর যত দিন গড়িয়েছে, ততই কিছুটা উত্তেজনায়, শিহরণে, কিছুটা শঙ্কায়ও চুরমুর হচ্ছে নিজের ভেতর। আজ সেই দিনের দিন টেনশন যে তুঙ্গে উঠবে তা তো অনিবার্যই।

বিতর্কের বিষয়বস্তু অবশ্য গার্গীর কাছে গ্রিক কিংবা রোমানের মতো দুর্বোধ্য ঠেকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের ছাত্রী সে। 'ভারতীয় গণতন্ত্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র'—এই বিষয়বস্তু তার অধীত বিষয়ের ধারে কাছেও ঘেঁসে না। কিন্তু গণিতের ছাত্রী হয়েও গার্গীর কৌতূহলের বৃত্তটি পরিসরে বড্ডই বড়। সে তার নিজস্ব বিষয়ের বাইরে হুটহাট বেরিয়ে পড়ে আরও বহুবিধ তথ্য, তত্ত্ব ও তর্কের তালাশে। কখনও সাহিত্য, কখনও রাজনীতি, কখনও অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কখনও দর্শনের তত্ত্বতালাশও তার অন্যতম হবি। কখনও কলকাতার পথে পথে সন্ধানী চোখ নিয়ে টুকটাক ঘোরাফেরা করাও তার আর এক প্রিয় বিলাস। ঠিক বোহেমিয়ান তাকে বলা যাবে না। কেন না আসলে এতসব অ্যাড্ভেঞ্চারের ভেতর ঢুঁ দিতে দিতে তার কালি, কলম ও মন জন্ম দেয় এক একটি ফিচারের। ইতিমধ্যে তার কিছু কিছু ফিচার প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার দু-তিনটি জনপ্রিয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

বিংশতিবর্ষীয়া এই তরুণীটির নাম অতএব সংবাদপত্রের কল্যাণে কোনও কোনও মহলে সামান্য পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী মহলে তো অবশ্যই। তাই বিতর্কের আসরে গার্গী মুখার্জির অংশগ্রহণ রীতিমতো কৌতূহলের তো বটেই, অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে সমীহেরও।

এতসব ভাবনার মধ্যে গার্গী বিছানা ছেড়ে শুরু করে দিয়েছে তার দৈনন্দিন রোজনামচা। বিছানা তোলা, ঘরকন্নার কাজে তার মাকে একটু সাহায্য করার পর বইখাতা খুলে গণিতের

pathagar.net

গভীর তত্ত্বে কিছুক্ষণ হাবিডুবি খাওয়া। আজ সেই সঙ্গে বিতর্কের বিষয়েও এক ঝলক নজর রাখল সে। তার মধ্যে রান্নাঘর থেকে মায়ের রান্নার আওয়াজ, তার দাদা সুশোভনের অফিস যাওয়ার প্রস্তুতি, একটু পরেই খেয়ে দেয়ে তার অ্যাটাচি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ, এতসব শোনার পর সে হামলে পড়ল সেদিনকার খবরের কাগজ নিয়ে।

সকাল সাড়ে আটটা নটার পর মিনিট পঁয়তাল্লিশেক সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তন্নতন্ন চোখ বোলাবুলিও তার রোজনামচার একটি বিশেষ আইটেম। যারা রোজ সারারাত জেগে সাদাপৃষ্ঠা কালো করেন, তাদের পরিশ্রম ও ক্লান্তিকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে গার্গীর কোনওদিনই ক্লান্তি নেই। সারা বিশ্বে কোথায় কী ঘটে চলেছে তা না জানা তক্ একটা মূর্খ মূর্খ অনুভূতি ঘুলিয়ে ওঠে তার শরীরে। তার বান্ধবীরা যাকে বোকা বোকা লাগা বলে। পি. টি. এসের অক্ষরগুলি গোগ্রাসে গেলার পর তবেই যেন বিশেষ অজ্ঞ থেকে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে গার্গী। অন্তত সেদিনকার মতো।

আজও পঞ্চম পৃষ্ঠায় পৌঁছানোর পর একটা চমকপ্রদ খবরে তার চোখ আটক হয়ে রইল। শুধু চমকপ্রদই তা নয়, বেশ রহস্যময়ও। সংবাদে প্রকাশ, কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে বেশ রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন সে বাড়ির রানিমা। রানিমার বয়স হয়েছিল প্রায় সাতাত্তর। গত চার-পাঁচ বছর ধরে চলচ্ছক্তিহীনও হয়ে পড়েছিলেন বাতজনিত ব্যথায়। তবু তাঁর স্মৃতিশক্তি, বিবেচনাবোধ, রাজকীয় মেজাজ খুবই অটুট ছিল এখনও। বছর দশেক আগে রাজা ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মারা যাওয়ার পর রানি লাবণ্যপ্রভা বাস করতেন রাজপ্রাসাদে। তিনি ছাড়াও রাজপ্রাসাদে বাস করতেন তাঁর বহু আশ্রিত-আশ্রিতারা। কেউ একা, কেউ সপরিবারে। দিন চারেক আগে রঙিন সাইডব্যাগ কাঁধে দাড়িগোঁফওলা এক যুবক রাজপ্রাসাদে হঠাৎ হাজির হয় সাংবাদিক পরিচয়ে। রাজপ্রাসাদেরই একটি ঘরে থাকত সে, চোখে হালকাফ্রেমের চশমা, হাতে সর্বক্ষণই লেখার প্যাড ও কলম। গত চারদিন ধরেই সে কখনও রানিমার কাছে, কখনও আশ্রিতদের কাছে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করত, আর সেগুলি নোট করত মনোযোগ সহকারে। যুবকটির বিশেষত্ব হল, সে লেখালেখি করে বাঁ-হাতে, কিন্তু খাওয়াদাওয়া বা অন্য কাজের সময়ে ব্যবহার করে ডানহাত। খুব বেশি কথা বলে তা নয়। কিন্তু যখন বলে, একটু উত্তেজিত দেখায় তাকে। গতকাল দুপুরে আরও কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার ছুতোয় সে রানিমার ঘরে ঢুকেছিল। ঘন্টাখানেক পর সে চলে যাওয়ার পরেই আবিষ্কৃত হয়, রানিমার নিস্পন্দ শরীর পড়ে আছে বিছানায়। তাঁর গলার নলিটি কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বিছানা। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেই যুবককে দেখা যায়নি সে তল্লাটে। যুবকটি রাজবাড়িতে ঢোকার সময় জানিয়েছিল, সে কলকাতায় থাকে, পেশায় ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিক, তবে ছবিও আঁকে মাঝেমধ্যে, এখন বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে পুরানো রাজবাড়িগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছে একটি পূর্ণাঙ্গ লেখা তৈরি করবে বলে। প্রাসাদের আশ্রিতরা তাকে সাংবাদিকবাবু বলেই জানত। রানিমার কাছে নাম বলেছিল অশেষ রায়। কী কারণে খুনটি হল, তা সবার কাছেই ভারি রহস্যজনক। পুলিশ তদন্ত করছে।

সংবাদটিতে বারদুই চোখ বুলিয়ে ভারি আশ্চর্য হল গার্গী। খুনের খবরটি যেমন তার কাছে বিস্ময়কর, তেমনই সেই 'সাংবাদিক'টির লেখার বিষয়বস্তুটিও। পুরানো রাজবাড়িগুলো নিয়ে লেখার কথা সে নিজেও তো কতবার ভেবেছে।

pathagar.net

কিন্তু এহেন রোমাঞ্চঘন একটি লেখা তৈরি করতে এসে হঠাৎ এক বৃদ্ধা, পঙ্গু রানিমাকে খুন করতে গেল কেন সেই অদ্ভুত দাড়িগোঁফওলা লোকটি।

কতক্ষণ এই রহস্যের ভেতর নিজেকে ওতপ্রোত রেখেছিল গার্গী তা স্মরণে নেই তার। হঠাৎ টেবিলঘড়িটার দিকে চোখ পড়তে চমকে ওঠে। সময় দশটার ঘর ছুঁই-ছুঁই। বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা বলেছেন, অন্তত বারোটার মধ্যে হাজিরা দিতে প্রতিযোগিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা চাই।

দ্রুত স্নান-খাওয়া সেরে একরাশ উত্তেজনার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হল গার্গী। সময়ানুবর্তিতা যেমন তার পছন্দের, তেমনি কর্তব্যবোধ। আসলে যে কোনও ব্যাপারেই সে ভীষণ সিরিয়াস। বিতর্কে নামার ঘন্টাখানেক আগে সে তার ব্যাগ খুলে চোখ রাখল নির্দিষ্ট কাগজটিতে যাতে তার আলোচ্য বিষয়বস্তুটি লেখা আছে বিশদ করে।

সেই দিনটা গার্গীর জীবনের এক লাল অক্ষরের দিন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বিতর্কে সে-ই একমাত্র প্রতিনিধি যে কিনা সায়েন্সস্ট্রিমের ছাত্রী। স্বভাবতই বিচারক, অধ্যাপক, শ্রোতা—সবাইই কৌতূহলের দৃষ্টি ছিল তারই দিকে। তবে সে নিরাশও করেনি তাদের। তার বাচনভঙ্গি বরাবরই ভারী সাবলীল, তার বিশ্লেষণবোধও তীক্ষ্ণ, বিষয়বস্তুটি উপস্থাপনাও করল খুবই বিশদ, প্রাঞ্জল ও নিপুণভাবে। বিতর্কের পক্ষে সে এমন বিপুল তথ্যাবলী হাজির করল শ্রোতাদের সামনে যে, তার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অডিয়েন্স ফেটে পড়ল তুমুল হাততালিতে।

বিচারকরাও একবাক্যে ঘোষণা করলেন, গার্গী মুখার্জিই প্রথম।

গার্গী তখনও এক ঘোরের মধ্যেও আছে। মঞ্চ থেকে নামার পর এতজনে এতভাবে প্রশংসা করল যে, সে বহুক্ষণ অভিভূত হয়ে রইল নিজের ভেতর। কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ তাকে এক অলিখিত উপাধিতে ভূষিত করল, মিস ইউনিভার্সিটি, মিস ইউনিভির্সিটি। ইয়ার্কি করেই বলেছে, তবু এই ঘোরের মুহূর্তে উপাধিটি মন্দ লাগল না তার। সে তেমন রূপসী নয় যে সে কখনও মিস ইউনিভার্স হতে পারবে। সে যোগ্যতা তার নেই, বাসনাও নেই। কিন্তু মিস ইউনিভার্সিটি! বাহ্, বেশ বলেছে তো ছেলেটা। নিশ্চই কোনও ছাত্র।

দু' একজন পরিচিত অধ্যাপকও তাকে কনগ্র্যাট্স জানিয়ে গেলেন।

শেষে তার হাতে তুলে দেওয়া হল উইনার্স কাপ, সুদৃশ্য সার্টিফিকেটটি। সেই সঙ্গে একগুচ্ছ ভারী ভারী বই। বইয়ের প্যাকেটটিই সবচেয়ে পছন্দ হল তার। বইই মানুষেৰ শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যে কখনও বিট্রে করে না।

বাড়ি ফিরতেই তার মা বললেন, সে কি রে, তুই ডিবেডে ফার্স্ট হয়েছিস! এ তো ভাবাই যায় না। ছোটবেলায় যা মুখচোরা ছিলি তুই!

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল। মা জানে না এই ক'বছর কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার পর সে এখন রীতিমতো মুখরা। তার তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে কখনও ঘাবড়ে যান অধ্যাপকবৃন্দও। তার শাণিত আক্রমণকে সমীহ করে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা। আসলে গার্গী ভীষণ স্পষ্টবক্তা। কাউকেও রেয়াত করে না আজকাল। অন্তত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে।

বিতর্কে প্রথম হয়ে পুরস্কার জিতেই যে সে রেহাই পেল তা নয়। তার বিশুদ্ধ গণিত বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা পরদিন তাকে চেপে ধরল, অ্যাই গার্গী, আমরা অনেকেই তো ডিবেট কমপিটিশন দেখতে যাইনি। কী বিতর্ক করে ফার্স্ট হলি তা আমাদের শোনা। আজ ক্লাসে ডেইসে দাঁড়িয়ে তোর বক্তিমে দিয়ে তাক লাগিয়ে দে সবাইকে।

pathagar.net

গার্গী এড়াতে চাইছিল। কিন্তু সুপ্রতিম, শঙ্খলেখা, রীতেশ, বুম্বা, স্বাগতা, এরা কয়েকজন এমন নাছোড়বান্দা হল যে, গার্গীকে উঠতেই হল ডেইসে। তারপর সেই বক্তব্য রেকর্ডের মতো পুর্নবার—

আবারও তুমুল হাততালি। সবাই উদ্ভাসিত হয়ে বলল, আমাদের ডিপার্টমেন্টের মান বাড়ালি তুই।

হেট অব্ দ্য ডিপার্টমেন্ট এস. কে. জি পর্যন্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর অথচ মৃদুভাষে তার পিঠ চাপড়ে বললেন, গুড।

এভাবে বেশ কয়েকদিন প্রশংসা আর উচ্ছ্বাসে ডুবে থাকার পর হঠাৎ দিন পনেরো বাদে আর এক সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ আটক হল তার। এবার সংবাদ নয়। বিজ্ঞাপন। সেই বীরভঙ্গপুরের ঘটনারই জের টেনে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তৃতীয় পৃষ্ঠার উপরের ডানদিকের কলামে। বীরভঙ্গপুরের নামটি দেখেই গার্গী কৌতূহলী হল। বিজ্ঞপ্তিটি খুবই অদ্ভুত আর বিস্ময়কর। তার বয়ানটি এইরকম ঃ

বীরভঙ্গপুর রাজপ্রাসাদে রানিমা লাবণ্যপ্রভা মিত্রর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এইমুহূর্তে উত্তরাধিকারবিহীন। যদি এ দেশের কোথাও তাঁর কোনও উত্তরাধিকারী জীবিত থাকেন, তাহলে তিনি বা তাঁরা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনেরো দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণাদি সহ রাজবাড়ির ট্রাস্টিবোর্ডের নিযুক্ত অ্যাডভোকেটের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যিনি বা যাঁরা উত্তরাধিকারী হিসেবে দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন, রানিমার বিপুল ধনসম্পত্তি, রাজবাড়ি, জমিজমা—সবকিছুরই মালিক হিসেবে ঘোষণা করা হবে তাঁকে বা তাঁদের। যদি কেউ ভুয়ো প্রমাণাদি নিয়ে উত্তরাধিকারীত্বের দাবি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তবে তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিটি পড়েই গার্গী লাফিয়ে উঠল প্রায় ছেলেমানুষের মতো। যে প্রসঙ্গটি গত কয়েকদিন তার ভেতরে হাজারবার ঢালাউপুড় হয়েছে, সেই কাহিনীটিই হঠাৎ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এভাবে ফিরে আসবে তো ভাবতেই পারেনি। আগের দিন প্রকাশিত সংবাদটির সঙ্গে আজকের বিজ্ঞপ্তি যুক্ত করলে রাজবাড়ির রহস্যটি খুবই যে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠল তাতে সন্দেহ নেই। কীভাবে হঠাৎ এক অপরিচিত সাংবাদিকের হাতে খুন হলেন বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির রানিমা, তাঁর হত্যারহস্যের কী তদন্ত হল, তার জট এতদিনে খুলেছে কি না, এর কোনও কিছুই জানা হয়নি গার্গীর। তার আগেই উত্তরাধিকারী চেয়ে এই বিজ্ঞপ্তি দ্বিগুণ কৌতূহল উসকে দিল তার ভেতরে। তা হলে কি এই দাঁড়ায় যে, রানিমার কোনওভাবে মৃত্যু হলে তাঁর বিপুল ধনসম্পত্তি অন্য কারও হাতে বর্তাবে! তার মানে রানিমার খুনের পিছনে কারও সুনির্দিষ্ট মোটিভ কাজ করেছে! উত্তরাধিকারী হওয়ার মোটিভ! সে মোটিভ তা হলে কার? সেই তথাকথিত সাংবাদিকের! না অন্য কারও!

সমস্ত বিষয়টি আরও কয়েকবার নিজের মনে নাড়াচাড়া করার পর ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল গার্গী। এ ধরনের কোনও রোমাঞ্চকর বা রহস্যঘন ঘটনা তার কানে এলে কিংবা সংবাদপত্রে পড়লে আজকার একধরনের টেনশন চারিয়ে যায় তার ভেতর। তা সে কোনও বস্তিবাড়ির একটি শিশুশ্রমিকের দৈনন্দিন লড়াইয়ের কথাই হোক, অথবা কোনও তরুণ খেলোয়াড়ের খুব সামান্য পরিবার থেকে দ্রুত উত্থানের কাহিনীই হোক, কিংবা তিরিশের দশকে লক্ষ্ণৌ থেকে আসা কোনও বাইজির চমকপ্রদ স্মৃতিকথাই হোক। আর আশ্চর্য, রোজই

কোনও না কোনওভাবে এই ধরনের 'স্টোরি' তার নজরে চলে আসে ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্টোরিটিতে সাহিত্য মিশেল দিয়ে সে প্রতিদিন চমক দিতে চায় সংবাদপত্রের পাঠকদের।

তবে এর আগে কোনও খুনের ঘটনা তাকে আলোড়িত করেনি এভাবে। কেন যেন তার মনে হচ্ছে, বীরভঙ্গের কাহিনীটিতে কোনও দারুণ চমক অপেক্ষা করে আছে তার জন্য। জায়গাটা কলকাতা থেকে তিন সাড়ে তিনঘন্টার পথ। ওদিকে কখনও যায়ওনি গার্গী। একবারেই অচেনা, অজানা জায়গা। অপরিচিত বলেই বীরভঙ্গপুর সম্পর্কে আরও কৌতূহল উসিয়ে যাচ্ছে তার মনে! সেখানে তার মতো একজন মেয়ের পক্ষে ঘটনার উৎস খুঁজতে-যাওয়া সত্যিই কি সম্ভব! কীভাবে যাবে সেখানে! কী পরিচয়েই বা।

হঠাৎ এই আন্‌কা ব্যাপারটা নিয়ে তার মাথায় জট পাকিয়ে যেতে কয়েকদিন রাতে ঘুমই এল না চোখে।

দুই

কলকাতা থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে একটি নৃশংস খুনের ঘটনার জেরে খুঁজতে যাওয়া, এ যেন প্রায় শার্লক হোমসের মতোই এক অ্যাডভেঞ্চার। গোয়েন্দা-উপন্যাস পড়ার দিকে তার বরাবরের ঝোঁক। আগাথা ক্রিস্টি কিংবা আর্থার কোনান ডয়েলের কোনও বই তার হাতে পড়লেই সে গোগ্রাসে পড়ে ফেলে, শুধু পড়েই তা নয়, পড়ার পর খুনের মোটিভ, খুনির চালচলন, গোয়েন্দাপ্রবরের তদন্তের ধারা সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবে, আর মনে মনে এও চিন্তা করে, সে গোয়েন্দা হলে এই হত্যারহস্যটির কিনারা করতে পারত কি না। তারপর নিজের মনে হেসেও ফেলে সে। তার এই অলীক, অদ্ভুত ভাবনার কথা ভেবেই। বীরভঙ্গপুরের রানিমার করুণ পরিণতির কথাও তাকে ভাবাল। খুবই ভাবাল। যত না খুনের মোটিভ নিয়ে, তার চেয়েও বেশি সেই সাংবাদিকটিকে ঘিরে ঘূর্ণায়মান হল তার ভাবনার আবর্ত। গার্গী নিজেও ভবিষ্যতে কোনও বিখ্যাত কাগজের সাংবাদিক হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করে। কোনও অভিনব সংবাদের পিছু পিছু ধাওয়া করে তার ভেতরকার খুঁটিনাটি বার করার মধ্যে যে অদ্ভুত একটা থ্রিল আছে তা রেলিশ করে। অথচ একজন সাংবাদিক কিনা রাজবাড়ি নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এক বিধবা বৃদ্ধা রানিমাকে খুন করে পালিয়ে এল চুপিচুপি! কী অদ্ভুত! কী আশ্চর্য!

কিন্তু গার্গী তখন এও ভাবতে শুরু করেছে, এক্ষেত্রে সাংবাদিক যুবকটির মোটিভই বা কী হতে পারে! সে কি রাজবাড়ির সঙ্গে কোনও ভাবে যুক্ত! ভাবনাটা আরও গাঢ় হল এই কারণে যে, রানিমার খুনের সঙ্গে হয়তো তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের একটা প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।

এরকম একটি অনুসন্ধিৎসা নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস করার ফাঁকে ফাঁকে গার্গী কয়েকদিন ধরে খোঁজখবর নিতে লাগল, অশেষ রায় নামে কোনও সাংবাদিক কোনওভাবে আবিষ্কার করা যায় কি না। নানান ধরনের ফিচার লেখার সুবাদে প্রায় সব সংবাদপত্রের অফিসেই তার অল্পস্বল্প যোগাযোগ আছে। সব অফিসেই কোনও না কোনও সাংবাদিক, অথবা বার্তা-সম্পাদক, কিংবা খোদ পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে মোটামুটি 'জান-পহচান' হয়ে গেছে গত দু-তিন বছর যাতায়াতের ফলে। কিন্তু কয়েকদিন ফোনাফুনি, ঘোরাঘুরি করার পর সে তার

অনুমানমতো ব্যর্থই হল। সব কাগজের অফিস থেকেই তার চেনাজানারা কেউ ঠোঁট উল্টে অথবা কাঁধ শ্রাগ্ করে অথবা জিভে চুক্ চুক্ করে জানিয়েছে, স্যরি গার্গী—

অর্থাৎ যে যুবকটি বীরভঙ্গপুর রাজবাড়িতে গিয়েছিল, হয় সে আদৌ কোনও সাংবাদিক নয়, অথবা তার নাম হয়তো অশেষ রায় নয়, অন্য কিছু। এক্ষেত্রে নাম গোপন করাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য তার সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লুও পাওয়া গেছে খবরের কাগজের রিপোর্টিং থেকে। 'সাংবাদিক' যুবকটি বাঁ হাতে লেখে, এবং আরও বড় কথা, ছবি-আঁকার অভ্যাসও আছে তার।

তা হলে যদি সাংবাদিক না হয়, এমন কোনও শিল্পী যে বাঁ-হাতে!

সে যাই হোক, সেই রাজবাড়ির খুনের ঘটনাটি যতটা চমক দিয়েছে, ততটাই তাকে উস্কে দিয়েছে সেই 'তথাকথিত' সাংবাদিক-কাম-শিল্পীর ফিচারের বিষয়টি। গত দু-তিনবছরে গার্গী এত এত ফিচারের পিছনে দৌড়েছে, তার ছোট্ট নোটবইটিতে সংগ্রহ করেছে কত না খুঁটিনাটি 'স্টোরি', কিন্তু কখনও এইসব পুরানো রাজবাড়ি নিয়ে সে মাথা ঘামায়নি। এ যুগে রাজা নেই, তাদের রাজত্ব নেই, থাকবার কথাও নয়, কারণ সরকারি আইনবলে এইসব রাজা তথা জমিদারদের রাজত্ব অনেকদিন আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু অতীত দিনের ছায়া হয়ে পড়ে আছে তাঁদের আভিজাত্য ও গড়ে যাওয়া বিশাল অট্টালিকাগুলি। সেইসঙ্গে রাজবাড়ির বর্ণাঢ্য সব ইতিহাস।

ভাবতে ভাবতে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল গার্গী। মনে হল তার এক্ষুনি একবার বীরভঙ্গপুরে যাওয়াটা খুবই জরুরি। এহেন একটি নৃশংস খুনের ঘটনার পর রাজবাড়ির অতীত ইতিহাস টেনে বার করার পক্ষে এই হল উপযুক্ত সময়। কথার পৃষ্ঠে বেরিয়ে আসবে চমক-দেওয়া সব কাহিনী। হয়তো অনেক লোমহর্ষক গল্পও। অনেক বর্ণাঢ্য চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে সেই প্রাচীন অট্টালিকার চত্বরে।

কিন্তু যাওয়া বললেই তো যাওয়া নয়। অচেনা জায়গা, অচেনা পথঘাট। বিশেষ করে কলকাতা থেকে যখন এতখানি দূরে, সেখানে হুট করে একা গার্গী যায়ই বা কী করে। কলকাতার পথঘাট তার চেনা। এখানকার অলিতে গলিতেও সে অনেক রাত পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলে বেড়াতে পারে। হঠাৎ ফুটপাতে উবু হয়ে বসে নোট করে নিতে পারে কোনও ফুটপাত বাসিন্দার জীবনকথা। কিন্তু অত দূরে, ঠিক মফস্বল শহরও নয় যে গিয়ে কোনও হোটেলে গিয়ে উঠে পড়বে!

কিছুক্ষণ নিজের ভেতর ডুব দিয়ে চক্কর দিতে দিতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বান্ধবী শঙ্খলেখার কথা। খুবই শান্ত, মার্জিত স্বভাবের, মাঝারিধরনের রূপসী শঙ্খলেখা পড়াশুনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থেকে। কিছুকাল আগে কথায় কথায় বলেছিল, তার বাড়ি ঝাড়গ্রামের দিকে কোথাও, কোনও এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত ট্রেনে গিয়ে তারপর বাস ধরে আরও কিছুক্ষণ। জায়গাটার নাম এই মুহূর্তে গার্গীর মনে না পড়লেও সে জানে, প্রতি পনেরো দিন পর পর শনিবার হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে সেই গাঁয়ের বাড়িতে যায় শঙ্খলেখা। রবিবার কাটিয়ে সোমবার ভোরেই আবার কলকাতার ট্রেন ধরে। যতদূর মনে হচ্ছে বীরভঙ্গপুর জায়গাটা ঝাড়গ্রামের কাছাকাছি কোথাও হবে। তাহলে হয়তো শঙ্খলেখার কাছে হালহদিশ পাওয়া যেতে পারে বীরভঙ্গপুরের।

ঠিক যেমনটি মনে হওয়া, অমনি পরদিনই গার্গী হোস্টেলে গিয়ে পাকড়াও করল শঙ্খলেখাকে, হ্যাঁ রে, শঙ্খলেখা, তুই কি বীরভঙ্গপুর নামটা কখনও শুনেছিস?

গ্রন্থকীট মেয়ে শঙ্খলেখা, সারাক্ষণ অঙ্কের গভীর সব সমস্যার ভিতর ডুবে থাকতেই পছন্দ করে। গার্গীর আচম্‌কা প্রশ্নে তার দীর্ঘ চোখের পাতা আস্তে আস্তে করে তোলে, হঠাৎ বীরভঙ্গপুর নিয়ে তোর কী কাজ!

শঙ্খলেখার বলার ভঙ্গি দেখেই তৎক্ষণাৎ গার্গী অনুমান করে ফেলল, বীরভঙ্গপুর নামটা তার খুবই চেনা, সে উৎসুক হয়ে বলল, ওখানকার রাজবাড়ি নিয়ে একটা স্টোরি বেরিয়েছে কাগজে, নিশ্চই দেখেছিস খবরটা?

শঙ্খলেখা মিষ্টি করে হাসল, এই রে, তোর মাথায় সেই রাজবাড়ির ভূত চেপেছে নাকি!

গার্গীর তখন আর তর সইছে না, আরে বলবি তো, তুই ব্যাপারটার কিছু জানিস কি না—

—একটু একটু জানি বলেই তো তোকে ল্যাজে খেলাচ্ছি। তবে বীরভঙ্গপুর আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে। কিন্তু গাঁ-গ্রামের ব্যাপার তো, দূরে হলেও রাজবাড়ির ব্যাপারস্যাপার বলে ওখানে খুব হইচই পড়ে গেছে ঘটনাটা নিয়ে। তার উপর একটা লোকাল নিউজপেপারে মাঝেমধ্যে স্কুপ নিউজ হিসেবে ঘটা করে ছাপছেও ব্যাপারটা।

—তাই! গার্গী ভীষণ উৎসাহিত হয়ে পড়ল শুনে, পড়েছিস খবরগুলো? খুব ইন্টারেস্টিং?

—মোটামুটি ইন্টারেস্টিংই বলতে পারিস। রাজবাড়ির ঘটনা তো, তাতে একটু কেচ্ছাকাহিনী থাকবেই।

—কেচ্ছা! গার্গীকে একটু ভুরু কুঁচকোতে দেখা যায়।

শঙ্খলেখা হাসল, আসলে কি জানিস, সাধারণ ঘরে যেটা আক্‌ছার ঘটে, সেই ঘটনাটাই রাজবাড়িতে ঘটতে থাকলে সেটা মুখরোচক হয়ে লোকের মুখে মুখে ঘোরে।

গার্গী এবার ঝুঁকে পড়ল, তা হলে তো একদিন ওখানে যেতে হয়। নিয়ে যাবি আমাকে?

—তুই যাবি সেই বীরভঙ্গপুরে! শঙ্খলেখাকে বেশ আশ্চর্য হতেই দেখা যায়, কেন রে?

—তুই তো জানিস, আমার আবার এই ধরনের খবর সংগ্রহের একটা বাতিক আছে। কেন কে জানে, আমার ভারি ইচ্ছে করছে সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে জানতে। হয়তো দারুণ একটা স্টোরি বেরিয়ে আসবে ওর ভেতর থেকে।

শঙ্খলেখা খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গার্গীর মুখের দিকে। গার্গী মাঝেমধ্যে কী যেন সব লেখে এ কাগজে ও কাগজে। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্খলেখার কোনও মাথাব্যথা হয়নি কখনও। তার একমাত্র চিন্তাভাবনা ম্যাথ্‌সের জটিল প্রবলেমগুলো নিয়ে। এখন গার্গী অত দূরে সেই বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি যেতে চায় শুনে তার আশ্চর্য হওয়ারই কথা। কিন্তু গার্গীর আগ্রহে সে তৎক্ষণাৎ জল ঢেলে দিয়ে বলল, ধুর, মাথা খারাপ নাকি তোর। একবার এক সাংবাদিক গিয়ে খোদ রানিমাকে খুন করে এসেছে। তারপর তার ওই রাশরাশ সোনার গয়না, টাকাকড়ি, জমিজমা কে পাবে তা নিয়ে দিনরাত লাঠালাঠি চলছে ওখানে। সেই খবর ওখানকার এক স্থানীয় সাংবাদিক কাগজে ছেপেছে। তাই নিয়ে আরও হুলুস্থুলু। সেই স্থানীয় সাংবাদিক দ্বিতীয়বার রাজবাড়িতে যেই খবর আনতে গেছে, রাজবাড়ির লোকজন তাকে ধরে বেদম পিটিয়েছে।

—সে কি! গার্গী বিস্মিত।

—হ্যাঁ। আবার তুই যদি সাংবাদিক হয়ে ওখানে যাস তো তোকেও—, বলতে বলতে শঙ্খলেখা হেসে গড়িয়ে পড়ে। হাসলে আবার শঙ্খলেখার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ গালে দুটো চমৎকার টোল।

pathagar.net

গার্গী একমুহূর্ত থমকায়। শঙ্খলেখাকে নিয়ে যদি স্পটে যায়, তাহলে সত্যিই কী ঘটতে পারে বোধহয় তাইই ভেবে নিল মনে মনে। পরক্ষণেই হেসে ফেলে বলল, তবে মেয়ে সাংবাদিক তো, বোধহয় পিটুনি দেবে না—

শঙ্খলেখা কিন্তু তাকে নিরুৎসাহ করে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, রাজবাড়ির ভূত তুই মাথা থেকে ঝেড়ে ফ্যাল্। ওসব রূপকথা এখন কেউ শুনতে চায় না। জানতেও চায় না।

গার্গী অবশ্য একবিন্দুও নিরুদ্যম হতে নারাজ। তার স্বভাবই এই যে, কেউ যদি তাকে কোনও ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে তো সে দ্বিগুণ উৎসাহে সে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শঙ্খলেখা আসলে ভীতু স্বভাবের। অধিকাংশ মেয়েই যেরকম হয়ে থাকে আর কী। যেহেতু এখানে বিপদের গন্ধ আছে—

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কী মনে হতে সে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু একজন সাংবাদিক সেখানে গিয়ে পিটুনি খেল, এটা ভাবতে কিন্তু আমার আশ্চর্যই লাগছে।

শঙ্খলেখা তার চোখেমুখে একটা ভয়-ভয় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে, না রে, রাজবাড়িতে নাকি হরিশংকর চৌধুরী বলে একজন লোক আছে। এককালে রাজবাড়ির লেঠেল ছিল। এখন অবশ্য আর লেঠেলগিরি করার কোনও স্কোপ নেই। তা ছাড়া লোকটার বয়সও হয়েছে, কিন্তু এখনও নাকি লোকটা নাকি ভয়ঙ্কর। তার যা বিশাল চেহারা—

—ও, গার্গী সেই ভয়ঙ্কর হরিশংকর চৌধুরীর চেহারাটা মনে মনে কল্পনা করে নেয়, তারপর একটু থিতু হয়ে জিজ্ঞাসা করল, হুঁ, আর কী কী জেনেছিস তুই?

—জেনেছি যে আপাতত রাজবাড়ির কোনও উত্তরাধিকারী নেই। হরিশংকর চৌধুরীর মতো আরও বেশ কয়েকটি পরিবার দীর্ঘদিন রাজবাড়িতে রয়ে গেছে আশ্রিত হিসেবে। তারা এখন চাইছে, রাজবাড়ির উত্তরাধিকারিত্ব তাদেরই উপর বর্তাক। কিন্তু রাজবাড়ির ট্রাস্টিবোর্ডের যে উকিলবাবু আছেন, তিনি তা মানতে চাইছেন না। বলেছেন, প্রয়োজন হলে গভর্নমেন্টের ঘরে চলে যাবে এত বড় সম্পত্তি।

গার্গী এতক্ষণে জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বলল, ঠিকই তো বলেছেন উকিলবাবু। তাঁর হেডে মাথা আছে বলতে হবে। আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকারহীন সম্পত্তি তো সরকারেই বর্তায়।

শঙ্খলেখা হাসল খুক খুক করে, কিন্তু সত্যি কথাটা বলে ফেলায় উকিলবাবুর হেডে আর মাথা থাকবে না। সেই হরিশংকর চৌধুরী নাকি উকিলবাবুর লাশ ফেলে দেবে বলে শাসিয়েছে। বলেছে, কর্তাবাবুর হুকুমে এরকম বহু লাশ এককালে ফেলেছি। না হয় আরও একটা ফেলব। কিন্তু এই সম্পত্তির হক ছাড়ব না। আমি না থাকলে রানিমার সাধ্যি কী ছিল এত বড় সম্পত্তি আগলে আগলে রাখেন!

গার্গী থম মেরে গেল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, শঙ্খলেখা এবার কণ্ঠস্বর একটু খাদে নামল, যেন তার কথা সেই বীরভঙ্গপুরের লোক শুনে ফেলবে, বলল, তার হুমকি শুনে এখন এলাকার লোক অন্য কথা বলাবলি করছে। বলছে, হরিশংকর চৌধুরীই বুড়ি রানিমাকে খুন করেছে। তারপর ওই সাংবাদিককে সে-ই গুম করে পাচার করেছে কোথাও, অথবা হয়তো মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। তারপর এমনভাবে প্রচার করছে যাতে লোকের ধারণা হয়, সেই সাংবাদিকটিই খুন করে পালিয়েছে।

গার্গী এবার যেন চিন্তায় পড়ল খুব, তা হতে পারে নাকি!

pathagar.net

—না হওয়ার কিছু নেই। কারণ সাংবাদিক পালিয়ে গেল, কিন্তু যাওয়ার সময় সে তার লেখার প্যাড আর কলমটা ফেলে গেল কেন!

গার্গী কিছুক্ষণের জন্য হাঁ হয়ে গেল, বাহ্, বেশ বলেছিস তো।

—আমি বলিনি। সেই স্থানীয় সাংবাদিকটিই এতসব কথা তার কাগজে লিখে ছাপিয়ে ছিল। তার ফলেই তাকে পিটুনি খেতে হয়েছে হরিশংকর চৌধুরীর হাতে।

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গার্গী বলল, তাহলে তো তাকে পিটুনি খেতেই হবে। সরাসরি দুটো খুনের চার্জ! নিশ্চিত ফাঁসি হবে প্রমাণ হলে। যাই হোক, আমার তো তাহলে বীরভঙ্গপুরে না গিয়ে উপায় নেই, শঙ্খলেখা।

—তুই যাবি? শঙ্খলেখা সত্যিই আঁতকে উঠল। হয়তো সেই ভয়ঙ্কর হরিশংকর চৌধুরীর কথা ভেবেই। তারপর বলল, ঠিক আছে, তাহলে বরং আমি পরের বার বাড়ি গিয়ে সব খোঁজখবর নিয়ে আসি। যদি শুনি, কোনও ঝামেলা নেই আর, তখন না হয় —

—দ্যার্টস রাইট, এতক্ষণে সহজ হয়ে নিঃশ্বাস নিল গার্গী, দ্যাটস লাইক অ্যা গুড গার্ল, বলে আজকালকার ছেলেমেয়েদের কায়দায় কাঁধ শ্রাগ করার ভঙ্গি করল। তার ভাবভঙ্গি দেখে তার সঙ্গে হেসে উঠল শঙ্খলেখাও।

গার্গী অবশ্য সেখানেই থামল না, কিছু একটা ভাবল কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে, যেমন সে সারাদিনের মধ্যে হাজারবার ভেবে থাকে, তারপর বলল, কিন্তু সেই সাংবাদিকের গতি তাহলে কী হল? সে খুন করে পালিয়ে গেল, না তাকেই খুন করা হল! অবশ্য ভুয়ো সাংবাদিক যখন, তার হোয়ার-অ্যাবাউটস আর আমার পক্ষে খুঁজে বার করা সম্ভব নয়! তবে—, বলে গার্গী হঠাৎ তার হাতের আঙুল তুলে তুড়ি মারার ভঙ্গি করল, দি আইডিয়া, সে তো আবার শিল্পীও ছিল নাকি। তাহলে এরকম কোনও তরুণ শিল্পী কলকাতার শিল্পজগৎ থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে গেল কিনা সে হদিশও তো নেওয়া যেতে পারে—

শঙ্খলেখা গার্গীর টেনশিটি দেখে অবাকই হয়ে উঠছে ক্রমশ, নাহ্। তোর মাথা থেকে সেই রাজবাড়ির ভূত আর নামানো যাবে না মনে হচ্ছে। তরুণ শিল্পীটির হদিশ তুই এখন পাবিই বা কী করে।

গার্গী মিটমিট করে হাসছে, দাঁড়া না, আমার এক নতুন বান্ধবী জুটেছে। তার নাম ডোনা। ডোনা চ্যাটার্জি। তার বাবা একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। তিনি নিশ্চই কিছু হালহদিশ দিতে পারবেন। দ্যার্টস দ্যা আইডিয়া।

বলতে বলতে গার্গী শঙ্খলেখাদের হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এল পথে। সত্যিই তার মাথায় এখন রাজবাড়ির ভাবনা বেশ গ্যাঁট হয়ে বসেছে। কতদিন থাকবে তো সে জানে না। এরকম এক-একটা বিষয় তার মগজে ভর করে প্রায়শ। তারপর সে অন্ধের মতো ছুটে চলে তার পিছু পিছু। কয়েকদিন পরে একটা দুর্ধর্ষ লেখা সাদা পৃষ্ঠায় নামিয়ে তবে খালাস। তবে এরকম খুনের ঘটনা নিয়ে কখন মাথা ঘামায়নি এর আগে।

বড়রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে প্রথম যে পাবলিক বুথটি তার নজরে এল, তার ভেতর ঢুকে ডায়াল ঘোরাল, হ্যালো—

ফোনের ওপাশ থেকে ভেসে এল ডোনার মা বনানীর দলা, কে, গার্গী?

—আন্টি, ডোনাকে একটু দেবেন ফোনটা? খুব জরুরি কথা আছে।

—জরুরি! বনানী তৎক্ষণাৎ হতাশ করলেন তাকে, ডোনা তো বাড়িতে নেই। বন্ধুদের সঙ্গে আউটিঙে গেছে পরশু। কাল ফেরার কথা ছিল, কিন্তু বোধহয় আটকে গেছে কোনওভাবে।

pathagar.net

—আউটিঙে? কোথায়, আন্টি?

— সে অনেকদূর। গুপ্তিপাড়ায়। হয়তো আজ রাতে ফিরতে পারে। ফিরলে তোমাকে ফোন করতে বলব।

—ঠিক আছে, আন্টি। আমি এখন পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছি। আমার বাড়ি ফিরতেও হয়তো একটু রাত হবে আজ। তখন যোগাযোগ করে নেব।

বলে ঝুপ করে রিসিভার রেখে দিল গার্গী। ডোনার সঙ্গে দিন চার-পাঁচ আগেই দেখা হয়েছিল তার। কই, তখন তো তাকে বলেনি আউটিঙে যাওয়ার কথা! বললে সেও হয়তো তাদের সঙ্গে শামিল হত অভিযানে। পরক্ষণেই অবশ্য মনে হল, নাহ্ ডোনা হয়তো তার ছেলেবন্ধুদের সঙ্গেই ঘুরতে বেরিয়েছে। যা উড়নচণ্ডি স্বভাব ওর। তাহলে গার্গী যেতে পারত না। সে আবার একটু রক্ষণশীল। একেবারে ঠাকুমা-ঠাকুমা হয়তো নয়, তবু সমাজ সংসারের নর্মস্ কিছুটা তো মেনে চলতে হয় বঙ্গসমাজে বাস করতে হলে। ডোনা অবশ্য এত সব মানে না।

আসলে ডোনাকে যা দেখেছে গার্গী, ও বেশ মড্ ধরনের। চুলের কারুকাজে, পোশাকের চমকে প্রায়ই বিপ্লব ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। হয় তো কোনও দিন ছেলেদের সঙ্গে সিগারেট খেতে শুরু করল দারুণ মেজাজে। কখনও ছেলেদের হোস্টেলে গিয়ে পানীয়ও। কদিন আগে এমন একটা মিনিস্কার্ট পরে ক্লাস করতে এসেছিল যে, সারা চত্বরে যেন একটা অস্বস্তি, একটা গুঞ্জন। কিন্তু ডোনার তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনিতে ডোনার গায়ের রং যাকে বলে সাদা-ফর্সা, মেম সাহেবদের মতো তার শরীরের গড়ন, পোশাকেও কখনও তেমনি মেমসাহেব মেমসাহেব ভাব। ডিজাইনও আমদানি করে প্যারিস কিংবা ফ্রাঙ্কফুর্ট ধরনের। এ মেয়ের সঙ্গে গার্গীর বন্ধুত্ব হওয়াটাই আশ্চর্যের।

কিন্তু এতসব আশ্চর্য নিয়েই তো জীবন।

গার্গী নিজে দুঃসাহসী না হলেও অন্য কারও দুঃসাহস তাকে চমকে দেয়। সে অনেকবার ভেবেছে, এ দেশে বাস করেও ডোনা কী করে বিদেশিদের ঢং ঢাং আত্মীকরণ করল! সে অবশ্য শুনেছে, ডোনারা নাকি কিছুদিন আমেরিকায় বাস করে এসেছে। সেই সুবাদেই কি তার এহেন বোহেমিয়ান জীবনযাপন!

তিন

পুরো কালনা রোড ড্রাইভ করে এসেছে মন্দর। দিল্লি রোড পড়তেই ডোনা তার কপালের ওপর উড়ে এসে পড়া চুলের রাশ বাঁহাতে সরিয়ে বলল, দাও, এবার আমিই চালাই—

মন্দার তার ঘন ছাইরঙের মারুতি ভ্যান থামিয়ে সিট অদলবদল করতে বলল, দিল্লি রোড কিন্তু একটা খুনি রাস্তা। সেদিন যাওয়ার পথে দ্যাখোনি, পর-পর তিন জায়গায় উল্টেপাল্টে পড়ে আছে ভারী ভারী ট্রাকগুলো! একটা অ্যাম্বাসাডার তো দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে ছিটকে গেছে ধানখেতে।

ডোনা কোনও কথা না বলে অ্যাকসিলেরেটরে চাপ দিতে শুরু করল। প্রথমে আস্তে, তারপর গিয়ার বদল করে গতিবেগ বাড়াতে শুরু করল দ্রুত। পরক্ষণেই একদমকে কিলোমিটারের কাঁটা ছুঁয়ে ফেলল আশির ঘর। তার স্টিয়ারিঙের এক আচমকা মোচড়ে টাল

pathagar.net

খেয়ে পড়তেই মন্দার আবার বলল, একটু আস্তে চালিয়ো, ডোনা। সেদিন কোথায় যেন দেখলাম, রাস্তার পাশে একটা ফলকে লেখা রয়েছে, ইট'স বেটার টু বি মিস্টার লেট দ্যান টু বি লেট মিস্টার......

অ্যাক্সিলেরেটরে আরও একটু চাপ দিয়ে কিলোমিটার কাঁটা একশো'র দাগে ছুঁইয়ে দিতে দিতে ডোনা বলল, মিস্টার নয়, মিস। লেট মিস ডোনা চ্যাটার্জি, বলে খিলখিল করে শরীর দুলিয়ে হেসে, মন্দারকে চমকে দিয়ে ঝড়ের মতো পার হয়ে চলল দিল্লিরোডের মসৃণ, একটানা পথ। সামনেই বিশাল শরীর নিয়ে একটা পাঞ্জাববডির ট্রাক আসছিল, তার মুখোমুখি হয়ে হঠাৎই কব্জির এক মোচড়ে তাকে এমন ভড়কি দিল যে, ট্রাক-ড্রাইভার আর একটু হলেই মারুতি বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ধান খেতে নেমে পড়েছিল আর কি। তার অবস্থা দেখে জিভে চুক্‌চুক শব্দ করল ডোনা, আহা, বেচারি।

মন্দার প্রায় আঁতকে উঠল তার গাড়ি চালানোর রকম দেখে, নার্ভাসও বোধ করল খানিক, কিন্তু আর কিছু বলতে সাহস পেল না। বললেই হয়তো ডোনা আরও এমন কোনও কারিকুরি দেখাতে শুরু করবে যে, আজ আর তাদের কলকাতা না পৌঁছে ভর্তি হতে হবে কোনও হাসপাতালের বেডে। কিংবা লোকালয় ছেড়ে আরও দূর অন্য কোনও লোকে।

ডোনার গাড়ি চালানোর হাত অবশ্য খুব ভালোই, লং ড্রাইভেও তার অভ্যেস আছে, কিন্তু তার অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তাই মন্দারের ভীত হয়ে ওঠার কারণ। কিছুকাল আগেও ডোনাদের একটা গাড়ি ছিল। সে সময় সে-ই গাড়িটা চালাত বেশিরভাগ সময়। কিন্তু ক্রমাগত পেট্রলের দাম বাড়তে থাকায় বছর দুয়েক হল গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছেন তার বাবা। তারপরও অবশ্য এর-ওর গাড়ি চালিয়ে ড্রাইভিংটা রপ্ত রাখতে ভুল করেনি ডোনা। তবে যা ভাবনার বিষয় তা হল, তার গাড়ি-চালানোর ধরনটা বরাবরই বেপরোয়া। তার বেহিসেবি জীবনযাপন, পোশাকআশাক, চালচলনের মতোই তার উড়নচণ্ডি ড্রাইভিং। সব সময়ই সে নিজেকে এক এবং অদ্বিতীয় ভাবতে পছন্দ করে। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোয়নি, অথচ তার ভাবভঙ্গি, চাউনি, তুখোড় সংলাপ— সবই এত অসাধারণ যে, অন্যের দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে অতিসহজেই। যখন তাদের বাড়ির ড্রয়িংরুমে সাদা ধবধবে হাউসকোর্টটি পরে বসে থাকে সোফায় গা এলিয়ে, তখন প্রায় রাজহংসীর মতোই তার শরীরে অহংকার। যখন ক্লাসে বসে থাকে সুবোধ বালিকার মতো নিষ্পাপ, যেন কিছুই জানে না এমন মুখভঙ্গি করে, তখন অধ্যাপকদের চোখ কিংবা পড়ানো সবই আবর্তিত হয় ডোনাকে ঘিরেই। আবার যখন উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একটি শান্ত, নিরীহ প্রশ্ন করে বিভ্রান্ত করে দেয় স্বয়ং অধ্যাপককেই, তখনও ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক সবারই নজর আছড়ে পড়ে তারই ওপর। আবার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, কিংবা কলেজের লম্বা করিডোর দিয়ে দারুণ মড-ফ্যাশনের কোনও পোশাক পরে হেঁটে যায় ছিপনৌকার মতো অনায়াস ভঙ্গিতে, তখনও সে-ই যেন সম্রাজ্ঞী, অন্য কেউ নয়। আবার এখন, এই যে তেলচুকচুকে, কোথাও বা হঠাৎ একটা স্পট-হোল আগ্‌লি-স্পটের মতো জেগে আছে এহেন থাকা দিল্লি রোডের বুকের ওপর দিয়ে তীব্রগতিতে মারুতি হাঁকিয়ে ছুটছে, তখনও সে-ই যেন রাস্তার একমাত্র চালক, একক অধিশ্বরী। দু-একজন ট্রাক-ড্রাইভার সত্যিই তার গতির কাছে সম্ভ্রম জানিয়ে তাদের দৈত্যকায় ট্রাক স্লো করে দিল সহসা, কিংবা হয়তো চালিকার রূপ ও সৌন্দর্য দেখে কুর্নিশ জানাল কয়েক লহমা।

মন্দার অবশ্য এন্‌জয় করছিল বেশ। সে-ও গতি পছন্দ করে। গুপ্তিপাড়া থেকে বেরোতে

pathagar.net

একটু দেরিই করে ফেলেছে বলে গোটা কালনা-রোড সে-ও ঝড়ের গতিতে চালিয়ে এনেছে এতক্ষণ। এখন ডোনার পাশে বসে তার হাতে কব্জির অনায়াস দক্ষতা, দু'পায়ে অ্যাকসিলেরেটরে, ব্রেক, ক্লাচের রিডে সা-রে-গা-মা বাজানোর মতো ক্রমান্বয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার ভঙ্গি, হঠাৎ আল্‌তো আঙুলের ছোঁয়ায় গিয়ার বদলানো, তারই ফাঁকে ফাঁকে তার ডিম্বাকৃতি ফর্সা মুখের ওপর থেকে ছড়ানো চুলের গুচ্ছ সরিয়ে দেওয়া, সবই মন্দারের কাছে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। তবু আবার একসময় ফিসফিস করে বলল, বি অ্যালার্ট, ডোনা, মোমের পুতুলের মতো মারুতিটা যদি কোনও দৈত্যকায় ট্রাক একলহমা চুমু খেতে চায়—

— কী আর হবে! বড়জোর কিমা হয়ে যাব তুমি, আমি এবং তোমার মারুতি, সবাইই, বলে ডোনা অদ্ভুত রহস্যময়ভাবে হেসে উঠে বোধ হয় আর একটু চাপ দিল অ্যাকসেলেটর রিডে।

মন্দার অগত্যা ক্ষান্ত দিল। পাগলকে সাঁকো নাড়াতে না বললেই সে আরও বেশি করে নাড়াবে। ডোনা বরাবর এমনই জেদি, একগুঁয়ে, অবাধ্য কখনও কখনও। কিংবা হয়তো তার হঠাৎ মনে হয়েছে এক্ষুনি কলকাতা ফেরার দরকার। এই মুহূর্তেই তাই এই ঝড়বৎ প্রস্থানের তাগিদ।

কলকাতা যাওয়ার তাড়া অবশ্য মন্দারের বেশি। বস্তুত পরশু সকালেই গুপ্তিপাড়া থেকে ফেরার কথা ছিল তাদের। মাত্র একরাত গুপ্তিপাড়ার আস্তানায় কাটিয়ে তারা কলকাতা ফিরবে এমন কড়ারেই সে ডোনার সঙ্গে কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল দিনতিনেক আগের এক উম্‌সুম্‌ ভোরে। বেরোবার দিন ঠিক এরকমই বলেছিল ডোনা; কিন্তু গুপ্তিপাড়ার সেই প্রায় পোড়োবাড়িটায় থাকতে গিয়ে হঠাৎ তার এমনই ভালো লেগে গেল যে, যাব-যাচ্ছি করে তিনদিন তিনরাত্রি দিব্যি থেকে গেল সেখানে। বেশ অবাকই হয়েছিল মন্দার। ডোনা অবশ্য দারুণ মড্‌-ধরনের মেয়ে, এরকমই এলোমেলো, উদ্‌ভ্রান্ত জীবনযাপন করাই তার পছন্দের। তার সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে যাওয়াটা যেমন মন্দারের জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, তেমনই তার সঙ্গে এভাবে দ্রুত প্রেমে পড়াটাও। তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় মন্দার ভাবতেই পারেনি এহেন বিচিত্র মেয়েটি তার প্রেমে হাবুডুবু খাবে। এখন মন্দারের এমন হয়েছে, ডোনাকে না দেখে সে একদিনও সুস্থির থাকতে পারে না।

তবে ডোনার সঙ্গে হঠাৎ করে এভাবে বেরিয়ে পড়াটা তার এই প্রথম। তাই সেটাই ছিল তার কাছে পরম বিস্ময়ের। ডোনাই ক'দিন আগে দিয়েছিল খবরটা, জানো, বাবার এক বন্ধুর একটা অদ্ভুত ধরনের বাড়ি আছে গুপ্তিপাড়ার কাছেপিঠে। বিশাল তিনতলা বাড়ি। তবে ভীষণ পুরানো। অনেকটা মহেঞ্জোদাড়ো টাইপের। চলো না, একদিন আবিষ্কার করে আসি, তোমার ওই মারুতি করে—

ছাইরঙের এই মারুতিভ্যানটা সদ্য কিনেছে মন্দার, এখনও তেমন করে আউটিঙে বেরোনো হয়নি। তাই ডোনার প্রস্তাব কিছুটা বুঝে, কিছুটা না-বুঝেই লাফিয়ে উঠেছিল, ফাইন—

কতটা ফাইন তা ডোনার সঙ্গে এবার গুপ্তিপাড়া না গেলে সত্যিই বুঝতে পারত না। পুরানো বাড়ি যে আসলে কতটা পুরানো তা ওখানে না গেলে বোঝা সম্ভবই নয়। ডোনার বাবার বন্ধুও একজন ছবি-আঁকিয়ে এবং স্বভাবতই বোহেমিয়ান। তাই এমন একটা পোড়োবাড়ি হঠাৎ কিনে ফেলেছেন শখ করে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, বাড়িটা কেনার পর রেখে

pathagar.net

দিয়েছেন প্রায় অ্যাজ্-ইট-ইজ, মহেঞ্জোদাড়োর আদলেই। জঙ্গল, আগাছাও রয়ে গেছে তার সর্বাঙ্গে। মন্দার সে বাড়ির দশা দেখে আঁতকে উঠেছিল প্রথমটায়। যখন তারা পৌঁছেছিল বাড়ির সামনে, তখন ঠা-ঠা দুপুর। চারিদিকে ঝোপ-জঙ্গল, আর্বজনার স্তূপ, সামনে পেছনে ভাঙা পাঁচিল, ঢোকার মুখে ধোঁয়া-ওঠা পথের দু-ধারে কয়েকটা বাজ পড়া পামগাছ, এবং পাঁচিলের চারপাশে খাঁ-খাঁ শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। বাড়ির সিঁড়ি প্রায় পড়ো পড়ো, তবু সিঁড়িটা এমনভাবে বাঁশের প্যালা দিয়ে ভেঙে পড়া ঠেকানো হয়েছে, তার ধাপগুলো পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে যে, তাতে কোনও ক্রমে তিলতলায় পৌঁছানো যায়। পুরো একতলা-দোতলা তো বটেই, তিনতলার বাকি ছ-সাতখানা ঘরও ডাহা অন্ধকার, শুধু তিনতলার দক্ষিণ প্রান্তে একখানা ঘর কী অলৌকিকভাবে রেনোভেট করে আধুনিক কায়দায় সাজানো হয়েছে বসবাসের জন্য।

এহেন অদ্ভুত বাড়িতে পৌঁছে বিহ্বল মন্দার বলে ফেলেছিল। খুবই বিদ্‌ঘুটে টেস্ট তো তোমার বাবার বন্ধুর!

ডোনা কিন্তু একেবারেই অবাক হয়নি। তার তীব্র লাল-হলুদ রঙের স্কার্ট-ব্লাউজ পরা শরীরটা নিয়ে ঘুরপাক খেল এক মুহূর্ত, লাফিয়ে উঠে বলল, আহ্, কী দারুণ। বলে ডানলোপিলো পাতা খাটে ধাঁই করে শুয়ে ওলটপালট খেয়ে নিল একবার, পরক্ষণেই উঠে এসে বলল, আসলে এ বাড়ির রহস্য কি জানো! মডার্ন সুযোগসুবিধের মধ্যে বাস করেও একটা পোড়োবাড়িতে থাকার রোমাঞ্চ উপভোগ করা। তাকিয়ে দ্যাখো, এই ঘরখানার মেঝেয় দামি ইটালিয়ান টাইলস্, দেওয়ালে প্লাস্টার অফ্ প্যারিস, ঘরের ভেতর পর পর সাজানো খাট-আলমারি-ওয়ারড্রোব, কিচেনে গ্যাস, প্রেশার কুকার, ক্যাসারোল, ফ্রিজ, বাথরুমে গিজার, শাওয়ার, এমনকি কমোড পর্যন্ত। এ-বাড়ির মাত্র একটা ঘরেই ইলেকট্রিসিটি, ব্যস্। বাকি সব ঘরে পুরানো আসবাবপত্র, টিকটিকি, মাকড়সা আর চামচিকের বাসা, সবঘরেই পুরানো মরচে-ধরা তালা লাগানো, ঠেললেই চাপ-চাপ অন্ধকার। রীতিমতো থ্রিলিং।

তা এই তিনদিন, মন্দারের জীবনেও এক স্মরণীয় থ্রিল এনে দিয়েছে ধু-ধু মাঠের মধ্যে একলা-একা দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বাগানবাড়িটি। যেমন শতাব্দীর ধুলো জমে থাকা মহেঞ্জোদাড়ো-প্রতিম বাড়িটির ইট-কাঠ-কড়িবরগা আবিষ্কার করেছো, তেমনি আবিষ্কার করেছো নিজেদের। কয়েকদিন ধরে তারা ফিরে গিয়েছিল সেই মহেঞ্জোদাড়োর পৃথিবীতে, গুহামানবদের আদিম জীবনযাপন খুঁজে বেড়িয়েছে পাগলের মতো। ডোনা শুধু যে কথাবার্তায়, চালচলনে, বুদ্ধিতেই তুখোড় না নয়, প্রেমের ছলাকলায় যে দুরন্ত পারদর্শী তা উপলব্ধি করেছে বারবার। তবু সব অভিজ্ঞতার পরেও মন্দারের মনে হয়েছে, ডোনাকে সে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। ডোনা অধরা, রহস্যময়ীই।

যেমন এই মুহূর্তে যে-ডোনা ঝড়ের মতো ড্রাইভ করে চলেছে, সে-ও যেন মন্দারের চেনা নয়। হু-হু করে তীব্রগতিতে কালো পিচরাস্তা পেরোতে পেরোতে হঠাৎই ব্রেক কষে থমকালো হাইওয়ের পাশেই একটা ধাবার সামনে, বাঁই করে মারুতির মুখ ঢুকিয়ে দিল গোটা চার ছয় দড়ির খাটিয়া-ঝিমোতে- থাকা খোলা চত্বরের ভেতর। মন্দারের দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলল, দাঁড়াও, একটু চায়ের হদিশ করি।

মন্দারের ফেরার তাড়া ছিল। হাতের কব্জিতে ঘড়ির দিকে নজর রেখে বলল, নামার কী দরকার! এই তো ফ্লাস্কে, এখনও অনেকটা চা রয়ে গেছে। ঢেলে দিচ্ছি।

pathagar.net

ডোনা ততক্ষণে দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙছে তার এতক্ষণের ক্লান্তি দূর করতে। মন্দারের প্রস্তাবকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলল, ধুর, ফ্লাস্কের চা তো আমার তৈরি করা। এর আগে দু-দুবার খেয়েছি আসার পথে। এখন ধাবার চা না খেলে আর একটুও এনথু পাচ্ছি না। নামো, নামো শিগগির—

মন্দার নেমে আসে অনিচ্ছুক পায়ে। অন্তত বেলা চারটের মধ্যেও কলকাতা পৌঁছাতে পারলে সে জনসন অ্যাণ্ড টেনিসন কোম্পানির টেণ্ডারটা ধরতে পারবে আজ। ওখানে টেণ্ডার জমা দেওয়ার আজ শেষ দিন। গতকালও অন্য একটা কোম্পানি টেণ্ডার জমা দেওয়ার কথা ছিল তার। কাল সকালে উঠে সে 'ফিরব' বলতেই ডোনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে তাকে, ধুর, আজ তো কিছুতেই না। এ বাড়িতে এসে কেমন একটা নেশা ধরে গিয়েছে পোড়োবাড়িতে বাস করার যে এমন থ্রিল তা কে জানত! বাবার বন্ধু সত্যিই একটা জিনিয়াস। প্রায়ই নাকি এখানে চলে আসত দু-তিনদিনের জন্য। একতাড়া অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি এঁকে নিয়ে যান কলকাতায়। কী বিশাল দামে নাকি বিকোয় ছবিগুলো।

থ্রিল অবশ্য মন্দারেরও কম হয়নি। বস্তুত ডোনার সঙ্গে বসবাসের প্রতিটি মুহূর্তই যেন এক অদ্ভুত উত্তেজনায় ভরপুর। ডোনা নামের এই ঝোড়ো হাওয়ার তরুণীটি যে প্রতিমুহূর্তে কী অবলীলায় নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তা তার সঙ্গে না মিশলে উপলব্ধি করাই সম্ভব নয়।

কিন্তু মন্দার আপাতত আপাদমস্তক ওতপ্রোত হয়ে আছে তার টেণ্ডারের ভাবনায়। মাত্র বছর পাঁচ-ছয় হল সে সাকার হয়েছে একটি ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের ছোট্ট ব্যবসায়ে নেমে। আর্কিটেক্চরের একটি কোর্সে ভর্তি হওয়ার দু-তিন বছর পরে সে হঠাৎই সিদ্ধান্ত নেয় চাকরি নয়, স্বাধীন ব্যাবসা করে অর্থ উপার্জন করবে। সে জানত, সব সময়ই তার ভেতরে কাজ করে এক আশ্চর্য সৌন্দর্যবোধ। কোনও একটি তরুণীকে দেখে যেমন সে চুলচেরা বিচার করে মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরী কি না, সুন্দরী হলে তার সৌন্দর্যের চাবিকাটি ঠিক কোনখানে। সুন্দরী না হলে ঠিক কোনখানে তার খুঁত। কোথায় কী প্রসাধন হলে সে আর একটু সুন্দরী হয়ে উঠতে পারত এইসব, ঠিক তেমনই ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের প্ল্যান করতে গিয়েও সে সচেতন হয়ে পড়ে, কীভাবে একটি ঘরকে সাজিয়ে তোলা যায় আরও চমৎকারভাবে, ছোট্ট স্পেসকে শুধু সাজানোর গুণে বাড়ানো যায় তার পরিসর, সৌন্দর্য—

মাত্র ক'বছর ব্যবসায়ে নেমেই যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে ইতিমধ্যে। তার ছোট্ট কোম্পানি 'ইনডেক' শুধু তরতর করে ব্যাবসা বাড়িয়েই চলেছে তাই না, কলকাতার অনেক নামীদামি ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে রীতিমতো। এর মধ্যে লিণ্ডসে স্ট্রিটে ছোট্ট একটি অফিস খুলেছে, তাতে জনাতিনেক উৎসাহী যুবক-যুবতী বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। কখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে, কখনও বিভিন্ন অফিসে খোঁজখবর নিয়ে তারা টেণ্ডারের কাগজ তৈরি করে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাগজপত্রও জমা দেয়। টেণ্ডার অ্যাক্সেপ্টেড হলে কাজ শুরু করে দেয় নিখুঁত জ্যামিতিক পদ্ধতিতে, কাজ শেষও করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। শুধু প্লাইউড, সানমাইকা, টাইলস, কাচের কারিকুরিতেই হাজার হাজার টাকা লাভ।

ব্যাবসা এখন উঠতির মুখে। স্বভাবতই মন্দারকে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হয় কোন্ সংবাদপত্রে কী টেণ্ডারের খবর বেরোল। সেখানে যোগাযোগ করা, টেণ্ডার খোলার দিন হাজির থাকা ইত্যাদিতে। বেশি কাজ ধরার তাগিদে কম লাভ রেখে টেণ্ডার দেয় সে, তাতে কখনও

pathagar.net

'ইনডেক' কাজ পায়, কখনও পায়ও না। বহুক্ষেত্রে নানান বাধাবিপত্তি দেখা দেয়। কত জায়গায় অসৎ আবদার এসে ভিড় করে, কতজনকে বিভিন্নভাবে তুষ্ট করতে হয়। কখনও নানা প্রলোভনের হাতছানিও না আসে তা নয়। এই পাঁচ-ছ বছরেই মন্দার জেনে গেছে, ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের এই জগৎ দারুণ কমপিটিটিভ, সারাক্ষণই এক টানাপোড়েনের ভেতর কাজ করতে হয়। এখানে টিকে থাকতে গেলে প্রবল লড়াই চালিয়ে যেতে হবে সদা সতর্ক পা ফেলে। প্রতিপক্ষ প্রতিটি কন্‌সানই রীতিমতো ধুরন্ধর, চোখের পলক না ফেলতে হঠিয়ে দেবে অন্যকে। কোনও একটি টেণ্ডার ফেল করা মানেই প্রতিযোগিতা থেকে কয়েক ধাপ পিছিয়ে যাওয়া, তার সঙ্গে বেশ কয়েক হাজার, কখনও লক্ষ টাকার ক্ষতি।

অতএব প্রতিটি টেণ্ডারের ব্যাপারেই মন্দারকে টানটান সতর্ক থাকতে হয়। কোনও ক্রমেই যেন তার আওতা থেকে ফস্কে না বেরিয়ে যায় কাজগুলো। অথচ তার জীবনে এই প্রথম, গুপ্তিপাড়া অভিযানে বেরোবার পর থেকেই, পর-পর টেণ্ডার মিস্ করার ঘটনাই ঘটে চলেছে। কালও তার অনুপস্থিতিতে নিশ্চিত তার সংস্থার ছেলেমেয়েরা টেণ্ডার জমা দিতে পারেনি। প্রায় দু'লাখ টাকার টেণ্ডার ছিল সেটা। আজও তাদের তিন লাখ টাকার টেণ্ডার জমা দেওয়ার কথা। সম্ভবত এ টেণ্ডারটি মিস হয়ে যাবে স্রেফ ডোনার খামখেয়ালিপনার জন্যই। মন্দার বেশ কয়েকবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, প্লিজ ডোনা, তুমি ব্যাপারটার ইম্‌পর্ট্যান্স বোঝো। একটা টেণ্ডার মিস করা মানে—

ডোনা প্রতিবারই খিলখিল করে হেসে উঠেছে, মন্দারকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছে, অদ্ভুত মানুষ তো তুমি। দু-একদিনের আউটিংএ বেরিয়েছ, তাও এমন একটা রোমহর্ষক স্পটে, যেখানে রাতের বেলা তিনতলার বারান্দায় বেশিক্ষণ ঘোরাঘুরি করলে অন্ধকারে হয়তো দু একটা ভূতফুতের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যেতে পারে, আর তুমি কিনা টেণ্ডার-টেণ্ডার করে দু-চোখের পাতা এক করতে পারছ না!

শেষ পর্যন্ত রণে ক্ষান্ত দিয়েছে মন্দার। ডোনা সত্যিই অবুঝ, খেয়ালি, আনপ্রেডিক্টেব্‌ল্। কখন্ ওর মগজে কী আইডিয়া ঘাই দিয়ে উঠবে তা বোধহয় ও নিজেও জানে না। এই যেমন এ মুহূর্তে দুরন্ত রোদ্দুর থেকে মারুতিটাকে বাঁচাতে পার্ক করল মস্ত একটা রেন-ট্রি গাছের এপাশে। তারপর দরজা খুলে নেমে এল বিজয়িনীর ভঙ্গিতে, রেন-ট্রি গাছের তলায় খোলা চত্বরে বিছোনো একটি খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে হুকুম করল, জলদি জলদি দো গেলাস চায়ে—

ধাবার মালিক মস্ত মোচ্-ওলা এক হিন্দুস্থানি, দুপুরের অলস আরামে টাকা গুনছিল ক্যাশ-বাকসের সামনে বসে। সারাদিন ট্রাক-ড্রাইভারদের সামলানো ছাড়াও এখন অজস্র ট্যুরিস্টের বায়নাক্কা মেটাতে হয় তাকে। এখনও দু-একটি ড্রাইভার মৌজ করে রুটি তড়কা খাচ্ছে। ডোনার হুকুম শুনে চোখ ঘুরিয়ে তৎক্ষণাৎ তেরো-চোদ্দো বছরের এক রোগা-পাতলা ঝাঁকড়াচুলো কিশোরের উদ্দেশে চালান করে দিল সেই নির্দেশটিই।

ডোনা তখন খাটিয়ার ওপর কাত হয়ে শুয়ে, একটা কনুই ভাঁজ করে সেই হাতের করতলে মাথার ভার রেখে মন্দারকে বলছে, এই ধাবার পাঞ্জাবি-চায়ের যা টেস্ট না, এক-এক চুমুকে এক-এক বছর বয়স কমিয়ে দেয়, বুঝলে?

মন্দারের চোখ তখন তার হাতের কব্জির দিকে। এখনও রওনা দিলে হয়তো ডালহৌসি পাড়ায় পৌঁছাতে পারত শেষ মুহূর্তে। নিশ্চই তার অফিসের কেউ না কেউ টেণ্ডার পেপার

pathagar.net

তৈরি করে জনসন অ্যাণ্ড টেনিসন কোম্পানির গেটে অপেক্ষা করছে তার জন্য। সে টেণ্ডার ফর্মে সই না করলে জমা দিতে পারবে না কাগজগুলো। হয়তো ভাবছে, মন্দার কাল না এসে পৌঁছাতে পারলেও আজ নিশ্চই এসে পড়বে বেলা চারটের মধ্যে।

মন্দারের কোনও জবাব না পেয়ে ডোনা পুনর্বার বলল, শুধু এই খাবার চা খেতে আমি কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে দিল্লি রোডে চলে আসতে পারি—

ডোনা কী পারে আর কী পারে না, তার কিছুটা ইতিমধ্যে জেনেছে মন্দার, তবে অনেকটাই জানেনি এখনও। যেটুকু জেনেছে তা স্তম্ভিত করে দিয়েছে তাকে। মাত্র কমাস হল ডোনার প্রেমিক হয়েছে সে, শরিক হয়েছে ডোনার ভাবনাচিন্তার, তাতে তার এমন আশ্চর্য-আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, এই মধ্যেই সে একখানা মহাভারত লিখে ফেলতে পারে। ডোনার কথার মন্দার কোনও জবাব দেওয়ার আগেই চা এসে গেল তাদের হাতে।

প্রমাণ সাইজের কাচের গেলাসে গরম ধোঁয়া-ওঠা টলটলে ঘন চায়ে চুমুক দিয়ে ডোনা এবার অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল, তুমি কি এখনও টেণ্ডার নিয়েই ভেবে যাচ্ছ, মন্দার?

মন্দার করুণভাবে হাসল, এখন আর কোনও কিছুই ভাবতে পারছি না। তোমার পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন কখন যে কলকাতায় পৌঁছাতে পারব, কিংবা আদৌ পারব কি না তার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দিল্লি রোড শেষ হলে কলকাতার পথে টার্ন না নিয়ে তোমার স্টিয়ারিং হয়তো ঘুরে যাবে বোম্বেরোডের দিকে।

ডোনা সহসা খাটিয়ার ওপর সোজা হয়ে উঠে বলল, দি আইডিয়া, যাবে নাকি মন্দার, বোম্বেরোড ধরে? উলুবেড়িয়ার ওদিকে নদীর ধারে চমৎকার সব বাংলো আছে—

মনে মনে প্রমাদ গুনল মন্দার, তবু ডোনার কথায় হাসতে হল, গেলে মন্দ হয় না। ফুলেশ্বর কিংবা বাগনানের কোনও বাংলোয় আরও কয়েকদিন থেকে আসা যেতে পারে। চাই কি, ব্যাবসাপত্তর সব গুটিয়ে দিয়ে এভাবে বাংলোয় বাংলোয় ঘুরে কাটিয়ে দিতে পারি জীবনটা। স্রেফ যাযাবরের মতো, কি বলো?

তার কথায় সূক্ষ্ম একটা খোঁচা ছিল। ডোনা তা একেবারেই গায়ে না মেখে হেসে উঠল শরীর কাঁপিয়ে, বাহ্ চমৎকার বলেছ কিন্তু। যাযাবর জীবনযাপন আমার বরাবর ভীষণ পছন্দের। ভারি ইচ্ছে করছে, তোমাকে নিয়ে জিপসি হয়ে ঘুরে বেড়াই এক শহর থেকে আর এক শহরে—

দ্রুত পর-পর কয়েকটা চুমুক দিতে হাতের গেলাস নিঃশেষ করে খাটিয়া থেকে উঠতে যাচ্ছিল মন্দার। হঠাৎ ডোনা তার কথা মাঝপথে থামিয়ে তাকে উঠতে নিষেধ করল, হাতের ইশারায় দেখাল ধাবার ডানদিকে মস্ত চৌবাচ্চাটার চাতালের দিকে; যেখানে তখন বালতি বালতি জল ঢেলে স্নান করছে এক ট্রাক ড্রাইভার। চেক-কাটা লুঙ্গি পরনে, আদুল গা। সে আদুল শরীরে এমন অটুট স্বাস্থ্য ফেটে বেরোচ্ছে যে, সেদিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল ডোনা। তার প্রগল্‌ভ্ চাউনি মোটেই খুশি করল না মন্দারকে। সে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই ডোনা নীচু গলায় বলল, দ্যাখো, দূর থেকে দেখলে মন হয় না, একদম সিলভাস্টর স্ট্যালন?

মন্দার হাঁ-হয়ে গিয়ে বলল, ধুর, কিসে আর কিসে তুলনা? সামান্য একজন ট্রাক-ড্রাইভারকে দেখে—

—আমি বলছি, লোকটার স্বাস্থ্যের কথা। প্রফেসন যাইই হোক, কী পেল্লাস্ট চেহারা বলো ওর? মন্দারের বুকের কোথাও একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল। চেহারার ব্যাপারে তার সামান্য দুর্বলতা আছে। তার স্বাস্থ্য অটুট হলেও পুরুষদের নর্মাল হাইটের তুলনায় সে দৈর্ঘ্যে

একটু খাটোই। পাঁচ-পাঁচের মতো তার উচ্চতা। অন্তত ছ'ফুট উচ্চতার বিশালদেহী ট্রাক-ড্রাইভারকে দেখে সে হয়তো কিছু হীনমন্যতায় ভুগতে থাকে। চায়ের গেলাসটা খাটিয়ার পায়ার কাছে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, পুরুষদের ফিগার খুব একা ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার নয় কিন্তু। আসলে যা দরকার তা হল তার অকুপেশন, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স—এইসব। একটা সিনেমার কাগজে পড়েছিলাম কে যেন লিখেছিলেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্যাঙ্কের ফিগার, আর মেয়েদের দরকার ফিগারের ব্যাঙ্ক।

ডোনা হেসে উঠল ফের, বাহ্, সংজ্ঞাটি তো বেশ। কিন্তু সংজ্ঞাটি নিশ্চই কোনও পুরুষের মাথা থেকে বেরিয়েছে। মেয়েরা যে পুরুষদের ফিগারকেও ইম্পর্ট্যান্স দ্যায় তা তোমরা জানো না—

মন্দার ততক্ষণে ধাবার মালিককে চায়ের দাম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, চলো এবার, কুইক। ডোনা ফের চালকের আসনেই বসল। মন্দার তার পাশে এসে বসতেই একদমকায় অনেকখানি উড়িয়ে নিয়ে এসে বলল, আমাদের এক অধ্যাপক মণীশ রায় ঠিক এ ধরনের কথাই একটু অন্য মোড়কে মুড়ে বলতেন মাঝে মাঝে।

মন্দার ভুরু কোঁচকালো ফের, কী কথা?

—বলতেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে যা প্রধান তা হল মস্তিষ্ক, আর মেয়েদের হল শরীর।

মন্দারের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল, ওই একই হল আর কি, যার মস্তিষ্ক আছে, তারই টাকা হয়। ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স বাড়ে।

—উঁহু, মস্তিষ্ক অর্থে উনি মিন্ করেন প্রতিভা। ট্যালেন্ট। কম্প্যারেটেভ লিটারেচার পড়াতে পড়াতে হঠাৎ বার্নাড শ'-এর প্রসঙ্গ উঠতে বলেছিলেন কথাটা। সেই যে বার্নাড শ'এর এক প্রেমিকা ছিল, অভিনেত্রী, অপরূপা সুন্দরী, যে বার্নাড শ'কে প্রস্তাব দিয়েছিল, এসো, আমরা বিয়ে করি। তোমার প্রতিভা আর আমার সৌন্দর্য, দুয়ে-মিলে যে সন্তানের জন্ম হবে, সে হবে ভাবী পৃথিবীর এক অনন্ত বিস্ময়। খুবই কুৎসিত দেখতে ছিলেন বার্নাড শ। প্রেমিকার কথা শুনে কী জবাব দিয়েছিলেন জানো? বলেছিলেন, কিন্তু যদি উল্টোটা হয়? তোমার বুদ্ধি আর আমার রূপ। তা হলে, তাহলে কী হবে?

মন্দার হো হো করে হেসে বলল, তোমাদের ওই মণীশ রায় যে অর্থেই বলে থাকুন না কেন, আমার কথারই প্রতিধ্বনি ওটা। ট্যালেন্ট ব্রিঙ্কস মানি—

—উঁহু, ডোনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, প্রতিভা থাকলেই যে টাকা হবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। তার সঙ্গে ভাগ্যও ক্লিক্ করতে হবে। এটাও কিন্তু মণীশ রায়েরই কথা।

মন্দার হঠাৎই কৌতুক করে বলল, তুমি মণীশ রায়ের ফ্যান বলে মনে হচ্ছে। সারাক্ষণ মণীশ রায় মণীশ রায় করে চলেছ?

ডোনা একটা ভারী ট্রাককে অনায়াসে কাটিয়ে হেসে উঠল খিলখিল করে, তুমি কি আবার জেলাস হয়ে উঠছ নাকি? শুধু আমি নই, ক্লাসশুদ্ধ মেয়ে মণীশ রায়ের ফ্যান। এত চমৎকার পড়ান উনি, এমন চমৎকার ভয়েস যে কী বলব। চল্লিশের ওপর বয়স, অথচ এখনও এমন চমৎকার দেখতে যে, মেয়েরা একবার দেখলেই ওঁর প্রেমে পড়ে যায়।

—তুমিও পড়েছ নাকি ওঁর প্রেমে?

—আমার আগে অন্তত আরও পঞ্চাশজনের লাইন আছে, ডোনা মজা করে হাসতে হাসতে বলল, তবে তুমি বোধহয় জানো না, আমার মা-ও ওঁর সঙ্গে একই ইয়ারে পড়তেন।

মন্দার অবাক হয়ে বলল, তাই!

pathagar.net

—হুঁ। আমার মা-ও নাকি তখন ওঁর রূপমুগ্ধ ছিলেন। হয়তো মনে-মনে এখনও আছেন। এখন আবার আমিও। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, তোমার ফিগারটা সত্যিই ভাল।

ও, ওঁর কথা শুনেই বুঝি তুমি মডেলিং-এ উৎসাহী হয়েছ?

—ঠিক তা নয়। তার আগে থেকেই ফিগার সম্পর্কে আমি সচেতন ছিলাম। কিন্তু মডেলিং-এর অফারটা এনে দিয়েছিলেন শিহরণদা।

—ও, তোমাদের বাড়ির পেয়িং গেস্ট! মেয়েদের দেখলেই যিনি তাদের সঙ্গে ফেবিকলের মতো সেঁটে থাকেন?

—ওহ্, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। শিহরণদাই তো 'রিক্রিয়েশন ফ্যান কোম্পানি' থেকে অফারটা এনে দিয়েছিলেন। আমিও চট করে রাজি হয়ে গেলাম। ভাবলাম, দেখিই না, ক্লিক করে কি না।

—ক্লিক করে গেল তো?

—হুঁ, বেশ নাম হয়ে গেল হঠাৎ। জানো, গত সপ্তাহে এক সাবান-কোম্পানি থেকে একটা অফার এসেছে। ভাবতে পারো, মাত্র চার ঘন্টা দাঁড়াতে হবে ক্যামরার সামনে কয়েকটা পোজ দিয়ে। তাতেই তিন হাজার টাকা দেবে। ছবিগুলো ভাল হলে পরে ওদের অ্যাড-ফিল্মেও হয়তো আমাকে নেবে।

মন্দার ম্লান হেসে বলল, তারপর হয়তো ফিল্ম থেকেও অফার আসবে, কি বলো?

—খারাপ কি, আই লিভ ফর ফান। জাস্ট ফর ফান, বলে ডোনা শব্দ করে হেসে উঠল।

ডোনাকে হঠাৎ বেশ নিষ্ঠুর মনে হল মন্দারের। সে গুম হয়ে রইল প্রবল ক্ষোভে। হয়তো তাইই পরক্ষণে ডোনা প্রসঙ্গ বদলে চলে গেল অন্য আলোচনায়। স্টিয়ারিঙে মোচড় দিতে দিতে বলল, কয়েকদিন আগে কোন এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে একটা অদ্ভুত ধরনের খুন হয়েছে, খবরটা তোমার চোখে পড়েছে মন্দার?

মন্দার মাথা ঝাঁকাল, কই না তো।

—দেখনি! একেবারে পঞ্চম পৃষ্ঠায় বক্স করে নিউজ করেছিল। অবশ্য তুমি দেখবেই বা কী করে। তুমি তো খবরের কাগজে একমাত্র টেন্ডারের পৃষ্ঠাটাই যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ো। বাকি পৃথিবী রসাতলে গেল কি গেল না তাতে তোমার মাথাব্যথা নেই।

মন্দার উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, এই খুনটার খবর রাখা কি খুব জরুরি, ডোনা?

ডোনা হেসে উঠে বলল, না। আসলে খুনি হিসাবে যার কথা লিখেছে কাগজে, সে একজন সাংবাদিক, আবার আর্টিস্টও। কী আশ্চর্য, আর্টিস্টরা আবার খুন করতে পারে নাকি?

মন্দার ঝুঁকে পড়ল ডোনার দিকে, আমি এক বছর আর্ট কলেজে পড়েছিলাম, কিন্তু আর্টিস্ট হতে পারিনি বলেই ইনটেরিয়র ডেকরেশনের ব্যাবসাটা খুলে বসেছি। তুমি কি তাইই আর্টিস্টের প্রসঙ্গ তুলে আমাকে টিজ করতে চাইছ, ডোনা?

ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, না, তা নয়—

—তবে কি ভাবছ, আমিই ওই খুনটা করেছি কি না?

ডোনা এবার হেসে গড়িয়ে পড়ল, না। তবে এবার আমিই তোমাকে খুন করব, এই দ্যাখো না—

বলেই ডোনা তার দিল্লিরোড পরিক্রমা শেষ করে বিবেকানন্দ সেতুর পথ না ধরে হঠাৎ

pathagar.net

ডাইনে বাঁক নিল বোম্বেরোডের দিকে। এতক্ষণ একটা খুনের গল্প ফেঁদে সে ইচ্ছে করেই অন্যমনস্ক করে রেখেছিল মন্দারকে। মন্দার বুঝতেই পারেনি। সম্বিত ফিরতেই চ্যাঁচিয়ে উঠল, আরে, এদিকে কোথায় চলেছ?

ডোনা হাসল মিটিমিটি, চলোই না। এখনই কলকাতা ফিরে কী হবে? এই বেহদ্দ দুপুরে?

—আমার অনেক কাজ আছে, তোমাকে কখন থেকে বলছি, তুমি কানেই নিচ্ছ না, মন্দারের গলায় উপছে উঠল ক্ষোভ।

—ঠিক আছে, সামনেই হাওড়া ব্রিজে ওঠার মোড় আছে, না-হয় ওখানে গিয়েই বাঁক নেব।

মন্দার ক্ষুব্ধ, বিস্মিত। ডোনা কিন্তু নির্বিকার, ঝোড়ো হাওয়ার মতো উড়ে চলেছে বোম্বে রোড ধরে। কখনও একলহমা মুচকি হাসি খেলা করে যাচ্ছে তার হাল্‌কা লিপ্‌স্টিক মাথা ঠোঁটে। তারপর হঠাৎ মন্দারকে চমকে দিয়ে বলল, তুমি কখনও চুল্লু খেয়েছ, মন্দার?

—চুল্লু? মুখ বিকৃত করল মন্দার, তুমি তো জানোই কোনও ড্রিঙ্ক্‌স্ পছন্দ করি নে আমি।

—মারিজুয়ানা।

—ধুর, কী আলফাল বকছ? গাড়ি চালাতে চালাতে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?

ডোনা আবার শব্দ করে হেসে উঠল, চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটা ধাবা আছে। ওখানে চুল্লু পাওয়া যায়। যাবে নাকি?

মন্দার রেগে গিয়ে বলল, এখন কোথাও যাব না। এক্ষুনি কলকাতা না পৌঁছাতে পারলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে আমার।

— কী এত ক্ষতি হবে, মন্দার?

— টেন্ডারটা জমা না দিতে পারলে বিরাট লস্ হয়ে যাবে।

ডোনা তার দিকে তাকিয়ে ভুরুতে অদ্ভুত ভঙ্গি করল, আমার জন্য একদিন না হয় লসই হল তোমার। অনেক তো গেইন করেছ গত তিনদিনে?

—তুমি বুঝতে পারছ না ডোনা, ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের লাইনটা ভীষণ কমপিটিটিভ্। একটা টেন্ডার মিস্ করা মানে শুধু টাকাটাই লস্ হবে তা নয়, আরও অনেক ক্ষতি। কন্ট্রাক্টর হিসেবে শিগগিরই আমার গ্রেড্ চেঞ্জ হবে। সে তুমি বুঝবে না। ভীষণ ভাইট্যাল সময় এটা আমার কাছে। এত কমিপিটিটিভ্ লাইন—

— তাই নাকি? ডোনা তখনও নির্বিকার, কী রকম কমপিটিটিভ্?

—ভীষণ, মন্দার ফের বোঝাতে চাইল, একটা কাজ পাওয়ার জন্য যে কোনও কনসার্ন যে কোনও লেভেলে চলে যেতে পারে। ঘুষ, ব্যাক-বাইটিং, লেঙ্গি মারা—সবই চলে। দরকার হলে আমাকে খুন পর্যন্ত করতে পারে ওরা।

—তাই? ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, ঠিক আছে, আজ না-হয় তোমাকে আমিই খুন করি। একেবারে ঠাণ্ডা মাথায়—

বলে অ্যাক্সিলেরেটরে আর একটু চাপ দিল ডোনা। বাঁ-দিকে বাঁকড়া-দাসনগর হয়ে হাওড়া সেতুর পথ। সেদিকে বাঁক না নিয়ে তীব্রগতিতে ডোনা সোজা এগিয়ে চলল বোম্বেরোড ধরে। মন্দার এবার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল, এ কী করছ, কী করছ, ডোনা, গাড়ি ঘোরাও, ঘোরাও—

pathagar.net

ডোনা হাসতে হাসতে আরও চাপ দিল অ্যাকসিলেরেটরে, প্রায় বিদ্যুতের মতো কালো পিচঢালা পথ বেয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মন্দারের ছাইরঙের মারুতিভ্যান। সামনে একটা লংরুটের বাস আসছিল গাঁক গাঁক করে, নিখুঁত ভাবে তার পাশ কাটিয়ে চলল দূর থেকে আরও দূরে, তারপর কপালের ওপর উড়তে থাকা চুলের গুচ্ছ সরাতে সরাতে বলল, ভয় নেই, মধ্যরাতের আগে নিশ্চয় কলকাতা ফিরে আসব আমরা। লের্টস হোপ সো—

মন্দারের মুখখানা বিকৃত হয়ে গেল, অসহায়ভাবে কেবল বিড়বিড় করল, আমার চারদিকে এখন এত শত্রু, কেউই বোধহয় আমাকে আর বাঁচতে দেবে না।

ডোনা হাসল, নিষ্ঠুরের মতো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তাই! তা হলে তো তুমি এখন একজন ভি. আই. পি!

সামনে তখন একটা ওভারলোডেড ট্রাক আসছে, ঝড়ের মতো।

চার

পাশের বাড়ির দোতলা থেকে মস্ত দেওয়ালঘড়িটা ঢং ঢং করে একরাশ বাজনা শোনানো শুরু করতেই মণীশ সচকিত হয়ে তাঁর টেবিলক্লকের দিকে চোখ রাখেন। রাত এখন বারোটার মতো। এমন মধ্যরাত্রে দক্ষিণ কলকাতার এই শহরতলি এলাকা নাকতলা প্রায় ঘুমের দিকে ঢলে পড়েছে। একটু আগেই লোডশেডিং হওয়ায় অন্ধকারে ডুবে আছে এলাকা। মণীশেরও এই সময় শুতে যাওয়ার কথা। তাঁর চব্বিশবছরের ভরা যুবতী বৌ ঈষিতা অনেকক্ষণ আগেই তাঁকে তাড়া দিয়ে গেছে বিছানায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু মণীশের সামনে টেবিলের উপর এই মুহূর্তে খুলে রাখা রয়েছে তাঁর সেমিনারের কাগজপত্র। ইনভার্টারের আলো জ্বেলে মুখ নিচু করে লিখেই চলছেন একমনে। তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র দুদিন পরেই যে বিশাল সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তাতে একটি অভিনব বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করবেন তিনি। বক্তৃতাটা শুধু বক্তৃতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়। সেমিনারটির মূল্য মণীশের কাছে তার চেয়ে কিছু বেশিই। গত দু'সপ্তাহ ধরে বইপত্তর লেখাজোখা নিয়ে তাই গভীর রাত পর্যন্ত তাঁকে সেঁটে থাকতে হচ্ছে তাঁর রিডিং রুমের বাদামি রেক্সিন-ফিট্-করা হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিলে।

মণীশের লেখার বিষয়বস্তু বেশ নতুন ধরনের, একটু দুরূহও বটে। সেমিনারের আয়োজকরা অবশ্য প্রত্যেক অধ্যাপককে পইপই করে অনুরোধ করেছেন, আলোচনার বিষয় যেন খুবই আনকোরা এবং চমকপ্রদ হয়, যাতে আরও অনেক সেমিনারের মতো নিতান্ত দায়সারা বা ম্যাড়মেড়ে না হয়ে পড়ে। যাতে শ্রোতাদের ঘুম না পেয়ে যায়। যাতে শ্রোতারা টানটান হয়ে চার-পাঁচঘন্টার আলোচনাচক্রের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন। সাহিত্যের সেমিনার যখন, তাঁকে তো নানাভাবেই আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে।

মণীশও অবশ্য এহেন অদ্ভুত ধরনের একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে পেরে ভারি রোমাঞ্চিত। অনেক ভেবেচিন্তে একটি দুর্দান্ত বিষয়ও খুঁজে পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যে। তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন কবি-লেখকদের চমকপ্রদ জীবনী, তাঁদের কালজয়ী সাহিত্য তাঁর নখদর্পণে। তার সঙ্গে সাহিত্যের চমকপ্রদ খুঁটিনাটিও তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে থাকেন নিয়মিত। কী নিয়ে লিখবেন এমন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যে

pathagar.net

আইডিয়াটা পেয়েছেন তা শ্রোতাদের বেশ রহস্যেই ডুবিয়ে রাখবে। সেমিনারে তাঁর বিষয়বস্তু হবে, 'মিস্টিসিজম্ ইন লিটারেচার'। অনেকগুলো চ্যাপ্টারে ভাগ করে নিয়েছেন প্রবন্ধটিকে। প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারই ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আকর্ষণীয় করে লেখার চেষ্টা করেছেন। আপাতত যে পরিচ্ছেদটিতে হাত দিয়েছেন, তার বিষয় হল, কোন কোন লেখার জন্মরহস্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে অলৌকিক কোনও কাহিনী। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন লেখকের লেখার উৎস খুঁজতে খুঁজতে কখনও জানা গেছে, কোনও লেখার বিষয় হয়তো স্বপ্নের ভেতর খুঁজে পেয়েছেন সেই কবি বা লেখকের। অথবা দৈববলে লাভ করেছেন কোনও পঙক্তি। কিংবা অদ্ভুত কোনও রহস্য জড়িয়ে আছে লেখাটির জন্মকথায়।

বেশ কিছুক্ষণ বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে হঠাৎই মণীশের মনে পড়ে গেল ইংরেজ কবি কোলরিজের কথা। কুব্লাই খান্ নামের বিখ্যাত কবিতাটি তিনি নাকি পেয়েছিলেন ভোররাতের স্বপ্নে। স্বপ্নের নীল রহস্যের ভেতর ঘটনাটি ঘটতে দেখছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবিতার পঙক্তিগুলিও সাজিয়ে নিচ্ছিলেন মনে মনে। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠেই কবিতাটি লিখে চলেছিলেন দ্রুত, সেইসময় দরজায় হঠাৎ কড়ানাড়া শুনে গিয়ে দেখলেন, তাঁরই এক প্রিয় বন্ধু সামনে দাঁড়িয়ে। তৎক্ষণাৎ কবিতা লেখা ফেলে মেতে উঠলেন আড্ডায়। বহুক্ষণ পর বন্ধুটি চলে যাওয়ার পর দেখলেন, স্বপ্নের বাকি অংশের বিন্দু-বিসর্গও আর মনে নেই তাঁর। ফলে কবিতাটি রয়ে গেল অসমাপ্ত, সেই অবস্থাতেই ছাপতে দিয়েছিলেন কোলরিজ। ছাপা হতে বিখ্যাত হয়েছিল কবিতাটি।

এপিসোডটি মনে মনে ভেঁজে যে মুহূর্তে গুছিয়ে সাদাপৃষ্ঠায় লিখতে যাবেন মণীশ, তক্ষুণি ঈষিতা এসে ঢুকে পড়ল লিভিংরুমে, কী হল, শুতে যাবে না?

মণীশ হাসি-হাসি মুখে ঈষিতার দিকে তাকালেন, হ্যাঁ, এই হয়ে গেছে আর কি। আর কুড়ি- পঁচিশ মিনিট।

--আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

ঈষিতার পরনে এখন দুধসাদা রঙের একটি চমৎকার নাইটি। কাঁধ থেকে দুটো সরু স্ট্রাইপ নেমে এসেছে তার ভরাট বুকের ওপর পর্যন্ত। তাতে তার ফর্সা বুকের ওপরটা এবং নগ্নবাহুতে যেন আলাদা একটা সৌন্দর্য অবয়ব পেয়েছে। বুকের ওপর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত নাইটির গায়ে এমন দারুণ সব কারুকাজ, লেস-বসানো চমৎকারিত্ব আর ঝলমলে ব্যাপার আছে, যা ঈষিতাকে প্রায় পরী করে তুলেছে। মণীশের খুব ইচ্ছে করছিল, তাঁর লেখার প্যাড, কলম ফেলে বিছানায় গিয়ে ঈষিতার পাশে শুয়ে পড়তে, কিন্তু তিনি আপাতত আটকে গিয়েছেন কোলরিজ সাহেবের স্বপ্নের ভিতরে। এমন অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন মণীশরাও দেখে থাকেন প্রতিনিয়ত, কিন্তু তাঁরা তো আর কোলরিজ নন যে, সেগুলো থেকে এমন দুর্দান্ত একটি কবিতার জন্ম হবে। এই যে ঈষিতার এমন নয়নাভিরাম সাজ, তা দেখেও তাঁর এখনই একটি কবিতা লেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু তাঁর কলমে প্রবন্ধ যা-ও বা খেলে, কবিতা নৈব নৈব চ। সেই প্রবন্ধ লিখতেই এমন কলমের নিব্ ভাঙতে হচ্ছে তাঁকে। তাই না পারছেন ঈষিতার রূপের স্তুতি করতে, না পারছেন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়তে। আর দুদিনের মধ্যেই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। কোনও উপায় নেই।

ঈষিতার আকর্ষণীয় শরীরের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে টেবিলের প্যাডে নিবিষ্ট হতেই ঈষিতা ক্ষুব্ধ-ক্ষুব্ধ চোখ করে তাঁর টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল, এই বাইরে না ফাটাফাটি জ্যোৎস্না চলো না, ছাদে যাই—

pathagar.net

—ছাদে! মণীশকে হঠাৎ খুবই বিপন্ন দেখাল।

—হুঁ, ছাদে। লোড্‌শেডিং-এর সময়ই তো জ্যোৎস্নার কারিকুরি ফুটে ওঠে কলকাতায়। চলো না। কতদিন ভালো করে জ্যোৎস্না দেখিনি। বিয়ের আগে একবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দল বেঁধে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম জ্যোৎস্না দেখব বলে। পূর্ণিমার রাত ছিল সেদিন। সন্ধে থেকে চাঁদ উঠবে বলে উশখুশ করছি, হঠাৎ কোত্থেকে একরাশ কালো মেঘ উড়ে জুড়ে বসল সারা আকাশে। ইস্‌, কী যে আফশোস হয়েছিল সেদিন!

টেবিলের ওপর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়ায় এই মুহূর্তে ঈষিতার শরীরের কারুকাজ মণীশের সামনে উদ্ভাসিত। তার উপছানো স্তনবিভাজের দিকে একলহমা মুগ্ধদৃষ্টি রেখে মণীশ চোখ ফিরিয়ে বললেন, এই ঈষিতা, তোমার মনে আছে, রিল্‌কে যখন তাঁর ডুয়িনো এলিজি লিখেছিলেন, তখন হঠাৎ দু-লাইন কবিতা দৈববাণীর মতো উপহার পেয়েছিলেন! তোমার তো তখন বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ মুখস্ত ছিল। সে লাইনদুটো কী ছিল বলো তো?

জ্যোৎস্না রাতে যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে ছাদে যাওয়ার আমন্ত্রণ পরিহার করে হঠাৎ রিল্‌কে প্রসঙ্গে চলে যেতে ঈষিতা ভীষণ রেগে গেল। ঝট্‌ করে টেবিল থেকে উঠে গিয়ে বলল, ধুর, ছাড়ো তো তোমার ওই সেমিনার। রাত কটা বাজে সেটা খেয়াল আছে?

মণীশ তবুও নাছোড়। কোলরিজ হয়ে চলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথে, রাজর্ষির তাতা ও হাসির ঘটনাটিও তো রবীন্দ্রনাথ স্বপ্নের ঘোরেই পেয়েছিলেন, সেটা নোট করে চলে এসেছেন রিলকের এপিসোডে, ঈষিতাকে ধরলেন ফের, তোমার স্মৃতিশক্তি তো দারুণ প্রখর। বলো না, মানে আছে পঙক্তিদুটো?

ঈষিতা তখন তার পরীর মতো দুধসাধা শরীর নিয়ে ক্ষুব্ধমুখে পায়চারি করছে রিডিং রুমের মেঝেয়। মাত্র বছর তিনেক আগেও ঈষিতা মণীশের ছাত্রী ছিল। তুলনামূলক সাহিত্যে প্রতিবছই একঝাঁক করে সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়ে এসে ভর্তি হয়। প্রায় প্রত্যেকের চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ, তুখোড় ব্যক্তিত্ব আর প্রবল সাহিত্যপিপাসা। প্রায় সবাই-ই মেধাবীও। তারই মধ্যে ঈষিতা নামের তরুণীটি ছিল একেবারেই অন্যরকম। যেমন অসাধারণ সুন্দরী, কাটাকাটা চোখমুখ, তেমনই চমৎকার তার পড়াশুনোর পরিধি। দীর্ঘ একযুগ অধ্যাপনা করেও মণীশ যখন একজন সুন্দরী তরুণী ছাত্রীরও প্রেমে পড়েননি, এবং তিনি একজন কমফার্মড ব্যাচেলর হতে যাচ্ছেন বলে সবাই ধরে নিয়েছে, ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর জীবনে ঈষিতার আবির্ভাব। আটত্রিশ বছরের মণীশের সঙ্গে একুশ বছরের ঈষিতা কীভাবে যে লটকে গেল তা ক্লাসের কোন ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপকরাই ধরতে পারেননি। শুধু দু'বছরের ক্লাস শেষ হলে, ফাইনাল পরীক্ষার আগে প্রিপারেটিভ লিভ্‌-এর সময় একদিন ঈষিতাকে দেখা গেল লাইব্রেরি রুমে। তাকে দেখে তার এক সহপাঠী বিশ্ববন্ধু চমকে উঠে বলল, কী রে, ঈষিতা তোর কপাল ফাটল কী করে? কে-ই বা ফাটাল?

ঈষিতার সিঁথিতে তখন জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের সরু একটা রেখা। সে রেখা এসে ছুঁয়েছে তার কপালের প্রায় মাঝখানে পর্যন্ত। ঈষিতা শুধু রহস্যময়ী মতো হেসেছেল, কিন্তু রহস্যটি ফাঁস করেনি। সে রহস্য অবশ্য সবাই জেনে গিয়েছিল কিছুদিন পরে, ততক্ষণে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ।

মণীশের প্রশ্নে ঈষিতা হঠাৎ থেমে গিয়ে চমৎকার করে আবৃত্তি করল ঃ

কে, আমি চিৎকার করে উঠি যদি, হবে শ্রোতা শ্রেণীবদ্ধ ওই দেবদূত-পর্যায়ের মধ্যে থেকে?

pathagar.net

রিলকে তখন ট্যাক্সি-হোহেন্‌লাহে নামের এক সুন্দরী রাজকন্যার আতিথ্যে আছেন তাঁদের ডুয়িনো দুর্গে। পাহাড়ের উপর এক নির্জন বিশাল বাড়ি, পাহড়ের পা ছুঁয়ে আছে চমৎকার অন্তহীন নীল সমুদ্র। সেই দুর্গের খোলা বারান্দায় বসে ঝোড়ো হাওয়ায় মাতাল হাওয়ায় মুহূর্তে এই পঙক্তি দুটি যেন হঠাৎ শুনতে পেয়েছিলেন জার্মান কবি রিল্‌কে।

—থ্যাঙ্কু ঈষিতা, বলে মণীশ আবার ডুবে গেলেন তাঁর লেখার মধ্যে। কলকাতায় আপাতত লোডশেডিং-এর দাপট এত বেশি যে, জ্যোৎস্নারাতের ম্যাজিক এখন প্রায়শ দেখতে পায় কলকাতাবাসী। বছর কুড়ি আগেও লোডশেডিং-এর এমন বিদ্‌ঘুটে প্রকোপ ছিল না। তখন একবার গ্রামে বেড়াতে গিয়ে মণীশ আবিষ্কার করেছিলেন, জ্যোৎস্নারাতে পৃথিবী এক অন্যরকম সাজে সেজে ওঠে। কলকাতা ফিরে এসে জনে-জনে গল্পও করেছিলেন, জানেন, মনে হচ্ছিল কোন রূপকথার দেশে বেড়াতে গিয়েছি আমি। সে এমন চমৎকার সৌন্দর্য। যেন আকাশ থেকে সার বেঁধে নেমে আসছে কিন্নর কিন্নরিরা। সে গল্প শুনে অনেকেরই সাধ হয়েছিল গ্রামবাংলায় জ্যোৎস্না দেখতে যাওয়ার। তারপর গত কুড়িবছর অনেক জ্যোৎস্নার রাত এসে পৌঁছেছে কলকাতায়। জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যও তাই গা-সওয়া হয়ে গেছে কলকাতাবাসীর।

আর ইদানীং লোডশেডিং-এর ভয়াল আক্রমণ থেকে রেহাই পেতে মণীশ তাঁর রিডিংরুম আর বেডরুম দুটো ঘরই ইনভার্টারের আলোয় আলোকিত করে রাখেন। ঘরের ভেতর লোডশেডিং আর বুঝতেই পারেন না। বুঝতে হলে ছাদে যেতে হয়। বিয়ের পর অনেক লোডশেডিং-এর অন্ধকার রাতে ছাদে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন ঈষিতাকে, অনেক জ্যোৎস্নাভেজা রাতে ছাদের আলসেয় বসে গল্প করেছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। কিন্তু এই মুহূর্তে আর সে সময় নেই। সেমিনারটি নিয়ে খুবই টেনশনে আছেন মণীশ।

টেনশনে থাকার অন্যতম কারণ হল সেমিনারের দিন সারাক্ষণ উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং ভাইস চ্যান্সেলর। সে সব অধ্যাপকেরা পেপার পড়বেন তাঁদের প্রত্যেকের বিষয়বস্তু, তার গভীরতা, লেখার বিশ্লেষণ, এ সবকিছুই নাকি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন উনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব শিগ্‌গির রিডারের একটি পোস্ট খালি হচ্ছে। রিডারের পদ মনোনয়নের আগে এই সেমিনারটিকে তাই খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন ভাইস চ্যান্সেলর। স্বভাবতই একে সমীহ করছে সব অংশগ্রহণকারী অধ্যাপকও। মণীশ তো গত পনেরো কুড়িদিন যাবৎ পাগলের মতো পড়াশোনা করছেন, নোট নিচ্ছেন, অবশেষে গত দিনতিনেক ধরে প্রবন্ধটি একটা শেপে আনার চেষ্টা করছেন। কমদিন হল না তাঁর চাকরি, এখন রিডার হবার সব যোগ্যতাই তাঁর হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে সেমিনারটির গুরুত্ব তাঁর কাছে খুবই বেশি। বিশেষ করে তাঁরই বিভাগের রণজয় দত্ত একেবারে তাঁর ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে। রণজয় কনটেম্পারারি হলেও খুব সম্প্রতি তরুণ কবি হিসেবে বেশ নাম করে ফেলেছে। তরুণ কবি শব্দটা অবশ্য মণীশের কাছে ভারি গোলমেলে বলে মনে হয়। রণজয়ের বয়সও চল্লিশের মতো, লেকচারার হিসেবে বেশ সিনিয়রই বলা যায়, ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা তাকে রীতিমতো রেসপেক্ট করে, তা সত্ত্বেও সে কী করে তরুণ কবি হিসেবে অভিহিত হয় তা মণীশ বুঝতে পারেন না। আর এই খ্যাতির জন্য রণজয়ের মন একটা চাপা অহঙ্কার আছে। কথাবার্তার মধ্যে তার এই নাক উঁচু স্বভাবটা কখনোই চাপা থাকে না। সেজন্যে রণজয়কে বেশ অপছন্দই করেন মণীশ। সম্ভবত রণজয়ও মণীশকে।

দিনতিনেক আগেও এই পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা আরো একবার যাচাই হয়ে গেল

pathagar.net

দুজনের মধ্যে। যে বিষয়টি নিয়ে মণীশ তাঁর প্রবন্ধ লিখছেন, যথাসম্ভব সেটি তিনি গোপনই রেখেছিলেন অন্য সবার কাছ থেকে। তবু রণজয় কিভাবে যেন সেটি জেনে ফেলে একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার, মণীশদা, আপনি নাকি কী সব অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার নিয়ে পেপার তৈরি করছেন?

মণীশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, হুঁ, ওই আর কি, কেন?

—আসলে আপনি তো মৌলিক লেখা লেখেন না। লিখলে জানতেন, সব সৃষ্টিশীল লেখাই একটা অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎ কখন কবিতার কোন পঙক্তি কিংবা একটা গল্পের প্লট মাথার ভিতর স্পার্ক করবে তা কোনও কবি বা লেখকই আগে থেকে জানতে পারেন না। কোনও চিত্রশিল্পীর ছবি আঁকা, কিংবা কোনও মিউজিসিয়ানের মিউজিক কম্পোজ করার ব্যাপারেও ঠিক একই জিনিস খাটে। সুতরাং অলৌকিক উপায়ে সাহিত্যের জন্ম এই বিষয় নিয়ে আলাদা করে কোনও প্রবন্ধ লেখার মানে হয় না।

কথাটা শুনে মণীশ সেদিন বেশ গুম হয়ে গিয়েছিলেন। রণজয় দত্ত কীভাবে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু জেনে গেল তা বুঝতে পারেননি। সম্ভবত দিনকয়েক আগে ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক সুশোভন চ্যাটার্জির সঙ্গে কোল্‌রিজের লেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, সেখানেই কথাপ্রসঙ্গে কুবলাই খানের প্রসঙ্গ উঠেছিল। হয়তো সুশোভন চ্যাটার্জির কাছ থেকেই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে রণজয়, আর তাই-ই প্রথম চোটে মণীশকে ঘাবড়ে দিতেই রণজয়ের এমন বক্রোক্তি।

আসলে রণজয় যেমন স্বার্থপর, তেমনই অহঙ্কারী। ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে চাকরির ব্যাপারে উমেদারিও করছে নাকি ও, এমন তথ্যও জানা গিয়েছে এর মধ্যে।

নিজের লেখার মধ্যে ডুবে গিয়েও এমন অনেক এলোমেলো কথা মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে যাচ্ছিল মণীশের। ঈষিতা বেশ কিছুক্ষণ তাঁর ঘরে ঘোরাঘুরি করার পর এখন আবার শোবার ঘরে ঢুকে তার ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল আয়নায় তার নাইটি পরা সুন্দর শরীরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। হঠাৎ নিচু হয়ে পাফে পাউডার মাখিয়ে নিয়ে হালকা করে প্রলেপ লাগিয়ে নিল তার ঘাড়ে পিঠে। দু'হাত তুলে মসৃণ বগলের নিচেও একঝলক। তারপর হঠাৎ আলতো করে বেঁধে রাখা খোঁপার চুল খুলে ছড়িয়ে দিল পিঠে। চুল খুলে এভাবে ছড়িয়ে দিলেই যে ঈষিতাকে অতিরিক্ত সুন্দরী লাগে তা মণীশ ওকে অনেকবার বলেছেন। হয়তো তাই-ই তার এমন আলুলায়িতকুন্তলা চেহারা। চুল ছড়িয়ে দিয়ে একবার বড় করে হাই তুলল, তারপর রিডিংরুমের দিকে গলা বাড়িয়ে গলায় খানিক বিরক্তি মাখিয়ে বলল, আমার কিন্তু ভীষণ ঘুম পেয়ে যাচ্ছে।

মণীশ লেখার প্যাড থেকে মুখ না তুলেই বললেন, তুমি শুয়ে পড়োনা গিয়ে। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। হয়ে এসেছে প্রায়। আর এক পাতা।

বিরক্ত ক্ষুব্ধমুখে আর একটা হাই তুলল ঈষিতা। তারপর বিড়বিড় করে কিছু বলল একা-একা। ওপাশে সরে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। আসলে এই মুহূর্তে একা-একা বিছানায় যেতে ইচ্ছে করছে না ঈষিতার। তিনবছর বিয়ে হয়ে গেছে তাদের, তবু মণীশের প্রতি তার এখনও এক তীব্র আকর্ষণ, তিনবছর আগেও যেমন ছিল। আসলে মণীশের চেহারার মধ্যে এমন একাট গ্ল্যামার আছে, যা যে কোনও মেয়েকেই ভীষণভাবে টানে। আজ বহু বছর ধরে এভাবেই মেয়েদের আকর্ষণ করে আসছেন মণীশ।

দোতলার জানালা থেকে দেখা যায়। ওপাশের মালটিস্টোরিড বিল্ডিংটা বিশাল শরীর নিয়ে

pathagar.net

দাঁড়িয়ে আছে। তার সব আলোই এখন লোডশেডিং-এর কল্যাণে নেভা। কেবল একটা জানালায় এখনো রাতের নীল আলো জ্বলছে। কী এক কৌতূহলে সেদিকে চোখে রেখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঈষিতা।

বিয়ের পর-পরই ঈষিতা বলে দিয়েছিল, এখনই দু-চার বছরের মধ্যে তার মা হবার ইচ্ছে নেই। মা হলেই তো সন্তানের কাছে সমর্পণ করে দিতে হয় মায়ের বাকি জীবন-যৌবন সব। তার আগে একটু হালকা থাকলে জীবনটা উপভোগ করে নেয়া যায়।

ঈষিতার যেমন ইচ্ছে, মণীশকে তেমনই মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেটা ছিল ঠিক এর অন্যরকম। তাঁর বিয়ে হয়েছে অনেক দেরিতেই। আটত্রিশ বছরের মণীশের পাশে একুশের ঈষিতা, বয়সের হিসেবে বেমানান হলেও দেখতে তেমনটা লাগেনি। মণীশকে এখনো সদ্য তিরিশের যুবক বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়। শুধু তাঁর কোঁকড়ানো চুলে দু-চারটে রুপোলি চমক দেওয়া ছাড়া তাঁর চেহারায় বয়সজনিত কোনও অতিরিক্ত মেদ এখনও জমেনি। তবু হাজার হোক, তাঁর লেট-ম্যারেজ। তাই এই একচল্লিশে পৌঁছে যদি তিনি সন্তানের জনক না হতে পারেন, তাহলে তো ছেলে-মেয়ে মানুষ করার কোনও সুযোগ কপালে জুটবে না। তবু ঈষিতা তার দাবিতে অনড়। সে তার শরীরে যত্ন একেবারে টায়টায় বজায় রেখেছে। শ্যাম্পু করা চুলের কেয়ারিতে, পোশাকের পরিপাটিতে, চোখের স্বপ্নালু চাউনিতে, কথার সুরেলা ধ্বনিতে এমন নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছে তার যৌবন যে, তার দিকে একবার নজর রাখলে যে কোনও পুরুষের আরও একবার তাকাতে ইচ্ছে করবে। তিনবছর বিয়ে হয়েছে, তবু মণীশের নিজেরই এখনও তাকিয়ে আশ মেটে না, অন্য পুরুষদের তো হবেই। তাঁরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হবে মেড্ ফর ইচ্ আদার।

বেডরুমের জানালা থেকে সরে এসে ঈষিতা ততক্ষণে বলছে, ধুর, তোমার ওই লেখার কাজও আর শেষ হবে না, তোমার শুতে আসারও আর সময় হবে না। রাত তো এদিকে ভোর হয়ে গেল। মণীশ অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, দাঁড়াও না, সেমিনারটা হয়ে গেলেই আমি ফ্রি। তখন দেখো—

ঈষিতা ঝাঁঝিয়ে বলল, তুমি আর ফ্রি হয়েছ! সারা বছর হয় সেমিনার, না হয় কোনও রিসার্চ পেপার তৈরি করা। অথবা পরীক্ষার কোশ্চেন-পেপার সেট্ করা। অথবা অন্য ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে বক্তৃতা করতে যাওয়া। এই তো দেখছি তিনবছর ধরে।

এতক্ষণে মণীশ মুখ ফিরিয়ে হাসলেন।

ঈষিতা সত্যিই চটে গিয়েছে তাঁর উপর। একপশলা ফায়ারিং করে পায়ের স্লিপারে ফট্‌ফট্ শব্দ তুলে চলে গেল খাটের কাছে। বেশ যত্ন করে সে বিছানা পাতে রোজ। প্রায়ই নতুন নতুন বেড্‌কভার। প্রায়ই নতুন বেড্‌শিট। প্রতিটি চমৎকার সব রঙের আর কারুকাজের। ঈষিতার মনে রোজ বেডকভার বদলালে তাতে ঘরের চার্ম বলতে যায়। বিছানার একটা আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়। রাতে শুতে যাবার মোহ বেড়ে যায়। মণীশ তাই ঈষিতার নাম দিয়েছেন শয্যাবিলাসিনী। তবে সত্যি বলতে কি, ঈষিতার এই ব্যাপারটা মণীশও ভারি পছন্দ করেন। কখনো ঘরের ভিতর খাটটা এদিক-ওদিক করে ঘরের চেহারাটাই বলদে দেয় ঈষিতা। তখন মনে হয় তাঁদের বেডরুমটা যেন নতুন, হঠাৎ যেন বদলে গেছে কীভাবে।

আর শুধু বেডরুমটাই নয়, ঈষিতা নিজেকেও কখনো বদলে ফেলে বিছানায়। যত দিন যাচ্ছে, ততই ঈষিতা যেন নতুন করে ধরা দিচ্ছে মণীশের কাছে। প্রতিদিনই যেন তার বয়স কমে যাচ্ছে আরো। সে চায় মণীশের বয়সও যেন এভাবে কমে যায়।

pathagar.net

তবু মণীশের বয়স যে বেড়েছে তা মোটেই ধরা যায় না। কদিন আগেই ডোনা নামের একটি ছাত্রী এসেছিল তাঁর কাছে। একটু অন্যরকম ব্যক্তিত্ব আছে মেয়েটির, বেশ কিছুটা অভিনব তার চালচলন। বলেছিল, স্যার, আজকাল কাগজগুলোতে মেয়েদের রূপচর্চা সম্পর্কে নানারকম টিপস দিয়ে থাকে, কীভাবে সাজবেন, কী দিয়ে সাজবেন, কী খাবেন—এসব তথ্য আরও দিয়ে। কিন্তু পুরষদের বয়স কী করে ধরা যায়, আরও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, কীভাবে আরও হ্যাণ্ডশাম হয়ে ওঠা যায়, কীভাবে শরীর মেইনটেইন করা উচিত তা নিয়ে যেন কারও মাথাব্যথা নেই। আপনি একটা কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রস্তাব দিন, প্রতি সপ্তাহে পুরুষদের রূপচর্চার জন্য টিপস্ দেবেন। দেখবেন, কাগজের বিক্রি বেড়ে যাবে। পুরষরাও প্রত্যেকেই আরও সুন্দর হয়ে উঠতে চায় সে-কথা কিন্তু কেউ ভাবে না। আপনি দেখতে এত সুন্দর বলে অন্য পুরুষেরা মনে-মনে হিংসে করে আপনাকে, তা জানেন?

সে-কথা খুব ভাল করেই জানেন মণীশ। প্রসঙ্গটা মনে পড়তেই হঠাৎ ঈষিতাকে কিছু বলতে গিয়ে দেখলেন, সে শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় ঢোকার তোড়জোড় করছে। ডোনার কথা তাকে বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। এক মেয়ে যে অন্য মেয়েদের কথা শুনতে পছন্দ করে না তা হাড়ে-হাড়ে জেনে গিয়েছেন বহুকাল। আজ দুপুরে একটা ফোন এসেছিল তাঁদের রুমে, ডোনার বাবাই ফোনটা করেছিলেন, পরশু নাকি বাড়ি ফেরার কথা ছিল ডোনার, কোন্ বন্ধুদের সঙ্গে আউটিঙে গিয়েছে এখনও ফেরেনি বলে খোঁজ করছিলেন, ক্লাসের বান্ধবীরা কেউ যায়নি শুনে আশ্চর্য হয়ে রেখে দিয়েছেন ফোন।

মণীশ অবশ্য তেমন আশ্চর্য হননি, কারণ অল্প কিছুদিনের মধ্যে ডোনা তার বিচিত্র জীবনযাপনে বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে। সেই ডোনাই অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিল, স্যার, অনেকেই কিন্তু হিংসে করে আপনাকে।

কথাটা ঠিকই, আরও বহুজনের চোখেই এমনই পরশ্রীকাতরতার ঝিলিক বহুদিন ধরেই দেখতে পাচ্ছেন মণীশ। সে বিদ্বেষের স্ফুরণ কখনও ক্ষীণ, কখনও তীব্র হয়ে ধরা দেয় তাঁর কাছে। কখনও শিউরেও ওঠেন তার ভয়াবহতা অনুমান করে।

দৃশ্যগুলো ভাবতে ভাবতে লেখার টেবিলে মণীশ আর বসে থাকতে পারলেন না, আলো নিভিয়ে ধীরপায়ে গিয়ে প্রবেশ করলেন তাঁদের শোবার ঘরে। ততক্ষণে বিছানায় শরীর মেলে দিয়ে একটা হালকা নীল আলো জ্বেলে দিয়েছে ঈষিতা। সাদা ধবধবে মশারির ভিতর আজ ক্রিম-কালারের বেডশিট। তার উপর সাদা নাইটিতে ওতপ্রোত হয়ে থাকা ঈষিতা কাত হয়ে শুয়ে চোখ বুজে আছে এলায়িতভঙ্গিতে।

মণীশও মশারি তুলে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। ঈষিতা ঘুমোয়নি, জেগেই ছিল। তার চমৎকার মুখে ছড়িয়ে রয়েছে একরাশ অভিমান। বাইরে জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঈষিতা কথিত সেই ফাটাফাটি জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার চাদরে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কলকাতার বাদবাকি মানুষ।

সে দৃশ্যের দিকে কয়েক লহমা অপলক তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মণীশ। ঈষিতার পাশে শুয়ে তাকে কাছে টানতে টানতে বললেন, জানো, আজকাল আমার যেন কীরকম ভয় ভয় করে।

ঈষিতার মুখের মেঘ কেটে যাচ্ছে। মণীশের কথায় সহসা বিস্ময় ঘনিয়ে এল তার চোখমুখ জুড়ে, সে কি, কিসের ভয়?

pathagar.net

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মণীশ, তাকিয়ে ছিলেন ঈষিতার মুখের দিকেই, হঠাৎ সে মুখ পেরিয়ে তাঁর চোখের সামনে সিনেমার স্লাইডের মতো পরপর ভেসে উঠতে লাগল অনেক দৃশ্য, অনেক মুখ, অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত পটভূমিকা। যেন এই মুহূর্তে সে-সব মনে পড়ার কথা ছিল না। হঠাৎ বিড়বিড় করে বললেন, মনে হচ্ছে মৃত্যুভয়। সবসময় মনে হয়, কেউ যেন আমাকে অনুসরণ করছে, আমাকে তাড়া করছে মারবে বলে।

ঈষিতা অবাক, কিছুই বুঝতে পারছিল না মণীশের কথা। এতদিন বিয়ে হয়েছে তাদের, কখনও মণীশ ও ধরনের কথাবার্তা বলেনি। বরং তার কথায় আত্মপ্রত্যয়ের ভাবই বেশি। একটা অন্যরকম অহঙ্কার। এই মুহূর্তে অন্যধরনের কথা শুনে তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। নাইটি সামলে ধড়মড় করে উঠে বসল, সে আবার কী কথা? কারা তাড়া করে বেড়াচ্ছে তোমাকে? তোমার কোন শত্রু আছে নাকি?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মণীশ বললেন, কি জানি! আমি জানি না।

পাঁচ

চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িতে লিভিংরুমটা বেশ বড়সড় এল-সেপের। এল-এর হরাইজন্ট্যাল বাহুতে চারজনের খাওয়ার মতো একটা ডাইনিং টেবিল পাতা। ঠিক তার পিছনেই কিচেন। ভার্টিক্যাল বাহুতে চিত্রদীপের একটা ছোট্ট লাইব্রেরি, তাতে পেইন্টিঙের বইই বেশি। তার একপাশে ছবি-আঁকার একটা ক্যানভাস দাঁড় করানো। তাতে অর্ধেক আঁকা হয়ে রয়েছে একটি রমণী-শরীর।

প্রতিদিন সকালবেলা কিছুক্ষণের জন্য হলেও ক্যানভাসের সামনে রং-তুলি হাতে নিয়ে দাঁড়ানো চিত্রদীপের অভ্যাস। দু-এক পোঁচ তুলি চালিয়ে কখনও সরে আসেন, কখনও মনে লেগে গেলে সারাটা সকাল। কিন্তু আজ একবারও ক্যানভাসের সামনে যাননি, বসে আছেন পাশেই পড়ার টেবিলে। অবশ্য পড়ছেন না, চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে টুকটুক করে এঁকে চলেছেন একটি কমিক-স্ট্রিপ, আর মাঝেমধ্যে তাঁর ঠোঁটের ঘাড়-বাঁকানো পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়ছেন ফুরফুর করে।

কমিকটির বিষয় যেমন মজার, তেমনই মন দিয়ে তার বিষয়বস্তুটিতে প্রাণ সঞ্চার করে চলেছেন চিত্রদীপ। ত্রৈলোক্যনাথের একটি হাসির গল্পকে কমিকে রূপান্তরিত করছেন ক'দিন ধরে। প্রায় শেষ করে এনেছেন, হঠাৎ কিচেন থেকে মুখ বাড়ালেন বনানী, ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু—।

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরোবার পর গত কুড়ি বছর ধরে ছবি আঁকার লাইনে রয়েছেন চিত্রদীপ, কিন্তু আর্টিস্ট হিসেবে এখনও কোনও খ্যাতি হয়নি। তাঁরই সমসাময়িক অন্য শিল্পীদের ছবির দাম যেমন চড়া, তেমনই তাদের ছবির জন্য রসিক মহলে বেশ ক্রেজ। অনেক শিল্পী আছেন যাঁদের ছবি নাকি আঁকার অনেক আগেই বিক্রি হয়ে যায় চিত্ররসিকদের কাছে, তাঁদের পাশাপাশি কী কারণে যেন চিত্রদীপের ছবির বিক্রি নেই বললেই চলে। কখনও কখনও দু-একখানা বিক্রি হয় বটে, কিন্তু তাতে একজন শিল্পীর পক্ষে শুধু ছবি এঁকে সংসার চালানো অসম্ভব।

ফলে বাধ্য হয়ে চিত্রদীপকে বেশির ভাগ সময়ই কমার্শিয়াল আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করতে হয়। প্রথমদিকে তো সিনেমার পোস্টার আঁকতেন, এখনও একটি বাচ্চাদের পত্রিকায় গল্প

উপন্যাসের ছবি এঁকে, কখনও ক্রমিক-স্ট্রিপ এঁকে, কখনও পত্রিকা বা বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে পয়সা রোজগার করতে হয় তাঁকে। চিত্রদীপ অনেক সময় ভাববার চেষ্টা করেছেন তাঁর ছবি বিক্রি না হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলো, কিন্তু ভেবে বেশিদূর এগোতে পারেননি। এখনো তাঁর ছোট্ট বাড়ির এদিকে-ওদিকে কয়েকশো ছবি পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। অনেক সময় নতুন ছবি আঁকতে গিয়ে থমকে যান। কখনও আধখানা এঁকে ফেলে রাখেন অবহেলায়, মনে হয় এঁকে আর কী হবে, গ্যালারিতে শো দিলে তো অবিক্রিত অবস্থায় ফেরত আসবে আবার। তার চেয়ে খরিদ্দারের অর্ডার মাফিক কিছু বাণিজ্যিক আঁকাআঁকি করলে দুটো পয়সা আসবে ঘরে।

বনানী অবশ্য মাঝেমধ্যে উৎসাহ দিতেন, আঁকাটা একেবারে বন্ধ কোরো না তুমি। একদিন হয়তো তোমার ছবি কেনার জন্যেই লাইন পড়ে যাবে। কখনো উদাহরণ দেন, বিদেশের বহু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর জীবনীতে লেখা আছে, যাঁরা জীবিত অবস্থায় প্রায় অখ্যাত ছিলেন, মৃত্যুর পর এখন তাঁদের একেকটি ছবি নিলামে উঠলে কয়েক কোটি টাকার বিক্রি হয়ে যায়। যেমন ধর পল গগ্যাঁর কথা, কিংবা ভ্যান্ গখ—

চিত্রদীপ পাইপ দাঁতে চেপে ধরো ম্লান হেসে বলেন, উহুঁ, আমার মধ্যে নিশ্চয় প্রতিভা নেই। নইলে দ্যাখো, সুহাস ভট্টাচার্যের ছবি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, আর আমার ছবি কেউ ছুঁয়েও দ্যাখো না!

এমন ভাবতে ভাবতে কমিক-স্ট্রিপটা আঁকা শেষ করে সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকেন। পত্রিকার সম্পাদক একটু পরেই লোক পাঠাবেন বলে ফোন করেছিলেন খানিক আগে। বাচ্চারা নাকি তাঁর এই কমিক-স্ট্রিপ দারুণ পছন্দ করছে। একটা বাচ্চা ছেলে চিঠিও লিখেছে এই বলে যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাচ্ছে চিত্রদীপের কমিক-স্ট্রিপ পড়ে। চিত্রদীপ অবশ্য বুঝতে পারেন না কমিকের ম্যাজিকটা তাঁর আঁকার মধ্যে, না ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মধ্যে! এক-এক সময় মনে হয় ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মজার জন্যেই উতরে যাচ্ছে তাঁর আঁকা। কখনও অবশ্য ভাবেন, নিজেই গল্প তৈরি করে তা দিয়ে কমিক স্ট্রিপ তৈরি করবেন কিনা। কিন্তু ভাবনাটা ভাবনার মধ্যেই থেকে যায়, আঁকতে সাহস হয় না। যদি তাতে বাচ্চারা খুশি না হয়!

আসলে, চিত্রদীপ বুঝতে পারেন, ছবি বিক্রি না হবার ফলে নিজের উপর কন্‌ফিডেন্স ক্রমশ কমে যাচ্ছে তাঁর। এভাবেই বোধহয় অনেক প্রতিভার অকালমৃত্যু হয়ে থাকে।

ততক্ষণে ডাইনিং টেবিলের উপর চমৎকার ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে ফেলেছেন বনানী, সাজিয়ে ডাক দিচ্ছেন, শিগগির চলে এসো, নইলে জুড়িয়ে যাবে।

কমিক স্ট্রিপটা সযত্নে একটা বই-এর মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়ালেন চিত্রদীপ। প্রায় ঘন্টাখানেক টানা এঁকেছেন ভোরবেলা থেকে। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে আঁকলে তাঁর ঘাড়ে একটা টনটনে ব্যথা হয়। ডাক্তার বলেছে স্পণ্ডিলাইটিস।

উঠে দাঁড়িয়ে শরীরটা একটু পিছন দিকে বাঁকিয়ে দেখলেন, ঘাড়ের ব্যথাটা কমে কিনা, তারপর গিয়ে দাঁড়ালেন ডাইনিং টেবিলের সামনে। টেবিলে সাদা কড়ির প্লেটে সাজানো আহার্যদ্রব্য দেখে তৃপ্তির স্বরে বলে উঠলেন, ফাইন।

প্রতিদিন সকালের ব্রেকফাস্টটি বেশ মনোযোগ দিয়েই বানান বনানী। সপ্তাহের সাতদিন সাতরকম মেনু নির্দিষ্ট আছে তাঁর। কখনো অবশ্য প্রথা ভেঙে নতুন কোনও রান্না তৈরি করে ফেলেন। আজ শুক্রবার, আজ অবশ্য প্রথামতো বড় এক প্লেট এগ্ নুড্‌ল্‌স্, তার সঙ্গে শসাকুচি-বিট গাজর-পেঁয়াজ কুচিয়ে স্যালাড্। শেষ মস্ত একখণ্ড পুডিং।

pathagar.net

চেয়ার টেনে বসতে বসতে খেয়াল করলেন, মাত্র দুজনের জন্যেই আজ ব্রেকফাস্টের আয়োজন। চামচ দিয়ে নুডলস মুখে তুলতে তুলতে বললেন, ডোনা ওঠেনি ঘুম থেকে?

বনানী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, না। এগ্ নুডলস-এর দিকে মনোযোগ ছেড়ে হঠাৎ যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। কী একটা যেন ভাবছেন আনমনে। ভাবনার সময় তাঁর হাতে চামচ থেমে যায় রোজ। কিছুক্ষণ পরে আবার নিজে নিজেই ধ্যান ভেঙে জিজ্ঞাসা করলেন, শিহরণ ব্রেকফাস্টের টেবিলে এল না?

বনানী অবাক হয়ে বললেন, ওমা, শিহরণ তো কাল রাতের ট্রেনে দিল্লি গেছে।

—তাই নাকি?

—বাহ্, কাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে কত কথাই তো বলল। তুমি কি কিছুই শোনোনি।

এতক্ষণে চিত্রদীপের মন পড়ল, কাল শিহরণ এরকম কিছু বলেছিল বোধহয়। তিনি তখন অন্যমনস্ক হয়ে অন্যকিছু চিন্তা করছিলেন গভীরভাবে। ভাবা ভাসা কথাটা কানে এসেছিল বটে। কাল দুপুরে খেয়ে দেয়ে চিত্রদীপ বেরিয়েছিলেন অ্যাকাডেমিতে তাঁর এক বন্ধু মণিময়-এর ছবির এক্‌জিবিশন দেখতে। ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল। তার মধ্যে শিহরণ কখন যেন বেরিয়ে গেছে তার ট্রেন ধরতে। তাই আর জানতেও পারেননি। মনেও নেই।

সেই কথাই আবার বললেন বনানী, ওদের অ্যাসোসিয়েশনের কী একটা জরুরি কাজে শিহরণকে দিল্লি যেতে হয়েছে।

—কবে ফিরবে?

—ফিরতে ফিরতে তো দিন সাতেক লাগবে এরকমই বলল।

আবার অন্যমনস্ক হয়ে খাবারের প্লেটে মনঃসংযোগ করলেন চিত্রদীপ। শিহরণ রায়চৌধুরী তাঁদের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে থাকে। তাঁদের বাড়ির বাইরের দিকে একটা গেস্টরুম আছে, একখানা ঘর, তবে বেশ বড়ই, অ্যাটচড্, বাথ। বছরখানেক হল চল্লিশ-পেরোনো এই প্রায়-যুবক ব্যাচেলরটি তাঁদের বাড়িতে থাকা-খাওয়া করছেন। তার বিনিময়ে মাসে দেড় হাজার টাকা করে দিয়ে থাকেন চিত্রদীপদের। চিত্রদীপদের অবশ্য এই ব্যবস্থাপনায় তেমন সায় ছিল না। হঠাৎ তাঁদের ছোট্ট নিরিবিলি পরিবারে বাইরে একজন আগন্তুককে ঠাঁই দিলে নিজেদের প্রাইভেসি তেমন থাকবে না এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু বনানী তখন যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, গেস্টরুমটা এ বাড়ি থেকে বেশ বিচ্ছিন্নই, সেখানে একজন বাইরের লোক থাকলে কী আর এমন প্রাইভেসি নষ্ট হবে! সকালের ব্রেকফাস্ট, আর দু-বেলার লাঞ্চ-ডিনার ওর ঘরে ঠিক টাইমে পৌঁছে দিলেই তো কাজ শেষ। তার বিনিময়ে মাসে এতগুলো টাকার নিশ্চিন্ত আয় মন্দ কী। আমাদের বাড়িতে যখন মাস-পয়লার চাকরির কোনও বাঁধা আয় নেই।

শেষ কথাটা অবশ্য চিত্রদীপকে লক্ষ করেই বলা। এককালে বড় শিল্পী হবেন এমন আশা নিয়েই চিত্রদীপ কখনো চাকরির ধার ধারেননি। ফলে তাঁর বাঁধা আয় কোনোদিনই নেই। শুধু নিজের পরিশ্রম দিয়ে সংসার চালিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধে তাঁর কোনওদিনই হয়নি। তবু সচ্ছলতার অভাব এখনও অনুভূত হয়। তাই নিজের অক্ষমতা মেনে নিয়েই শেষপর্যন্ত বনানীর মতো অনুযায়ী পেয়িংগেস্ট রাখতে রাজি হতে হয়েছিল তাঁকে। পরে জানতে পেরেছিলেন শিহরণ একসময় বনানীরই ক্লাসমেট ছিল, কলেজে পড়াকালীন।

পেয়িংগেস্টের গতিবিধি অবশ্য শেষপর্যন্ত তার গেস্টরুমেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, শিহরণ তাঁদের সংসারের একজন হয়ে গিয়েছেন শেষপর্যন্ত। এই অবিবাহিত মধ্যবয়স্ক যুবকটি বেশ

murchona.net

স্মার্ট, সদালাপী এবং সমসময়েই হাস্যোচ্ছল। দু-একদিন ব্রেকফাস্টের সময় হাজিরা দিতে দিতে এখন তিনবেলাই তিনি চিত্রদীপের ডাইনিং টেবিলে খাওয়া দাওয়া করেন।

তবে শিহরণের নাকি কিছু অতীত ইতিহাস আছে। অল্পবয়সে জড়িয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবের আন্দোলনে। এখন সে ভূত অবশ্য মাথায় নেই, কিন্তু বিভিন্ন ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। আর আছে এক অদ্ভুত শখ, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। কলকাতা শহরে তার অনেক বান্ধবী আছে। প্রায়ই তাদের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যায় তাকে।

এ বাড়িতেও যেমন বনানীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, তেমনি ডোনার সঙ্গেও। প্রায় দিনই খাওয়ার টেবিলে তর্কবিতর্ক-পরিহাস জমজমাট করে তোলে ওরা। ডোনা আর শিহরণই এই বিতর্কসভার প্রধান আলোচক।

দুই প্রধানের অভাবে আজ ব্রেকফাস্টের আসর তাই চুপচাপ, শান্ত। চিত্রদীপ অবশ্য বেশিরভাগ দিনই নিস্পৃহ থাকেন, আজও তেমনি উদাসীন ভঙ্গিতে শেষ করলেন তাঁর পুডিং-এর প্লেট। বনানী তৎক্ষণাৎ বললেন, তোমাকে কি আর একটু পুডিং দেব? আজ অনেকটা বেশি আছে।

পুডিং-এর আসল পৃষ্ঠপোষক অবশ্য ডোনাই। খাওয়ার ব্যাপারে আজকালকার সব ছেলেমেয়েদের মতো ডোনাও ভীষণ চুজি। কোনও কোনও খাবার সে ছুঁয়েও দেখে না। আবার কোনও কোনও খাবার তার দারুণ পছন্দসই। বনানীর হাতের তৈরি পুডিং এরকমই ভীষণ পছন্দের খাবার ওর।

মৃদু ঘাড় নেড়ে হঠাৎই চিত্রদীপ বললেন, ডোনা কত রাতে ফিরেছে?

বনানী উত্তর দিলেন, প্রায় একটায়।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, একটা! কোথায় গিয়েছিল ওরা? সঙ্গে কে ছিল?

— সে তো তোমাকে বললাম, এবার মন্দারের সঙ্গে বেরিয়েছিল।

—আর কারা ছিল?

—আর কেউ তো নয়। অন্যবার দল বেঁধে আউটিঙে যায়। এবার কেবল ওরা দুজনেই গিয়েছিল। তোমারই বন্ধুর বাড়িতে, সেই গুপ্তিপাড়ায়। তোমার টেলিফোন পেয়ে সে-ই তো ঘরের চাবি পাঠিয়ে দিয়েছিল, মনে নেই?

—শুধু মন্দার আর ডোনা! কথাগুলো বিড়বিড় করে বলে হঠাৎ কেমন যেন গুম্ হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ফের বললেন, তা ওরা একদিন পরে ফিরবে বলে তিনদিন পরে কেন ফিরল, তা জিজ্ঞাসা করেছিলে?

বনানী ঘাড় নাড়লেন, অত রাতে ফিরেছে, এমনিতেই ঘুমে টলছিল তখন, অত শত জিজ্ঞাসা করার সময় পাইনি।

—তাই বলে একটা ছেলের সঙ্গে তিন চারদিন বাইরে কাটাতে হবে!

হঠাৎ চিত্রদীপের এহেন প্রশ্নবাণে বনানী কিছুটা হতভম্ব, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ও মা, তাতে কী হয়েছে? আমেরিকায় যদি এতদিন আমরা সেট্‌ল করতাম, তাহলে তো আর এ প্রশ্ন তুলতে পারতে না। সেখানে দ্যাখোনি, ওখানকার মেয়েরা রোজ নতুন নতুন ছেলেদের সঙ্গে ডেটিং করতে বেরিয়ে যায়। সেখানে ডোনা থাকলে আটকানো যেত! আর এ তো গেছে মন্দারের সঙ্গে। মন্দারের সঙ্গে ওর একটা কোর্টশিপ চলছে। তাতে আর আমাদের কী বলার আছে?

pathagar.net

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন বনানীর দিকে, তারপর ঠোঁটের পাইপটা দাঁতে চিবোনোর ভঙ্গি করে বললেন, তোমরা কি তাহলে দেশটাকে আমেরিকা করে তুলছ?

—আমরা মানে! বনানী হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন।

—মানে, তোমার একটা অ্যাফেয়ার চলছে, তোমার মেয়ের একটা অ্যাফেয়ার চলছে, বেশ আছো তাহলে। আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু আসার সময় দেশটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

চিত্রদীপের কথা শুনে তার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন বনানী। তাঁর চোখমুখ সহসা বদলে কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। মনে হল, এই পরেই বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু তার আগেই ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে ওঠায় সেদিকে এগিয়ে গেলেন চিত্রদীপ। রিসিভার কানে দিতে শুনলেন, ওপাশ থেকে শুভব্রত চৌধুরীর গলা, আপনার কমিক-স্ট্রিপের পাতাটা কি শেষ হয়েছে চিত্রদীপ?

—এই হয়ে এল, চিত্রদীপের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—তাহলে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

টেলিফোন রেখে দিয়ে চিত্রদীপ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, বনানী আশেপাশে কোথাও আছে কি না। যে বিস্ফোরণটি একটু আগেই হতে পারত, সেখানে এখনো বারুদ মজুত আছে কিনা সেটাই ভাবছিলেন মনে মনে। কিন্তু বনানী সম্ভবত কিচেনে কিংবা ওপাশের শোবার ঘরে ঢুকে পড়েছেন। ডোনা ক'দিন বাড়ি ফেরেনি দেখে হঠাৎই মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তাকে আবার বনানী প্রশ্রয় দিচ্ছে দেখে হঠাৎই বলে ফেলেছেন কথাটা। আসলে শিহরণের উপস্থিতিটা কেন যেন আর পছন্দ হচ্ছে না চিত্রদীপের। প্রথম প্রথম মনে হয়নি,এখন মনে হয় শিহরণের উপর বনানীর কিছু দুর্বলতা জন্মেছে। শিহরণের বয়স অবশ্য বেশি না, চল্লিশ পেরিয়েছে। বনানীরও হয়তো তাই। তবু একদিন সন্ধের পর খেয়াল করলেন, বাইরের গেস্টরুমে শিহরণ আর বনানী বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলছেন নীচু স্বরে। তারপর থেকে প্রায়ই মনে হয়, শিহরণকে খুব বেশি পাত্তা দেন বনানী। এমনকি চিত্রদীপের সামনেই। এর আগে কখনও এভাবে বনানীকে বলেননি চিত্রদীপ, আজই রাগের মাথায় হঠাৎ প্রকাশ করে ফেলেছেন তাঁর ক্ষোভ।

কমিক-স্ট্রিপটা ততক্ষণে হাতে নিয়ে তার ছবির মধ্যে কয়েকটা ডায়ালগ বসাচ্ছেন চিত্রদীপ। কথাগুলো আগেই ভেবে রেখেছিলেন, এখন চাইনিজ ইঙ্কে কলম ডুবিয়ে লিখে চললেন পর পর। লেখাটা তখনও শেষ হয়নি। হঠাৎই বাড়ির ডোর-বেল বেজে উঠল। অবাক হয়ে ভাবলেন, সে কি, এর মধ্যে শুভব্রত চৌধুরী তার লোক পাঠিয়ে দিল! উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলতে যাবেন, হঠাৎ আবার টেলিফোনের ঝনঝনানি। দরজা আগে খুলবেন, না টেলিফোন আগে ধরবেন, ভাবতে ভাবতে টেলিফোনটাই তুললেন আগে। হয়তো শুভব্রতই আবার ফোন করছে ভেবে বললেন, হ্যালো—

—হ্যালো, আমি কি বিখ্যাত শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলছি।

চিত্রদীপের ভুরুদুটোয় কোঁচ পড়ল, বললেন, হ্যাঁ, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি বলছি।

—দেখুন, আমার নাম অর্কক বোস। আমি 'এ টু জেড়' নামে একটা ছোট্ট কোম্পানি খুলেছি। এই কোম্পানি কলকাতায় কয়েকটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলবে শিগগির। সব কটা স্টোরই কলকাতার প্রধান-প্রধান রাস্তার মোড়ে। বেশ কয়েকটা স্পেসও পেয়ে গিয়েছি আমরা।

pathagar.net

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, তাতে আমার কী করার আছে?

—এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো হবে কলকাতার মার্কেটিং ওয়ার্ল্ডে একেকটি বিস্ময়। ভিতরে ছবির মতো করে সাজানো থাকবে সমস্ত পণ্যদ্রব্য। শো-রুমের ভিতরের লে-আউট থেকে শুরু করে দেয়ালে বিভিন্নরকম ম্যুরাল আঁকার জন্য আপনার সহযোগিতা চাই আমি।

চিত্রদীপ একটু কঠিন হয়ে বললেন, আয়্যাম স্যরি। দোকানের লে-আউট আমি করি না। ওটা আমার পেশা নয়।

—তা আমি জানি মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি একজন বড় আর্টিস্ট। কিন্তু কখনো সখনো কমার্শিয়াল কাজও তো করেন আপনি।

—মাপ করবেন, তাই বলে স্টেশনারি কিংবা মুদির দোকানের লে-আউট কখনও করব না।

—মিঃ চ্যাটার্জি, এই কাজের জন্য আপনি যেরকম পারিশ্রমিক চান, তাইই পাবেন।

তবু চিত্রদীপ আবার বললেন, আয়্যাম স্যরি মিঃ বোস, আপনি ভুল জায়গায় ফোন করেছেন—

—আপনি দু-একদিনের মধ্যে আপনার কাছে ব্ল্যাঙ্ক চেক নিয়ে হাজির হচ্ছি, মিঃ চ্যাটার্জি। কাইণ্ডলি আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন।

ছয়

বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির সেই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ডের ভূতটি এখনও পুরোপুরি নেমে যায়নি গার্গীর মাথা থেকে। তার মধ্যেই আর একটি ভূত হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে। কয়েকদিন আগে কলকাতার সবচেয়ে দামি সংবাদপত্রটির সাপ্লিমেন্টের সম্পাদক তাকে ডেকে একটা ফিচার লেখার অর্ডার দিয়েছেন। সেই লেখাটার ভাবনা তার মগজে টোকা দিচ্ছিল বলে হাতের নোটবই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বর্তমান প্রজন্মের কিছু তরুণী ও কিশোরীদের ইন্টারভিউ নিতে। দু-চারদিন ঘোরাঘুরি করার পর তার নোট বইতে আপাতত অনেক সাক্ষাৎকার। সেই নোটগুলিতে চোখ বোলাতে বোলাতে এখন মনে হচ্ছে,এই দেশটা খুব দ্রুত আমেরিকা হয়ে উঠতে চাইছে। দ্রুত বদলে যাচ্ছে এই প্রজন্মের আচার-আচরণ, জীবনযাপন, কথাবার্তা —সব।

এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ঘরে দেখা হয়ে গেল শঙ্খলেখার সঙ্গে। শঙ্খলেখা তখন দিব্যি ভালমেয়ে ভালমেয়ে মুখ করে রিম্যানিয়ান ইন্ট্রিগালের অঙ্ক কষে গলদঘর্ম হচ্ছে। গার্গীকে দেখে বলল, কী ব্যাপার, তুই যে একেবারে নিপাত্তা হয়ে গেলি?

—আরে কী যে মুশকিলে পড়েছি। নতুন একাট ফিচার লেখার ঝামেলায় পড়ে খুব জেরবার হচ্ছি। তারপর, তুই তো এ সপ্তাহে বাড়ি গিয়েছিলি শুনেছি। আমার জন্য কোনও খবর এনেছিস?

—খবর এনেছি বলেই তো তোর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি। ব্যাপারটা এত্ব ইন্টারেস্টিং যে, আমি নিজেও যেন থ্রিল্‌ড্ হয়ে যাচ্ছি ক্রমশ।

শঙ্খলেখার নরম-নরম মুখখানায় হঠাৎ উত্তেজনার ঢেউখেলা দেখে গার্গী জাঁকিয়ে বসল

pathagar.net

তার পাশে, তার নোটবইয়ের সেই বীরভঙ্গপুর পর্বের পৃষ্ঠা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, হুঁ, বল্‌তো, কী সন্দেশ এনেছিস আমার জন্যে;

শঙ্খলেখা ততক্ষণে তার ছোট্ট দেরাজটি খুলে বার করেছে একটি ট্যাবলয়েড সাইজের সংবাদপত্রের কয়েকটি সংখ্যা। সপ্তাহে দুবার বেরোয় কাগজটা। তাতেই কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রকাশিত হয়েছে রাজবাড়িতে ঘটে যাওয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ও তার ফলোআপ। প্রায় রুদ্ধশ্বাস কাহিনীই যেন একটি। গার্গী তার নোট বই সরিয়ে রেখে মুহূর্তে অন্তরিন হল বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির অদ্ভুত অভিনব ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

শহর থেকে অনেকখানি ভেতরে রাজবাড়ির বিশাল চেহারাটা সত্যিই নাকি দেখবার মতোই। পলেস্তারা খসে পড়েছে, বেরিয়ে পড়েছে সরু, পাত্‌লা ধরনের পুরানো যুগের ইট, তবু তার উঁচু-উঁচু গোলাকার থাম, চওড়া দেওয়াল আর উঁচু ছাদের কড়ি-বরগা বহন করছে রাজবাড়ির ঐতিহ্য। এককালে মস্ত জমিদার ছিলেন ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, এদিকার লোক বড় জমিদারদের রাজা বলতেই অভ্যস্ত, সেই রাজার ছিল শ-শ' বিঘে শালিজমি। এ ছাড়া সিন্দুক-বোঝাই টাকা-পয়সা, সোনার গয়না। লোকে বলে, তাঁদের মেঝে খুঁড়লে এমন অনেক কলসি বেরোবে যার মধ্যে হিরে-জহরত ভর্তি। রাজার কোনও ছেলে ছিল না। কিন্তু দুটি কন্যা ছিল। দুজনেই নাকি ভারি রূপসী। এতদিন পর্যন্ত রাজবাড়ির ঐতিহ্য সবই ঠিকঠাক ছিল, কিন্তু আজ থেকে আঠাশ তিরিশ বছর আগে পর পর দুটি ঘটনায়, দুর্ঘটনায় বলা যায়, বিপর্যয় ঘনিয়ে এল রাজবাড়িতে। রাজার দুই কন্যাই একে-একে রাজা-রানির অমতে বিয়ে করে বসল নিজেদের পছন্দ করা পাত্র। সেই যে চলে গিয়েছিল তারা রাজবাড়ি ছেড়ে, আর কখনও তাদের মুখ দেখা যায়নি বীরভঙ্গপুরে। রাজার হুকুমও ছিল নাকি যে, তাদের দেখামাত্র যেন গুলি করে মেরে ফেলা হয়। রানিমাও এত আঘাত পেয়েছিলেন যে, কোন মেয়েরই আর মুখ দর্শন করেননি। তারপর বছর দশেক আগে মারা গেছেন ব্রজেন্দ্রলাল। এতদিন রানিমাই দেখাশুনো করেছেন সেই বিপুল সম্পত্তি। তারপর তিনি খুন হতে সেখানে এখন টালমাটাল অবস্থা।

একটার পর একটা পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে গার্গী, আর তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে এযুগের এক রাজকাহিনী। পড়তে পড়তে মুখ তুলল, আশ্চর্য হয়ে বলল, মেঝে খুঁড়লে সোনা-হিরে-জহরত ভর্তি কলসি পাওয়া যাবে! খুব ইন্টারেস্টিং তো! যাই হোক, কিন্তু তারপর তো আর কোনও সংবাদ নেই! সেই উত্তরাধিকারিত্বের ঝামেলাটা এখনও রয়ে গেল।

শঙ্খলেখা মিটমিট করে হাসল এবার, সেটাই তো সদ্য জেনে এলাম এবার বাড়ি গিয়ে। সে খবর বাই-উইকলির যে সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সেটা এমন হটকেকের মতো বিক্রি হয়েছে যে, অনেক কষ্ট করেও জোগাড় করে উঠতে পারিনি। একেবারে রুদ্ধশ্বাস কাহিনী—

গার্গীরও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, কী খবর?

—রাজবাড়ির সাতকুলে কেউ আর বেঁচে নেই এমনই জানত সবাই। হঠাৎ একজন যুবক খবরের কাগজে তাদের বিজ্ঞাপন দেখে এসে হাজির হয়ে জানিয়েছে, সে-ই এই রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী। অমনি তাদের ট্রাস্টিবোর্ডের উকিল নাকি মেনে নিয়েছে তাকে। সে-ই বিশাল সম্পত্তির মালিক এখন।

গার্গীও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, তাই?

—হ্যাঁ। কিন্তু রাজবাড়ির কেউ তাকে মানতে চাইছে না। বলছে, সে রাজবাড়ির কেউ নয়। ভুয়ো উত্তরাধিকারী।

pathagar.net

—রাজবাড়িতে আর কারা থাকে?

—ও বাড়িতে যারা আশ্রিত হিসেবে থাকে। তারাই তো বুড়ি রানিমাকে দেখাশুনো করেছে এতদিন। ভেবেছিল, বুড়ি মরে গেলে তারা এ বাড়ির সম্পত্তি ভোগ করবে।

—তাহলে সেই ছেলেটা কে?

—সে নাকি গিয়ে বলেছে, তার নাম অলর্ক বোস। রানিমার এক মেয়ের ছেলে। কিন্তু চেহারা একেবারে সাহেবদের মতো। গায়ের রং লাল। চুল-দাড়ি সবই নাকি লালচে ধরনের।

গার্গী ঘটনাটা নিয়ে কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে ভাবল নিজের মনে। এসব ঘটনা যেন গল্প-উপন্যাসেই পড়া যায়। হঠাৎ বিংশশতাব্দীর এই শেষপদে পৌঁছেও এমন ঘটনা যে ঘটতে পারে, তা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না। কে যেন বলেছিলেন, সামটাইমস্ ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই বিড়বিড় করল সে, অদ্ভুত, খুবই অদ্ভুত। তারপর হঠাৎ বলল, আর রানিমার সেই খুনের ঘটনা? তার কোনও তদন্ত হয়েছে কে খুন করল তাকে! কেনই বা!

—না। থানা থেকে একদিন এসে হরিশংকর চৌধুরীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল থানায়। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আবার ছেড়ে দিয়েছে তাকে। তারপর আস্তে আস্তে ধামা চাপা পড়ে গেছে এতদিনে। আসলে রাজবাড়ির ব্যাপার চিরকালই একটু রহস্যময় লাগত স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে। এখনও তার সবকিছুই রহস্যে ভরা। শুনলাম, সাহেবখানা যে ছেলেটা উত্তরাধিকারী হিসেবে সব সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তার সঙ্গে ওদের বাড়ির হেড-লেঠেল হরিশংকর চৌধুরীর তক্‌রার হয়েছে।

—তক্‌রার!

মানে তর্কাতর্কি। তাতে দুজন দুজনকেই শাসিয়েছে, পরে হেস্তনেস্ত করবে বলে।

—বাহ্, তাহলে তো বেশ জমেছে ব্যাপারটা, একদিন তাহলে যেতেই হচ্ছে ওখানে। গার্গী হাসতে হাসতে বলল।

সত্যিই এক অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেয়ে তার ভেতরে তোলপাড় হচ্ছে তখন। যে ঘটনার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই, হয়তো খবরের কাগজ না পড়লে জানতেই পারত না ব্যাপারটা, তেমন একটি ঘটনার সঙ্গে সে যেন ওতপ্রোত হয়ে পড়েছে ক্রমশ।

কিন্তু যাই হোক, গার্গীর মাথায় তখন একই সঙ্গে অন্য চিন্তাও চারিয়ে যাচ্ছে এবার। নতুন ফিচারটির সন্ধানেও তো তাকে বেরোতে হবে। নইলে ওদিকে গোঁসা হবে সম্পাদকের। অতএব হোস্টেল থেকে বেরিয়ে পায়ে পায়ে ঘুরল সে। কিছু ভাবছিল, আবার ভাবছিলও না। ঘুরতে ঘুরতে প্রায় আচমকা ধরা পড়ে গেল আর এক তরুণীর হাতে। তার পরনে বেশ মড্-ধরনের পোশাক। গার্গীকে দেখেই চ্যাঁচিয়ে উঠল, হাই, তুই এখানে কেন? বিদেশি অনুপ্রবেশকে আমার বেশ সন্দেহের চোখে দেখছি আজকাল—

গার্গী চমকে উঠে দেখল, সে ঢুকে পড়েছে তুলনামূলক সাহিত্যের চত্বরে। তরুণীটি আর কেউ নয়, তার অতি সাম্প্রতিক বান্ধবী ডোনা।

গার্গী কিছু অবাক, কিছু দোলাচলভঙ্গিতে তাকাল ডোনার দিকে। ডোনা এই চত্বরে বেশ বিখ্যাত মেয়ে। তবে ছাত্রী হিসেবে নয়, সে প্রসিদ্ধ তার বোহেমিয়ানা স্বভাবের জন্য। পোশাকের ব্যাপারে সে যেমন সবচেয়ে দুঃসাহসী, তেমনই তার চোখা চোখা কথাবার্তা, অদ্ভুত চালচলনের জন্যও সবার নজর কাড়ে অহরহ। আজও সে পরেছে লালরঙের একটি চাপা

pathagar.net

স্ন্যাকস। গায়ে ততোধিক চাপা স্লিভলেস জামা। হঠাৎ তার শরীরের দিকে তাকালে গা-টা শিরশির করে যেন। গার্গী নজর ফিরিয়ে বলল, কেন?

উত্তর না দিয়ে ডোনা পুনর্বার জিজ্ঞাসা করল, নিশ্চই তুই কারও দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছিস এখানে? কোনও অধ্যাপকের?

—উঁহু,মনে কর্, আপাতত তোর হদিশেই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, আমার খোঁজে। নো, নো, মাই ফ্রেণ্ড, গার্গী মুখার্জি আমার খোঁজে কমপ্যারেটিভ লিটারেচার ডিপার্টমেন্টে আসবে, এ কথা মরে গেলেও আমার বিশ্বাস হবে না। কিন্তু ম্যাথ্‌সের ছাত্রী হঠাৎ এ দপ্তরে কেন তা জানতে ভারি আগ্রহ হচ্ছে!

গার্গী হাসল, তার হাসির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থাকে বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক, বলল, একটা ফিচার তৈরি করছি আমাদের প্রজন্মের মেয়েদের ব্যাপারস্যাপার নিয়ে। তুই নিশ্চয় এ-কথা স্বীকার করবি, আমাদের মা-কাকিমা কিংবা মাসি-পিসিরা যেভাবে জীবনযাপন করত তাদের কৈশোর কিংবা যৌবনে, এখনকার মেয়েরা তাদের চেয়ে একেবারেই আলাদা!

—অফ কোর্স।

—আমার ফিচারের বিষয়বস্তু সেটাই। হঠাৎ এমন করে বদলে গেল কেন মেয়েরা, সে ব্যাপারে তোর মতামত নিতে চাই।

—গুড হেভেনস্‌! তুই ম্যাথ্‌স্ পড়তে পড়তে হঠাৎ সোসিয়েলজির ব্যাপারে এত আগ্রহী হলি কেন? ম্যাথ্‌সে এম. এস. সি ক'রে সোসিয়োলজিতে ডক্টরেট করতে চাস নাকি?

—না, না, তা নয়। গার্গী হেসে উঠল, জাস্ট ফর কিউসিওসিটি। আমার এরকম হাজারো কৌতূহল থাকে চারপাশে যা-সব ঘটে যাচ্ছে তাই নিয়ে।

—সে তো ডিবেট-কম্পিটিশনে তোর চ্যাম্পিয়ন হওয়া দেখেই বুঝেছি। সেও তো তোর নিজের সাবজেক্টে নয়। ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের বিষয় নিয়ে সেদিন যেভাবে লড়ে গেলি—। তা হঠাৎ আমার কাছে কেন?

—তোর বোহেমিয়ানা জীবনযাপন এই চত্বরে আজকাল গসিপের বিষয়বস্তু। হঠাৎ কানে এল, তুই নাকি কার সঙ্গে ডেটিং করে ফিরেছিস, আর সেটা ফলাও করে বলে বেড়াচ্ছিস একে-ওকে। শুনে মনে হল, ব্যাপারটা আনলাইক বেঙ্গলিজ্। তুই অন্য সবার থেকে আলাদা। দুঃসাহসী।

ডোনা খিলখিল করে হেসে উঠল, দ্যাটস জাস্ট ফর ফান। আই লিভ ফর ফান, বুঝলি? হি হি হি হি...... সেদিন যখন মারুতি চালিয়ে ফিরছি, সেই ছেলেটা তার টেণ্ডার মিস্ হয়ে গেল বলে কেবলই হাপ্‌সি কাটছিল। তা আমি বললাম, পৃথিবীতে বেঁচে থাকার তুলনায় টেণ্ডার একটা ভারি সামান্য ব্যাপার। এই দ্যাখো সামনে একটা ট্রাক আসছে, একটা অ্যাকসিডেন্ট করি। তখন দেখবে টেন্ডার-ফেন্ডার সব আসলে মায়া। শুনে বুঝলি, ছেলেটা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল প্রায়, বলল, মেরো, মেরো না প্লিজ—

ডোনার বলার ভঙ্গিতে গার্গীর হাসি পেয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর হাসি-বাসি মুখে বলল,তুই পারিসও বটে। তা হঠাৎ বিদেশি অনুপ্রবেশ নজরে পড়লে তোরা সন্দেহের চোখে দেখছিস কেন?

ডোনা মিটমিট করে হাসল, তা হলে আয়, তোর ওই কিউরিয়োসিটি র কাজে লেগে যাবে এমন কিছু তথ্য জোগাড় করে দিই। আধুনিক প্রজন্মের মেয়েরা ঠিক কীরকম—

যে বিল্ডিংটিতে তুলনামূলক সাহিত্য পড়ানো হয়, তার একতলার বারান্দায় এককোণে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে আনমনে। তরুণীটিকে গার্গী চেনে না, কিন্তু তার উদাসীন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। পরনে চট্‌লা-ওঠা নীলরঙের জিনস্‌, আর সাদা শার্ট। দূর থেকে দেখে মনে হল, চোখের চশমাটা সে উঠিয়ে রেখেছে মাথার উপর, মাথার চুলে। কানের দুপাশ থেকে চশমার কালো কার নেমে এসেছে গলার দু-পাশে। দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, অথচ মৃদু-মৃদু দুলছে তার শরীর। যেন তালে তালে পা নাচাচ্ছে—

ডোনা গলা নামিয়ে বলল, এও কিন্তু বিদেশি অনুপ্রবেশ। ইংরেজির ছাত্রী।

তারপর বেশ সপ্রতিভভঙ্গিতে মেয়েটির কাছে গিয়ে বল, হা-ই।

মেয়েটি কিন্তু শুনতেই পেল না ডোনার ডাক। বরং তার শরীর কী এক অদ্ভুত তালে দুলে দুলে উঠছে। ডোনা ফের ডাকল, হাই ইলিনা—

ইলিনা নামের মেয়েটি তখনও ভাবে বিভোর। নিজেকে আর সামলাতে না পেরে ডোনা একেবারে তার কাছে গিয়ে কাঁধে চাপড় দিয়ে বলল, হোয়াট হ্যাপেন্‌ড্‌ ইলিনা, সো অ্যাবসেন্ট-মাইন্ডেড্‌—!

ইলিনা এতক্ষণে হুঁশে ফিরে এল যেন। ততক্ষণে তার কানের কাছে ঝুলতে থাকা কালো কার টেনে সরিয়ে দিয়ে বলল, কিছু বলছিস, ডোনা?

ডোনা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে, ও, তাই বল। তাহলে তুই বিভোর হয়ে ওয়াকম্যান শুনছিলি।

গার্গীর খেয়াল হয় এতক্ষণে। তাই তো, মাথার উপর তোলা ডাঁটিটা তো চশমার নয়, ওয়াকম্যানের। দেখেই হাসি পেয়ে গেল তার। বেশ মজার মেয়ে তো।

ডোনা হাসি থামিয়ে বলল, কী ব্যাপার, ইলিনা, কার মিউজিক শুনছিস অত মন দিয়ে?

—কার আবার। মাইকেল জ্যাকসনের। কা দারুণ গেয়েছে। শুনবি, শুনবি, বলে তাড়াহুড়ো করে তার ওয়াকম্যানটি পরিয়ে দিতে চায় ডোনার কানে।

ডোনা তাকে নিবৃত্ত করে আগের প্রশ্নটাই ফের করল, কিন্তু হঠাৎ ইংলিশ ডিপার্টের ছাত্রী কমপ্যারেটিভ কেন, মাদামাজোয়েল?

ইলিনা হঠাৎ মুখটা সিরিয়াস করে বলল, আমি তো এম. আর-এর জন্য ওয়েট করছি।

ডোনা মুহূর্তে গার্গীর সঙ্গে চোখাচোখি করে নিল, তারপর বলল, কেন, এম. আর-এর জন্য কেন?

ইলিনা হাসি-হাসি মুখে বলল, উনি তো আমাকে শেক্সপীয়ার-এর উপর লেখা একটা বই দেবেন বলেছিলেন। কিন্তু সেই কখন থেকে এসে ওয়েট করছি। এখনও প্রফেসর্স রুমে ফেরেননি।

ডোনা ভুরু কুঁচকে বলল, ফেরেননি মানে? আমাদের ক্লাস তো সেই কখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তুই নিশ্চয় অনেকক্ষণ উপরে যাসনি।

ইলিনা আঁতকে ওঠে, তাই! এ হে, আমি আসলে গানের মধ্যে ছিলাম তো। বলেই হুড়মুড় করে ছুটল দোতলায়, যেন তার ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে।

তার ছোটার ভঙ্গি দেখে ডোনা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। গার্গী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এম. আর-এর ফ্যান বুঝি ও?

—শুধু একা ইলিনাই নয়। মণীশ রায়ের যে কত্ব ফ্যান তা তুই ভাবতে পারবি না। যেদিন

pathagar.net

মণীশ রায়ের ক্লাস থাকে, সেদিন আমরা বসার সিটই পাই না ক্লাসে। অন্য ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা এসে দলে-দলে ভিড় করে মণীশ রায়ের লেকচার শুনতে।

—তাই! খুব ভালো পড়ান বুঝি?

—পড়ান অবশ্য ভালই। বিদেশি-সাহিত্য এত নিখুঁতভাবে পড়েছেন,আর তা এমন চমৎকারভবে এক্সপ্লেন করেন যে, অবাক হয়ে শোনার মতোই। কিন্তু অন্য মেয়েরা তো ওঁর পড়ানো শুনতে আসে না, ওঁকে দেখতে আসে। এমন সুপুরুষ চেহারা এই চত্বরে চট্‌ করে দেখতে পাবি না।

—মাই গড্‌। গার্গী অবাক হয়ে বলল, খুব ক্রেজি তো তাহলে মেয়েগুলো!

—তাহলেই দ্যাখ্‌, ডোনা গার্গীর দিকে তাকিয়ে তার ভুরু নাচায়, এ ব্যাপারটা তোর কাছে একাট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট। তোর ডায়েরিতে এই পয়েন্টটা অনায়াসে নোট করতে পারিস।

গার্গী হেসে বলতে যাচ্ছিল, ব্যাপারটা অবশ্যই নোট করব। এই ক্রেজটাই তো আমার কৌতূহলের বিষয়বস্তু, কিন্তু বলা হল না, তার আগেই ডোনা তার ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে মুখে স-স্‌-স্‌-স্‌ শব্দ করে চুপ করতে বলল গার্গীকে। ততক্ষণে সেখানে হনহন করে এসে পড়েছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের শাড়ি পরে আরেক তরুণী। লব্‌জ্‌ করা চুল কপালে লতিয়ে নেমেছে, কানে বড়-আকারের ঝুমকো দুল। চোখে পড়ার মতো সাজ। তাকে থামিয়ে ডোনা বলে উঠল, তুই কি এম. আর-এর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস, তিতির?

উনি কিন্তু একটু আগে বেরিয়ে গেলেন।

তিতির নামের মেয়েটি হতাশ হয়ে বলল, তাই নাকি? উনি যে বলেছিলেন সোয়া একটা নাগাদ আসতে?

—হুঁ। কিন্তু হঠাৎ বাড়ি থেকে টেলিফোন এসেছে, ওঁর মিসেসের শরীরটা ভাল নেই। তাইই—

—তাই? মেয়েটি গম্ভীর হল। সুপুরুষ পুরুষদের ‘মিসেস’ থাকার অস্তিত্ব কোনও প্রেমিকা বা ফ্যানই বোধহয় পছন্দ করে না। একমুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে সে আবার পা বাড়াল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই।

তিতির চোখের আড়াল হতেই খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে ডোনা, বলল, আমার খুব মজা লাগে এইসব ক্রেজি মেয়েগুলোকে নিয়ে একটু নাচানাচি করতে। এই মেয়েগুলোর স্বভাবই এই যে, তারা কোনও না কোনও ছলছুতোয় মণীশ রায়ের কাছে যাবে, তাঁর সঙ্গে একটু গল্পগুজব করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করবে।

—আশ্চর্য, এতদিন হয়ে গেল এখানে পড়ছি, অথচ তোদের ডিপার্টে এমন একটি সেন্টার অপ অ্যাট্রাকশন আছে তা কেউ কখনও আমাকে বলেনি তো।

—এ তো কেউ কাউকে বলে না। সবাই ভাবে, এম. আরের সান্নিধ্য সে একাই উপভোগ করবে। যারা জানবার তারা ঠিকই খুঁজে নেয় এই দপ্তরের ঠিকানা। তোর এরকম কোনও ধান্দা থাকলে নিশ্চয় জেনে যেতিস।

—এম. আর নিশ্চয়ই বিবাহিত?

—হুঁ, লেট-ম্যারেজ। এতদিন কয়েক হাজার মেয়েকে সান্নিধ্য দেওয়ার পর হঠাৎ কিছুদিন আগে ফেঁসে গেছেন। বিয়ে করেছেন ওঁর ক্লাসেরই এক ছাত্রীকে। কী করে আরও হাজার খানেক ছাত্রীকে ওভারটেক করে সে এম. আর কে বিয়ে করতে পারল, তা নিশ্চই তোর কাছে এক গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

pathagar.net

—যা বলেছিস। তাহলে তো ভদ্রলোকের সঙ্গে একদিন আলাপ করতে হয়।

ডোনা আঁতকে উঠে বলল, ওঁর সঙ্গে আলাপ করলে তুইও ফেঁসে যাবি কিন্তু। আর বেরিয়ে আসতে পারবি না। নারীদের মোহিনীশক্তি থাকে জানতাম, কিন্তু পুরুষদের আকর্ষণী-ক্ষমতা যে এত প্রবল হতে পারে তা ওঁকে দেখে প্রথম জানতে পারলাম।

—তোকে আকর্ষণ করেন না!

যখন প্রথম পড়তে এসেছিলাম, তখন ওঁর রূপ, কথা বলার স্টাইল, পড়ানোর চার্ম আমাকেও মুগ্ধ করত। কিন্তু পরে মনে হল, আমি একজন মেয়ে, কোথায় আমাকে দেখে মুগ্ধ হবে, তা নয় তো আমিই মুগ্ধ হচ্ছি এক পুরুষকে দেখে। এ বড় অনাছিষ্টি ব্যাপার। এরকম হওয়া উচিত নয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলাম। এখন অন্য মেয়েদের আদেখলেপনা দেখলে হাসি লাগে আমার। ওদের নিয়ে প্রায়ই এরকম মজা করি আমি।

গার্গী কয়েকমুহূর্ত ডোনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ডোনা আসলে নিজেই সেন্টার অপ্ অ্যাট্রাকশন হতে চায়। সে চায়, অন্যে তাকিয়ে থাকুক তার দিকে। অন্যেরা ছুটুক তার পিছনে। সে কারও পিছনে ছুটবে না। বোধহয় তাই এর এমন অদ্ভুত পোশাক, এমন বোহেমিয়ানা জীবনযাপন। খানিক পরে বলল, একালের মেয়েরা সত্যিই আশ্চর্যের। ভেরি মাচ ক্রেজি অ্যাণ্ড আন্‌প্রেডিক্টব্‌ল্। বোধহয় মেয়েদের ষোলো থেকে উনিশ-কুড়ি বয়সটাই এমন। এই বয়সে মেয়েরা কাউকে না কাউকে পাগলের মতো ভালবেসে ফ্যালে। কাকে ভালবাসছে তা খতিয়ে দেখার সময় নেই তাদের। মনে নেই, মীরাকে বলা হয়েছিল পাথরের তৈরি কৃষ্ণমূর্তিটি তার স্বামী? ব্যস্, বাকি জীবন সে পাথরের মূর্তিটিকে স্বামী বলে পুজো করে গেল। তবে আদ্যিকালের মেয়েরা বোধহয় এমন ভীষণভাবে ক্রেজি ছিল না, যা এখনকার মেয়েরা। আসলে পাশ্চাত্য অনুপ্রবেশ যত ঘটছে, ততই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে মেয়েদের। সামনে ঝলমলে যা-কিছু দ্যাখে, তার পিছনেই ছুটতে চায়। আজকালকার প্রায় সব ইয়ং মেয়েরাই ভাবে সাজগোজ করে এক-একজন ফিল্ম অ্যাকট্রেস হয়ে উঠবে। দামি কস্‌মেটিক্স্ মাখবে যেগুলো রোজ তারা টি.ভি-র বিজ্ঞাপনে দ্যাখে। ভাল বাড়িতে থাকবে, গাড়ি চড়বে, ভাল খাবার খাবে। যেমন আজকালকার সব ইয়ং মা-ই ভাবে তার ছেলে ভাল ইংলিশ মিডিয়ম স্কুলে পড়বে। সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে। সি. এ, অথবা আই. এ. এস। ফলে সবার সঙ্গে সবার এক অন্তহীন প্রতিযোগিতা।

ডোনা হেসে বলল, স্টাডি করার বিষয়বস্তুটি ভালই বেছেছিস তুই।

—মাঝেমধ্যে দাদার বাচ্চাটাকে স্কুলের গেটে পৌঁছে দিয়ে আসতে কিংবা নিয়ে আসতে হয়। গেটের সামনে অপেক্ষা করার সময় কয়েক হাজার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাদের আলোচনা কানে আসে। সে যা ইন্টারেস্টিং আলোচনা, শুনতে শুনতে মনে হয়, আমাদের শৈশবে আমাদের মায়েরা এসব ভাবেইনি কখনো। হঠাৎ দশ-পনেরো বছরের মধ্যে কয়েকযুগ এগিয়ে গেছি যেন আমরা।

গার্গীর লম্বা বক্তৃতা শুনতে শুনতে ডোনা অল্প অল্প হাসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল দূর থেকে হনহন করে হেঁটে আসছেন তাদের এক অধ্যাপক। সে ঠোঁটে হিস্‌হিস্ শব্দ করে বলল, ইটস অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং কেস। আর. ডি. আসছেন।

আর. ডি-এর পরনে ঘন ছাই রঙের প্যান্ট। গায়ের সাদার উপর নীল সরু স্ট্রাইপের জামাটা প্যান্টের ভিতর বেশ নিখুঁত করে গোঁজা। দ্রুত হেঁটে আসা দেখেই বোঝা যায় এক্ষুনি তাঁর ক্লাস আছে। চলতে চলতে হঠাৎই ডোনাকে দেখে থমকে গেলেন, ক্লাসে যাবে না?

pathagar.net

—যাব, স্যার।

আর. ডি-র হঠাৎ নজর পড়ল গার্গীর দিকে। এমনিতে চেনার কথা নয়, তবু চিনলেন, তুমি এবার ডিবেট-কম্‌পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছিলে না।

গার্গী খুব লজ্জা পেয়ে বলল, হ্যাঁ, স্যার।

—বাহ্‌। ভাল। তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন দুজনে।

ডোনা হঠাৎ ফস্‌ করে বলল, স্যার এম. আর-এর সঙ্গে আলাপ করার খুব শখ ওর। তাই অপেক্ষা করছে। ইলিন বলে একটা মেয়ে প্রায় আধঘন্টা আগে এম. আর-এর কাছে গেছে শেক্সপিয়ার-এর উপর একটা বই আনতে। কিন্তু এখনও ওঁর ঘর থেকে বেরোয়নি।

তৎক্ষণাৎ আর. ডি-র মুখটা শক্ত হয়ে দেল। মুখটা সামান্য বাঁকিয়ে গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী বই-এর দরকার?

ভীষণ বিব্রত, বিপন্ন দেখাল গার্গীকে, হঠাৎ ডোনা তাকে এমন অপ্রস্তুত করে দেবে তা সে একবারও ভাবতে পারেনি। আর. ডি-র প্রশ্নের উত্তরে সে কী জবাব দেবে ভাবতে ভাবতে একমুহূর্ত লাল হয়ে গেল। কিন্তু উত্তর দিতে হল না তাকে, তার হয়ে দ্রুত উত্তর দিল ডোনাই, স্যার, গার্গী ম্যাথ্‌স্‌-এর ছাত্রী, আইনস্টাইন-এর রিলেটিভিটির উপর কী যেন একটা বই চাই বলছিল।

আর. ডি-র মুখটা আবারও পাথর হয়ে গেল, চোয়াল দুটো ঘৃণায় বেঁকেও গেল একটু, বললেন, ও, মণীশ আজকাল ম্যাথ্‌স্‌-এর বইও সাপ্লাই করছে নাকি?

ডোনা হেসে বলল, স্যার, আপনার কাছে আছে নাকি বইটা! তাহলে আর ওকে এম. আর-এর জন্য ওয়েট করতে হয় না।

আর. ডি গম্ভীর হয়ে বললেন, না, ম্যাথ্‌স্‌ তো আমার সাবজেক্ট নয়। বলে হনহন করে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে।

আর. ডি অন্তর্হিত হওয়ার পরের মুহূর্তেই ডোনা আবার খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। গার্গী অপ্রস্তুত মুখে বলল, তুই ভারি অদ্ভুত তো?

—দেখলি, এম. আর-এর নাম কানে যেতেই আর. ডি-র মুখখানা কীরকম স্টিফ্‌ হয়ে গেল?

—তা তো দেখলাম। দু'জনের মধ্যে খুব রেষারেষি বুঝি?

—ভীষণ। আসলে এটাই তো হিউম্যান সাইকোলজি। সব মেয়েরা যেভাবে এম. আর. এম. আর করে পাগল, তাতে তার সহকর্মীর তো ঈর্ষা হবারই কথা।

—আর তার মধ্যে আবার তুই আমাকে লট্‌কে দিলি?

ডোনা আর একদফা হেসে উঠে বলল, ভাগ্যিশ সেই মুহূর্তে আইনস্টাইন-এর রিলেটিভিটির কথা পট্‌ করে মনে পড়ে গেল। ব্যস্‌, এক আইনস্টাইন-এর নামেই আর. ডি কাত। সাহিত্যের বই-এর নাম মনে পড়লে হয়েছিল আর কি। তোকে টানতে টানতে নিয়ে যেতেন উপরে, বলতেন, ওহো, ও বইটা তো আমার কাছেই আছে—

ফের আঁতকে উঠল গার্গী, ও মা গো—

তারপর হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল ডোনার, এ হে্‌ আর. ডি-র ক্লাসে যেতে হবে যে। একবার যখন দেখে ফেলেছেন, তখন ক্লাসে না গেলে পরের দিন ক্লাসেই ধরবেন, কী হল, ডোনা, এম. আর-এর ক্লাস হলে নিশ্চয় এভাবে অফ্‌ দিতে না—

pathagar.net

সাত

কালোরঙের একটা বিশাল কনটেসা চালিয়ে অলর্ক একদিন সকালে ঢুকে পড়ল যোধপুর পার্কের ভিতর। লক্ষ রাখছিল কেউ তাকে ফলো করছে কি না। রাস্তার দু'পাশে লেটেস্ট ডিজাইনের রঙচঙে দোতালা তিনতলা বাড়িগুলো ফেলে, কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে পাক খেয়ে, একে ওকে জিজ্ঞাসা করে সে এসে থামল চমৎকার, প্রায় ছবির মতো দেখতে একটা একতলা বাড়ির সামনে। এরকম নতুন সব পল্লী কলকাতার যেখানেই গড়ে উঠেছে, বিশেষ করে যেমন এই যোধপুর, কিংবা আলিপুর, লেকটাউন বা সল্টলেক এলাকায়, সেখানেই আর্কিটেক্টদের এমন অভাবনীয় চোখ-ধাঁধানো স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে অহঙ্কারীর মতো। কনটেসার ইঞ্জিন বন্ধ করে অলর্ক বেশ কিছুক্ষণ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িটার দিকে।

কয়েকদিন আগে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে ফোন করা মাত্র পত্রপাঠ রিফিউজড্ হয়েছিল সে। অবশ্য কর্কশ কণ্ঠের 'স্যরি' শুনেও বিন্দুমাত্র ঘাবড়ায়নি। শিল্পীরা এমন রুক্ষমেজাজের, একগুঁয়ে হতে পারে এমন আভাস তার এক বন্ধু দিব্যজ্যোতি আগেই দিয়েছিল তাকে। যে-কোনও শিল্পীই তার আঁকাজোকার গণ্ডির বাইরে বেরোনোকে খুবই অপছন্দ করবেন সেটাই সম্ভব। কিন্তু চিত্রদীপ শুধুমাত্র শখের শিল্পী নন, কিছু-কিছু কমার্শিয়াল কাজও করে থাকেন এ খবর তার কাছে আছে। তাইই আজ তার হঠাৎ এই যোধপুর পার্কে অভিযান। চেনাগণ্ডির বাইরে তাঁকে যে কোনও ভাবেই হোক বের করে আনতে হবে অলর্ককেই। তার জন্যে প্রস্তুতি দরকার, সময় চাই, শিল্পীকে সেভাবেই আস্তে আস্তে আলোচনায় নিয়ে আসতে হবে, তাকে রাজি করাতে হবে।

এককালের রকবাজ ছোকরা অলর্কের সামনে এখন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। যজ্ঞই বটে। সে যজ্ঞ সঠিকভাবে, এবং হ্যাঁ দুরন্তগতিতে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে তাকে খুব হিসেব করে এগোতে হবে এখন।

রকের আড্ডাবাজ ছোকরা যে হঠাৎই এভাবে একই সঙ্গে রাজপ্রাসাদ ও রাজকোষের মালিক হতে পারে, তা কোনও গল্প উপন্যাসে পড়া থাকলেও কখনো সত্যি হয় তা ভাবতে পারেনি অলকা। কলকাতার রাসেল স্ট্রিটের এক পুরানো বাড়িতে তার অশৈশব বসবাস। পিতৃদত্ত এই অদ্ভুত ধরনের প্রাচীন বাড়িটি ছাড়া তার আর কোনও সম্পত্তি ছিল না ভূভারতে। তার বাবা ছিলেন আর্মেনিয়ান, কিন্তু মা এদেশি রমণী। সে কারণে তার জন্ম রহস্যটি ভারি গোলমেলে। জন্মের কারণেই তার চোখের তারা নীলচে, চুল একটু সোনালি ধরনের, গায়ের রঙও অসম্ভব ফর্সা। তার উপর চুল-দাড়ি লম্বা করে রাখায় তার চেহারাটা দেখায় প্রায় জিশুর মতো। তার মা হঠাৎ করে মারা যাওয়ায়, এবং বাবা এদেশ ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পর এই পৃথিবীতে সে হয়ে গেল একেবারে ছন্নছাড়া, নিঃসঙ্গ। তার এমন কোনও যোগ্যতা ছিল না যাতে সে নিজের ভরণপোষণের সংস্থানটুকুও করতে পারে। শুধু বাবার জমানো টাকার সুদ হিসেবে মাসে হাজার দেড়েক টাকা তার একমাত্র সম্বল। তাতেই তার একার জীবনযাপন চলে যাচ্ছিল কোনোক্রমে। বাড়তি রোজগারের জন্য কোনও চেষ্টাই করেনি। হঠাৎই তার জীবনে ঘটে গেল এক অলৌকিক ব্যাপার।

আকস্মিক ভাবে তার কাছে খবর এসে পৌঁছাল তার কোনও এক দিদিমা নাকি সম্প্রতি মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন এক বিশাল সম্পত্তির মালিক, রাজৈশ্বর্যই বলা চলে, কিন্তু কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না সেই অগাধ রাজকোষের। ছিল না নয়, সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

উত্তরাধিকারীর অভাবে যখন বীরভঙ্গপুরের সেই সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা অন্যের করায়ত্ত হতে চলেছে, ঠিক সেসময়ে কোনও শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে একটা খবর তার কাছে এসে গেল অদ্ভুতভাবে। অলর্কই নাকি সেই উত্তরাধিকারী। সম্পত্তি বেহাত হওয়ার আগে তার এক্ষুনি পৌঁছান দরকার সেখানে। এইমুহূর্তে। শুনে অলর্ক বিস্মিত, স্তম্ভিত। সে নিজে খুব অবহিত ছিল না এ-ব্যাপারে। এহেন কোনও দিদিমার কথা তার শৈশবে কৈশোরে কখনও শোনেওনি মায়ের কাছে। ইতিমধ্যে তার মা মারা যাওয়ায় এখন জানার কোনও প্রশ্নও ওঠে না। তবু খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে দেখল এক এলাহি কাণ্ড।

শুধু যে দিদিমার বাড়িটাই এক রাজপ্রাসাদের মতো তো নয়, বাড়িতে মজুত আছে ব্যাঙ্কের আমানতের প্রচুর কাগজপত্র। তাছাড়া দু-তিনটে সিন্দুকভর্তি সোনাদানা। দাদামশাই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর পূর্বপুরুষরা এককালে রাজা ছিলেন। এখন রাজত্ব গেছে, কিন্তু তিলতিল করে সঞ্চিত অর্থ তাঁরা যক্ষের মতো আগলে রেখে গেছেন আমৃত্যু। বছর দশেক আগে দাদামশাই মারা যাওয়ার পর বিধবা দিদিমাও সে অর্থ প্রাণ ধরে খরচ করে উঠতে পারেননি। শুধু একপাল পোষ্য পালন করে গেছেন প্রাসাদটিতে।

শেষে মৃত্যুর আগে একটি উইল করে তাতে নির্দেশ দিয়ে যান : আমার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এই বংশের জীবিত নাতি। তার নাম অলি।

অলিই যে অলর্ক, সে কথা অলর্ক জানে না। তার ডাকনাম টোটো, কস্মিনকালেও অলি ছিল না। কী ভাবে যে বহু বাধাবন্ধ ডিঙিয়ে দিদিমার মৃত্যুসংবাদ ও তার উত্তরাধিকারী হওয়ার সংবাদ তার কাছে পৌঁছাল সেটাও তার কাছে ভারি রহস্যজনক। আসলে সম্পত্তির অনেক দাবিদার জুটে গিয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই ছলে-বলে কৌশলে হাতিয়ে নিতে চেয়েছিল এ বিপুল সম্পত্তির সিংহভাগ। তাদের মধ্যে যারা এই চাতুর্যের খেলায় হেরে যেতে বসেছিল, তাদের কেউ বা কারা খোঁজ করে আবিষ্কার করেছিল তাকে। নিজে যখন পাচ্ছি না, তখন অন্য দাবিদারদেরও পেতে দেব না এমন ঈর্ষাজনিত কারণেই অলর্কের খোঁজ।

শুনে অলর্ক নিঃসন্দেহ হতে পারেনি এই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র সত্যিই তাঁর দাদামশাই ছিলেন কি না। তার মাকে প্রায় লোপাট করে নিয়ে এসে বিয়ে করেছিলেন তার বাবা এমন সংবাদ ভাসা ভাসা শুনেছিল তার শৈশবে। মায়ের কুলপঞ্জিকা নিয়ে কখনও অতঃপর কেউই মাথা ঘামায়নি, ঘামানোর প্রয়োজনও ছিল না, কারণ সে তরুণী তখন ছিল এল লালমুখো বিধর্মর হেপাজতে। এতদিন পর সেই তরুণীর গর্ভজাত সন্তানকে সন্ধান করবে তার পিত্রালয়ের কিংবা মাতুলালয়ের কেউ তা অলর্কের পক্ষে ভাবা অসম্ভব।

যাই হোক, তা নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনও ফুরসতই তার হয়নি। সে রাজপ্রাসাদে পৌঁছানো মাত্র বুঝতে পারল, তার উপস্থিতি সে বাড়ির অন্য দাবিদারদের আশায় একমুহূর্তে জল ঢেলে দিয়েছে। রাজবাড়িতে দিদিমার অনেক পোষ্য। চাকর-বাকর দূর-সম্পর্কের আত্মীয়রা বাস করতেন বহুদিন ধরে। অলর্ক পৌঁছাবার অনেক আগেই তারা নিজেদের মধ্যে সেই বিশাল সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিতে আলোচনা চালাচ্ছিল। রাজবাড়ির সব সম্পত্তির চাবি গচ্ছিত ছিল স্থানীয় একজন নামজাদা উকিলবাবুর কাছে। তিনি উত্তরাধিকারী সম্পর্কে নিঃসন্দেহে হতে না পারায় আত্মীয়স্বজনদের আলোচনা আলোচনার স্তরেই থেকে যাচ্ছিল, ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্ভবপর হয়নি। অলর্ক যদি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছাত তাহলে কী হল বলা যায় না।

pathagar.net

অলর্ক সেখানে গিয়ে পৌঁছাতেই পুরো আবহাওয়াটা বদলে গেল ভোজবাজির মতো। সবাই যেন আগে থেকে জেনেই গিয়েছিল তার অস্তিত্ব, কিন্তু তার ঠিকানা জানত না। শুধু ভয়ে ভয়ে ছিল সে কখন পটভূমিতে আবির্ভূত হয়ে পড়ে। তারা হয়তো মনেপ্রাণে কামনা করেছিল, অলি নামের নাতিটির কাছে যেন এই সম্পত্তির খবর গিয়ে না পৌঁছায়। অথবা সে যেন জীবিত না থাকে। অথবা যে কোনও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। ফলে অলর্কের পৌঁছানোতে তারা প্রবল আশাহত, প্রত্যেকেই হতাশ, ক্ষুব্ধ, কিন্তু কেউই তা মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারল না, কারণ সেই উকিলবাবু অলর্ককে দু'চারটে প্রশ্ন করেই নিঃসন্দেহ হলেন এই যুবকটিই বুড়ি দিদিমার উইল কথিত নাতি। অলিই অলর্ক।

দাবিদারদের মধ্যে যিনি প্রধান ছিলেন সেই হরিশংকর চৌধুরী নানা কুলপঞ্জিকা মুখে মুখে শুনিয়ে তাঁর দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বহুকাল ধরে। হরিশংকরের বয়স ষাটের ওপর। কিন্তু বিশাল দশাসই চেহারার তিনি তখনও কর্মক্ষম। তাঁর চোখদুটি সর্বদাই লাট্টুর মতো ঘুরছে, সারাক্ষণই অন্যদের দাবিয়ে কীভাবে গ্রাস করবেন এই ঐশ্বর্য, তার ছক কষে যাচ্ছিলেন নিখুঁতভাবে। অলর্ক ঘটনাস্থলে হাজির হতে তিনি প্রথমেই তাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, কে হে তুমি, ছোকরা? কোথাকার নেপো যে ফোকটে দই খেয়ে যাবে! এ বাড়িতে আমাদের তিরিশ বছরের বাস।

অলর্ক তাকে একধরনের গা-জ্বালানো হাসি উপহার দিয়ে বলেছিল, সেটা পরে বুঝবে চাঁদু। আপাতত আমার হিস্যা বুঝে নিতে দাও।

হরিশংকর দপ্ করে জ্বলে উঠে বলেছিলেন, খবর্দার বলছি, এখানে হাত বাড়ানোর চেষ্টা করবে না। তাহলে–

—তাহলে? অলর্ক তার চোখে চোখ রেখেছিল, দাঁতে দাঁতও।

—তাহলে, বলে হরিশংকর চুপ করে গিয়েছিলেন, তাঁর ক্রুর চোখে তখন হাজার আগুনের দাপাদাপি। সে আগুনে অলর্ককে ভস্ম করে দিতেই বুঝি চাইলেন।

অলর্ক পরে এর ওর কাছে শুনেছিল, হরিশংকর এককালে ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের লেঠেল হিসেবেও কাজ করেছিলেন। তার লাঠিতে প্রাণ হারিয়েছে বহু গরিব মানুষ। লোকটা জল্লাদের চেয়েও নাকি নিষ্ঠুর। তিনি হঠাৎ অলর্কের অলি হয়ে যাওয়াটা সহ্য করবেন কেন!

অলর্ক তার পিতাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়েছিল তার নামকরণের জন্য। ভদ্রলোক চেহারায় সাহেব হলেও বাঙালি মেয়ে বিয়ে করার সুবাদে মেজাজে কিছুটা এদেশি হয়ে উঠেছিলেন। কোত্থেকে যেন জোগাড় করেছিলেন তাঁর ছেলের এই এদেশি নামটি যা শুনতে কিছুটা বিদেশি লাগে। অলর্কের ডাকনাম যে অলি হতে পারে তা বোধ হয় কখনও ভাবেননি তিনি, অলর্কও নয়। অলি বড়জোর কোনও মেয়ের নাম হতে পারে।

সে কথা চেপে গিয়ে সে এ বাড়ির উকিলবাবুর সঙ্গে জাঁকিয়ে বসল এই বিশাল ধন ঐশ্বর্যের হিসেব বুঝে নিতে। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারল,তার বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে সংগঠিত হতে চলেছে এক বিপুল ষড়যন্ত্র। যে-কোনও মুহূর্তে সে খুন হয়ে যেতে পারে এমন ফিসফিসানিও তার কানে পৌঁছে দিয়ে গেল কোনও শুভানুধ্যায়ী। অলর্কও সতর্ক হয়ে গেল। অনুভব করতে পারল, হরিশংকর চৌধুরীর তীক্ষ্ণ নজর তাকে অনুসরণ করে চলেছে সদাসর্বদা। সে একটু অসাবধান হলেই—

কয়েকদিন রাজপ্রসাদে থাকার পর উকিলবাবুর সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে সে যখন

pathagar.net

পুরো সম্পত্তির হদিশ পেল তখন প্রথমটা তার বিশ্বাসই হয়নি। এত পরিমাণ অর্থ এখন তার হেপাজতে! কেবল তারই! এও কি কখনও সম্ভব! এ তো রূপকথার কোনও রাজপুত্রই পেতে পারে। এ তো আলাদিনের প্রদীপ হাতে পাওয়ার মতোই।

সেই প্রায়-ভিখারি অলর্ক হঠাৎই যখন দৈববলে রাজা হয়ে গেল, প্রথমে ভাবতেই পারল না এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কী করবে। সমস্ত সম্পত্তি তার হস্তগত হওয়ার পর সে সেই উকিলবাবুকে এই সম্পত্তি এতকাল আগলে রাখার জন্য একটা মোটা টাকার চেক দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তারপর প্রাসাদের অন্য বাসিন্দা, পোষ্য, আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে মিটিং করে জানিয়ে দিল, এই বাড়িতে দীর্ঘদিন যাবৎ যারা বসবাস করে আসছে, তারা আপাতত সেখানেই বাস করতে পারবে। কিছু কিছু টাকাও সে প্রত্যেককে দিয়ে কিছুটা খুশি করে দিল। শুধু হরিশংকর চৌধুরীকে বলল, আপনি কালকের মধ্যেই বাস উঠিয়ে নিয়ে চলে যান অন্যত্র। তারপর ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, সিন্দুকের চাবি নিয়ে সে চলে এল কলকাতায়, অতঃপর সে কী করবে বা তার কী করা উচিত এমন এক প্রবল উদ্‌ভ্রান্তি নিয়ে।

টাকাটা নিয়ে প্রথমে তার কিছু গুপ্তবাসনা চরিতার্থ করল একজন উচ্চবিত্ত মানুষের যা যা উচ্চাকাঙ্খা থাকে সেই ভোগবিলাসের সব উপকরণ কিনে। তার সঙ্গে কিনল এই চমৎকার কনটেসা গাড়িটি, যার দিকে একবার তাকালে দ্বিতীয়বার তাকাতে ইচ্ছে হবে। দ্বিতীয়বার তাকালে তৃতীয়বার।

গাড়িটি কেনার তার অন্য একটি ছোট্ট কারণও ছিল। ছোট্ট, কিন্তু অলর্কের কাছে সেই মুহূর্তে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রথম যৌবনে সে হঠাৎ দুম্ করে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল এক সুন্দরী কিশোরীর। এই রাসেল স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সাইকেলে খুব বেশি হলে দশমিনিটের দূরত্বে তার বাস। রুবিনা নামের এই পাঞ্জাবি মেয়েটির সঙ্গে তার আলাপ একেবারে আচমকা, এক সন্ধেয়, নিবিড় বৃষ্টির মুহূর্তে। কী একটা কাজে অলর্ক গিয়েছিল ভবানীপুরে, বকুলবাগানের দিকে। ফেরার পথেই সহসা এমন দারুণ বৃষ্টি ঘনিয়ে এল যে, তাকে দাঁড়াতে হল একটা পুরানো বাড়ির গাড়ি বারান্দার নিচে। বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল রুবিনাও। জংলা স্কার্ট, হলুদ টপে ওতপ্রোত হয়ে থাকা এই কিশোরীকে দেখে মুহূর্তেই অলর্কের মনে শুরু হয়ে গিয়েছিল চড়ুইয়ের কিচমিচ। বারবার তাকিয়ে দেখছিল ধারাবর্ষণের দৃশ্যে শঙ্কিত কিশোরীটির ডিম-ছাঁচের চমৎকার ফর্সা মুখাখানা। বেশ লম্বাটে চেহারা, হাতে একগোছা বই। নিশ্চয় টিউশন পড়ে ফিরছে। ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা বব-করা সিল্কি চুলের গুচ্ছ ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তার ঘাড় নাড়ছিল, ও মাই গড্, এত্‌না বারিষ!

বৃষ্টি সেদিন খুব প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল কলকাতায়। সন্ধে পার হয়ে রাত্রিও নেমে এল ক্রমশ। জলও জমে গেল ভবানীপুরের এই অঞ্চলটিতে। সেই জলভারাক্রান্ত পথের দিকে তাকিয়ে রুবিনার মুখ শুকিয়ে আসছিল ক্রমশ, বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণই ছিল না। জল বেড়েই চলেছিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন বৃষ্টি থামল, রুবিনা ভেবে পাচ্ছিল না, কীভাবে এত জল ভেঙে বাড়ি ফিরবে। তার ফর্সা মুখখানা কালো দেখাচ্ছিল। অলর্ক কিন্তু অনায়াসেই তার কাছে একটি সমাধান প্রস্তাব দিল, ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, যদি কিছু মনে না করো, আমার সাইকেলের সামনে বসিয়ে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি।

রুবিনাও অনেকক্ষণ এই যুবকটির চেহারা, দৈর্ঘ্য, মুখের সাজছবি-ধাঁচ দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল মনে-মনে। অবলীলায় রাজি হয়ে গেল অলর্কের প্রস্তাবে।

প্রেমের শুরু সেই থেকে, তারপর একবছর ধরে রুবিনার সঙ্গ পেয়েছিল অলর্ক। বেশ অনেকবার তার সাইকেলে সামনে বসিয়ে রুবিনাকে নিয়ে গেছে কখনও পার্ক সার্কাসের দিকে, কখনও গড়ের মাঠের দিকে, কখনও খিদিরপুর পর্যন্তও।

কিন্তু রুবিনা বোধহয় বুঝে গিয়েছিল, অলর্কের চেহারার মতো তার জীবনযাপন খুব লোভনীয় নয়। হঠাৎ একদিন তার অপেক্ষায় থেকে থেকে দেখা গেল না অলর্ক। বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ তাকে দেখতে পেল অন্য এক যুবকের স্কুটারের পিছনে। বেশ নিবিড় করে জড়িয়ে রয়েছে যুবকটিকে। তারপর আরও কয়েকদিন দেখতে পেল দৃশ্যটি। অলর্ক অবাক হল, কষ্টও পেল, তৎক্ষণাৎ সে বুঝতে পারল, রুবিনার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার দিন শেষ। অপমানে, কষ্টে কয়েকদিন পাগলের মতো ছটফট করে বেড়িয়েছিল। সাইকেলে নয়, স্কুটারের আকর্ষণই হয়তো রুবিনার কাছে বেশি।

কনটেসা কেনার পর একদিন অলর্ক বাবুঘাটের কাছে গিয়ে দাঁড় করাল গাড়িটা। আকাশি নীল রঙের স্কুটারটা সে দেখতে পেয়েছিল দূর থেকে। দেখেছিল, রুবিনা সেই যুবকের সঙ্গে বসে আছে স্কুটারের কাছেই। কনটেসা দাঁড় করিয়ে ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়েছিল অলর্ক, হাই রুবিনা—

রুবিনার চোখে স্পষ্টতই সে দেখেছিল একরাশ বিস্ময়। সে অলর্ক সাইকেলে চড়ে ঢনঢন করে ঘুরত, সে কিনা কনটেসায়! পরক্ষণেই রুবিনা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল, কী যেন ফিসফিস করে বলেছিল তার পাশে বসা যুবকটিকে।

অলর্ক আরও কাছে গিয়েছিল, লিফ্‌ট চাই, রুবিনা?

রুবিনা কথা বলেনি। অলর্ক হাসতে হাসতে কনটেসায় স্পিড তুলে চলে গিয়েছিল রাজার মতো।

এমন আরও দু-তিনদিন ক্রমাগত টিজ করল রুবিনাকে। প্রতিবারই সে দেখেছে, পাশে বসা যুবকটি দাঁত কিড়মিড় করছে রাগে।

আর একদিন আরও এক বড় অঘটন ঘটিয়ে ফেলল সে। দেখল, এক ঝালমুড়িওয়ালার কাছে দু'জনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঝালমুড়ি খাবে বলে। অলর্ক ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সেখানে। পকেট থেকে দু'খানা একশো টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিল ঝালমুড়িওয়ালাকে, গম্ভীরস্বরে বলল, তোমার কাছে যত ঝালমুড়ি আছে, সব আমার গাড়িতে তুলে দাও।

এবং আক্ষরিক অর্থে তা নিয়েও ছিল।

রুবিনার সঙ্গী যুবকটি দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিল, শালা, এর বদলা আমি নেব।

পরে অলর্ক লক্ষ করেছিল, যুবকটি প্রায়শ তার দলবল নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে তাদের পাড়ায়।

অলর্ক অবশ্য কয়েকদিন পরে ভেবেছিল, ব্যাপারটা তার পক্ষে খুব হাস্যকর। রুবিনার মতো সামান্য এক কিশোরীর জন্য এতটা বাড়াবাড়ি করা তার উচিত হয়নি। তাছাড়া তার এই খামখেয়ালিতে ক্রমশ শত্রুর সংখ্যা বেড়েই যাবে দিনদিন।

সে তখন অন্যদিকে তার নজর ফেরাল।

যে উড়ো টাকা হঠাৎ অলৌকিকভাবে পেয়ে গেল অলর্ক, তাতে সে অনায়াসে পায়ের ওপর পা দিয়ে বাকি জীবন নবাবের মতো কাটিয়ে দিতে পারত। শুধু সে নয়, তার পরবর্তী কয়েক পুরুষও। কিন্তু অলর্কের মাথায় তখন অন্য এক ভাবনা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে।

pathagar.net

বড় হওয়ার উচ্চাকাঙ্খা ছোট্ট একটি বীজ হয়ে বরাবর ঘাই মারত তার স্বপ্নে-জাগরণে। ব্যাপারটা ভাবত একা-একা, কিন্তু সে জানত না, কীভাবে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠে মানুষ। সে মাত্র একটাই পরীক্ষার গণ্ডি পেরোতে পেরেছিল তার বাবার দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে। তারপর গত আট-ন বছর স্রেফ তার নামের মতোই টোটো-কোম্পানি। অথবা তার এমন কোনও শিক্ষা বা গুণাবলি নেই যা দিয়ে সে নিজেকে কেউকেটা প্রতিপন্ন করবে। তার পক্ষে সম্ভব নয় কোনও ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা। ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলতে যে প্রবল বুদ্ধি, শিক্ষাগত যোগ্যতা বা টেকনিক্যাল নো-হাউ জানা দরকার তা একটুও তার নেই।

অলর্ক অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল, সে কোনও একটা ব্যাবসা করবে, কিন্তু সে ব্যবসায়ের ধরন এমন হবে যা আর পাঁচজনের থেকে পৃথক। যে অনায়াসে ইলেকট্রনিকস্ সরঞ্জামের দোকান বা লোহালক্কড়ের ব্যাবসা করতে পারত যাতে লোকসান হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সে তো আর পাঁচজনও করে। তাকে এমন কোনও ব্যবসায়ে হাত দিতে হবে যা কলকাতায় বেশ অভিনব বলে তো মনে হবেই, উপরন্তু তার মধ্যে থাকবে অন্য গ্র্যাঞ্জার।

এর-ওর কাছ থেকে বুদ্ধি নিয়ে, এর-তার সঙ্গে পরামর্শ করে অলর্ক ভাবল, সে কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার ধারে, অথবা জনবহুল জায়গায় বিশালসাইজের সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খুলবে। বিদেশে এমন সব ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কথা প্রায়শ শুনতে পাওয়া যায়। কলকাতা এ-ধরনের দু চারটে দোকান থাকলেও চোখে পড়ার মতো কোনও বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নাগালে পায় না কলকাতাবাসী।

খুব দ্রুত যোগাযোগ করে সে বড়ধরনের গোটা পাঁচেক ফ্লোর-স্পেস পেয়ে গেল, যে পাঁচটি জায়গায় কলকাতার সব চেয়ে প্রধান এলাকায়। শ্যামবাজার,হাতিবাগান এবং গড়িয়াহাট মোড়ের তিনটি ফ্লোর স্পেস পেয়েছে দুই থেকে তিনবাজার স্কোয়ারফুটের মধ্যে। লিন্ডসে স্ট্রিটে যে স্পেসটি পেয়েছে সেটি দোতলা-একতলা মিলিয়ে সাত হাজার স্কোয়ারফুট। অন্য জায়গাটি হল শিয়ালদহ স্টেশনের সামনেই। সেটিও কম বড় নয়। চার হাজার স্কোয়ারফুট। আরো তিনচারটি পেয়েও যাবে শিগগির।

কিন্তু শুধু স্পেস পেলেই তো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলা যায় না। তার জন্যে আলাদা প্ল্যানিং করতে হবে। প্রথমেই শোরুমগুলির একটি জুতসই নাম দেয়া দরকার। তার পরিকল্পিত ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি হবে এমন যাতে আলপিন থেকে এলিফ্যান্ট সবই পাওয়া যাবে। অথবা সংক্ষেপে বলা যায় এ টু জেড। কিছু সুস্থির চিন্তাভাবনার পর সে ঠিক করল, তার শোরুমগুলির প্রত্যেকটির নাম হবে,এ টু জেড্ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সবকটি স্টোরের নাম শুধু একই থাকবে তাই নয়, তাদের একই ধরনের গ্লো-সাইন হবে, নিজস্ব একটি এমব্লেম থাকবে এবং প্রতিটি শো-রুমের সামনেটা হবে একই ডিজাইনের, একই রঙের, এমনকি প্রবেশ পথটিও হবে একরকম।

কিন্তু শো-রুমগুলির ভিতরটা হবে আরও চমকে দেওয়ার মতো। প্রতিটি দেয়ালে থাকবে নতুন ধরনের কারুকাজ, তার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাও হবে অন্য পাঁচটা শো-রুমের থেকে পৃথক। এমনকি একে অন্যের থেকেও আলাদা হবে। কিন্তু শুধু ভাবলেই তো হবে না, এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ ইমপ্লিমেন্ট করাই হবে সবচেয়ে কঠিনতম সমস্যা।

সে ভেবে রেখেছে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে থাকবে সারা ভারতবর্ষের বিখ্যাত সমস্ত

জিনিসপত্র। টুকিটাকি জিনিসগুলি তো অবশ্যই। তার জন্যে তাকে ছুড়ে ফেলতে হবে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত গঞ্জ ও বাজার। আসাম থেকে গুজরাট পর্যন্ত সমস্ত বাণিজ্যকেন্দ্র। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে ঘুরে সেখানকার সমস্ত কারিগরি বৈশিষ্ট্য তাকে হাজির করাতে হবে একই ছাদের নিচে। যাতে কোনও ক্রেতাকেই তার দোকানে ঢুকে খালি হাতে ফিরে না যেতে হয়।

অলর্ক আরও ভেবে রেখেছে, প্রতিটি শো-রুমে থাকবে একজন করে সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। প্রতিটি কাউন্টারে শোভা পাবে একগুচ্ছ সুন্দর চেহারার যুবক ও যুবতী। প্রত্যেকের মুখেই থাকবে সুন্দরী এয়ারহোস্টেসদের মতো মন-জুড়োনো হাসি, সপ্রতিভ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মতো চমৎকার ব্যবহার।

কিন্তু এর সবকিছুর পেছনেই চাই খুব স্থির মস্তিষ্কের প্ল্যানিং ও তার রূপায়ণ।

সে প্রথমেই ভাবল, বাইরের ও ভিতরের সাজসজ্জার জন্য চাই একজন প্রথিতযশা আর্টিস্টের সূক্ষ্ম তুলির ছোঁয়া। এমন শিল্পীর, যিনি তাঁর সৌন্দর্যবোধের চূড়ান্ত রূপটি রূপায়িত করবেন এই শো-রুমগুলিতে। কিন্তু শিল্পীদের সঙ্গে একের পর এক যোগাযোগ করে পর পর বেশ ধাক্কা খেল সে, কলকাতার প্রিয় সব বিখ্যাত শিল্পী এমন প্রবলভাবে ব্যস্ত যে, তাঁরা অলর্কের জন্য এক সেকেণ্ড সময়ও ব্যয় করতে পারবেন না। কোনও কোনও শিল্পী দিন প্রতি একটি করে ছবি আঁকেন, যেগুলি তৎক্ষণাৎ বিক্রি হয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার টাকা থেকে একলাখ টাকায়। কোনও কোনও ছবির দাম নাকি আরও বেশি। কলকাতার আর একজন শিল্পী দু'বছর পরে যে ছবি আঁকবেন তা নাকি এখনই বুক্‌ড হয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে। আর একজন শিল্পী কয়েকটি মাত্র ছবি নিলাম হয়ে গেল কোটি টাকার বেশি দামে। ছবির বাজার ঠিক এরকম তা জানা ছিল না অলর্কের। সে যেমন বিস্মিত হল, তেমনি কৌতূহলী হয়ে উঠল শিল্পীদের সম্পর্কে।

তার শুভানুধ্যায়ীরা তাকে উপদেশ দিল, এমন এক শিল্পীর সন্ধান কর, যে ভাল ছবি আঁকে, কিন্তু এখনো বাজারের যথেষ্ঠ দর হয়নি। স্বভাবতই অলর্ক অনুসন্ধান করছিল তরুণ শিল্পীদের। প্রথম বয়সে সব নবীণ শিল্পীই তার শরীরের শেষ ঘামবিন্দু পর্যন্ত ঢেলে দেয় তাদের ক্যানভাসে। প্রথমদিকে টাকার লোভও তেমন থাকে না, আবার ছবির গুণমান যাতে চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছায় সেদিকেও যত্নবান থাকে।

খুঁজতে বেরিয়ে বেশ কয়েকজন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে ইতিমধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে অলর্কের। এই পরিচয়ের ফলে কয়েকদিনেই ছবি সম্পর্কে আশ্চর্য কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেশ অবাক হয়ে গেছে সে। শিল্পীরা বোধহয় সবসময়ই এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ হয়। তারা আর পাঁচজন মানুষের থেকে শুধু যে পৃথক স্বভাবের হন তাই নয়, তাদের জীবনযাপন, চলাফেরা, চাউনি, জীবনবোধ সবই অন্যরকম। তাদের মুখমণ্ডল শোভিত থাকবে লম্বা দাড়ি গোঁফে, পরনে থাকবে বিচিত্রধরনের পোশাক, কাঁধে থাকবে অদ্ভুত ধরনের ঝোল ব্যাগ। বিচিত্র নকশায় ভরা থাকবে সে ব্যাগের দু-দিক। মুখে সিগারেট ধরাই থাকবে, কিন্তু অন্যমনস্কতার জন্যে জ্বালানো হবে না বহুক্ষণ। আর চোখ দুটি থাকবে উদাসীন-উদাসীন।

এইসব তরুণদের ছবির বিষয়বস্তু, রঙের ব্যবহার, কারুকাজও অদ্ভুত লেগেছে অলর্কের কাছে।

তাদেরই একজন কাউকে মনোনীত করবে কি করবে না এমন দ্বিধায় যখন সে আন্দোলিত, সে সময় অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেল।

pathagar.net

এক তরুণ শিল্পীর বেশ কিছু ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ অসতর্কভাবে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, নাহ্, এ সব ছবি চলবে না।

তরুণ শিল্পীটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে। বেশ বলশালী চেহারা, মুখে বিশাল দাড়িগোঁফ, হাতের বাইসেপ চোখে পড়ার মতো। সে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলল, কী বললেন? এ ছবি চলবে না! আপনি ছবির কী বোঝেন?

অলর্ক কথাটা ফিরিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু শিল্পী ততক্ষণে ভীষণ খেপে গেছে। আর একটু হলেই অলর্ককে প্রবল একখানা ঘুঁসি ঝেড়ে দিয়েছিল আর কি। কোনও ক্রমে অলর্ক সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছে।

কয়েকদিন হতভম্ব হয়ে যখন কী করবে ভাবছে, ঠিক তখনই তাকে কে একজন বলল, একটু প্রবীণ কোনও শিল্পীকে খোঁজ করো না। শিল্পের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার একটা দাম আছে।

দিশেহারা অলর্ক বলেছিল, প্রবীণদের কাউকে ধরা আমার সাধ্যের বাইরে। তারা সবাই ভীষণ ব্যস্ত।

—দেন ট্রাই চিত্রদীপ চ্যাটার্জি। বেচারির লাক ফেবার করছে না। আদারওয়াইজ হি ইজ অ্যা গুড আর্টিস্ট।

সেই থেকে অলর্কের মাথায় চিত্রদীপ চ্যাটার্জির নামটা ঢুকে গিয়েছিল। আরও দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল, চিত্রদীপ খুবই প্রতিভাবান, কিন্তু ছবি বিক্রির দৌড়ে তাঁর সমকালীনদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে। ইদানীং কিছু কমার্শিয়াল ছবিও আঁকছেন জীবিকার তাগিদে।

টেলিফোন ডিরেক্টরি হাতড়ে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির টেলিফোন নম্বর খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না তার। সেইসঙ্গে ঠিকানাও। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়ে টেলিফোন করতেই আবার সেই ধাক্কা। চিত্রদীপ সরাসরি বলেছেন আয়্যাম স্যরি। দোকানের লে আউট আমি করি না। ওটা আমার পেশা নয়।।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে অনেকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে বলেছিল অলর্ক। সে যে প্রত্যাখ্যাত হবে এমন ভাবনা তার ছিল না তা নয়। এই কয়েক দিনে বহু শিল্পীর সঙ্গে কথোপকথন করে, তাদের বাড়িতে গিয়ে, ছবি দেখে,তার দরদাম করে অলর্ক এটুকু বুঝেছে, শিল্পীদের সম্পর্কে কোনওরকম অনুমান করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। তার প্রিয় সবাই, যাকে বলে, আন্‌প্রেডিকটেবল।

প্রাথমিক ধাক্কায় অনেকখানি পিছিয়ে এলেও অলর্ক হাল ছাড়ল না। এসব পরিস্থিতিতে হেরে পিছিয়ে গেলে তো তার এহেন বিশাল পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। অতএব লেগে থাকতে হবে। কীভাবে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে রাজি করানো যায় এ নিয়ে তাকে ভাবতে হবে আলাদাভাবে। সেদিন তাঁকে ব্ল্যাঙ্ক চেক্ দেবার অফার দিয়েও টলাতে পারেনি। পরে বুঝতে পেরেছে কোনও শিল্পীকে এভাবে কিনতে চাওয়া উচিত হয়নি তার। এভাবে অফার দেয়াই শিল্পীর পক্ষে অপমানজনক।

সুতরাং অন্য কোনও পরিকল্পনার ছক কষতে হবে তাকে। তার শিয়রে যেন প্রতিমুহূর্তে এসে দাঁড়াচ্ছে শমন, কিন্তু কোনও কাজেই উৎসাহের কমতি নেই তার।

এমন ভাবতে ভাবতেই যোধপুর পার্কের বর্ণাঢ্য পল্লীতে অলর্ক তার বিশাল কনটেসা চালিয়ে ঢুকে পড়েছে আজ। তার শার্টের পকেটে টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে টুকে নেয়া

pathagar.net

চিত্রদীপ চ্যাটার্জির ঠিকানা। সেই ঠিকানা অনুসরণ করে কয়েকবার এলোমেলো পাক খেয়ে সে এসে দাঁড়াল একটা বিশাল পুষ্করিণীর কোণে ছবির মতো বাড়িটার সামনে। ঠিকানা গার্গীর নিশ্চিন্ত হল তার গন্তব্য সম্পর্কে। তবে অবাক হল, একজন শিল্পী তাঁর বাড়ি তৈরির ব্যাপারে কতখানি শিল্পসম্মত হতে পারেন তার নমুনা দেখে। যাকে বলে সুন্দর, তাইই।

ইঞ্জিন বন্ধ করে, গাড়ির দরজা-জানালায় লক্ লাগিয়ে সে ধীর পায়ে গিয়ে দাঁড়াল বন্ধ দরজার সামনে। তারপর কলিং বেলে সামান্য আঙুল ছোঁয়াতেই টুং টাং জল-তরঙ্গের মৃদু শব্দ।

আট

ক্যানভাসের উপর ঝুঁকে ছবির একদিকে ঘন লালরং বোলাচ্ছিলেন চিত্রদীপ। যথারীতি কালোরঙের ঘাড় বাঁকানো পাইপটি তাঁর ঠোঁটে চেপে ধরা। ইদানীং লালরং ভারি প্রিয় হয়ে উঠেছে তাঁর। প্রায় ছবিতেই ঘন লালরঙের আঁচর কেটে গোটা ছবিটিকেই ভীষণ তীব্র করে তুলতে চাইছেন। যেন শিল্পীর ভিতরকার এক প্রবল ক্রোধ লালরং হয়ে ফেটে পড়ছে ক্যানভাসে।

ছবিটা গত সাতদিন ধরেই অর্ধেক আঁকা হয়ে পড়েছিল চিত্রদীপের স্ট্যাডিতে। তাঁর নিজস্ব স্টুডিও বলতে এই লিভিংরুমটিই। লিভিংরুমেই তাঁর লাইব্রেরি, স্টাডিরুম, স্টুডিও সবকিছুই। যখন উত্তর কলকাতার পুরানো বনেদি বাড়িটি বিক্রি করে যোধপুর পার্কে খোলামেলা পরিবেশে এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন, তখন আলাদা করে স্টুডিও করার কথা মনে হয়নি। তাঁর বাড়িতে লিভিংরুম ছাড়া দুটো বেডরুম, যার একটি তিনি আর বনানী, অন্যটায় ডোনা। একটা গেস্টরুমের প্রভিশনও রেখেছিলেন বাড়ির বাইরের দিকে, যেটা এতদিন খালিই পড়ে ছিল। ইচ্ছে করলে সেই ঘরে তাঁর স্টুডিও করতে পারতেন, কিন্তু ছবি এঁকে তেমন নাম হল না, তাই আলাদা করে স্টুডিও করে কী হবে এমন ভাবতে ভাবতে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি ও-ঘরে। এর মধ্যে হঠাৎ শিহরণ রায়চৌধুরী এসে জুটে গেল পেয়িংগেস্ট হিসেবে। এখন ইচ্ছে করলেও আর সে ঘরে স্টুডিও খোলা সম্ভব নয়। অথচ ইদানীং প্রায়ই মনে হচ্ছে এই লিভিংরুমে আঁকাজোখার কাজ করাটা বেশ ঝকমারি। কাজ করতে করতে প্রায়ই অন্য লোকজন ঢুকে পড়েছে, সাংসারিক কাজকর্মের কথাবার্তা চলছে, আড্ডা-ইয়ার্কি শুরু হয়ে যায় চেনা লোকজন চলে এলে। এই পরিবেশে আঁকা যায় না।

বনানীর একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেওছিলেন, যদি শিহরণকে অন্য কোথাও চলে যেতে বলা হয়, তাহলে তিনি নতুন করে স্টুডিও খুলে সিরিয়াসলি কাজ শুরু করতে পারেন। শুনে বনানী মুখ বাঁকিয়ে হেসেছেন। বলেছেন, আর এ বয়সে নতুন করে স্টুডিও খুলে কী লাভ। ছবি যখন বিক্রিই হয় না, তখন পেয়িংগেস্টের কাছ থেকে মাসে দেড়হাজার টাকার বাঁধা আয় ছেড়ে দিলে সংসার চালানই মুশকিল।

চিত্রদীপ মনে মনে ক্ষুব্ধই হয়েছেন কেবল, কিন্তু কিছু করে উঠতে পারেননি। তাঁর খুব ইচ্ছে, আর একটা বড় করে শো করবেন অ্যাকাডেমিতে, একটু বেশিরকমের পাব্লিসিটি দিলে যদি নাম হয়ে যায়—

ভাবতে ভাবতে আরও লালরং তুলিতে মাখিয়ে নিলেন। ক্যানভাসে যে ছবিটি অনেকখানি অবয়ব পেয়েছে তা একজন গ্রাম্য রমণীর। তার গায়ে জামা নেই, বুকের আঁচলও বেশ

pathagarfo.net

ঢিলেঢালা, একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে আছে দূরের কোনও দৃশ্যের দিকে। যেন তার গোরু সকালে চরতে গিয়েছে, এখনও ঘরে ফেরেনি, অথবা অন্য কোনও কারণেও। সময়টা বিকেল বেলা। গোধূলিও বলা যায়। সূর্যাস্তের লাল আভা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার রক্তবর্ণ ফুলের সঙ্গে।

কিছুক্ষণ আগেই খবরের কাগজওলা জানলা দিয়ে ছুড়ে দিয়ে গিয়েছে আজকের কাগজ, কিন্তু চিত্রদীপ তখনও মেঝের উপর থেকে তুলে নেননি সেটা। ছবিতে আরও দু-একটি তুলির পোঁচ দিয়ে তারপর মন দেবেন খবরের কাগজে এমন ভাবছেন এমন সময় কিচেন থেকে বনানী এসে চট করে তুলে নিলেন ভাঁজ করা কাগজ।

কাগজ খুলে দেখতে দেখতে হঠাৎ চ্যাঁচিয়ে উঠলেন, আরে দ্যাখো দ্যাখো ডোনার ছবি বেরিয়েছে কাগজে।

বেশ খানিকটা চমকে উঠলেন চিত্রদীপ। চমকে ওঠার ফলে তাঁর হাতের তুলি নড়েও গেল বেশ খানিকটা। হঠাৎ কী কারণে ডোনার ছবি খবরের কাগজে উঠতে পারে তা একেবারেই মাথায় ঢুকল না তাঁর। না কি বনানী অন্য কারও ছবি দেখে ডোনার ছবি বলে ভুল করছে!

চমকে ওঠারই কথা চিত্রদীপের। তিনি বিশ বছর ছবি আঁকার লাইনে থেকে কাজ পর্যন্ত তেমন নাম করতে পারেননি যাতে তাঁর ছবি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেরোতে পারে। মাঝেমধ্যে কন্‌টেম্পোরির আর্টিস্ট বলে ক্যাপ্‌শনে তাঁর সমকালীন অনেক শিল্পীর ছবিই গ্রুপ ফোটো হিসেবে ছাপা হয়েছে কাগজে, কিন্তু তার মধ্যে কখনওই তাঁকে রাখা হয়নি। এ নিয়ে বরাবরই একটা চাপা ক্ষোভ রয়ে গেছে তাঁর ভিতরে। মনে হয়েছে ইচ্ছা করেই তাঁকে উঠতে দেয়া হচ্ছে না। আঁকাআঁকির লাইনে এত গ্রুপিজম, এত ল্যাং-মারামারি শুরু হয়েছে আজকাল যে, কোনও সমকালীন শিল্পীই চাননা অন্য আর একজন কেউ নাম করুক, বড় হোক কিংবা পয়সা উপার্জন করুক। অথচ বনানী এখন উল্লসিত হয়ে বলছে ডোনার ছবি—

প্যালেটে তুলি রেখে সাগ্রহে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে দেখলেন, হুঁ, ডোনার ছবি। বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে, একা সাবান কোম্পানির মডেল হিসেবে।

ছবিটা দেখে প্রায় তাজ্জব হয়ে গেলেন চিত্রদীপ। ডোনা যে কোনও সাবান কোম্পানির মডেল হয়েছে তা জানা ছিল না তাঁর। বনানী নিশ্চই জানতেন, তাই তাঁর চোখেমুখে বিস্ময় নেই, বরং উপছে পড়ছে উল্লাস। হই-চই করে ডাকছেন ডোনাকে, ডোনা, এই ডোনা, শিগ্‌গির উঠে আয় বিছানা থেকে। দেখে যা—

চিত্রদীপের চোখমুখ থেকে কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। ডোনাকে তিনি চিত্রশিল্পী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন প্রথমদিকে। রং, তুলি, আর্টপেপার সবই তার জন্য আলাদাভাবে কিনে দিয়েছিলেন যাতে সে তার আঁকার জগৎ গড়ে নিতে পারে। ছবি আঁকা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দিয়ে বলেছিলেন, এবার নিজের মতো করে আঁকো। আর আশ্চর্য, কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ করলেন, ডোনার আঁকার হাত ভারি চমৎকার। তার শিল্পবোধ যে শুধু অসাধারণ তাইই নয়, তার রঙের ব্যবহারও সংযত এবং যথাযথ। মনে মনে ভেবেছিলেন শিল্পীর কন্যার শিল্পবোধ থাকবে না তো কার থাকবে।

কিন্তু ডোনার স্বভাব ছটফটে। সে কোনও বিষয়েই মন-সংযোগ করতে পারে না। যে কোনও ব্যাপারেই সে কিছুকাল দারুণ ডিভোশন নিয়ে লেগে থাকে। তখন সেই বিষয়টিই তার কাছে পৃথিবীর একমাত্র ঈপ্সিত বস্তু, তারপর হঠাৎই সেই বিষয় সম্পর্কে হারিয়ে ফেলে তার

আগ্রহ। এভাবেই কলেজে সে তার পড়ার বিষয় বদলে ফেলেছে দ্রুত। কিছুদিন বিজ্ঞান পড়ে বলল, উঁহু, ভালো লাগছে না, আর্টসে ভর্তি করে দাও। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে অনার্স পড়ে বলল, ভালো লাগছে না। ইংরেজি পড়ব না, অন্যকিছু। খুঁজে পেতে কমপ্যারেটিভ লিটারেচারে ভর্তি করে দেওয়া হল। কিছুদিন খুব মন দিয়ে ক্লাস করার পর এখন তাকে দেখে বোঝা যায় তুলনামূলক সাহিত্যেও তার আর আগ্রহ নেই। এর মধ্যে কখন যে মডেলিং-এ ঝুঁকে পড়েছে তা জানতেই পারেননি তিনি।

ডোনার সন্ধানে বাড়ির এখানে ওখানে খুঁজে বিফল হয়ে ফিরে এলেন বনানী, নাহ্, ডোনা বোধহয় বেরিয়েছে।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, এই সাতসকালে কোথায় আবার বেরোল?

—নিশ্চই জগিং করতে।

—জগিং! জগিং আবার কবে থেকে শুরু করল।

বনানী হাসলেন, ওই যে, হঠাৎ মাথায় ঢুকেছে শরীরে নাকি মেদ জমতে শুরু করে এ বয়সে। অতএব তার আগেই জগিং শুরু করে দাও।

—তাই নাকি! এটা আবার মাথায় কে ঢোকাল ওর।

—কে আবার। ওই যে শিহরণ।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ বিস্মিত হয়ে রইলেন। আজকাল তিনি শিহরণকে যে একেবারেই সহ্য করতে পারেন না এই তথ্যটি বোধহয় মা-মেয়ে দুজনেই জেনে থাকবে। তাই দু'জনে ই একযোগে শিহরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে চলেছে ক্রমশ।

—ও, চিত্রদীপ বিড়বিড় করে বললেন, আর মডেলিং? এই আইডিয়াটা ওর মাথায় আবার কে ঢোকাল?

—কে আবার, ওই শিহরণই।

—ও, তাহলে শিহরণই আজকাল ওর গড্‌ফাদার হয়ে দাঁড়িয়েছে!

বনানী ভুরু কুঁচকে বলেন, তা তুমি এতে রাগ করছ কেন? মডেলিং করা কি কোনও ব্যাড্ প্রফেশন? আজকাল এই প্রফেশনে যাওয়ার জন্য কী কমপিটিশন শুরু হয়েছে তার তো খবর রাখো না। শিহরণের জানাশুনো ছিল বলেই চট্ করে এমন নামকরা সাবান কোম্পানির কাছ থেকে পেয়ে গেল সুযোগটা। মেয়ের এমন চমৎকার ফিগার, যদি মডেলিঙে একবার নাম করা যায়—

চিত্রদীপ আরও গলা চড়িয়ে বললেন, মডেলিং কি একটা প্রফেশন হল? ও সব লাইনে কারা যায় তা খোঁজ নিয়ে দেখেছ? তার আলটিমেটলি কোন লেভেলে নেমে যায় তা তো জানো না। যারা দেহ সর্বস্ব, রূপ আছে অথচ ব্রেন ডাল, তারাই ও সব লাইনে যায়, গিয়ে নামটাম করে। কোনও ভদ্রঘরের মেয়ে ওখানে গিয়ে বেশিদিন টিকতে পারে না। কী যেন নোংরা হয়ে গেছে ও-সব জগতের লোকজন তা ভাবতেও গা ঘিনঘিন করে। এই তো সেদিন কাগজে পড়লাম, একটা মেয়ে মডেল হতে ঘোরাঘুরি করত ওইসব লোকেদের চারপাশে। শেষে তাকে সুইসাইড করতে হল—

বনানী কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে গেলেন, তারপর নরম হয়ে বললেন, সবাইই খারাপ নয়। এই যে জুহি চাওলা, আরও সব নামকরা নামকারা আর্টিস্ট, তাদের এখন কত নাম,তারা সবাইই তো মডেল হিসেবেই প্রথমে এসেছিল, তার থেকে নায়িকা হয়ে গেছে। তাদের কত টাকা পয়সা এখন।

pathagar.net

—বাহ্, শুধু টাকা পয়সা দেখলেই হবে? টাকা পয়সার মোহেই তো তোমরা সব ছুটছ। এভাবে টাকা রোজগার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্ব, বিবেক সব যে বিসর্জন দিতে হয়, তা খেয়াল করো না?

—রাখো তো তোমার ও সব বড় বড় কথা। টাকাটাই এ যুগে সব। যার টাকা আছে, লোকে তাকেই সমীহ করে। তারই পেছনে পেছনে ছোটে। যার টাকা নেই, লোকে তাকে করুণা করে, পেছনে হাসাহাসি করে। এই যেমন তুমি, তোমার ছবি বিক্রি হয় না এর জন্যে তোমারই বন্ধুরা তোমার পেছনে কতরকম টিপ্পনী কাটে তা কি তুমি জানো?

চিত্রদীপ তখন ভিতরে ভিতরে ভীষণভাবে ফুঁসছেন। যখনই তিনি বনানী বা ডোনার কোনও ব্যাপারে মাথা গলাতে যাবেন, তখনই তারা তাঁর ছবি আঁকার ব্যর্থতার কথা তুলে তাঁকে দাবিয়ে রাখতে চায়। ওরা জানে, এই ব্যর্থতাই তাঁর সব চেয়ে দুর্বল জায়গা। ব্যর্থ মানুষেরা চিরকালই উপহাসের পাত্র। তাদের ভেতরে যত প্রতিভাই থাক, যতক্ষণ না সেই প্রতিভার বিনিময়ে টাকা ঘরে না আসছে, ততক্ষণ লোকে তাকে করুণা করবে। প্রতিভার মূল্য তো দেবেই না, উপরন্তু তাদের ফেলে দেবে বাজে কাগজের ঝুড়িতে। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললেন, টাকাটাই পৃথিবীতে সব নয়। বহু ধনকুবের আছে পৃথিবীতে। জীবনের শেষ মুহূর্তে তারা বুঝতে পারে তারা আসলে হেরেই গেছে জীবনের খেলায়।

বনানী থামলেন না, বললেন, জীবনের শেষ মুহূর্তে উপলব্ধি হলতো বয়েই গেল। সারাটা জীবন তো ভোগ করে গেছে তারা। শিহরণ তো বলেই যে টাকা হল—

—স্টপ, স্টপ ইট, চিত্রদীপ হঠাৎ যেন গর্জন করে উঠলেন, বারবার আমাদের কথার ভেতর শিহরণের নাম টেনে আনবে না। কথায় কথায় শিহরণ আর শিহরণ। শিহরণকে একদিন আমি—

—কী করবে শিহরণকে তুমি? খুন করবে নাকি?

চিত্রদীপ সহসা থমকে গেলেন। তাঁর ভেতরে তখন যেন অগ্ন্যুৎপাত ঘটছে। শিহরণের নাম শুনলেই কী জানি কেন, তাঁর মাথায় যেন সত্যিই খুন চেপে যায়। বনানীর কথার উত্তরে সেরকম বলে ফেললেন, হ্যাঁ দরকার হলে খুনই করে ফেলব কোনোদিন। দিনদিন বড় বেড়ে যাচ্ছে ও। আমার সংসারের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে—

—বাহ্ বাহ্, বনানী বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলেন চিত্রদীপের দিকে, ফ্রাস্ট্রেটেড হতে হতে তোমার মনোবৃত্তি এখন এই পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে নাকি!

—ঠেকেছে তো তোমাদের জন্যই, তোমারই এ জন্যে দায়ী। দ্যাট ব্লাডি ফেলো এখন আমার মেয়েটাকে প্রলোভনের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বনানী ক্রমশই যেন স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছেন চিত্রদীপের কথা শুনে। আজকাল শিহরণকে নিয়ে প্রায়ই তাঁদের কলহটা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। চিত্রদীপ যে এতসব আজেবাজে কথা বলবেন তা যেন তিনি ভাবতেই পারছেন না। শক্ত চোখমুখে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর নিজেই নীরব হয়ে গেলেন হঠাৎ, বললেন, এটা প্রলোভনের ব্যাপার নয়। মডেলিং ইজ এ গুড প্রফেশন। তোমার বন্ধুবান্ধবদের কাছেও জিজ্ঞাসা করে দেখো—

চিত্রদীপ ততক্ষণে আবার গুম হয়ে গেছেন। ডোনার যে ছবিটা ছাপা হয়েছে, সেদিকে বাবা হয়ে বেশিক্ষণ চোখ রাখতে পারলেন না। একটা বড় বাথটাবের মধ্যে শুয়ে আছে ডোনা, ফেনা-ওঠা জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে। তাঁর কাঁধ, বুকের উপর পর্যন্ত কোনও পোশাক নেই।

pathagar.net

চিত্রদীপ জানেন, মডেলিংএ নামা মানেই শরীরের পোশাক নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না। বিজ্ঞাপনের প্রযোজকদের খুশিমতো চলতে হয় মডেলকে। ব্যাপারটা তাঁকে ইরিটেট্ করার পক্ষে যথেষ্ট। বনানীর উদ্দাম উল্লাস দেখে তাকে থামিয়ে দেবার জন্য বললেন, স্টপ ইট।

বনানী তৎক্ষণাৎ রুক্ষস্বরে বললেন, কেন, থামব কেন। নিজের দু'পয়সা ঘরে আনার মুরোদ নেই, আর ও যে চারঘন্টা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তিনহাজার টাকা ঘরে নিয়ে এল, তাতে অমনি গায়ে জ্বালা ধরে যাচ্ছে—

—তাই বলে এভাবে পোশাক না পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে!

—বাহ্, বিজ্ঞাপনটা তো সাবানের। টি.ভি-তে রোজই দ্যাখো, কীভাবে সাবানের বিজ্ঞাপনের মডেলরা পোজ দেয়। ডোনা কি তার চেয়ে খারাপ কিছু করেছে? আর তাছাড়া, তোমার মতো একজন শিল্পীর কাছ থেকে এমন কন্জারভেটিভ কথাবার্তা আশা করা যায় না। তোমরা যখন মডেলদের সামনে দাঁড় করিয়ে ছবি আঁকো তখন! আমি কি কিছু জানি না ভেবেছ। বিয়ের পর আমাকেই একবার বলোনি ওভাবে তোমার ক্যানভাসের পাশে দাঁড়াতে? আর তোমার ছবিগুলোই বা তাহলে ওভাবে আঁকা কেন? অর্ধেক ছবিই তো ন্যুড—

চিত্রদীপ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন বনানীর ক্রুদ্ধ, হিংস্র মূর্তির সামনে। বনানী তাকে এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করবেন তা ভাবতে পারেননি। নিজে ছবি আঁকলেও, জীবন্ত মডেল বেশ কয়েকবার ছবি আঁকার সময় ব্যবহার করলেও, নিজের মেয়ে এমন অশ্লীলভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে এটা ভাবতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। আর বনানী নিজের মেয়ের কাজকে ক্রমাগত সমর্থন করে যাচ্ছে দেখে অবাক হচ্ছিলেন। আসলে শিহরণ এই অফারটা এনে দিয়েছে বলেই বনানীর এমন সমর্থন তাও বুঝতে পারছেন এখন।

হয়তো আরও কিছুক্ষণ বনানীর এই আক্রমণ থাকত, হঠাৎই কলিং বেল বেজে ওঠায় দ্রুত চলে গেলেন দরজা খুলতে। নিশ্চয় শিহরণ আর ডোনা ফিরেছে এমনই ভেবেছিলেন, দরজা খুলে অবাক হয়ে বললেন, কাকে খুঁজছেন?

—এটা কি শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়ি?

—হ্যাঁ, আসুন।

বেশ লম্বা চওড়া গড়নের এক অচেনা যুবককে চিত্রদীপের খোঁজ করতে দেখে প্রথমটা বেশ অবাকই হলেন বনানী। লম্বা চুল, একমুখ দাড়ি গোঁফ দেখে ভাবলেন, নিশ্চয় কোনও তরুণ ছবি-আঁকিয়ে হবে। কিন্তু তরুণ শিল্পীরা তো তেমন খোঁজ খবর রাখে না চিত্রদীপের। শিল্পী হিসেবে চিত্রদীপ তেমন নামীদামি নন, শিল্পজগতে তেমন কোনও ক্ষমতা বা প্রভাবও নেই তাঁর, সুতরাং তরুণরা কীসের তাগিদেই বা খোঁজ করতে আসবে তাঁকে!

অচেনা যুবক ততক্ষণে চিত্রদীপের স্টাডিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্ধসমাপ্ত ছবিটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বিস্মিত চোখে, খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ আনমনে তার অবাক অনুভূতি ব্যক্ত করল মাত্র একটিই শব্দে, বাহ্। তারপর চিত্রদীপের সামনে গিয়ে বলল, আমার নাম অলর্ক বোস। কয়েকদিন আগে আপনাকে ফোন করেছিলাম, আপনার বোধহয় এই মুহূর্তে তা মনে নেই।

চিত্রদীপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবকটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, হঠাৎ মনে পড়ল কয়েকদিন আগেকার ফোনবার্তাটি, মনে পড়তেই শক্ত হয়ে এল তাঁর মুখ, বললেন, হুঁ, মনে আছে, কিন্তু আমি তো আমার ডিসিশন জানিয়েই দিয়েছি আপনাকে।

pathagar.net

অলর্ক খানিকক্ষণ সময় নিল চিত্রদীপকে বুঝতে, একটু চুপচাপ থেকে হঠাৎ বলল, আমি সেজন্য আসিনি। আমি এসেছি আপনার কয়েকটা ছবি কিনতে। আপনারা ছবি দিয়েই আমরা দু একটা শো-রুম সাজিয়ে দেখতে চাই—

চিত্রদীপ শক্ত মুখে খানিক বিস্ময়ের ঢেউ খেলা করে গেল যেন, বুঝি নরম হল তাঁর অভিব্যক্তি, কিন্তু ভুরুর কোঁচ তবু রয়েই গেল কিছুটা, বললেন, আপনি আমার ছবি দেখেছেন?

—না, তবে এই যে ছবিটা আঁকছেন ক্যানভাসে, শুধু এটুকু দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি কত বড়শিল্পী।

—ব্যস্!

—তবে আরও ছবি দেখতে চাই। কোথায় গেলে আপনার ছবি দেখা যাবে যদি বলে দেন, তাহলে সেখানে যাব। যদি আগামী দিনে আপনার কোনও শো হয় সেখানেও যেতে পারি। অথবা আপনার বাড়িতে এখনও বিক্রি হয়নি এমন ছবি যদি থাকে তাও দেখব এখন।

চিত্রদীপ এতক্ষণে অবাক হচ্ছেন, হয়তো ঠিক বুঝতেও পারছেন না। এই অচেনা যুবকের প্রকৃত উদ্দেশ্য। খানিক ভেবে বললেন, আপাতত কোনও গ্যালারি বুক করা নেই আমার নামে। দু-তিন মাস পরে একটা শো করার ইচ্ছে আছে। যদি ততদিন আপনি অপেক্ষা করতে পারেন, তাহলে দেখতে পারবেন নিশ্চয়।

অলর্ক ইতস্তত করে বলল বাড়িতে কোনও ছবি নেই আপনার?

—আছে, তবে এই মুহূর্তে দেখানোর একটু অসুবিধে আছে। ঠিকমতো সব সাজানো-গোছানো নেই।

বনানী এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে এ কথোপকথন শুনছিলেন। বাড়িতে খরিদ্দার যেচে এসে ছবি দেখতে চাইছে, আর চিত্রদীপ বেমালুম তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন দেখে রাগে গা-হাত-পা জ্বলছিল তাঁর। তাঁর স্বামীর যে বিন্দুমাত্র ব্যবসায়িক বুদ্ধি নেই এ সংবাদ তাঁর অজানা নয়। বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসে বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কয়েকটা ছবি ঘরে পরিষ্কার করে রাখা আছে। আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

অলর্ক সাগ্রহে বলে উঠল, খুব ভাল হয় তাহলে।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন হতভম্ব হয়। হঠাৎ বোধহয় তাঁর খেয়াল হল অচেনা যুবকটিকে তিনি বসতে বলেননি তখনও। সম্বিত ফিরতে বললেন, আপনি বসুন। আমি দেখছি।

বনানীর পিছু পিছু তিনিও ছুটলেন ভিতরের ঘরে, সেখানে তাঁর একরাশ ছবি ধুলো পড়ে বেঘোরে নষ্ট হচ্ছে বহুদিন ধরে। বনানী ঠিকমতো ছবি চেনে না। পাছে সে ভাল ছবিগুলো চিনতে না পারে, যে ছবি পছন্দ হবে না হয়তো সেগুলোই বেছে নিয়ে আসে এই আশঙ্কায় নিজেই হন্তদন্ত হয়ে চললেন ছবি বাছাই করতে। আসলে তাঁর ইচ্ছে ছিল না এমন আগোছালো অবস্থায় ছবিগুলো হাজির করতে কোনও ক্রেতার সামনে। কিন্তু বনানী নাছোড়বান্দা হয়েছে যখন—

চিত্রদীপ ভিতরে যেতে অলর্ক এবার থিতু হয়ে বসল স্টাডির মধ্যে বিছোনো মোড়ার একটিতে। মোড়াগুলো বেতের, প্রতিটির উপর রঙিন কাপড়ের টুকরো জুড়ে ডিমের আকারের ছোট ছোট গদি তৈরি করে রাখা। মোড়ায় জুত করে বসে সে স্টাডি কাম স্টুডিওর চারপাশে একবার নজর চালিয়ে দেখল আঁতিপাতি চোখে। তারপর পাশেই টেবিলের উপর পড়ে থাকা খবরের কাগজটা তুলে নিল সময় কাটানোর জন্য।

pathagar.net

খবরের কাগজের যে অংশটি টেবিলের উপর খোলা অবস্থায় ছিল, সেখানেই ছাপা রয়েছে সেই সাবানের বিজ্ঞাপনটি। অলর্ক ডোনাকে চেনে না। সে অভ্যাসবশত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ডোনার খোলামেলা শরীরটার দিকে। মেয়েটার চাউনির মধ্যে যেন একটা উত্তেজক ব্যাপার আছে। যেন হঠাৎ এই গোলমেলে শহর ছেড়ে কোনও দূর তেপান্তরে উধাও হয়ে যেতে ডাক দেয় মেয়েটা। এই সাবানটায় পাতিলেবুর গন্ধ পাওয়া যাবে এমন আশ্বাস দিয়েছেন বিজ্ঞাপনদাতা। স্নান করে বেরোবার পর সমস্ত শরীরে, আবহাওয়ায় ভরে উঠবে তাজা পাতিলেবুর গন্ধ। ভাবতে ভাবতে ডোনার অনাবৃত শরীর থেকে অলর্ক সেই পাতিলেবুর গন্ধ শুষে ওম হতে চাইল কিছুক্ষণ।

চিত্রদীপ আর তাঁর স্ত্রী অনেকক্ষণ হল ভিতরের ঘরে ঢুকেছেন এখনও বেরোয়নি। এতটা সময় একা বসে থেকে কিছুটা বোর লাগছে অলর্কের। হঠাৎ চমকে উঠল দরজার দিকে তাকিয়ে। চোখ কচ্‌লে দেখবে কিনা ভাবছে, তার আগে নিজের কণ্ঠস্বর থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল, কী অদ্ভুত!

দরজা খুলে ততক্ষণে লিভিংরুমের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ডোনা। তার পরনে ভোরের জগিং করার ড্রেস, ধবধবে সাদা শার্ট ও সর্টস। বোধহয় অনেকখানি ছুটে আসার ফলে তার মুখে নাকে কপালে বিন্‌বিন্ করছে ছোট ছোট ঘামের ফোঁটা। ঘাড়ের অর্ধেক পর্যন্ত নেমে আসা ঝোপাচুলের রাশ এলোমেলো হয়ে কিছুটা উড়ে এসে পড়েছে তার চোখেমুখে।

ডোনা সুন্দরী বলেই যে অলর্ক অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে তা নয়। সুন্দরী এবং তার সঙ্গে সকালের বিশুদ্ধ বাতাসে খানিকটা কেয়ারলেস বিউটিতে ভূষিত বলে ডোনা যেন এই মুহূর্তে প্রায় রূপকথার নায়িকা। কিন্তু আসলে অলর্কের মনে হচ্ছিল এই মেয়েটি তার ভীষণ চেনা। কোথায় দেখেছে কীভাবে দেখেছে তা মনে করতে পারছে না বলে তার দুচোখে আরও বিস্ময় আরও আকুতি ঘনিয়ে উঠল মুহূর্তে।

ততক্ষণে ডোনা এগিয়ে এসেছে অলর্কের অনেকটা কাছে। স্বাভাবিক সৌজন্যবশত অলর্ক তার মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ, কী বলবে ভেবে না পেয়ে এক চিলতে বোকার মতো হাসল।

ডোনা চোখে কৌতুক ফুটিয়ে, ভুরু কপালের উপর তুলে বলল, অদ্ভুত! কে অদ্ভুত? আমি?

তক্ষুণি অলর্কের মনে পড়ে গেল, কোথায় সে ডোনাকে দেখেছে। তড়িঘড়ি হাতের খবরের কাগজটা তুলে আরেকবার দেখল বিজ্ঞাপনের মেয়েটিকে। দেখে ভীষণ অবাক হয়ে গেল আরও। তারপর শব্দ করে হেসে বলল, খুব আশ্চর্য লাগছে আমার। সিনেমার নায়িকারা হঠাৎ পর্দা ছেড়ে অডিয়েন্সের মধ্যে নেমে এলে যেরকম স্বপ্ন-স্বপ্ন মনে হয় ঠিক সেরকম।

ডোনার বিস্মিত হবার পালা এবার, মানে? তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে অলর্কের হাত থেকে কেড়ে নিল খবরের কাগজখানা, কই, দেখি—

ছবিটা দেখেই সে মুখে বিচিত্র শব্দ করে হেসে উঠল, আরে, আজই বেরিয়ে গেছে!

নিজের ছবি সংবাদপত্রের পাতায় দেখার যে আনন্দ, সেই খুশির হিল্লোল ততক্ষণে বয়ে যাচ্ছে ডোনার আকর্ষণীয় শরীরে। কিছুটা জগিং করার ফলেই হোক, কিছুটা বিজ্ঞাপনে নিজেকে দেখার থ্রিলেই হোক, ডোনা বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে তখন। তার ভারী বুকের ওঠানামা, চোখমুখের অভিব্যক্তি, সরু কোমর, সর্টসের বাইরে সোনালি উরু দেখতে দেখতে মুগ্ধ হচ্ছিল অলর্ক। আর মনে মনে ভাবছিল, আজ সকালে কী এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি সে।

ইতিমধ্যে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন চিত্রদীপ ও বনানী। দুজনের হাতেই বেশ কয়েকখানা করে ছবি। কয়েকটা বড় সাইজেরও। ঘর থেকে বেরিয়েই বনানী ডোনাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, দেখেছিস ডেনো, কী দারুণ ছবিটা হয়েছে—

চিত্রদীপ আর বনানী দুজনে মিলে ততক্ষণে স্টাডির মধ্যে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখছেন ছবিগুলো। যেন এক্ষুনি এগুলো নিয়ে কোথাও 'শো' দিতে যাবেন। অলর্ক এতক্ষণে তার বিস্ময় ছেড়ে ঝুঁকে পড়ল ক্যানভাসে আঁকা বিচিত্ররঙের ছবিগুলোর উপর। প্রতিটি ছবির আড়ালে রয়েছে একজন শিল্পীর অবিরত নিষ্ঠা আর শ্রম। রঙের কারুকাজে মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর এক-একটি ভাবনা। এ ছবিগুলোতে অবশ্য ইদানীংকার মতো লালরঙের প্রাচুর্য নেই। বরং সবুজ বা তুঁতে রঙেরই প্রাধান্য। বেশ অনেকক্ষণ এই 'গ্যালারি'তে ঘুরে ঘুরে ছবিগুলো দেখল অলর্ক। সবসমেত আঠারোখানা ছবি সাজানো হয়েছে। ঝুঁকে পড়ে সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ অলর্ক বলে উঠল, আর নেই?

—আর! চিত্রদীপ খবুই অবাক হলেন। পরমুহূর্তে খানিক রুক্ষস্বরে বললেন, কেন, এগুলো একটাও পছন্দ হল না?

অলর্ক চোখ তুলে প্রথমে দেখল চিত্রদীপকে। এতগুলো ছবির সবকটাই বাতিল করলে একজন শিল্পীর চোখমুখের অভিব্যক্তি কীরকম হতে পারে তা ক'দিন আগে এই তরুণ শিল্পীকে দেখে সে-অভিজ্ঞতা হয়েছে, এখন আরও একবার উপলব্ধি করল সে। ক্রমান্বয়ে সে তাকাল বনানী ও ডোনার মুখের দিকে। বনানী স্তম্ভিত হয়ে গেছেন অলর্কের কথা শুনে। ডোনার চোখেমুখে কিন্তু বিস্ফারিত হয়ে রয়েছে কৌতুক, যেন ভাবখানা এমন যে, এইটুকু ছোকরা তার বাবার মতো মহান প্রতিভার শিল্পকর্মকে অনায়াসে বাতিল করছে!

—এর সবগুলোই আমি কিনতে চাই। প্রত্যেকটি ছবিই ভারি চমৎকার হয়েছে। আমি গত দু-তিনমাস ধরে বারো চোদ্দোজন শিল্পীর স্টুডিওতে ঘোরাঘুরি করেছি, কিন্তু এমন সুন্দর কাজ কারও কাছেই দেখতে পাইনি। আমি আরও কিছু ছবি কিনব।

অলর্কের কথার মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস গমগম করে উঠল যে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তার অনেক অনেক গুণ বিস্ময় চারিয়ে গেল এ বাড়ির তিন বাসিন্দার চোখেমুখে। ডোনা তো বিস্ময় চেপে রাখতেই পারল না, সব!

—হুঁ, সবগুলোই। আমাকে আরও কিছু ছবি দেখান।

চিত্রদীপ তার চোখের তারায় কিছু সন্দেহ নাচিয়ে বললেন, এতগুলো ছবির দাম সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে?

অলর্ক দৃঢ় ভঙ্গিতে এই ক'দিনে সে বিষয়ে কিছু ধারণা নিশ্চয় হয়েছে। আমি সুহাস ভট্টাচার্যের স্টুডিওতেও ঘুরেছি। অবিনাশ ঘড়াই-এর কাছেও গিয়েছি দু-তিনবার।

চিত্রদীপ কঠিন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কে। আই উইল শো ইউ সাম মোর। তারপর ডোনার দিকে তাকিয়ে বললেন, ডোনা, প্লিজ হেল্প—

চিত্রদীপ ডোনাকে নিয়ে ফের ভেতরের ঘরে ঢুকলেন ছবির সন্ধানে। বহুদিন অনাদৃত, অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকা ছবিগুলোকে ধুলোর জঞ্জাল থেকে বার করে আনাটা সহজ কাজ নয়। অনেক ছবির রঙই চটে গেছে। কোথাও কোথাও ভাঁজ পড়ে গেছে ক্যানভাসে। তার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দ্বিতীয় দফায় ছবি বাছতে বসলেন চিত্রদীপ।

ডোনা তার বাবাকে সাহায্য করতে করতে বলল, হু ইজ দ্যাট ফেলো, ড্যাডি?

pathagar.net

ডোনাকে বিস্মিত করে চিত্রদীপ বলল, অ্যা শপ্‌কিপার। কলকাতায় কয়েকটা দোকান খুলছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স, না কী যেন বলল। তার ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের লে-আউট করাতে চাইছিল আমাকে দিয়ে।

—ইনটেরিয়র ডেকোরেশান। তোমাকে দিয়ে! লোকটা পাগল নাকি?

—পাগল বলেই তো মনে হচ্ছে। হঠাৎ পাগলের মতো এখন ছবি কিনতে চাইছে। কিন্তু লোকটা নভিশ।

—নভিশ!

হুঁ, এর আগে ছবি কিনেছে বলে মনে হচ্ছে না। হঠাৎ কী কারণে আমার ছবি কিনতে চাইছে তাও বোধগম্য হচ্ছে না।

স্টাডিতে তখন বনানী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন অলর্ককে, আপনার বুঝি ছবি কেনার নেশা?

অলর্ক ঘাড় নাড়ল, আগে ছিল না, এখন হয়েছে।

—আপনার বাড়িতে গ্যালারি আছে?

—না, ছবিগুলো আমি কিনছি অন্য কারণে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর সাজাব বলে।

—ডিপার্টমেন্টাল স্টোর!

অলর্ক খুব সংক্ষেপে তার ভেঞ্চারের কথা বনানীকে জানাল। প্রতিটি শো-রুম সে যে চমৎকার করে সাজাতে চাইছে কোনও বড় শিল্পীর সহায়তায়, তাও বলল অকপটে। শেষে বলল, আপন যখন একজন শিল্পীর স্ত্রী, তখন নিশ্চয় স্বীকার করবেন, কাস্টমার শো-রুমে ঢোকে যতটা তার দ্রব্যসামগ্রীর টানে, ততটাই তার আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার আকর্ষণে। হঠাৎ শো-রুমে ঢুকে যদি তার মনে হয়, এটা কলকাতা শহর নয়, দাঁড়িয়ে আছি নতুন কোনও জায়গায়,তখন তার কেনার আগ্রহ বেড়ে যায় অনেকগুণ। তেমনই অভিনবভাবে সাজাতে চাইছি আমার শো-রুমগুলো—

ততক্ষণে চিত্রদীপ আর ডোনা বার করে নিয়ে এসেছে আরও কিছু ছবি। সেসব ছবি সাজাতে সাজাতে ভরে গেল গোটা লিভিংরুমখানাই। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে অলর্ক বলল, সব ছবিগুলোই আমি বুক করে যাচ্ছি। কত দামাদাম হবে তার একটা হিসেব করে আমাকে জানাবেন। আপাতত একটা চেক দিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। দশ লাখ। বাকিটা আমি নেক্সট্‌ দিন এসে দিয়ে যাব। আপনি যদি কাউকে দিয়ে ছবিগুলো পাকিং করে রাখার ব্যবস্থা করেন তো আমি সঙ্গে বড় গাড়ি নিয়ে আসব। আর হ্যাঁ—

খসখস করে চেক লিখে তার নিচে লম্বা ধরনের সই করে সেটা তুলে দিল চিত্রদীপের হাতে। প্রায় বোবা হয়ে গেছেন চিত্রদীপ। বনানী আর ডোনাও দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে অলর্কের দিকে।

—আর হ্যাঁ, অলর্ক সেই তিন মুখ, তিন স্থির অবয়বের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, তবে আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, আমার সব কটা শো-রুমের লে-আউটের ব্যাপারে আপনার মূল্যবান পরামর্শ চাই। এই ছবিগুলো কোনটা কোন শো-রুমে কোথায় রাখলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হবে, সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল বুঝবেন। তা ছাড়াও যেসব দেওয়ালে ফাঁকা স্পেস থাকবে, সেখানেও আপনার পরিকল্পনা মতো সাজাতে চাই।

চিত্রদীপ আগের দিনের মতো প্রতিবাদ করতে চাইলেন, কিন্তু পারলেন না। শুধু স্তিমিত গলায় বললেন, ভেবে দেখি—

pathagar.net

অলর্ক তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল কী যেন দেখল, তারপর বলল, কিন্তু খুব দ্রুত জানাতে হবে আপনাকে। কারণ আপনি হয়তো জানেন না, আমি খুব ডিস্টার্বেন্সের মধ্যে আছি।

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, কেন?

—হঠাৎ কোনও মানুষের টাকা হয়ে গেলে তার অনেক শত্রু হয়ে যায়। আমারও এখন সেরকমই প্রচুর শত্রু। কয়েকদিন আগেই আমার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে একটা মার্কেটিং কমপ্লেক্সে ঢুকেছিলাম। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, তাদের শো-রুমগুলো কীভাবে সাজিয়েছে, কোথায় কী রাখলে ভাল দেখায়। ফিরে এসে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় নেমেছি, হঠাৎ দেখি গাড়িতে ব্রেক ধরছে না। অথচ এরকম হওয়ার কথায় নয়। নতুন গাড়ি। শেষ মেকানিককে দেখাতে বলল, খুব পাকা হাতের কাজ, কেউ আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য এটা করেছে। আপনি সাবধানে থাকবেন।

—স্ট্রেঞ্জ! বাপ্-মা-মেয়ে তিনজনেই যেন একযোগে আর্তনাদ করে উঠল।

—আরও আছে। সেদিন রাতের বেলা বাড়ি ফিরছি, হঠাৎ দু'দুটো বোমা ফাটল গাড়ির জানলার কাছেই। একটুর জন্যে বেঁচে গেছি।

—মাই গড্? কারা করছে এ-সব?

—বুঝতে পারছি, আবার পারছি না। আসলে আমার অনেক শত্রু জুটে গেছে। সে-সব পরে বলব একদিন। সেদিন এক আর্টিস্ট পর্যন্ত আমাকে ঘুষি মারতে গিয়েছিল। তার ছবি পছন্দ হয়নি বলেছিলাম বলে—

শেষ বাক্যটি বলে অবশ্য হাসল অলর্ক, ঠিক আছে, চলি—

অলর্ক বেরিয়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত তিনজনে বিস্ময়, আতঙ্কে নির্বাক হয়ে রইল। তারপর বনানী ও ডোনা প্রায় একসঙ্গে আছড়ে পড়ল চিত্রদীপের উদ্দেশ্যে, কে লোকটা, তোমার চেনা?

—নাহ্, একেবারেই নয়।

—ওর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে শেষে তুমি আবার বিপদে পড়বে না তো!

চিত্রদীপ গম্ভীর হল, বুঝতে পারছি না।

এতক্ষণে তাঁর হাতে ধরা বিশাল অঙ্কের চেকটার দিকে একরাশ অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে বনানী বললেন, চেকটা বাউন্স করবে না তো?

—কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে—

নয়

গতকাল থেকে অভিনন্দনের বন্যায় প্রায় ডুবে আছেন মণীশ রায়। পরশু শ্রোতায় পরিপূর্ণ হলের মধ্যে তাঁর পেপার পড়ার পর চারপাশে যে আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, তা মণীশের কাছে সত্যিই বিস্ময়কর। কয়েকজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছেন, প্রবন্ধকারের ভাষ্য এককথায় প্রশংসনীয়। লেখাটির বিষয় যেমন অভিনব, লেখার স্টাইল তেমনই নতুন ধরনের। তুলনায় রণজয় দত্তের লেখায় কবিত্বই বেশি, তথ্য কম। ফলে সে প্রবন্ধটি জোলো হয়ে গিয়েছে। সেমিনারে আরও তিন-চারজন অংশগ্রহণকারীর লেখা সম্পর্কে

pathagar.net

তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়নি। শ্রোতাদের মধ্য থেকে শিহরণ রায়চৌধুরী নামে এক অধ্যাপক এসে চমৎকার বক্তব্য রেখেছেন। মণীশ রায়ের লেখার প্রশংসা করে এবং রণজয় দত্তের লেখাকে তীব্র আক্রমণ করায় তিনিও কম হাততালি পাননি। শোনা গেছে, ভাইস চ্যান্সেলর নিজে কোনও বক্তব্য না রাখলেও একান্তে কারও কারও কাছে প্রশংসা করেছেন মণীশ রায়ের। বলেছেন, বিষয়টি কিন্তু বেশ বেছেছে মণীশ।

তবে ভাইস চ্যান্সেলরের, বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিদের, কিংবা শ্রোতাদের তরফ থেকে যত প্রশংসাই আসুক না কেন, সবচেয়ে বেশি প্রশংসা মণীশ পেয়েছেন তার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। ছাত্ররা যত না, তার চেয়ে ঢের বেশি উচ্ছ্বাস ভেসে আসছিল ছাত্রীদের কর্নার থেকে। মণীশের ডেইসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল হাততালি শুনেই বোঝা গিয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অধ্যাপক খুবই পপুলার। তাছাড়া, তাঁর পাঠ চলাকালীন বেশ কয়েকবার তুমুল ক্ল্যাপ। মণীশ আড়চোখে দু'একবার দেখে নিয়েছেন, ঠিক কোন জায়গা থেকে উচ্ছ্বাস ও হাততালি ভেসে আসছে।

তার পাশাপাশি রণজয় দত্ত পড়তে ওঠার পর দৃশ্যপট গেল বদলে। ক্ল্যাপ তো নয়ই, কেবল দীর্ঘশ্বাস। আসলে মণীশ রায় নেমে যাওয়ার পর বোধহয় সেমিনার জমানো আর কারও পক্ষেই বেশ কঠিন ব্যাপার। মণীশের সুন্দর চেহারা, বাচনভঙ্গি, পড়তে পড়তে ঠিক জায়গায় এক-এক মুহূর্ত পজ্ দেয়া, আর সর্বোপরি তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রণজয় দত্ত অনেক কবিত্ব করেও, প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েও শুধু ভাল পড়তে না পারার জন্যই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত জমিয়ে তুলতে পারলেন না তাঁর আলোচনা। তেমন হাততালিও না পেয়ে ডেইস থেকে নেমে তাই বিড়বিড় করেছেন, সব বোগাস্। এরা আলোচনা শুনতে আসেনি। নাটক শুনতে এসেছে—

ডেইস থেকে রণজয় দত্ত নামার পর শ্রোতাদের ভিতর থেকে হঠাৎ বিড়াল ডাকও শুনতে পাওয়া গেছে। সম্ভবত রণজয়ের সরু মিনমিনে গলাকে ব্যঙ্গ করেই এই ডাক। তিনি কটমট করে সেদিকে তাকাতেই দেখলেন, কয়েকজন অন্য ডিপার্টমেন্টের মেয়েও বসে আছে সেখানে।

এতসব বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে রণজয় দত্ত কাল ক্লাস নিতেই আসেননি। আজও এসে নিজের সিটে বসে আছেন গুম্ হয়ে। ক্লাস নিতে গিয়েও বুঝতে পেরেছেন কালকের ব্যাপারটা বেশ প্রচার হয়ে গিয়েছে মুখে-মুখে, সব ছাত্র-ছাত্রীই যে সেমিনার শুনতে গিয়েছিল তা নয়, কিন্তু যারা গিয়েছিল, তারা নিশ্চই এসে অন্যদের কাছে গল্প করেছে, জানিস, আর. ডি. পেপার পড়ার পর খুব প্যাঁক খেয়েছে।

পরিস্থিতি বুঝে দুটোর ক্লাসটা আর নিতেই গেলেন না রণজয়। একটা মোটামতন বই মুখে দিয়ে বসে আছেন নিঃশব্দে।

একটু দূরে কোণের দিকে বসে থাকা মণীশ রায়ের অবস্থাটা ঠিক বিপরীত, ক্লাস নিয়ে ফিরে এসে সজনী দাশগুপ্ত নামের একজন অধ্যাপক বললেন, কী মণীশ, পরশু নাকি সেমিনারে ফাটিয়ে দিয়েছ একেবারে—

মণীশ কাল থেকে এত প্রশংসা আর অভিনন্দন পেয়েছেন যে, এখন আর ভাল করে কিছু বলতেই পারছেন না। শুধু হাসলেন মৃদু।

—ভি. সি. নাকি বলেছেন, ছেলেটার ফাণ্ডা আছে বেশ!

pathagar.net

মণীশ আর একবার শুধু হাসলেন সজনী দাশগুপ্তের দিকে তাকিয়ে।

—বাহ্, গুড্। বলে সজনী দাশগুপ্ত তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রফেসরস্ রুমটা বেশ বড়ই। প্রায় পনেরো কুড়িজন অধ্যাপকের জন্য এই ঘরটা নির্দিষ্ট। যারা একটু সিনিয়র, তাঁদের জন্য আলাদা টেবিল-চেয়ার। জুনিয়রদের জন্য ঘরের মাঝখানে বড় একটা টেবিলের দু'পাশ খানদশেক চেয়ার পাতা। যখন সব অধ্যাপকই ঘরে থাকেন,তখন হইচইতে মুখর হয়ে ওঠে প্রফেসরস্ রুম। তবে তেমন ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

আজো ঘরে বেশি অধ্যাপক নেই। জনাচারেক বসে আছেন মাঝখানের টেবিলে। তারা নিজেদের মধ্যে আড্ডা ইয়ার্কি মারছেন। মণীশ বসে আছেন তাঁর কোণের দিকের আলাদা চেয়ার-টেবিলে। তাঁর ক্লাস একটা আগেই শেষ হয়েছে। আপাতত পর পর দুটো পিরিয়ড অফ্। রণজয় দত্ত বসে আছেন অন্যদিকের কোণায় সেরকম গম্ভীর মুখেই। সজনী দাশগুপ্তের মন্তব্য শুনে একবার কটমট করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আবার বইয়ের পাতায় মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করলেন।

পরক্ষণেই প্রফেসরস্ রুমে ঢুকে পড়ল দুই তরুণী। তার মধ্যে একজন গার্গী। বীরভঙ্গপূরের রাজবাড়ির ঘটনাটি নিয়ে ক'দিন খুবই উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে সে, বিশেষ করে অলর্ক বোস নামের এক যুবক কীভাবে উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিপন্ন হল, তারপর এখন সে কোথায়, কী করছে, রাজবাড়ির অন্য পোষ্যদেরই বা কী হল, এহেন হাজার রোমাঞ্চকর প্রশ্ন এখন তার মগজে। তার মধ্যেই চলছে তার অন্য ফিচার লেখার প্রস্তুতি। এ ঘরে তরুণীরা ঢুকে কোন অধ্যাপকের কাছে যায়, তা অন্য সবারই জানা। মণীশ রায়ও সাধারণত প্রস্তুত থাকেন অফ্-পিরিয়ডে কেউ না কেউ তাঁর কাছে আসবেই। দুই তরুণীর একজন তাঁর চেনা। তাঁদের ডিপার্টমেন্টেরই ছাত্রী ডোনা চ্যাটার্জি। ডোনা মাঝেমধ্যেই তাঁর ক্লাসে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দেয়।

এহেন ডোনা আজ হঠাৎ আর একটি তরুণীকে তাঁর কাছে নিয়ে এসে বলল, স্যার, এ হল গার্গী মুখার্জি, মাই ফ্রেণ্ড। ম্যাথস্-এর ছাত্রী। কিন্তু অঙ্কের বাইরে অনেক বিষয় নিয়ে ওর কৌতূহল। আপাতত একটা ফিচার লেখার কাজে খুবই ব্যস্ত। ফিচারটির বিষয় 'আধুনিক প্রজন্মের মেয়েরা'।

মণীশ তীক্ষ্ণচোখে তাকালেন গার্গীর দিকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মেয়েই ভিন্ন ভিন্ন ছুতো নিয়ে তাঁর কাছে এসে থাকে। নিশ্চয় তেমনই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এই মেয়েটি এসেছে। তবু গার্গী মুখার্জি নামটা কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল তাঁর। পরক্ষণে জিজ্ঞাসা করলেন, হুঁ, মনে পড়েছে, তুমিই সেই ডিবেট চ্যাম্পিয়ন, তাই না?

গার্গী লজ্জিত হয়ে বলল, হ্যাঁ। সবাই আমাকে এই পরিচয়েই চেনে এখন। কিন্তু আপাতত আপনার কাছে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। ফিচারটি বিষয়েই—

মণীশ বললেন, ফিচারটি তো খুবই ইন্টারেস্টিং, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে ডোনাদের মতো আধুনিক প্রজন্মের মেয়েদের কাছেই তোমাকে প্রশ্ন রাখতে হবে। আমার কাছে কেন?

—স্যার, এ পর্যন্ত পঞ্চান্ন-ষাটজন মেয়ের কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি আমি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এই প্রজন্মের মেয়েদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন এমন পুরুষদের থেকেও কিছু জেনে নেয়া যায়।

pathagar.net

মণীশ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি! কিন্তু প্রফেসর রুমে বসে সেসব প্রশ্নের উত্তর কি দেয়া যাবে? দেখছ না, মেয়েরা আমার কাছে এলে জোড়ায় জোড়ায় চোখ আমাকে ফলো করতে থাকে।

ডোনা তৎক্ষণাৎ বলল, তাহলে স্যার, অন্য কোথাও আপনার সঙ্গে বসতে পারে গার্গী, ধরুন, কোনও রেস্তোরাঁ, কিংবা কফি-হাউসে—

মণীশ সায় দিয়ে বললেন, চলো, তাহলে সামনের মোড়ে যে কফি হাউসটি আছে, সেখানেই বসা যাক। আমার এখন অফ্ আছে।

গার্গী খুশি হয়ে বলল, চমৎকার প্রস্তাব। চলুন স্যার—

বলে চেয়ার ছেড়ে উঠতেই দেখল, চারপাশ থেকে অন্য সব অধ্যাপকেরা তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। বিশেষ করে রণজয় দত্ত। তিনি এমন হিংস্রচোখে তাকালেন মণীশ রায়ের দিকে যে, গার্গীর শরীরটা কেমন শিরশির করে উঠল। একজন অধ্যাপকের চাউনি কি এমন সাংঘাতিক হতে পারে!

বেশ অপ্রস্তুত বোধ করে তারা বেরিয়ে এল প্রফেসরস্ রুমের বাইরে। মণীশ রায়ের তো রীতিমতো অস্বস্তি হয় আজকাল। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসে তিনজন হাঁটতে হাঁটতে চলে এল কফি হাউসের ভেতর। কিছুটা এসেই ডোনা বলেছিল, তাহলে গার্গী, স্যারের সঙ্গে তোর তো পরিচয় হয়ে গেল, এবার আমি চলি—

গার্গী তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে বলেছে, উঁহু, ওটি হচ্ছে না। ইন্টারভিউয়ের সময় তোকেও থাকতে হবে। তোরা, স্যারের ছাত্রীরা কী কারণে তাঁর এমন অন্ধ ভক্ত হয় তাঁর চারপাশে ঘুরঘুর করিস তাও জানতে হবে। সেদিন এ ব্যাপারটা তোকে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি।

কফি-হাউসের সুবিধে এই যে, সামনে এককাপ কফি নিয়ে অনন্ত সময় ধরে কথাবার্তায়, আড্ডায়, আলোচনায় পার করে দেয়া যায়। উঠতি কবি-লেখকেরা, তরুণ শিল্পীরা তাদের ইনটেলেকচুয়াল কথাবার্তা আদানপ্রদান করার জন্য কফি-হাউসগুলোকেই সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করে। নামীদামিরাও যে একেবারে আসেন না তা নয়। এককাপ কফিতেই সংস্কৃতির তুফান বয়ে যায় রোজ।

তবু মণীশ বললেন, তা হলে অন্তত পকৌড়া নেওয়া যাক। কফির সঙ্গে পকৌড়া থাকলে একটু গরম হতে পারে আলোচনা।

বলেই বেয়ারাকে ডেকে কফি আর পকৌড়ার অর্ডার দিয়ে বললেন, হুঁ, বলো তোমার কী প্রশ্ন? তবে দেখো, তোমার এই বান্ধবীটি, ডোনা চ্যাটার্জি কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস মেয়ে। ক্লাসে মাঝেমধ্যে অধ্যাপকদের এমন সব ঝামেলায় ফেলে দ্যায়! সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, পরকীয়াতত্ত্ব কবি-লেখকদের এত ফেবারিট কেন?

ডোনা হেসে বলল, স্যার, আপনিও কম ডেঞ্জারাস না। তার উত্তরে আপনি যা বলেছিলেন, তাতে কান লাল হয়ে গিয়েছিল।

মণীশও হাসলেন, ডেঞ্জারার্স মেয়েদের কাছে ডেঞ্জারাস না হলে তো এই কলেজে আমাকে আর অধ্যাপনা করতে হতো না। যা সব বাঘিনিরা পড়তে আসে—

ততক্ষণে কফি আর পকৌড়া এসে গেছে তাদের সামনে। কফিতে চুমুক দিয়ে মণীশ বললেন, এসো, এবার তাহলে আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসি। পৃথিবীর যাবতীয় ডিপ্লোম্যাটদের আলোচনা কিন্তু ডাইনিং টেবিলে হয়। আপাতত কফির টেবিলেই আলোচনা শুরু হোক।

খানিকক্ষণ ভেবেটেবে নিজেকে গুছিয়ে নিল গার্গী। তারপর কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, স্যার, আপনি তো দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করছেন। ভালো অধ্যাপক হিসেবে যেমন আপনার সুনাম, তেমনই আরও একটি খ্যাতি ইতিমধ্যে এই চত্বরে বহুল প্রচারিত তা হল, মেয়েরা আপনাকে ভীষণ পছন্দ করে। ফলে এই দীর্ঘ সময়ে বহু তরুণীর সংস্পর্শে এসেছেন আপনি, তাতে মেয়েদের মধ্যে এই ক'বছরে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে তাও গভীরভাবে লক্ষ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই আমার প্রথম প্রশ্ন, কুড়ি বছর আগে আপনি যে তরুণীদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের সঙ্গে হাল আমলের তরুণীদের কোনও মৌলিক পার্থক্য আছে কি না, থাকলে কোথায় সেই পার্থক্য?

মণীশ কিছুক্ষণ ভাবলেন প্রশ্নটি নিয়ে। তারপর বললেন, ভারি ইন্টারেস্টিং ডিসকাসন। তবে তুমি ফিচারিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে ভেবেছ, আমি তো তাদের সেভাবে দেখিনি। কুড়িবছর আগেও মেয়েরা যে কারণে ছুটে আসত আমার কাছে, এখনও সেই কারণেই আসে। মেয়েরা পুরুষের কাছে আসে ভালোবাসার খোঁজে। যে পুরুষের ব্যক্তিত্ব আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, খ্যাতি আছে তাদের দিকেই সাধারণত ঝুঁকে পড়ে মেয়েরা। রূপের আকর্ষণেও কেউ কেউ না আসে তা নয়। এই সবকিছু মিলিয়ে আমার হয়তো একটা চাহিদা তৈরি হয়ে যায় তাদের কাছে।

—এই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে নেন? তারাই বা কী চায় আপনার কাছে?

মণীশ হাসলেন, অবশ্যই উপভোগ করি ব্যাপারটা। তারা কুড়ি বছর আগেও যেভাবে আকার-ইঙ্গিতে, কখনও কেবলমাত্র চাউনি দিয়েই তাদের প্রেম ভালবাসা প্রকাশ করত, এখনও সেভাবেই প্রকাশ করে থাকে। কোনও পার্থক্য নেই।

—বলতে চাইছেন কেবল প্রেম-ভালবাসাই?

—তাইই। আসলে প্রেম-ভালবাসা মেয়েদের এক চিরন্তন কাঙ্ক্ষিত বিষয়। কয়েক হাজার বছর আগে মেয়েরা যেভাবে ভালবাসত পুরুষকে, আজও তেমনিভাবেই ভালবাসে। শুধু পার্থক্য যেটুকু তা হল, এক নারীর সঙ্গে আর এক নারীর আচরণের মধ্যে, কিংবা এক পুরুষের সঙ্গে আর এক পুরুষের।

—আপনার মনে হয় না, এখানকার মেয়েরা অনেক বেশি ক্রেজি?

মণীশ রায় এ প্রশ্নে খানিকক্ষণ থমকালেন, বোধ হয়ে ভাবতে চাইলেন গার্গী আসলে কী বলতে চায়। এত বিচিত্র ধরনের তরুণী তাঁর কাছে প্রতিদিন আসে, এমন বিভিন্ন ছলছুতোয় তাঁর সাহচর্য উপভোগ করতে চায় যে, তাদের সবাইকেই তো তাহলে ক্রেজি বলতে হয়। এমনকি তাঁর স্ত্রী ঈষিতাকেও। ঈষিতাও তো পাঁচ বছর আগে তাঁর জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিল। তার আগে আরও অনেক তরুণী। তাঁদের সবাইকে একে-একে এড়িয়ে যেতে পারলেও শেষপর্যন্ত ঈষিতাকে আর এড়াতে পারেননি। কিছুক্ষণ ভেবেটেবে বললেন, মেয়েদের পাগলের মতো ভালবাসাকে যদি তাদের ক্রেজ বলতে চাও, তাহলে বেশির ভাগ মেয়েই ক্রেজি। যাকে ভালবাসে, তার জন্য সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পিছপা হয় না।

—উঁহু, আমি ঠিক তা বলতে চাইনি। এখনকার অনেক মেয়েই ঠিক আগের দিনের মতো নরমসরম, লাজুক কিংবা সনাতন ভারতীয় ধ্যানধারণায় আর বিশ্বাসী নয়। হঠাৎ ওয়েস্টানাইজড় হয়ে উঠেছে তারা। প্রাচ্যের সংস্কৃতির গণ্ডি পেরিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকেই আদর্শ মনে করছে। আপনারা কি সেরকমই মনে হয় না?

pathagar.net

মণীশ কিছু উত্তর দেবার আগেই বাধা দিল ডোনা, বলল, ওয়েস্টার্ন কালচার তো এখন আমাদের জীবনযাপনের মধ্যে দ্রুত ঢুকে পড়েছে অমনিই। তার জন্য শুধু মেয়েদেরই বা দায়ী করছ কেন, গার্গী?

—দায়ী করছি না। কিন্তু তাতে আমাদের জীবনযাপন থেকে দ্রুত অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে সনাতন মূল্যবোধ।

—তা তো হবেই, গার্গী। মূল্যবোধের সংজ্ঞা কখনও থেমে থাকে না পৃথিবীতে। যত বদলে যেতে থাকে সিভিলাইজেশন, মূল্যবোধ বদলে যায়। পাঁচহাজার বছর আগে মানুষের মূল্যবোধ যেরকম ছিল, পরের শতাব্দীতে পৌঁছে নিশ্চয় তার আগের শতাব্দী থেকে ঢের বদলে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শেষে এসেও তার প্রথম দিককার মূল্যবোধ বজায় থাকবে, নিশ্চিতভাবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। একবিংশ শতাব্দী যত এগোবে, মূল্যবোধের সংজ্ঞা নিশ্চয় তত বদলে যাবে।

মণীশও এবার অংশগ্রহণ করলেন আলোচনায়, ডোনা ঠিকই বলেছে, গার্গী। যেভাবে আমরা পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার কাছাকাছি আসছি, তত জীবনযাপনের সংজ্ঞাও বদলে যাচ্ছে আমাদের।

—কিন্তু স্যার, তাতে আমাদের জীবনে পিস্ নামক ব্যাপারটি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কিছুকাল আগেও আমাদের সমাজে এত ডিভোর্স ছিল না, এত অশান্তি ছিল না সংসারে, পারস্পরিক অ্যাডজাস্টমেন্টের এত অভাব ছিল না—

ডোনা ফোঁস করে উঠে বলল, কিন্তু পুরুষরা তখন অনেক বেশি দাবিয়ে চলত মেয়েদের উপর। সেটা নিশ্চয় এখন টলারেট করা যায় না। ম্যারেড লাইফে দু'জন দুজনের লাইফ পার্টনার। দেয়ার মাস্ট বি ইকোয়াল শেয়ার। তার অভাব হলে ডিভোর্স আসবেই। আগের দিনের মেয়েরা সেসব অত্যাচার সহ্য করত নীরবে।

গার্গী মুচকি হেসে তার ডায়েরিতে নোট করে নিতে নিতে বলল, চমৎকার জমেছে কিন্তু ডিবেটটা। যাই হোক, ডোনা যেভাবে রি-অ্যাক্ট করল, তাতে সমাজের এক শ্রেণীর মেয়েদের মতামত তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে। আবার অন্যধরনের মেয়েও আছে, যারা পুরানো ধ্যানধারণাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। তারা আবার এই ওয়েস্টানাইজ্ড্ হওয়াটাকে মেনে নিতে পারছে না। তেমন মেয়ের সংখ্যাও আমাদের সমাজে কম নয়।

কফি ও পকৌড়ার প্লেট ইতিমধ্যে নিঃশেষ করে ফেলেছে তিনজনে। মণীশ ঘড়ি দেখে বললেন, আমার আর একটা ক্লাস আছে, গার্গী। আমাকে এখনই উঠতে হবে। তোমার যদি আরও প্রশ্ন থাকে, পরে একদিন সময় করে চলে এসো।

গার্গী ব্যস্ত হয়ে বলল, আমার প্রশ্নের তো সবে শুরু, স্যার। এখনও অনেক বাকি।

—ঠিক আছে মাঝমাঝেও চলে এসো তবে। যখন যেরকম মনে হবে তোমার।

মণীশ রায় চলে যেতেই ডোনা হঠাৎ ধরল গার্গীকে, কি রে তুই তো তাহলে পার্মানেন্ট ইনভাইটি হয়ে গেলি মনে হচ্ছে।

গার্গী অন্যমনস্কভাবে বলল, ইস, সবে আলোচনাটা জমে উঠেছিল, এমন সময়—

ডোনা হেসে উঠে বলল, সব আলোচনা একদিনে কি শেষ করে ফেলতে হয়! রোজ একটু একটু করে করতে হয়। কিন্তু দেখিস, তুই আবার ফেঁসে যাসনে যেন আলোচনা করতে করতে।

pathagar.net

—তুই জেলাস হচ্ছিস নাকি?

—না। তবে আরও অনেক হবে। অনেকেই কাছে ভিড়তে চাইছে, পাত্তা পাচ্ছে না। তুই যেরকম পাত্তা পেতে শুরু করেছিস, অন্যেরা তোকে হয়তো মেরে গুম করে ফেলবে—

ডোনার মজা করে বলা কথাটার উত্তরে প্রবলভাবে হেসে উঠতে যাচ্ছিল গার্গী, কিন্তু জায়গাটা কফি হাউস, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের কমনরুম নয় মনে পড়তে ঝট করে উঠে পড়ল টেবিল ছেড়ে, চল্ তো, বাইরে যাই।

কফি হাউসের জমজমাট পরিবেশ ছেড়ে বাইরে আসতেই ডোনাকে চেপে ধরল গার্গী, কী ব্যাপার, তোর সেই গুপ্তিপাড়ার প্রেমিকের কী খবর? আবার কোথাও আউটিঙে যাচ্ছিস নাকি?

ডোনা অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে বলল, নাহ্। তাকে আপাতত কোল্ডস্টোরেজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। এই মুহূর্তে আর এক রাজকুমার আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে—

গার্গী কিছুটা অবাক হল, আবার হলও না। ডোনার স্বভাবচরিত্র, হাবভাব তার এ কদিনে হাড়ে-হাড়ে চেনা হয়ে গিয়েছে। সে বড় বেশি বৈচিত্র্যে আগ্রহী। সারাক্ষণ কোনও না কোনও বিপ্লব ঘটাতে খুবই উৎসাহ তার। তবু হঠাৎ রাজকুমার শব্দটি শুনে ঔৎসুক্য গোপন করতে পারল না, বলল, সে আবার কে?

—একজন ধনকুবের। সে হঠাৎ দশলক্ষ টাকা দিয়ে আমার বাবার আঁকা কয়েকখানা ছবি কিনে নিয়ে গেছে। আরও নাকি কিনবে। বিশাল একখান কনটেসা হাঁকিয়ে সেদিন এসেছিল আমাদের বাড়ি। একদম সাহেবদের মতো চেহারা, কিন্তু বাংলায় কথা বলে। ।

গার্গী অবাক হয়ে দেখছিল, সেই রাজকুমার সম্পর্কে এতক্ষণ কথা বলতে গিয়ে একটা অদ্ভুত ঘোর ঘনিয়ে আসছিল ডোনার চোখেমুখে। একেই তো ধনকুবের, তার উপর সাহেবদের মতো চেহারা, ডোনা একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে তাতে আর সন্দেহ কী। ডোনার তো আবার একটা আমেরিকা আমেরিকা ব্যাপার আছে কিনা। মুচকি হেসে বলল, তার সঙ্গেও আউটিঙে যাবি নাকি?

ডোনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নাহ্। এখনও ত ইন্টিমেসি হয়নি। জাস্ট আলাপ হয়েছে। নামটাও কী অদ্ভুত। অলর্ক। অলর্ক বোস।

নাম শুনে এবার গার্গীরই ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা, সে ছিটকে উঠে বলল, কী নাম বললি?

অলর্ক বোস। কেন, তুই চিনিস নাকি তাকে!

গার্গী স্তব্ধ হয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, চিনি, আবার চিনিও না। কিন্তু তাকে আমার খুব দরকার। আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি?

ডোনাও হতবাক হয়ে গিয়েছিল গার্গীর এই আকস্মিক আচরণে। তার চোখে কী যেন পর্যবেক্ষণ করে জোরে জোরে ঘাড় ঝাঁকল, নো ম্যাডাম। আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর হিম। হি ইজ অ্যা নাইস গাই—

গার্গী পুরোপুরি নিরুৎসাহ হল না। সে তো অলর্ক বোসের প্রেমে পড়বে না, তার সঙ্গে আলাপ করতে চায়নি। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি নিয়ে তার ভাবনাটা শেষ পর্যন্ত ভাবনার স্তরেই রয়ে গেছে। অনেক চেষ্টাচরিত্র করে আজ পর্যন্ত বীরভঙ্গপুর পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি

pathagar.net

তার পক্ষে। ক'দিন হল সেই রহস্যের জট খোলার আশা ছেড়েই দিয়েছিল। হঠাৎ আচমকা অলর্ক বোসের সন্ধান পেতে একেবারে মুখিয়ে উঠল এবার। ব্যাপরটা অতএব চেপে গার্গী মৃদু হাসল ডোনার দিকে তাকিয়ে, তাহলে মন্দার মিত্রের এখন স্টার খারাপ যাচ্ছে বল—

ডোনাও হাসল। তবে রহস্যময়ীর মতো।

দশ

ঠিক দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছে তার রিভলভিং চেয়ারে বসে একটা ইংরাজি কাগজের টেণ্ডারে পাতায় চোখ রাখছিল মন্দার।

লিণ্ডসে স্ট্রিটে ঢুকেই কিছুটা এগিয়ে গেলে এই চারতলা পুরানো বাড়িটা। কলকাতার এই সব ব্যস্ত এলাকায় যখন পুরানো বাড়ি ভেঙে মহামান্য প্রমোটাররা পটাপট মাল্‌টি-স্টোরিড বিল্ডিং গজিয়ে তুলছে, তখন এই বাজাজ ম্যানশনটি কী করে তাদের নজর এড়িয়ে এখনও টিকে আছে, সেটাই মন্দারের কাছে ভারি বিস্ময়কর। পুরানো বলেই দু'লাখ সেলামিতে দোতলার উপর একটা ষোলো বাই দশ ঘর পেয়ে গেছে সে। লোকেশনের তুলনায় টাকাটা খুবই কম হলেও মন্দারের কাছে আপাতত অনেক। দালালের হাতে দু'লাখ টাকা গুনে গুনে দেবার সময় তার বুকের ভিতরটা চিন্‌চিন্ করছিল। তার বিজনেসে এখন লিকুইড ক্যাশের খুবই প্রয়োজন। এতগুলো টাকা ব্লকড হয়ে গেলে অসুবিধা হবে। মন্দারের কথা শুনে দালাল শিবরাম দস্তিদার বলছিল, মন্দারবাবু, অনেক কপাল করেছিলেন বলেই এত সস্তায় ঘরখানা পেয়ে গেলেন। একটু অপেক্ষা করলে তিন-চার লাখ টাকাও হয়তো অফার দিত কেউ। এখানে একটা ঘরের কীরকম ডিমাণ্ড জানেন! এই ঘরখানায় শুধু একটা টেলিফোন নিয়ে বসে থাকলে এক বছরে দু'লাখ টাকা ঘরে এসে যাবে। স্রেফ ব্রোকারি করেই—

না, মন্দার দালালি করে বড়লোক হতে চায় না। একটা ভালো ব্যাবসা করেই সে তার ভাগ্য ফেরাবে। মাত্র পঞ্চাশহাজার টাকা সম্বল করে নেমে এই চার-পাঁচ বছরে সে চোদ্দো-পনেরো লাখ টাকা ক্যাপিটাল করে ফেলেছে। সব টাকাটাই অবশ্য তার ব্যবসায়ে খাটছে। বছর খানেক হল এই হলঘর খানা পেয়ে যেতে অসুবিধা হয়ে গেছে তার।

ষোলো বাই দশ ঘরে মন্দার ও তার তিন কর্মচারী মিলে খুলে বসেছে তাদের 'ইনডেক' কোম্পানি। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে দরজার উপরে তাদের কোম্পানির নেমপ্লেটটি বেশ কায়দা করে বসানো। দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ-দিকে পর-পর তিনখানা টেবিল। রজীত, নিখিলেশ ও সুমনা নামের তিন যুবক-যুবতীকে কোম্পানির কাজে নিয়োগ করেছে মন্দার। তিনজনই বেশ স্মার্ট, কাজেকর্মেও তুখোড়। সুমনা নামের মেয়েটি যথেষ্ট সুন্দরীও। তিনজনের টেবিল-চেয়ার যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটি প্লাইউডের পার্টিশন। তার ওপাশে একটা হাফ-সেক্রেটারিয়েট টেবিল নিয়ে বসে থাকে মন্দার। তার টেবিলের সামনে দু'খানা স্টিল-ফ্রেমের গদি-আঁটা চেয়ার, ভিজিটরদের বসার জন্য।

প্লাইউডের পার্টিশনটা ইচ্ছে করেই রেখেছে মন্দার। তার কর্মচারীদের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখার জন্য। তাতে একটু আড়ালও রইল, আবার ইচ্ছেমতো তিনজনকে ঠিকঠাক ইনস্ট্রাকশনও দেয়া যাবে।

টেণ্ডারগুলো পর পর পড়ে যেতে হঠাৎ একটা অ্যানাউন্সমেন্টের দিকে নজর আটকে গেল

pathagar.net

তার। বেশ বড় অঙ্কের একটা টেণ্ডারের কল দিয়েছে একেবারে নতুন একটা কোম্পানি। টাকার অঙ্কটিই শুধু চোখে পড়ার মতো তাই নয়, টেণ্ডারের বিষয়টিও ভারি অভিনব। বার কয়েক গড়গড় করে বিজ্ঞাপনটি পড়ার পর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল মন্দারের, সে একটা জোরেই চ্যাঁচিয়ে উঠল, রজীত, রজীত।

রজীতের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে। দশটা বাজার আগেই সে অফিসে পৌঁছে তার কাজকর্ম শুরু করে দেয়। আজও যথারীতি ফাইল খুলে 'বাড কোম্পানিতে' জমা দেওয়ার জন্য টেণ্ডার পেপার তৈরি করছে। তার টেবিলে খোলা ফাইলের পাশে ছড়ানো-ছিটানো অনেকগুলো কাগজ, একপাশে একটি ক্যালকুলেটরও। মন্দারের ডাক শুনেই দ্রুত কাজ ফেলে চলে এল পার্টিশনের এপাশে, ইয়েস স্যার—

খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ না তুলে মন্দার বলল, ক্যারিসমা সিণ্ডিকেটের অফিস থেকে যে পেমেন্টটা পাওয়ার কথা ছিল সেটার কী হল?

—সেটা বোধহয় শিগগিরই পাওয়া যাবে, সুমনা তো কাল গিয়েছিল ওদের অফিসে।

—কবে পাওয়া যাবে কিছু বলেছে?

—সুমনা এখনও অফিসে আসেনি। কাল সকাল সকাল বেরিয়ে গিয়েছিল ক্যারিসমা সিণ্ডিকেটে যাবার জন্য। বলেছিল, অ্যাকাউন্টস্ অফিসারের সঙ্গে দেখা না হলে আজ অফিস আসার পথে দেখা করে আসবে।

ক্যারিসমা সিণ্ডিকেটের পেমেন্ট নিয়ে বেশ কয়েকদিন চিন্তায় আছে মন্দার। প্রায় তিনমাস হয়ে গেল ওদের অফিসের ভেতরটায় রি-মডেলিং-এর কাজ করে 'ইন-ডেক' অথচ এখনও পেমেন্ট দেয়নি ওরা। প্রায় লাখদুয়েক টাকা আটকে যাওয়ায় খুবই অসুবিধে হচ্ছে। রজীতের কথা শুনে খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ খবরের কাগজটা এগিয়ে দিল, 'এ টু জেড' কোম্পানির এই বিজ্ঞাপনটা দেখেছ?

রজীত ঘাড় নাড়ে, দেখেছি, স্যার।

—আমরা কি টেণ্ডার দিতে পারব?

খানিক ইতস্তত করে রজীত বলল, মনে হচ্ছে পারব না। শুধু আর্নেস্ট মানিই জমা দিতে হবে আড়াই লাখ টাকা। তারপর প্রায় চল্লিশ লাখ টাকার কাজ প্রথম দফায়। আমাদের যা ক্যাপিট্যাল তাতে কুলোবে না।

মন্দার কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বলল, ওরা মোট পাঁচটা শো-রুমের জন্য টেণ্ডার কল করেছে। আমরা যদি একটা শো-রুমের জন্য কমপিট করি?

—টেণ্ডারের অ্যানাউন্সমেন্টে তা বলা নেই। বলেছে, একজন বিখ্যাত শিল্পীর বিশেষ লে-আউট অনুযায়ী সব ক'টা শো-রুমের ইনটেরিয়র ডেকোরেশন করতে হবে, মাত্র একটি কনসার্নই সব ক'টা কাজের বরাত পাবে।

মাঝেমধ্যেই সংবাদপত্রে এরকম বড় বড় কাজের টেণ্ডার প্রকাশিত হয়। সমস্ত টেণ্ডারগুলিই মন্দর খুঁটিয়ে পড়ে, কিন্তু প্রতিবারই তাকে হতাশ হতে হয় অর্থাভাবের জন্য। সে তার ছোট্ট কোম্পানিটিকে দ্রুত বড় করে তোলার জন্য প্রবল পরিশ্রম করে চলেছে। প্রতিটি মাঝারি টেণ্ডারেই সে অংশগ্রহণ করে এবং এ পর্যন্ত যতগুলি কাজ তার 'ইন-ডেক' হাতে নিয়েছে, প্রতিটির পারফরমেন্সই চমৎকার। শুধু এ মাসে দু'দুটি ভাল টেণ্ডার সে পায়নি তারই গাফিলতির জন্য। রজীতরা দুটো টেণ্ডারের কাগজপত্রই ঠিকঠাক প্রস্তুত করে রেখেছিল। মন্দার

বিনা নোটিসে পরপর তিনদিন অফিসে না আসায় তারা জমা দিতে পারেনি টেণ্ডার। তিনদিন পর অফিসে ফিরে এসে বুঝতে পেরেছিল, অফিস-মাস্টারের অনুপস্থিতির জন্য তার কর্মীরা মনে-মনে ক্ষুব্ধ, কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও তা প্রকাশ করেনি তারা।

মন্দার মনে মনে লজ্জিত বোধ করেছিল, কিন্তু খুশিও হয়েছিল এই কারণে যে, তার কোম্পানির কর্মীরা তাহলে কোম্পানির জন্য মমত্ব অনুভব করতে শিখেছে। কোথায় অফিস-মাস্টার তার কর্মীদের গাফিলতির জন্য রাগারাগি করবে, তা নয়তো কর্মীরাই ক্ষুব্ধ হচ্ছে অফিস-মাস্টারের গরহাজিরায়। কিন্তু সেই একবারই না, এই নিয়ে দুবার। এর আগেও হঠাৎ এভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিল তিন-চারদিনের জন্য, একাই অবশ্য। সেবার ফিরে এসে শুনেছিল, রজীত তার অনুপস্থিতিতে তারই নাম সই করে জমা দিয়েছে টেণ্ডারের কাগজপত্র। সেবার রজীতকে খুব বকাবকি করেছিল মন্দার, এভাবে স্বাক্ষর জাল করায়। কিন্তু দু'লাখ টাকার কাজটা পেয়ে যেতে মনে মনে খুশিই হয়েছিল, তবে রজীতকে তা জানায়নি, ইচ্ছে করেই। সেইজন্যেই এবার রজীত আর টেণ্ডারপেপার জমা দেয়নি। যাই হোক, মন্দার তার কোম্পানির জন্য গত পাঁচ-ছ বছর জান লড়িয়ে দিচ্ছে। 'ডি' ক্লাস থেকে 'সি' ক্লাস কন্ট্রাক্টর হয়েছে। খুব শিগগির হয়তো 'বি' ক্লাসও হয়ে যাবে। কিন্তু তার টার্গেট 'এ' ক্লাস হওয়া। কবে কোটি টাকার টেণ্ডার ধরতে পারবে সেদিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু আপাতত চল্লিশ লাখ টাকার টেণ্ডারেও সে অংশগ্রহণ করতে পারছে না এই বোধটাকে তাকে পীড়িত করছে। যে করেই হোক, কিছু টাকা তাকে সংগ্রহ করতেই হবে।

—এক কাজ করো রজীত। ক্যারিস্‌মা সিণ্ডিকেটের পেমেন্টটা পেয়ে গেলে আর্নেস্ট মানির টাকাটা জমা দিয়ে দাও। তারপর ওয়ার্ক অর্ডার পেলে কোনও ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

রজীত তবুও মাথা নাড়ল, ওয়ার্ক অর্ডার পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, স্যার। বিজ্ঞাপনে বলা আছে, যেসব কোম্পানি অন্তত এককোটি টাকার কাজ করার অর্ডার পেয়েছে, কেবল তাঁরাই পার্টিসেপেট করতে পারবে।

মন্দার বিস্মিত হয়ে বলল, কেন, এখনও এককোটি টাকার কাজ আমরা করিনি।

—না স্যার। আমি হিসেব করে দেখছিলাম, 'ইন-ডেক' কোম্পানি এ পর্যন্ত ওয়ার্ক অর্ডার পেয়েছে মোট সাড়ে সাতানব্বই লাখ টাকার। মাত্র আড়াই লাখ টাকা সর্ট আছে এখনো।

—মাত্র আড়াই লাখ?

—হ্যাঁ, এ মাসে দু-দুটো অর্ডার হাতছাড়া না হয়ে গেলে হয়তো আমরা কম্‌পিট করতে পারতাম।

মন্দার কয়েক মুহূর্ত অপরাধীর মতো তাকিয়ে রইল রজীতের মুখের দিকে। এত বড় একটা টেণ্ডারে অংশগ্রহণ না করতে পারার যাবতীয় দায়িত্ব কিনা তারই ওপর এসে বর্তাচ্ছে! সে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এখন তাহলে থাক।

রজীত চলে যাবার পর নিজের উপর ভীষণ রাগ হয়ে গেল মন্দারের। সেই রাগ পুঞ্জীভূত হতে হতে অবশেষে আছড়ে পড়ল ডোনার উপর। সেদিন ডোনা অমন নাছোড় না হলে তারা তো পরদিনই ফিরে আসতে পারত গুপ্তিপাড়ার সেই মহেঞ্জোদাড়ো স্টাইলের পোড়ো বাড়িটা থেকে। তাহলে তো 'জনসন অ্যাণ্ড টেনিসন' আর 'ট্রেড-টায়ার' নামে দুটো কোম্পানির প্রায় পাঁচ লাখ টাকার টেণ্ডার তাদের হাতছাড়া হত না। পাঁচ লাখ টাকার মতো কাজ পেলে অন্তত

সত্তর আশি হাজার টাকা লাভ হত এ মাসে। সে টাকাও এখন তাদের কোম্পানির কাছে অনেক।

নাহ্, ডোনা সত্যিই কেয়ারলেস, ইররেসপনশিব্‌ল। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ডোনার কথাই ভাবতে বসল মন্দার। হয়তো কেয়ারলেস্ বলেই ডোনার মতো বোহেমিয়ান সুন্দরী তার মতো একজন ব্যবসায়ীর প্রেমে পড়ে গেছে হঠাৎ। হয়তো তাইই হঠাৎ তার সঙ্গে অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে সে বেরিয়ে পড়েছিল গুপ্তিপাড়ার পোড়োবাড়ির উদ্দেশ্যে। আর একদিনের বদলে তারা কীভাবে তিনদিন পার করে ফেলল তা বুঝতেই পারেনি। তার এই আঠাশ বছর বয়সে দু-একজন মেয়ের সঙ্গে একটু-আধটু ঘনিষ্ঠতা হয়নি এমন নয়। কিন্তু সে ওই চোখাচোখি, একটু হাসি, কিংবা অপালা নামের একটি মেয়ের হাতটাও হঠাৎ ধরে ফেলেছিল একদিন। কিন্তু সে ওই পর্যন্তই। তার বেশি প্রেম করার ধৈর্য বা ক্ষমতা তার ছিল না। তখনও পর্যন্ত সে ছিল বেকার, বাবা-মায়ের বাঁয়ে-এলেক-দেয়া ছেলে। তারপর ছোট্ট ব্যবসায়ে হাত দেয়ার পর আর কোনও দিকে তাকানোর ফুরসত পায়নি। তরতর করে কেবল সাফল্যের মুখ দেখতে চেয়েছে, আর তার সঙ্গে যোগ করেছে নিষ্ঠা, পরিশ্রম আর সততা। এর মধ্যে কীভাবে যেন সে লট্‌কে গেল ডোনার সঙ্গে। আর কয়েকদিনের মধ্যে তার সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ল যে, সে অভিজ্ঞতা তার কাছে অদ্ভুত, প্রায় অসম্ভবের মতো। ডোনা বোহেমিয়ান তো বোহেমিয়ান। মাত্র তিনদিনের মধ্যে প্রেমে আনাড়ি মন্দারকে সে মন্ত্রের মতো পুরোপুরি সাবালক করে ছেড়ে দিয়েছে। মাত্র তিনদিনের জন্য সে আর ডোনা কাছাকাছি হয়েছিল। এই তিনদিনে তার মনে হল সে জয় করে এসেছে তাবৎ বিশ্ব। এভারেস্ট-শৃঙ্গ ডিঙিয়ে ফিরে এল এক্ষুনি।

তারপর কয়েকদিন তার সমস্ত শরীর ও মন জুড়ে কেবল ডোনা, ডোনা আর ডোনা। দু'দুটো টেণ্ডার মিস করার শোকও সে অনায়াসে ভুলতে পেরেছিল, ডোনার কাছ থেকে যে স্বর্গীয় সুখ লাভ করেছিল তার আনন্দে, উল্লাসে, এক নিশ্চিন্ত ভাবনায়।

কিন্তু এখন আবার সেই শোকটাই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। রজীতের একটু আগের কথাগুলো কয়েকটা আলপিন হয়ে বিঁধে রয়েছে তার বুকের ভিতরে, 'এ মাসে দু'দুটো অর্ডার হাতছাড়া হয়ে না গেলে হয়তো আমরা কমপিট করতে পারতাম।'

কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে বসে থেকে মন্দার হঠাৎ হাত দিল তার টেবিলের একপাশে রাখা টেলিফোনে, ডায়াল ঘোরাতেই ওপাশ থেকে পুরুষ কণ্ঠ, কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝল, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি।

—হ্যালো, আমি মন্দার বলছি। মন্দার মিত্র। ডোনাকে একবার ফোনটা দেবেন? ওপাশ থেকে নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর, ডোনা বাড়ি নেই।

মন্দার জানে, চিত্রদীপ তাকে খুব একটা পছন্দ করেন না। করার কথাও নয়, কারণ ডোনার সঙ্গে ম্যাচ হিসেবে মন্দারের তেমন যোগ্যতা আছে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। চিত্রদীপ শিল্পী মানুষ। শিল্পী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম না হলেও তাঁর বাড়ির আবহাওয়া, আদবকায়দা, পরিবেশ সবই একেবারে আলাদা ধরনের একটা বিদেশি-বিদেশি ব্যাপারও আছে। আর সেটা বেশ উপভোগ করে মন্দার। ডোনা সুন্দরী, শিক্ষিতা, আদবকায়দায় অতীব আধুনিক, তবু সে যে কেন হঠাৎ পছন্দ করে ফেলল মন্দারকে তা তার কাছে অবোধ্য।

একটু থেমে, পরক্ষণে মন্দার আবার বলল, ডোনা কোথায় গেছে বা কখন ফিরবে বলতে পারবেন?

—কখন ফিরবে বলতে পারব না। কোথায় গেছে সেটা জানিয়ে গেছে আমাকে। মা-মেয়ে দুজনে মিলে একটা গাড়ি কিনবে স্থির করেছে। তার মডেল পছন্দ করতে বেরিয়েছে ঘন্টাদুয়েক আগে।

মন্দারের বিস্ময় চাপা থাকল না, গাড়ি কিনতে? ইয়ে, মানে কোন গাড়ি?

—ওই, চার চাকার গাড়ি আর কি।

খুব নিস্পৃহভঙ্গিতে কথা বলছেন চিত্রদীপ, কিন্তু মন্দার ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, চিত্রদীপ মারুতি কিংবা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি কেনার কথা বলছেন কি না। ডোনাদের বাড়ির অবস্থা সে যতদূর জানে, তা এইমুহূর্তে গাড়ি কেনার মতো নয়। তার শিল্পী-বাবার যা আয় তাতে হেসেখেলে সংসারটা চলে যায়, কিন্তু আবার একটা গাড়ি কেনার মতো হয়ে ওঠেনি। আগের সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়িটাই তো বিক্রি করে দিয়েছে মেইনটেন করতে পারছে না বলে। তবু হয় তো—

মন্দার আবারও বিস্মিত হয়ে বলল, তা ওরা, মানে ডোনা আর তার মা গাড়ির মডেল পছন্দ করতে গেল! ওরা কি পারবে!

—না পারার কি আছে।

—মানে আপনি সঙ্গে গেলে ভালো হত না?

—আমার যাওয়ার আর কী দরকার। আই অ্যাম অ্যান ওল্ড হ্যাগার্ড। ওদের সঙ্গে শিহরণ গেছে— দ্যাট বাস্টার্ড! বাস্টার্ড আবারও থমকালো মন্দার, শিহরণ মানে ডোনাদের বাড়ি যিনি পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকেন। তিনি তো ইংরাজির অধ্যাপক বলে মন্দার জানে। তাঁর নিজের সংসার, চালচুলো বলতে কিছু নেই। গাড়ির মডেল কে তিনি পছন্দ করতে পারবেন! কে জানে—

মনে মনে খুবই রাগ হয়ে গেল মন্দারের। গাড়ি কিনবে ডোনারা, তা সেটা মন্দারকে একটু বলতে পারতে না! এই কিছুদিন আগেই সে নতুন মারুতিটা কিনেছে। সেসময় সে কলকাতার যাবতীয় গাড়ির ডিলারদের কাছ থেকে খোঁজখবর নিয়েছে, কোন মডেলের কত দাম কোন গাড়ির সবচেয়ে ভালো পিক-আপ, কোন গাড়ির তেল-খরচ সবচেয়ে কম, কোন ডিলার সবচেয়ে বেশি কমিশন দিতে পারেন ক্রেতাকে। এ সমস্তই তার নখদর্পণে। যে মানুষটা সদ্য গাড়ি কিনেছে, ডোনা তো তার কাছ থেকেই পরামর্শ নিতে পারত। নিদেন একবার তাকে ফোনও তো করতে পারত।

না কি ডোনার একবারও মনে হয়নি মন্দারের কথা! তাছাড়া হঠাৎ গাড়ি কেনার মতো টাকাই বা ওরা পেল কোত্থেকে! এই তো ক'দিন আগে দিল্লির রোড দিয়ে তুমুল গতিতে গাড়ি চালাতে চালাতে ডোনা বলেছিল, তার নিজের একটা গাড়ি থাকলে সে ওয়ার্ল্ড-ট্যুরে বেরোতে পারত। মন্দারের মুখে একবার এসে গিয়েছিল, তা চলো না, এই গাড়িটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ি।। এই গাড়িটার অর্ধেক তো তোমার। বলেনি অবশ্য কথাটা, কারণ তাতে ডোনা তৎক্ষণাৎ ওয়ার্ল্ড-ট্যুরে বেরোবার দিনক্ষণ ভাঁজতে বসবে। তার তো আর চারপাশের পৃথিবী নিয়ে কোনও চিন্তাভাবনা নেই। সে তো প্রায় জন্ম-ভবঘুরে। কিন্তু এভাবে বেরিয়ে পড়লে মন্দারের তো চলবে না।

আসলে মন্দার বুঝতে পারে, অল্পবয়স থেকেই ডোনা ফাস্ট লাইফ লিভ করতে অভ্যস্ত।

pathagar.net

তারা একসময় আমেরিকায় বসবাস করে এসেছে। দেশে ফেরার সময় সেখানকার বোহেমিয়ান জীবনযাপন, আদবকায়দা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। এহেন উড়নচণ্ডিকে কীভাবে শাসনে রাখবে মন্দার তা বুঝতে পারে না।

তা ছাড়া কদিন আগে খবরের কাগজে ডোনার যে ছবিটা বেরিয়েছে, তা মন্দারের কাছে রীতিমতো শকিং। এভাবে বেআব্রু হয়ে স্টুডিওতে সবার সামনে ছবি তুলেছে, তা ছাপাতে পেরেছে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, এই ব্যাপারটা ভাবতেই পারে না মন্দার। যে পরিবারে বড় হয়েছে মন্দার, তা রক্ষণশীল আর পাঁচটা বাঙালি পরিবারের মতোই। তার বাবা-মা ভেবে রেখেছেন কোনও নরমসরম বাঙালি মেয়ে তাদের ঘরে বৌ হয়ে আসবে। তাঁদের চিন্তাভাবনার পথে ডোনার মতো মড মেয়েকে কেমন লাগবে তা ভেবে মন্দার দিশেহারা। অথচ ডেনার বেহিসেবি বাঁধন কাটিয়ে তার পক্ষে এখন ফেরাও কঠিন। ডোনা আসলে একটা নেশার মতো, তার ভালবাসা উদ্দাম, উচ্ছল, যার বাঁধভাঙা তোড়ে উধাও হওয়া যায় অসীমের টানে। সে ভালবাসা আবার কোনও বাঙালি ঘরের নরম মেয়ে দিতে পারবে না কখনও। ডোনা-নাম্নী সেই তুমুল নেশা ছেড়ে মন্দার তাহলে কীভাবে থাকবে!

বাস্টার্ড শব্দটি মনের ভেতর আর একবার নাড়াচাড়া করল সে। কদিন আগে ডোনাদের বাড়ি ঢোকার মুখ শুনতে পেয়েছিল, চিত্রদীপ আর বনানীর মধ্যে শিহরণকে নিয়ে প্রবল কলহ হচ্ছে। সে সময় চিত্রদীপের মুখখানা কী বীভৎস দেখাচ্ছিল। কোনও পুরুষই বোধহয় তার স্ত্রীর জীবনে অন্য পুরুষকে সহ্য করেন না।

বহুক্ষণ পর তার সহসা খেয়াল হল, শেষ বাক্যালাপটি দীর্ঘক্ষণ আগে করে চিত্রদীপ কখন যেন ওপাশে টেলিফোন রেখে দিয়েছেন, আর সেও দীর্ঘক্ষণ রিসিভার হাতে নিয়ে আবোল-তাবোল ভেবে চলেছে।

লজ্জা পেয়ে রিসিভার রাখতেই শুনল, প্লাইউডের পার্টিশনের ওপাশে সুমনার উচ্ছ্বসিত গলা, জানেন রজীতদা, ক্যারিসমা সিন্ডিকেট দু-মাস টলিয়ে তারপর আজ চেক ইস্যু করল। উহ, যা ধকল আর টেনশান গেছে না আমার উপর দিয়ে!

রজীত সঙ্গে সঙ্গে বলল, যাও, বসকে খবরটা দিয়ে এসো এক্ষুনি।

সুমনার সঙ্গে রজীতও চলে এল মন্দারের কাছে, স্যার গুড্ নিউজ। মন্দার হেসে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ সুমনা। তুমি কোম্পানির জন্য ক'দিন ধরে যা ট্রাবল নিয়েছ, তাতে আপাতত শুধু ধন্যবাদই জানাচ্ছি। পরে নিশ্চই কোনও প্রেজেন্টস দিতে পারব তোমাকে। রজীত, তুমি তাহলে এ টু জেড্-এর টেণ্ডার পেপার তৈরি করে ফেলো—। কুইক।

রজীত বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতেই মন্দার আবার বলল, আগে কম্পিটিশনে নামি তো, তারপর দেখা যাবে—

এগারো

সকালে উঠেই চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বাড়িতে যাওয়ার কথা অলর্কের, কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোবার মুখেই এমন একটি ঘটনা ঘটে গেল যা তাকে রীতিমতো চমকে দিল আজ। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতেই দেখল, সিঁড়ির গোড়ায় কুণ্ডলি পাকানো একখণ্ড কাগজ পড়ে আছে নিতান্ত নিরীহ ভঙ্গিতে। হয়তো অদরকারি কাগজই, ফেলে দিতে হবে ওয়েস্ট পেপার ফেলার ঝুড়িতে, এমন ভাবতে ভাবতে কাগজখণ্ডটি তুলে কী লেখা দেখতে গিয়েই তাজ্জব। তাতে

হিজিবিজি অক্ষরে লেখা কয়েকটি শব্দ, যা অতিকষ্ট উদ্ধার করতেই সে উপলব্ধি করল সেগুলো শব্দ নয়, অ্যাটম বোমাই যেন। লেখা আছে তোমার আয়ুমাত্র আর কয়েকদিন।

মাত্র কয়েকদিন! নিজের ভেতর সহসা প্রবলভাবে ঝাঁকুনি খেয়ে গেল অলর্ক। সে এখন কলকাতার অন্যতম ধনী ব্যক্তি, বোধহয় বিলিওনেয়ার শব্দটাই তার নামের পাশে এখন দিব্যি খাপ খেয়ে যায়। তার মাথায় এখন অনেক পরিকল্পনা, সামনে লক্ষ কাজের পাহাড় যা রূপায়িত করতে দিবা-রাত্র পরিশ্রম করে চলেছে ভূতের মতো। এহেন মুহূর্তে তার আয়ুমাত্র কয়েকদিনের হলে চলবেই বা কী করে? ব্যাপারটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল,তবু সে প্রতিমুহূর্তে আজকাল অনুভব করতে পারে, তার চারপাশে শত্রুর সংখ্যা এখন অনেক। বহু প্রতিহিংসার নজর সর্বক্ষণ তাকে ঘিরে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর অক্টোপাসের মতো। কেউ বা কারা যেন সর্বক্ষণ তাকে অনুসরণ করে চলেছে ছায়ার মতো। যে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তার ওপর। কয়েকদিন ধরেই দেখছে, বিশাল একটা কালোরঙের মোটর বাইক তার গাড়ির পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গতিতে। দু-তিনটে গগলস পরা যুবক তাতে বসে, সবই অচেনা, কিন্তু তারা এভাবে গুমগুম শব্দে বাইক চালিয়ে প্রতিমুহূর্তে তাকে ধমক দিয়ে চলেছে যেন। দেখলেই মনে হয় ভাড়াটে খুনি, কেউ বা কারা হয়তো তার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে এদের।

অলর্ক খুবই সাহসী, এসব ধমক পরোয়া করে না তেমন, তাই পুলিশকে ব্যাপারটা জানায়নি এতদিন, আজ চিরকুটটা হাতে পেতেই মনে হল, একবার থানায় জানিয়ে রাখলে ভাল হত। কিন্তু কী বলেই বা জানাবে। জানাতে গেলে হয়তো পুলিশই ফেউয়ের মতো লেগে থাকবে তার পেছনে। তার টাকার গন্ধে চকচক করতে থাকবে তাদের মুখগুলো।

অনেক ভেবেচিন্তে, যাতে ছোটখাটো প্রতিরোধও গড়ে তুলতে পারে, একটা বিদেশি পিস্তল জোগাড় করে ফেলেছে অলর্ক। খুবই আধুনিক মারণাস্ত্র, অনেক দূর থেকেও পেড়ে ফেলা যায় শত্রুকে। তা হাতে পেয়ে কয়েকদিন ধরে নাড়াচাড়া করে দেখেছে, শরীরে বেশ সাহস এনে দেয় যন্ত্রটা। চিরকুটটা বার দুই পড়ার পর তার অজান্তেই ডানহাতের আঙুলগুলো ছুঁয়ে ফেলল কোমরে গুঁজে রাখা নতুন পিস্তলের বাঁট। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল তার শরীরটা। বুঝতে পারছে না, কে লাগিয়ে দিল এই ভাড়াটে খুনিদের! সেই রাজপ্রাসাদপ্রতিম বাড়ির হরিশঙ্করবাবু, না কি তার সেই একদা প্রেমিকার নবতম প্রেমিকটি! যে-হোক না কেন, তার সঙ্গে কি অলর্ককে শেষ পর্যন্ত একটা এস্‌পার-ওস্‌পার করতেই হবে!

পিস্তলটির শরীর ছুঁয়ে অলর্ক যেন কেঁপে উঠল থরথর করে। 'আয়ু মাত্র কয়েকদিনের' শব্দগুলো তাকে বারবার প্রবল ভাবে ছুঁয়ে যাচ্ছে যেন। কার আয়ু— তার, না তার প্রতিপক্ষের?

কয়েকদিন আগে হরিশংকর চৌধুরি তার বাড়িতে এসেছিল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে। বীরভঙ্গপুরের রানিমাকে খুন করেছিল যে সাংবাদিকটি, সে নাকি ঘোরাফেরা করছে অলর্কের বাড়ির কাছাকাছি। হরিশংকর চৌধুরি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, রানিমাকে আপনিই খুন করিয়েছেন ওই লোকটিকে পাঠিয়ে—

অলর্ক অবাক হয়ে বলেছিল, আমি!

—হ্যাঁ। লোকটাকে সেদিন আপনার অফিসেও দেখলাম। শুধু দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেলেছে এই যা। শুনে অলর্ক যেমন বিস্মিত, তেমনই শঙ্কিত। কেন তার আশেপাশে সর্বক্ষণ ঘুরছে লোকটা! কী মতলব তার!

pathagar.net

পিস্তলটি নিয়ে এর মধ্যে বারকয়েক প্র্যাকটিসও করেছে সে। ঠিক কতদূর থেকে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করতে হবে এখনও জানে না। দুশো গজ, কিংবা দুশো বিঘৎ— দূরত্ব যাই হোক না কেন, তাকে জিততেই হবে সেই লড়াইয়ে। হয় এস্‌পার, না হয় ওস্‌পার।

কিন্তু হঠাৎ যদি চোরাগোপ্তা কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর! অন্ধকারে, গোপনে, কিংবা পেছন থেকে। এমন ভাবতে ভাবতে সে তার বিশাল ঝকঝকে গাড়িটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে তার এখন অনেক কাজ। পর পর অনেক আলোচনা সেরে নিতে হবে। লোকটি যেমন গুরুগম্ভীর, তেমনই ভারি আনপ্রেডিকটেবল। শিল্পীরা এমন অদ্ভুত ধরনের হয়, তারা আর পাঁচটা মানুষের থেকে যে আলাদা, তা কদিনে বুঝে ফেলার পর চিত্রদীপকে নিয়ে খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হচ্ছে তাকে। খুবই বড় শিল্পী চিত্রদীপ, বড় বলেই এরকম পাগলা ধরনের।

আর এরকম একজন বড় শিল্পীর সঙ্গে কাজ করা কী যে ঝকমারি ব্যাপার তা এখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে অলর্ক। প্রথমে চিত্রদীপ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাকে। কিন্তু অলর্ক প্রথম থেকে ঠিক করে রেখেছে, তার প্রজেক্ট সে যেভাবে করবে বলে মনে করেছে, ঠিক সেভাবেই করবে। তা সে যে কোন মূল্যের বিনিময়েই হোক না কেন। সেই সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার পথে সে আপাতত সফল। এতগুলো ছবি একসঙ্গে বিক্রি হয়ে যাওয়ায় চিত্রদীপই শুধু অবাক হয়েছেন তাই নয়, তাঁর পরিবারের বাকি সবাইও তাজ্জব। তারা জেনেছে, তাহলে চিত্রদীপের ছবিও বিক্রি হত পারে! তাহলে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকেও একজন প্রতিভাবান শিল্পী!

তাঁদের এই আকস্মিক বিহ্বলতার মধ্যেই অলর্ক তার কাজ হাসিল করে নিয়েছে টায়েটায়ে। চিত্রদীপ শেষ পর্যন্ত অলর্কের প্রস্তাবে রাজি হয়ে এখন পুরোপুরি মগ্ন ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনের লে-আউট তৈরির কাজে। কাজটি তাঁর কাছে অদ্ভুত, কিন্তু দারুণ লাগছে আপাতত। কাজটা চ্যালেঞ্জিংও বটে। কিন্তু অলর্কের কোনও সাজেশনই কর্ণপাত করেননি।

কয়েকদিনের মধ্যেই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলির জন্য একটি চমৎকার লে-আউট প্ল্যান তৈরি করে ফেলেছেন চিত্রদীপ। আপাতত পাঁচটি শো-রুমের কাজ শুরু হবে, তার জন্যে নক্‌শা একটাই, শুধু রঙের আর দৃশ্যপটের তারতম্য করে প্রতিটি শো-রুমের বৈচিত্র্য আনতে চান তিনি। অলর্কের লিণ্ডসে স্ট্রিটের স্পেসটাই বৃহত্তম, একতলা-দোতলা মিলিয়ে প্রায় সাতহাজার স্কোয়ার ফুট, তাই এই শো-রুমটির ভিতরে শুধু নীল আর নীল। তাঁর যে ছবিগুলোতে শুধু নীলরঙের ছড়াছড়ি সেগুলিই এই শো-রুমটিতে টাঙাবার পরিকল্পনা করেছেন। ছবির সঙ্গে রং মিলিয়ে প্রতিটি দেয়াল। তার মাঝখানে নীলরঙের প্রাধান্য দিয়ে এখানে ওখানে ম্যুরাল। শো-রুমের কোথাও প্লাইউডের পার্টিশন, কোথাও কাচের। প্লাইউডের উপর কখনও হালকা নীল, কখনও ঘন নীলরঙের ঢেউ-ঢেউ ডিজাইনওয়ালা সানমাইকা। শো-উইনডোতে কয়েকটি ন্যুড মডেল। তার সঙ্গে যেখানে যেখানে প্রয়োজন আলোর কাজ। ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের কাজ শেষ হয়ে গেল মনে হবে যেন কোনও সমুদ্রের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। তার সেই অফুরন্ত জলরাশির ভেতর থেকে স্নান করে উঠছে ভেনাসের মতো নগ্ননারীরা।

হঠাৎ কোনও নতুন কাস্টমার শো-রুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল নিশ্চিত দিশেহারা হয়ে পড়বে। এমন অলৌকিক পরিবেশে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র কেনার থ্রিলই তো অন্যরকম।

pathagar.net

লিগুসে স্ট্রিটের শো-রুমে যদি নীলরঙের ছড়াছড়ি হয়, তাহলে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে শো-রুমটিতে হবে সবুজের প্রাচুর্য। এখানে এমন উপছানো সবুজের ঢেলখেল, যেন তা হবে প্রকৃতির এক চমৎকার ল্যাণ্ডস্কেপ। যেন কোথাও সবুজ ধানখেত, কোথাও ঘন বাঁশবন ঝুঁকে আছে ক্রেতার মাথার উপরে, কখনও বা বিশাল শাল সেগুনের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন ক্রেতারা।

ঠিক তেমনই হাতিবাগানের শো-রুমে থাকবে ঘন ও হালকা খয়েরি রঙের ছড়াছড়ি। দূরে একটা গ্লোব এমনভাবে রাখা থাকবে যেন পৃথিবীটাই কেউ দেখতে পাচ্ছে পৃথিবীর বাইরে কোথাও দাঁড়িয়ে। আসলে শো-রুমটি করা হচ্ছে মানুষ চাঁদে গেলে যে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট দেখতে পাবে তারই আদলে। চাঁদের গায়ে যে অসংখ্য নগ্ন পাহাড়, ধু-ধু জলহীন সমুদ্র, গিরিখাত আছে, তাতে যে খয়েরি, কালচে-খয়েরি রঙের প্রাধান্য, চিত্রদীপ তাইই ফোটাতে চেয়েছেন এখানে।

পাশাপাশি শ্যামবাজারে মরুভূমির দৃশ্য। তার ভেতরে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটি যেন হবে একটি চমৎকার মরুদ্যান। কয়েকটি খেজুর গাছ এমন চমৎকার ভাবে এঁকেছেন যে, তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকার আরামই আলাদা। আর গড়িয়াহাটের শোরুমে অন্য এক চমক, সেখানে সাদা রঙের কারুকাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বরফের দেশ। তার সঙ্গে থাকবে এয়ারকণ্ডিশনের কৃত্রিম শীত। এস্কিমোরাই যেন বিক্রেতার ভূমিকায়।

চিত্রদীপকে যত দেখছে তত অবাক হয়ে যাচ্ছে অলর্ক। প্রতিটি শো-রুমের জন্য মডেল তৈরি করে সেগুলো টেবিলের উপর সাজিয়ে চিত্রদীপ ঠোঁট থেকে পাইপ নামিয়ে বললেন, এখন বলো, কেমন লাগছে এগুলো?

বিহ্বল অলর্ক শুধু বলতে পারল, সুপার্ব। আমি কিন্তু এর দশভাগের একভাগও এক্সপেক্ট করিনি। সত্যিই আপনার প্রতিভা এতদিন শুধু অপচয় হয়েছে।

—নাও ইউ গো অ্যাহেড উইথ ইয়োর প্রজেক্ট।

—আমি কিন্তু আপনার এই শিল্পকর্মের নমুনা সহ কাগজে আলাদা করে বিজ্ঞাপন দেব প্রতিটি শো-রুম ওপেনিং-এর সময়। এমন শৈল্পিকভাবেও যে শো-রুম সাজানো যায় তা এতদিন এই শহরের বাসিন্দারা জানত না। 'এ টু জেড ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস' দেখে সবাই নিশ্চিতভাবে চমকে যাবে। আর এ ব্যাপারে পাইওনিয়ার হবেন আপনিই।

চিত্রদীপ পাইপে খানিক ধোঁয়া উড়িয়ে হেসে বললেন, আগে কাজটা কমপ্লিট হোক—

এবার খানিক ইতস্তত করে অলর্ক বলল, কিন্তু এই ডিজাইনের জন্য আপনার পারিশ্রমিক কত তা কিন্তু বলেননি এখনও—

গত কয়েকদিন রাতদিন পরিশ্রম করে তাঁর স্টুডিওতে কাজগুলো করছেন চিত্রদীপ। এ ধরনের কাজ আগে কখনও করেননি, তাই ব্যাপারটা তাঁর মনে হয়েছিল চ্যালেঞ্জিং। তারপর কাজ করতে করতে মনে হয়েছে এই ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের পুরো ব্যাপারটাই একধরনের শিল্প। শুধু প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কমোডিটির জন্য র‍্যাক তৈরি করা, দামি সানমাইকা দিয়ে কাউন্টার বানানো, আর শো-উইণ্ডোয় মডেল রেখে দিলেই তা ইনটেরিয়র ডেকোরেশন হয় না। তাকে শৈল্পিক সুষমায়ও উন্নীত করে তোলা যায়। এক একটি শো-রুম হবে এক একটি চিরস্থায়ী গ্যালারি। এ টু জেট-এর প্রতিটি শো-রুমেই থাকবে চিত্রদীপের প্রতিভার এ টু জেড স্বাক্ষর।

pathagar.net

একটু ভেবে চিত্রদীপ বললেন, শিল্পী যখন ছবি আঁকে, তখন তা কত দামে বিকোবে তা ভেবে আঁকে না। এই কাজটা করার সময়ও শিল্পের কথা ভেবেই দিনরাত খেটেছি। টাকার কথা ভেবে করিনি। তবে আমার ছবিগুলোর দাম বাবদ তুমি যে টাকা এ পর্যন্ত দিয়েছ, তা এই মুহূর্তে আমার কাছে অনেক। আপাতত আর কিছু না হলেও চলবে।

অলর্ক চমকে উঠল রীতিমতো। একজন শিল্পী গত কয়েকদিন পাগলের মতো খেটে এতগুলো দুর্দান্ত মডেল, লে-আউটে তৈরি করার পর এখন কিনা বলছেন, আপাতত কিছু না হলেও চলবে!

প্রাথমিক বিহ্বলতা কেটে গেল অলর্ক বলল, ঠিক আছে, ওটা আমার উপর ছেড়ে দিন। তাহলে আপাতত মডেলগুলো আমি গাড়িতে তুলে নিচ্ছি। শো-রুমগুলোর জন্য ইনটেরিয়র ডেকোরেটরদের কাছ থেকে টেণ্ডার চেয়েছি। তারা দু-একদিনের মধ্যেই আসতে শুরু করবে আমার অফিসে। মডেল দেখে এস্টিমেট তৈরি করবে।

—তোমার অফিস কোথায়?

অলর্ক হেসে বলল, আমার বাড়িতেই অফিস করেছি আপাতত। রাসেল স্ট্রিটে।

—ও, চিত্রদীপ আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যেন। কথা বলতে বলতে মাঝেমধ্যেই এমন হারিয়ে যান নিজের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার সম্বিত ফিরে পান। তৎক্ষণাৎ ডেকে ওঠেন, ডোনা, ডোনা, ডোনা—

ডোনা বোধহয় এতক্ষণ নিজের ঘরেই ছিল। বহুক্ষণ এ বাড়িতে এসেছে অলর্ক, বেলা নটা নাগাদ, এখন দশটা পনেরো বাজে তার ঘড়িতে, এতক্ষণ ডোনাকে দেখেনি বলে তার একটু যেন আশ্চর্যই লাগছিল। চিত্রদীপের ডাক শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল ডোনা, অলর্ককে দেখে চমকে বলে উঠল, আরে আপনি!

ডোনার পরনে একটা ঘন গোলাপি রঙের গাউন, পায়ের পাতা পর্যন্ত লুটিয়ে আছে গাউনের ফ্রিল, চুল হর্সটেল করে বাঁধা, তাতে তাকে দেখাচ্ছে কোনও ইউরোপীয়ান তরুণীর মতো। তার ফর্সা রঙে, চোখের চটুলতায়, পোশাকের অভিনবত্বে ফুটে উঠেছে তার বিদেশিয়ানা। কিছুক্ষণ তাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখার পর অলর্ক হাসল, অনেকক্ষণ হল এসেছি, এখন যাবার সময় হয়ে গেল।

—তাই! জানতে পারিনি তো, ও হো, এতক্ষণ শিহরণদার ঘরে জোর আড্ডা হচ্ছিল যে। নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে, কোথায় যাওয়া যায়, তারই প্ল্যান করছিলাম। শিহরণদা বলেছে সমুদ্র, মা বলছে পাহাড়, আমি বলেছি, উঁহু সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল কোনওটাই নয়। লোকালয়ের বাইরে কোনও আনকমন স্পটে। যে স্পট আমরা হঠাৎ যেন এক্সপ্লোর করব।

—ফাইন, অলর্ক অনায়াসে অ্যাপ্রুভ করল ডোনার প্রস্তাব, কোনও আনকমন জায়গা আমারও পছন্দের। তা হবে আমার একান্তই নিজের, এক্সক্লিউসিভ।

ডোনা ততক্ষণে ঝুঁকে পড়েছে চিত্রদীপের টেবিলে হিপ হয়ে থাকা মডেলগুলোর দিকে। কয়েকদিন ধরে চিত্রদীপ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, তা নজরে পড়েছে ডোনার, কিন্তু ঠিক খেয়াল করে দ্যাখোনি তার বাবা ছবি আঁকছেন, না অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত। এখন মডেলগুলো দেখে সেও বলে উঠল একরাশ উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে, ফাইন। এগুলো নিশ্চয় আপনার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের?

অলর্ক ঘাড় নাড়ে, অবশ্যই। প্রতিটি ডিজাইন এক্সক্লিউসিভ, যা আমি পছন্দ করি।

pathagar.net

ডোনা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, আপনার আর কী কী আছে এক্সক্লিউসিভ?

হাসল অলর্ক, অনেককিছুই, আমার এই যে জিশুখ্রিস্টিপ্রতিম চেহারা, এটাও। যে প্রাচীন বাড়িটিতে আমি থাকি, তাও। যে রাজপ্রাসাদটি আমি দৈববলে উপহার পেয়েছি, সেটাও। আপাতত আরও একটি এক্সক্লিউসিভের সন্ধানে আমি আছি। সেটিও আমি চাই।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কী সেটা?

—একজন সুন্দরী তরুণী, যাকে আমি আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগাতে পারি। সি উইল ব এক্সক্লিউসিভ ফর এ টু জেড।

ডোনা অপলক তাকিয়ে রইল অলর্কের মুখের দিকে, বলল, সেটা কীরকম?

—সেই মেয়েটি একান্তভাবেই 'এ টু জেডে'র জন্য কাজ করবে।' 'এ টু জেড' তাকে সমস্ত সংবাদপত্রে এমনভাবে হাজির করবে, যাতে সে এবং 'এ টু জেড' এক ও অবিচ্ছিন্ন বলে মনে হবে। সি উইল বি অন্যা 'এ টু জেড' গার্ল। পারিশ্রমিক হিসেবে তাকে আমি একটি ব্ল্যাঙ্ক চেক দেব—

ডোনা খিলখিল করে হেসে বলল, বাহ্, আইডিয়াটা তো চমৎকার। এ টু জেড গার্ল।

—আমার মাথায় আরও একটা আইডিয়া এসেছে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জি যখন আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের জন্য এতটা পরিশ্রম করলেন, তার বিনিময়ে আমিও ওঁর জন্য কিছু করতে চাই। ভাবছি ওঁর একটা একজিবিশন আমি স্পনশর করব। কলকাতার সবচেয়ে বড় গ্যালারিতে সব চেয়ে বেশি পাবলিসিটি দিয়ে, সেখানে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বেস্ট কালেকশনস্ দেখানো হবে।

চিত্রদীপ এতক্ষণে চমকে উঠে বললেন, সে কি!

—আমার মনে হয় এতবড় একজন আর্টিসকে আলোর কেন্দ্রবিন্দু থেকে এভাবে আড়ালে রাখা ঠিক নয়। সংবাদপত্রে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে সমস্ত ক্রিটিকদের একটা পার্টিতে এনে খুব হইচই করে জানাতে চাই এই শো-এর কথা। আর সেটা হবে আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর উদ্বোধনের আগেই।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, ফাইন। আমি এরকম একটা কথা ভাবছিলাম।

চিত্রদীপ হঠাৎ বলে উঠলেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও। সমস্ত ব্যাপারটা যে গুলিয়ে যাচ্ছে আমার—

অলর্ক হেসে বলল, আপনি আবার নতুন করে আঁকা শুরু করুন, মিঃ চ্যাটার্জি। অনেক সময় শুধু প্রেরণার ভাবে, উৎসাহ না পাওয়ায় অনেক বড় প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের দেশে। আমি বেশ বুঝতে পারছি আপনিও আঁকার প্রেরণা হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু সেটা হতে দেব না আমি।

কিছু আর বলতে পারলেন না চিত্রদীপ, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন অলর্কের দিকে। ভাল করে একটাই প্রদর্শনী করার তাঁরও অনেকদিনের ইচ্ছে। এর আগে যা দু-তিনটে শো করেছেন, শেষ পর্যন্ত উৎসাহের অভাবে কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে যেন।

এবার অলর্ক বলল, আমাকে কিন্তু এবার ফিরতে হবে। মডেলগুলো গাড়িতে তুলে নিতে হবে। ডোনা, উড ইউ হেল্প মি?

ডোনা সাগ্রহে বলল, ওহ্, শিওর।

ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে অলর্ক একে-একে সমস্ত মডেলগুলো ভরে ফেলল তার গাড়িতে। এগুলো এখন পৌঁছে দিতে হবে যে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে যেটি লাগবে। তারপর সেখানে গিয়ে চিত্রদীপ শুরু করবেন তাঁর আঁকাজোখার কাজ।

pathagar.net

গাড়িতে চালকের আসনে বসে এবার অলর্ক তাকাল ডোনার দিকে, থ্যাঙ্কস্ অ্যা লট।

ডোনা চমৎকার করে হাসল। সে হাসির দিকে তাকিয়ে বিহ্বল অলর্ক মনে মনে বলল, আমি আরও একটি এক্সক্লিউসিভ চাই, ডোনা। অ্যাণ্ড দ্যাট ইজ ইউ।

বারো

উপাচার্য নীতিশ দে সরকার হঠাৎ এক জরুরি চিঠি পাঠিয়ে তলব করেছেন মণীশ রায়কে। প্রফেসরস রুমে একা বসেছিলেন মণীশ। তাঁর আপাতত পর পর দুটি পিরিয়ড অফ থাকায় একটু জিরিয়ে নেবেন এমন ভাবছেন, সেসময়ে এহেন আচমকা তলবে বিস্মিত হয়ে পড়লেন ভারি। সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন, সেটা অ্যাশট্রের মধ্যে চেপে নিভিয়ে উঠে দাঁড়ালেন দ্রুত। ওপাশে রণজয় দত্ত একটা খবরের কাগজ পড়ার ভান করে বসে আছে গা এলিয়ে, মণীশকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একটা চোরাহাসির স্রোত যেন ঝিলিক মেরে গেল তাঁর ঠোঁটের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। সেটা মণীশের নজর এড়াল না, আর তাইই তাঁর মুখটা শক্ত হয়ে গেল মুহূর্তের ভিতর। ডিসগাস্টিং—

এমনিতেই মণীশের মনমেজাজ খুব একটা ভাল নেই কদিন ধরে। ঈষিতা কদিন ধরেই অভিযোগ করছিল, মণীশ আজকাল নাকি তাকে আর সময় দিচ্ছেন না। আজকাল মণীশ ব্যস্ত থাকেন বইপত্র, সেমিনার, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ানো নিয়ে। ঈষিতাকে নিয়ে অনেকদিন সিনেমায় পর্যন্ত যাযনি। মণীশ হেসে বলেছিলেন, এত ভাল কোয়ালিটির ভি.সি.পি কিনে দিলাম, পাড়ায় দুটো বড় বড় ভিডিও লাইব্রেরি হয়েছে, তাতেও কি তোমার সিনেমা দেখার শখ মিটছে না?

গতকাল রাতে কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠেছিল। কোথায় একা-একা মার্কেটিং করতে বেরিয়েছিল ঈষিতা, ফেরার পথে বাস নাকি দেখেছে, মণীশ একটা সালোয়ার কামিজ পরা মেয়ের সঙ্গে ভবানীপুরের একটা সিনেমা হল থেকে বেরোচ্ছেন।

মণীশ অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, তুমি ভুল দেখেছ। কাল বিকেলে আমি লাইব্রেরিতে বসে নোট নিচ্ছিলাম—

ঈষিতা তার বক্তব্যে অনড় থেকে মুখ লাল করে বলেছে, বাজে কথা বলো না। মেয়েরা তার স্বামীকে এক মাইল দূর থেকে দেখলেও ঠিক চিনতে পারে। হাজার ভিড়ের মধ্যেও একপলক নজর চালিয়ে বলে দিতে পারে তার স্বামী কোথায় আছেন!

—কিন্তু কাল যে তুমি ভুলই দেখেছ এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দিল্লির একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমাকে পেপার পড়তে ডেকেছে সামনের মাসে। সেটা নিয়ে এখন আমি ভীষণ ব্যস্ত। হাতে একদম সময় নেই, আর আমি কিনা এখন যাব সিনেমা দেখতে!

প্রায় ধমক দিয়ে ঈষিতাকে কাল রাতে থামিয়ে দিয়েছেন মণীশ। কিন্তু বিছানায় শুয়ে রাতে অনেক একা একা কেঁদেছে সে, বিড়বিড় করে অস্ফুটে বলেছে, তোমাকে আমি হাড়েহাড়ে চিনি। তুমি মেয়েদের নিয়ে সিনেমায় যাও কি না যাও আমার চেয়ে ভাল করে কেউ জানে না।

সেই থেকে বাড়ির আবহাওয়া গরম। সকালেও ঈষিতা তাঁর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। ক্লাসে পড়ানোর সময় স্বভাবতই আজ তেমন ফ্রি হতে পারছিলেন না। ক্লাসের ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি বিচ্ছু। পড়ানোর ফাঁকে স্পষ্ট শুনলেন, সেকেণ্ড বেঞ্চের একটা ছেলে তার

পাশের জনকে ফিসফিস করে বলেছে, স্যারের বাড়িতে নিশ্চয় আজ রাগারাগি হয়েছে। দেখছিস না, স্যার আজ ঠিক মুডে নেই। সেই ভুবনমজানো হাসিটিও নেই—

উপাচার্যের চেম্বার মণীশদের ডিপার্টমেন্ট থেকে তিনটে বিল্ডিং পরে। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁদিকে ঘুরেই তাঁর বিশাল রাজকীয় ঘরখানা। বেয়ারা দিয়ে খবর পাঠাতেই মণীশের ভেতরে যাওয়ার হুকুম হল।

মণীশ ভিতরে যেতেই মিঃ দে সরকার বজ্র গম্ভীর স্বরে বললেন, বসুন।

মণীশ আড়ষ্ট ভাবে বসলেও ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, উপাচার্য তাঁকে কী কারণে ডেকে পাঠিয়েছেন। কদিন আগেই সেমিনারে ভাল বক্তৃতা দেওয়ায় উপাচার্য নাকি মন্তব্য করেছিলেন, ছেলেটার বেশ ফাণ্ডা আছে তো। তাহলে কি সেই বিষয়েই কিছু বলবেন তিনি! শিগগিরই একটা রিডারের পদ খালি হচ্ছে মণীশদের ডিপার্টমেন্টে। এহেন ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে উপাচার্যের মতামত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমন ভাবতেই টেনশনে টানটান হয়ে উঠলেন।

মিঃ দে সরকারের চেম্বারটি আকারে বিশাল। পুব-দক্ষিণ খোলা এই ঘরে বসলে বাঁদিকের সবুজে উমসুম খেলার মাঠটি চোখে পড়ে। এতখানি নয়নাভিরাম খোলা জায়গা পাশেই থাকার ফলে ভি.সি.-র ঘরে সর্বক্ষণই হইহই করে হাওয়া। এমন একটা খোলামেলা ঘর, রেক্সিন-আঁটা বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল, সিংহাসন রিভলভিং চেয়ার, চেয়ারের পিছনে দুটো আলমারি বোঝাই মোটা মোটা বই—সব মিলিয়ে বেশ রাজসিক পরিবেশ। এমন পরিবেশে উপাচার্যের মতো একজন গম্ভীর মানুষের টেবিলের উল্টোদিকে কিছুক্ষণ বসে থাকাটা নিঃসন্দেহে অস্বস্তিকর।

কতকগুলো ফাইল খুলে পর পর সই করে যাচ্ছিলেন মিঃ দে সরকার। তাঁর সই বেশ লম্বা ধরনের, একটু অলঙ্কারময়ও বটে। সই হয়ে গেল হঠাৎ ফাইলগুলো ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিয়ে মুখ তুলে বললেন, তুমিই তো সেদিন সেমিনারে ভাল বক্তৃতা করেছিলে, তাই না?

উপাচার্য কী বলতে চাইছেন ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে মণীশ আস্তে করে বললেন, একটা পেপার পড়েছিলাম, স্যার।

—সেদিন তোমার উপর আমার ভালই ইম্প্রেশন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার নামে প্রচুর কমপ্লেন এসেছে।

—কমপ্লেন! মণীশ চমকে উঠলেন।

—হুঁ। সহকর্মীদের সঙ্গে তুমি খুব ইলট্রিটমেন্ট করছো আজকাল, এমন অভিযোগ পেয়ে আমিও বিস্মিত।

মণীশ অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপারটা যদি আপনি একটু ক্লিয়ার করে বলেন, স্যার, তাহলে কী ঘটেছে আমি বুঝতে পারি। কমপ্লেনটা কার কাছ থেকে এসেছে?

—দু তরফের কমপ্লেনই এসেছে আমার কাছে। একদিকে ছাত্ররাও কমপ্লেন করেছে, অন্যদিকে একজন অধ্যাপকও এসেছিল কাল।

মণীশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর পিঠ দিয়ে একটা ঠাণ্ডা রক্তস্রোত দ্রুত নেমে গেল যেন। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। একটু পরে ঢোক গিলে বললেন, অধ্যাপকদের মধ্যে কে এসেছিলেন স্যার?

—রণজয় দত্ত। আমার কাছে অভিযোগ করেছে, দীর্ঘদিন ধরে তুমি তার বিরুদ্ধে নানান ধরনের ষড়যন্ত্র করছো, তাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছো।

pathagar.net

মণীশের বুকের ভিতর নিঃশ্বাস আটকে গেল কয়েক মুহূর্ত। প্রফেসরস রুম থেকে উঠে আসার মুহূর্তে রণজয় দত্তের মুখে একটা বাঁকা হাসির স্রোত খেলা করছিল তা লক্ষ করেছিলেন তিনি। উপাচার্যের তলবটি যে তার অভিযোগের জন্যই, এটা রণজয় তাহলে বুঝতে পেরেছিল।

—অভিযোগটা কী ধরনের, যদি আর একটু স্পষ্ট করে বলেন, স্যার।

—সেদিন তোমার সঙ্গে রণজয়ও একটা পেপার পড়েছিল সেমিনারে। তার পড়াটা তেমন ভাল হয়নি। কিন্তু সে ডেইস থেকে নেমে আসার পর শিহরণ রায়চৌধুরী নামের একজন অধ্যাপক মাইকের সামনে গিয়ে রণজয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছে। রণজয়ের অভিযোগ, এই সমালোচনা আসলে তোমারই ইনস্টিগেশনে হয়েছে। গট-আপ।

মণীশ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন গট-আপ!

—হ্যাঁ, তুমি শিহরণ রায়চৌধুরীকে ভাল করে চেনো।

মণীশ প্রতিবাদ করে বললেন, সে আজ কুড়ি বছর আগের কথা। একই ইয়ারে পড়তাম এইটুকুই। তারপর আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ নেই।

—তোমাদের ডিপার্টমেন্টে ডোনা চ্যাটার্জি নামে এক ছাত্রী আছে—

—ডোনা চ্যাটার্জি! মণীশ বেশ অবাক হয়ে গেলেন। হঠাৎ তার নাম এই আলোচনার মধ্যে ঢুকে গেল কী করে তাও বুঝতে পারলেন না।

—শিহরণ রায়চৌধুরী ডোনাদের বাড়িতেই পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকে। ডোনাই শিহরণ রায়চৌধুরীকে রণজয়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে উৎসাহিত করে। আর সেটা তোমার নির্দেশেই।

মণীশ প্রথমে কথাই বলতে পারলেন না। উপাচার্যের কথাগুলো তাঁর কাছে যেমন আশ্চর্যের, তেমনি ভিত্তিহীন। প্রতিবাদ করে বলল, অ্যাবসার্ড, স্যার। শিহরণ রায়চৌধুরী একটা নামী কলেজের অধ্যাপক। তাঁর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, মতামত আছে, তিনি ডোনার কথায় এরকম একটা কাজ করবেন ভাবতেও অবাক লাগছে।

—কিন্তু রণজয় তাই-ই বলেছে।

—তা এ ঘটনার পেছনে আমার ভূমিকা রয়েছে এ কথা সে ভাবল কী করে?

—ডোনা নাকি তোমার ভীষণ অনুরাগী। ডোনাকে ইনস্টিগেট করেছ নাকি তুমিই।

—মাই গড! এও কি সম্ভব, স্যার? আপনি একথা বিশ্বাস করলেন? ডোনা তো রণজয় দত্তেরও ছাত্রী।

উপাচার্য কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন মণীশের দিকে। উত্তেজিত মণীশের মুখ চোখ দেখে অনুমান করতে চাইলেন কিছু। তারপর বললেন, আরও একটা গুরুতর অভিযোগ আছে। তুমি নাকি তোমার ক্লাসে পড়ানোর সময় রণজয়কে সরাসরি কটাক্ষ করে কিছু বক্তব্য রেখেছ।

মণীশ উত্তরোত্তর আশ্চর্য হয়ে চলেছেন। তাঁর শরীরের ভিতর একধরনের প্রতিক্রিয়াও হয়ে চলেছে অনবরত। তাঁর ভিতরে ক্রোধ কম, কিন্তু এখন একধরনের উত্তেজনায় ঘাম ঝড়ে পড়ছে তাঁর সারা শরীর থেকে।

—কী বক্তব্য, স্যার?

—তুমি জানো, রণজয় একজন আধুনিক কবি। ক্লাসে পড়ানোর সময় তুমি বলেছ, পৃথিবীর অনেক কবি-লেখকদের মধ্যে একটা কিলিং ইন্স্টিগেট আছে, অনেকেই খুনি, সমকামী।

pathagar.net

—স্যার, এখানেও আমার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। আসলে আমি সেসময় র‍্যাঁবোর কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে এসে গেল কবি ভের্লেনের কথা। আপনি তো জানেন, এই দুই প্রথিতযশা কবি—র‍্যাঁবো ও ভের্লেনের বন্ধুত্ব ছিল প্রবাদপ্রতিম। শুধুমাত্র বন্ধুত্বের আকর্ষণেই ভের্লেনে তাঁর স্ত্রী পুত্রকে পরিত্যাগ করে র‍্যাঁবোর সঙ্গে ফ্রান্স ছেড়ে চলে আসেন লণ্ডনে। লণ্ডনে তখন আরও অনেক কবি-লেখকদের সমাগম হয়েছে। দুই কবি লণ্ডনের সাহিত্য পরিমণ্ডলে খুঁজে পেলেন অফুরন্ত আড্ডা, মজার খোরাক। তা ছাড়াও লেখার প্রেরণা। এখানেই ভের্লেনের 'রোমান্স' নামের সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার পর দারুণ হইচই পড়ে যায় সাহিত্যমহলে। তার কিছুদিন পর দুই বন্ধুতে হঠাৎ কী কারণে শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। যে বন্ধুর জন্য ভের্লেন তাঁর সংসার ভেঙে দিয়ে চলে এসেছিলেন লণ্ডনে, সেই র‍্যাঁবোর কোনও উক্তিতে এমন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, রাগের মাথায় রিভলভার চালিয়ে গুলি করে বসলেন তাকে। র‍্যাঁবো ভয়ঙ্কর রকমের আহত হয়েছিলেন। আর বিচারে দু বছরের জেল হয়েছিল ভের্লেনের। র‍্যাঁবোও তো পরবর্তীকালে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে আফ্রিকার দুর্দান্ত চোরাকারবারীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

উপাচার্য মন দিয়ে শুনছিলেন, কোনও কথা না বলে শুধু উচ্চারণ করলেন, হুম।

—আর সমকামী বলতে অস্কার ওয়াইল্ডের কথা বলেছিলাম, স্যার। অস্কার ওয়াইল্ড জীবনযাপন করতেন লাগামছাড়াভাবে। লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করার কিছুকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় সমকামিতার। লর্ড আলফ্রেড ডগলাস নামে এক তরুণের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক সম্পর্ক ছিল ওয়াইল্ডের। ওয়াইল্ড নিজেই এমন দক্ষতার সঙ্গে মামলা লড়েছিলেন যে, জুরিরা প্রথমবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। দ্বিতীয়বারের বিচারে অবশ্য তাঁর দু' বছরের জেল হয়।

উপাচার্য গভীর কৌতূহলের সঙ্গে মণীশের বাচনভঙ্গিতে লক্ষ করছিলেন। হয়তো কৌতুকও অনুভব করছিলেন কিছুটা, কিন্তু গম্ভীর মুখ করে বললেন, ঠিক আছে, এখন তাহলে তুমি যেতে পার।

—কিন্তু ছাত্ররা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে গেছে বলছিলেন আপনি।

—ছাত্রদের অভিযোগ, তুমি ক্লাসের মেয়েদের নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত থাক।

মণীশ হেসে ফেললেন হঠাৎ, আপনি একদিন ক্লাসে আমার পড়ানো দেখুন, স্যার। আমি সবাইকেই সমানভাবে পড়াই।

—সে তো আমাকেই তুমি যেভাবে এতক্ষণ লেকচার দিয়ে শোনালে তাতেই বুঝে গেছি।

উপাচার্যের কথার মধ্যে এবার আর কৌতুক গোপন থাকেনি। মণীশ আবারও হাসলেন, তবে, ক্লাসের বাইরে অনেকেই আমার কাছে নানারকম সাহায্য নিতে আসে। এমনকি অন্য দপ্তর থেকে কেউ কেউ এসেও বইপত্র ধার নিয়ে যায়। প্রশ্নের উত্তর জানতে আসে।

—ও কে, দ্যাট উইল ডু।

মণীশ একরাশ উত্তেজনা নিয়ে প্রবেশ করেছিলেন উপাচার্যের ঘরে। এক নাগাড়ে নিজেকে ডিফেন্ড করতে করতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এতক্ষণে। রণজয় দত্ত যে সেমিনারের ঘটনার পরে এতটাই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তা ভাবতে পারেননি। তাঁর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে নালিশ করেছে, ছাত্রদের গিয়েও নালিশ করিয়েছে। কোন কোন ছাত্ররা তাঁর নামে উপাচার্যের কাছে এসে বলেছে তা জানতে ভারি ইচ্ছে করছিল তাঁর। কিন্তু আর কথা বাড়ালেন না। উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।

pathagar.net

বাইরে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। রণজয় দত্ত কতদূর ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে তা ভেবে অবাক হচ্ছিলেন। রণজয়ের পূর্ব ইতিহাস তো কিছুটা জানেন তিনি। সে ইতিহাস স্মরণ করলে গায়ে কাঁটা দেয়। সেরকম কাঁটা দিয়ে উঠল এই মুহূর্তে মণীশের সমস্ত রোমকূপে। মনে হল রণজয়ের সঙ্গে টক্কর দেওয়াটা বোধহয় ভুলই হয়ে গেছে তাঁর। অথবা তাঁর নিয়তিই হয়তো টেনে নিয়ে যাচ্ছে অন্য এক পরিণতির দিকে।

তেরো

কাঠের স্ট্যান্ডে দাঁড়া-করানো মস্ত ক্যানভাসে তুলি বোলাচ্ছিলেন চিত্রদীপ। তাঁর তুলিতে এখন নীল রঙ। কিছুটা সমুদ্র, কিছু আকাশ। তারই তারতম্য করতে নীল রং নিয়ে ঘনত্বের অদলবদল ঘটাচ্ছিলেন ভারি মনোযোগ দিয়ে।

গত কয়েকদিনে যাবৎ ভীষণ এক ব্যস্ততার মধ্যে কাটছে চিত্রদীপের। পাঁচ-পাঁচটা শো রুমের ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের জন্য বড় বড় দেয়াল জুড়ে ছবি আঁকা। তার ওপর প্রায় একই সঙ্গে তাঁর বিশাল চিত্রপ্রদর্শনী শুরু হতে চলেছে। তার জন্যও প্রচুর ছবির প্রয়োজন। এতকাল প্রায় অকর্মা থাকার পর হঠাৎ তাঁর চাহিদা এভাবে দেখা দেবে তা ভাবতেও পারেননি। একজন প্রোমোটার তাঁর অনেকগুলো ছবি মোটা দামে কিনে নিয়ে গেছে এ খবর বাজারে চাউর হওয়ার পর আরও প্রোমোটার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করছে, ছবির দরদাম করছে। আরও কয়েকখানা ছবিও ইতিমধ্যে বিক্রি হয়ে গেল বেশ ভাল দামে।

ছবিতে রং বোলাতে বোলাতে মাঝেমধ্যে দূরে সরে এসে চোখ রাখছেন ক্যানভাসে। দূর থেকে দেখলে ছবি আরও খোলতাই লাগে। দেখতে দেখতে আরও খানিকটা পিছোলেন, আর তখনই তাঁর মনে হল, তাঁর এই স্টাডি-কাম স্টুডিওটা আকারে বড়ই ছোট। এত স্বল্প পরিসরে তাঁর আর কুলোচ্ছে না। অন্য শিল্পীদের স্টুডিওতে কখনো-সখনো গিয়ে দেখেছেন, তাঁদের স্টুডিওগুলো দেখবার মতো। আকারে বড় তো বটেই, তার ভিতরটা চমৎকার সাজানো গোছানো। সে তুলনায় তাঁর স্টুডিও প্রায় হাস্যকর।

ভাবনাটা মনে উদয় হওয়া মাত্র মনটা হঠাৎই বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠল তাঁর। একজন শিল্পীর বড় হয়ে ওঠা না ওঠা অনেকখানি নির্ভর করে তার স্টুডিওর ওপর। এখন অপরিসর, অগোছালো স্টুডিওতে বসে কি ছবি আঁকা যায়। অথচ আজই 'এ টু জেড কোম্পানির' বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয়েছে, মাত্র দু'মাস পরেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির বৃহৎ একক প্রদর্শনী।

ভাবতে ভাবতে অলর্ক বসুর ভাবনাটাও কয়েক মুহূর্ত ঘাই মেরে গেল তাঁর মগজে। ছেলেটা লেখাপড়া না জানলেও তার ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা এর মধ্যে বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। প্রদর্শনীর পর-পরই তার দু-তিনটে শো-রুম খোলা হবে। কিন্তু সে-কথা আপাতত তার বিজ্ঞাপনে উল্লেখ নেই। আগে সে ফলাও করে প্রচার করতে চাইছে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির প্রদর্শনীকে। লোকে আগে শিল্পীকে চিনুক। শিল্পী বিখ্যাত হয়ে গেলে সেই শিল্পীরা জাদুআঙুলের কারুকাজ সমন্বিত শো-রুমের একটা আলাদা আকর্ষণ হবে। তখন 'এ টু জেড'-এর শো রুমে যাওয়ার তাগিদও বাড়বে কাস্টমারদের।

অলর্কের এই ব্যবসায়িক বুদ্ধির দৌলতে অবশ্য চিত্রীদেরও লাভ। হঠাৎ একজন শিল্পী প্রায় জিরো থেকে উঠে দৌড়াচ্ছে চড়চড় করে। চিত্রদীপের ছবির বাজারও ক্রমশ শেয়ার-মার্কেটের মতো লাফ দিয়ে উঠে যাবে অনেকদূর।

pathagar.net

এতদিন পরে তাঁর মনে হল, সব শিল্পীরই বড় হওয়ার মূলে একজন ভাল প্রোমোটার লাগে। সে যে অর্থেই হোক না কেন।

কিন্তু আপাতত তাঁর স্টুডিওটি আরও বড় করে তোলা দরকার। চারপাশে অসংখ্য ছবি, রং-তুলির সরঞ্জাম বিশ্রীভাবে ছড়িয়ে রাখতে হয়েছে যে, তাতে ভাল করে ঘোরবার ফেরবার জায়গাই নেই।

সেই মুহূর্তেই কিচেন থেকে ঘেমেচুমে বেরিয়ে এলেন বনানী। মাঝেমধ্যে চিত্রদীপের ক্যানভাসের দিকে চোখ রেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা তাঁর এখন অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতদিন পর তাঁরও মনে হচ্ছে, তাঁর স্বামীদেবতাটি ভালই ছবি আঁকেন। এখানেও সেরকম কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে চিত্রদীপ বললেন, এইটুকু স্টুডিওতে আর কাজ করা যাচ্ছে না।

বনানী চারপাশের অগোছালো ছবির পাহাড়ের দিকে নজর রেখে বললেন, ঠিক আছে, আজ দুপুরে সব গোছগাছ করে রাখব খ'ন। তাতে অনেকটা জায়গা বেরোবে। ডোনা ফিরুক।

—ডোনা কোথায় বেরিয়েছে?

—ডোনা তো বেরিয়েছে শিহরণের সঙ্গে। চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, এখন, এই সকালে?

—দুজনে ব্যাডমিন্টন খেলবে। তাই র‍্যাকেট-কর্ক-নেট ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনতে গেছে।

—তা তোমাকে বাদ দিল যে বড়?

বনানী চোখে অদ্ভুতভঙ্গি করে বললেন, আমি তো বুড়ি হয়ে গেছি।

চিত্রদীপ খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, শিহরণকে অন্য কোথাও ঘর খুঁজে নিতে বোলো। আমি ওই ঘরে স্টুডিও শিফ্ট করব।

বনানী খানিকক্ষণ বিহ্বল হয়ে চিত্রদীপের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, সে এখন কী করে হবে?

—কী করে হবে মানে? চিত্রদীপ হঠাৎ প্রায় রুখে দাঁড়ালেন, যখন আমাদের অতিরিক্ত ঘর ছিল, তখন তাকে আমরা থাকতে দিয়েছিলাম। এখন নিজেদেরই ঘরের সংকুলান হচ্ছে না। এখন তাকে অন্য ব্যবস্থা দেখে নিতে হবে।

—বাহ্, এতদিন এ ঘরে বসেই তো ছবি আঁকলে, এখন আর এখানে বসে ছবি আঁকা যাচ্ছে না?

চিত্রদীপ প্রায় গর্জে উঠে বললেন, না, যাচ্ছে না। এতটুকু জায়গায় ভাল করে চলাফেরা করাই যায় না। ছবি আঁকতে গেলে নিরিবিলি চাই, আলাদা পরিবেশ চাই, মনের কনসেনট্রেশন চাই।

বনানী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন চিত্রদীপের দিকে।

একটু পরে চিত্রদীপ আবার বললেন, তুমি যদি বলতে না পারো, তাহলে আমিই বলে দেব।

বনানী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠলেন, না, বলতে পারবে না।

—ও, খুব যে তার ওপর তোমার দরদ দেখছি।

—দরদ যতটা আমার, তার চেয়ে তোমার মেয়ের এখন বেশি। সে এখন শিহরণদা বলতে অজ্ঞান।

চিত্রদীপ ভুরু কুঁচকে বনানীর দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন, আবারও ঝেঁঝে উঠে কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। বনানী তৎক্ষণাৎ

সচকিত হয়ে বললেন, ওই বোধহয় ওরা এসেছে। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব।

বলে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার ছিটকিনি খুলে দিলেন। কিন্তু শিহরণ বা ডোনা নয়, দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে রয়েছে মন্দার।

বনানী মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, ও তুমি, ভিতরে এসো—

মন্দার ভিতরে আসতেই আবার দরজা লাগিয়ে দিলেন বনানী।

চিত্রদীপ মন্দারকে খুব একটা পছন্দ করেন না কোনও দিন। আজ তার এমনিতেই মুড খারাপ ছিল। হঠাৎ এহেন পরিস্থিতিতে মন্দারের দিকে একবার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আবার মনোনিবেশ করলেন তাঁর ক্যানভাসে।

অবস্থা সামাল দিতে বনানী মন্দারকে বললেন, তুমি সোফায় একটু বোসো। আমি ততক্ষণে চা করে আনি।

মন্দার ঘরের ভিতরে ঢুকে বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল। চিত্রদীপ এবং বনানী দুজনে যে একটা আগে কথা কাটাকাটিতে ব্যস্ত ছিলেন সেটুকু বুঝতে তার অসুবিধে হয়নি। অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল, ডোনা বাড়ি নেই?

বনানী চা করার উদ্যোগ নিতে কিচেনের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, থেমে গিয়ে বললেন, না, ওরা একটু মার্কেটিং-এ গেছে।

মন্দার অবাক হয়ে বলল, ওরা মানে—

—ডোনার সঙ্গে শিহরণ গেছে। ওই যে শিহরণ—

—ও, মন্দার চুপ করে গেল। খানিকক্ষণ পর আবার বলল, তাহলে আমি এখন উঠি—

—উঠবে কেন। একটু বোসো না। ওরা বোধহয় এখনই এসে পড়বে। সেই আটটা নাগাদ বেরিয়েছে। ব্যাডমিন্টনের সরঞ্জাম কিনতে গেছে দু'জনে। তুমি বোসো—

বনানী কিচেনের মধ্যে ঢুকে যেতে মন্দার চুপচাপ বসে রইল। চিত্রদীপ চিন্তামগ্ন হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন তাঁর ক্যানভাসের দিকে। ছবিটা প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। সমুদ্রের ভিতর থেকে স্নান করে উঠছে ভেনাস, এরকম একটি থিম নিয়ে আঁকা হচ্ছে ছবিটা। ভেনাসের শরীর অবশ্য পুরো আঁকা হয়নি। কিন্তু যেটুকু ফুটে উঠেছে ছবির মধ্যে, তাতে বোঝা যাচ্ছে তার সুন্দর অনাবৃত দেহসৌষ্ঠব। সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই মন্দারের শরীরটা শিরশির করে উঠল। শিল্পীরা কেমন করে ঘরের মধ্যে সবার সামনে এসব ছবি আঁকেন তা সে বুঝে উঠতে পারে না। আসলে শিল্পীদের বাড়ির আবহাওয়া বোধহয় এরকম হয়। আর এজন্যই বোধহয় ডোনা অবলীলায় সাবানের বিজ্ঞাপনে নিজেকে প্রকাশ করে।

সেই সকাল থেকে নীলরং নিয়েই মগ্ন ছিলেন চিত্রদীপ। হঠাৎ তাঁর তুলি চুবিয়ে নিলেন লালরঙের মধ্যে। কখনও মন বিক্ষিপ্ত থাকলে কিংবা রাগ হলে তিনি লালরঙের মধ্যে ডুবে থাকেন। এখন হঠাৎ সমুদ্রের প্রান্তে দিগন্তরেখা ছড়িয়ে দিতে থাকলেন লাল রং। যেন সূর্য উঠবে এখনই, অথবা সূর্য এইমাত্র দিগন্তরেখা থেকে লাফ দিয়ে উঠে আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে রক্তাভ রশ্মি। সেই রশ্মি থেকে আবার প্রতিফলিত হচ্ছে লালাভা।

একটু পরেই কিচেন থেকে বনানী বেরিয়ে এলেন চায়ের কাপ হাতে। এ বাড়ির চায়ের কাপগুলি চমৎকার রঙিন হয়। এই কাপটার রং প্রায় চায়ের রঙের সঙ্গে মেলানো। প্লেটের রংও তাই। সব মিলিয়ে ভারি সুন্দর।

pathagar.net

সেন্টারটেবিলের উপর চায়ের কাপপ্লেট রেখে বনানী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ডোনার দেখা হয় না!

চায়ে চুমুক দিয়ে মন্দার চোখ তুলল, হয়। তবে এবার অনেকদিন হয়নি।

বনানী চুপ করে থেকে তারপর বললেন, তোমার হাতে বোধহয় এখন অনেক কাজ, তাই না?

—ঠিক তা নয়। তবে একটা বড় কাজের সন্ধান পেয়েছি। যদি টেণ্ডার অ্যাকসেপ্টেড হয়, তাহলে প্রায় চারমাস লেগে যাবে শেষ হতে।

—বাহ্! তা কত টাকার টেণ্ডার?

—অনেক। আমার অবশ্য অত টাকা নেই। তবু যদি কাজটার সিকিভাগও পাই তবে আপাতত আমার কোম্পানির একাট হিল্লে হয়ে যায়।

বনানী কিছু বলার আগেই বাইরে গাড়ি আসার শব্দ হল। একমুহূর্ত সেদিকে কান রেখে বনানী বললেন, ওই বোধহয় ডোনারা এল। তুমি একটু ডোনার উপর নজর রেখো। মেয়েটা বড্ড উড্ডু-উড্ডু হয়ে যাচ্ছে কেমন।

তার কথা শেষ না হতেই গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হল বাইরে। তারপর দরজা খুলে ফের বন্ধ করল কেউ। পরক্ষণেই ডোরবেল বেজে উঠল।

বনানী দরজা খুলতেই দেখলেন, বাইরে ডোনা আর শিহরণ। দুজনের হাতে দুটো বড় প্যাকেট। তাদের খেলার সরঞ্জাম। মন্দারকে দেখেই ডোনা বলে উঠল, হাই।

মন্দার হাসল। শিহরণ ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত মন্দারের দিকে তাকিয়ে বনানীকে বললেন, এই নাও। তোমার মেয়ে বোধহয় স্পোর্টসম্যান না হয়ে ছাড়ছে না।

শিহরণের কথার উত্তর না দিয়ে বনানী ডোনাকে বললেন, এই দ্যাখ্। মন্দার কতক্ষণ ধরে এসে বসে আছে। তার সঙ্গে আজকাল নাকি ওর দেখাই হয় না—

ডোনা ঠোঁট উল্টে বলল, দেখা আর হবে কী করে। হি ইজ নাউ অ্যা বিজি গাই। বিজনেস নিয়ে এত বিজি হয়ে পড়েছে—। তারপর শিহরণের দিকে তাকিয়ে বলল প্লিজ শিহরণদা, গাড়িটা একটু গ্যারেজ করে দেবে?

শিহরণ বাইরে চলে গেলে ডোনা এবার মন্দারের দিকে তাকায়, কাম ইন মিস্টার। তোমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া জমে আছে। তোমার তো আজকাল দেখা পাওয়াই ভার।

—আমার, না আমার?

ডোনা হেসে বলল, মা, একটু চা হবে। তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে—

মন্দার আর ডোনার ঝগড়ার রকম দেখে বনানী হাসতে হাসতে আবার কিচেনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

ডোনা তক্ষুণি বলল, চলো, আমার ঘরে যাই। এ ঘরে বেশিক্ষণ আড্ডা মারলে ড্যাডি রেগে ফায়ার হয়ে যায়। ড্যাডি ইজ নাউ অ্যা ভেরি বিজি আর্টিস্ট।

শেষ কথাগুলো ডোনা তার বাবার উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিয়ে মন্দারকে নিয়ে এল তার ঘরে।

ডোনার ঘরখানা আকারে খুব বড় নয়। কিন্তু বেশ সাজানো-গোছানো টিপ্-টপ। ঘরে একপাশে একটা সিঙ্গল খাট। তার উপর নরম গদির সঙ্গে চমৎকার ফুল-কাটা বেডকভার। ঘরের এককোণে ড্রেসিং টেবিল। অন্যকোণে শো-কেস। শো-কেসের ভিতর বইপত্তর, খাতা। শো-কেসের উপর একটা চিনেমাটির পরী। দেয়ালে চিত্রদীপের আঁকা একখানা বিশাল ছবি। হঠাৎ দেখলে অজন্তার স্টাইলের কথা মনে পড়ে।

pathagar.net

ঘরে ঢুকেই মন্দার বলল, তোমার বাবার একটা চিত্রপ্রদর্শনী হচ্ছে দেখলাম।

—হ্যাঁ, আজকের কাগজে বেরিয়েছে বিজ্ঞাপনটা।

একটু চুপ করে থেকে মন্দার বলল, 'এ টু জেড' থেকে স্পনশর করছে? কী করে আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে?

—ও, সে এক ইতিহাস। ভদ্রলোকের হঠাৎই দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে বাবার পেইন্টিংস। এখন সে চিত্রদীপ চ্যাটার্জির ব্লাইণ্ড অ্যাডমায়ারার বলা যায়। হঠাৎ বাবার সব ছবি কিনে নিচ্ছে পটাপট। এখন একটা একজিবিশন করবে। তাছাড়া আরও একটা বড় খবর—

কী?

—'এ টু জেড'-এর অনেকগুলো শো-রুম খুলছে কলকাতায়। ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স। তার সমস্ত লে-আউট ড্যাডিকেই করতে হচ্ছে। সে প্রচুর কাজ।

মন্দার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, তারপর বলল, তাহলে অলর্ক বোসের সঙ্গে তোমার ড্যাডির এখন খুব ক্লোজ রিলেশন্?

—ভেরি ক্লোজ।

একটু পরে ইতস্তত করে মন্দার বলল, 'এ টু জেড' থেকে তাদের সমস্ত শো-রুমের ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনের জন্য টেণ্ডার কল করেছে। বেশ মোটা টাকার টেণ্ডার। আমার কোম্পানি তাতে কমপিট করছে—

—তাই নাকি? ডোনা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল, ভারি ইন্টারেস্টিং তো।

—খুব একটা ইন্টারেস্টিং নয়। কারণ ওরা যা যা শর্ত দিয়েছে, আমার কোম্পানি তা ফুলফিল করতে পারছে না।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন?

—এ টু জেড বলেছে যে-সব কোম্পানি এর আগে এককোটি টাকার ব্যাবসা করেছে কেবল তারাই টেণ্ডারে পার্টিসিপেট করতে পারবে। কিন্তু আমার কোম্পানি এ পর্যন্ত সাড়ে সাতানব্বই লক্ষ টাকার কাজ পেয়েছে, মাত্র আড়াই লক্ষের জন্য আমার 'ইন-ডেক' টেণ্ডার পাচ্ছে না।

—ইস্, তাই নাকি!

হুঁ, তার জন্য তোমার কিছু কনট্রিবিউশনও রয়েছে।

ডোনা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইল মন্দারের দিকে, বলল, আমার কনট্রিবিউশন?

—হুঁ, সেবার গুপ্তিপাড়ায় আউটিঙে যাবার ফলে দুটো টেণ্ডার আমি মিস করেছি, যার পরিমাণ প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। তোমাকে বলেছিলাম তখন, মনে পড়ে?

ডোনা স্তম্ভিত হয়ে গেল কথাটা শুনে। একটু পরে বলল, তখন তাহলে না গেলেই পারতে?

—তখন তো ভাবিনি, একদিনের জায়গায় তিনদিন ডেটেইনড্ হয়ে যাব।

—সেটা তো হতেই পারে। বাইরে বেরোলে ফেরার কোনও নিশ্চয়তা থাকে নাকি?

মন্দার আমতা আমতা করল একটু, না, তা নয়। তবে বুঝিনি, হঠাৎ ডিটেনইড্ হয়ে যাব।

—না কি, আমাকে পাওয়ার লোভটা সামলাতে পারনি?

ডোনা হঠাৎ এভাবে উল্টে চার্জ করবে তা ভাবতে পারেনি মন্দার। থতমত খেয়ে বলল, সে কথা এখন থাক।

—তাহলে তোমার ক্ষতিটা আমি এখন কীভাবে কমপেনস্ট করতে পারি?

pathagar.net

এতক্ষণে উৎসাহিত হল মন্দার। তার চোখে চকচক করে উঠল একটা প্রত্যাশা। বলল, তোমার ড্যাডির সঙ্গে অলর্ক বোসের যখন খুব দহরম মহরম, উনি যদি একবার আমার নামটা রেকমেণ্ড করে দ্যান, তাহলে টেণ্ডারটা আমি পেতে পারি। বিরাট টাকার টেণ্ডার।

ডোনা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। খানিকক্ষণ পর মুখটা কালো হয়ে গেল তার। সে যেন এইমুহূর্তে এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছে।

মন্দার আবার বলল, কাজটা যদি আমি পাই, তাহলে 'এ টু জেডে'র সুবিধেই হবে। টেণ্ডারে বলা আছে, যে শিল্পী এই শো রুমগুলোর লে-আউট করছেন, তাঁর নির্দেশেই ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনের কাজ করতে হবে।

ডোনা আস্তে আস্তে বলল, ড্যাডি কি রেকমেণ্ড করতে রাজি হবেন?

মন্দার থমকে গেল হঠাৎ। ডোনার মুখ থেকে এ ধরনের উত্তর পাবে তা যেন সে আশা করেনি। হঠাৎ সাগ্রহে বলল, এ বাড়িতে অলর্ক বোস কয়েকবার এসেছেন নিশ্চই।

—এসেছেন।

—তোমার সঙ্গে আলাপ হয়নি?

—হয়েছে।

সাগ্রহে মন্দার বলল, তাহলে তুমি বলে দিলেই তো কাজটা আমি পেতে পারি। চল না, কাল সন্ধেবেলা আমি ফ্রি আছি, এবার দু'জনে মিলে ওঁর কাছে যাই।

ডোনা তার নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে, বলল, কাল সন্ধ্যায় আমি ফ্রি নেই।

—কেন, কোথাও যাচ্ছ?

—আমার কাল একটা শুটিং আছে।

—শুটিং? কীসের, ছবিতে অভিনয় করছ নাকি?

—না, মডেলিঙের। হঠাৎ একটা দারুণ অফার পেয়েছি। একদিন শুটিংয়ের জন্য বারো হাজার টাকা দিচ্ছেন আমাকে।

—বারো হাজার?

—এই রেটটা নাকি এখন কলকাতার শ্রেষ্ঠ এবং ব্যস্ততম নায়িকা নিয়ে থাকে মডেলিং করতে।

মন্দারের মুখটা কালো হয়ে এল, ও, তা কে ঠিক করে দিলেন? তোমার ওই শিহরণদা নাকি?

ডোনা হঠাৎ হাসল, একেবারে রহস্যময়ী মতো। তার চিলতে হাসির স্রোত মন্দারকে বিমূঢ় করে বসিয়ে রাখে ডোনার ঘরের ভিতর।

চোদ্দো

শিহরণ রায়চৌধুরী নয়, ডোনাকে এবারের মডেলিঙের অফার দিয়েছে 'এ টু জেড' কোম্পানির কর্মধার অলর্ক বোস। ডোনার রূপ, সৌন্দর্য, স্মার্টনেস সে ব্যবহার করতে চায় তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনে। তার নতুন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলি যেমন কলকাতার বুকে এক অন্য চমক হবে, তেমনি ডোনার উপস্থিতি হবে ফ্যাশনের যুগে এক অন্য থ্রিল। যেখানেই 'এ টু জেড' এর বিজ্ঞাপন থাকবে, সেখানেই ডোনার ছবি। ডোনা হবে 'এ টু জেড' এর এক্সক্লিউসিভ গার্ল।

pathagar.net

রীতিমতো মড গার্লের সাজে নিজেকে সাজিয়ে তাদের নতুন কেনা গাড়িটি ড্রাইভ করে স্টুডিওতে চলে এল ডোনা। ঠিক দশটায় তার আসার কথা, কাঁটায় কাঁটায় নটা উনষাটে পৌঁছে গেল আনোয়ার শাহ রোডের উপর ছোট্ট স্টুডিও 'ফোটোজেনিক' এর সামনে। গাড়ি পার্ক করে যখন স্টুডিও-র দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল, তখন সেখানকার ঘড়িতে ঠিক দশটা। সামনের ঘরে অলর্ক আগেই এসে অপেক্ষা করছিল, ডোনাকে দেখে তার দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে হাসি বিস্মৃত করে বলল, দিস ইজ পাঞ্চুয়ালিটি।

স্টুডিওটি বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার নারাণ ঘোষের। বাইরে থেকে দেখতে যত ছোট মনে হয় স্টুডিওটা, ভিতরটা সেরকম নয়। দরজা ঠেলে ঢুকেই একটা বসার ঘর, তিন-চারখানা বড় সোফা রাখা একদিকে, অন্যদিকে শো-উইণ্ডোতে নারাণ ঘোষের তোলা বিখ্যাত সব সিনেমাভিনেত্রী আর মডেলদের ছবি। বড় বড় কাট্-আউট। ছবিগুলো দেখলেই বোঝা যায়, নারাণ ঘোষের ফোটোগ্রাফির হাত দুর্দান্ত। তাঁর ক্যামেরার কল্যাণে অভিনেত্রী বা মলেরা প্রায় জীবন্ত হয়ে বসে আছে শো-উইণ্ডোর ভিতর। এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর মেয়ের ছবিও শোভা পাচ্ছে সেখানে। দারুণ সেক্সি-পোজের। সেই ছবিটির দিকে ডোনার চোখ কয়েক সেকেণ্ড বেশি থমকে গেল নিজের অজান্তেই।

—খুব সেজেছেন দেখছি আজ, অলর্ক তার স্বভাব-সিদ্ধ সারল্য বলে উঠল। তার মুখ ছড়িয়ে পড়ে সেই অসাধারণ, সরল, বিস্ময়-মাখানো হাসি।

ডোনা সামান্য হাসল তাতে। প্রায় বিদেশিঢঙের ঝকমকে স্কার্ট-ব্লাউজ তার পরনে, চুল হর্সটেল করে বাঁধা, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, চোখে কালো চশমা। হঠাৎ দূর থেকে দেখলে তাকে মেরিলিন মনরো বলেও ভাবা যেতে পারে। প্রায় সেরকমভাবে সেজে এসেছে যাতে 'এ টু জেড' এর বিজ্ঞাপনে দারুণ চনমনে দেখায় তাকে। কিন্তু অলর্ক বলল, তোমাকে কিন্তু পুরোপুরি বাঙালিকন্যার সাজেই দাঁড়াতে হবে ক্যামেরার সামনে। বাঙালিকন্যা শব্দটা কেমন অদ্ভুত শব্দে বেজে উঠল ডোনার কানে। অনিবার্যভাবেই তার চোখ চলে গেল ঘরের কোণে রাখা বিশালসাইজের আয়নাটার দিকে,সেখানে এই মুহূর্তে ওই শব্দটির ঠিক বিপরীত অবস্থানে সে দাঁড়িয়ে। অলর্কের দিকে সামান্য বিস্মিতচোখে তাকিয়ে এবার সে তার চোখ থেকে রহস্যময় কালো চশমাটি খুলে ফেলল।

স্টুডিওর সময় চলে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। নারাণ ঘোষ এখন এই শহরের ব্যস্ততম ফোটোগ্রাফার। প্রতি আটঘন্টার জন্য তাঁর স্টুডিওর ভাড়া হাজার ছয়েক। কলকাতার বিখ্যাত সিনেমা ম্যাগাজিন, ফ্যাশন ম্যাগাজিনের প্রতি সংখ্যায় তাঁর ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রকাশিত হয়। অনেক মডেল নারাণ ঘোষের ক্যামেরা ছাড়া অন্য কারও ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতেই রাজি হল না। এহেন নামী ক্যামেরাম্যান ডোনার সামনে এসে চটপট তাড়া দিলেন, নিন, মেক-আপ রুমে বসে যান। কুইক।

মেক-আপ রুমে নামী বিউটিশিয়ান বেবি মিত্র দশটার আগেই তাঁর সঙ্গিনীদের নিয়ে হাজির হয়েছেন। মাত্র ঘন্টাখানেকের মধ্যে মেরিলিন মনরোকে এক আশ্চর্য কৌশলে তিনি বানিয়ে ফেললেন জয়াপ্রদার মতো এক মিষ্টি তরুণীতে। মেক-আপ রুমে বসেই ডোনা বুঝতে পারল, কেন অলর্ক সেদিন তাদের বাড়িতে গিয়ে তার ব্লাউজের মাপ জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন ডোনা ঠিক বুঝতে পারেনি, অলর্ক তার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে, না কি সে সত্যিই সরল আর বোকা। এখন বেবি মিত্র যখন তাকে মেক-আপ করে ম্যাচিং শাড়ি-ব্লাউজ সাজিয়ে বাইরে বার করে

আনল, তখন ডোনা নিজেকে আর চিনতেই পারল না। ফুল সাইজের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

— বিউটিফুল, অলর্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে তার ভাল লাগাটিকে মাত্র একটি শব্দে প্রকাশ করে ফেলল।

ডোনা নিজেও ভাবতে পারেনি, গাড় উজ্জ্বল আগুনরঙের শাড়ি-ব্লাউজ এহেন আগুন পারা রূপে উদ্ভাসিত করে তুলবে তাকে। সে বড় হওয়া ইস্তক শালোয়ার-কামিজ, স্কার্ট-ব্লাউজ, শার্ট-প্যান্ট-জিনসে অভ্যস্ত। শাড়ি পরে জবরজঙ হয়ে রাস্তায় বেরোনো, বাসে-ট্রামে ওঠা, এর-বাড়ি ওর-বাড়ি যাওয়া তার কাছে অসহনীয়। এখানকার যুগে শাড়ির ব্যবহার যে কতখানি অসম্ভব, এ নিয়ে তার কলেজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কতবার আলোচনা করেছে। তার মা বনানী তাকে কোনও উৎসবে কিংবা পার্টিতে শাড়ি পরবার জন্য জেদাজেদি করলেও সে অনায়াসে রিফিউজ করেছে। বলেছে, শাড়ি হচ্ছে তোমাদের জেন্যারেশনের মহিলাদের জন্য। এখনকার দিনে শাড়ি একেবারেই ব্যাক-ডেটেড। অথচ এখন তাকে কিনা সেই শাড়িতেই—

অলর্ক হাসি-হাসি মুখে বলল, শাড়ি পরলেই যে বাঙালি মেয়েকে সবচেয়ে সুন্দরী দেখায়, তা তোমাকে দেখে আরেকবার বুঝতে পারছি, ডোনা।

ডোনা নিজেকে দেখে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল। অলর্কের কমপ্লিমেন্ট শুনে হেসে বলল, থ্যাঙ্কস্।

ততক্ষণে নারায়ণ ঘোষ প্রস্তুত হয়ে গেছেন তাঁর ক্যামরার সামনে। বারবার আলো জ্বালিয়ে, আলো নিভিয়ে অ্যাডজাস্ট করছেন লাইট। একবার ডোনাকেও দাঁড় করালেন ক্যামেরার সামনের ছোট্ট বেদিটার উপর। ডোনার স্কিন কতটা আলো নেবে তা নিয়ে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন।

আগের বারে সাবানের বিজ্ঞানের জন্য ডোনাকে যখন অনেক খোলামেলা হয়ে বাথটাবে নামতে হয়েছিল, তখন তার শরীরে যে ধরনের থ্রিল হয়েছিল, আজ শাড়ি পরিহিতা হয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো তার চেয়ে কিছু কম উত্তেজনাকর নয়। ডোনা বোধহয় তার জীবনে এই প্রথম জানল, শাড়ি পরলেই তাকে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী দেখায়।

ডোনার স্কিনে কতটা আলো লাগবে যে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর নারাণ ঘোষ বললেন, ও কে, এবার তাহলে টেক্ শুরু হবে।

ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ডোনার ঠিক কী কী পোজের ছবি হবে তা অলর্ক আগে থেকেই ব্রিফ করে রেখেছিল নারাণ ঘোষকে। ঠিক সেইমতো স্টুডিওর ভিতর দৃশ্যপট তৈরি শুরু হয়ে গেল। ডোনা অবাক হয়ে দেখল, তার বাবা চিত্রদীপের আঁকা সমুদ্রের একটি বিশাল ছবি ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসেবে দাঁড় করানো হল বেদির উপর। সেদিকে কোণাকুণি মুখ রেখে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ডোনা। মন্ত্রোচারণের ভঙ্গিতে নড়তে থাকবে তার ঠোঁটদুটো। একটু আগেই ডোনা জেনেছে, বীরভঙ্গপুরের সম্পত্তির ব্যাপারে খুব টেনশনে আছে অলর্ক। তার জীবন বিপন্ন কে বা কারা নাকি প্রতিনিয়ত খুনের হুমকি দিয়ে চলেছে তাকে। তবু কী আশ্চর্য, এত ঝড়ঝামেলার মধ্যেও কী নিস্পৃহভাবে, কোনও উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করেই তার প্রতিটি কাজ করে চলেছে নিখুঁত ছক অনুযায়ী।

প্রায় চিত্রপরিচালকদের মতো এক-একটি দৃশ্য রচনা করেছে অলর্ক। ফোটোগ্রাফার এবং মডেল, দুজনকেই তার ভাবনার হদিশ বুঝিয়ে দিচ্ছে যাতে ক্যামেরায় ঠিক-ঠিক ধরা পড়ে

pathagar.net

ডোনার অভিব্যক্তি। নারাণ ঘোষ অনেকদিনের দক্ষ ফটোগ্রাফার, একটু বলতেই তিনি বুঝে নেন কোথায় বসাতে হবে তাঁর ক্যামেরা, পিছনের দৃশ্যপটই বা কীভাবে সাজাতে হবে। মডেলই বা কোন অ্যাঙ্গেলে মুখ করে কীভাবে দাঁড়াবে ক্যামেরার সামনে। মডেল হিসেবে ডোনা প্রায় নতুনই। তবু সে তার তুখোড় স্মার্টনেস দিয়ে চেষ্টা করছে অলর্কের চাহিদা অনুযায়ী অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে। এ দফায় মোট পাঁচটি ছবি তোলা হবে, এক একটি ছবি তুলতেই লেগে যাচ্ছে একঘন্টা কখনও দু-ঘন্টাও। শোরুমগুলির এক-একটির দৃশ্যপট এক-একরকম। বিজ্ঞাপনের ছবির দৃশ্যপটও সেভাবে বলতে যাচ্ছে প্রতিবারে। তার সঙ্গে আরও চমক হল এই যে, প্রতিবারেই ডোনার জন্য নতুনরঙের নতুন ধরনের শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া চলে আসছে। আর বেবি মিত্র প্রত্যেকবার তার মুখের মেক-আপ বদলে তাকে নতুন এক-একটি তরুণ হিসেবে হাজির করছেন ক্যামেরার সামনে।

মাঝে আধঘন্টার জন্যে ফুরসত পেতে ডোনা তারিফ জানাল অর্লককে, আইডিয়াগুলো দারুণ।

অলর্ক হাসল, শুধু ফটো দেখেই সব কিছু বুঝতে পারা যাবে না। যখন কাগজে ছাপার জন্য পুরো লে-আউট তৈরি হবে, তখন আরও সব চমক থাকবে। অ্যাডভার্টাইজিঙের পুরানো ধ্যানধারণা ভেঙে নতুন ঘরানা আনতে চাই।

—মডেল হিসেবে ছবি তুলতে এসে আমারই যা চমক লাগছে, তাতে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাস্টমারের কত যে চমক লাগবে তা বুঝতে বাকি নেই আমার। আমার ধারণা ছিল, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যখন বিদেশি সাজানো হচ্ছে, তখন মডেলও নিশ্চয় বিদেশিনির সাজে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে। হয়তো আমাকে কিছু বোল্ট পোজে ছবি তোলাতে হবে এমন ভেবে রেখেছিলাম।

মাথা নাড়ল অলর্ক, আমার আইডিয়া ঠিক তার উল্টো। কলকাতার শো-রুমগুলো বিদেশি স্টাইলে করছি এই কারণে যে, তাতে এ দেশে থেকেও অন্য দেশের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ঢোকার অনুভূতি পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার কাস্টমাররা তো সব এদেশি, অতএব মডেলকে হতে হবে দেশীয় ঘরানার। তাকে দেখেই তো কাস্টমারদের শো-রুমে ঢোকার সাহস বাড়বে।

আধঘন্টার অবসরে কিছু চা ও স্ন্যাক্সও এল। নারাণ ঘোষ এ সব লাইন ভারি সমঝদার লোক। ডোনাকে তিনি আগে কখনও দ্যাখেনি। চা খেতে খেতে অলর্ককে বললেন, আপনি যে মডেলটি এনেছেন, তিনি নতুন হলেও ভারি ট্যালেন্টেড। ভবিষ্যতে খুবই সাইন করবে।

ডোনা চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে বলল, থ্যাঙ্ক ইউ, মিঃ ঘোষ।

নারাণ ঘোষ আবার বললেন, আমার কাছে অনেক ক্লায়েন্ট আসে তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য নতুন মুখ খুঁজতে, আমি কি তাদের কাছে ডোনা চ্যাটার্জির নাম রেকমেণ্ড করতে পারি?

ডোনা অবাক হল, খুব খুশিও হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে আরও অবাক করে দিয়ে অলর্ক বলে উঠল, নট নাউ মিঃ ঘোষ। ডোনা ইজ নাউ ওনলি ফর 'এ টু জেড'। পরপর অনেকগুলো ডেট ডোনার জন্য ব্যয় করতে হবে আপনাকে। এখন থেকে 'এ টু জেড'এর যত বিজ্ঞাপন বেরোবে, সবগুলোতেই ডোনার ছবি থাকবে, সি উইল বি এক্সক্লুসিভ ফর 'এ টু জেড'।

নারাণ ঘোষ তাঁর জহুরি চোখ নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন ডোনার দিকে, তারপর আরেকবার ঘাড় নেড়ে তারিফ করলেন, ইয়ে, এ গুড্ চয়েস।

pathagar.net

সেদিন স্টুডিও-র কাজ মিটিয়ে বাইরে বেরোতে সন্ধে উতরে গেল। অলর্ক প্রতিবার শটের পর উদ্ভাসিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই, একজ্যাকটলি, যা চেয়েছিলাম সেরকমই পোজ দিয়েছ, ডোনা। লাজুক হওয়ার দৃশ্যে লজ্জবতী লতা, অহংকারী হওয়ার দৃশ্যে এ প্রাউড গার্ল। যখন নববধূর সাজে, তখন তোমাকে বিয়ের কনে ছাড়া আর কিছুই ভাবা যাচ্ছিল না।

স্টুডিও থেকে বাইরে বেরোতেই বলল, পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে?

—নো থ্যাঙ্কস্। বলে ডোনা তার গাড়ির দরজা খুলে স্টিয়ারিঙে বসল। তারপর অলর্ককে ফের মেরিলিন মনরোর মতোই হাসিতে ভিজিয়ে বলল, আজ চলি।

—এক মিনিট প্লিজ, অলর্ক দৌড়ে স্টুডিওর ভিতরে গেল। এক মিনিটও লাগল না, তার নির্দেশে স্টুডিওর এক কর্মী বয়ে নিয়ে এল বিরাট একটা প্যাকেট, প্যাকেটে একরাশ সাড়ি-শায়া-ব্লাউজ, যেগুলো এতক্ষণ পরে ডোনা ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়েছে।

ডোনা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, এগুলো আবার কেন? আমি কিন্তু একেবারেই শাড়ি ইউজ করি না।

অলর্ক তার মুখমন্ডল দীর্ঘ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত করে বলল, এবার থেকে পরবে! শাড়ি পরলে তোমাকে যে কী চমৎকার দেখায় তা নিশ্চয় আজ আবিষ্কার করেছ। নারাণ ঘোষের তোলা ফোটোগুলো দেখতে দেখতে তা সবাই জানতে পারবে আরও।

ডোনা স্মিতহাসিতে ভরিয়ে ফেলল তার শরীর, থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার।

পরক্ষণেই ডোনাকে অবাক করে দিয়ে অলর্ক বলল, বাট হু ইজ মন্দার?

ডোনা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর হেসে বলল একজন ভাগ্যান্বেষী যুবক।

তেমনই হাসি-হাসি মুখে অলর্ক বলল, এবার থেকে ডোনা কিন্তু একমাত্র অলর্কেরই, এক্সক্লুসিভ টু অলর্ক বোস।

ডোনা অবাক হয়ে তাকাল অলর্কের দিকে। দেখল, অলর্কের শ্মশ্রুগুম্ফময় মুখে খেলা করছে এক দৃঢ় প্রত্যয়। দু-চোখে প্রগাঢ় চাউনি। সে দৃশ্য তার শরীরে সহসা কী এক শিরশিরানি স্রোতের মতো পাক খেয়ে গেল যেন।

একরাশ উত্তেজনা, উল্লাস আর একটুকরো বিস্ময় বুকে নিয়ে সেদিন অনেকটা রাত করে ঘরে ফিরল ডোনা। চমৎকার স্বপ্নের মতো একটা দিন তার জীবনে কেটে গেল আজ। উচ্ছ্বাসে ভরা নীল টইটম্বুর স্বপ্ন। গেটের কাছে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতে নামতে সে অবাকও হচ্ছিল। তাহলে মন্দার সম্পর্কে জেলাস হচ্ছে অলর্ক। খুবই অদ্ভুত আর আশ্চর্য লাগছে তার। অপ্রত্যাশিত যেন। প্রেমে পড়লেই এ ধরনের জেলাস হয়ে ওঠে মানুষ। তাহলে অলর্ক নিশ্চই তার প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কখন তার প্রেমে পড়ল অলর্ক! আজই কি! না কি সেই প্রথম দিনেই! যেদিন তার ছবি দিয়ে সাবান-কোম্পানির বিজ্ঞাপনটা বেরিয়ে ছিল। তাহলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট!

উত্তেজনায় থরথর হয়ে ডোনা তাদের বাড়ির দরজার সামনে এসে দেখল, কী কারণে যেন দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকতেই দেখে, বনানী ক্রুদ্ধা বাঘিনির মতো শিহরণদার সঙ্গে ঝগড়া করছেন। বলছেন, তুমি এরকম লম্পট, দুশ্চরিত্র, তা জানতাম না।

শিহরণও বলছেন, তুমিও কিসে কম যাও। এ ব্রুট ক্যারেকটারলেশ উওম্যান। তোমাকে কি আমার চিনতে বাকি আছে?

বনানী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, এখনও পুরোপুরি চেনোনি আমাকে। তোমাকে এমন শাস্তি দেব—

ডোনার দিকে চোখ পড়তেই সহসা থেমে গেলেন বনানী।

pathagar.net

পনেরো

সংবাদপত্রের পঞ্চম পৃষ্ঠায়, যে পৃষ্ঠাটিতে পাঠকরা সাধারণত চোখ রাখে সারাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবরগুলির টুকিটাকির সন্ধানে, সেখানে একেবারে ডানদিকে পুরো তিনকলম জুড়ে ছাপা হয়েছে বিজ্ঞাপনটা। প্রথমে বেশ বড় বড় অক্ষরে : এ টু জেড ইজ কামিং টু ক্যালকাটা। তার নিচে আরও একটু ছোট লেটারিং-এ : ফ্রম প্যারিস উইথ লাভ, ফ্রম নরওয়ে উইথ বিউটি, ফ্রম ভেনিস উইথ নেটার, ফ্রম নিউইয়র্ক উইথ প্যাশন, ফ্রম লণ্ডন ইউথ থ্রিল।

তার ঠিক নিচে ডোনার হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ। সুন্দরী বাঙালি ললনা বলতে যা বোঝায়, ডোনার ফোটোটি এখানে ঠিক সেরকমই।

বিজ্ঞাপনটা এমন গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে, এতবড় করে, আর এমন চমক দিয়ে যে, কেউই সেটি এড়িয়ে যেতে পারবে না। ডোনা সকালের খবরের কাগজ দেখেই বুঝে নিয়েছে, সে এই বিজ্ঞাপনটির পর রীতিমতো বিখ্যাত হয়ে পড়বে।

'এ টু জেডে'র সেই এক্সক্লিউসিভ গার্ল ডোনা চ্যাটার্জি কিন্তু এখন নিতান্ত নিরীহ মুখে হন হন করে হেঁটে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর দিয়ে। তার চলনে স্পষ্টতই ব্যস্ততা। দ্রুত পায়ে সে এগোচ্ছিল তাদের তুলনামূলক সাহিত্যের-দপ্তরের দিকে, হঠাৎ তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল অনিল কাপুরের মতো মুখে-ক'দিনের খোঁচা-খোঁচা দাড়ি নিয়ে এক যুবক, মুখ হাঁ-করে বলল, তুই কি ডোনা?

ডোনা মুখে সামান্য বিরক্তি দেখিয়ে বলল, ফাজলামি করিস না ঋজু, পথ ছাড়। ঋজুরেখ নামের যুবকটি তবুও পথ ছাড়ে না, বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বলল, তুই সত্যিই ডোনা?

—কেন, অন্য কেউ বলে মনে হচ্ছে?

—না, মানে, এরকম বেশে তোকে কখনও দেখিনি তো, যাকে বলে ফ্যান্টাস্টিক, তাইই—

ডোনা হেসে ফেলল। সে আজ কচি কলাপাতা রঙের একটা সিফন শাড়ি পরেছে। সঙ্গে ম্যাচিং ব্লাউজ। দৃশ্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অবাক করে দেওয়ার মতোই বটে। যে ডোনা এই ক্যাম্পাসটিতে নতুন ডিজাইনের পোশাকের বিপ্লব ঘটায় রোজ-রোজ, সে কিনা আজ সনাতন বাঙালিয়ানার পোশাক শাড়ি-ব্লাউজে ভূষিত করেছে নিজেকে!

—কেন, পরতে নেই নাকি?

—নাহ্, পরতে থাকবে না কেন? বরং শাড়ি পরে তোকে যা সুন্দরী দেখাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এক্ষুনি তোকে ইলোপ করে পালিয়ে যাই।

—যাহ্, ডোনা ভ্রূকুটি করে হাসল।

—হ্যাঁ রে, তোকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে। আজ কাগজে একখানা দারুণ ছবি বেরিয়েছে তোর।

ঋজুরেখর হাত থেকে কোনও ক্রমে নিষ্কৃতি নিয়ে পালাতে চাইল ডোনা। বেশ খুশি-খুশি লাগছে তার। খানিক এগোতেই দেখা হয়ে গেল গার্গীর সঙ্গে, তৎক্ষণাৎ চ্যাঁচিয়ে উঠল, হাই।

—কী ব্যাপার, এমন হন্তদন্ত পায়ে কোথায় চলেছিস?

—বুঝলি গার্গী, আজ আমাদের দপ্তরি থেকে এম. আরকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে।

—হঠাৎ? তুই বুঝি তুই এমন শাড়িটাড়ি পরে—। তা অকেশানটা কী?

—আমাদের দপ্তরে একটা রিডারের পোস্ট খালি হয়েছিল। পরশু সে পোস্টে মণীশ রায়কে প্রোমোশন দিয়েছেন ভি.সি.।

pathagar.net

—তাই? তোদের এম. আর-এর সময় এখন তাহলে ভাল যাচ্ছে, বল?

—যাচ্ছেই তো। ওঁর ফ্যানের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল কয়েকগুণ। যাবি নাকি?

—আমার একটা ক্লাস ছিল যে।

—অফ করে দে ক্লাসটা। চল না, দেখবি মেয়েগুলো এম. আরকে নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করবে। সম্বর্ধনার নাম করে এম. আরকে যদি একটু ছুঁতেটুতে পারা যায়। মেয়েরা দল বেঁধে ফুলের মালা, বোকে সব আনতে ছুটেছে। কেউ গানের মহড়া দিচ্ছে সকাল থেকে। কেউবা আবার দাম প্রেজেন্ট্স কিনে আনছে।

গার্গী তার কব্জিতে চোখ রেখে সময় দেখে নিয়ে বলল, চল তাহলে। এই রগড়গুলো দেখতে আমি বেশ পছন্দই করি। কিন্তু তাহলে তোদের আর.ডি.-র পজিশন বেশ খারাপ হয়ে গেল রে।

—সাংঘাতিক পরশু খবরটা পাওয়ার পর সেই যে প্রফেসরস রুম থেকে বেরিয়ে গেছেন, আর ফেরেননি। শোনা যাচ্ছে চাকরিই ছেড়ে দেবেন নাকি। ডোনার বলার ভঙ্গিতে গার্গী হেসে ফেলল।

—তারপর তোর অলর্ক বোসের খবর কী রে? গার্গী আজকাল ডোনার সঙ্গে দেখা হলেই অলর্ক বোসের হালচাল, গতিবিধি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করে। ডোনা যে ইতিমধ্যে অলর্ক বোসের কাছ থেকে জেনেছে, হরিশংকর চৌধুরী অলর্ককেই দায়ী করেছে রানিমাকে খুনের ব্যাপারে, সে খবরটাও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিল গার্গী। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, সাংবাদিকটি ভুয়ো পরিচয়েই গিয়েছিল বীরভঙ্গপুরে। এখন ডোনার কাছ থেকে সব শুনে বুঝে ফেলল, তার অনুমান সঠিক। কিন্তু অলর্কই সেই লোকটিকে পাঠিয়ে খুন করেছে, হরিশংকর চৌধুরীর এহেন অভিযোগ শুনে দোনামনা হল। বুঝতে পারল না, এমন একটা ভয়ঙ্কর অভিযোগের কথাটা অলর্ক বললই বা কেন ডোনাকে!

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতেই নাকি!

দু'জনে একটু পরেই পৌঁছে গেল দোতলায়, কমপ্যারেটিভ লিটারেচার ডিপার্টমেন্টে। গিয়ে দেখল, বেশ ভিড় জমে গেছে দপ্তরের চারপাশে। যথারীতি অন্য দপ্তরের মেয়েরাও এসে জুটেছে সম্বর্ধনার আয়োজন করতে। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। অন্য দপ্তরের মেয়েরাই কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেছে ডোনাদের ক্লাসের মেয়েদের হটিয়ে দিয়ে।

ডোনা হেসে বলল, দেখেছিস মজাটা?

—কিন্তু এম. আর. কোথায়?

—এম. আর. তো ঘেরাও হয়ে বসে আছেন। এখন তাঁর চারপাশে অজস্র হুরীপরীদের ভিড়, তাদের নাগাল এড়িয়ে এম. আর.-এর দেখা পাওয়া অসম্ভব।

কিন্তু ভিড়ের মধ্যে থেকে মণীশ রায় ঠিকই দেখতে পেলেন ডোনাকে। দূর থেকে হাত নেড়ে ডাকলেন, ডোনা।

ডোনাকে আজ সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। শুধু যে শাড়ি পরেই আজ বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয়, আজ খবরের কাগজের পৃষ্ঠায়ও সে দ্রষ্টব্যবস্তু। ভিড় ঠেলে গার্গীকে নিয়ে মণীশ রায়ের কাছে পৌঁছেই ডোনা বলল, কনগ্র্যাটস, স্যার।

মণীশ রায় হেসে বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ। তবে আজকের এই সম্মানপ্রাপ্তিতে পরোক্ষে হলেও তোমার কিছু কনট্রিবিউশন আছে, ডোনা।

pathagar.net

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, কেন, স্যার?

—সেদিন সেমিনারে আমরা যে প্রবন্ধগুলো পড়েছিলাম, সেগুলো নিয়ে একটা বই বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তার সঙ্গে শ্রোতাদের বক্তব্যও টেপ থেকে তুলে নিয়ে হুবহু ছাপা হয়েছে। সেখানে শিহরণ রায়চৌধুরীর বক্তব্যও ছেপেছে ওরা।

—তাই নাকি? বইটা দেখতে হবে তো।

—শিহরণ আমার বক্তব্যকে সাপোর্ট করেছে বলে, আয়্যাম গ্রেটফুল টু হিম। তার বক্তব্য আমার প্রোমোশন পেতে সাহায্য করেছে।

ডোনা হাসি-হাসি মুখে বলল, আমি শিহরণদাকে আপনার কথা জানিয়ে দেব, স্যার।

—আমি ভাবছি, একদিন তোমাদের বাড়ি গিয়ে ওঁকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আসব।

উৎফুল্ল হয়ে ডোনা বলল, তাহলে তো খুব ভাল হয়, স্যার। আমার মা-ও তো আপনার কন্‌টেম্‌পোরারি ছিলেন শুনেছি। মা-ও খুব খুশি হবে। তবে শিহরণদা আজই সকালে দিল্লি চলে গেলেন কী একটা জরুরি কাজে। ফিরতে ফিরতে দিনসাতেক লাগবে। ঠিক ওই সময় আবার আমার বাবার একটা প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে তাঁর নতুন ছবিগুলো নিয়ে। আপনি যদি একেবারে প্রদর্শনী দেখতে চলে আসেন, তাহলে প্রদর্শনী-ও দেখা হবে, শিহরণদার সঙ্গেও কথাবার্তা হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাগজে দেখছিলাম বটে। তোমার বাবার ছবি নিয়ে একেবারে অভিনব প্রদর্শনী হচ্ছে কোথাও।

—ঠিক তাই স্যার। অভিনবই বলা যায়, কারণ প্রদর্শনীটা হচ্ছে কোনও প্রচলিত গ্যালারিতে নয়, একটা অদ্ভুতদর্শনের বাড়ির ভেতর, যার ভেতর বাইরে পুরোটাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো পুরানো ধরনের।

—বাহ্, সত্যিই অদ্ভুত। যেতে হবে তো।

মণীশ রায় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হঠাৎ দপ্তর থেকে ছুটতে ছুটতে এল একজন বেয়ারা, ডোনাকে বলল, ফোন আছে, আপনার, খুব জরুরি।

ডোনা খুবই আশ্চর্য হল। কলেজে হঠাৎ তার কাছে কে ফোন করবে, এত জরুরিই বা কেন, বুঝে উঠতে পারল না। এর আগেও অবশ্য বনানী কিংবা চিত্রদীপ কখনও দরকার মতো তাকে ফোন করেছেন। কিন্তু আজ তো মাত্র কিছুক্ষণ আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছে সে!

ডোনা দ্রুতপায়ে প্রফেসরস' রুমে গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশে বনানীর গলা, ডোনা? যাক, তোকে পেয়ে গেলাম ফোনে। এদিকে ভীষণ একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছিল। আমি একটা নার্সিংহোম থেকে কথা বলছি। রডন স্ট্রিটের কাছেই নার্সিংহোমটা। মন্দার হঠাৎ ভীষণভাবে ইনজিওরড হয়েছে। তুই শিগগির চলে আয়। মাথা ফেটে—

ডোনা উদ্বিগ্ন হল, সে কী? কী করে হল? কোথায় বললে নার্সিংহোমটা?

বনানী একটা ঠিকানা দিয়ে দিলেন ডোনাকে। নার্সিংহোমের লোকেশনটা বুঝে নিয়ে ডোনা এসে গার্গিকে বলল, এম. আর-এর সম্বর্ধনায় আমার আর থাকা হল না রে। তুই এম. আর-কে বলে দিস।

গার্গী অবশ্য সব শুনে রীতিমতো বিস্মিত। তৎক্ষণাৎ বলল, চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে, এত বড় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে যখন। হাজার হোক, ওর সঙ্গে তো তোর একটা—

বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে বেরিয়ে দুজনে একটা ট্যাক্সি ধরে নিল। সন্ধের পর কলকাতার

pathagar.net

পথে আজকাল এত ট্রাফিক-জ্যাম বেড়ে গেছে যে, নার্সিংহোমে পৌঁছাতেই লেগে গেল প্রায় একঘন্টার মতো। বিপর্যস্ত হয়ে তখন রডন স্ট্রিটের কাছে হোয়াইট ঈগল নার্সিংহোমের সামনে এসে পৌঁছাল, তখনও বনানী তাদের জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

বনানীকে দেখে আপাতত টেনশনমুক্ত মনে হচ্ছে। তবুও উদ্বিগ্নকণ্ঠে ডোনা জিজ্ঞাসা করে, এখন কেমন আছে?

—ডাক্তার বলেছে, আউট অফ ডেঞ্জার।

—দেখা করতে দেবে?

—হ্যাঁ। দু-তিনটে এক্স-রে করেছে ইতিমধ্যে। তাতে বলল, ইনজুরি তেমন মারাত্মক নয়। তবে বাহাত্তর ঘন্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না। ইনটারনাল হেমারেজ যদি হয়ে থাকে—

তিনজনে দ্রুত উঠে এল দোতলায় মন্দারের কেবিনে। মন্দারের জ্ঞান ফিরেছে বটে, কিন্তু চোখে এখনও ঘোর লেগে রয়েছে। ডোনাকে দেখে অবশ্য খুশি হল খুব। একটু হাসল। তার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বনানীই জানালেন, মন্দার একটা মালটিস্টোরিড বিল্ডিঙের পাশ দিয়ে হেঁটে আসছিল, হঠাৎই একটা পাথরের টুকরো এসে পড়ে তার মাথার পিছন দিকে। পাথরে টুকরোটা বেশ বড় আকারের। সুতরাং বলা যায়, অল্পের জন্য বড় রকমের দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে মন্দারের বক্তব্য ভারি অদ্ভুত। পাথরের টুকরোটা কেউ নাকি ছুড়ে মেরেছে।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, সে আবার কী কথা? কে তোমাকে পাথর ছুড়ে মারবে?

মন্দার ম্লান হেসে জড়ানো গলায় বলল, বুঝতে পারছি না।

—কারও সঙ্গে এর মধ্যে বড় রকমের কোনও ঝামেলা হয়েছে নাকি?

—টুকটাক তো হয়ই আমাদের এ ধরনের ব্যবসায়ে। তবে এ ঘটনাটার পিছনে মনে হচ্ছে অন্য কোনও কারণ।

—কী কারণ? ডোনা অবাক হল।

—হঠাৎ কাল সকালে একটা অদ্ভুত টেলিফোন এল আমার অফিসে। রিসিভার তুলতেই বলল, ডোন্ট ডিস্টার্ব ডোনা। ডোনা ইজ মাইন।

মন্দারের কথা শুনে হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে গেল ডোনা। মুহূর্তে চোখাচোখি করে নিল একবার গার্গীর সঙ্গে, একবার বনানীর সঙ্গে। তার মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল যেন। কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না।

মন্দারই আবার বলল, হঠাৎ এরকম হুমকি কে দিল বুঝতেই পারিনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে বলছেন? তাতে উত্তর দিল, যেই হই না কেন। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্নিং। দরকার হলে পথের কাঁটা সরিয়ে দেব। বলেই টেলিফোন রেখে দিল পট করে। পরদিনই এভাবে পাথর ছুড়ে মারল কেউ, তাতেই বুঝে নিয়েছি—

ডোনা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এটা নিয়ে বেশি ভাবার দরকার নেই। যে-ই কাজটা করে থাকুক, ভাল করেনি।

কিছুক্ষণ পর মন্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে সেই গার্গী ধরল ডোনাকে, কী রে, আর কেউ তোর দিকে নজর দিয়েছে নাকি?

ডোনা বিব্রত হল, লাল হয়ে উঠল তার চোখমুখ, কোনওক্রমে বলতে পারল, বুঝতে পারছি না।

pathagar.net

গার্গী অবাক হয়ে বলল, বুঝতে পারছিস না? না কি চেপে যাচ্ছিস? তোর যা ব্যাপার স্যাপার—

ঠিক এ সময় বনানী এগিয়ে এলেন হঠাৎ, ডোনার দিকে কীরকম কড়া চোখে তাকিয়ে হিসহিস করে বললেন, শিহরণের সঙ্গে তোর সম্পর্কটা একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু—

ডোনা শুধু বলল, শিহরণদা নয়। মনে হচ্ছে অন্য কেউ।

ষোলো

ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় লেখা কিছু বইপত্তর ঘাঁটাঘাটি করছিলেন চিত্রদীপ। তার সঙ্গে মুঘলযুগের এবং পরবর্তীকালের বাবু-কালচারের কিছু ছবিও দেখছিলেন বেশ মনোযোগ দিয়ে। কয়েকদিন আগে অলর্কের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁর নতুন প্রদর্শনীর স্পটটি ঘুরে ফিরে দেখতে। এই বাড়িটিতেই অলর্ক থাকে। রাসেল স্ট্রিটে এখনও কিছু পুরানো আমলের সাহেবিকেতার বাড়ি অবশিষ্ট আছে। বাড়িটা দোতলা, কিন্তু আকারে বিশাল। বাইরে থেকে দেখলে প্রাচীন ঘরানার একটা গন্ধ পাওয়া যায়। অলর্কের ইচ্ছে, এই বাড়িটিতেই চিত্রদীপের প্রদর্শনী হোক। সেটা অভিনব হবে। তার আরও ইচ্ছে, এই বাড়িটির আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিত্রদীপ তাঁর নতুন সিরিজের ছবিগুলো আঁকুন।

লিভিংরুমের স্টাডিতে এক গভীর ভাবনায় নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন চিত্রদীপ, আর ওদিক সেন্টারটেবিলে কফির কাপ হাতে নিয়ে ডোনা তার মাকে বলছিল, বুঝতে পারছি নে মা, কী করে এতসব ম্যানেজ করব আমি। একসঙ্গে দু'দুটো পারফরমেন্স—

ডোনার কাঁধে এখন জমা হয়েছে রাজ্যের ব্যস্ততা। চিত্রদীপের প্রদর্শনী সাকসেসফুল করে তোলার জন্য ঘোরাঘুরির আর অন্ত নেই তার। সে কয়েকদিন ধরে টালা থেকে টালিগঞ্জ, হাওড়া থেকে সল্টলেক ঘুরে ঘুরে যোগাযোগ করছে শিল্পবোদ্ধাদের সঙ্গে, চিত্র সমালোচকদের সঙ্গে, তাদের পরিবারের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও। প্রবীণ ও তরুণ শিল্পীদের কাছেও সে জনে জনে গিয়ে বলে এসেছে তাঁরা যেন চিত্রদীপের এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন।

একই সঙ্গে ডোনা জড়িয়ে পড়েছে আরও একটি থ্রিলিং অথচ ঝামেলাপূর্ণ কাজে। হঠাৎ তাদের ডিপার্টমেন্টের মেয়েরা মিলে ঠিক করেছে, একটা ড্যান্সড্রামা করবে অ্যানুয়াল সোশ্যাল ফাংশনে। ইংরেজি ড্যান্সড্রামা। তার রিহার্স্যাল হয়ে গেল একদিন। এখন প্রায় প্রতি একদিন অন্তর তাকে যেতে হবে মহড়ায়।

এমন দ্বিবিধ চাপে ডোনা ব্যস্ত, বিপর্যস্ত, তার এখন নিঃশ্বাস ফেলারও সময় নেই। কফির কাপ নিঃশেষ করে বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে সবে তার সারাদিনের প্ল্যান মনে মনে চক-আউট করছে এমন সময় ডোরবেলে টুং নানা টুং নানা।

নিশ্চই অলর্ক।

প্রদর্শনীর দিনক্ষণ যতই এগিয়ে আসছে, ডোনাদের বাড়িতে অলর্কের যাতায়াত বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সেটা অবশ্য স্বাভাবিকই, কারণ প্রোমোটার ও শিল্পী দু'জনের যৌথ উদ্যোগ ছাড়া এতবড় প্রদশর্নী সফল করা সম্ভব নয়। প্রচুর ছোটাছুটি করতে হচ্ছে অলর্ককেও। তার মধ্যে বারবার আলোচনা করতে এ বাড়িতে আসছে বটে, কিন্তু চিত্রদীপ তাঁর ছবি আঁকা নিয়ে এতই

ব্যস্ত থাকছেন যে, অলর্কের সঙ্গে কথা বলার মতো তাঁর সময়ই নেই। কেবলই পাইপ দাঁতে কামড়ে রেখে রঙের নেশায় বিভোর হয়ে আছেন।

ফলে ডোনাকেই বেশিরভাগ সময় সঙ্গ দিতে হচ্ছে অলর্ককে। ডোনা অবশ্য বুঝতে পারছে, অলর্ক যত না এগিয়ে চিত্রদীপের জন্য এ বাড়িতে আসে, তারচেয়ে বেশি আসে ডোনার আকর্ষণে। ডোনার সঙ্গে প্রদর্শনী নিয়ে আলোচনা করতেই তার বেশি আগ্রহ। ডোনাও এই দীর্ঘকায় সরল যুবকটির সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়। তবু সেদিন মন্দারের কথা শোনার পর তার মনে একটা খটকা লেগে রয়েছে।

ডোরবেলের শব্দ শুনে বেতের চেয়ার থেকে আলসেমি-ভরা শরীরটা তুলে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলে হাসল ডোনা, হাই।

অলর্ক ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, শিহরণদা আছেন?

ডোনা বিস্মিত হয়ে বলল, না তো। খুব দরকার? শিহরণদার ফিরতে দুপুর হয়ে যাবে।

—ঠিক আছে, আপাতত না হলেও চলবে। আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করে নেব'খন।

গত কয়েকদিন যাওয়া আসার মধ্যেই একদিন অলর্কের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে শিহরণের। শিহরণের যা স্বভাব, একদিন আলাপেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন অলর্কের সঙ্গে। শিহরণ একজন অধ্যাপক, তাছাড়া সাহিত্যরসিকও, একথা জেনে ফেলার পর অলর্ক একদিন শিহরণকে বলেছিল, খুব ভাল হল, যদি আপনার কছু সাহিত্যভাবনা আমার বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার জন্য লিখে দেন।

শিহরণ তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হয়ে বলেছিলেন, আমি কয়েকটা ক্যাপশন লিখে দিতে পারি—

যেদিন ডোনা ও অলর্কের আলোচনার সময় শিহরণ উপস্থিত থাকে, সেদিন আড্ডাটা একটু বেশিই জমে। শিহরণ হলেন কথার জাদুকর, টেবিল—টকে তিনি বরাবরই চমৎকার। কখনও গুরুগম্ভীর বক্তৃতায়, কখনও ঈষৎ হাস্যরসে, কখনও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্যে আসর জমিয়ে তুলতে পারেন মুহূর্তে।

অলর্ক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে ডোনা ভুরু তুলে বলল, কি হল, শিহরণদা বাড়ি নেই বলে বসবেন না মনে হচ্ছে?

অলর্ক ধপ করে বসে পড়ে বলল, না, তা নয়, তবে অন্যত্র যাওয়ার একটা তাড়া আছে।

—ঠিক আছে, আপাতত চা তো খাবেন, চা কিংবা কফি?

অলর্ক হঠাৎ বলল, তোমার এই খাবেন, বসবেন শব্দগুলি কিন্তু আমাকে বড্ড পরপর করে রেখেছে এ বাড়িতে। ঠিক যেন ফ্রি হতে পারছিনে—

ডোনাও প্রথমটা ফ্রি হতে পারছিল না। তবু অলর্কের কথাবার্তা এতই সহজ, চাউনি এতই সরল যে তার সম্পর্কে কোনও খারাপ ধারণা করতে ইচ্ছে করে না। ঘন-বেগুনি সুতোয় কাশ্মীরি-কাজ করা ঘিয়ে রঙের পাঞ্জাবি আলিগড়িতে ওতপ্রোত যুবকটির দিকে ভাল করে তাকাল ডোনা, তারপর রহস্যময়ীর মতো হেসে বলল, ও কে মিস্টার। এখন তাহলে বোসো। মা-কে কফি করতে বলি—

কিচেন থেকে একপাক ঘুরে এসে ডোনা বেতের চেয়ারে বসতেই অলর্ক বলল, একদিন শিহরণদাকে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর কাজ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডোনা জানত না, অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি!

—হ্যাঁ। ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব। রঙের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এরপরই শুরু হবে

pathagar.net

ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের বাকি কাজ। দেওয়ালের ফাঁকা জায়গাগুলোতে আঁকা হবে ম্যুরাল। নিচে এ মুড়ো ও-মুড়ো জুড়ে র‍্যাক, কাউন্টার, বাইরে শো-উইন্ডো। প্লাইউড-ম্যাসোনাইট-কাচের আয়না বসানো হলে দারুণ দেখাবে কিন্তু—

ডোনা অ্যাপ্রুভ করার ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়তেই অলর্ক আবার বলল একত্রিশজন কন্ট্রাক্টর কমপিট করছে ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের কাজ পাওয়ার জন্য। তা শিহরণদাকে বললাম, ডোনার ইচ্ছে, বিশেষ একজনকে কাজটা দেওয়ার। তা শিহরণদা শুনে কী বললেন জানো?

ডোনা ভুরু কুঁচকে বলল, কী?

—বললেন, তাই নাকি! ভারি ইন্টারেস্টিং। ডোনা বিশেষ একজনকে যখন রেকমেণ্ড করছে, তখন সে বিষয়টাতে নিশ্চয় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাকে একদিন কাগজপত্রগুলো দেখতে দিও তো—

ডোনা অবাক হয়ে বলল, শিহরণদা এসব কাগজও দেখছেন নাকি!

—আমি একা মানুষ। নিজস্ব কয়েকজন লোক রেখেছি সব কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য। কিন্তু তারা কী করছে না করছে তা দেখার সময়ও আমার নেই। লে-আউট না হয় তোমার বাবা দেখছেন, কিন্তু তার বাইরেও হাজারো কাজ। শিহরণদাকে একদিন সব বলতেই তিনি বললেন, তা এত ভাবনার কী আছে। আমি কিছু সাহায্য করতে পারি, যদি তোমার দরকার মনে হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছি।

ডোনা খানিকটা হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে অলর্কের মুখের দিকে।

—বুঝল ডোনা, একসময় আমি ছিলাম একদম বেকার, ভ্যাগাবণ্ড। আর এখন একসঙ্গে এতরকম কাজে জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে যে, এক চিলতে অবসর বলে নেই কিছু নেই। কখনও গভীর রাতে ঘুমোবার আগে এতসব কর্মকাণ্ডের কথা ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। মনে হয়, এত কাজ সব আমিই করছি নাকি! এগুলো সব স্বপ্ন নয় তো! কিছুকাল আগেও চরম ফ্রাস্ট্রেশনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। বহু ভিখারিকে রাস্তায় যেমন দেখি, খাদ্যাভাবে, দুর্দশায় দিন কাটিয়ে যাচ্ছে ছন্নছাড়াভাবে, নিজেকে তেমনি মনে হত। ভাবতাম, এমন কর্মহীনভাবে কি বেঁচে থাকা চলে, না থাকা উচিত। অজস্র কুষ্ঠরোগী তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতেও বেঁচে থাকে বছরের পর বছর। তারা সবাই ভাবে, একদিন তাদের সব দুঃখযন্ত্রণা শেষ হয়ে এসে পৌঁছাবে সুসময়। কিন্তু সবাই জানে, তা আর কখনও হবে না। আমিও বেঁচে ছিলাম ঠিক এঁদেরই মতো। কিন্তু কর্মহীন, বাউন্ডুলে একজন যুবক কিসের জন্যই বা বেঁচে থাকবে। অথচ বেশ কিছু টাকা হাতে পেয়ে যাওয়ার পর এখন মনে হয়, পৃথিবীতে মানুষের কাজ না করে বেঁচে থাকাটাই এক সমস্যা। পৃথিবীতে কাজের অভাব নেই, সময়ের বড় অভাব।

ডোনা হেসে বলল, পার্থক্য একটাই। টাকা থাকা আর না-থাকা।

—যাই হোক, অলর্ক হঠাৎ যেন কী মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বলল, আমার অ্যাড-এজেন্সি বলেছে, তোমার আরও কিছু ছবি তুলতে হবে।

—আবার! ডোনা চোখ কপালে তুলে বলল, এরপর তো তোমার অ্যালবাম ছাপাছাপি হয়ে যাবে আমার ফোটোয়।

—সেটা খারাপই বা কী, অলর্ক অবলীলায় বলল, সুন্দর মুখ বারবার ঘুরিয়ে দেখলে মন ভাল থাকে। কিন্তু সারাক্ষণ তো একজন তরুণীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। সেটা

pathagar.net

অসভ্যতা বলেই ভাববে সবাই। শুধু তোমার কাছেই নয়, এই বিশ্বসংসারের সকলের কাছে সেটা এক অভব্য ব্যাপার। তার চেয়ে অ্যালবামে প্রচুর ফোটো থাকলে সেদিকে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে বসে থাকা যায়।

ডোনা এমন অদ্ভুত স্বীকারোক্তি শুনে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে অলর্কের দিকে। কেমন শিরশির করে ওঠে তার শরীরের ভিতর।

—তবে আপাতত তোমার ফোটো তুলতে চাই সে কারণে নয়। প্রায় সব শো-রুমগুলোর ভিতরে রঙের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। প্লাইউডের পার্টিশন শুরু হওয়ার আগে শোরুমের এই মুহূর্তের ছবিগুলো ক্যামেরায় ধরে রাখতে চাই। কী চমৎকার হয়েছে ভিতরগুলো তা না দেখলে অনুমান করতে পারবে না। লিণ্ডসে স্ট্রিটের শো-রুমের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়লে মনে হবে, দাঁড়িয়ে আছ একটা জাহাজের ডেকের উপর। চারপাশে শুধু নীল সমুদ্র আর সমুদ্র। চারপাশে উত্তাল ঢেউ বিশাল হয়ে তোমাকে ভাসিয়ে রেখেছে অনন্ত জলরাশির উপর। আবার শিয়ালদহ শো-রুমে গেলে মনে হবে দাঁড়িয়ে আছ কোনও সবুজ গাছগাছালি ভরা গাঁয়ের রাস্তায়। তেমনি—

ডোনা হেসে বলল, তা না হয় দেখলাম, কিন্তু আবার ফোটো তোলা কেন?

—এই শো-রুমগুলোর মধ্যে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ফোটো তোলা হবে। এক-এক পটভূমিকাতে এক এক রকমের পোশাকে। কখনও তোমাকে মনে হবে সমুদ্রকন্যা, কখনও গাঁয়ের বধূ, কখনও চাঁদের বুকে এক তরুণী মহাকাশচারী, কখনও মরুভূমির বুকে এক বেদুইন কন্যা। তুমি কাল সকালে তৈরি হয়ে থেকো। আমি এসে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব। নারাণ ঘোষের সঙ্গে সেভাবেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে—

এতসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ডোনাও যেন আর থই খুঁজে পাচ্ছে না। এতদিন সে নিজেই ছিল একটি বিশাল সমুদ্র। কখন কাকে বানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার ঠিক ছিল না। এখন অলর্কই তার অনন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্য সবাইকে নিয়ে যাচ্ছে দুকূল প্লাবিত বন্যার মতো।

ডোনা আপ্লুতহয়ে বলল ফ্যান্টাসিক'। এই আইডিয়াটা নতুন মনে হচ্ছে, আগে তো কখনও বলোনি।

অলর্ক মিটিমিটি হেসে বলল, আইডিয়াটা আগেই ছিল মাথার মধ্যে। ঠিক ভরসা হচ্ছিল না। সেদিন শিহরণদাকে বলতেই বললেন, গুড আইডিয়া। এক্ষুনি শুট করে ফেলো—

—বাহ্, শিহরণদা তোমাকে আজকাল এসব বিষয়েও অ্যাডভাইস করছেন নাকি?

—ওঁর কিছু কিছু আইডিয়া আমার দারুণ লাগে। সেদিন ওঁকে নিয়ে কয়েকজন বিগ সাপ্লায়ারের কাছে গিয়েছিলাম। তারা বিভিন্ন স্টেট থেকে বেস্ট কমোডিটিস সাপ্লাই করে। শিহরণদা তাদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেন। দু-একজন সম্পর্কে আমাকে সাবধান করে দিলেন পরে। বললেন, দু-নম্বরি মাল গছিয়ে দিতে পারে।

—বাহ্, অধ্যাপককে তাহলে বিজনেসের লাইনে নিয়ে আসছ? সর্বঘটের কাঁঠালিকলা হয়ে উঠছেন দেখি।

অলর্ক হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, সেদিন শিহরণদাকে দেখলাম এক মহিলার সঙ্গে। রেস্তোরাঁয় বসে চাইনিজ খাচ্ছেন।

ডোনা হেসে উঠে বলল, কলকাতার এমন আরও অনেক তরুণীকে নিয়েই উনি ঘুরতে বেরোন, রেস্তোরাঁয় চা-কফি, চাইনিজ খান।

pathagar.net

—হুঁ, আলাপও করিয়ে দিলেন আমার সঙ্গে। নাম বললেন, ঈষিতা, ম্যারেড।

ডোনা চমকে উঠে বলল, সে কি?

—চেনো না কি তুমি ভদ্রমহিলাকে? খুব সুন্দরী কিন্তু।

ডোনা হঠাৎ শক খেয়েছে বলে মনে হল। মাত্র কিছুদিন আগেই শিহরণদা এসে হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'জানো ডোনা। মণীশ রায়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। কনগ্র্যাটস জানাতে। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। বেশ মিশুকে কিন্তু।' সেই ক্ষণিকের আলাপ যে শিহরণ ইতিমধ্যে রেস্তোরাঁ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছেন তা ভেবে যতটা না অবাক হল ডোনা, তার চেয়ে কেন যেন উৎকণ্ঠিত হল। শিহরণদা সামান্য আলাপ আরও বহুদূর 'পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারেন। সে ভালই জানে ব্যাপারটা।

ডোনা খানিক পরে হেসে বলল, আমার চেনাজানার পরিধি তো খুব কম নয়। তবে শিহরণদার মতো নয়। শিহরণদা ছুঁচ হয়ে ঢুকে—

অলর্ক ডোনার অভিব্যক্তি নিরিখ করতে করতে বলল, আচ্ছা, শিহরণদার সঙ্গে তোমাদের কিরকম সম্পর্ক?

—সম্পর্ক! এহেন জটিল প্রশ্নে ডোনা এক লহমা বেশ হকচকিয়ে গেল। সম্পর্কের কথা ভেবে সে কি কারও সঙ্গে মেশে। সে তো মেশে জাস্ট ফর ফান। হেসে বলল, কিরকম আবার। আমাদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকেন।

—উঁহু। ওঁর কথাবার্তা শুনে মনে হয় সম্পর্কটা তার চেয়েও একটু গভীর।

ডোনা তীক্ষ্ণ চোখে অলর্কের চোখের দিকে তাকাল। অলর্কের চাউনিতে অবশ্য যথারীতি সারল্য। ঠোঁটের কোণে সামান্য মিটিমিটি হাসি। সে ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বলল, আসলে উনি আমার মায়ের বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে পড়তেন প্রেসিডেন্সিতে।

—ও, আর তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা কী ধরনের? তোমার উপর খুবই যে ডমিনেট করেন তা ওঁর কথাবার্তা থেকেই বোঝা যায়।

ডোনা রীতিমতো বিচলিত বোধ করল এবার। শিহরণদা তার সম্পর্কে কী বলেছে অলর্কের কাছে তা সে জানে না। হয়তো এমন কিছু বলেছে যা শুনে এতটাই বিচলিত হয়ে পড়েছে অলর্ক। বোধহয় জেলাসও হয়েছে। কদিন আগেই ঠিক এমনই ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করেছিল, হু ইজ মন্দার। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল ডোনা, বোধহয় কয়েকমুহূর্তে জমে ওঠা চোরঘূর্ণির টানটুকু পেরিয়ে আসতে চাইল, বলল, কীরকম আবার। শিহরণদা আমারও ফ্রেণ্ড।

—শুধু ফ্রেণ্ড!

ডোনা আরও হতবাক হয়ে থমকে যায় হঠাৎ। এতদিন অলর্ককে মনে হতো স্বপ্নের জগতের মানুষ হিসেবে, যে সারাক্ষণ তার স্বপ্নের ভেতর, তার একান্ত ভাবনায় লীন হয়ে থাকে। হঠাৎ যেন সে তার পারিপার্শ্বিক অন্য জগৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। হয়তো ডোনার জন্যই।

ডোনা নির্বিকারভাবে বলল, বলতে পার, হি ইজ মাই ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড। বলে তার মুখ উদ্ভাসিত করল এক রহস্যময়। হাসিতে।

—এত! অলর্কের গোঁফদাড়ির ভিতর দিয়ে চিলতে হাসি ফুটে বেরোল। কিন্তু চোখদুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে পরখ করতে লাগল ডোনার চোখমুখ।

pathagar.net

কেন যেন ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ডোনা। হঠাৎ ভারি অপরিচিত মনে হল অলর্ককে। খুবই অদ্ভুত আর অচেনা।

সেই মুহূর্তে অলর্ক হঠাৎ বলল, আজ সকালে বাড়িতে খুব ঝামেলা হয়ে গেল, ডোনা।

ডোনা চোখ নরম করল, এত্ত বড় বিজনেসম্যান। ঝামেলা তো সারাক্ষণই লেগেই থাকবে।

—সে তো থাকবেই। কিন্তু হঠাৎ পুলিশ পিছনে লাগলে মহা মুশকিল।

ডোনা চমকে উঠে বলল, পুলিশ কেন!

—আর বলো কেন। সেই যে বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ি, সেখানে হরিশংকর চৌধুরী বলে একটা লোক থাকত। সে নাকি এককালে মস্ত লেঠেল ছিল। আমার দাদামশাইয়ের রাজত্ব সামলাতো তার বাহিনী নিয়ে। হঠাৎ সে লোকটা খুন হয়ে গেছে।

ডোনা স্তব্ধ হয়ে গেল, খুন! কীভাবে?

—লোকটা মাঝেমধ্যে দরকার পড়লে কলকাতায় আমার কাছে আসত। দিনকয়েক আগেও এসেছিল টাকাপয়সা নিতে। টাকাপয়সা দিয়েও ছিলাম। তারপর শুনি আমার বাড়ি থেকে বীরভঙ্গপুর ফেরার পথে খুন হয়ে গেছে।

—কোথায় হয়েছে খুনটা?

—কোথায় হয়েছে তা বলতে পারব না। কিন্তু তার লাশ পাওয়া গেয়ে আমার বাড়ির খুব কাছেই। কে যেন খুন করে ফেলে গেছে এখানে। পুলিশ তাই নিয়ে খুব হুজ্জুতি করছে। বলছে আপনার বাড়ির কাছে যখন পাওয়া গেছে, তখন আপনিই খুন করেছেন। বোঝো অবস্থা। নিজেরা অপরাধী বার করতে পারে না, এখন উদোর পিণ্ডি চাপাচ্ছে বুধোর ঘাড়ে!

ডোনার নিঃশ্বাস আটকে গেল, তারপর?

—আমি বললাম, ভাল করে তদন্ত করুন। আমাকেই বলির পাঁঠা সাজিয়ে লাভ কী! হা হা হা—

অলর্কের হাসি শুনে ডোনা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তাকে একগলা কাঁপুনির মধ্যে দাঁড় করিয়ে অলর্ক স্টার্ট দিল তার গাড়িতে। হু-স্ করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তায়।

সতেরো

অলর্কের হাড়-কাঁপানো হাসি গোটা একটা দিন বেশ প্যানিকে রাখল ডোনাকে। সন্ধের পর গার্গীকে ফোন করে জানালও ব্যাপারটা। গার্গী শুনে এতটাই চমকে গেল যে, মৃদুকণ্ঠে বলল, খুব মিস্টেরিয়াস কিন্তু।

ডোনা সত্যিই বেশ কয়েকদিন ধরে অলর্ককে নিয়ে একটু ধন্দে আছে। তার ম্যান্‌লি চেহারা, উদার, রাজা-রাজা স্বভাব যেমন তাকে আকর্ষণ করে, তেমনি ভাবনায় ফেলে তার অতীত জীবন, রহস্যময় কথাবার্তা।

গার্গী সাবধানবাণী উচ্চারণ করল, একটু অ্যালার্ট থাকিস, ডোনা।

—ওহ্, শিওর। ডোনা এরকম বহু পুরুষের ধকল বহন করতে পারে, গার্গী। ডোন্ট ওরি—, বেশ রেলা মেরে বলল বটে ডোনা, বেশ সাহস দেখিয়েই, তবু কী একটা আলপিন তার গলার কাছটায় বেধে আছে কদিন ধরে। রাতেও গভীরভাবে ভেবে চলেছে ব্যাপারটা। মন্দারকে তবু বোঝা যায়, টেণ্ডার পাগল একটা লোক। কিন্তু অলর্ক রহস্যময়। আগাপাশতলা রহস্যে মোড়া তার সমস্ত অস্তিত্বই। অলর্ককে নিয়ে এখন সে কী করবে!

pathagar.net

দিনদুয়ে পরে বেলা এগারোটা নাগাদ দুপুরের খাওয়া সেরে ডোনা বেরিয়ে এল তাদের বাড়ির বাইরে। আজ তাকেই ঘর ইন্টারলক করে বেরোতে হবে। প্রায় সকাল থেকে বাড়িতে সে আজ একাই। চিত্রদীপ খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছেন শিয়ালদহের দিকে। আজই ওখানকার শো-রুমে রঙের ফাইনাল টাচ হবে। ওখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকে রংকর্মীদের ঠিকঠাক নির্দেশ দিতে হবে, কখনও নিজেকেই মই-এ উঠে ব্রাশ চালাতে হবে ম্যুরালের কারুকাজ ফোটাতে। চিত্রদীপের পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন বনানীও, নিউমার্কেটের দিকে কিছু টুকটাক কেনাকাটি আছে তাঁর। ফেরার পথে ভবানীপুরে কার বাড়িতে যেন যাবেন। ফিরতে বেলা একটা-দেড়টা হয়ে যাবে। তার বেরোনোর সময় শিহরণও বেরোচ্ছিলেন তৈরি হয়ে। বনানীকে গাড়িতে উঠতে দেখে বললেন, তোমার গাড়িতে একটা লিফট দেবে, বনানী?

বনানী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে তুমি?

—বলতে পার একটা ছোটখাটো আউটিঙে, অলর্কের সঙ্গে খড়গপুরের দিকে।

—সে কী, হঠাৎ?

—ওখানে কয়েকজন বিজনেসম্যানের সঙ্গে অলর্কের একটা ডিল আছে। হয়তো আজ নাও ফিরতে পারি।

—তাই নাকি? কবে ফেরার কথা?

—কাল বিকেলের দিকে, কিংবা রাতও হতে পারে।

—পরশু ডোনাদের কলেজে ফাংশন আছে, সে খেয়াল আছে?

—খুবই আছে। কারণ ওদের নাটকে আমারও তো কিছু অবদান আছে।

বনানী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি তো তোমার লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, অধ্যাপক-সমিতি এ সব নিয়ে ভালই ছিলে এতদিন। হঠাৎ অলর্কের ব্যাবসার মধ্যে মাথা গলাচ্ছ কেন?

শিহরণ অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছিলেন, মাঝেমধ্যে মুখ বদলাতে কার না সাধ হয়।

শিহরণের বলার ভঙ্গির মধ্যে কেমন একটা অশ্লীলতার গন্ধ পেয়ে মুখটা বিকৃত করেছিলেন বনানী। হিসহিস করে বলেছিলেন, তুমি যে এতটা লম্পট তা আগে এভাবে বুঝতে পারিনি।

শিহরণ বিশ্রীভাবে হেসে বলেছিলেন, বুঝতে পারলে কী করতে?

কথার উত্তর না দিয়ে বনানী বললেন, শেষ পর্যন্ত অন্য অধ্যাপকদের বউ নিয়ে টানাটানি করছো আজকাল?

শিহরণ আবার হাসলেন, সে তো আমার বহুদিনের অভ্যাস।

ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে বনানী প্রায় বাঘিনির মতো হিংস্র হয়ে উঠলেন, এর শাস্তি কিন্তু তোমাকে একদিন পেতেই হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এবার বোধহয় তুমি সহ্যের শেষ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

—তাই নাকি? হঠাৎ আমার চরিত্র নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে শুরু করলে কেন? আমাকে তো তুমি বিশ বছর ধরে চেনো। কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কত করেছি। আমার স্বভাবটাই যে এরকম, না মরা পর্যন্ত স্বভাব বদলাবে না। সেই যে একটা প্রবচন আছে না, অঙ্গার শত-ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। বাংলার বলে, কয়লা না যায় ধুলে ময়লা, স্বভাব না যায় মলে—

বনানী দাঁত কিড়মিড় করে বলেছিলেন, তোমার মরাই দরকার। তাহলে ঘরের মেয়ে-বউগুলো অন্তত বাঁচে।

এত ঝগড়াঝাঁটির পরও শিহরণকে সঙ্গে নিয়েই গাড়িতে উঠেছিলেন বনানী। সমস্ত কথোপকথনে ঘটেছিল ডোনার সামনেই। কদিন ধরেই লক্ষ করেছিল ডোনা, বনানীর সঙ্গে

শিহরণের একা কোল্ড-ওয়ার চলছে। কারণটা সে একেবারে না বোঝে তা নয়, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে সে তেমন মাথা ঘামায়নি।

শিহরণ গাড়িতে ওঠার সময় আবার বলেছিলেন, খুব বেশিদিন তোমাদের আর জ্বালাব না, শিগগির এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যাব।

বনানী এবং শিহরণের মধ্যে যে একটা প্রবল টানাপোড়েন চলছে তাতে ব্যাহত হচ্ছে ডোনাদের-বাড়ির আবহাওয়া, সে টানাপোড়েনে ডোনারও যে একটা ভূমিকা আছে তা ডোনা জানে। শিহরণের সঙ্গে ডোনার ঘনিষ্ঠতা একবারেই সহ্য করতে পারছেন না বনানী। ওদিকে কয়েকদিন আগে শিহরণদার সামনেই তাঁকে নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছে চিত্রদীপ আর বনানীর মধ্যে। চিত্রদীপ তখনই সরাসরি বলে দিয়েছেন, তিনি চান শিহরণ তাঁদের বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাক। শুধু যে তাঁদের ঘরই আটকে রেখেছেন শিহরণ তা নয়, কয়েকদিন আগে শিহরণ কোনও একটি শো-রুম দেখে এসে মন্তব্য করেছেন, লে-আউটটা যতটা ভাবা গিয়েছিল, তত ভাল হয়নি। শুনে চিত্রদীপের মুখ গনগন হয়ে উঠেছিল রাগে। হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, হু ইজ হি টু কমেন্ট লাইক দ্যাট!

শিহরণের কোনও ধারণাই নেই, এহেন মন্তব্য করলে চিত্রদীপের সম্মান কতটা হানি হয়। না কি ইচ্ছে করেই মন্তব্যটা করেছেন শিহরণদা! চিত্রদীপ তাঁকে বাড়ি ছেড়ে বলে যেতে বলেছেন,তাতে পাল্টা রাগ দেখাতেই!

এতসব টানাপোড়েন, মন কষাকষির মধ্যে থাকতে চায় না ডোনাও। সে ভাবতে চায়, লাইফ ইজ জাস্ট অ্যা ফান, তবু এই ঘাত প্রতিঘাতের আঁচে সামান্য ক্লান্ত বোধ করছে আজকাল। তার কাঁধেও এখন প্রচণ্ড ঝামেলা চেপে বসেছে। একদিকে চিত্রদীপের চিত্রপ্রদর্শনী, অন্য দিকে ড্যান্স-ড্রামার রিহার্সাল।

এমন সব ভাবনায় গেরো দিতে দিতে যোধপুরপার্কের স্টপেজ থেকে একটা মিনিবাস ধরে নিল ডোনা। আজ মাত্র গোটা দুয়েক ক্লাস আছে, তারপর ড্যান্সড্রামাটার মহড়া শুরু হবে দোতলার একটা ঘরে। রিহার্স্যাল শেষ হলে তার ইচ্ছে মন্দারকে একবার দেখতে যাবে নার্সিংহোম। হাজারো কাজের চাপে একখানি সাণ্ডউইচড্ হয়ে আছে ডোনা যে, গত এক সপ্তাহের মধ্যে একবারও দেখতে যেতে পারেনি মন্দারকে দেখতে। খুবই ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়ে আছে মন্দার। নার্সিংহোম থেকে পরশু টেলিফোন করেছিল তাকে, তুমি কি আমাকে ভুলেই গেলে, ডোনা!

ডোনা বিব্রত হয়ে বলেছিল, তুমি বুঝতে পারছ না, আমার কাঁধে এখন দু' কোটি দায়িত্ব।

—আশ্চর্য, আমি মরে গেলেও বোধহয় তোমার দেখতে আসার সময় হবে না!

—ঠিক আছে দু-একদিনের মধ্যে অবশ্যই যাব।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসটা আজ কেমন ফাঁকা-ফাঁকা, শুনশান। নিশ্চয় আজ শনিবার বলেই। কিছু ছেলে-মেয়ে এদিকে-ওদিকে জটলা করছে, হয়তো তারাও বাড়ি ফিরবে বলে উদ্যোগ করছে মনে-মনে, আর একটু আড্ডা মেরে ফেরার বাস ধরবে। ক্যাম্পাস বরাবর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই ডোনার চোখ পড়ে গেল গার্গীর দিকে, বলল, হাই।

গার্গী তখন তার সামনে দাঁড়ানো এক বিশালাকায় কাবুলিওয়ালার পাশে সাধারণ মাপের বাঙালিকন্যা গার্গীকে দেখাচ্ছে প্রায় লিলিপুটপ্রতিম।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার, গার্গী!

pathagar.net

গার্গী হাসল, দ্যাখ না, হঠাৎ এই কাবুলিওয়ালাটাকে দেখে ভারি ইন্টারেস্ট জাগল। ওরা কোথায় থাকে, কবে আসে, কবে যায়, এখানে কী কী ব্যাবসা করে, দেশে কে কে থাকে, এইসব।

—বেশ মেয়ে বাবা। সঙ্গে সঙ্গে ডায়েরিতে নোটও করে নিচ্ছিস। নিশ্চয় একটা লেখা তৈরি করে ফেলবি ওদের নিয়ে? তাহলে আমিও একটা পয়েন্ট সাপ্লাই করতে পারি। পয়েন্টটা হল, এ দেশে রাস্তাঘাটে এতই তো কাবুলিওয়ালা দেখতে পায় সবাই, কাবুলওয়ালার বউ কেউ কখনও দেখেছে?

গার্গী হেসে উঠল, বেশ বলেছিস তো। শুনেছি খুব সুন্দরী হয় ওরা।

—সুন্দরী বলে সুন্দরী। লোকে বলে, একেবারে মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো সুন্দরী। সেইজন্যেই নাকি ওরা বউ নিয়ে কখনও এ দেশে আসে না, পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়।

—বাহ্, উপমাটা বেশ দিলি যা-হোক। মাথা খারাপ করে দেওয়ার মতো সুন্দরী! একেবারে ছেলেরা যেমনভাবে বলে—

ডোনা খিলখিল করে হাসল, মেয়েদের সম্পর্কে সব উপমা তো এ পর্যন্ত ছেলেরাই দিয়ে এসেছে। মেয়েরা মেয়েদের সম্পর্কে তেমন ভাল উপমা আর দিল কোথায়। মেয়েরা তো মেয়েদের শুধু হিংসেই করে।

একজ্যাক্টলি। দাঁড়া, সাক্ষাৎকারটা শেষ করে নিই। বলতে বলতে গার্গী আবার মন দেয় তার সামনে দাঁড়ানো কাবুলিওয়ালাটার দিকে। ডোনাও হাসতে হাসতে এগোয় তাদের ডিপার্টমেন্টের দিকে। কাবুলিওয়ালাটা এতক্ষণ তাকে যেন হাঁ-করে গিলছিল। হয়তো তার শরীরের পোশাক- বিপ্লবের জন্যই।

ডিপার্টমেন্টের দোতলায় উঠতেই তাদের ক্লাসের লোলিটার সঙ্গে দেখা। চাঁপাফুলের রঙের একটা স্কার্ট পড়েছে লোলিটা, ব্ল্যাক টপ। মাথায় হর্সটেল করে চুল বাঁধা। তাতে বিদেশি সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখাচ্ছে লোলিটাকে। ডোনা তার দিকে একনজর তাকিয়ে মনে মনে হাসল। লোলিটা আজকাল পোশাকে-আশাকে ডোনাকেই নকল করার চেষ্টা করে। ডোনার পরনেও আজ স্কার্ট-ব্লাউজ। তবে তার রং জেড-ব্ল্যাক। মুখে বলল, কী রে, লোলিটা ক্লাস হবে না?

—না। আর. ডি. আসেননি আজ। তার পরের ক্লাসটাও নাকি হবে না।

—বাহ্, বেশ তাহলে চল, রিহার্স্যালটা সেরে নিই।

—রিহার্স্যাল কাদের নিয়ে হবে। দু-তিনজন ছাড়া কেউই তো আসেনি দেখছি।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, সে কি রে। কাল বাদে পরশু ড্রামা। আজ যদি রিহার্স্যাল না হয়, তাহলে ফাংশন হবে কী করে?

—দেবযানীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলল, এ নিয়ে কিছু ভাবিস না, দেখবি, ঠিক স্টেজে মেরে দেবে।

—বাহ্, বেশ বেশ, ডোনা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল। হঠাৎ না-ক্লাস, না-রিহার্স্যাল, কোনওটাই না হওয়াতে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল সে। এখন এই লম্বা দুপুরটা সে কীভাবে কাটাবে, কোথায় যাবে তার কোনও কিনারা করতে পারল না। আপাতত তার হাতে একটাই কাজ, মন্দারকে নার্সিংহোমে দেখতে যাওয়া। সেই বিকেল চারটের দিকে।

লম্বা করিডোরে বেশ কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে তার মনে পড়ে গেল

pathagar.net

গার্গীর কথা। একলা-একা এভাবে কালক্ষেপ না করে বরং গার্গীর কাবুলিওয়ালা পর্ব এখন কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে সেটাই সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা যাক। কাবুলিওয়ালার বউ আছে কি নেই এ নিয়ে যে জোকটা প্রায়শ তারা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আলোচনা করে, গার্গী সে রহস্যের কোনও উন্মোচন করতে পারল কি না দেখতে গিয়ে প্রায় তাজ্জব হল। দেখল কাবুলিওয়ালাটা তার ঝোলা পকেট থেকে বার করেছে সযত্নে রাখা একটা রঙিন ফোটো। একটি যুবতীরই ছবি, কালো বোরখা তুলে রেখেছে মাথার ওপর। মুখের যে অংশটুকু বোরখার বাইরে দৃশ্যমান, তাতে যুবতী যে অতীব সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই।

ডোনাকে দেখে গার্গী হেসে ফিসফিস করে বলল, এই দ্যাখ, তোর কথা শুনে যেই লোকটাকে বউয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ফোটোটা বার করে দিল। ছেলেদের চোখে পড়লে সত্যি পাগল হয়ে যেত কিন্তু—

ডোনা গলাটা নিচে নামিয়ে ঠাট্টা করে বলল, তুই মেয়ে বলেই ফোটোটা বার করে দেখাল। যাইহোক, দেখিস, লোকটার চাউনি মোটেই ভাল ঠেকছে না আমার কাছে। তোকে বগলদাবা করে না নিয়ে যায় ওদের দেশে। আজকাল কলকাতার টিনএজাররা নাকি কাবুলিওয়ালাদের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে।

—সে হয়তো তোকে নিয়ে যেতে চাইবে, আমাকে নয়, বলে গার্গী হাসল। তার ইন্টারভিউ নেওয়া ততক্ষণে শেষ। কাবুলিওয়ালা কাছে থেকে বিদায় নিয়ে দুজনে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে এল হাঁটতে হাঁটতে। গার্গীর কী যেন মনে পড়তে হঠাৎ বলল, হ্যাঁ রে, তোর সেই ফিঁয়ারের খবর কী? সেই যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, এখন কেমন আছে?

—ভালই আছে মনে হয়। পরশু টেলিফোন করেছিল। আর দেখতে যাইনি বলে রেগে ফায়ার।

—সে কী রে। এতদিন হয়ে গেল, আর একবারও দেখতে যেতে সময় পাসনি? কী রকম প্রেম রে তোদের?

ডোনা রহস্যময়ীর মতো শব্দ করে হেসে উঠল। বলল, একেবারে প্লেটনিক প্রেম। দূর থেকে, দেখা না-দিয়ে যতটুকু প্রেম করা যায়, ততটুকুই। তবে ইচ্ছে আছে, আজ বিকেলে একবার যাব নার্সিংহোমে।

—ছাড়া পায়নি এখনও?

—না। তবে এর মধ্যে আরও একটা ঘটনা ঘটেছে। কে যেন টেলিফোন করে বলেছে, একবার টার্গেট মিস করেছি বলে বারবার মিস হবে না। হাসপাতাল থেকে বেরোলেই তোমার মৃত্যু। তাই ছাড়া পেলেও চট করে রিলিজ নেবে না বলল।

গার্গী আঁতকে উঠে বলল, সে কী! কে এমন ফোন করল?

—তা বুঝতে পারেনি। তবে সন্দেহ করছে এর আগে যে লোকটা টেলিফোন করে বলেছিল। ডোন্ট ডিস্টার্ব ডোনা, সি ইজ মাইন, এবারও সে-ই ফোন করেছিল।

গার্গী ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে, তোকে আরও কেউ চাইছে। কে সে! নিশ্চয় চিনিস তাকে?

ডোনা গম্ভীর হয়ে তার ঠোঁট কামড়াতে লাগল। তারপর উদার হয়ে বলল, কী জানি, কে চাইছে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

গার্গী ডোনার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তোর অন্য কেউ প্রেমিক আছে? যে তোকে মনে মনে পছন্দ করে—

pathagar.net

ডোনা এবারও শব্দ করে হেসে উঠল, সে রকম তো কতই আছে। তুই তো জানিসই আমি বিশ্বপ্রেমিকা। আমি বহুজনকে ভালবাসি, অ্যাণ্ড ভাইসি ভার্সা।

—ইয়ার্কি নয়, আমি সিরিয়াসলি বলছি। প্রথমে অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। পরে হুমকি, ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবা দরকার।

ডোনা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, দ্যাখ, যদি কেউ এভাবে পেছন থেকে মারতে চেষ্টা করে, তারপর টেলিফোনে হুমকি দেয়, আমি তাকে পুরুষ বলতে পারি নে। সাহস থাকে তো সামনে এসে ব্যাপারটা ফয়সালা করে নিক।

গার্গী আশ্চর্য হয়ে বলল, কী ফয়সালা করে নেবে? ডুয়েল লড়বে নাকি?

—না, ডুয়েল লড়ার কথা বলিনি। আমি বলেছি, পেছন থেকে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিকে মারার চক্রান্ত করে, তারা কাপুরুষ।

গার্গী ডোনার মুখের অভিব্যক্তি লক্ষ করছিল গভীরভাবে। তার কেন যেন মনে হচ্ছিল, কে ফোন করেছে মন্দারকে, কেনই বা, তা ডোনা জানে, অথচ এড়িয়ে যাচ্ছে সে প্রসঙ্গ। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলল, তাহলে এখন কী করবি? তোদের এম. আর-এর কাছে আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য ছিল। যাবি নাকি একবার?

ডোনা ভুরু কোঁচকাল, মুখ টিপে হেসে বলল, ব্যাপারখানা কী বলতো তোর? ফেঁসে গেছিস নাকি?

গার্গী হাসল, ফাঁসব কেন? সেদিন এম. আর. কে-গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে দেখলাম। সস্ত্রীক হেঁটে আসছেন। কী সুন্দর দেখতে ঈষিতাদিকে, তাই না? ঈষিতাদির মতো বউ যার ঘরে আছে, তিনি আমার মতো সাধারণ মেয়ের দিকে তাকাবেন কেন?

—ঈষিতাদিকে দেখলি তাহলে? সেদিন একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। ঈষিতাদি নাকি আর. ডি.-র সঙ্গেও একটা অ্যাফেয়ার করবার চেষ্টা করছেন। এম. আর-এর উপর রাগ করেই—

—যাহ! কে বলল তোকে?

—শিহরণদাই হাসতে হাসতে বলল সেদিন। শুনে আমি ভীষণ রাগারাগি করেছি শিহরণদার সঙ্গে। বলেছি, এটা কিন্তু ভারি অন্যায়, কেন শুধু শুধু একজন মহিলাকে নিয়ে আপনারা এভাবে ঘুরছেন? তাতে হেসে বলল, আমার আর দোষ কী! একজন মহিলা যদি যেচে এসে আমার ঘাড়ে চাপতে চায় কার কী করার আছে?

গার্গী অবাক হয়, কেন, ঈষিতাদি এরকম করছেনই বা কেন?

—শুনলাম, এম. আরের ওপর প্রতিশোধ নিতে। এম. আর- এর তো অনেক ফ্যান। প্রায়ই তো এর-ওর সঙ্গে ঘোরেন। ঈষিতাদি নাকি বেশ কদিন নিজের চোখে দেখেওছে, কোন ছাত্রীকে নিয়ে সিনেমা দেখে বেরোতে।

গার্গী কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বলল এগুলো খুব খারাপ। এতে কার কতটা লাভ হয় তা জানিনে, কিন্তু জীবনযাপনে ক্রমশ জটিলতা বেড়েই যায়। নেশাটা ফিকে হয়ে এলে পস্তাতে হয় সারাজীবন।

ডোনা হাসল রহস্যময়ী মতো। সে এসব জটিলতার প্রসঙ্গ যেভাবে এড়িয়ে যায় সেভাবেই এড়িয়ে গেল চুপচাপ থেকে। গার্গী একটু পরে বলল, চল, আমিও তোর সঙ্গে নার্সিংহোমে যাই। গিয়ে দেখে আসি তোর মিস্টারকে।

pathagar.net

ডোনা উৎসাহিত হয়ে বলল, যাবি? কিন্তু বিকেল চারটের আগে বোধহয় ঢুকতে দেবে না।

—তাহলে কোনও রেস্তোরাঁয় বসে চা খেয়ে নিই দুজনে। সঙ্গে একটা কাটলেট-ফাটলেট নিলে কিছুক্ষণ সময় কেটে যাবে।

ঠিক ঘন্টাখানেক আরও সব আগডুম-বাগডুম বকে তিনটে নাগাদ রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দুজনে চলে এল বড় রাস্তায়। একটা ট্যাক্সি পেয়ে যেতেই ডোনা ডাক দিল, অ্যাই, রোখখে। মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগল ছোটখাটো জ্যামজোম, ক্রশিংয়ে পুলিশের হাত ইত্যাদি নানান বাধাবন্ধ পেরিয়ে রডন স্ট্রিটের নার্সিংহোমটিতে পৌঁছাতে।

নিদির্ষ্ট কেবিনটিতে ঢুকে দুজনে এক আজব দৃশ্য দেখল। বিছানায় আধশোয় হয়ে তার সামনে রাখা একরাশ কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখছে মন্দার। তার হাতে একটা লালরঙের ডটপেন। এতই চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে যে, হাতের পেনটা সে কামড়াচ্ছিল দাঁত দিয়ে। মাথায় চওড়া করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ডোনাদের দেখেই কাগজগুলো একপাশে জড়ো করে রেখে ম্লান হাসল, এতদিনে মহারানির সময় হল আমাকে দেখতে আসার!

মন্দারের চোখমুখ জুড়ে থমথমে অভিমান, আর তা হওয়ারই কথা। ডোনা সামান্য হেসে অন্যভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করল, বাহ, হেড-ইনজুরি হয়ে যে মহারাজ নার্সিংহোমে ভর্তি আছে, সে আবার অফিসের কাগজপত্র দেখে কোন নিয়মে! শিগগির সরাও ওগুলো—

মন্দার যে খুবই রেগে আছে তা বোঝাতে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যেরকম সিরিয়াস ইনজুরি হয়েছে মাথায়, তাতে এ সব কাগজপত্রের জটিল হিসেবটিসেব দেখার কথা নয় ঠিকই, কিন্তু আমি তো তোমার মতো সুখী রাজকন্যা নই, একটা কোম্পানি অনেক কষ্ট করে চালাতে হয়। সেখানের একদিনের অনুপস্থিতি মানেই বিরাট লস। গত কয়েকদিন চুপচাপ শুয়েই ছিলাম। কিন্তু আজ একটু আগেই আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা দেখতে এসেছিল, তারা এই কাগজগুলো দিয়ে বলে গেল, আপনি যখন একটু ভাল আছেন, টেণ্ডারপেপারগুলো দেখে সই করে রাখবেন। কালই জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট। তাইই—

গার্গীও মৃদু ধমক দিয়ে বলল, সেদিন আপনাকে দেখে গেলাম প্রায় আনকনসাস, কথাই বলতে পারছিলেন না। এত বড় একটা হেড-ইনজুরি হয়েছে, তার মধ্যে এইসব কমপ্লিকেটেড কাগজপত্র মোটেই দেখা উচিত হচ্ছে না আপনার।

মন্দার বেশ খুশি হল গার্গীর ধমক খেয়ে। বিষণ্ণভাবে হেসে বলল, তবু যা-হোক আপনি ইনজুরির সিরিয়াসনেসটা বুঝতে পেরেছেন। অথচ আপনার বান্ধবী দেখতে আসার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি। ডাক্তার একস-রে রিপোর্ট দেখে বললেন, মাত্র একচুলের জন্য বেঁচে গেছেন। ইনটারনাল হেমারেজও নাকি সামান্য হয়েছিল। কনটিনিউ করলেই মারা যেতাম নির্ঘাত।

গার্গী আঁতকে উঠে বলল, কী ডেঞ্জারাস। তারপরও আপনি এসব জটিল কাগজপত্রে মাথা ঘামাচ্ছেন! উঁহু, মোটেই ঠিক হচ্ছে না। যাই হোক, যে কথাটা আমাকে ভাবাচ্ছে তা হল, আপনি তো বলেছেন, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাটেম্পট টু মার্ডার। আপনি কি কাউকে সন্দেহ করছেন?

মন্দার এতক্ষণে উৎসাহী হয়ে বলল, ঠিক বুঝতে পারিনি, কে আমার ক্ষতি করতে চাইছে। আমার প্রফেশনাল লাইনে অবশ্য বহু শত্রু আছে। আমি যে দ্রুত সাইন করছি আমাদের প্রফেসনে, তা অনেকেই সহ্য করতে পারছে না। তবে এ ঘটনাটা খুবই মিস্টিরিয়াস। লোকটা এর মধ্যে ডোনাকে জড়াচ্ছে কেন বুঝতে পারছিনে।

pathagar.net

হঠাৎ বিব্রত দেখাল ডোনাকে, মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, আয়্যাম ভেরি স্যরি, মন্দার। আমার কারণেই যদি তোমার এই বিপদ হয়ে থাকে, তবে জেনে রেখো, যে তোমাকে আঘাত করেছে, তাকে আমি কখনও ক্ষমা করব না।

মন্দার যেন এই কথাটাই শুনতে চাইছিল ডোনার কাছ থেকে। এতক্ষণে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, আমারও খুব খারাপ লাগছে। আমি অন্য কারও পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি এই ভাবনাটাই আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে না। যাক গে, এখন রিলিজ নিয়ে বাড়ি চলে যাব, তাতেও ঘাবড়ে যাচ্ছি। ডাক্তার অবশ্য বলছে, আরও দিনসাতেক থেকে যান। পুরোপুরি সুস্থ না করে ছাড়ব না আপনাকে। আমিও বাধ্য হয়ে রাজি হয়ে গেলাম। কারণ বলা যায় না, এখান থেকে বেরোবার পর হয়তো আবার একটা অ্যাটেম্পট হল আমার উপর। তার চেয়ে সাতদিন পরে যাওয়াই ভাল। এই সাতদিনই হয়তো অতিরিক্ত আয়ু হয়ে গেল আমার।

গার্গী এতক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছিল গভীরভাবে। এবার বলল, আপনার কিন্তু থানায় একটা এফ. আই. আর. করা উচিত, মিঃ মিত্র।

প্রস্তাব শুনে মন্দার লাফিয়ে উঠল, ঠিকই বলেছেন। এখানে টেলিফোনটা পাওয়ার পর থেকে আমি তাইই ভাবছিলাম। কালই লিখে পাঠাব থানায়।

ডোনা ততক্ষণে তার কাঁধের ঝোলাব্যাগটি থেকে বার করেছে একগুচ্ছে রঙিন ছবিওলা কার্ড। সুদৃশ্য ছবির একপাশে অলঙ্কারময় হস্তলিপিতে লেখা ডোনাদের ড্যান্স-ড্রামার বিবরণ। তারই একটি কার্ডে মন্দারের নাম লিখে ডোনা মৃদু হেসে এগিয়ে দিল, যেতে পারবে না তা তো বুঝতেই পারছি. তবু কার্ডটা দিয়ে গেলাম। শিহরণদারই লেখা নাটক। বললেন, নাটকটা লিখেছেন শ্রেফ নাকি আমার কথা ভেবেই। আমার মাথায় একরাশ ফাঁপানো চুল আছে তাইই। একেবারে নতুন ধরনের ড্যান্সড্রামা।

মন্দার তার হাতের ডটপেনটা কুট কুট করে কামড়াচ্ছিল। পেনটা দাঁতের ফাঁকেই আটকে রেখে ডানহাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিয়ে বলল, ইস, তাই নাকি? সুস্থ থাকলে নিশ্চই দেখতে যেতাম। তোমার অভিনয় দেখা সেটাও ভাগ্যের ব্যাপার। খুবই কৌতূহল হচ্ছে দেখার জন্যে।

ডোনা হেসে বলল, ব্যাড লাক। কী আর করবে। এখন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো।

—যদি নেক্সট টাইম কখনও স্টেজ হয়, বোলো কিন্তু।

—ওহ, শিওর। ঠিক আছে। গুড লাক, বলে মন্দারকে গুডবাই করে ডোনা আর গার্গী বেরিয়ে এল নার্সিংহোমের বাইরে। বেরোবার সময় গার্গী দেখতে পেল, ডোনা চলে যাচ্ছে বলে মুখটা কালো হয়ে গেল মন্দারের। বাইরে এসেই তাই অনুযোগ করতে ছাড়ল না, এ তোর কিন্তু খুবই অন্যায়, ডোনা, অসুস্থরোগী তখনই দ্রুত সেরে ওঠে, যদি তার প্রিয়জনের ঠিকমতো দেখভাল করে তাকে, কিংবা সেবা করে মনোযোগ দিয়ে। আর তুই একবার তাকে দেখতে আসার সময় পর্যন্ত পাচ্ছিস না!

আবারও কাঁচুমাচু হয়ে এল ডোনার মুখ, শেষ পর্যন্ত তুইও এরকম বললি, গার্গী? তুই তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস, কীরকম বিজি হয়ে রয়েছি আমি। তারপর হেসে আবার বলল, আমার হয়ে বরং তুইই না-হয় আর একদিন এসে দেখে যাস—

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, বেশ বলেছিস তো।

pathagar.net

আঠেরো

শিহরণ রায়চৌধুরী যে ড্যান্সড্রামাটা লিখে দিয়েছেন ডোনাদের অভিনয়ের জন্য, সেটা একেবারেই নতুন ধরনের। যে ইংরেজি গল্পটিকে তিনি নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়েছেন, সেটি সবারই পরিচিত, বিখ্যাত লেখক ও.হেনরির বিখ্যাত গল্প, দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই। ডোনাদের ক্লাসের মেয়েরাই শুধু অংশগ্রহণ করবে এই ড্যান্সড্রামাটিতে। ডোনারা সাত-আটজন মেয়ে খুব খেটেখুটে মাত্র কয়েকদিনের রিহার্স্যালে কোনও রকমে দাঁড় করিয়েছে নৃত্যনাট্যটিকে। সাত-আটখানা ইংরেজি গানও আছে যেগুলি সবই শিহরণের নিজের লেখা। গানগুলিতে ডোনারা এমন চমৎকার সুর দিয়েছে যে, যেসব অধ্যাপক মাঝেমধ্যে সময় করে রিহার্স্যাল দেখতে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এর আগেও এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দু-একবার ইংরেজি নাটক না হয়েছে তা নয়, কিন্তু কখনও ইংরেজি ড্যান্সড্রামা হয়নি। ডোনা অনেকদিন হল নাচ ছেড়ে দিয়েছে। তবু বেশ চেষ্টাচরিত্র করে আবার নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে বিদেশিনির ভূমিকায়। আগের বার 'ওথেলো' করেছিল তারা। ডোনা ডেসডিমোনার ভূমিকায় ফাটাফাটি অভিনয় করে প্রায় কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইউনিভার্সিটি চত্বর। এবার নতুন নৃত্যনাট্যটিতে তার ভূমিকা ডেলার।

কিন্তু এবারের অনুষ্ঠানটি রূপায়িত করতে যেমন হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, তেমনি এই নৃত্যনাট্যটি নিয়ে তাদের দপ্তরে নাটকও হচ্ছে কম নয়। নাটকের রিহার্স্যাল দেখে প্রায় সব অধ্যাপকই যখন প্রশংসায় মুখর, তখন একা রণজয় দত্তই নাকি বলেছেন, বাহ, এরা আর নাটক লেখানোর লোক পেল না? শেষ পর্যন্ত শিহরণ রায়চৌধুরী! সে নাটক কি লোকে দেখতে আসবে? কেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কি আর নাটক লেখানোর লোক ছিল না!

কথাটা কানে আসতে খুব ঘাবড়ে গিয়েছে ডোনা। এহেন তীব্র মন্তব্য তাকে দমিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, কেননা তাদের দপ্তরের এ ধরনের অনুষ্ঠানে সাধারণত তার ভূমিকাই প্রধান। নাটকের মনোনয়ন থেকে শুরু করে তার কাস্টিং, পরিচালনা, রিহার্স্যাল, লাইটিং স্টেজ, এমনকী আমন্ত্রণ—সবই সে একা হাতে করে। সব ব্যাপারে সে-ই প্রতিবার উদ্যোগী হয় বলে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানই সফল হয়। এবার তো আবার নৃত্যনাট্যটি লেখা তারই পরিচিতজনের। যদি দর্শক না আসে, যদি অনুষ্ঠান ঠিকমতো না করতে পারে, যদি ফ্লপ করে গোটা ব্যাপারটা, তাহলে তো সব দায়িত্ব বর্তাবে ডোনারই ওপর।

কিন্তু শোয়ের দিন দর্শকদের ঢল দেখে সবাই বিস্মিত। অবিশ্বাস্যও মনে হল ব্যাপারটা। তাদের প্রেক্ষাগৃহটিতে যত সিট ছিল, ইচ্ছে করেই তার চেয়ে দশ শতাংশ কার্ড বেশি বিলি করেছিল, যাতে কিছু আমন্ত্রিতজন শেষ পর্যন্ত না এলেও (যা প্রতিবারেই হয়ে থাকে) যেন হলটা ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সমস্ত সিট ভর্তি হওয়ার পরও কিছু বাড়তি দর্শক এসে গেছেন। কিন্তু গুঞ্জন, হইচই শুরু হতেই দ্রুত তাড়াহুড়ো করে আরও কিছু ফোল্ডিং চেয়ার জোগাড় করে সামাল দেওয়া হল পরিস্থিতি, তবু কিছু বাড়তি দর্শক রয়েই গেল শেষ রোয়ের পিছনে।

ওদিকে ডোনা ততক্ষণে নিজেকে প্রবিষ্ট করছে ডেলার চরিত্রে। বুকের ভেতরে মৃদু কাঁপুনি না আছে তা নয়, প্রতিবারই মঞ্চে নামার আগে এমন হয়ে থাকে, এবারে যেন আরও একটু বেশি, কারণ মেক-আপ রুমে বসেই খবর পাচ্ছিল, হলে তিলধারণের জায়গা নেই, তবু

pathagar.net

পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকা সাদা লেস বসানো ঝলমলে হলুদ গাউন পরে, চমৎকার মেক-আপ নিয়ে মঞ্চে নামার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল নিজেকেই যেন আর চিনতে পারল না। সে যেন এই মুহূর্তে আর ডোনা নয়, এক বিদেশিনি, যার নাম ডেলা, যার মাথায় একঢাল চুল আর চমৎকার মুখের ছাঁদ নজর কাড়ার মতো। তার ফর্সা শরীরে হলুদ গাউনটা মানিয়েওছে সুন্দর। হলুদরংটার তারই পছন্দ করা। মাত্র এই কিছুকাল আগে বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর যখন তাঁর অষ্টম বিবাহ করলেন, তখন বিবাহের আমন্ত্রণপত্রে অনুরোধ ছিল, আমন্ত্রিতরা কেউ যেন হলুদ পোশাক পরে না আসেন বিবাহ অনুষ্ঠানে। কেন এই অদ্ভুত নিষেধাজ্ঞা তা পরিষ্কার হল বিবাহের দিন। কেননা সেদিন এলিজাবেথ টেলর এমনই একটি হলুদ গাউনে নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন।

ডোনা যেন আজ সেই অপরূপ সুন্দরীর সাজে। আর মঞ্চে অভিনয়ও করল প্রায় এলিজাবেথ টেলরের মতোই। সে নিজেই অবাক হয়ে গেল তার নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে, গানগুলিও গাইল চমৎকার করে। এমনকি চলনে হাবভাবেও সে অবিকল বিদেশিনির মতো। শুধু নাটকের শেষদৃশ্যে একটি চুম্বন দৃশ্য ছিল, ঝামেলা বাধল সেই সময়েই। দেবযানী নামের যে মেয়েটি পুরুষ সেজে জিমির ভূমিকায় অভিনয় করছিল, রিহার্স্যালের সময় এই দৃশ্যটিতে ঝুঁকে পড়ে ভঙ্গি করত চুমু খাওয়ার। কিন্তু আজ মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিসত্যিই সে ডেলার ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খেয়ে নিল, বেশ একটু সময় নিয়েই। ডোনা নিজেও কম অবাক হয়নি। চুমু খেতে খেতেই ফ্রিজ হয়ে যাবে তারা, ধীরে ধীরে নেমে আসবে পর্দা, নাটকও শেষ, এরকমই পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু ঘটনা হয়ে গেল অন্যরকম। ফ্রিজ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে একদল দর্শক দাঁড়িয়ে উঠে তুমুল হাততালি দিতে থাকল প্রযোজনাকে প্রশংসা করে, আর একদল দর্শক চ্যাঁচিয়ে উঠল, স্টপ ইট, স্টপ ইট।

ডোনারা প্রথমে বুঝতেই পারেনি ব্যাপারটা। ভাবছিল, হয়তো জিমিবেশী দেবযানীকে দর্শকরা পুরুষ বলে ভেবে নিয়েছে, তাই এই চুম্বনের দৃশ্যটির প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা। দেবযানীর চেহারাটা বেশ বড়সড়, প্রায় পাঁচ-সাত হাইট, কোথায় যেন একটা পুরুষালি বলিষ্ঠতা আছে তার উপস্থিতিতে, সেটা ডোনাও বুঝতে পারছিল তাকে জড়িয়ে ধরার ভঙ্গিতে। দর্শকরা বোধহয় তাই বাড়াবাড়ি বলে মনে করছে দৃশ্যটা।

'স্টপ ইট, স্টপ, চিৎকারে হাততালি মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গেল। মঞ্চের উপর হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ডোনা আর দেবযানী। পর্দা নামাও বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। সেই মুহূর্তে কে যেন চ্যাঁচিয়ে বলল, আলো, আলো জ্বালাও শিগগির।

সে সময় স্বাভাবিক নিয়মে আলো জ্বলে ওঠারই কথা। আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল একেবারে সামনের রোয়ের কাছে কে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মুখ থুবড়ে।

হইচই, চিৎকার, চ্যাঁচামেচির মধ্যে শোনা গেল, খুন, খুন, মার্ডার।

মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে ডোনারা চমকে উঠল তৎক্ষণাৎ, ততক্ষণে দর্শকদের মধ্যে প্রবল হৈ-চৈ, হুড়োহুড়ি। সবাই একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। তার ভেতর প্রবল ঠেলাঠেলি, গুতোগুতি—কেউ কেউ আহতও হল ভীষণভাবে।

মঞ্চের উপর ডোনাদের এক অধ্যাপক ত্রিদিবেশবাবু মাইক নিয়ে বলতে লাগলেন, আপনারা অযথা হুড়োহুড়ি করবেন না। আস্তে আস্তে একে-একে বাইরে যান। কোনও ভয় নেই। মনে হচ্ছে, এটা একটা দুর্ঘটনা।

pathagar.net

ডোনারা সবাই পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে তখন। ভিড় একটু হালকা হলে দেখা গেল, একেবারে সামনের রোয়ের কাছে তখনও বেশ কিছু লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার-চ্যাচামেচি করছে. কেউ বলছে, শিগগির হাসপাতালে নিয়ে চল। কেউ বলছে জল নিয়ে আয়।

ডোনারা কয়েকজন তাদের মেক-আপ করা অবস্থায়ই ছুটে গেল সেদিকে। ভিড় ঠেলেঠুলে কোনওক্রমে কাছে গিয়ে দেখল, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা এক ভদ্রলোক উপুড় হয়ে আছেন নিশ্চল হয়ে। তার সাদা পাঞ্জাবি রক্তে ভেজে লাল হয়ে গেছে। আরও একটু কাছে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখ তার চোখে পড়তে সে একদম নিশ্চল হয়ে গেল। খুন হয়েছেন শিহরণ! একটা গুলি ভেদ করে চলে গিয়েছে তাঁর হৃৎপিণ্ড।

উনিশ

রক্তাক্ত একটা মৃতদেহ এভাবে পড়ে আছে দেখে তখন প্রবল বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। এভাবে জনাকীর্ণ জায়গায় অন্ধকারের মধ্যে কীভাবে খুন হলেন শিহরণ তা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। ভয়ার্ত, আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে আছে সবাই।

গার্গী গ্রিনরুমের ভেতরেই ছিল। হইচই শুনে ছুটে এসে নিচে এহেন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠল সেও। ওদিকে ডেলার পোশাক পরা ডোনার চোখ আতঙ্কে ছিটকে বেরোচ্ছে যেন। তারও চোখের সামনে ঝাপসা, অন্ধকার ঠেকছে সব। একটু পরেই কেউ যেন বলল, হাসপাতালে নিয়ে গেলে হত।

একজন কাছে গিয়ে শিহরণের নাড়ি টিপে ধরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, তার আর দরকার হবে না বোধহয়। হি ইজ ডেড।

ততক্ষণে গার্গী দেখতে পেল, সেখানে জড়ো হয়েছেন চিত্রদীপ, বনানী আরও অনেকে। চিত্রদীপ প্রায় পাগলের মতো মাথা নাড়ছেন, অ্যাবসার্ড, অ্যাবসার্ড। বনানী ভয়ার্ত, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন শিহরণের মৃতদেহের দিকে। যেন কারোরই বিশ্বাস হচ্ছে না এরকম ভয়ঙ্কর একটি ঘটনা সহসা ঘটে যেতে পারে প্রেক্ষাগৃহের ভেতর। একটু দূরেই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে অলর্ক। ভিড়ের ভেতর একপাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে মণীশ রায়। আরও অনেক চেনাজানা লোক দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছে শঙ্কিত দৃষ্টি ছড়িয়ে।

তখনও টাটকা রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের মেঝে। এহেন বীভৎস দৃশ্যের সামনে একজন মহিলা চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর স্বামী ঠিকঠিক সময় ধরে না ফেললে আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল শুশ্রূষা করতে।

দেখতে দেখতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা। এমনিতেই সারাদিন প্রবল টেনশনে, খাটাখাটুনিতে পরিশ্রান্ত হয়েছিল, তার ওপর এরকম একটা শক ভাবতেই পারছে না সে। তার একটু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল গার্গী, সে চট করে ডোনার কাছে গিয়ে বলল, এদিকে আয়, ডোনা, বাইরে যাই—

তার পরের মুহূর্তগুলো তাদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। হাসপাতাল, থানা, পুলিশ—এদের কারোরই মুখোমুখি হওয়া কোনও সুস্থ মানুষের পক্ষে কাম্য নয়। অনেক

pathagar.net

জিজ্ঞাসাবাদ, জেরা, খুঁটিনাটি নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতে প্রত্যেকেই জেরবার হয়ে গেল।

অভিনয়ের প্রবল পরিশ্রমের পর কোথায় ডোনারা স্বস্তির শ্বাস ফেলে একটু বিশ্রাম নেবে, পরিবর্তে সে রাতটা তাদের কাটল এক ভয়াল দুঃস্বপ্নের ভেতর। টেনশনে, শোকে, দুশ্চিন্তায় সারাটা রাত ছোটাছুটি করে যখন ভোর হল, তখন ডোনাদের বাড়ির তিনজন মানুষের চেহারা হয়ে দাঁড়াল বিধ্বস্ত, ঝোড়ো-কাকের মতোই।

শিহরণ রায়চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনায় যেমন শোকস্তব্ধ হয়ে গেছে ডোনাদের বাড়ির সবাই, তেমনই বিহ্বল হয়ে গেছে গার্গীও। পরের দিন পোস্টমর্টেমের ঝামেলা তো আছেই, তাছাড়া ডোনাদের বাড়ি অসংখ্য লোকের যাতায়াত, ফোন ইত্যাদিতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল সবাই। সারারাত ঘুম হয়নি কাল, ক্লান্তিতে, উত্তেজনায়, আতঙ্কে কেউ আর দাঁড়াতে পারছে না পায়ের পাতা মেলে। গার্গী সামান্য সময়ের জন্য বাড়ি গিয়েছিল, তার মা ও দাদা খুবই দুশ্চিন্তায় ছিলেন, গার্গী অবশ্য মাঝরাতের দিকে একবার ফোন করে দিয়েছিল, সে রাতে ফিরতে পারবে না জানিয়ে। ভোরে বাড়ি গিয়ে চেষ্টা করল ঘুমোতে, কিন্তু ঘুমই এল না। দুপুরে খেয়েদেয়ে ফের চলে এল ডোনাদের বাড়ি। শিহরণের সঙ্গে তার সামান্য পরিচয় হয়েছিল একদিন, না হওয়ার মতোই, কিন্তু সে এটুকু জানত, শিহরণ ডোনাদের বাড়িতে পরিবারের একজনের মতোই বাস করতেন। সেই শিহরণ হঠাৎ প্রেক্ষাগৃহের ভেতর ভিড়ের মধ্যে গুলিতে নিহত হয়েছেন এটা যেমন আশ্চর্যের, তেমনই রহস্যেরও।

ভোর রাতে থানা থেকে টেলিফোন এসেছিল ডোনাদের বাড়ি, পুলিশ অফিসার তুষারশুভ্র মিত্র বিকেলের দিকে আসবেন ঘটনার তদন্ত করতে। ডিটেকটিভ বইয়ে এহেন তদন্তের কথা হাজারবার পড়া থাকলেও কখনও স্বচক্ষে খুনের তদন্ত দেখেনি গার্গী। তাই তার ভেতরে উসকে উঠছিল একটা প্রবল কৌতূহল। কলকাতা শহরে খুনের কিনারা আজকাল হয় না বললেই চলে। এখানে সেই অর্থে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভও নেই যার নাম শহরবাসী একডাকে জানে। যা কিছু ইনভেস্টিগেশন তা কলকাতা-পুলিশেরই একচেটিয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রে চার্জশিট দিতে দিতেই তারা বছর পার করে দেয়। বহু ক্ষেত্রে চার্জশিটই দিতে পারে না। কোর্টে মামলা খারিজ হয়ে যায় প্রমাণের অভাবে। এখন এহেন একটি জলজ্যান্ত খুনের রহস্য কীভাবে উদ্ঘাটিত হয় তা দেখার জন্য উত্তেজনায় টানটান হয়ে আছে গার্গী।

শেষ-দুপুরের একটু আগেই ডোনাদের বাড়ি পৌঁছে দেখল, গোটা বাড়ির পরিবেশ থমথম করছে। চিত্রদীপ পাগলের মতো মাথা নাড়ছেন মাঝেমাঝে, কী সব বকছেন বিড়বিড় করে, কখনও পায়চারি করছেন অস্থিরভাবে, কখনও স্টাডির চেয়ারে গিয়ে বসে থাকছেন অপ্রকৃতিস্থের মতো, আর বলছেন, আমার সব শেষ হয়ে গেল। বনানী তাঁর শোওয়ার ঘরে বসে আছেন গুম হয়ে। ডোনা বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল অন্যমনস্কের মতো। বোঝাই যাচ্ছে, পড়ার মতো মানসিক স্থৈর্য তার নেই। গার্গীকে দেখে ম্লান হেসে বলল, এসব কী হয়ে গেল বল তো?

গার্গী কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না। কাল থেকে ডোনার পাশে পাশে থেকে ক্রমাগত সান্ত্বনা দিয়ে গেছে। ঘটনাটা এতই আকস্মিক, এমনই অনভিপ্রেত যে এখন কী ধরনের ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে তা কেউই জানে না। গার্গীকে কোনও কথা না বলতে দেখে

pathagar.net

ডোনা আবার বলল, বাবা তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বারবার বলছে, পুলিশ ঘরে ঢোকা মানে সমূহ সর্বনাশ। এখন কত যে ঝড় বয়ে যাবে এ বাড়ির ওপর দিয়ে তা ভাবা যাচ্ছে না।

গার্গী আবারও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে, দ্যাখ, এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। পুরোপুরি অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, একজ্যাক্টলি কী হয়েছে তা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। অতএব অনর্থক ভাবনাচিন্তা করাটা ঠিক নয়। পুলিশ আসুক, ইনভেস্টিগেট করুক, ল উইল টেক ইটস ওন কোর্স। তবে ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের। কানায় কানায় ভর্তি হল, তার মাঝখানে হঠাৎ একজন লোকের পিঠে গুলি চালিয়ে হত্যাকারী কীভাবে গা ঢাকা দিল তাই ভেবে অবাক হচ্ছি।

ডোনার গলাটা ধরে এল, ব্যাপারটা আমার এখনও বিশ্বাস হয় না। হঠাৎ কে এমনভাবে শিহরণদাকে—

ডোনার কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় কলিং বেলের গুঞ্জন। ডোনাই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে দিতেই একজন স্মার্ট পুলিশ অফিসার বুটের শব্দ তুলে ঢুকলেন লিভিংরুমের ভেতর। তার সঙ্গে জনা দুয়েক কনস্টেবল, তাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে পুলিশ অফিসারটি দৃপ্তভঙ্গিতে মুখোমুখি হলেন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির, নমস্কার, আমার নাম তুষারশুভ্র মিত্র। কালরাতেই একবার আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, বোধহয় মনে আছে।

স্ট্যাডিতে কয়েকটি চেয়ার, কুশন-পাতা মোড়া ছড়ানো ছিটোনো, তারই একটায় মৃদুকণ্ঠে পুলিশ অফিসারকে বসতে বলে চিত্রদীপ বললেন, হুঁ, বলুন, কী জানতে চান?

পুলিশ-অফিসার একটা কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসলেন, হাতের ছোট্ট ডায়েরিটা খুলে কিছু যেন পড়লেন মন দিয়ে। হয়তো কাল রাতে ঘটনাস্থলে গিয়ে যা যা দেখেছিলেন, বা শুনেছিলেন এর-ওর মুখে, তাইই নোট করা রয়েছে সেখানে। তারপর পকেট থেকে পেন বার করতে করতে বললেন, কাল রাতে আপনারা সবাই তো ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন, তাই না?

চিত্রদীপ পাইপ দাঁতে কামড়ে এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ছিলেন পুলিশ-অফিসারের দিকে। প্রশ্ন শুনে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, হুঁ, সবাই।

—সবাই মানে?

—আমি, আমার স্ত্রী বনানী। আমার মেয়ে ডোনা কাল নাটকে অংশ নিয়েছিল, নিশ্চয় শুনেছেন। এ ছাড়া শিহরণ। ·

ডায়েরিতে নোট করতে করতে তুষারশুভ্র মিত্র আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, অন্য কোনও প্রশ্নে যাওয়ার আগে কাল রাতে ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছিল, একটু ডিটেলসে শুনতে চাই প্রথমে।

পাইপে কয়েকবার ফুকফুক করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, কোন ঘটনা?

—শিহরণ রায় চৌধুরী কীভাবে খুন হলেন কাল সন্ধেয়?

—কীভাবে খুন হলেন সেটা তো বলতে পারব না। তবে ওদের ড্যান্সড্রামার লাস্ট সিনে, শেষ দৃশ্যে আজকালকার নাটকে যেরকম হয়, হঠাৎ ফ্রিজ হয়ে যায় কুশীলবরা। দর্শকরা সবাই দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তুমুল অভিনন্দন দিচ্ছে, ঠিক সেসময় মনে হল, কেউ যেন ধপ করে পড়ে গেল মেঝেয়। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায়নি কী হল, কীভাবে হল। তারপর আলো জ্বালাতেই দেখা গেল, একজন ধুতি-পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক উপুড় হয়ে পড়ে আছেন মেঝেয়, তার পিঠের দিকে পাঞ্জাবি রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

pathagar.net

—শিহরণ রায়চৌধুরী বোধহয় একেবারে সামনের রোয়েই বসেছিলেন?

চিত্রদীপ ঘাড় নাড়লেন, একেবারে ফ্রন্ট রোতেই। সে-ই কালকের ড্যান্সড্রামার স্ক্রিপ্ট লিখেছিল। তাই নাট্যকার হিসেবে এই সম্মানটুকু তাকে দিয়েছিল ওরা।

—ও, আর আপনারা কোথায় বসেছিলেন?

—আমরাও ফ্রন্ট রোতেই বসেছিলাম। শিহরণের বাঁ পাশে বনানী, বনানীর পাশে আমি। ড্যান্সড্রামার হিরোয়িনের বাবা-মা হিসেবে আমাদেরও গেস্ট কার্ড দিয়েছিল।—শিহরণবাবুর ডানপাশে কে ছিলেন?

—অলর্ক বোস নামের এক যুবক।

—তিনিও কি ওদের গেস্ট ছিলেম?

—হ্যাঁ। অলর্ক ওদের ফাংশনের একজন পৃষ্ঠ-পোষক ছিল। কালকের স্টেটসম্যান আর টেলিগ্রাফে ওদের ফাংশনের বিজ্ঞাপন স্পনশর করেছিল সে।

—ও, শিহরণবাবুর পেছনের রোয়ে কি আপনাদের চেনা কেউ বসেছিল?

চিত্রদীপ একটু ভেবে বললেন, হলের প্রথম দুটো রোয়ে বেশির ভাগই ছিলেন ওদের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা আর ড্যান্সড্রামার কুশীলবদের পেরেন্টস্‌রা। এর চেয়ে ডিটেল্‌সে আমি বলতে পারব না।

—আচ্ছা, আপনারা যখন শিহরণবাবুর পাশেই বসে ছিলেন, তখন কোনও গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?

চিত্রদীপ একমুহূর্তে থমকে গিয়ে বললেন, না, শোনা সম্ভবও নয়। কারণ নাটক শেষ হওয়ামাত্র হলের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছিল। দু-একজন সিট ছেড়ে বেরিয়েও পড়েছিল ডানপাশের রো আর বাঁ পাশের রোয়ের মাঝখানে প্যাসেজে। প্রশংসাসূচক কিছু ধ্বনিও ভেসে আসছিল চারপাশ থেকে। এত হট্টগোলের মাঝখানে আমি অন্তত কিছু শুনতে পাইনি। বনানী, তুমি কিছু শুনেছিলে?

বনানী বসেছিলেন একটু দূরে একটা মোড়া টেনে নিয়ে, ঘাড় নেড়ে বললেন, না।

—শিহরণবাবু যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তা আপনারা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছিলেন?

চিত্রদীপ নয়, উত্তর দিলেন বনানীই, হ্যাঁ, আমার পাশেই বসেছিল শিহরণ। হাততালি দিতে দাঁড়িয়েও উঠেছিল মনে হল। তারপরই মনে হল, কে যেন ওকে ঠেলে ফেলে দিল।

—পেছন থেকে কেউ?

—আসলে সেসময় ভিড়টা কয়েক মুহূর্তের জন্য এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। সিনেমা বা থিয়েটারের শো-ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হয়ে থাকে। কিছু লোক দাঁড়িয়ে পড়ে, কিছু গেটের বাইরে বেরোবার জন্য হুড়মুড় করে এগিয়ে যায়, তেমনি কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে আবার পেছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিল অভিনন্দন জানাতে।

দ্রুত হাতে তাঁর ডায়েরিতে কিছু পয়েন্টস নোট করে নিতে নিতে তুষারশুভ্র মিত্র এবার হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, আচ্ছা, শিহরণবাবুর সঙ্গে আপনাদের কতদিনের সম্পর্ক? উনি তো এ বাড়িতেই পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতেন?

উত্তর দিলেন চিত্রদীপ, তা প্রায় এক বছরের ওপর হয়ে গেল শিহরণ এ বাড়িতে ছিল।

—হঠাৎ উনি কীভাবে পেয়িংগেস্ট হয়ে এলেন এ বাড়িতে? আগে থেকে পরিচয় ছিল নাকি ওঁর সঙ্গে?

pathagar.net

—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, 'পেয়িংগেস্ট চাই' বলে। তাতে শিহরণ অ্যাপ্লাই করেছিল—

—হঠাৎ একজন অপরিচিত ব্যক্তি আপনাদের বাড়ি পেয়িংগেস্ট হিসেবে এন্ট্রি পেলেন? তার সম্পর্কে কোনও খবরাখবর নিলেন না?

কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন চিত্রদীপ, হঠাৎ বনানী বললেন, শিহরণ আমার সঙ্গে এক কলেজে পড়ত। সে প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর আগেকার কথা। আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তরে ও এসে দেখা করেছিল। চেনা লোক বলে আর আপত্তি করিনি।

—গত কুড়ি বছরের মধ্যে আপনার সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ ছিল না?

বনানী ঘাড় নাড়ালেন, না।

—শিহরণবাবু কি কলেজে পড়াকালীন আপনার বন্ধু ছিল?

ইতস্তত করে বনানী বললেন, ওই আর কি। একসঙ্গে পড়তে পড়তে যেরকম বন্ধুত্ব হয়ে থাকে।

তুষারশুভ্র মিত্র এবার তাকালেন চিত্রদীপের দিকে, শিহরণবাবুর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কীরকম ছিল?

দ্রুত উত্তর দিলেন চিত্রদীপ, ভাল। খুব ভাল। শিহরণ প্রায় আমাদের বাড়ির একজন হয়েই ছিল। আমরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতাম।

—ও, আচ্ছা। স্ত্রীর পুরুষবন্ধু কোনও পরিবারে পেয়িংগেস্ট হয়ে এলে হঠাৎ কখনও কখনও গোলযোগ দেখা দেয়। আপনাদের পরিবারে সেরকম হয়নি?

চিত্রদীপ দ্রুত ঘাড় নাড়লেন, কখনও না।

—শিহরণবাবু তো ব্যাচেলর ছিলেন, তাই না?

—হ্যাঁ।

—এখানে আসার আগে শিহরণবাবু কোথায় থাকতেন?

চিত্রদীপ আর বনানী একবারে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে নিলেন। তারপর চিত্রদীপ বললেন, ঠিক কোথায় থাকত তা জানি না। তবে কোনও মেসে থাকত শুনেছি।

—ওঁর বাড়িতে কেউ নেই? বাবা-মা, ভাই-বোন?

—ঠিক জানা নেই।

—কখনও জিজ্ঞাসা করেননি?

—না, দরকার হয়নি।

—কেউ কখনও ওঁর সঙ্গে এ-বাড়িতে দেখা করতে আসত?

—আত্মীয়স্বজন কেউ কখনও এসেছে বলে দেখিনি। ও যে কলেজে পড়ায়, সেখান থেকে কখনও অধ্যাপক বা ছাত্রছাত্রীরা কখনো-সখনো এসেছে।

—কাল আপনারা সবাই একই সঙ্গে ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন?

চিত্রদীপ একটু ভেবে নিয়ে বললেন, না। ডোনা দুপুরেই চলে গিয়েছিল। ও-ই ড্যান্স ড্রামার ডিরেক্টর ছিল, অতএব প্রস্তুতির ব্যাপারে আগেই যেতে হয়েছিল ওকে। আমি আর বনানী সন্ধের সময় একসঙ্গে গিয়েছিলাম গাড়িতে।

—আর শিহরণবাবু?

—শিহরণ কাল ভোরেই বেরিয়ে গিয়েছিল। ওর নানারকম কাজ থাকে। দুপুরে বোধহয় কলেজে কী একটা মিটিংও ছিল। সেখান থেকে সোজা এসেছিল ফাংশনে।

pathagar.net

—হলে ঢোকার আগে আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হয়েছিল। কিন্তু ও বলল, আপনারা ভেতরে ঢুকে যান। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

—কেন, পরে কেন?

—বোধহয় কারও জন্য অপেক্ষা করছিল।

—কার জন্যে, জানতেন?

—বোধহয় অলর্কের জন্য।

—অলর্ক কে?

—একজন ব্যবসায়ী। একটু আগেই আপনাকে বলেছি, সে ডোনাদের ফাংশনের বিজ্ঞাপন স্পনশর করেছিল কাগজে।

তুষারশুভ্র মিত্র আবার কীসব নোট করলেন ডায়েরিতে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অলর্কবাবুর সঙ্গে শিহরণবাবুর সম্পর্ক কী?

—অলর্ক আপাতত আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড। প্রায়ই আসে আমাদের বাড়ি। সেই সূত্রে শিহরণের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।

একটু থেমে কী যেন ভেবে হঠাৎ তুষারশুভ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের বাড়িতে একটা পিস্তল আছে না?

চিত্রদীপ এতক্ষণে যেন বেশ নার্ভাস হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ।

—কই দেখি, একবার দেখান তো আমাকে?

চিত্রদীপ এতক্ষণ যথাসম্ভব শান্তমেজাজেই কথা বলছিলেন, হঠাৎ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ মেজাজে বলে উঠলেন, কেন, পিস্তল দেখতে চাইছেন কেন? আপনি কি ভাবছেন, আমি মার্ডার করেছি?

—তা তো বলিনি। পিস্তলটা একবার দেখতে চেয়েছি মাত্র।

চিত্রদীপ বনানীর দিকে তাকিয়ে বললেন, নিয়ে এসো তো পিস্তলটা। বেডরুমে আলমারির ভেতর রাখা আছে।

বনানীকে বেশ বিব্রত দেখাল। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে উঠে গেলেন শোওয়ার ঘরের দিকে। একটু বেশিই সময় নিলেন খোঁজাখুঁজি করতে। তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, ওটা কি আলমারির মধ্যেই ছিল?

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, হ্যাঁ।

আবার থমকে গিয়ে বনানী বললেন, কই, নেই তো—

—নেই। চিত্রদীপ লাফিয়ে উঠলেন, অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ বনানীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, কই দেখি—

চিত্রদীপও ঘরে ঢুকে আলমারি টুঁড়ে ফেললেন আঁতিপাতি করে। তাক থেকে জিনিসপত্র ছুড়ে ছুড়ে ফেললেন মেঝেয় তবু কোথাও পিস্তলটির সন্ধান না পেয়ে বিভ্রান্তমুখে বেরিয়ে এলেন বাইরে। স্টাডির একোণ-ওকোণ খুঁজলেন, যাবতীয় ড্রয়ার টেনে টেনে দেখতে লাগলেন কোথাও ভুলে রেখেছেন কি না পিস্তলটা। তারপর আবার ঘরে গেলেন। খাটের বিছানা উল্টেপাল্টে দেখলেন অনেকক্ষণ, তারপর বিড়বিড় করতে লাগলেন আপনমনে, স্ট্রেঞ্জ! কোথায় রাখলাম সেটা!

পুলিশ-অফিসার আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কী! খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না পিস্তলটা?

pathagar.net

চিত্রদীপ প্রায় বোবা হয়ে গেছেন যেন। অনেকক্ষণ থম হয়ে থেকে হঠাৎ বনানীর দিকে তাকালেন, তুমি জানো কিছু এ ব্যাপারে?

বনানী নার্ভাস হয়ে বললেন, না তো।

—ডোনা, তুই জানিস কিছু?

ডোনা অবাক হয়ে যাচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারস্যাপার দেখে। বলল, পিস্তল নিয়ে আমি কী করব?

—তা হলে কোথায় গেল সেটা? চিত্রদীপকে প্রায় ক্ষিপ্ত দেখায়।

ডোনা বিব্রত হয়ে বলল, নিশ্চয় কোথাও আছে ঘরের ভিতর যা এই মুহূর্তে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে।

পরের কয়েক মুহূর্ত ঘরের ভিতর এক থমথমে অবস্থা। চিত্রদীপ কিছুটা বিভ্রান্ত, কিছুটা ক্রুদ্ধ কিছুটা অসহায়। ওদিকে পুলিশ-অফিসারের মুখ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠছে। হঠাৎ চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠলেন, কিন্তু পিস্তলটা হোয়ারঅ্যাবাউটস যে আমার চাইই, মি. চ্যাটার্জি।

চিত্রদীপ বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কি ভাবছেন, কাল আমার পিস্তল থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছে?

তুষারশুভ্র মিত্র মুচকি হাসলেন, এতক্ষণ তা না ভাবলেও আপাতত তাইই ভাবতে বাধ্য হচ্ছি। জিনিসটা তো আর পাখি নয় যে ডানা মেলে উড়ে যাবে জানলা দিয়ে।

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কি হাতে পেয়ে গেছেন, মি. মিত্র?

তুষারশুভ্র মিত্র অবাক হয়ে বললেন, না, তা পাইনি।

—তাহলে কী করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছেন যে আমার পিস্তলই ব্যবহার হয়েছিল কাল?

—আপনার পিস্তল যে ব্যবহার হয়নি তা প্রমাণ করতেই এক্ষুনি সেটা আমার সামনে বার করে দেওয়া উচিত, মি. চ্যাটার্জি। দিলেই তো পরিষ্কার হয়ে যাবে, কাল সেটা ব্যবহার হয়েছিল, কি হয়নি। লুকিয়ে রেখেছেন বলেই তো সন্দেহ করছি।

—লুকিয়ে! বলতে বলতে হঠাৎ কেমন স্তব্ধ হয়ে গেলেন চিত্রদীপ।

পুলিশ-অফিসার এবার উঠে দাঁড়ালেন, চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, আপনি ভাল করে ঘর সার্চ করে দেখুন। কাল সকালের মধ্যে খুঁজে বার করে দেখিয়ে আসবেন থানায়। নইলে আমরাই ঘর সার্চ করতে বাধ্য হব।

চিত্রদীপ প্রায় ক্রুদ্ধচোখে তাকালেন তুষারশুভ্র মিত্রের দিকে, তারপর চোখে আগুন জ্বেলে তাকালেন বনানীর দিকে, হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তুমি নিশ্চয় জানো পিস্তলটা কোথায়? আমি এই সেদিন রেখেছি আলমারির ভেতর।

বনানী ততক্ষণে প্রায় হিম হয়ে গেছেন ভয়ে, ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে তাঁর, ঘর সার্চ হবে শুনে হঠাৎ বললেন, সেদিন অলর্কের সঙ্গে শিহরণ যখন খড়্গাপুরে গেল, আমাকে বলল, পিস্তলটা একটু দেখি। আমি বললাম, কেন? বলল, দরকার আছে। পিস্তলটা বার করে ওর হাতে দিতেই বলল, খড়্গাপুর থেকে ফিরে এসেই দিয়ে দেব তোমাকে।

কথাটা শুনে চিত্রদীপ প্রায় অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে রইলেন, আর তুমি তাই দিয়ে দিলে?

পুলিশ-অফিসারের চোখেও তখন ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস। একটু আগেই বনানী বলেছেন, তিনি জানেন না কোথায় গেল পিস্তলটা, এখন আবার বলছেন—

pathagar.net

বনানী কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন, কী করব। চট করে পকেটে পুরে নিল যে, বলল, খড়্গপুরে ঝামেলা হতে পারে। কাছে থাকা ভাল।

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন, কীসের ঝামেলা?

—অলর্ক যাদের ওখানে গিয়েছিল, সেটা খুব ভাল জায়গা নয়। ওর কোম্পানির সাপ্লায়ার হবে বোধহয়। ওরা নাকি সেখানে একটা ঝামেলা এক্সপেক্ট করেছিল।

—তা সত্ত্বেও সেখানে যাওয়ার দরকার কী ছিল?

—অলর্ক নাকি অনেক টাকা অ্যাডভান্স করে ফেলেছে ওদের। সেটা শিহরণের পরামর্শক্রমেই। কিন্তু তারপর সাপ্লায়ার ক্রমাগত ঘোরাচ্ছিল ওদের। তার আগের সপ্তাহে পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয় তাদের সঙ্গে বেশ ঝগড়াও হয়ে গেছে। টাকাটা আদায় করার জন্যই নাকি গিয়েছিল ওরা।

চিত্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললেন অদ্ভুত তো, এতসব ঘটনা ঘটে গেছে আর আমি কিছুই জানতে পারিনি। তা শিহরণ খড়্গপুর থেকে ফিরে এসে আর ফিরিয়ে দেয়নি পিস্তলটা?

—আগের দিন অনেক রাতে ফিরেছিল। তখন আর জিজ্ঞাসা করতে মনে নেই। পরদিন সকালে উঠেই বেরিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সোজা ফাংশনে। এর মধ্যে কোনও কথা হয়নি আমার সঙ্গে।

—খড়্গপুরে কোনও গোলমাল হয়েছিল নাকি?

—বললাম তো, আমার সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি।

—আশ্চর্য!

চিত্রদীপ বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে নির্বাক হয়ে গেলেন হঠাৎ। বনানীর কথাগুলো কিছুই সেঁধুচ্ছে না তাঁর মগজে। যেন এক ভয়ঙ্কর খাড়াই পাহাড় থেকে সহসা তাঁকে গড়িয়ে দেওয়া হল নিচে।

চিত্রদীপের বিস্ময় কিন্তু একটুও প্রভাবিত করল না পুলিশ অফিসারটিকে। গম্ভীর কৌতূহলের সঙ্গে ভ্রূকুটি করে শুনছিলেন এতক্ষণের কথোপকথন। চিত্রদীপ 'আশ্চর্য' বলে চুপ হয়ে যেতেই হা হা করে হেসে উঠে বললেন, বাহ্, ভাল গল্প ফেঁদেছেন তো আপনারা। প্রায় রূপকথার মতোই লাগছে শুনতে। কিন্তু এসব ছেঁদো গপ্পে আমি ভুলছি নে। পিস্তলটা আমাকে দেখাতেই হবে। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো মি. চ্যাটার্জি, হঠাৎ কী এমন প্রয়োজন হল যার জন্য এই বয়সে, পিস্তল কেনার দরকার হল আপনার?

চিত্রদীপ তখনও স্তব্ধ হয়ে আছেন। কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে কটমট করে তাকালেন তুষারশুভ্র মিত্র, আপনাকে একদিন সময় দিলাম, মি. চ্যাটার্জি। তার মধ্যে পিস্তলটা থানায় গিয়ে শো করে আসবেন। নইলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব।

বলে আর দাঁড়ালেন না। বুটে গটগট শব্দ তুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

pathagar.net

কুড়ি

পুলিশ ইনস্পেক্টর চলে যাওয়ার পর ঘরের ভেতরে প্রথমে কিছুক্ষণ পিনপতন নিস্তব্ধতা। তারপর চিত্রদীপের মুখচোখ হিংস্র হয়ে উঠল, যেন বনানীর ওপর লাফিয়ে পড়বেন বাঘের মতো। ডোনা দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিত হয়ে। কয়েকদিন আগে চিত্রদীপ একটা পিস্তল এনেছেন এইটুকুই জানত সে। কিন্তু তার ফল যে এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা ভাবতেই পারছে না এখন। বনানী কেনই বা হঠাৎ শিহরণকে দিতে গেলেন কে জানে! তারপর সেটা এখন কোথায় তা একমাত্র শিহরণই জানতে পারেন হয়তো। কিন্তু সেই শিহরণই এখন সবাইকার ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ দু-একদিনের মধ্যে থানায় সেটা না দেখাতে পারলে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই।

গার্গী একপাশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিল। এইমুহূর্তে কিছু একটা না করলে ঘরের অবস্থা যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে তা অনুধাবন করে সে দ্রুত এগিয়ে গেল চিত্রদীপের কাছে, বলল, আঙ্কেল, আমার মনে হয় নিশ্চই কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে পিস্তলটা। আপনি দু-একদিন অপেক্ষা করুন। ঘরের ভেতরটা একটু খোঁজাখুঁজি করি আমরা, বিশেষ করে শিহরণদার ঘর। না হলে, শিহরণদা কাল কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন আমরা খবর নিয়ে দেখছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওটা পাওয়া যাবেই।

এমন জোর দিয়ে কথাগুলো বলল গার্গী যে, চিত্রদীপ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন হয়তো। মুখের হিংস্রভাব কমে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল এক ধরনের অসহায়তা, কেবল বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, হোপলেস হোপলেস ইট'স অল হোপলেস, আমাকে এরা সবাই প্ল্যান করে ডোবাবে ঠিক করেছে। দ্যাট ডার্টি উওম্যান, ক্যারাকটারলেস, নিশ্চয় কোনও একটা কনস্পিরেসি করেছে—

বলতে বলতে প্রায় টলমল পায়ে ঢুকে গেলেন শোবার ঘরে। গিয়ে ধপাস করে পড়ে গেলেন বিছানায়। বোধহয় শক্‌টা এত প্রবল হয়ে ধাক্কা দিয়েছিল যে, চোখ বুজে শুয়ে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন নিজেকে।

গার্গী ডোনাকে টেনে নিয়ে গেল তার ঘরে, বলল, কী ব্যাপার বল তো, ডোনা। আমার তো সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে অ্যাবসার্ড মনে হচ্ছে। ডোনা তখনও বিভ্রান্ত, আমারও তাই। মা হঠাৎ কেন যে শিহরণদাকে—। তাছাড়া, শিহরণদা কেন পিস্তল নিয়ে গেলেন খড়্গপুরে, তাও তো আমার মাথায় ঢুকছে না।

গার্গী কড়া চোখে তাকাল ডোনার দিকে, সবকিছুই এখন ভারি রহস্যময় মনে হচ্ছে। তোদের বাড়িতে পর-পর এমন কতকগুলো ব্যাপার ঘটে গেল যা শুধু অদ্ভুত নয়, ভয়ঙ্কর। প্রথমে মন্দারবাবুর কথাই ধর। হঠাৎ কে বা কারা তাকে খুন করার চেষ্টা করল। বেচারি প্রাণে বেঁচে গেছে কপাল জোরে। তারপর এখন টেলিফোন কেউ হুমকি দিচ্ছে তাকে এবং তার কেন্দ্রবিন্দু তুইই। তারপর শিহরণদা খুন হলেন। এর পেছনে কারও কোনও মোটিভ আছে বলে তোর মনে হয়?

ডোনা ঠোঁট কামড়াতে লাগল অন্যমনস্ক হয়ে। তার মুখে চিন্তার ছাপও। গার্গী তার মুখের দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ ধরে নিল ব্যাপারটা, একটু ধমক দিয়েই বলল, কোনও ঘটনা এখন একদম লুকোবি নে, ডোনা। কিছু চেপে যাওয়া মানে প্রথমেই বিপদে পড়বেন তোর বাবা।

pathagar.net

অন্তত পিস্তলটা যে করে হোক উদ্ধার করতেই হবে এই মুহূর্তে। যা তোর মনে আসছে, খোলসা করে বল তো—

ডোনার মনে তবু দ্বিধা যায় না। কিছুক্ষণ দোনামোনা করে হঠাৎ বলল, দ্যাখ, অলর্ক বোসকে আমার সন্দেহ হচ্ছে।

গার্গী চমকাল কম নয়। তবু একটি হত্যাকাণ্ডের পর কোনও তথ্যই অসম্ভব মনে না হওয়াই স্বাভাবিক। ডোনার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, কেন?

—আসলে পর-পর দুটো ঘটনা ঘটে গেল, সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভাবনাটা মনে এল হঠাৎ। বুঝলি, অলর্ক হঠাৎ ভীষণ ইন্টারেস্টেড হয়ে উঠেছে আমার সম্পর্কে। আমাকে তার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের বিজ্ঞাপনের এক্সক্লিউসিভ মডেল করেই শখ মেটেনি, সেদিন বলল, তার জীবনেও আমাকে এক্সক্লিউসিভ হিসেবে চায়—

—তাই নাকি! গার্গী আবার চমকাল।

—তারপর একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, হু ইজ মন্দার? তারপরই তার ওপর খুনের চেষ্টা হয়ে গেল। কদিন আগে আবার জিজ্ঞাসা করল, শিহরণদার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী? ঠিক তার দিনকয়েকের মধ্যে শিহরণদা—

বলতে বলতে ডোনার গলা কাঁপতে শুরু করল, আমার মোটেই বিশ্বাস হয় না, উনি এরকম করতে পারেন। কিন্তু এমনভাবে ঘটে গেল ঘটনাটা!

গার্গী খুবই অবাক হল, বিশ্বাস করতে তারও কষ্ট হচ্ছিল, তবু তার বিস্ময় মনের ভেতর চেপে রেখে বলল, অলর্কবাবু তো সেদিন ছিলেন প্রেক্ষাগৃহের ভেতর?

—ছিলেনই তো। শিহরণদার পাশেই বসেছিলেন শুনলাম।

—তাহলে তৈরি হয়ে নে। এখনই একবার অলর্কবাবু ওখানে আমাতে-তোতে যাই। ওঁর রি-অক্যাশনটা বোঝার চেষ্টা করি। তা ছাড়া পরশু খড়্গাপুর থেকে ফিরে শিহরণদা কাল ভোরেই আবার কেন গিয়েছিলেন অলর্কবাবুর বাড়ি, সে সময় পিস্তলটা তাঁর কাছে ছিল কিনা এগুলো জানা দরকার।

ডোনা বিস্মিত হয়ে বলল, এখনই?

—হ্যাঁ, এখনই। বি কুইক।

ডোনাকে সঙ্গে নিয়ে গার্গী যখন রাসেল স্ট্রিটে পৌঁছাল, সন্ধ্যা পার হয়ে আলোয় ঝলমল করে উঠেছে কলকাতা শহর। কলকাতার এই সাহেবপাড়াটিতে এখন চারপাশে উঁচু-উঁচু সব মালটিস্টোরিড বিল্ডিং। এহেন আধুনিকতার ছোঁয়াচ এড়িয়ে অলর্ক বসুর দোতলা বিশাল বাড়িটা সেই সাবেকি ধরনের। সাবেকি বলতে চৌরঙ্গির এপাশে এই অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই হয়ে একধরনের সাহেবিপনা বজায় রেখেছে চটলা-ওটা হলুদবাড়িটা। চারপাশের বাকি সব দৃশ্য আঙুলে চেপে হঠাৎ এই বাড়িটা নজরে পড়লে যে কোনও পথচারী মনে হতে পারে, সে এসে পৌঁছেছে লন্ডনের কোনও শহরতলিতে। ইংরেজি সিনেমায় দেখা কোনও পুরানো বাড়িই যেন। এমন একটি বাড়ির উঁচু পাঁচিলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে গার্গী মনে মনে তারিফ জানাল বাড়ির নির্মাতাকে। সেই সঙ্গে এখন যিনি বাড়ির মালিক তার কথা ভেবে কিছুটা সম্ভ্রমও। কিন্তু আপাতত অলর্ক বসু সম্পর্কে গার্গীর মনে এক ঘোর সন্দেহ।

প্রাচীন এই বাড়িটিতে দোতালায় ওঠার সিঁড়িটি কাঠের। কিন্তু খুবই মজবুত আর কারুকার্যময়। একতলা-দোতলা মিলিয়ে এ বাড়িতে কতগুলো ঘর তা বোধহয় শুনে শেষ করা

যাবে না। দারোয়ানের পিছু পিছু দোতালায় উঠে এমনই অনেকগুলো ঘরের পাশ দিয়ে, এক লম্বা করিডোর পার হয়ে যে ড্রয়িংরুমটায় এসে পৌঁছোল গার্গীরা, সেটাতে বোধহয় অনায়াসে লনটেনিসের কোর্ট বানানো যায়। বাকি ঘরগুলোর ক্ষেত্রফলও কম কিছু নয়। আর গার্গী শুনে আশ্চর্য হল যে, এই বিশাল বাড়িটিতে অলর্ক আর তার দারোয়ানটি ছাড়া কোনও তৃতীয় প্রাণী থাকে না।

অলর্কের কাছে এসে প্রথম প্রশ্ন যা গার্গীর মনে এল, এত বড় বাড়িতে এভাবে একা থাকতে আপনার ভয় করে না?

—ভয়! অলর্কের হাসি ছড়িয়ে পড়ে তার লম্বা দাড়িগোঁফের অন্তরালে। একা থাকি আপনাকে কে বলল? এ বাড়িতে তো অনেকগুলো ভূত থাকে। তারা আছে বলেই তো একলা মনে হয় না।

—সর্বনাশ। ভূত আছে কী করে বুঝলেন?

—বাহ্। তারা তো সারারাত ফিসফাস করে কথা বলে। কখনও নিজেদের মধ্যে। কখনও আমাকে লক্ষ করেও। কখনও করিডোর দিয়ে খটখট শব্দ তুলে যাতায়াত করে হি হি করে হাসেও কখনও বা।

গার্গী আর ডোনা দুজনে একবার চোখাচোখি করে নেয়, আর?

—লোডশেডিংয়ের সময় মোমবাতি জ্বাললে ফস করে হঠাৎ নিভিয়ে দেয়।

—আপনি খুবই যে বীরপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই, গার্গী হাসতে হাসতে বলল, ডোনা বরাবরই বলত, আপনি একেবারে অন্যধরনের মানুষ। আজ মনে হচ্ছে, সত্যিই অদ্ভুত। যাই হোক, আপনার কাছে কতকগুলো দরকারে এসেছি।

অলর্ক যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল তার কাছে কেউ অনেক প্রশ্ন নিয়ে আসবে। হেসে বলল, সে তো দুই সুন্দরীর যৌথ অভিযান দেখেই বুঝতে পেরেছি। ভাবাই যায় না এরকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেল আমাদের চোখের সামনে, অথচ কেউ কিছু বুঝতেই পারলাম না।

গার্গী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল অলর্কের মুখ। ডোনা ঠিকই বলেছিল কদিন আগে। জিশুর মতোই সরল-সুন্দর। কিছুক্ষণ অলর্কের অভিব্যক্তি নিরিখ করে বলল, আচ্ছা, মি. বোস, সেদিন আপনিও তো ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন ওখানে। ঠিক কোথায় বসেছিলেন আপনি?

—শিহরণদার ডানপাশেই ছিলাম। একেবারে ফ্রন্ট রোয়ে।

—অন্ধকারের ভেতর কী ঘটতে চলেছে তা কি বুঝতে পেরেছিলেন কিছু?

—ঠিক বুঝতে পারিনি বললে ভুল বলা হবে। শেষ দৃশ্যে যে মুহূর্তে ড্যান্সড্রামার কুশীলবরা ফ্রিজ হয়ে গেছে, আমরা দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তুমুল হাততালি দিচ্ছি, অনেক দর্শক হুড়মুড় করে এগিয়েও এসেছেন অভিনন্দন জানাতে, সেসময় হঠাৎ আমার মনে হল কে যেন পিছন থেকে ঠেলে দিল আমাকে। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম। সামলে নেওয়ার আগেই দেখি, পাশে দাঁড়ানো শিহরণদাও পড়ে গেলেন হঠাৎ।

—স্ট্রেঞ্জ, গার্গী অবাক হল, আর একবার চোখাচোখি করল ডোনার সঙ্গে, আচ্ছা, মি. বোস। শিহরণদার ঠিক পিছনে কে ছিলেন, মনে আছে আপনার?

—হ্যাঁ, মণীশ রায়।

—তাই নাকি? আর আপনার পিছনে?

—আমার পিছনে যিনি ছিলেন, তাঁকে চিনি না। দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক। চোখে চশমা।

আবারও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল গার্গী, তার আগেই অলর্ক হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে উঠল,

pathagar.net

এই যা, শুধু কথাই বলে যাচ্ছি। এমনভাবে তখন থেকে জেরা করে যাচ্ছেন যে, আপনাদের সামান্য আপ্যায়নটুকু করার কথাও ভুলে গেছি।

তারপর একবার গার্গীর দিকে, একবার ডোনার দিকে তাকিয়ে বলল, বলুন তো, কলকাতার দুই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী এখন কী পছন্দ করবেন? চা, না কফি, অথবা লস্যি?

—আপাতত কিছুই না, গার্গী বাধা দিয়ে বলল, আমরা কয়েকটা জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছি, সেটাই এখন মোস্ট ইমপর্ট্যান্ট। আপনার সঙ্গে সেদিন শিহরণদা গিয়েছিলেন খড়্গাপুরে। সেখানে সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কোনও ডিসপুট হয়েছিল আপনাদের?

অলর্ক অবাক হয়ে বলল, না তো—

—আচ্ছা, আপনি কি জানেন, শিহরণদার সঙ্গে একটা পিস্তল ছিল সে-সময়?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। গাড়িতে যেতে যেতে উনি আমাকে পিস্তলটা দেখিয়েছিলেন। আমি তো বেশ অবাকই হয়েছিলাম ওটা দেখে। বুঝতে পারিনি কেন উনি সঙ্গে করে এনেছেন ওটা।

—পিস্তলটা কি উনি কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন?

অলর্ক একটু থমকে গিয়ে বলল, হ্যাঁ। তা তো নিশ্চয়ই।

—কিন্তু পিস্তলটা এখন আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

—তাই নাকি? কিন্তু যখন গাড়ি থেকে নামেন, তখনও কিন্তু পিস্তলটা ছিল ওঁর কাছে।

—কোথায় নেমেছিলেন গাড়ি থেকে?

—এসপ্ল্যানেডেই নেমেছিলেন। আমি বলেছিলাম, বাড়ি পৌঁছে দিই। কিন্তু উনি রাজি হননি। বলেছিলেন, চৌরঙ্গিতে কী একটা দরকার আছে। সেটা মিটিয়ে উনি নাকতলা যাবেন।

ডোনা অবাক হয়ে বলল, নাকতলা! অদ্ভুত তো! যখন গাড়ি থেকে নেমেছিলেন তখন কটা বাজে?

—সন্ধ্যে ছটা নাগাদ।

—আশ্চর্য, সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন অনেক রাতে। ফিরে আমাকে বলেছিলেন, এক্ষুনি ফিরলাম খড়্গাপুর থেকে।

গার্গী ডোনার দিকে তাকাল, হঠাৎ নাকতলায় কেন?

ডোনা গম্ভীর হয়ে বলল, নিশ্চয় এম. আরের বাড়িতে। কিন্তু সেটা স্রেফ চেপে গিয়েছিলেন আমার কাছে। যাই হোক, বাড়ি ফিরে পিস্তলটা কেন ফেরত দেননি মা'র কাছে, সেটাই ভারি অবাক লাগছে আমার।

অলর্ক বলল, এমনও হতে পারে পরদিন হয়তো ওঁর কাজে লাগবে বলেই ফিরিয়ে দেননি ওটা। পরদিন ভোরেই অবশ্য প্রথমে আমার বাড়ি এসেছিলেন। তখন ওটা ওঁর কাছে ছিল কি না জানি না। বেলা এগারোটা নাগাদ বেরিয়ে গেলেন খুব জরুরি মিটিং আছে এই বলে।

ডোনা অবাক হল, কিসের মিটিং?

—তা আমাকে বলেননি। তবে বলেছিলেন, আজকের মিটিংটা খুব ইমপর্ট্যান্ট, ভীষণ ফাটাফাটি হবে।

গার্গী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মি. বোস, দুদিন আপনার সঙ্গে খড়্গাপুরে ব্যস্ত থাকার পর হঠাৎ কী এমন কারণ ঘটেছিল যাতে পরদিন ভোরেই আবার আপনার বাড়ি আসতে হয়েছিল ওঁকে?

অলর্ক হেসে বলল, আসলে আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ব্যাপারে কিছু কিছু অ্যাডভাইস দিচ্ছিলেন শিহরণদা। তারই কাগজপত্র দেখেছিলেন সারা সকাল।

pathagar.net

—আপনার বিজনেস নিয়ে কি কোনও ঝামেলা চলছে, মি. বোস?

—বিজনেস মানেই হাজারো ঝামেলা। সে তো সারাক্ষণ কোনও না কোনও সমস্যা এসে পড়ছে সামনে।

—এমনও তো হতে পারে বিজনেসে উনি জড়িয়ে পড়ায় কেউ তা সহ্য করতে পারছিলেন না।

—তাতে টার্গেট হওয়ার কথা এই অলর্ক বোসের। কিন্তু অলর্ক বোস কাউকে তোয়াক্কা করে না।

—আচ্ছা, কী কী ব্যাপারে আপনাকে অ্যাডভাইস করছিলেন শিহরণদা?

একটু ইতস্তত করে অলর্ক বলল, সে তো প্রায় সব ব্যাপারেই সাহায্য করছিলেন। খড়্গপুরেও গিয়েছিলেন সাপ্লায়ারদের সঙ্গে কথা বলতে। কোন জিনিস কোন মার্কেটে সুবিধেমতো দরে পাওয়া যায়, কোনও প্রভিন্স থেকে কোনও প্রোডাক্ট আনলে সস্তায় পাওয়া যাবে, সবই লিস্ট করে দিয়েছিলেন একদিন বসে। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া?

ডোনার দিকে একমুহূর্ত তাকিয়ে অলর্ক বলল, এমনকি চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে দিয়ে আমি যে সব লে-আউট করিয়েছি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোর জন্য, সে ব্যাপারেও বলেছিলেন, মাত্র একজন আর্টিস্টকে দিয়ে সব শো-রুমের লে-আউট কেন করাচ্ছি। বিভিন্ন আর্টিস্টকে দিয়ে করালে তার এফেক্ট হত অন্যরকম।

ডোনা স্তম্ভিত হয়ে বলল, তাই?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমি ওঁর কথা শুনিনি। বলেছিলাম, এসব ব্যাপারে আমি একজনের হাতেই দায়িত্ব দিতে চাই।

গার্গী হঠাৎ প্রশ্ন করল, ডোনার বাবা এ ঘটনার কথা জানতেন?

ইতস্তত করে অলর্ক বলল, হ্যাঁ। একদিন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির সঙ্গে আলোচনার সময় আমি বলে ফেলেছিলাম। তাতে উনি ভীষণ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, স্কাউন্ড্রেলটাকে আমি জন্মের মতো শিক্ষা দিয়ে দেব।

ডোনার মুখখানা সহসা কালো হয়ে গেল। গার্গী তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিল, আচ্ছা, আর কী কী ব্যাপারে আপনাকে অ্যাডভাইস করেছিলেন শিহরণদা?

—সে অনেক ব্যাপার। সব বলতে গেলে একখানা বাইবেল হয়ে যাবে। বরং একদিন সকালের দিকে আসুন। এখন ঘড়িতে রাত প্রায় সাড়ে নটা হয়ে গেল। আপনাদের বাড়ি ফিরতে হবে তো—

গার্গী এতক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকায়নি। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, সত্যিই তো। ডোনা, শিগগির ওঠ।

দুজনে ড্রয়িং ছেড়ে উঠতে গিয়েই হঠাৎ কী যেন নজরে পড়তে ডোনা চমকে উঠে বলল, ওটা পিস্তল নয়?

অলর্ক অবশ্য চমকাল না, হ্যাঁ, ওটা আমার পিস্তল।

—আপনার পিস্তল আছে নাকি? গার্গী বিস্মিত হল। তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে আছড়ে পড়ল ড্রয়িংয়ের কোণে যে দেরাজটা আছে তার কাচের ভেতর। পিস্তলের নলটাই শুধু দেখা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমাকেও সম্প্রতি একটা লাইসেন্স করাতে হল। নইলে চলছিল না।

pathagar.net

পরমুহূর্তেই গার্গীর প্রশ্ন আছড়ে পড়ল, কেন?

—আর বলবেন না, কী যে সব বিপদের মধ্যে আছি। হাতে হঠাৎ অনেক টাকা এসে গেলে চারদিকে প্রচুর শত্রু হয়ে যায়। এই দেখুন না। কদিন আগেই একটা চিরকুট কেউ ফেলে গেছে বারান্দায়, ইয়োর ডে'জ আর নাম্বারড্। তারপর হঠাৎ টেলিফোনে হুমকি দিয়েছে আজ সকালেই : সাবধান। তোমাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।

গার্গী ভুরুতে কোঁচ ফেলে তাকাচ্ছিল অলর্কের দিকে। গল্পগুলো কতটা সত্যি কতটা আষাঢ়ে তাইই বোধহয় মাপের চেষ্টা করছিল। হঠাৎ কী মনে হতে বলল, পিস্তলটা একবার দেখব?

অলর্ক ঘাড় নাড়ল, না। খড়্গাপুরে নিয়ে গিয়েছিলাম ওটা। ওখান থেকে ফিরে এসে দেরাজে রেখেছিলাম ওভাবেই। তারপর কাল ওই ঘটনার পর আর ওটায় হাত দিইনি। পুলিশ হয়তো আসতে পারে, কোঁজ করতে পারে পিস্তলটার এই ভেবে অ্যাজ ইট ইজ রেখে দিয়েছি। ছটা গুলিই ভরা আছে ওর ভেতর।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, কতদিন গুলি ছোড়েননি ওটা থেকে?

আবারও ইতস্তত করল অলর্ক, খড়্গাপুরে গিয়ে একটা গুলি ছুড়তে হয়েছিল। তক্ষুণি অবশ্য আর একটা গুলি লোড করে রেখে দিয়েছি।

অলর্কের গলাটা হঠাৎ করেই কেন যেন কেঁপে গেল। গার্গীর চোখ এড়াল না। সে এবার মৃদুস্বরে বলল, আপনি কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন, মি. বোস।

রীতিমতো নার্ভাস দেখাল অলর্ককে, কেন! কেন?

গার্গী সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল, আচ্ছা, মি. বোস, আপনি তো বেশ কয়েকদিন ঘনিষ্ঠভাবে মিশছিলেন শিহরণদার সঙ্গে। নিশ্চই অনেক বিষয়ে আলোচনাও করতেন কাজের ফাঁকে ফাঁকে। কিছু অনুমান করতে পারেন, কে খুন করতে পারেন ওঁকে?

অলর্ক একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, সে আমি কী করে জানব। নিজের সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলতেন না উনি। একদিকে খুবই এক্সট্রোভার্ট, সারাক্ষণ হইচই করে কথা বলতেন। অন্যদিকে ভীষণ ইনট্রোভার্ট, নিজের ব্যাপারে খুবই চাপা। শুধু একটা ব্যাপারে দুর্বলতা ছিল ওঁর। মেয়েদের সান্নিধ্য পছন্দ করতেন খুব। সেদিন খড়্গাপুর থেকে ফিরে, অতটা জার্নির পরও বললেন, নাকতলায় যাব। আমাকে কিছু না বললেও বুঝতে পেরেছিলাম, কোনও মহিলার সঙ্গে দেখা করাটা খুব দরকার ছিল ওঁর।

ডোনা আর গার্গী ফের চোখাচোখি করল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আজ চলি। দরকার হলে আবার আসব কখনও।

—ওহ, শিওর, অলর্ক তার দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভরিয়ে ফেলল হাসিতে। পরমুহূর্তে বলল, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। আমি বরং গাড়িতে করে পৌঁছে দি।

ডোনা, গার্গী দুজনেই অবশ্য বাধা দিল, থ্যাঙ্কস অ্যা লট। তার দরকার হবে না। আমরা ট্যাক্সি ধরে নিচ্ছি একটা—

বড় রাস্তা পর্যন্ত অলর্ক তাদের সঙ্গে এল। ট্যাক্সিও ডেকে দিল কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে। তারপর ডোনাকে বলল, শিহরণদা মারা যাওয়ায় আমি কিন্তু খুব বিপদে পড়ে গেলাম, ডোনা। আমার ব্যাবসার অনেকটাই ওঁর ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখন যে তার কী হবে কে জানে। কিন্তু তোমার বাবার চিত্রপ্রদর্শনীটা ঠিক সময়ে করে ফেলতে চাই।

pathagar.net

ডোনা অবাক হয়ে বলল, এর পর একজিবিশনের কথা আর ভাবতেই পারছে না কেউ। বাবার পিস্তল হারিয়ে যাওয়ায় যা বিপদে পড়ে গেছি আমরা।

ট্যাক্সি ছাড়ার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ অলর্ক বলল, ওহো, এবার মনে পড়েছে। কাল সকালে শিহরণদা যখন আমার বাড়ি এসেছিলেন, তখন বলেছিলাম, পিস্তলটা নাকি ভুলে ফেলে এসেছেন নাকতলায়।

গার্গী চমকে উঠল, তা সেটা এতক্ষণ বলেননি কেন?

একুশ

গতকাল সংবাদপত্রে শিহরণ হত্যার ঘটনাটি ছাপা হয়েছিল ছোট্ট করে, পাঁচের পাতায় নিচের দিকে, অবশ্য বক্স করে ছাপিয়ে কিছুটা গুরুত্ব দিয়েছিল খবরটায়। সংবাদে বলা হয়েছিল, কীভাবে বিশ্ববিদালয়ের একটি ফাংশনে ইংরেজি ড্যান্সড্রামার অভিনয় চলাকালীন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছিল সুকৌশলে। পুলিশ তদন্ত করছে ঘটনাটির।

আজ কিন্তু ঘটনাটির ফলো আপ রিপোর্ট ছাপা হয়েছে একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়, মাঝখানে বেশ বড় করে, আর রিপোর্টটি খুবই চাঞ্চল্যকর। সাংবাদিক জানিয়েছেন, গতকালের রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁদের দপ্তরে হঠাৎই একটি উড়ো ফোন আসে, তাতে জানা যায়, কলেজের অধ্যাপক-সমিতির এক কর্মকর্তা ছিলেন শিহরণ। হত্যার দিন দুপুরে সেই সমিতির মিটিং ছিল। সেখানে শিহরণের বক্তৃতার সময় তাঁর কোনও একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তুমুল বচসার সৃষ্টি হয়। সেই বচসার জেরেই এই হত্যাকাণ্ড। উড়ো-ফোনটি পাওয়ার পর সাংবাদিকটি অধ্যাপক-সমিতির অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জোগাড় করেছেন অনেক আশ্চর্য তথ্য। শিহরণ রায়চৌধুরী প্রথম যৌবনে নাকি যুক্ত ছিলেন এক বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে। পরে অবশ্য কোনও কারণে সরে এসেছিলেন আন্দোলন থেকে। প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও পরবর্তীকালে শামিল হয়েছিলেন অধ্যাপক সমিতির কাজকর্মের সঙ্গে। সামনেই কর্মসমিতির নির্বাচন। বহুদিন ধরেই বিরোধীপক্ষের সঙ্গে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল তাঁদের। গত পরশু অর্থাৎ হত্যার দিন দুপুরে মিটিং চলাকালীন সেই বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। বক্তৃতা দিতে উঠে শিহরণ এমন জ্বালাময়ী ভাষায় নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিলেন বিরোধীপক্ষের কোনও কোনও অধ্যাপককে, তাতে পেছনের দিকে বসা কোনও কোনও সদস্য উত্তেজিত হয়ে শাসিয়েছিলেন, এরকম আল্‌গা মন্তব্য করলে মেরে লাশ ফেলে দেওয়া হবে। অতএব এই শত্রুতার জের হিসেবে শিহরণ খুন হতে পারেন এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

খবরটা বার দু-তিন খুঁটিয়ে পড়ে খুবই আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। তার ঘরের ছোট্ট জানালাটির পাশে বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে মনে মনে কয়েকমুহূর্ত বিশ্লেষণ করে নিল ঘটনাটা। যে মুহূর্তে মনে হচ্ছিল চিত্রদীপের পিস্তল হারানো নিয়ে অদ্ভুত বাঁক নিচ্ছে শিহরণ-হত্যার রহস্য, ঠিক সেসময় সংবাদপত্রের এই তথ্যাদি সমস্ত হিসেব যেন উল্টো দিল।

শিহরণ রায়চৌধুরী সম্পর্কে গার্গী যতটুকু খবর জেনেছে, তিনি ব্যাচেলর মানুষ, অধ্যাপনা নিয়ে যতটা ব্যস্ত থাকতেন, তার চেয়েও ব্যাপৃত থাকতেন তাঁর এক্সট্রা ক্যারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ নিয়ে। মাঝে মাঝে শৌখিন সাহিত্যচর্চা যেমন করতেন, তেমনই কোনও একটি

pathagar.net

আঁতেলমার্কা লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যও ছিলেন। কিন্তু তিনি অধ্যাপক-সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, থাকলে কতটা প্রত্যক্ষভাবে, এ সব গার্গীর জানার বাইরে। ডোনা জানে কি না কে জানে। শিহরণের সঙ্গে ডোনার কখনও এসব ব্যাপারে আলোচনা হত কি না তা একসময় জেনে নেবে গার্গী। ডোনা প্রায়ই বলত, জানিস, শিহরণদা এমন সব বিষয় নিয়ে মাঝেমধ্যে আলোচনা করেন, যা শুনতে শুনতে হেসে কুটপাট হতে হয়।

সত্যিই নানারকম কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকার ফলে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন শিহরণ। টুকটাক এখানে-ওখানে ভ্রমণের ভীষণ নেশা ছিল, সেই সুবাদে তাঁকে থাকতে হত কখনও দূর-দূর প্রান্তের হোটেলে, কখনও জেলার সার্কিটহাউস বা ডাকবাংলোয়। কোথায় কখন কোন ডাকবাংলোয় গিয়ে কী অভিজ্ঞতা হয়েছে তা শুনতে শুনতেই কাবার হতে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোন কোন ডাকবাংলোয় ভূত আছে, সে সব ভূতেরা কে কীরকম, কে মাঝরাতে হা হা করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে ওঠে, কোন সার্কিটহাউসে মাঝরাতে শুধু ফিসফাস শব্দ শোনা যায়, কিন্তু ভূত দেখা যায় না। কোনও ফরেস্ট বাংলোয় রাতে বাঘ এসে ঢুঁ মারে। কোথায় বাংলোচত্বরে হরিণ এসে জিরোয় ভেড়া ছাগলদের মতো, এমন হাজারো সব গল্প তাঁর স্টকে গিজগিজ করতে সারাক্ষণ। কখনও রাজনীতিবিদদের নিয়েও মজা করে গল্প বলতেন। আবার চমৎকার সব কার্টুনও আঁকতে পারতেন তাদের নিয়ে, তাদের কার কী ম্যানারিজম তাও হই-হই করে শোনাতেন প্রায়ই। এমনকি কোনও বাস-কন্ডাক্টর কেমনভাবে টিকিট চায় যাত্রীদের কাছে তাও নিখুঁতভাবে ক্যারিক্যাচার করে দেখাতেন।

এহেন শিহরণের যে কিছু শত্রু না ছিল তা নয়। যারা স্ট্রেটকাট কথা বলে, তাদের বিরুদ্ধে কিছু মতামত তৈরি হয়ে যায় এমনিই। যাদের কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন হয়, তাদেরও কিছু কিছু বিরোধীপক্ষ থেকে থাকে।

তবু গার্গী বুঝে উঠতে পারছে না, অধ্যাপক সমিতির নির্বাচন নিয়ে কী এমন সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে খুন হতে হল শিহরণকে!

তার আগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কে সংবাদপত্রে উড়ো ফোন করে জানাতে গেল খবরটি! অধ্যাপক সমিতির কোনও সদস্য, না কি বাইরের কেউ! বিরোধীপক্ষের কেউ যদি খুন করেই থাকবে, তাহলে নিশ্চই তারা ফোন করে জানাতে যাবে না। আর শিহরণের পক্ষের কোনও সদস্য যদি হয়ে থাকে, তাহলে তারা পুলিশের কাছে না জানিয়ে হঠাৎ সংবাদপত্রে জানাল কেন? সে যাইহোক তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে শিহরণকে হত্যার জন্য হত্যাকারীকে নিশ্চই শিহরণকে অনুসরণ করে ড্যান্সড্রামার হলে ঢুকতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও জাগে, কোন কোন অধ্যাপক সেদিন ড্যান্সড্রামা দেখার কার্ড পেয়েছিলেন অর্গানাইজারদের কাছ থেকে?

এই সব প্রশ্নে আলুথালু হতে হতে গার্গী খবরের কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে দ্রুত তৈরি হল। সমিতির ব্যাপারে আজই একটা খোঁজখবর নেবে এমনও ভাবল মনে মনে। মাকে ডেকে 'বেরুচ্ছি একটু বলেই পাড়ার পথ পেরিয়ে ট্রামরাস্তার দিকে। নতুন একটা স্পেশাল-বাস চালু হয়েছে যেটা যাদবপুর থানা হয়ে এইট বি বাসস্ট্যান্ডের দিকে যায়। তাতে উঠলে সরাসরি গিয়ে নানা যায় যোধপুরপার্কের স্টপেজে। আনোয়ার শা রোড থেকে ডোনাদের বাড়ি সামান্য দূরে হলেও রাস্তাটি বেশ ছিমছাম। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে কলিংবেল টিপতেই জংলা-ছাপা সালোয়ার-কামিজ পরে বেরিয়ে এল ডোনা। অন্যদিনকার মতো লাফিয়ে উঠে বলল না 'হাই', শুধু গম্ভীর মুখে বলল, আয়।

pathagar.net

ডোনাও এতক্ষণ খুঁটিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজের সেই অংশ, যেখানে ফলাও করে ছাপা হয়েছে শিহরণ হত্যার সংবাদ। সেও এতক্ষণ ঘটনাটির আকস্মিকতায় বোধহয় চুরমুর হচ্ছিল একা-একা। গার্গীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, লোকটা কী অদ্ভুত ছিল তাই না?

গার্গী বুঝতে পারল না যেন, কেন, অদ্ভুত কেন?

ডোনা যে বেশ সংকটের মধ্যে আছে, তা বোঝাই যাচ্ছে তার মুখ দেখে। নিশ্চই সেই পিস্তল সমস্যা এখনও মেটেনি, সেজন্য তার বাবা ও মায়ের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলছে তার জের অবশ্যই ঝামরে পড়ছে ডোনার উপর। গার্গীর কথার উত্তরে শুধু বলল, খুবই অদ্ভুত মানুষ। সারাদিন যে সব কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখতেন নিজেকে, তার মধ্যে অনেক ঝঞ্ঝাটের কাজও থাকত। কিন্তু কোনও টেনশনই ছিল না। এত কাজ কোনটার পর কোনটা করবেন, তা ওঁর মাথার মধ্যে ছক কষে রাখা থাকত, কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তার কিছুই বোঝার উপায় নেই। এই মুহূর্তে যে সামনে আছে, সে জানতেই পারত না পরের মুহূর্তে উনি কোথায় যাবেন, কিংবা কার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এমনিতে মনে হয় দারুণ দিল-খোলা, সারাক্ষণ মজা করছেন, অথচ আসলে ভীষণ চাপা।

গার্গী কৌতূহলী হল, যেমন—

—যেমন পরশুর কথাই ধর না। তার আগের দিন সন্ধে নাগাদ খড়্গাপুর থেকে ফিরেছেন অলর্ক বোসের সঙ্গে, আমাদের এখানে না ফিরে সোজা চলে গেছেন এম. আরের বাড়ি। রাতে বাড়ি ফিরেছেন, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বোঝাই যায়নি সারাদিন কী টেনশনে কাটিয়েছেন। কোনও আলোচনাও করেননি তা নিয়ে। পরশু ভোরে উঠেই চলে গেছেন অলর্ক বোসের বাড়ি। নিশ্চই জরুরি কাজ ছিল নইলে অত ভোরে যাবেনই বা কেন। আমি জগিং করতে যাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে হেসে বলেছিলেন, 'নো', মাই চাইল্ড, আমাকে একটু বেরোতে হচ্ছে। দুপুরে হয়তো ফিরব না।' অলর্ক বোসের বাড়ি থেকে সোজা চলে গেছেন অধ্যাপক সমিতির মিটিংয়ে। সেখানে এত কাণ্ড হয়েছে তা কিন্তু সন্ধের সময় ফাংশন দেখতে এলে বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি কেউ। মায়ের সঙ্গে নাকি দারুণ খোশমেজাজে কথা বলেছেন। অথচ এত সব টেনশনের ব্যাপার থাকলে আমার তো ঘুমই হত না রাতে।

গার্গী সামান্য হাসল, কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করছিল ডোনার মুখের অভিব্যক্তি। তাকে আরও একটু উসকে দেওয়ার জন্য বলল, আর এমন কোনও ব্যাপার মনে পড়ছে তোর?

একটু ইতস্তত করে ডোনা বলল, সেদিন কী হয়েছে শোন। আমাকে বললেন চল ডোনা, জিমি'স তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করি আজ। গাড়ি নিয়ে দুজনে এখানে-ওখানে ঘুরে লাঞ্চ খেয়ে হইহই করতে করতে ফিরছি, হঠাৎ বললেন, 'আমাকে একটু রবীন্দ্রসদনের সামনে নামিও দিও, ডোনা।' 'কেন,' তা জিজ্ঞাসা করায় বললেন 'তিনটে নাগাদ এখানে একটা ফাংশন আছে। উদ্যোক্তারা জোর করে কার্ড গছিয়ে দিয়েছেন,—।' তা ওঁকে নামিয়ে দিয়ে ফিরছি, হঠাৎ দেখি ওঁর সিগারেটের প্যাকেটটা পড়ে আছে সিটের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রসদনের কাছাকাছি যেতে দেখি, ঈষিতাদির সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটছেন ভিক্টোরিয়ার দিকে। কী আশ্চর্য, বল। ঈষিতাদির সঙ্গে ওঁর যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, তা আমার কাছে একবারও ভাঙেননি! গার্গী তার অবাক হয়ে যাওয়া চোখে হঠাৎ হাসি ভরিয়ে বলল, যাদের অনেক প্রেমিকা তাকে, তাদের এমন মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। কী আর করা যাবে। কিন্তু সে যাই হোক, কাগজে হঠাৎ যেভাবে লিখেছে, তাতে কিন্তু গোটা ব্যাপারটা ভারি রহস্যজনক মনে হচ্ছে আমার।

pathagar.net

—তাই! কথা বলতে বলতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল ডোনা, কেমন অস্পষ্ট, জড়ানো গলায় বলল, আমারও কিন্তু অদ্ভুত লাগছে। হঠাৎ কী এমন শত্রুতার সৃষ্টি হল অধ্যাপক-সমিতির মিটিং-এ যে, বলতে বলতে থেমে গেল, তার পর হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, এতদিন জানতাম, স্টুডেন্টস ইউনিয়নের নির্বাচনে মারামারি খুনোখুনি হয়। এখন তাহলে সে অভ্যেসটা অধ্যাপক-সমিতির নির্বাচনেও সংক্রামিত হল!

গার্গী ঘাড় নেড়ে বলল, কাগজে লিখেছে বলেই সেটা সত্যি হবে তার কোনও মানে নেই। একটা উড়ো ফোনের খবরে নির্ভর করে সাংবাদিক একটা মোটিভ তুলে ধরেছেন পাঠকের কাছে, কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে যদি আমল দিতে হয় তাহলে জানা দরকার, অধ্যাপক সমিতির কোনও কোনও মেম্বার ফাংশনের কার্ড পেয়েছিলেন সেদিন।

ডোনা ঠোঁট উল্টে বলল, সে কি আর এক মুহূর্তে বলা যায়! আমাদের ডিপার্টমেন্টের সব ছাত্রীকেই কিছু কিছু করে কার্ড বিলি করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তাতে কে কাকে কার্ড দিয়েছে, তা তো আর লেখাজোখা নেই। তাছাড়া একজনের কার্ড নিয়ে অন্য কেউ আসতে পারে।

গার্গী চিন্তিত হয়ে বলল, তাহলে কী করা যায়?

ডোনা গার্গীর মুখচোখ দেখে হেসে ফেলল হঠাৎ, কী ব্যাপার, তুই কি এই ব্যাপারটা নিয়েও কোনও আর্টিকেল লিখে ফেলতে চাস?

গার্গী আবার ঘাড় নাড়ল, না, তা নয়। কিন্তু চোখের সামনে এরকম মার্ডার কখনও দেখিনি তো। ঠিক কী পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ ধরনের মার্ডার করে তা জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।

ডোনা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বিষণ্ণ, জড়ানো গলায় বলল, জানিস, আমার ভীষণ ভয় করছে—

গার্গী অবাক হল, কেন?

—আমার বাবাকে কয়েকদিন ধরে দেখছিলাম, শিহরণদার ব্যাপারে ভীষণ টেনশনে ছিলেন। শিহরণদা যে এ বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হয়ে আছেন, মায়ের সঙ্গে আমার সঙ্গে যে এত খোলামেলাভাবে মেশেন তা যেন বাবা একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তার উপর হঠাৎ এই বয়সে কেনই বা একটা পিস্তল কিনে তার লাইসেন্স করালেন, কেনই বা সেটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তার কিছু মাথায় ঢুকছে না আমার। মা বললেন, ফাংশনে যাওয়ার আগে কী একটা টেলিফোন পেতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন বাবা। পুলিশ ইনস্পেক্টরের কথাবার্তা শুনে মনে হল, বাবাকেই এই মার্ডারের ব্যাপারে সন্দেহ করছে।

গার্গীও কিছুক্ষণের জন্য থম মেরে গেল। হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, তোর বাবাকে কি তোর সন্দেহ হয়?

ডোনা সজোরে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে বলল, না, হয় না। আমার বাবা ভীষণ রাগী। রেগে গেলে আর জ্ঞান থাকে না। কিন্তু তাই বলে আমার বাবা শিহরণদাকে খুন করবেন—, বলতে বলতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ডোনা।

গার্গী তৎক্ষণাৎ তাতে সান্ত্বনা দিতে বসল, শুধু শুধু মন খারাপ করে লাভ নেই, ডোনা। বরং গোটা ব্যাপারটা ভাল করে খোঁজ খবর নিই। সেদিন শিহরণদা যখন ফাংশন দেখতে ঢুকেছিলেন। তুই তাঁকে দেখেছিলি?

—আমি কী করে দেখব। শুনলাম, উনি এসেছিলেন শো আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে। তখন তো আমি গ্রিনরুমে।

pathagar.net

গার্গী কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবল, তারপর হঠাৎ বলল, আচ্ছা, অধ্যাপক-সমিতির ব্যাপারে নিশ্চয় এম. আর খোঁজখবর রাখবেন?—হ্যাঁ, তা হয় তো রাখবেন।

—শিহরণদা যেখানে বসেছিলেন সেদিন, তার কাছাকাছি মণীশ রায়ও ছিলেন কিন্তু। হয়তো এ ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা যেতে পারে। শিহরণদার আশেপাশে অধ্যাপক-সমিতির আর কে কে বসেছিলেন, তাও হয়তো বলতে পারবেন।

ডোনা ঘাড় নাড়ল, ঠিক বলেছিস।— তা হলে আমি একবার এম. আরের বাড়ি হানা দিচ্ছি দেখা যাক, কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কিনা। বলে ডোনাদের যোধপুর পার্কের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গার্গী এসে দাঁড়াল বাসস্টপে। নাকতলা যদিও এখান থেকে তেমন দূরে নয়, তবু দক্ষিণ কলকাতার এই দুটো পল্লী বাসে যাওয়ার দূরত্ব হিসেবে অনেকটা। অন্তত দুটো বাসে না চড়লে কোনও ভাবেই পৌঁছানো যাবে না মণীশ রায়ের বাড়ি। লেগেও গেল প্রায় পৌনে এক ঘন্টার ওপর। বাস থেকে নাকতলার স্টপে নেমে বাঁদিকের একটা লেন ধরে কিছু দূর এগোতেই ডানদিকে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। বাড়ির গেটে একটা ফুলন্ত মাধবীলতার আর্চ। আর্চ ছাড়িয়ে তার ডালপালা দোতলার ছাদ অভিমুখে ধাবিত। গেটের মুখে পৌঁছাতেই মিষ্টি গন্ধটা গার্গীর নাকে চারিয়ে যেতেই কেমন রোমাঞ্চিত হল তার শরীর।

কিন্তু কলিংবেলে হাত দিতেই সেই রোমাঞ্চ কেটে গিয়ে তার শরীর জুড়ে দপদপ করে উঠল এক ধরনের অস্বস্তি। মিনিটখানেকের মধ্যে দরজা খুলে দাঁড়ালেন ঈষিতাদি। খুবই সুন্দরী যুবতী। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর ফর্সা মুখখানা কেমন যেন শোকাহত। গার্গীকে দেখে অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করলেন কী চাই?

গার্গী তৎক্ষণাৎ বেশ আড়ষ্ট হল, এম. আরের সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

খুবই বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল ঈষিতাদিকে, তবু গার্গীকে পরখ করলেন বেশ কড়া দৃষ্টিতে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গার্গীকে দেখে মোটেই খুশি হননি মহিলা। অবশ্য না হওয়ারই কথা। নিশ্চয়ই গার্গীকে তিনি ভেবেছেন মণীশ রায়ের অজস্র ফ্যানদের একজন। একটু পরে দরজা ছেড়ে দিয়ে বললেন, এম. আর ওপরে আছেন।

পরনে ধবধবে পাজামা-পাঞ্জাবি, মণীশ রায় তাঁর স্টাডিরুমে বসেছিলেন একটা ইংরাজি জার্নাল হাতে নিয়ে। বেশ রংচঙে পত্রিকাটি খুব সম্ভব এদেশি নয়। গার্গীকে হঠাৎ তাঁর ঘরে ঢুকতে দেখে মৃদু হেসে বললেন, এসো। তোমার প্রশ্নের ঝুলি নিশ্চয় সঙ্গে নিয়ে এসেছ?

গার্গী লক্ষ করছিল, শিহরণ রায়চৌধুরীর মৃত্যুতে কতখানি শক পেয়েছেন মণীশ রায়। শিহরণ যে হঠাৎ করে মণীশ ঈষিতার সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তারপর দুজনের ওপর কীভাবে তাঁর প্রভাব পড়েছিল তা গার্গী খুব খোলসা করে জানে না। কিছুটা তাঁদের অভিব্যক্তি দেখে, কিছুটা তাঁদের কথাবার্তা থেকে আঁচ করে নিতে হবে। মণীশের সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে গার্গী সামান্য হাসল, স্যার, প্রশ্নের ঝুলি এনেছি ঠিকই, কিন্তু আমার এবারের টপিক অন্য।

—নতুন কোনও ফিচার লিখছ বুঝি?

—প্রায় সেরকমই, স্যার। তবে ফিচারটি ভারি মিস্টেরিয়াস। আজকের কাগজ পড়ে হঠাৎ কতকগুলো অদ্ভুত প্রশ্ন মগজে উদয় হয়েছে। সে ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করব।

মণীশ রায় ঠিক বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসুচোখে তাকালেন গার্গীর দিকে।

—স্যার, শিহরণদার ব্যাপারে কতকগুলো কথা জানতে চাই। আপনি যতটুকু জানেন, যদি আমাকে বলেন—

pathagar.net

মণীশ রায় অবাক হয়ে বললেন, তুমি কি পুলিশে জয়েন করেছ নাকি?

—না স্যার, গার্গী হাসল, জাস্ট ফর কিউরিওসিটি। আজকের কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়, অধ্যাপক সমিতির মিটিং-এ কী সব ঝামেলা হয়েছিল সেদিন। তারই জেরে শিহরণদা খুন হয়েছেন, এরকম সন্দেহ করা হয়েছে খবরে। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারেন?

মণীশ রায় হঠাৎ বেশ সতর্ক হয়ে গেলেন যেন, বললেন, আমি তো সেদিন মিটিং-এ যাইনি। ফলে একজ্যাক্টলি কী ঘটেছিল তা বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে যেটুকু জানি, অধ্যাপকদের মধ্যে দুটো দল ইদানীং বৈরী হয়ে উঠেছিল পরস্পরের বিরুদ্ধে। আর শিহরণ তো বরাবরই এ সব ব্যাপারে ভীষণ এককাট্টা।

গার্গী জিজ্ঞাসু হল এককাট্টা?

—হ্যাঁ। আসলে শিহরণের অ্যাটাকের ধরন বরাবরই খুব সাংঘাতিক। ছাত্রজীবনে ও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে। সভা সমিতিতে বেশ জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিত বরাবর। ক্যাডাররা খুবই উদ্বুদ্ধ হত ওর ভাষণে। অনেক মিটিং-এ ওকে নিয়ে যেত শুধু বক্তৃতা ভাল দিতে পারত বলেই। সেই টেম্পারামেন্টের কিছুটা রেশ এখনও ওর বক্তৃতার মধ্যে আছে তা নিশ্চই এতদিনে তোমরাও জেনেছ। তাতে এখনকার বিরোধীপক্ষও মনে মনে শত্রু হয়ে গিয়েছিল ওর।

—ওঁর বিরোধীপক্ষের কাউকে আপনি চেনেন?

কিছুটা ইতস্তত করে মণীশ রায় বললেন, আছেন তো অনেকেই। আলাদা করে কার আর নাম বলব? তবে একটা ব্যাপারে আমার ভীষণ খটকা লেগেছে। হয়তো আমার অনুমান সত্যি নাও হতে পারে।

গার্গী বিস্মিত হয়ে বলল, কীসের খটকা?

—তোমরা হয়তো জানো না, অধ্যাপক সমিতিতে এই যে রেষারেষি তার শিকড় নিহিত আছে আজ থেকে কুড়ি বছর আগের এক ঘটনায়।

গার্গী আরও অবাক হল, কুড়ি বছর?

—হ্যাঁ। শিহরণ আর রণজয় একই সঙ্গে পড়ত প্রেসিডেন্সিতে। বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল একসঙ্গেই। কিছুকাল পর কোনও একটা ইস্যু নিয়ে গোলমাল বেধেছিল দুজনের মধ্যে। শিহরণ বেরিয়ে আসে দল ছেড়ে। তারপর অবশ্য ও আর রাজনীতি করত না। এতকাল পর অধ্যাপক সমিতি করতে গিয়ে দুজনে যোগ দিয়েছিল দুই বিপরীত অ্যাসোসিয়েশনে।

—আপনি বলতে চাইছেন সেই পুরানো ঝগড়ার জের হিসেবে?

—সম্ভবত। তবে ওদের মধ্যে বৈরিতার আরও একটা গূঢ় কারণ ছিল। তুমি তো ডোনার মা বনানী চ্যাটার্জিকে চেনো?

গার্গী অবাক হয়ে বলল হ্যাঁ—

—বনানীও ওদের ক্লাসমেট ছিল। তখন অসাধারণ সুন্দরী হিসেবে বনানীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক দূর। সেসময় খুবই আশ্চর্যের কথা, রণজয় আর শিহরণ, দুজনে একই সঙ্গে বনানীর প্রেমে পড়েছিল।

—তাই! এরকম ভীষণ একটা আশ্চর্যের ঘটনা মণীশ রায়ের কাছ থেকে শুনতে পাবে তা গার্গী স্বপ্নেও ভাবেনি। তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল, স্ট্রেঞ্জ! আপনিও কি তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিলেন?

pathagar.net

—না, আমি ওদের কনটেম্পোরারি ছিলাম, কিন্তু পড়তাম অন্য কলেজে। আমি স্কটিশের ছাত্র। স্কটিশে পড়লেও আমরা সবাই তাকিয়ে থাকতাম প্রেসিডেন্সিতে কী হচ্ছে তা জানার জন্য। সে লেখাপড়া সম্পর্কিত কোনও ব্যাপারেই হোক, আর কোন মেয়ে সুন্দরী, কে কার প্রেমে পড়ল সে বিষয়েই হোক, অথবা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারেই হোক। আসলে প্রেসিডেন্সিকে চিরকালই একনম্বর বলে গণ্য করত সবাই। আজও বোধহয় তাইই করে।

গার্গী উৎসুক হয়ে বলল, তারপর?

—বনানী তখন দুজনের সঙ্গেই একটা রিলেশন রেখে চলত। তারপর কলেজের পড়া শেষ হতে রণজয় চলে গেল কমপ্যারেটিভ লিটারেচার পড়তে, আর শিহরণ ভর্তি হল ইংরেজি নিয়ে।

—সে সময় আপনি নিশ্চই আর. ডি-র সহপাঠী ছিলেন?

—হ্যাঁ, রণজয় আর আমি একই সঙ্গে পড়তাম। কমপ্যারেটিভ লিটারেচার নিয়ে, তবে রণজয় আমাকে মণীশদা বলত। সেসময় বনানী কী কারণে যেন আমার গুণগ্রাহী হয়ে পড়ে, তবে রণজয়ের সঙ্গে তার আর কোনও রিলেশন ছিল না।

—আর শিহরণদার সঙ্গে?

মণীশ রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, শিহরণের সঙ্গে বনানীর একটা সম্পর্ক বরাবর থেকেই গিয়েছিল।

—তাহলে শেষ পর্যন্ত চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে হঠাৎ বিয়ে করলেন কেন উনি?

—সে অনেক ঘটনা। সবটা তোমার না জানলেও চলবে। হঠাৎ কেন যে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে পাত্র হিসেবে পছন্দ করেছিল বনানী, তা তখন কলকাতার অনেক মহলে দারুণ একটা আলোচনার বিষয় ছিল। চিত্রদীপ চ্যাটার্জি বরাবর একটু খ্যাপা ধরনের। যাই হোক, তার সঙ্গে বিয়ের এতকাল পর হঠাৎ শিহরণ বনানীর বাড়িতে এসে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকছে জেনে আমরা কম অবাক হয়নি। তাতে রণজয় হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলা যায়, আগুনে ঘৃতাহুদি পড়ল যেন।

—সেই জন্যে কি আপনাদের সেমিনারের দিন শিহরণদা হঠাৎ আগ বাড়িয়ে রণজয় দত্তের আর্টিকেলটির অমন নির্মম সমালোচনা করেছিলেন।

মণীশ রায় আবার একটু থমকালেন, হয়তো তা-ই। তবে অধ্যাপক সমিতির নির্বাচন নিয়ে ক্রমশ চূড়ান্ত শত্রুতা তৈরি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। সেমিনারে বক্তৃতা সে কারণেও করে থাকতে পারে শিহরণ।

গার্গী এবার স্পষ্ট চোখে তাকাল মণীশ রায়ের দিকে, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন, শিহরণদার হত্যার ব্যাপারে আর. ডি-র কোনও ভূমিকা আছে?

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মণীশ রায় এবার বললেন, রণজয়কে আমার কিছুটা সন্দেহ হয়—

ক্রমশ আশ্চর্য হচ্ছিল গার্গী। মণীশ রায় যে সরাসরি এভাবে রণজয় দত্তর নাম বলবেন তা সে ভাবতেই পারেনি। রহস্যের মোড়ক আঁট হয়ে উঠছে যেন ক্রমে। কী যেন ভেবে হঠাৎ বলল, কিন্তু আর. ডি তো সেদিন ফাংশন দেখতেই যাননি শুনলাম।

—কে বলল আসেনি? সেকেন্ড কিংবা থার্ড রোয়ের চেয়ারে বসেছিল রণজয়। তারপর ফাংশন শেষ হওয়ার সময় গণ্ডগোলের মধ্যে দেখি, দ্রুত হল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—

—তাই? গার্গীর ভুরুতে একটা ভাঁজ ঘনিয়ে এল স্বাভাবিকভাবে।

pathagar.net

—শুধু তাই নয়। এত বড় একটা ঘটনা ঘটল, অথচ রণজয়কে তারপর ওখানে আর দেখাই গেল না। সেইটেই আমার কাছে ভারি আশ্চর্য লাগছে—

মণীশ রায়ের কথা শেষ না হতেই গার্গী হঠাৎ দুম করে জিজ্ঞাসা করল, স্যার, পরশুর আগের দিন, অর্থাৎ শিহরণদা যেদিন খুন হন, তার আগের দিন সন্ধের পর শিহরণদা বোধহয় এসেছিলেন আপনাদের বাড়িতে?

প্রসঙ্গ হঠাৎ ঘুরে যেতে প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে গেলেন মণীশ রায়। পরক্ষণে বললেন, হ্যাঁ, এসেছিল—

—হঠাৎ খড়্গপুর থেকে ফিরেই শিহরণদা কেন এসেছিলেন এখানে, তা একটু বলবেন?

মুহূর্তে মণীশ রায়ের মুখখানা শক্ত হয়ে গেল, বোধহয় ঈষিতার সঙ্গে কোনও দরকার ছিল।

—ও, গার্গীই এবার যেন থমকে গেল, আপনার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি?

—হ্যাঁ, হয়েছিল। খড়্গপুরে গিয়ে নাকি একটা দারুণ রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা-ই শোনাল সাতকাহন করে।

গার্গী আশ্চর্য হল, কী রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা!

—বলল, যার সঙ্গে খড়্গপুরে গিয়েছিল সে লোকটা এমন থার্ড ক্লাস তা আগে বুঝতে পারেনি।

—সে কী, কেন?

—সে লোকটা নাকি খড়্গপুরের একজন ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ লাখ টাকার অর্ডার দিয়েছিল। অ্যাভভান্সও করেছিল একলাখের মতন। কিন্তু লোকটা মালও দেয়নি, অ্যাডভান্সও ফেরত দিচ্ছিল না। তাই শিহরণকে নিয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা সেট্‌ল্ করতে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু ব্যবসায়ীর সঙ্গে যখন কথাবার্তা চলছে, তখন সেই মি. বোস নাকি শিহরণকে বলে বসল, এ ধরনের কথাবার্তা আপনি বলবেন জানলে আপনাকে নিয়ে আসতাম না—

—তাই নাকি? শিহরণদা কিছু খারাপ কথা বলেছিলেন নাকি ব্যবসায়ীকে?

—হ্যাঁ, বলল এ ধরনের চাপ না দিলে তো টাকা আদায় করা যাবে না। কিন্তু মি. বোস যে ও ধরনের কথা বলবেন তা ভাবতেই পারেনি শিহরণ। ফেরার পথে গাড়িতে নাকি খুব ঝগড়া হয়েছে।

গার্গী আরও আশ্চর্য হয়, কী ধরনের ঝগড়া তা কি আপনাকে বলেছিলেন?

—তা বলেনি, তবে বলল, লোকটা ফ্রড। যে টাকা নিয়ে ফুটানি মারছে তা নাকি নিজের নয়।

—স্ট্রেঞ্জ! আর কিছু বলেছিলেন?

—না।

এবার গার্গী আসল কথায় চলে এল। অনেকক্ষণ ইতস্তত করছিল কথাটা কীভাবে পাড়বে এই ভেবে, এতক্ষণে বলতে পারল, স্যার, শিহরণদা সেদিন সন্ধেয় যখন এখানে এসেছিলেন, তাঁর কাছে কি একটা পিস্তল ছিল?

—পিস্তল! মণীশ রায় প্রথমে যেন আকাশ থেকে পড়লেন, তারপরই হঠাৎ যেন মনে পড়েছে এমনভাবে বললেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার দেখিয়েছিল বটে। বলেছিল, খড়্গপুরে দরকার হতে পারে এই মনে করে নিয়ে গিয়েছিল।

pathagar.net

—পিস্তলটা কি উনি আপনার বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন?

—ফেলে! মণীশ রায় খুবই অবাক হলেন, কই না তো! সঙ্গে সঙ্গে তো কোমরে গুঁজেছিল। পাঞ্জাবির নিচে ধুতির সঙ্গে আটকে রাখা ছিল ওটা।

—পিস্তলটা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, স্যার।

—তাই নাকি?

—শিহরণদা ডোনার মাকে বলেছিলেন, উনি কারও বাড়িতে ভুলে ফেলে এসেছেন।

মণীশ রায় তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, এখানে মোটেই পিস্তল ফেলে যায়নি। নিজেই কোথাও রেখেছে ভুলে। কিংবা হয়তো কোথাও রেখেছিল, যাতে পরে কাজে লাগানো যায়। ওর তো অনেক গুণ, বলতে বলতে আবার শক্ত হয়ে গেল মণীশ রায়ের মুখ। এতক্ষণ যেন একটা রাগ চাপা ছিল ভেতরে, হঠাৎ তা প্রকাশ হয়ে পড়ল গার্গীর সামনেই।

—গুণ! যেন কথাটা বুঝতে পারেনি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করল গার্গী।

রাগটা আর চেপে রাখতে পারলেন না মণীশ রায়, বললেন, মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে বেড়ানোটাই তো ওর নেশা ছিল কি না—

মণীশ রায়ের রাগের কারণ অবশ্য বুঝতেই পেরে গিয়েছিল গার্গী। শিহরণ রায়চৌধুরী আজকাল ঘন ঘন কেন আসতেন এ বাড়ি তা তার অজানা নয়। নণীশ রায়ও নিশ্চই সেটা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই আক্রোশে ফুঁসছিলেন ভেতরে-ভেতরে। হঠাৎ তার বহিঃপ্রকাশ হয়ে যেতে হাসি পাচ্ছিল গার্গীর। মণীশ রায় নিজেও যে এই অদ্ভুত নেশায় আক্রান্ত তা নিশ্চয় এ সময় ভুলে গিয়ে থাকবেন। তাঁর নেশাটি এখন বুমেরাং হয়ে ফিরে এসেছে তাঁরই সংসারে।

মণীশ রায়কে আর বেশি ঘাঁটিয়ে কাজ নেই বুঝতে পেরে গার্গী চট করে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে।

—ঠিক আছে, স্যার, আজ চললাম, বলেই ঘাড় ফেরাতেই দেখল স্ট্যাডি-রুমের জানালার ওপাশে এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঈষিতাদি। তাঁর মুখ গম্ভীর, দু-চোখে এক অদ্ভুত ক্রুরভঙ্গি। দৃশ্যটি নজরে পড়তে খুবই অবাক হল গার্গী। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিলেন ঈষিতাদি! মণীশ রায়ের সঙ্গে তার কথোপকথন শুনছিলেন গোপনে! ছাত্রীরা তাদের অধ্যাপকের সঙ্গে কীভাবে প্রেম করে তা শুনতেই আড়ি পেতেছিলেন।

অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে গার্গী দ্রুত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। দরজা খুলে বেরোতে যাবে, হঠাৎ পেছন থেকে নারী কণ্ঠে 'শোনো' শুনতেই থমকে দাঁড়াল অবাক হয়ে। তার পিছু পিছু নেমে এসেছেন ঈষিতাদিও। গার্গী ঘুরে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে, কিন্তু বেশ রাগতভাবেই ফুঁসে উঠলেন মণীশ রায়ের যুবতী স্ত্রী, উনি যা বলেছেন, সব কিন্তু মিথ্যে কথা।

এতক্ষণ যতটা চমকে উঠছিল, গার্গী তার চেয়েও আশ্চর্য হয়ে গেল ঈষিতাদির কথা শুনে। অনুচ্চকণ্ঠে বলল, কোন্‌টা মিথ্যেকথা?

—ওই যে, তোমাদের আর. ডি সম্পর্কে যা-যা বললেন। আমিও তো মাত্র ক'বছর আগে আর ডি-র ছাত্রী ছিলাম। উনি আর যাই হোন, মানুষ খুন করতে যাবেন না।

—সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

তেমনই ফিসফিস করে ঈষিতাদি বললেন, আমি জানি। তোমাদের এম. আর এখন নিজেকে আড়াল করার জন্য সমস্ত দোষ আর. ডি-র ঘাড়ে চাপাতে চাইছেন।

—নিজেকে আড়াল করতে? বিস্ময়ে গার্গীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যেতে চাইছে যেন।

pathagar.net

—তা ছাড়া আবার কী। তোমাদের শিহরণদাকে সন্দেহ করতেন উনি। আমাদের বাড়ি আসাটা একেবারেই পছন্দ করছিলেন না। আমি ইচ্ছে করেই ওঁর সঙ্গে মেলামেশাটা বাড়িয়ে দিলাম তোমাদের এম. আরকে উচিত শিক্ষা দিতে। নিজে সারাক্ষণ মেয়েপরিবৃত হয়ে থাকবেন, আর আমি কারও সঙ্গে হেসে কথা বললেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল!

গার্গী লক্ষ করছিল ঈষিতাদির ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ মুখখানা। রাগে লাল হয়ে উঠেছে পানপাতা ছাঁদের ফর্সা মুখমণ্ডল। বড় বড় নিঃশ্বাসে উঠছে-পড়ছে তাঁর ভারী বুক। অনেকদিনের জমে থাকা ক্রোধ হঠাৎ হুড়মুড় করে তাঁরও বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। গার্গী এই সুযোগটা ছাড়তে চাইল না। তক্ষুণি গলা যথাসম্ভব নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা আপনি জানেন, শিহরণদা সেদিন রাতের বেলা একটা পিস্তল এ বাড়িতে ফেলে গিয়েছিলেন কিনা।

ঈষিতাদি ঘাড় নাড়লেন, আমি দেখেছি পিস্তলটা।

গার্গীর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল, কোথায় সেটা?

—উনি তো শিহরণদার কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিলেন সেদিন। জিজ্ঞাসা করছিলেন, কীভাবে চালাতে হয় পিস্তলটা। শিহরণদা দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে গুলি ভরতে হয়, কীভাবে ট্রিগার টিপতে হয়, লক্ষবস্তু কোথায় থাকলে নলের মুখ কোথায় থাকবে—

—তাহলে শিহরণদা এ বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলেন পিস্তলটা?

—আমার তো তাই মনে হয়। নইলে উনি পিস্তল কোথায় পেলেন?

গার্গী প্রবল আশ্চর্য হয়ে ঈষিতাদির মুখের দিকে ভাল করে দেখল। ঈষিতাদি যেন ধরেই নিয়েছেন মণীশ রায়ই এই খুনটা করেছেন। কিন্তু সে কথা কেন হুড়মুড় করে গার্গীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন, তা ভেবে বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না তার। তার মানে শিহরণদা খুন হতে ঈষিতাদি এতটাই শক্‌ড্‌ হয়েছেন যে, মণীশ রায়কে খুনি সাব্যস্ত করতেও এতটুকু দ্বিধা করছেন না। গার্গী তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল, পিস্তলটা নিশ্চয় তাহলে এ বাড়িতেই আছে?

ঈষিতাদি ঘাড় নাড়লেন, না, তারপর থেকে আমি আর পিস্তলটা দেখতে পাইনি। কাল সারাদিন খুঁজেছি ঘরে—

—ও, গার্গী কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু হেসে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

বাইশ

বাড়ি ফিরে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর প্রথমেই যে-কথাটা মনে হল গার্গীর তা হল, সকালে মণীশ রায় উত্তেজনার বশে কিছু কথা বলে, কিছু কথা না বলে যে রহস্যটুকু চারিয়ে দিয়েছেন তার মনে, তার যদি কিনারা করতে হয়, তাহলে অধ্যাপক রণজয় দত্তর সঙ্গে গার্গীর কিছুক্ষণ বসা দরকার। রণজয় দত্তর সঙ্গে একদিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ডোনা। সে আলাপ-পর্বটি অবশ্যই খুব সুখের ছিল না, কারণ ডোনা তার স্বভাবসিদ্ধ চটুলতায় হাসি-হাসি মুখে আর-ডি-কে বলেছিল, গার্গী অপেক্ষা করছে এম. আরের জন্য। আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির ওপর একখানা বই নেবে বলে। কথাটা শুনেই শক্ত হয়ে গিয়েছিল রণজয় দত্তর ভারী, গোলগাল মুখখানা। এখন গার্গী যদি হঠাৎ গিয়ে রণজয় দত্ত সমীপে হাজির হয়, কীভাবে যে তাকে অভ্যর্থনা করবেন আর.ডি, তা কে জানে।

pathagar.net

তবু এতদ্বিধ কিছু দ্বিধায় আন্দোলিত হয়ে গার্গী দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ল রণজয় দত্তর উদ্দেশে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরস রুমে থাকার কথা তাঁর। একই ঘরে বসেন মণীশ রায়, অতএব তাঁর নজর এড়িয়ে কীভাবে রণজয় দত্তর সঙ্গে কিছুক্ষণ মুখোমুখি বসা যায় এমন ভাবতে ভাবতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছে প্রফেসরস' রুমে উঁকি দিল গার্গী। কিন্তু না, ঘরে আজ প্রায় কেউই নেই। খবর নিয়ে জানল, কী একটা জরুরি ব্যাপারে হেড্ অব্ দ্য ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সব অধ্যাপকদের মিটিং চলছে কনফারেন্স রুমে। অন্তত ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কারও দেখা পাওয়া ভার।

সামান্য বিমর্ষ মুখে গার্গী যখন লম্বা করিডোরে মিনিট পনেরো পায়চারি করেও ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, কীভাবে বাকি সময়টা কাটাবে, সেই মুহূর্তে সে দেখা পেয়ে গেল যাকে খুঁজছিল সেই আর.ডি-র। বোধহয় কনফারেন্স রুম থেকেই আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। মুখে সামান্য বিরক্তির আভাস। হয় তো মিটিং থেকেই কোনও কারণে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।—

যে যাই হোক, গার্গী তার প্রার্থিত ব্যক্তিকে হঠাৎ পেয়ে যেতে যেমন খুশিও হল, তেমনই দ্বিধান্বিতও হল এই ভেবে, এহেন রাগত একজন লোককে এখন কীভাবে প্রশ্নগুলো করবে!

রণজয় দত্ত হনহন করে প্রফেসরস রুমে ঢুকে তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসতেই সেদিকে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল গার্গী, স্যার, আপনার সঙ্গে একটু দরকার ছিল—

—আমার সঙ্গে! রণজয় দত্ত, বলাই বাহুল্য, ভারি আশ্চর্য হলেন। তাঁর অতিরিক্ত স্বাস্থ্য-ভালো চেহারাটা যে মোটেই তরুণী আকর্ষণকারী নয় তা বোধহয় এতকালে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

—হ্যাঁ, স্যার, যদি কিছু মনে না করেন, আমার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রশ্নগুলো একেবারেই ব্যক্তিগত।

রণজয় দত্তর মুখ একটু গম্ভীর হল। হাতের ঘড়িতে চোখ রেখে বললেন, আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে। থানার ও.সি ফোন করে জানিয়েছেন, উনি আমাকে ইন্টারোগেট করতে চান। কাগজে কী সব আল্‌ফাল্ রিপোর্ট বেরিয়েছে সে সব নিয়েই। হেড অব্ দ্য ডিপার্টমেন্টকে ফোন করে জানিয়েছেন। আর দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই—

কিন্তু দশ-পনেরো মিনিটও পার হল না। গার্গী সবে মনে-মনে গুছিয়ে নিচ্ছিল নিজেকে কীভাবে শুরু করবে তার প্রশ্নগুচ্ছ, তার আগেই নিচে জিপ এসে থামার শব্দ, পরক্ষণেই প্রফেসরস রুমে এসে ঢুকলেন পুলিশ ইনস্পেকটর তুষারশুভ্র মিত্র। দৈর্ঘ্যে ততটা উচ্চ নন, কিন্তু বেশ স্টাউট চেহারা, চোখে সরু ফ্রেমের চশমা, তাতে ওঁর নিঁখুতভাবে দাড়িগোঁফ কামানো মুখখানায় ব্যক্তিত্বের ছাপ। রণজয় দত্ত সামান্য নিষ্প্রভ হয়ে বললেন, আসুন, মি. মিত্র।

আর. ডি-র সামনে রাখা একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে তুষারশুভ্র মিত্র তাকালেন গার্গীর দিকে। তাঁর জিজ্ঞাসুচোখ দেখে সামাল দিলেন রণজয়, ও গার্গী, আমাদের এক ছাত্রী—

—ও, বলে তুষারশুভ্র মিত্র যেন তেমন আমল দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না গার্গীকে। রণজয় দত্তর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মি. দত্ত; আপনি নিশ্চয় জানেন, শিহরণ রায়চৌধুরী নামে একজন অধ্যাপক খুন হয়েছেন আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়াম হলে, এ ব্যাপারে আমরা তদন্ত করতে গিয়ে নানা রকম ক্লু পাচ্ছি একের পর এক। তার মধ্যে একটি তথ্য আমাদের নজর কেড়েছে। তা হল, আপনি আর শিহরণ একসঙ্গে

pathagar.net

পড়াশুনা করতেন কলেজে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে ছাত্র-আন্দোলন করেছেন, তারপর হঠাৎ কী কারণে আপনাদের মধ্যে বচসা হয়, তার জেরে শিহরণ সরে আসেন আন্দোলনের পথ থেকে। সেসময় কী ধরনের মতভেদ হয়েছিল আপনাদের দুজনের মধ্যে, তা আমরা এখনও জানতে পারিনি। নিশ্চয় আপনিই একমাত্র জানেন—

রণজয় দত্ত বেশ একরোখা, একটু জটিলধরনের মানুষ, তবু পুলিশ ইনস্পেক্টরের জেরার সামনে নার্ভাস হয়ে পড়লেন। একবার গার্গীর দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, দেখুন, সবাই জানে, আমাদের আন্দোলনের পথ খুব সহজ ছিল না। সেসময় আমাদের নেতৃত্বও ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিলেন নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিতর্কে, এক-একজন এক-একরকম মত প্রকাশ করছিলেন আমাদের পার্টির বুলেটিনে, তাতে আমরা নিচুস্তরের ক্যাডাররাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলাম ক্রমশ। সেরকম একটি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে শিহরণের সঙ্গে আমার মতভেদ হয়। আসলে শিহরণ ঠিক ডেডিকেটেড ছিল না। আমাদের মনে হচ্ছিল ও নিতান্তই অ্যামেচারিস্ট। শিহরণের বরাবরই একটু হিরোইজমের নেশা ছিল। আর সেই হিরো হওয়ার চেষ্টাটা ছিল শুধুমাত্র মেয়েদের চোখে একটা কেউকেটা হয়ে ওঠার অভিপ্রায়েই। পার্টিতে আসার কারণও ছিল তাই। অতএব তার যে অভিসন্ধি ছিল, তা পরিষ্কার হয়ে যেতেই ও নিজে থেকেই সরে যেতে চাইল পার্টি-লাইন থেকে।

তুষারশুভ্র মিত্রের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, অভিসন্ধি পরিষ্কার হওয়া বলতে আপনি কী মিন্ করছেন?

রণজয় হাসলেন, আসলে আমাদের পার্টিতে বনানী নামে একটি মেয়ে ছিল যে সেসময় খুবই সুন্দরী হিসেবে খ্যাত ছিল। তার নজরে পড়ার জন্যই শিহরণ আমাদের পার্টিতে যোগ দেয়। তারপর যেই বনানীর চোখে ও হিরো হয়ে গেল, সেই মুহূর্তে নিছক একটা ফালতু কারণে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে ও সরে গেল বনানীকে নিয়ে।

—বনানীকে নিয়ে! তুষারশুভ্র মিত্র যেন এ ব্যাপারটাও ঠিক বুঝতে পারলেন না।

—হ্যাঁ, রণজয় দত্ত এবার ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছেন নিজের বক্তব্যে, এতদিন কাউকে বলিনি, খুব একটা বেশি কেউ জানেও না ব্যাপারটা, তবে এখন যা পরিস্থিতি, তাতে বলা দরকার কথাগুলো। সেসময় শিহরণ বনানীকে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল। একসঙ্গে ছিলও মাস ছয়েকের মতো। কিন্তু বিয়েটা টেকেনি। হঠাৎই শিহরণকে অপছন্দ করতে শুরু করে বনানী, করার কথাও, কারণ শিহরণ, যাকে আপনারা বলেন উওম্যানাইজার, সেরকমই ছিল সে। বনানী ছাড়াও আরও প্রেমিকা ছিল। তাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়াত বনানীর সামনেই, অতএব—

পুলিশ ইনস্পেক্টর তুষারশুভ্র মিত্র যতটা চমকে উঠলেন রণজয়ের কথায়, তার চেয়ে ঢের বেশি চমকে উঠল ওপাশে বসা গার্গী। এত বড় একটা ঘটনা সে এতদিন ডোনার সঙ্গে মিশেও জানতে পারেনি ভেবে ভারি অবাক লাগছে তার। কিংবা হয়তো এও হতে পারে ডোনাও জানে না ঘটনাটা।

পরক্ষণেই স্তম্ভিত তুষারশুভ্র মিত্র সেই প্রশ্নই করে বসলেন রণজয় দত্তকে, চিত্রদীপ কি জানেন, বনানী তাঁকে বিয়ে করার আগে শিহরণকে বিয়ে করেছিলেন?

রণজয় দত্ত ঘাড় নাড়লেন, সম্ভবত জানতেন না। তাহলে পরে শিহরণ যখন তাঁর বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে থাকতে এলেন, তখন নিশ্চই বাধা দিতেন। তা ছাড়া, রণজয় একটু ভেবে বললেন, ওদের বিয়েটা অনেক দিন গোপন করে রেখেছিল। রেজেস্ট্রী করার অন্তত একবছর

pathagar.net

পর দুজনে কলকাতার কোনও শহরতলির দুরূহ এলাকায় বাসাভাড়া নিয়ে থাকত। সে খবর ওদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কেউই জানত না। তারপর কখন বনানী শিহরণের কাছ থেকে চলে এসে চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে বিয়ে করল সে খবর আমি জানতাম না, জানার দরকারও বোধ করিনি তখন।

তুষারশুভ্র মিত্র এবার তাঁর হাতের ছোট্ট ডায়েরি খুলে কী সব দেখে নিলেন এক পলক। তারপর হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বনানীকে ভালবাসতেন সেসময়?

রণজয় দত্ত মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেলেন, এক লহমা থেমে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, বনানী আমাদের পার্টিতে ছিল। খুব ডিভোটেড ওয়ার্কার, সেই হিসেবে তাকে পছন্দ করতাম—

—পছন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিনি। আমার যা খবর, আপনি তাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। কিন্তু শিহরণ আপনার কাছ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাকে। সেই ব্যর্থতা, সেই ক্রোধেই আপনি তুমুল ঝগড়া করেছিলেন শিহরণ রায়চৌধুরীর সঙ্গে। আপনার সুপারিশেই পার্টি থেকে এক্সপেল করা হয় তাকে, বলতে বলতে রণজয় দত্তের দিকে বেশ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ঝুঁকে পড়লেন পুলিশ ইনস্পেক্টর, কী ঠিক, বলেছি কি না?

এহেন পুরানো বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে রণজয় দত্তও বেশ তেতে উঠেছিলেন। ইনস্পেক্টর তাঁকে চার্জ করতেই হঠাৎ বেশ ক্রুদ্ধ দেখাল তাঁকে, এ সব মিথ্যে খবর আপনাকে কে দিল? শিহরণ নিজেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, আমার চিন্তা ভাবনা ভুল, আমি ভুলপথে চলেছি বলে নিজেই রিজাইন করে একদিন। আসলে, আগেই বলেছি, ঝগড়াটা একটা উপলক্ষ মাত্র। আসলে সে পার্টি থেকে পালিয়ে যেতেই চেয়েছিল। কারণ পার্টি সেসময় খুব কঠিন পদক্ষেপ নিয়ে এগোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাতে লাইফ রিস্ক ছিল। শিহরণ সে রিস্ক নিয়ে চায়নি বলেই—

—চায়নি বলেই আপনি তাকে থ্রেট করেছিলেন, ইউ উইল হ্যাভ টু ফেস ইটস কনসিকোয়েন্সেস, তাই না?

রণজয় দত্ত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর সম্বিত ভেঙে বললেন, এত সব কথা আপনাকে কে বলল?—

তুষারশুভ্র মিত্র এতক্ষণে মুচকি হাসি হেসে বললেন, পুলিশের কানে সব খবরই চলে আসে, মি. দত্ত। শুধু তাই নয়, তারপর এই দীর্ঘকাল ধরে আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা শত্রুতা বজায় থেকেছে। সে শত্রুতা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে শিহরণ রায়চৌধুরী অধ্যাপক সমিতিতে যোগ দেওয়ার পর। সমিতির মিটিং-এ রীতিমতো লড়াই হত আপনাদের দুজনের মধ্যে। এমনকি শিহরণবাবু আপনাকে হেয় করার জন্য ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে তীব্রভাবে আক্রমণ করে আপনাকে। সেই আক্রমণের জের পড়েছে আপনার ক্যারিয়ারেও। রিডারের পোস্টে আপনার পরিবর্তে প্রোমোশন পেয়েছেন মণীশ রায়।

রণজয় দত্তর চোখদুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন মণীশ রায়ের নাম শুনে। বললেন, তার মানে এই নয় যে, আমি শিহরণকে খুন করেছি। যদি আমার সেই মোটিভই থাকত, তাহলে শিহরণ খুন হয়ে যেত আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। পার্টির সঙ্গে বিট্রে করায় তখন খুন হয়ে যেতে হয়েছিল অনেককেই। আমাদের পার্টির নির্দেশও ছিল তাই—

পুলিশ ইনস্পেক্টর খেয়াল করছিলেন রণজয় দত্তের অভিব্যক্তি, বললেন, শুধু পার্টির সঙ্গেই বিট্রে করেননি শিহরণ, আপনার সঙ্গেও তো করেছিলেন। নইলে বনানী তো আপনারই ছিল সেসময়—

—উইল ইউ প্লিজ স্টপ, ইনস্পেক্টর, রণজয় দত্ত এবার স্থান-কাল ভুলে প্রায় চ্যাঁচিয়ে উঠলেন, পাস্ট ইজ পাস্ট। সেসব কথা তুলে শুধু শুধু আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন না।

পুলিশ ইনস্পেক্টর আবার মুচকি হাসলেন, তার মানে শিহরণের ওপর আপনি প্রবলভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন ভেতরে-ভেতরে?

—তার মানে এই নয় যে আমি তাকে খুন করেছি। রণজয় আবার বললেন কথাটা।

—কিন্তু, পলিশ ইনস্পেক্টর আবার ঝুঁকে পড়লেন, সেদিন ফাংশনে আপনার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। শিহরণ রায়চৌধুরী ড্যান্সড্রামাটির লেখক জানতে পেরে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, কেন, নাটক লেখার আর লোক পেল না ওরা? কার্ডও নাকি নিতে চাননি আপনি। তা সত্ত্বেও আপনি ফাংশন দেখতে গিয়েছিলেন। হত্যার মুহূর্তে শিহরণ রায়চৌধুরীর আশেপাশেই দেখা গিয়েছিল আপনাকে। তারপর উনি খুন হওয়ার পর আপনাকে আর দেখাও যায়নি। কেন বলতে পারেন, মি. দত্ত?

রণজয় দত্ত এবার যেন অবাক হলেন, ঠিক এজন্যেই কি আপনাদের মনে হয়েছে, আমি তাকে খুন করতে পারি?

—আসলে বুঝলেন, হত্যাকারীর মোটিভ, তার চলাফেরা, হত্যার সময়ে তার অবস্থান, হত্যার পর তার প্রতিক্রিয়া, সব কিছুই খেয়াল রাখতে হয় আমাদের। আর আপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুভমেন্টই এত সন্দেহজনক ঠেকছে আমাদের কাছে—

—বাহ্ চমৎকার বলেছেন, ইনস্পেক্টর। এ ছাড়া শিহরণের আশেপাশে আর কাউকেই চোখে পড়ছে না আপনাদের?

তুষারশুভ্র মিত্র তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের সামনে, সতর্ক দৃষ্টি ফেলে বললেন, কার কথা বলতে চাইছেন আপনি?

—অনেকের কথাই। মণীশ রায়ের কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন কী করে! ঈষিতাকে নিয়ে ইদানীং শিহরণ—, তারপর চিত্রদীপ চ্যাটার্জির কথাই ভাবুন না। আপনি হয় তো জেনেছেন, শিহরণকে নিয়ে ইদানীং এক ঘোরতর পারিবারিক সমস্যা তৈরি হয়েছিল ওঁদের বাড়িতে।

তুষারশুভ্র যেন ভাল করে জানেন না এমন ভঙ্গিতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন, যেমন?

—চিত্রদীপ কখনও চাননি, শিহরণ এ বাড়িতে আর থাকুক। বনানীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন শিহরণকে চলে যেতে বলার জন্য। তার ওপর, তিনি সেদিনই জানতে পেরেছিলেন, বনানীর সঙ্গে আগে শিহরণের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

—সে কথা আপনি কী করে জানলেন?

রণজয় দত্ত ইতস্তত করে বললেন, আমি জেনেছি ব্যাপারটা যে করেই হোক।

পুলিশ ইন্সপেক্টর দুম করে বলে উঠলেন, না কি ঘটনাটা আপনিই তাঁর কানে তুলেছেন, মিঃ দত্ত? শিহরণ যে বনানীর কাছে এসে থাকছে, এটা বোধহয় আপনি একেবারেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই-ই আপনি ফোন করে সব জানিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে?

রণজয় দত্ত প্রায় চুপসে গেলেন একলহমায়, একটু চুপ করে থেকে বললেন, হ্যাঁ, জানিয়েছিলাম। অধ্যাপক সমিতির মিটিং-এ ও এমন সব কথা আমাকে লক্ষ করে বলেছিল যে, তখনই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, ওর মুখোশ আমি খুলে দেব! সেদিন চিত্রদীপ ফোনে সব শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলেছিলেন, তাই নাকি! তারপরই ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

pathagar.net

পুলিশ ইন্সপেক্টর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু যেন চিন্তা করে নিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই অবশ্য রণজয় দত্ত আবার বললেন, তা ছাড়া বনানী নিজেও শিহরণকে নিয়ে খুব শান্তিতে ছিল না। আমার সঙ্গে ফোনে কথা হত মাঝে মাঝে। একদিন বলল, শিহরণ ওর মেয়ে ডোনার সঙ্গেও একটা আনএথিক্যাল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। বনানী চেষ্টা করেও কাউকে নিবৃত্ত করতে পারছে না।

তুষারশুভ্র মিত্র ভুরু কুঁচকে বললেন, কী রকম সম্পর্ক বললেন?

—ওরা নাকি দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যেত গাড়ি নিয়ে। ফিরত অনেক রাতে। মেয়ের মুখ দেখে বনানী সন্দেহ করত, ওদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও শুরু হয়েছে।

—মাই গড়। পুলিশ ইনস্পেক্টর বিড়বিড় করলেন মনে মনে।

—বনানী নিজেও খুবই ফিউরিয়াস হয়েছিল ভেতরে ভেতরে। আমার মনে হচ্ছিল, যে কোনও দিন আউটবার্স্ট হলেও হতে পারে।

—ঠিক আছে, মি. দত্ত, পুলিশ ইনস্পেক্টর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, তদন্তের প্রয়োজনে এক পরেও কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করতে হতে পারে। আপনি যতই অন্যদিকে আমাদের অ্যাটেনশান ডাইভার্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, আপনার ওপর কিন্তু আমাদের নজর থাকছে। ও.কে।

পুলিশ ইনস্পেক্টর চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও বেশ গুম হয়ে রইলেন রণজয় দত্ত। হঠাৎ খেয়াল হল, এতক্ষণ স্ট্যাচুর মতো কাছেই বসে রয়েছে গার্গী। তার দিকে ফিরে হঠাৎ বললেন, তুমি কী যেন জিজ্ঞাসা করবে বলেছিলে?

গার্গী অবশ্য তার যা-যা জিজ্ঞাস্য তার উত্তর পেয়েই গিয়েছে এতক্ষণের প্রশ্নোত্তরের ভেতর। শুধু হেসে বলল, আপনি এখন খুবই ডিস্টার্বড আছেন, স্যার। আমি পরে কোনও এক সময় আসব।

তেইশ

বিকেল ফুরিয়ে সন্ধে নামব-নামব করছে কলকাতার বুকে। ঠিক সেসময় গার্গী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিল বড় রাস্তার মুখে। শিহরণ হত্যার রহস্য ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে দেখে তার ভুরুতে মস্ত একটা ভাঁজ জাঁকিয়ে বসছিল। তার এই কুড়ি বছরের জীবনে এহেন চোরাঘূর্ণি কখনও ঘুলিয়ে ওঠেনি। ওঠেনি বলেই ঘটনাটার গভীরে ঢুকতে ঢুকতে এক গভীর গভীরতর বিস্ময়ে আবর্তিত হচ্ছিল ক্রমশ। পুলিশ ইনস্পেক্টর তুষারশুভ্র মিত্র নিশ্চই সে রহস্য উদ্ধার করার চেষ্টায় তাঁর তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি গার্গী এক নিদারুণ সন্ধিৎসায় এক ঠেক থেকে আর এক ঠেকে ঘুরপাক খাচ্ছে নিজের খেয়ালে।

শিহরণ খুনের ঠিক দুদিন আগে ডোনার প্রেমিক মন্দারকে নার্সিংহোমে দেখতে গিয়ে শুনেছিল তাকেও নাকি কোনও অদৃশ্য ঘাতক টেলিফোনে হুমকি দিয়ে বলেছে একবার টার্গেট মিস্ করেছি বলে বারবার মিস হবে না। হাসপাতাল থেকে বেরোলেই তোমার মৃত্যু। বেচারি ভয়ে নাকি নার্সিংহোম থেকে বেরোতেই সাহস পাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, তাকেই বা কে শাসানি দিতে পারে এভাবে! শিহরণ খুনের সঙ্গে মন্দারকে এই হুমকির কি কোনও আপাত

pathagar.net

সাযুজ্য আছে! দুজনের মধ্যে অবশ্য একজন কমন ফ্যাক্টর আছে, সে হল ডোনা। মন্দারও ডোনার প্রেমিক।

যতদূর মনে হচ্ছে শিহরণদার খপ্পরেও পা দিয়েছিল ডোনা, সেক্ষেত্রে ডোনার জীবনে তৃতীয় কোনও পুরুষ কি আবির্ভূত হয়েছে! সেদিন ডোনাকে সেভাবেই প্রশ্ন করাতে সে ঠোঁট কামড়ে বলেছিল, কী জানি, কে চাইছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তার ইতস্তত ভঙ্গিমার রকম দেখে মনে হয়েছিল ডোনা লুকোতে চাইছে কিছু? কিন্তু কাকে লুকোতে চাইছে ডোনা! কেনই বা! পরে অবশ্য বলেছিল, অলর্ক বোসকে সন্দেহ করছে। অলর্ক বোসকে নিয়েও অবশ্য তার নানান চিন্তা। হরিশংকর চৌধুরী লোকটা হঠাৎ খুন হয়ে গেল কেন, কেনই বা তার লাশ পাওয়া গেল অলর্ক বোসের বাড়ির ঠিক কাছেই। হরিশংকর চৌধুরীর অভিযোগ ছিল, বীরভঙ্গপুরের রানিমার খুনি এখন দাড়ি কামিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনও অলর্ক বোসের বাড়ির কাছে, কখনও তার অফিসেও। প্রশ্ন হল, তাহলে সে লোকটাই বা কে! সে কি সত্যিই অলর্ক বোসের নিজস্ব কোনও লোক, যাকে সে এইসব কাজের জন্য মাইনে দিয়ে রেখেছে! হরিশংকর চৌধুরীকে কি তাকে দিয়েই খুব করিয়েছে অলর্ক বোস! তাহলে অলর্ক বোসকেই বা হুমকি দিচ্ছে কে!

এমন নানান ভাবনায় আবর্তিত হতে হতে ডোনা উঠে পড়ল এমন একটা বাসে, যা তাকে নিয়ে গেল রডন স্ট্রিটের কাছাকাছি। রডন স্ট্রিটের একটা নার্সিং হোমে কয়েকদিন ধরে ভর্তি আছে মন্দার। দিনকয়েক আগে যখন ডোনার সঙ্গে দেখতে গিয়েছিল মন্দারকে, কথা দিয়ে এসেছিল আর একবার দেখতে যাবে। ডোনাকে নিয়েই অবশ্য আসা উচিত ছিল তার, ডোনাকে বললে হয়তো আসতও, কিন্তু কেন যেন গার্গীর মনে হল, মন্দারের সঙ্গে কিছুক্ষণ একা কথা বলা দরকার, এবং আজই।

'হোয়াইট ঈগল' নার্সিংহোমের দোতলার কেবিনটিতে পর্দা সরাতেই কিন্তু ভারি হতাশ হল গার্গী। ঘরে কেউই নেই। কেবিনের বেডটিতে অবশ্য ধবধবে চাদর পাতা, পাশের স্টিলফ্রেমের হোয়াটনটটিতে ওষুধ, হরলিকস ও অন্যান্য সরঞ্জাম সবই ঠিকঠাক আছে, যেমনটি ছিল সেদিন, কিন্তু পেশেন্টই নেই। না কি এ কদিনের মধ্যে রিলিজ হয়ে গেল মন্দার।

কাছেই সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন নার্সকে দেখতে পেয়ে সেদিকে দ্রুত এগিয়ে গেল গার্গী, শুনুন—

নার্স দাঁড়াতেই গার্গী জিজ্ঞাসা করল, এই কেবিনে মন্দার মিত্র নামে একজন পেশেন্ট ছিলেন।

—উনি একটু বেরিয়েছেন। বলে গেছেন সাড়ে ছ'টার মধ্যেই ফিরবেন।

—বেরিয়ে গেছেন? গার্গী অবাক তো হলই, ভুরু কুঁচকে এও ভাবল, নার্সিং হোমটা বাড়ি নাকি যে, হঠাৎ কেবিন ছেড়ে বেরোনো যায়!

নার্স মেয়েটির তাড়া ছিল, মৃদু হেসে বলল, না, মানে ওঁর ইনজুরি তো প্রায় সেরে এসেছে, ডাক্তার ছেড়ে দিতেই চেয়েছিলেন, কিন্তু ইচ্ছে করেই দু-একদিন ওভারস্টে করছেন মি. মিত্র। হয়তো দু-তিনদিনের মধ্যেই রিলিজ পাবেন। আজ ডাক্তারকে অনেক করে রিকোয়েস্ট করলেন, কোথায় একটা টেন্ডার না কী আছে, একবার দু-ঘণ্টার জন্যে যেতেই হবে তাঁকে, তাইই—

—টেন্ডার! গার্গীর মুখে একটা হাসির ঢেউ খেলে মিলিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ডোনা একদিন

বলেছিল, মন্দার টেন্ডার ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ডোনা কবে যেন তাকে কৌতুক করে বলেছিল, মন্দার মিত্রের নাম হওয়া উচিত টেন্ডার মিত্র। ভাবতে ভাবতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল গার্গী, ছটা কুড়ি, অর্থাৎ আরও দশমিনিট পরে টেন্ডার মিত্রের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এই দশ মিনিট মন্দারের জন্য অপেক্ষা করা যায়। এতদূর যখন এসেছে—

কেবিনের বেডটির উপর ছড়ানো-ছিটোনো কিছু কাগজপত্র, সম্ভবত অফিসেরই। বালিশের পাশে একটা মাঝারি আকারের নীল ডায়েরি, একটা টর্চ, কিছু কাগজ। কাগজপত্রগুলোর দিকে একলহমা ঝুঁকে পড়তেই একটা হাসির টুকরো আলোছায়া খেলে গেল গার্গীর মুখে। কাগজগুলো টেন্ডারেরই।

তারপর হঠাৎ কী খেয়াল হতে নীল ডায়েরিটি তুলে নিল হাতে। তেমন কিছু অবশ্য লেখা নেই ডায়েরিটায়। মাঝে মধ্যে কিছু হিসেব লেখা, টাকা পয়সার ডিটেইলস। কোথাও এক আধ লাইন নোট, তাতে কখনও লেখা ওল্ড বালিগঞ্জ প্লেস, কখনও সুইনহো স্ট্রিট, কখনও লিন্ডসে অ্যাট নাইন। চার লাইন ইংরেজি কবিতাও 'ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়েট টিল/সি দ্যাট ফেলো, অ্যান্ড গেট থ্রিল/দেন ইউ চিল টিল ইউ কিল/অ্যান্ড আই টেক এ হট মিল।' কোনও পৃষ্ঠায় হিজিবিজি ছবি আঁকা, পাখি, নৌকো, কখনও একটি মেয়ের আদল। কোথাও লেখা, আই অ্যাম দি লর্ড অফ অল আইস সি—

হস্তাক্ষর মোটামুটি পরিষ্কার। বেশ স্টাইলিস, অলঙ্কারবহুল। তবে অধিকাংশ পৃষ্ঠায় হিসেব, হিসেব আর হিসেব। লক্ষ লক্ষ টাকার সব হিসেব। এ সবই কি মন্দার মিত্রের ব্যাবসার হিসেব! টাকা পয়সার চিন্তা ছাড়া কি তার মাথায় আর কিছুই নেই!

সম্ভবত কিছুক্ষণের জন্য এতসব ভাবতে ভাবতে নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ কোথাও পায়ের শব্দ পেতেই চমকে উঠে ডায়েরিটা দ্রুত রেখে দিল যথাস্থানে। অন্যের ডায়েরি এভাবে পড়া মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু গার্গীর সব ব্যাপারেই অনাবশ্যক কৌতূহল। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে সে মুহূর্তে চলে গেল কেবিনের জানলাটির কাছে, যেখান থেকে রডন স্ট্রিটের অনেকখানি দেখা যায়। পরমুহূর্তে চটিতে শব্দ তুলে কেবিনের ভেতর যে ঢুকল, সে মন্দার মিত্র। ঘরেই ঢ়কেই গার্গীকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বেশ চমকে উঠল, আরে, কতক্ষণ এসেছেন? গার্গী সরে এল জানলা থেকে এই তো, মিনিট দশ। কিন্তু কী ব্যাপার! এখন পুরোপুরি সেরে ওঠেননি, এর মধ্যে টেন্ডার না কী ধরতে বেরিয়েছিলেন।

মন্দার লাজুক লাজুক মুখে হাসল, আর বলবেন না। টানা এতদিন নার্সিং হোমে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। আজ 'ম্যাকেঞ্জি অ্যান্ড গ্রিন কোম্পানি'র একটা বড় টেন্ডার জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল। প্রায় বারো লাখ টাকার কাজ। না গিয়ে আর থাকতে পারলাম না। ডাক্তারকে দিয়ে একটা পারমিশান করিয়ে নিলাম বাধ্য হয়ে। ডাক্তার বলল দু' তিনদিনের মধ্যে রিলিজ তো হয়েই যাবেন, তাহলে যান ঘুরে আসুন। ব্যাবসার ব্যাপার যখন—

—তাহলে এখন ভালই আছেন মনে হচ্ছে—

—হ্যাঁ, ইনজুরি শুকিয়ে এসেছে ডাক্তার বললেন, এ সবই ডাক্তারের হাতযশ আর আমার কপাল। তা আপনি একা এলেন? আপনার বান্ধবী কই?

—ডোনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি আমার। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একবার আপনার খবর নিয়ে যাই। তা ছাড়া, ডোনা একটু সমস্যায় আছে। আপনি ওদের বাড়ির ঘটনা কি শুনেছেন!

pathagar.net

মন্দারের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে, হ্যাঁ, আজ সকালেই শুনলাম সব। ফোন করেছিলাম ডোনাকে, তখনই জানলাম। ভীষণ শকিং। এরকম একটা ঘটনা যে ঘটতে পারে ভাবাই যায় না। ডোনা খুব ভেঙে পড়েছে দেখলাম।

—আপনি ফোন করেছিলেন? তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দু-একদিন পর পরই তো করি। আজ ফোন করতেই এরকম শকিং নিউজ।

—সত্যিই শকিং। দুদিন ধরে যা ঝড় যাচ্ছে ওদের উপর!

—তা তো যাবেই। আর আমারও ব্যাড লাক, ঠিক এ সময়েই আমি ইনজিওরড হয়ে নার্সিংহোমে পড়ে আছি। না হলে ওদের একটু হেল্প করতে পারতাম।

—আপনি আর কী করবেন। আপনি নিজেই তো খুন হতে যাচ্ছিলেন। মন্দার একটু শিউরে উঠে বলল, এখন বুঝতে পারছি একটুর জন্য বেঁচে গেছি সেদিন। তবে শিহরণদাও যে টার্গেট হতে পারেন তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম।

গার্গী এবার নড়েচড়ে বসল, ভালো করে তাকাল মন্দারের মুখের দিকে, বলল, অনুমান করেছিলেন! কীভাবে?

মন্দার একটু হাসল, আসলে আমার উপর অ্যাটেম্পট হওয়ার পরই আমি সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে বসলাম। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই মনে হল, কয়েকদিন ধরে যে-সব ঘটনা ঘটতে দেখেছি, তাতে অন্য একটা ইন্টারেস্ট প্লে করছে কারও।

গার্গী চোখ তীক্ষ্ণ করে তাকাল, কার ইন্টারেস্ট প্লে করছে?

—নাম এই মুহূর্তে বলা কি সঙ্গত হবে? পুলিশ নিশ্চই ইনভেস্টিগেট করছে। হত্যাকারী খুঁজে বার করা তাদেরই কাজ। তবে ডোনার কাছে ফোনে যা শুনলাম, তাতে আমার অনুমান হত্যাকারী অসংখ্য ক্লু ফেলে গেছে সবার চোখের সামনে।

গার্গীর বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন, তাই নাকি? একটি ক্লু সম্পর্কে আমাকে যদি হিন্ট্স্ দেন?

মন্দার আবার হাসল, ঠিক আছে, বলছি। আপনি বলুন তো, শিহরণদা গত কয়েকদিন ধরে কাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি ইনভলভ্ড্ ছিলেন?

—ইনভল্ভ্ড্! গার্গী হঠাৎ বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল। শিহরণদা এত বিচিত্ররকমের সমস্যা নিয়ে এ ক'দিন ব্যস্ত রেখেছিলেন নিজেকে যে, ঠিক কার কথা বলতে চাইছে মন্দার তা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। অধ্যাপক সমিতির ব্যাপারে যেমন লিডিং পার্ট নিয়েছিলেন, তেমনই ব্যস্ত ছিলেন ঈষিতাদির সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার গড়ে তুলতে। ডোনাকে নিয়েও তাঁর উৎসাহের কমতি ছিল না। গত দুদিন রহস্যটির পিছু পিছু তাড়া করে গার্গী যে অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাকে শিহরণদার চরিত্রের অত্যাশ্চর্য সব দিক একে একে উন্মোচিত হচ্ছে তার সামনে। এমনকি বনানী-শিহরণপর্বও তার কাছে আশ্চর্যতম বলে মনে হয়েছে। এতসব অভিজ্ঞতাবলী একলহমা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসে হঠাৎ কেমন বোকার মতো মন্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল গার্গী, ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, মি. মিত্র।

—পারলেন না? মন্দার অদ্ভুতভাবে হাসল, অলর্ক বোসকে তো আপনি দেখেছেন? কেমন মনে হয়েছে লোকটাকে?

গার্গী আবারও বেশ ধাঁধায় ঘুরতে লাগল। অলর্ক বোস যে খুবই রহস্যময় পুরুষ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি হঠাৎ শিহরণকে খুন করতে উদ্যোগী হবেন কেন তা যেন প্রথম দমকায় সেঁধুল না গার্গীর মনে।

pathagar.net

—যে লোকটা এইমুহূর্তে কোটি কোটি টাকার মালিক, তার ব্যাকগ্রাউন্ড কি কেউ জানে? তার পাস্ট হিস্ট্রি নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন মনে করেনি কেউ!

—পাস্ট হিস্ট্রি! গার্গী যেন প্রবল ধাক্কা খেল কোনও ডুবো-পাহাড়ে, আপনি জানেন নাকি?

—বিজনেসের ব্যাপারে অনেক কিছুই খোঁজখবর রাখতে হয় আমাদের। হঠাৎ একটা লোক ঢুকে পড়ল বিজনেস ওয়ার্ল্ডে, কোটি-কোটি টাকা ক্যাপিটালসহ, তাকে নিয়ে সবার মুখেই তো আলোচনা ঘুরছে। তাতে যেসব কথা কানে এল, সে তো সত্যিকারের রোমহর্ষক গল্প। এক কোটিপতি বিধবা কোনও উত্তরাধিকারী ছাড়াই হঠাৎ মারা গেলে প্রায় বেওয়ারিশ হতে বসেছিল তার সমস্ত সম্পত্তি। যখন বারোভূতে সে সম্পত্তি লুটেপুটে খাওয়ার যড়যন্ত্র করেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ভুয়ো উত্তরাধিকারী সেজে সমস্ত সম্পত্তি নিজের হেপাজতে নিয়ে নেয় অলর্ক বোস। সেই কোটিপতি। বিধবার যারা আশ্রিত ছিল, যারা সেই সম্পত্তির ভাগীদার হবে বলে স্থির করে ফেলেছিল মনে-মনে, ভাগ-বাঁটোয়ারাও প্রায় হয়ে গিয়েছিল মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে, ঠিক সেসময় অলর্ক বোস তাদের মুখের গ্রাস হঠাৎ ছিনিয়ে নিল এই ভুয়ো পরিচয়ের বিনিময়ে।

এ গল্পটা কিছু কিছু জানে গার্গী। মন্দারের কাছে এহেন একটি চমকপ্রদ গল্প শুনে তাই আশ্চর্য হল না, মুখে সামান্য বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, তাই নাকি?

—হ্যাঁ, রাসেল স্ট্রিটের এই বাড়িটি ছাড়া অলর্ক বোসের আর কোনও সম্পত্তিই ছিল না ভারতে। বলা যায় ফার্দিংলেস, ভাগ্যাবন্ড। অথচ আজ সে কোটি কোটি টাকার মালিক। ওয়ান অফ দ্য টপ বিজনেসমেন অব্ ক্যালকাটা। ঘটনাটা প্রায় রূপকথার মতো নয়! কিন্তু রূপকথা কখনও কখনও সত্যিও যে হয়, অলর্ক বোসই তার প্রমাণ।

গার্গী এবার তাকাল মন্দারের চোখের দিকে, কিন্তু তার সঙ্গে শিহরণ হত্যার কী সম্পর্ক?

—শিহরণ রায়চৌধুরী হঠাৎ কদিন ধরে খুবই মাথা ঘামাচ্ছিলেন অলর্ক বোসের ব্যাবসা নিয়ে। বিজনেস সম্পর্কে এটা-ওটা পরামর্শ দিতে গিয়ে জেনে ফেলেছিলেন অলর্কের সম্পত্তির উৎস। তারপর আমার ধারণা দুজনের মধ্যে কোনও ঝামেলা শুরু হয়েছিল—

গার্গী চমৎকৃত হচ্ছিল। আজই মণীশ রায় তাকে বলেছিলেন, শিহরণের সঙ্গে অলর্কের কোনও ব্যাপারে মতবিরোধ হয়েছে খড়্গাপুরে গিয়ে। সে কথা মনের মধ্যে রেখে মন্দারকে আবারও বাজাতে চাইল গার্গী, কী ধরনের ঝামেলা হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

—সম্ভবত শিহরণদা ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিলেন অলর্ক বোসকে, যাতে তিনি ওই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির কিছুটা পান। হয়তো বলেছিলেন, সম্পত্তির ভাগ না পেলে তিনি সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে দেবেন জনসমক্ষে।

গার্গী তার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, হুঁ, তারপর?

—ডোনা বলল, মার্ডারের দিনদুই আগে অলর্ক বোস শিহরণদাকে খড়্গাপুর নিয়ে গিয়েছিল কোনও একটা অছিলায়। সম্ভবত বাইরে গিয়েই ব্যাপারটা ফয়সালা করতে চেয়েছিল অলর্ক বোস। হয়তো ওখানেই কোনও ভাবে শিহরণদাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। শিহরণদা সেটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। নইলে শুধু শুধু হঠাৎ পিস্তল দরকার হল কেন তাঁর! হয়তো সেজন্যই খড়্গাপুরের অপারেশন সাকসেসফুল হয়নি অলর্কের, তাই ফিরে এসে আর অপেক্ষা করতে পারেনি। ফাংশনের রাতেই সুযোগ বুঝে—

গার্গীর হঠাৎ মনে হল, মন্দারের অনুমান একেবারেই নিখুঁত, যা সে নিজেও ভাবতে পারেনি। হেসে বলল, থ্যাঙ্কু ফর দি ইনফরমেশনস। মনে ইচ্ছে, শিহরণ হত্যার জট খুলতে

pathagar.net

আপনার বিশ্লেষণ কাজে লাগলেও লাগতে পারে। এত অসুস্থতার মধ্যেও আপনি যে এতটা ভেবেছেন, তার জন্যও ধন্যবাদ। কিন্তু যাওয়ার আগে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার উপর যে অ্যাটেম্পট্ নেওয়া হয়েছিল, আপনি কি মনে করেন তার নেপথ্যেও অলর্ক বোস!

সহসা তপ্ত হয়ে উঠল মন্দারের মুখ, চোখ ক্রুদ্ধ করে বলল, তা নয়তো কী!

গার্গী তা বুঝল না যেন। জিজ্ঞাসু চোখে নিরিখ করতে লাগল মন্দারের অভিব্যক্তি, মুখে বলল, কেন?

মন্দার তখন নিবিষ্ট হয়ে পড়েছে তার যুক্তিজালের ভেতর। তখন তার সামনে গার্গীও নেই যেন। নিজেই একটি হত্যাকাণ্ডের ক্লু খুঁজে চলেছে, উত্তেজিত হয়ে বলল, কারণ একটাই, সে ডোনা। ডোনা যেহেতু আমাকে পছন্দ করে, ভালবাসে, অতএব মন্দার মিত্রকে সরিয়ে দাও পৃথিবী থেকে। টাকা পেয়ে লোকটা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। জীবনে যা যা চায় তার সবই পেয়েছে। এখন ডোনাকেও চাই তার—

গার্গী বেশ আশ্চর্য হল। মন্দারের উত্তেজনার কারণও বুঝল। হঠাৎ মনে হল, মন্দার ঠিকই বলেছে। ডোনা সেদিন যাকে আড়াল করতে চাইছিল, সে অলর্ক বোস। কেন আড়াল করতে চাইছে কে জানে। তাহলে কি অলর্কের সঙ্গেও কি দোনার কোনও অ্যাফেয়ার চলছে! এ খবরটা গার্গী জানে না। মন্দারের পক্ষে সেটা অনুমান করা স্বাভাবিক। মন্দার ডোনার প্রেমিক, একজন প্রেমিকই ভালো বুঝতে পারে তার প্রেমিকার মনস্তত্ত্ব। তার গতিবিধি, অন্য যুবকের প্রতি তার ব্যবহার, আসক্তি।

হঠাৎ গার্গী গাত্রোত্থান করার উদ্যোগ করল, বলল, আপনার সঙ্গে আরও একদিন আলোচনায় বসতে হবে, মি. মিত্র। আপনার অফিসের ঠিকানাটা দিন তো।

মন্দার খুশি হয়ে তার বালিশের তলা থেকে বার করল একটা নীলরঙের ডটপেন। পেনটার তলার দিকে দাঁতের দাগ। ডায়েরির ভেতর থেকে একটা সাদা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে বেশ গোটা-গোটা অক্ষরে মন্দার তার অফিসের নাম-ঠিকানা লিখে দিল। সঙ্গে ফোন নম্বরও, গার্গী শুধু আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, মন্দারের হাতের লেখা যেন কোনও বাচ্চাদের মতোই।

আরও আশ্চর্য হল, ডায়েরিতে তাহলে কার হাতের লেখা এই ভেবে।

চব্বিশ

বাড়ি ফিরে দীর্ঘ রাত বড় বিনিদ্র কাটল গার্গীর। হঠাৎই সমস্ত ঘটনা তার কাছে কেমন ধোঁয়াশা হয়ে নেমে আসছে টুপটুপ করে। তাতে তার শরীরময় একধরনের অস্থিরতা। ঠিক কোন অ্যাঙ্গেল থেকে উন্মোচন করবে জটিল ক্লুগুলো তা ভেবেই পাচ্ছে না যেন। গত দু' দিন ক্লাসে যায়নি, গণিতের জটিল ভাবনাগুলো মাথার ভেতর থেকে উধাও হয়ে সেখানে হিসেবনিকেশ হচ্ছে অন্য এক অঙ্কের। বুঝতেই পারছে না, এহেন অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে কার পক্ষে শিহরণ রায়চৌধুরীকে খুন করা সম্ভব!

পরদিন সকালে উঠেই সে আবারও বেরিয়ে পড়ল যোধপুর পার্কের উদ্দেশে। ডোনাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে ডোরবেল টিপতেই যে দরজা খুলে দিল, সে ডোনাই। গার্গীকে তার ঘরে নিয়ে যেতে যেতে ফিসফাস করে বলল, ধুর, যা একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'ল। বাড়ি নয় তো যেন শ্মশান।

pathagar.net

গার্গী একলহমা তার নজর ছুড়ে দিল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির স্টাডির দিকে। মস্ত চেয়ারটায় কেমন ভাবলেশহীন হয়ে বসে আছেন চিত্রদীপ। এভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে সাধারণত কমই বসে থাকেন উনি। সারাক্ষণ কোনও না কোনও কাজে যিনি সদাব্যস্ত থাকতেন, হঠাৎ এই বিচিত্র পরিস্থিতিতে কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। বনানী কাছাকাছি নেই। হয়তো টয়লেটে, কিংবা হয়তো বা কিচেনেই অন্তরিন।

ডোনার কাছে কয়েকটা কথা জানার ছিল, সে কথাই জিজ্ঞাসা করল তার ঘরে ঢুকে, অলর্ক বোস লোকটিকে তোর কেমন মনে হয় রে, ডোনা?

ডোনা বোধহয় আশা করেনি এহেন প্রশ্ন, বলল, কী করে জানব, বল? মাত্র কয়েকদিনের চেনাজানা। তবে টাকার উপর কোনও মায়াদয়া নেই। যখন যেটা করবে ভাবে, সেটা করবেই। অ্যাট এনি কস্ট্।

গার্গী তাকাল তীক্ষ্ণচোখে ডোনার দিকে, তোর সঙ্গে রিলেশন কেমন?

ডোনা একটু গম্ভীর হল, কেমন আবার? বন্ধুরা যেমন হয়ে থাকে আর কি?

—বন্ধু, না কি তার চেয়েও বেশি?

ডোনা হাসার চেষ্টা করল, বেশি তো নয়ই, বরং কমই বলতে পারিস। তুই তো জানিসই, আমি তার কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মডেল। সুতরাং রিলেশন কিছুটা টাকারও বটে।

গার্গী এবার ঝুঁকে পড়ল ডোনার দিকে, নির্নিমেষে নিরিখ করল তার মুখ, কিন্তু তোকে টাকা দিয়ে কি পারচেজ করতে চেয়েছিল? তেমন কোনও প্রপোজাল দিয়েছে কখনও।

ডোনা হঠাৎ থমকে গেল। প্রায় জার্ক খেয়ে উঠল যেন। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই হঠাৎ তাদের লিভিংরুমে টেলিফোন বেজে উঠল সবাইকে চমকিত করে। এখন প্রতিটি টেলিফোনই যেন ভয়ঙ্কর। আগে টেলিফোন বাজলে ছুটে যেত ডোনাই। এখন গেল না। গেল না বলেই স্টাডি থেকে উঠে এসে টেলিফোন ধরতে হল চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকেই, হ্যালো।

ওপাশ থেকে কিছু কথা শুনলেন চুপচাপ। তারপর ফ্যাসফেসে গলায় বললেন, না, পাওয়া যায়নি। আবার ওদিক থেকে কিছু কথা, তারপর ঝট্ করে বেশ শব্দ তুলেই ক্র্যাডলের উপর রেখে দিলেন ফোনটা, অর্থাৎ ক্রোধের বহির্প্রকাশ। পরক্ষণেই গলা চড়িয়ে ডাকলেন, বনানী—

ডোনার ঘরের সামনে দিয়ে ফ্যাকাসে মুখে এগিয়ে গেলেন বনানী, কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে, তাঁকে দেখেই আবারও প্রায় গর্জন করে উঠলেন চিত্রদীপ, থানা থেকে ফোন করেছিল। পিস্তলটা আজকের মধ্যেই দেখিয়ে আসতে হবে ওদের। কোথায় রেখেছ পিস্তলটা বার করে দাও—

বনানী ভীত, সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, আমি কোত্থেকে বার করব। সে তো শিহরণ—

সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শব্দে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন চিত্রদীপ, একদম বাজে কথা বলবে না। পিস্তলটা শিহরণ দিয়ে গিয়েছিল খড়্গপুর থেকে ফেরার পর। আমি দেখেছি, বইয়ের র‍্যাকের এপাশে ছিল ওটা—

বনানী আবারও সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, ঠিক দেখেছ? কবে বললে?

—যেদিন শিহরণ খুন হয় সেদিন সকালেই।

বনানী হঠাৎ এবার কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুললেন, যদি দেখেই থাক, তাহলে তুমিই সে পিস্তল সরিয়েছ।

—আমি? আমি সরিয়েছি?

—হ্যাঁ, তোমার রাগ ছিল শিহরণের উপর, তার শোধ তুলেছ।

pathagar.net

চিত্রদীপ অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর দ্বিগুণ হুঙ্কার দিয়ে বললেন, আমি শোধ তুলেছি, না তুমি?

—আমি কেন শোধ তুলতে যাব?

—তুমিই তুলেছ। তুমি সহ্য করতে পারনি যে শিহরণ এখন তোমাকে ছেড়ে তোমার মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছে। দুজনে একসঙ্গে বেরোত গাড়ি নিয়ে। সারা দুপুর বিকেল সন্ধে কাটিয়ে রাত করে বাড়ি ফিরত। তোমার সেসব সহ্য হয়নি—

—চুপ করো, বনানী হিংস্র হয়ে উঠলেন, নিজের মেয়ের সম্পর্কে এতসব বাজে কথা বলতে তোমার আটকায় না?

—আটকাবে কেন? যা সত্যি তাইই বলছি। নিজে যেমন হয়েছে, তেমনি তোমার মেয়েও। পিস্তলটা কোথায় রেখেছ বার করে দাও—

বনানী কিছুক্ষণ চুপচাপ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, পিস্তল কোথায় আমি জানি না। নিশ্চই তুমিই সরিয়েছিলে বইয়ের র‍্যাক থেকে—

আবারও একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে চলেছিল লিভিংরুমের মধ্যে, সেই মুহূর্তে হঠাৎ ডোরবেল বেজে ওঠার কয়েক লহমা এক ভয়ঙ্কর নিঃস্তব্ধতা। হয়তো আবারও পুলিশ এসেছে এই আশঙ্কায় বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষই সিঁটিয়ে শীর্ণ হয়ে গেল। খুব ধীর পায়ে কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিলেন বনানী। ডোনা, গার্গীও ঘরের মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে দেখছিল, সত্যিই পুলিশ কি না। কিন্তু না, বাইরে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে অলর্ক।

অলর্কের মুখে হাসি দেখে একটু আশ্চর্যই হয়ে গেল সবাই, এহেন দুঃসহ পরিস্থিতিতে তার মুখে হাসি আসেই বা কী করে! লিভিংরুমে ঢুকে, যেন এ ক'দিন কিছুই ঘটেনি, ঘটে থাকলেও তাতে তার বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া হয়নি, এমন ভঙ্গিতে চিত্রদীপের কাছে এগিয়ে গেল অলর্ক, বলল, আজকের কাগজ দেখেছেন?

—কাগজ! চিত্রদীপ মুখ বিকৃত করলেন, কাগজ দেখার মতো মনের পরিস্থিতি আছে?

—আপনার এক্‌জিবিশনের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে আজ। আগামীমাসের এক থেকে সাত তারিখে।

চিত্রদীপ লাফিয়ে উঠে বললেন, সে কি, কে বিজ্ঞাপন দিল কাগজে।

—আমিই দিয়েছি।

শুধু চিত্রদীপ নয়। বনানী ডোনাও এমন চোখে অলর্কের দিকে তাকাল যেন সবাই ভূত দেখছে। ডোনাই তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, এই পরিস্থিতিতে একজিবিশন হবেই বা কী করে। অসম্ভব।

চিত্রদীপ কয়েক মুহূর্ত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর ঘাড় নাড়তে নাড়তেই বললেন, ঠিকই বলেছে ডোনা। এখন একজিবিশন করার মতো পরিস্থিতি নেই।

—সে কী! এবার অবাক হওয়ার পালা যেন অলর্কেরই, বলল, এতদূর এগিয়ে গিয়ে এখন কি আর ফেরা সম্ভব?

চিত্রদীপ তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অলর্কের দিকে। এপাশ থেকে ডোনা বলল, বুঝতেই পারছেন, আমরা সবাই ভীষণ আপসেট। এখন একজিবিশন করাই যাবে না।

—যাবে না মানে? অলর্ক তাদের কাউকেই পাত্তা দিল না যেন, বলল, এই দুর্ঘটনার জন্য আমরা তো কেউ দায়ী নই। যে ঘটনাটি ঘটেছে, তার তদন্তের দায় পুলিশের। পুলিশ

pathagar.net

ইনভেস্টিগেশন করুক। যে দোষী তাকে শাস্তি দিক, তাকে আমরা আমাদের পরিকল্পনা মুলতুবি রাখব কেন?

গার্গী খুবই বিস্মিত হচ্ছিল। কাল সন্ধেয় মন্দারের কথাগুলোর সঙ্গে অলর্কের ভাবলেশহীন মুখ মিলিয়ে নিচ্ছিল দ্রুত। এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনার মাত্র দুদিনের মধ্যে যে এমন নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে, এতটা নিস্পৃহ, তাতে তার সম্পর্কে সন্দেহ থাকা খুবই স্বাভাবিক।

অলর্ক অবশ্য থামল না, বলল, তা ছাড়া, আমি কয়েক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করেছি গোটা স্কিমটার জন্য। আপনার একজিবিশনের সঙ্গে আমার শো-রুমগুলো ওপেন করারও একটা সম্পর্ক আছে। এর মধ্যে অনেকগুলো শো-রুম প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। সেসব তো আপনি জানেনই। এক্‌জিবিশনে আপনি সাফল্য পেলে সেই গুডউইল আমি কাজে লাগাব শো-রুমের বিজ্ঞাপনে।

এমন অদ্ভুত সব কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়েই রইল। অলর্ক যে ব্যবসায়ী হিসেবেও বেশ দূরদর্শী, তা এর আগেও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। এখনও করছে। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রদর্শনী করলে তা শিল্পী মহলে, কিংবা বুদ্ধিজীবী মহলে কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, সে ভাবনাও তো ভাবা দরকার। হঠাৎ হুট করে এত বড় একটা কাজে নামা চলে কি না, তা অলর্ক না ভাবলেও চিত্রদীপকে নাড়িয়ে দিল বেশ। এমনও তো হতে পারে, সাংবাদিকরা এই চিত্র-প্রদর্শনীর সঙ্গে শিহরণ খুনের ঘটনাকে জড়িয়ে দিয়ে একটা কেচ্ছা গল্প ফাঁদতে পারে তাদের কাগজে। চিত্র সমালোচকদেরও কিছু একটা আলগা মন্তব্য লিখে দিতেও বা বাধা কোথায়!

কিন্তু চিত্রদীপের কোনও যুক্তিই অলর্ক গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। সে তার সিদ্ধান্তে অনড় রইল, দেখুন, এই দুর্ঘটনার জন্যে আমি যখন দায়ী নই, তখন আমার বিজনেস এই কারণে ডুবে যাবে সেটা আমি মানব না। আপনি যেভাবে কথা দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই আমার প্রোগ্রাম সেট করা আছে। সেই পরিকল্পনা মাফিক কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। আপনার ছবিও প্রায় প্রস্তুত। আমার বাড়িও নতুনভাবে সাজাতে হচ্ছে যাতে আপনার ছবির গ্যালারি হিসেবে সেটা ব্যবহার করা যায়। এখন আর কোনওভাবে পরিকল্পনাটা নষ্ট করে দেবেন না। যদি আপনার যাওয়ায় কোন অসুবিধা থাকে, তাহলে ছবিগুলোয় ফাইনাল টাচ দিয়ে আমাকে দিন। একজিবিশন আমি একাই চালিয়ে দেব।

চিত্রদীপ এর পর আর কথাই বলতে পারলেন না। তাঁকে বিস্মিত, স্তম্ভিত করে অলর্ক যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল তার গাড়ি হাঁকিয়ে।

অলর্কের ব্যবহারে ভাবভঙ্গিতে সবাই প্রায় স্তব্ধ। ঘটনাটা কখন কোনদিকে মোড় নিচ্ছে তার কোনও খেই খুঁজে পাচ্ছে না। একটু আগেই চিত্রদীপ আর বনানীর কোঁদল যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাতে পিস্তলের হালহদিশ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। মনে হচ্ছে, পিস্তল এ বাড়িতেই ছিল, এই মুহূর্তে তা নিশ্চয় হয় বনানী কিংবা চিত্রদীপের হেপাজতে। সেদিন পুলিশের সামনে পিস্তল খুঁজে না পাওয়ায় বনানীর বিস্ময় প্রকাশ, সেই সঙ্গে চিত্রদীপের আকাশ থেকে পড়ার ভান করা—এ সবই পুলিশকে দেখানো। এদিকে অলর্কের এহেন নিস্পৃহভঙ্গিও সন্দেহের উদ্রেক করছে। বাড়ির প্রতিটি লোকই যখন এভাবে অনড়, সেইমুহূর্তে আবার ফোনের পিকপিঁকাপিঁক আওয়াজ। ডোনা এতক্ষণ স্টিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে-ই ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল, হ্যালো, ডোনা স্পিকিং—

pathagar.net

ওপাশ থেকে কথা বলছিলেন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার তুষারশুভ্র মিত্র, হ্যালো, মিস চ্যাটার্জি, একটা খবর আছে। একটু আগেই আপনাদের খোয়া-যাওয়া পিস্তলটা পাওয়া গেছে।

ডোনা লাফিয়ে উঠতে চাইল, তাই নাকি? কোথায়?

—ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। একটা বড় বিল্ডিংয়ের পাশে কিছু ভাঙা ইটের টুকরোর আড়ালে পড়েছিল ওটা, ঠিক যে হলে আপনাদের ড্যান্সড্রামা হয়েছিল তারই কাছাকাছি। ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ খবর দিয়েছেন থানায়।

—পিস্তলটা দেখে কী মনে হচ্ছে? এই পিস্তল থেকেই কি গুলিটা ছোড়া হয়েছিল?

—পিস্তলের চেম্বারে পাঁচটা গুলি ভরা আছে, মাত্র একটা ফাঁকা। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সন্দেহ করছি, এই পিস্তল থেকেই ছোড়া হয়েছিল গুলিটা, তবে পরীক্ষা না করে এই মুহূর্তে কিছুই কন্‌ফার্মড্‌ হওয়া যাচ্ছে না। ব্যালিস্টিক রিপোর্ট পেলেই তবে জানা যাবে—

ডোনার হৃৎপিণ্ড কয়েকমুহূর্তের জন্য যেন থেমে গেল। তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, ওটা যে আমাদেরই পিস্তল তা জানলেন কী করে?

ইনস্পেক্টর জানালেন, সেটা কনফার্মড্‌ হয়ে তবেই টেলিফোন করছি। আপনি জানেন না বোধহয়, প্রতিটি থানা-এলাকায় যত আর্মস থাকে, স্মল-আর্মস বা বিগ-আর্মস যাই হোক না কেন, তার একটা তালিকা থানার রেজিস্টারে লেখা থাকে। বছর-বছর তার লাইসেন্স রিনিউ করতে হয়। রেজিস্টার দেখে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে এই পিস্তলের নম্বর। আপনার বাবা এসে পিস্তলটা আইডেন্টিফাই করে যেতে পারেন—

চিত্রদীপ শুনে আঁতকে উঠলেন, পরক্ষণেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, থানায় গেলে নিশ্চই অ্যারেস্ট করবে আমাকে—

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বর ফ্যাসফেসে হয়ে গেল। আর কিছু বলতেই পারলেন না। তাঁর ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। শরীরটা টলে উঠল যেন।

গার্গী দাঁড়িয়েছিল একটু দূরেই। চিত্রদীপের টলায়মান শরীর, তাঁর অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর—সব দেখেশুনে মনে হল এখনই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবেন ভদ্রলোক। দ্রুত ছুটে গিয়ে তাঁর হাতদুটো ধরে আস্তে আস্তে বলল, আপনি অযথা চিন্তা করবেন না। আমরা দেখছি কী করা যায়—

পঁচিশ

চিত্রদীপের পিস্তল উদ্ধার পর্ব শেষ হতে না হতেই আরও একটি যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেল থানা থেকে, তাকে দ্বিগুণ জট পাকিয়ে গেল গেল ঘটনাটা। জানা গেল, ইনস্পেক্টর তুষারশুভ্র মিত্র জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিলেন অলর্ক বোসের বাড়ি। ইন্টারোগেশনের পর তিনি দেখতে চেয়েছিলেন অলর্ক বোসের পিস্তলটি। অলর্ক বোস প্রথমে দেখাতে রাজি হয়নি। বলেছিল, পরে গিয়ে দেখিয়ে আসবে থানায়। ইনস্পেক্টর একটু কড়া হতেই সে সুড়সুড় করে বার করে দিয়েছে পিস্তলটি। সেটি পরীক্ষা করে দেখার পর যে তথ্যটি সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে ইনস্পেক্টরকে, তা হল অলর্ক বোসের পিস্তলটিতে ছটা গুলি ভরা, কিন্তু এই পিস্তলটি থেকেও একটি গুলি ছোড়া হয়েছে কয়েক দিনের মধ্যে। অলর্ক বোস অবশ্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে এই পিস্তলটি শিহরণ হত্যার কাজে মোটেই ব্যবহৃত হয়নি। ফাঁকা আওয়াজ করেছিল একদিন। পুলিশ অবশ্য তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি, কিন্তু গ্রেপ্তারও করেনি এখনও।

সংবাদটি চমকে দিয়েছে চিত্রদীপদের। ফাঁপরে পড়েছে গার্গীও। শিহরণ হত্যার রহস্য এতে আরও জটিলতর হয়ে উঠল সন্দেহ নেই। দু' বাড়ি থেকে দুটি পিস্তল পাওয়া গেল, যে পিস্তল দুটি থেকে ছোড়া হয়েছে একটি করে গুলি, এর মধ্যে কোন পিস্তলের গুলি শিহরণের হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তা এখন লাখটাকার প্রশ্ন।

সে প্রশ্ন অবশ্য আপাতত ঝুলেই থাকবে একটি সরল জিজ্ঞাসা-চিহ্ন হয়ে। তার আগে গার্গীকে যে প্রসঙ্গ ভাবিত করল, তা হল, অলর্ক বোস ক্রমশ পরিণত হচ্ছেন একটি হেঁয়ালিতে। সুতরাং জানা দরকার অলর্ক বোসের প্রকৃত পরিচয় কী, কীভাবেই বা সে এই বিশাল সম্পত্তির মালিক হল। মন্দার মিত্র তাকে সেদিন যে কাহিনী জানিয়েছে তা কি সত্যি! সত্যি!! সে কি সত্যিই ভুয়ো উত্তরাধিকারী! কিন্তু কলকাতায় বসে এহেন তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা তো আদৌ সম্ভব নয়। অগত্যা কী আর করা। গার্গীকে অতএব প্রবল ঝুঁকি নিয়ে সেই সকালেই বেরিয়ে পড়তে হল কলকাতা থেকে ঘণ্টা আড়াই ট্রেনজার্নির দূরত্বে এক মফস্বলে, যেখানে অলর্কের সেই তথাকথিত দাদামশাইয়ের বিশাল অট্টালিকা, যে রাজবাড়ির উত্তরাধিকারী আপাতত অলর্ক বোস। সেই দাদামশাই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রকে এ তল্লাটের সবাই রাজা বলেই জানত। এ জেলায় এহেন পুরানো রাজবাড়ি অবশ্য আরও অনেকই আছে। কিন্তু আজকাল কোনও রাজবাড়িতেই রাজাও নেই, রাজত্বও বহুকাল আগে এস্টেট অ্যাকুইজিশন আইনের আওতায় অন্তর্হিত। গোটা একটা দিন সেই রাজবাড়িপ্রতিম অট্টালিকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে প্রভূত ভালো ও মন্দ অভিজ্ঞতা অর্জন করে গার্গী প্রায় গভীর রাতে ফিরে এল তার জুবিলি পার্কের বাড়িতে।

তার এ কদিনের এলোপাথাড়ি জীবনযাপনে সে নিজেও যেন কিছুটা পরিশ্রান্ত, তার মা ও দাদাও যথাক্রমে বিচলিত ও বিরক্ত।

তবু এইমুহূর্তে তার উত্তেজনা এতই চরমে যে, পরদিন সকাল না হতেই সে আবার ঢুঁ দিল ডোনাদের বাড়ি। মাত্র একদিন ছিল না কলকাতা, কিন্তু তার ধারণা এর মধ্যে নিশ্চই আরও কিছু অঘটন ঘটে থাকতে পারে। আসলে পরিস্থিতি এত জটিল হয়ে উঠছে ক্রমশ। তার ধারণা যদিও বা ঠিক হল, কিন্তু যে ঘটনাটা ঘটেছে তা কিছুটা অবিশ্বাস্যই যেন বা।

গার্গী ডোনাদের বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ডোনা সন্ত্রস্ত গলায় বলে, জানিস গার্গী, কাল অলর্ক বোসের উপর অ্যাটেম্পট হয়েছিল।

—অ্যাটেম্পট! গার্গী বিস্ময়ের চোখ রাখে ডোনার দিকে।

—হ্যাঁ, গুলি ছোড়া হয়েছিল তার দিকে। কাল গাড়ি চালিয়ে যে মুহূর্তে ঢুকছিল তার রাসেল স্ট্রিটের বাড়িতে, ঠিক তখনই। সন্ধের অন্ধকারে সম্ভবত কোথাও লুকিয়েছিল আততায়ী।

গার্গীর ভুরুতে কোঁচ পড়ল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, অ্যাটেম্পট হওয়াই তো দরকার ছিল।

—দরকার ছিল! ডোনার কণ্ঠস্বরে অযাচিতভাবে একটা তীক্ষ্ণতা ঝরে পড়ল, কী বলছিস কি?

তাহলে আমার অঙ্কটা মিলে যায়।

—অঙ্ক! এর মধ্যে তুই অঙ্ক কোথায় পেলি? এটাও কি তোর ম্যাথ্‌সের ক্লাস নাকি? গার্গী সামান্য হাসল। কিছু বলল না।

pathagar.net

—কাল সারাদিন কোথায় ছিলিস তুই? এদিকে এত কাণ্ড ঘটে গেল, আর তোর পাত্তাই নেই।

—আরও কোনও ঘটনা ঘটে গেছে নাকি?

—হ্যাঁ, অ্যাটেম্পট হওয়ার পর পুলিশ অলর্ক বোসকে ইন্টারোগেট করতে গিয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ ঠিক বিশ্বাস করছে না ঘটনাটা। গুলি করল, অথচ অলর্ক বোসের গায়ে তো নয়ই, গাড়িতেও গুলির আঁচড় লাগেনি এটা ভারি অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

—এমনও তো হতে পারে, হত্যাকারীর টিপ ভালো নয়। দূর থেকে গুলি ছুড়লে নাও তো লাগতে পারে।

—কিন্তু পুলিশ সাসপেক্ট্ করছে, অলর্ক বোসই মার্ডারার। সে নিজের অপরাধ ঢাকতে এখন এইসব গালগল্প তৈরি করছে। ইনস্পেক্টর নিজে এ বাড়িতে এসে বলে গেলেন।

—তাহলে অলর্ক বোসকে অ্যারেস্ট করছে না কেন?

—বলল, পোস্টমর্টেট রিপোর্টে কিছু গোলমাল আছে। তাতে এখনই অ্যারেস্ট করা যাচ্ছে না।

—তাই! গার্গী তৎক্ষণাৎ আগ্রহী হল, তাহলে তো পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা একবার দেখা দরকার। কী ধরনের গোলমাল তা কিছু বলল?

ডোনা ঘাড় নাড়ল। পরক্ষণেই আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কাল হঠাৎ সেই যে সকালে একবার দেখা দিয়ে নিপাত্তা হলি, কোথায় গিয়েছিলি তা তো বললি না? গার্গীর চোখে এতক্ষণে ফুটে উঠল সেই রাজপ্রাসাদ আবিষ্কার করার আত্মপ্রসাদ। ঠোঁট টিপে হেসে বলল, গিয়েছিলাম অলর্ক বোসের সম্পত্তির হদিশ নিতে।

ডোনা আশ্চর্য হল, সে কী! পেলি তার হদিশ?

—পেলাম। সে এক রাজপ্রাসাদই বটে। ছোটবেলায় একবার মুর্শিদাবাদ গিয়ে হাজারদুয়ারি দেখে এসেছিলাম, অলর্ক বোসের রাজপ্রাসাদ প্রায় সেরকমই মস্ত এক অট্টালিকা। বিশাল বিশাল গোলাকার থাম। পেল্লাই পেল্লাই ঘর। ইয়া উঁচু ছাদ। ঘরে ঘরে ঝাড়লণ্ঠন।

ডোনা চোখ কপালে তুলল, তাই!

—তবে এখন প্রায় সবই তার ধ্বংসাবশেষ। ঠিকমতো মেইনটেন্যান্স না হওয়ায় পলেস্তারা খসে পড়ছে এখান থেকে ওখান থেকে। দেয়ালে, ছাদে সর্বত্রই লকলক করে বেড়ে উঠছে অশ্বত্থের চারা। এমনকি অলিন্দে ঘাস, গুল্মলতা। এ ছাড়াও যা অভিজ্ঞতা হল তা এক অদ্ভুত রহস্য।

—রহস্য! ডোনার চোখের পেয়ালা ক্রমশই উপছে পড়ছে কৌতূহলে।

—রাজপ্রাসাদে বেশ কয়েকটি পরিবার বাস করে যারা কেউই রাজবাড়ির লোক নয়, সবাই আশ্রিত। বাড়ির মালিক, অর্থাৎ যাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা রাজা বলে জানত, সেই ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র মারা যান তাঁর বিধবাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে। হঠাৎ কিছুদিন আগে এক দাঁড়িগোঁফওলা যুবা সেখানে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে গিয়েছিল থাকতে। উদ্দেশ্য, রাজবাড়ি নিয়ে কিছু লেখালেখি করা। দিন তিনচার রাজবাড়িতে থাকার পর যুবকটি হঠাৎ উধাও হয়। সে চলে যাওয়ার পরই আবিষ্কৃত হল, সেই বিধবা মহিলা খুন হয়েছেন।

—মাই গড। ডোনা আঁতকে উঠল।

pathagar.net

—সেই বিধবার কোনও উত্তরাধিকারী ছিল না রাজবাড়িতে। তাই ট্রাস্টি বোর্ডের ল'ইয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, বিধবার কোনও উত্তরাধিকারী যদি কোথাও জীবিত থাকে, তাহলে এক্ষুনি যেন যোগাযোগ করে ট্রাস্টিবোর্ডের ল'ইয়ারের সঙ্গে।

—তারপর? যোগাযোগ করেছিল কেউ?

—হ্যাঁ। অলর্ক বোস। সে-ই নাকি বিধবার একমাত্র নাতি, সে যোগাযোগ করামাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে সেই বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেছে রাতারাতি। যদিও তার উত্তরাধিকারের সত্যতা নিয়ে বাড়ির যারা আশ্রিত তাদের ঘোর সন্দেহ আছে।

ডোনা যেন রূপকথা শুনছে গোগ্রাসে এমন ভঙ্গিতে বলল, তারপর?

—কিন্তু ল'ইয়ার ভদ্রলোক নাকি অলর্ক বোসের কথায় কনভিন্‌স্‌ড। কিন্তু আর একটি যে ঘটনা শুনে এলাম, সেটা খুবই রহস্যময়। যে যুবা আগে সাংবাদিক পরিচয়ে গিয়েছিল রাজবাড়িতে, সে নাকি বিধবার কাছে জানিয়েছিল, সে-ই বিধবার নাতি। সম্পত্তি তারই হওয়া উচিত। বিধবা তাকে স্বীকার করেননি, উল্টে পুলিশে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ হয়ে সে-ই বুড়িকে মেরে আসে।

ডোনা সামান্য আতঙ্কিত হল, তাহলে তো রীতিমতো রহস্যই। তা সেই সাংবাদিক আর ধরা পড়েনি?

—না। তবে আশ্রিতদের এখন কেউ কেউ বলছে সেই যুবকটিই নাকি বিধবার আসল নাতি! অলর্ক বোসই নাকি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে এতবড় সম্পত্তির মালিক হয়েছে।

ডোনা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, আশ্রিতরা কী বলল না বলল সেটা বড় কথা নয়। ল'ইয়ার যখন কনভিন্স্‌ড হয়েছেন, তখন অলর্ক বোসই প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলে ধরে নিতে হবে। তা সেই আসল নাতি কোর্টে মামলা করছে না কেন?

গার্গী হাসল, কোর্টে যাবেই বা কী করে। তার নামে তো খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। তাকে এখন গা ঢাকা দিয়ে থাকতেই হবে। এতসব গল্প শুনে আমি থানায় গিয়েছিলাম—

ডোনা উত্তরোত্তর হতবাক হচ্ছে, থানায়ও গেলি?

—হ্যাঁ। যুবকটি সাংবাদিক বলেই আমার কৌতূহল হল। আমিও সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে থানার ও.সি-কে অনুরোধ করতে যে দুটি জিনিস তিনি আমাকে দেখতে দিলেন, সেগুলো খুব কাজে লেগেছে আমার। সাংবাদিকটি খুন করে পালাবার সময় তাড়াহুড়োয় ফেলে গিয়েছিল সাংবাদিকদের দুটি মহাস্ত্র। একটি তার নোট নেওয়ার প্যাড, অন্যটি তার কলম।

—বাহ্। বেশ সাংবাদিক তো সে!

—হ্যাঁ, ও.সি. সেগুলো কোর্টের একজিবিট হিসেবে রেখে দিয়েছেন। আমি তার প্যাডের পৃষ্ঠা উল্টে অবাক। হাতের লেখাটা যেন চেনা-চেনা মনে হল। তবে সেই বিধবা ভদ্রমহিলার সঙ্গে সেই যুবক নাতি হিসেবে পরিচয় দেওয়ার আগে সাংবাদিক সেজে যে-সব তথ্য নোট করেছিল, তার সঙ্গে তার নিজস্ব মতামত হিসেবে যা-যা লিখেছে, তা পড়ে কিন্তু আমারও মনে হয়েছে সে-ই বুড়ির আসল নাকি।

ডোনা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল গার্গীর মুখের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, তাহলে অলর্ক বোস।

—হয়তো ভুয়ো নাতি হতে পারে। তবে এখনই নিশ্চয় করে কিছু বলা যাচ্ছে না। অলর্ক বোসের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলা দরকার। তার সব ইতিহাস তো আমরা কেউই জানি না।

হয়তো সেই সাংবাদিকের মতামতও ভুল হতে পারে। সেও তো চেয়েছিল, এত বিশাল সম্পত্তি কোনওক্রমে হাতাতে—

গার্গীর কথা শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ বেজে উঠল ডোরবেল। ডোনা দ্রুত উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই প্রায় চমকে উঠে বলল, আরে, তুমি?

মন্দার হাসতে হাসতে বলল, বেশ সারপ্রাইজ দিয়েছি, তাই নয়? আজ ভোরেই নার্সিংহোম থেকে রিলিজ পেয়েছি। জিনিসপত্রগুলো ঘরে রেখে এককাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়েছি তোমাদের বাড়ি। কেমন যেন অস্থির অস্থির করছিল মনটা—

ডোনা ঠোঁট টিপে হাসল, কার জন্যে মন খারাপ করছিল! আমার জন্যে নাকি!

মন্দার হাসল বড় করে, তা আর বলতে।

বলতে বলতে তার নজর পড়ল ডোনার পিছনেই দাঁড়িয়ে থাকা গার্গীর দিকে। গার্গী ছাই-ছাই রঙের সালোয়ার-কামিজ পরেছে আজ। তাতে ওর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে দারুণ খুলেছে। তাকে দেখে মন্দার হাত তুলল, আরে, আপনি এখানে?

মন্দারের মাথায় সেই বড় করে বাঁধা ব্যান্ডেজটা নেই। তার পরিবর্তে বাঁদিকে কানের ওপর বেশ খানিকটা তুলো ব্যান্ড-এড দিয়ে আটকানো। গার্গী সেদিকে তাকিয়ে বলল, আসলে আমার মনটাও কেমন অস্থির-অস্থির করছিল—

ডোনাদের বাড়ির আবহাওয়া বেশ থমথমে। তার বাবা চিত্রদীপ স্ট্যাডিতে এতক্ষণ বসে ছিলেন চুপচাপ। মুখে পাইপ, কিন্তু তাতে আঁচ নিভে গেছে। এতক্ষণ সকালের খবরের কাগজটি টেনে নিয়ে তাতে চোখ বুলোচ্ছেন গভীর মনোযোগ দিয়ে। তাতে আজও প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে বড় করে। বিজ্ঞাপনে এও লেখা রয়েছে, শিল্পী চিত্রদীপ চ্যাটার্জির এই নতুন সিরিজের ছবিগুলি সম্পূর্ণ অভিনব।

মন্দার চিত্রদীপের দিকে একপলক তাকিয়ে চলে এল ডোনার ঘরেই। একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসতে বসতে হঠাৎ গার্গীকে বলল, তাহলে আমার কথা মিলল তো! যে মার্ডারার, তার কাছেই পিস্তল পাওয়া গেছে শেষ পর্যন্ত।

ডোনা গার্গীর দিকে তাকিয়ে বেশ অবাকই হল। গার্গীর সঙ্গে মন্দারের যে আলোচনা হয়েছিল নার্সিংহোমের কেবিনে বসে, তা সে জানে না বলেই তার চোখে এহেন বিস্ময়। কী বুঝল সে কে জানে, মন্দারের দিকে তাকিয়ে বলল, জানো তো, অলর্ক বোসের উপরও পরশু সন্ধেয় অ্যাটেম্পট হয়েছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছে—

মন্দার বিস্মিত হয়ে ভুরু কোঁচকাল, তাই! ইনজিওরড্ নাকি? পুলিশ গিয়েছিল ইনভেস্টিগেশনে? কিছু জানা গেল, কারা অ্যাটেম্প্ট নিয়েছিল?

—না, না। পুলিশ ওর কথা বিশ্বাস করেনি। আসলে গাড়িতে বা ওঁর শরীরে গুলি লাগার চিহ্ন নেই তো।

মন্দার হো হো করে হেসে উঠল, আসলে ঢপ দেয়া অলর্ক বোসের ছোটবেলার অভ্যেস। এটাও একটা ঢপ্।

গার্গী আর ডোনা পরস্পর চোখোচোখি করল।

মন্দার পরক্ষণেই বলল, ওঁকে তোমরা অলর্ক বোস বলছো তো? ওঁর বাবা একজন আর্মেনিয়ান ছিলেন, তা জানো? তার ছেলে বোস হয় কী করে?

গার্গী ডোনা দুজনেই চমকে উঠল ভীষণভাবে। এ কথাটা এতদিন কেউই ভেবে দেখেনি, মন্দার সত্যিই একটা বোমা ফাটিয়ে দারুণ হকচকিয়ে দিয়েছে দুজনকে। অলর্কের চেহারাটা

এমনই যে, দেখলেই অনুমিত হয় তার রক্তে বিদেশি রক্তের মিশেল আছে। তার বাবা আর্মেনিয়ান সে খবর ডোনারা ঠিকঠাক না জানলেও রাসেল স্ট্রিটের বাড়িটা যে কোনও বিদেশির বানানো তা সবাই জানে। অলর্ক সে বাড়ি পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রেই।

গার্গী হয়তো এই বোমাটির মোকাবিলা করতে কোনও জুতসই উত্তরের সন্ধান করছিল, ঠিক সে মুহূর্তে আবারও ডোরবেল। ডোনা ছুটে গিয়ে দরজা খুলতে আবারও এক চমক। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর কেউ নয়, সুদর্শন মণীশ রায়। তাঁর মুখ আপাতত গম্ভীর হলেও তাঁর চেহারায় এমনই একটি সৌম্যভাব আছে যাতে তাঁর অভিব্যক্তিতে উপচে পড়ছে একধরনের স্মিত প্রশান্তি। ডোনার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় লুকোনো রইল না, স্যার আপনি!

মণীশ অপ্রস্তুত হলেন না, বললেন, ঘটনাটায় আমি এতই শক্‌ড্ যে, মনে হল একবার তোমাদের বাড়ি ঘুরে আসি। খবরাখবর নিই। তোমার বাবার শরীর ভাল আছে?

বলতে বলতে ভেতরে ঢুকে এলেন মণীশ রায়। ডোনা অবশ্য এই মুহূর্তে চাইছিল না, মণীশ চিত্রদীপের কাছে কুশলাদি নিন, কিংবা জমিয়ে খোশগল্প করুন। চিত্রদীপ এমনিতেই রাগী মানুষ, তার উপর আপাতত ভীষণ টেনশনে আছেন। হঠাৎ মণীশের এই অনাকাঙ্খিত উপস্থিতি তাঁকে ক্ষিপ্ত, ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে। কায়দা করে মণীশকে বলল, স্যার, এ ঘরে আসুন—

মণীশ ডোনার ঘরে ঢুকে মোড়ার উপর বসে থাকা মন্দারকে দেখে হঠাৎ হেসে বললেন, আরে, আপনি?

মন্দার অপ্রস্তুত হয়ে গেল মণীশের কথায়, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, মানে, আপনি—

ডোনা মুহূর্তে অনুমান করে নিল মন্দারের অবাক হওয়ার কারণ, সে মণীশকে বলল, স্যার, আপনি ওকে এর আগে দেখেননি বোধহয়। মন্দার মিত্র, আমার বন্ধু।

মন্দারকে চেনার কথা নয় মণীশের। এতক্ষণে লজ্জিত হয়ে বললেন, আমারই ভুল। কেন যে ওঁকে চেনা মনে হল বুঝতে পারছি না। বোধহয় অন্য কারুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি—

মন্দার বোধহয় মণীশের উপস্থিতি পছন্দ করল না। তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল হঠাৎ। হয়তো মণীশের কথা ডোনার মুখে আগেই শুনে থাকবে। নিঃসন্দেহে তা প্রশংসাই। সৌম্য চেহারার মণীশকে ডোনার কাছে আসতে দেখে মন্দার অতএব অপছন্দ করতেই পারে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তাহলে আজ আমি উঠি, ডোনা।

ডোনা আশ্চর্য হল, তা কেন? এককাপ চা-ও তো আসেনি এখনও। দাঁড়াও—

মন্দার অসহিষ্ণু হয়ে বলল, না, না, থাক। আমার কিছু জরুরি কাজ পড়ে আছে। কদিন নার্সিংহোমে বন্দি থাকায় অফিসের কাজ কিছুই তো করা হয়ে ওঠেনি। কী যে হচ্ছে আমার কোম্পানিতে কে জানে—

বলতে বলতে দ্রুত উঠে পড়ল মন্দার। মণীশের দিকে একবারও না তাকিয়ে বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল। গার্গী একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিল। মণীশের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, মন্দারবাবুকে আপনি এর আগে দেখেছেন নাকি, স্যার?

মণীশ ঠিক মনে করতে পারলেন না কোথায় দেখেছেন। কিছুক্ষণ ভাবার চেষ্টা করে বললেন, আসলে দু-একটা মুখ এমন থাকে না যে, দেখলেই মনে হয় কোথায় দেখেছি। হয়তো সেরকমই—, যাই হোক, মণীশ হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, তোমাদের পিস্তলটা পাওয়া গেছে শুনলাম—

—হ্যাঁ, স্যার। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে। তবে এখনও আমরা ফেরত পাইনি। ইনস্পেক্টর

pathagar.net

জানালেন, ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হলে তবেই। হয়তো কোর্টের এক্‌জিবিটও হতে পারে—ইটের ভেতর ঝোপের মধ্যে রাখা আছে। কে ফোন করেছিল তা জানো?

ডোনা, গার্গী দুজনেই ঘাড় নাড়ল, না তো—

—রণজয় দত্তই ফোন করে থানায় জানায়, পিস্তলটি ওভাবে লুকোনো আছে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, রণজয় কীভাবে জানল ওটা ওভাবে রাখা আছে, ওরকম একটা গোপন জায়গায়!

ডোনা গার্গী দুজনেই আশ্চর্য হল, আর. ডি?

—হ্যাঁ। ওরকম একটা গোপন জায়গার হদিশ একমাত্র সেই বলতে পারে যে ওখানে লুকিয়েছিল। তাই কি না বলো।

গার্গীরা হতবাক হয়ে গেল একমুহূর্তে।

—তার মানে রণজয় খুন করার পর ওখানে ফেলে গিয়েছিল পিস্তলটা। তারপর সুযোগ বুঝে থানায় ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে ওটার হদিশ।

—কিন্তু আর. ডি. কী. করে পাবেন পিস্তলটা?

—আমার অনুমান, সেদিন অধ্যাপকসমিতির মিটিংয়ে বাদানুবাদ হওয়ার সময়, কিংবা তার আগে বা পরে। পিস্তলটা কোথাও পড়ে গিয়েছিল সেখানে। রণজয়ই কুড়িয়ে নিয়েছিল গোপনে। তারপর—

ডোনা আর গার্গী আর একবার চোখাচোখি করল পরস্পর, শুধু এই অনুমানটুকু জানাতেই মণীশ এসেছেন এ বাড়ি! যাতে রণজয় দত্ত পুলিশের নজরে পড়ে যায়।

ছাব্বিশ

চিত্রদীপের প্রদর্শনী যে সত্যিই হবে তা অলর্কের কথায় সেদিন বিশ্বাস হয়নি কারও। কিন্তু অলর্কের প্রবল জেদে, তার উৎসাহ ও কর্মতৎপরতায় শামিল হতে হল ডোনাদের বাড়ির প্রতিটি সদস্যকেই। এমনকি ডোনা উদ্বিগ্নমুখে গার্গীকে বলল, তোকেও কিন্তু আমার সঙ্গে সারাক্ষণ থাকতে হবে। ভীষণ নার্ভাস লাগছে আমার। গার্গীও কম উত্তেজিত বোধ করছে না। কিন্তু তার টেনশন তো আর প্রদর্শনী সফল করে তোলার জন্য নয়, সে অন্য এক জটিল আবর্তে পড়ে প্রায় হাবিডুবি খাচ্ছে ক'দিন ধরে। তার কেবলই মনে হচ্ছে, হয় তো খুব শিগগির আরও অঘটন ঘটবে। এই মুহূর্তে পরিস্থিতি তুঙ্গে, যে কোনও সময় হত্যাকারীর খাঁড়া নেমে আসবে প্রতিদ্বন্দ্বির মাথায়।

গত কয়েকদিন সে আরও বহু জায়গায় হানা দিয়েছে খুঁটিনাটি কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে। একদিন মণীশ রায়ের বাড়িতেই গিয়েছিল, মন্দার মিত্রকে সত্যিই আগে কোথাও দেখেছেন কি না। ঈষিতাদিকেও গোপনে জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই মণীশ রায় এর মধ্যে জড়িত আছেন কি না। অলর্ক বোসকে জিজ্ঞাসা করল, শিহরণদার সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল কি না শেষ দিকে, ঘটে থাকলে কেনই বা। সত্যিই কী ঘটেছিল খড়্গাপুরে গিয়ে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকেও সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, সত্যিই বইয়ের র‍্যাকের পাশে পিস্তলটা দেখেছিলেন কি না।

আর কী আশ্চর্য, কোনও প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর পেল না। যা পেল তা ভাসা-ভাসা। তাতে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া শক্ত। পুরো ব্যাপারটাই সহসা ধোঁয়াশার ঘেরাটোপ হয়ে ঝুলে রইল তার সামনে।

pathagar.net

প্রবল সন্ধিৎসায় তাকে এতসব ঘোরাঘুরি করতে দেখে ডোনা একদিন রহস্য করে বলল, কী ব্যাপার রে, তুই কি তাহলে কি শখের গোয়েন্দা হয়েছিস?

গার্গী চোখ কপালে তুলে বলল, ধুর সে যোগ্যতা কি আমার আছে? আসলে আমি একটা জটিল অঙ্কের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছি. থিয়োরেমটা অদ্ভুত।

—তোর ম্যাথ্‌সের থিয়োরেম!

গার্গী রহস্যময়ীর মতো হাসল, একটা বৃত্তের মধ্যে কত অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যায়, তারই হিসেব কষছি কদিন ধরে।

ডোনা বিষয়টা বোধহয় ঠিক বুঝল না।

গার্গী আবার বলল, সর্বশেষ যে ত্রিভুজটির সন্ধান পেয়েছি, তা হল, ঈষিতাদি ইদানীং মণীশ রায়ের উপর এতটাই ক্ষুব্ধ, বিরক্ত যে, অধ্যাপক রণজয় দত্তের সঙ্গেও ইচ্ছাকৃতভাবে ঘনিষ্ঠতা শুরু করেছিলেন। হয়তো এরই নাম প্রতিহংসা। যে রণজয় দত্তকে কেউই কোনও দিন পছন্দ করেনি, এড়িয়ে এড়িয়ে থাকত, তাঁর সঙ্গেও ঈষিতাদি—, বলে একটু হাসল গার্গী। সব জানতে পেরে এর মধ্যে মণীশ রায় একদিন রণজয় দত্তকে বলেছেন, আই উইল সি ইউ—

ডোনা চমকে উঠল, ইজ ইট?

গার্গী হাসল, কী যে জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি!

প্রদর্শনীর কারণে ইদানীং অলর্ক বোসের খুব যাওয়া আসা বেড়ে গেছে ডোনাদের বাড়িতে। রোজই তাকে আরও উৎফুল্ল যেন তার নিজের ছবিরই প্রদর্শনী হচ্ছে এমন হাবভাব তার চোখেমুখে। শুধু সংবাদপত্রেই নয়, শহরে হোর্ডিং লাগাল কয়েকটা। কিছু রঙিন পোস্টারও। এমনকি তার বাড়ির সিঁড়ির কাছে দুটো ভিডিও ক্যামেরা বসানোরও আয়োজন করেছে। চিত্রদীপ চ্যাটার্জিকে সে বিখ্যাত করে তুলেছে রাতারাতি। সেই সঙ্গে ডোনাকেও। ডোনার বেশ কয়েকটা ছবি প্রকাশিত হয়েছে কাগজে, অবশ্যই 'এ টু জেড' এর শো-রুমের মডেল হিসেবে।

এতসব প্রস্তুতির ভেতর ডোনা খুব উত্তেজিত। গার্গীকে বলল একদিন, কেমন বুঝছিস বল্ তো লোকটাকে? গার্গী হাসল, আপাতত খুবই মিস্টেরিয়াস। যাই হোক, লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি।

ডোনা কিছুক্ষণ গার্গীর অভিব্যক্তি পর্যবেক্ষণ করল, তারপর ভুরু নাচাল, তোর শখের গোয়েন্দাগিরি কদ্দূর? কে হত্যাকারী তার কোনও খোঁজ পেলি? গার্গী আবার রহস্যময়ীর মতো হাসল, একটু-একটু অনুমান করতে পারছি। কিন্তু এখনও কন্‌ফার্মড্ হইনি—

ডোনা আশ্চর্য হয়ে বলল, তাই!

এর মধ্যে অলর্ক বোস একদিন সন্ধেয় সেজেগুজে এল ডোনাদের বাড়ি। সত্যিই ম্যানলি চেহারা অলর্কের। তার লম্বা চুল আর গোঁফদাড়িতে বেশ অদ্ভুত লাগে তাকে। ডোনা কিছু একটা প্রশংসাসূচক বাক্য বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ অলর্ক একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে উঠল, তোমার ওই মন্দার মিত্র। লোকটা একেবারে ছিনেজোঁকের মতো লেগে আছে আমার পিছনে। ডিসগাস্টিং।

ডোনা চোখ তুলল, শান্তভাবে বলল, কেন?

—আমার শোরুমগুলোর ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের কাজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু ওর সব টেন্ডারই বাতিল হয়ে গেছে। তবু পিছু ছাড়ছে না।

—সবগুলোই বাতিল হয়ে গেল?

—হ্যাঁ, টেন্ডার জমা দেওয়ার যে-সব শর্তাবলি ছিল, মন্দার সেগুলো পূরণ করতে পারেনি।

pathagar.net

তা ছাড়া, অলর্ক একমুহূর্ত থামল কিছু একটা ভেবে, তারপর বলল, তা ছাড়া শিহরণদা চাননি যে মন্দার কাজগুলো পাক।

ডোনা হতবাক হয়ে গেল, শিহরণদা চাননি?

—না, উনি বারবার চাপ দিচ্ছিলেন যাতে মন্দারকে কাজটা না দেওয়া হয়।

—মন্দার সে কথা জানত?

—না, কারণ আমাদের ডিসিশন নেওয়ার আগেই মন্দার ইনজিওর্‌ড্ হয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল। পরে নিশ্চই তার কানে গেছে।

ডোনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, কাজটা এখন আর দেওয়া যায় না?

অলর্ক ইতস্তত করল ডোনার দিকে তাকিয়ে, তারপর হঠাৎ বলল, মন্দারের উপর তোমার কি কোনও দুর্বলতা আছে? হঠাৎ তাকে কাজ দেওয়ার জন্য এত পীড়াপীড়ি করছো কেন?

অলর্কের শেষ কথাগুলোয় এমন প্রচ্ছন্ন ধমক ছিল যে, তাতে চমকে উঠল ডোনা। এই অলর্ক যেন তার অচেনা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল, তাহলে থাক।

চিত্রদীপের প্রদর্শনীটি ঠিক কী ধরনের হবে, তা অলর্কের পরিকল্পনা শুনে প্রথমে বোধগম্য হয়নি ডোনাদের। শিল্পীদের প্রদর্শনী সাধারণত কোনও আর্ট-গ্যালারিতেই হয়ে থাকে। কিন্তু অলর্ক বলেছিল, তার মধ্য-কলকাতার পুরানো দোতলা বাড়িতেই সে চিত্রদীপের প্রদর্শনী করতে চায়। সেটাই হবে একজিবিশনটির সবচেয়ে বড় স্টান্ট। তাতে চিত্রদীপ ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

কিন্তু কদিন আগে চিত্রদীপ নিজে গিয়ে বাড়িটার একতলা দোতলা ঘুরেফিরে দেখার পর বিস্মিত হয়ে এসে ডোনাকে বলেছেন, বাড়িটা সুপার্ব।

সত্যিই বাড়িটি প্রাচীন ধরনের হলেও তার গঠনপরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। ইংরেজ আমলে বিদেশিদের বসবাসের বাড়িগুলি যেমন হত, এ বাড়িটাতেও তেমনি বিশাল বিশাল ঘর, উঁচু ছাদ, সিলিঙে কড়িবরগা, এপাশে-ওপাশে উঁচু সিঁড়ি। অলর্কের বাবা বিদেশি, মা এদেশি। বিদেশি ধাঁচের এহেন বাড়িটা সে পেয়েছে বাবার উত্তরাধিকারসূত্রে। এই বাড়িটিরই গোটা দোতলা জুড়ে প্রদর্শনী হবে।

দোতলায় খানছয়েক বড় বড় ঘর। কোনওটা ড্রয়িং, কোনওটা ডাইনিং, কোনওটা বেডরুম। প্রতিটি ঘরে, মস্ত মস্ত বারান্দা জুড়ে রয়েছে পুরানো আমলের আশ্চর্য ডিজাইনের সব দামি কাঠের ফার্নিচার। এ ছাড়াও সারা বাড়িতে ছড়ানো-ছিটানো বিচিত্র সব অ্যান্টিক কালেকশন।

এ বাড়িতে প্রদর্শনী হলে, সেটি ছবির, না কি অ্যান্টিক কালেকশনের, তা ভেবে দ্বিধাগ্রস্থ হতে পারে কেউ।

অলর্ক চিত্রদীপকে জানিয়েছে, এই ফার্নিচারগুলোর সব ক'টিই তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। কিছু পুরোনো আসবাবপত্র আগে থেকেই ছিল ঘরে, সেগুলো এত চমৎকার আর অভিনব যে, সেগুলোর মর্যাদা বাড়াতে সে এখন কোথাও পুরোনো বাড়ির ফার্নিচার বিক্রি হচ্ছে শুনতে পেলেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কোনও ফার্নিচারের অ্যান্টিকভ্যালু আছে বুঝতে পারলে তৎক্ষণাৎ কিনে নেয় যে কোনও মূল্যে। এভাবেই সে অনেক পুরোনো টেবিল-চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, কারুকাজ করা খাট, প্রায় ম্যান-হাটের পিলসুজ, অ্যাশট্রে, এমনকি পুরোনো ঝাড়লণ্ঠনও কিনে সাজিয়েছে বাড়িটা।

তাই-ই অলর্ক বলেছিল চিত্রদীপকে, তাঁর এবারের যে প্রদর্শনীটি হবে, তার ছবিগুলো একটা নতুন সিরিজ হিসেবে আঁকুন। এই বাড়িটার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে।

প্রস্তাবটা সে মুহূর্তে ভারি স্পর্ধার বলে মনে হয়েছিল চিত্রদীপের। একজন আর্টিস্টকে কিনা ডিক্‌টেট করছে একটা দুদিনের ছোক্‌রা, লেম্যান! পরে বাড়িটা দেখতে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এহেন বাড়িতে ছবির প্রদর্শনী করতে হলে পুরোনো যুগের স্টাইলে চিত্রমালা হাজির করলেই তা মানানসই হবে।

অলর্কের সাজেশন অনুযায়ী এবারের আঁকা তার সমস্ত ছবিই উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায়। ছবিগুলো টাঙানো শুরু হয়েছে সিঁড়িতে ওঠার পাশের দেয়াল থেকেই। উপরের ঘরগুলিতে যেখানে যে ফার্নিচার আছে তা বিন্দুমাত্র না সরিয়ে তার ফাঁকা দেয়ালগুলোতে পরপর ছবির সমাহার। ছ'খানা ঘর, বিশাল বারান্দা, লম্বা করিডোরের দু'পাশের দেয়াল, সিঁড়ি—সব জায়গা মিলিয়ে প্রায় সত্তরখানা ছবি। মাত্র দেড়মাসে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অসাধ্য সাধন করেছেন চিত্রদীপ। প্রদর্শনীটি আরও চমৎকার হয়ে উঠতে পারত, যদি কয়েকদিন আগে সেই নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডটি না ঘটত।

প্রদর্শনী সত্যিই তাহলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই সংবাদে চিত্রদীপ খুবই উত্তেজিত, তবু মাঝেমধ্যে হতাশ হয়ে বলছেন, কী হবে আর এসব করে। যে কোনওদিন পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করবে আমাকে। তখন তো সব শেষ।

ডোনা তার বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবু তারও মনের কোণে একটা বড় খিঁচ।

গার্গীও অবাক হচ্ছিল কম নয়। দু' দুটো পিস্তলের সন্ধান পেয়েছে পুলিশ, দুটো থেকেই গুলি ছোড়া হয়েছে, কিন্তু পুলিশ কোনও পিস্তলের মালিককেই এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। ব্যাপারটা খোলসা করতে সে একদিন দেখা করল ইনস্পেক্টর তুষারশুভ্র মিত্রের সঙ্গে। ইনস্পেক্টর এড়াতে চাইলেন, প্রথমটা, তারপর অনেক কথাই বললেন। গার্গী ঘটনাটার পরম্পরা নোট করছে শুনে অবাকই হলেন, একটু, তারপর একসময় বললেন, কে মার্ডার করেছে তা আমাদের কাছেও এক প্রহেলিকা। এই দেখুন না, সেদিন এক বৃদ্ধ অধ্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে বললেন, তিনি এক যুবককে শিহরণ রায়চৌধুরীর পিছনে ওইসময় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। তার চোখে চশমা, মুখময় কালো দাড়িগোঁফ।

গার্গী অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল ইনস্পেক্টরের দিকে। কালো দাড়িগোঁফ শুনে কোনও থই পাচ্ছিল না। কেন কে জানে বীরভঙ্গপুরের সেই 'সাংবাদিক'-এর চেহারার বিবরণ চকিতে ঝলক দিয়ে উঠল তার মগজে। কিন্তু বৃদ্ধ অধ্যাপক-কথিত এই রহস্যময় যুবকই কি শিহরণ হত্যার জন্য দায়ী!

এতসব উৎকণ্ঠা, টেনশন, রহস্যের মধ্যেই উদ্বোধন হয়ে গেল চিত্রদীপ চ্যাটার্জির প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীটি উদ্বোধন হওয়ার পর হইচই পড়ে গেল সারা কলকাতায়। মধ্য-কলকাতার এইসব বিদেশিধাঁচের বাড়িতে সচরাচর কেউ প্রবেশ করে না। অধিকাংশই হয় পরিত্যক্ত, নয় অপরিচ্ছন্ন। সেরকম একটা বাড়িতে এহেন ঝকমকে চেহারার একটা প্রদর্শনী করা যায়, তা ভাবনায় ছিল না কারও। শিল্পবোদ্ধাদের যে কয়েকজন প্রথমদিন প্রদর্শনী দেখতে এলেন, তাঁরা সবাই অকুণ্ঠ তারিফ জানালেন চিত্রদীপকে।

প্রদর্শনীর ব্যাপারে ডোনার উৎসাহই সবচেয়ে বেশি। সে সারা কলকাতা ঘুরে ঘুরে অজস্র মানুষকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে প্রদর্শনীতে আসার জন্য। শিল্পরসিক, নামী অনামী চিত্রশিল্পী, সংবাদপত্রের শিল্পসমালোচকদের তো বটেই, সে আরও আমন্ত্রণ জানিয়েছে তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে তার পরিচিত সবাইকেও। গার্গীকে

pathagar.net

বলেছে, রোজই আসা চাই তোর। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ডানদিকে একটা মস্ত টেবিলের উপর ভিজিটরস্ বুক রাখা থাকবে। যাঁরা প্রদর্শনী দেখতে আসবেন তাঁদের অনুরোধ করা হবে প্রদর্শনী দেখে মতামত জানানোর জন্য। তুই সেই ভিজিটরস্ বুকের কাছেই থাকবি।

গার্গীও এই ব্যাপারে ভারি উৎসাহ দেখিয়েছে, নিশ্চই। সে আর বলতে!

একতলার ঘরে গেট-টুগেদার। দোতলায় প্রদর্শনী। প্রথমদিনেই চেনাজানা, অচেনা মানুষে উপছে পড়ল রাসেল স্ট্রিটের গায়ে লাগা প্রাচীন চেহারার বাড়িটিতে। বাইরে থেকে দেখা যায় দোতলার ছাদের আলসেয় একটা মাঝারি চেহারার অশ্বত্থগাছ বেশ ডাঁটো হয়ে বড় হচ্ছে ক্রমে। অলর্ক গাছটা কাটেনি, তাহলে তো বাড়িটির প্রাচীনত্ব নষ্ট হয়ে যাবে।

প্রদর্শনী রিসেপসনে ডোনা নিজেই। প্রাচীন ইংল্যান্ডের রাজপরিবারের রাজকুমারীদের মতোই পোশাক তার পরনে। মাথায় একটা বাঁকানো টুপি পরে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে নিজেকে।

বনানী আছেন আপ্যায়নের দায়িত্বে। অলর্ক অতিথি-অভ্যাগতের জন্য শরবত ও মিষ্টির আয়োজন রেখেছে একতলার একটি বিশাল হলঘরে। সেকালে হয়তো নাচঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হত ঘরটি।

সন্ধের মধ্যেই অজস্র অতিথিতে ভরে গেল প্রদর্শনীর কক্ষগুলি। চেনা-অচেনা মানুষ আসছেন, আর হই হই করে উঠছে ডোনা, এই যে, এদিকে আসুন—এই অনামিকা, এত দেরি করলি যে—। এই যে আন্টি, আপনি একা এলেন যে বড়ো, আঙ্কেলকে নিয়ে আসতে পারলেন না? আঙ্কেল কি খুব বিজি? ঠিক আছে, ছুটির দিন দেখে আরেকবার আসুন এই যে মি. দত্ত, আপনাকে ধুতি-পাঞ্জাবিতে আজ কিন্তু দারুণ লাগছে। কী বললেন, এরকম উৎসবের পরিবেশে ধুতি-পাঞ্জাবিই একমাত্র মানায়!

কখনও গার্গীকে বলছে, এই গার্গী তুই একটু এদিকটা দেখিস তো। কাগজের অফিস থেকে দু'জন ক্রিটিক এসেছে। আমি একটু ওদের সামলে আসি।

আবার কখনো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সস্ত্রীক মণীশ রায়কে দেখে, এই যে স্যার, আপনি তাহলে শেষপর্যন্ত সময় করে আসতে পারলেন। ঈষিতাদি, আপনি যে সত্যিই আসবেন তা ভাবতেই পারিনি। ইস ঈষিতাদি, আপনি কী সুন্দর সেজেছেন আজ!

একটু পরেই বিখ্যাত শিল্পী সুহাস ভট্টাচার্য এসে হাজির। চিত্রদীপ ভাবতেই পারেননি সুহাসের মতো ব্যস্ত শিল্পী তাঁর প্রদর্শনী দেখতে আসবে। সুহাস ভট্টাচার্য অবশ্য বললেন, আর না এসে উপায় আছে। তোমার মেয়ে কার্ড দিতে গিয়ে পইপই করে বলে এসেছে, কাকু, যেতেই হবে কিন্তু। না গেলে কিন্তু ভাবব, আপনি আমার বাবাকে শিল্পী বলেই মনে করেন না।

সেই সুহাস ভট্টাচার্য কিন্তু চিত্রদীপের ছবি দেখে নিজেই বিস্মিত। বারবার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। আর বললেন, ওয়ান্ডারফুল। চিত্রদীপের ছবি যে এতটা হাইটে উঠেছে—

চিত্রদীপ বেশ অবাক হলেন। এ যুগে কোনও শিল্পী অন্যে কোনও শিল্পীর প্রশংসা করেন না। সবাই সবাইকে এড়িয়ে যান। বরং আড়ালে নাম সিঁটকান। এহেন পরিস্থিতিতে সুহাস ভট্টাচার্যের প্রশংসার একটা অন্য মূল্য আছে।

প্রদর্শনীতে আসতে বেশ দেরি করে ফেলল মন্দার। তাকে দেখেই ডোনা প্রায় ঝামরে পড়ল, এই যে মিস্টার, তুমি কি আজ এই প্রদর্শনীতে গেস্ট হয়েই এসেছ নাকি! তোমাকে আসতে বলেছিলাম বেলা তিনটেয়, আর তোমার আসতে সন্ধে সাতটা হয়ে গেল! আমরা এদিকে অতিথি সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি—

pathagar.net

সত্যিই ডোনার এ ক'দিন নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসতটুকুও ছিল না। অলর্ক আর চিত্রদীপ যেমন কয়েকদিন ধরে এই বাড়িতে সারাদিন রাত পড়ে থেকে ছবিগুলো টাঙিয়েছে, তেমনি ডোনা করেছে পাবলিক রিলেশনের কাজ।

একটু পরে ডোনাদের ইউনিভার্সিটি থেকে একদঙ্গল ছেলেমেয়ে হই-হই করে এসে পড়ল প্রদর্শনী দেখতে। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন অধ্যাপকও। সরকারি আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েরাও এসে গেল দল বেঁধে। কেউ কেউ ছবির সঙ্গে অলর্কের অ্যান্টিক কালেকশনগুলো দেখে তারিফ করছে। একজন দর্শক দেখতে দেখতে বললেন, এ যেন টু ইন ওয়ান। একই সঙ্গে দুটো প্রদর্শনী দেখার অভিজ্ঞতা হচ্ছে।

সেই ভদ্রলোক গার্গীর কাছে গিয়ে ভিজিটরস বুক টেনে নিয়ে সে-কথা লিখেও দিলেন বেশ ভাষাটাষা দিয়ে।

গার্গী এক ফাঁকে ডোনাকে গিয়ে একটা অদ্ভুত সংবাদ দিয়ে এল, জানিস ডোনা, তোদের রণজয় দত্তও এসেছেন প্রদর্শনী দেখতে।

ডোনা তো প্রায় টলে পড়ে যায় আর কি, বলিস কী! ওঁকে আমি অবশ্য ইনভাইট করে এসেছিলাম, কিন্তু ভাবতে পারিনি উনি সত্যিই আসবেন। দাঁড়া, ওঁকে একটু স্পেশাল খাতির করে আসি। আমার উপর ওঁর বোধহয় রাগ আছে। গার্গী হেসে বলল, মনে হয় না। তাহলে উনি এমন হাসিহাসি মুখে ঘুরে-ঘুরে ছবি দেখতেন না।

এক বিদেশিনিও এসে ছবি দেখছেন প্রদর্শনীতে। মহিলা বয়স্কা, মাথার সব চুলই সাদা, তবু চেহারার মধ্যে বেশ একটা তারুণ্য ঝলমল করছে, হাতের একটা নোটবইতে কী যেন নোটও করছেন ছবি দেখতে দেখতে। অলর্ক এসে পরিচয় করিয়ে দিল ডোনার সঙ্গে, ইনি মিসেস হোয়াইট, সম্পর্কে আমার পিসি হন। বোম্বের একটা কাগজের আর্টক্রিটিক। আমার টেলিগ্রাম পেয়ে চলে এসেছেন।

রাত আটটা নাগাদ ভিড় উপচে পড়ল একেবারে। ছবির প্রদর্শনীর সঙ্গে একটা চমৎকার গেট-টুগেদারের আবহাওয়া। এমন একটা অদ্ভুত বাড়ির পরিবেশ পেয়ে সবাই বেশ খুশি। ছবি দেখতে দেখতে গল্পগুজব করছেন এক-একটা দল বেঁধে। এক-একটা ঘরে এক-এক দলের ভিড়। আলো ঝলমল করছে ঘরগুলো। তার মধ্যে কোনও দল ড্রয়িংয়ের সোফায়, কেউ কেউ ডাইনিং টেবিলের চারপাশের চেয়ারে গোল হয়ে বসে আড্ডা জুড়ে দিয়েছেন।

অলর্ক এসে হঠাৎ ডোনাকে ডেকে নিয়ে গেল, মাদামাজোয়েল, মণীশ রায় তোমাকে খুঁজছেন, বলছেন, ডোনা এত বিজি যে দেখা পাওয়াই যাচ্ছে না। উনি বাড়ি চলে যেতে চাইছেন।

ডোনা হাসতে হাসতে বলল, আমি একা আর ক'জনকে সামলাব! প্রথমদিনেই যে এতজন আসবেন, তা আমার ধারণায় ছিল না, প্রদর্শনী চলবে তো সাতদিন ধরে।

ডোনা দ্রুত চলে গেল একেবারে উত্তরের ডাইনিং-হলের দিকে। মণীশ রায় তখন সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছেন, তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে আরও দু-তিনজন মেয়ে। খুব জমিয়ে গল্প করছে সবাই মিলে, ডোনাকে দেখে বললেন, দারুণ হয়েছে কিন্তু একজিবিশনটা। আমি কিন্তু আরও দু-একদিন চলে আসব।

ডোনা খুশি হয়ে বলল, নিশ্চই স্যার। সবাই এলে তবেই না ড্যাডির এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে। কিন্তু ঈষিতাদি কোথায়?

pathagar.net

—ঈষিতা বোধহয় নিচের দিকে গেল। ওই যে তোমার বন্ধু মন্দার এসে ডেকে নিয়ে গেল। বলল, শরবত আর মিষ্টি খাওয়াবে।

—আপনি গেলেন না?

—না, আমার বেশ ভালো লাগছে এখানে। ডাইনিং-হলের এই ছবিগুলোর কালার কম্বিনেশন দারুণ লেগেছে আমার। বারবার তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে ছবিগুলোর দিকে।

—জানেন, আর. ডি. ও এসেছেন এগজিবিশন দেখতে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

মণীশ রায় হাসলেন, নাহ্। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে অন্যদিকে চলে গেল। বোধহয় এ বাড়ির ড্রয়িংয়ের দিকে ঘোরাঘুরি করছে।

—গার্গী কিন্তু আপনাকে খুঁজছিল, ভিজিটরস্ বুকে কিছু একটা লিখিয়ে নিতে চাইছে আপনাকে দিয়ে।

—আমি তো এইমাত্র লিখে দিয়ে এলাম।

ডোনা উৎসাহিত হয়ে বলল, কী লিখলেন স্যার?

—লিখলাম, বিংশ শতাব্দীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল। গার্গীর খুব পছন্দ হয়েছে মন্তব্যটা।

ডোনাও খুশি হয়ে বলল, থ্যাঙ্কু স্যার, গার্গী বলেছে, এই চিত্রপ্রদর্শনী আর খাতায় লেখা মতামতগুলো নিয়ে ও কাগজে একটা আর্টিকেল লিখবে।

একটু পরেই সেই ঘরে এসে ঢুকলেন চিত্রদীপ। চিত্রদীপ আজ একটা চকরাবক্‌রা ঢোলা জামা, তার সঙ্গে জিন্‌সের প্যান্ট পরেছেন। ঢোলাজামায় অনেকগুলো বড়-বড় পকেট। সব ক'টা পকেটেই ঠাসা জিনিসপত্র। তার কোনওটায় তামাকের প্যাকেট, কোনওটা থেকে গলা বাড়িয়ে রয়েছে বিশাল আকারের ঘাড় বাঁকানো পাইপটি। ক'দিন ধরে চিত্রদীপ কেন যেন আর পাইপ ধরাচ্ছেন না সর্বক্ষণ। মাঝেমধ্যে দু-একবার টান দিয়েই নিভিয়ে ফেলছেন তামাক।

বরং তাঁর হাতে ধরা রয়েছে এক গোছা রং-মাখানো তুলি। হঠাৎ-হঠাৎ দেয়ালে আঁকা ছবিগুলোয় টুকটাক রং বুলিয়ে দৃশ্যপট অদলবদল করে দিচ্ছেন। দিয়ে যেন ভাবছেন, হ্যাঁ, এবারই ছবিটা ঠিক হল। পর মুহূর্তে আবার অন্যরং চাপিয়ে দিচ্ছেন। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ অস্থিরতার মধ্যে আছেন আজ।

চিত্রদীপকে দেখে ডোনা বলল, ড্যাডি, তুমি একটু এঁদের সঙ্গে কথা বলো। আমি নিচে যাচ্ছি। আমাদের আরও কয়েকজন অধ্যাপক নিচে রয়েছেন।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার পথে দেখা হল ঈষিতার সঙ্গে। উপরে উঠছেন। ঈষিতা প্রায় পরীর মতো সেজে এসেছেন আজ। আর সবচেয়ে যেটা অবাক লাগছিল ডোনার, ঈষিতা এতক্ষণ রণজয় দত্তর সঙ্গে নিচুস্বরে কিছু যেন বলছিলেন। এই ভিড়ের মধ্যেও দু'জনে হঠাৎ আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য।

উজ্জ্বল রোদ্দুর রঙের শাড়ি-ব্লাউজে ভূষিতা ঈষিতাকে দেখে ডোনা হাসল, ঈষিতাদি, আপনার জন্যে স্যার অপেক্ষা করছেন। ডাইনিং-এ আছেন।

—হ্যাঁ, এইবার আমরা ফিরব।

ঈষিতা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল, আর ডোনা নেমে এল নিচে। ওর সহপাঠী আর অধ্যাপকদের নিয়ে তখন হিমশিম খাচ্ছেন বনানী। ডোনাকে দেখে ফিসফিস করে বললেন, শিগগির আয়, আমাকে একটু হেল্প কর।

pathagar.net

অরুনাভ নামের একটি ছেলে ডোনাকে বলল, কোত্থেকে এ বাড়িটা তোরা জোগাড় করলি বল্ তো? একজিবিশনের পক্ষে ফ্যান্টা—

—জোগাড় হয়ে গেল। বলতে গেলে আকাশ থেকে পড়ে পেলাম—

—এটাও তোদের বাড়ি নাকি?

অলর্ক কাছেই ছিল, তাকে দেখিয়ে ডোনা বলল, উঁহু। ইনি হলেন অলর্ক বোস। এ নিউ বিজনেসম্যান ইন ক্যালকাটা। বাড়িটা এঁরই। এই ক'দিনের জন্য আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন।

কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করতে করতে কথা থামিয়ে হঠাৎ অলর্ক বলল, এক মিনিট। আমি একটু নিচে থেকে আসছি, বলে সিঁড়ির দিকে দৌড়াল।

সেই মুহূর্তে অমন আলোঝলমলে বাড়িতে পট করে লোডশেডিং হয়ে গেল।

এ বাড়িতে লোডশেডিং মানে চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটু পরেই সিঁড়ি থেকে অলর্কের গলা শোনা গেল, যে-যেখানে আছেন সবাই চুপ করে দাঁড়ান। এক্ষুনি জেনারেটার চালানো হবে।

তারা কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফট্ করে একটা আওয়াজ, পরক্ষণেই হঠাৎ ভারী কিছু একটা পতনের শব্দ হল সিঁড়িতে। তার সঙ্গে আর্ত একটা চিৎকার। কিছু যেন গড়িয়ে পড়ল সিঁড়ি বেয়ে।

ঘটনাটা এমন অতর্কিতে ঘটে গেল যে, কয়েকমুহূর্ত ভীষণ একটা নীরবতায় ছমছম করে উঠল গোটা বাড়িটা। তারপরেই কেউ যেন সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় করে নেমে এল নিচে। কিছু যেন ছুড়েও ফেলল কেউ। সিঁড়িতে তখনও সেই গোঙানির শব্দ। তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে সমস্বরে শব্দ ভেসে এল, কী হল? কী হল?

গোঙানির আওয়াজ তখনও থামেনি। উপর থেকে কেউ যেন বলল, সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছে। শিগগির আলো জ্বালাও, আলো জ্বালাও টর্চ কোথায়?

দেড়-দু'মিনিটের মধ্যে জেনারেটারের শব্দ শোনা গেল বাড়ির বাইরে থেকে। তারপরই দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। আর একরাশ আতঙ্ক চোখে নিয়ে অতগুলো মানুষ দেখল—

সিঁড়ির মাঝামাঝি হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন মণীশ রায়। মাথাটা নিচের দিকে, পা দুটো উপরের দিকের সিঁড়িতে, চোখ দুটো খোলা, বুকের বাঁদিকে একটা বড় ক্ষত। তার থেকে প্রবলভাবে ভেসে আসছে রক্ত। সেই তাজা লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে সিঁড়ি বেয়ে।

কে যেন সেই রক্ত দেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে টলে পড়ল হঠাৎ। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই তাকে ধরে ফেলল কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা গার্গী, বলল, এই, শিগগির শুইয়ে দিন ঈষিতাদিকে। জ্ঞান হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।—

চিত্রদীপ ততক্ষণে ছুটে এসেছেন সিঁড়ির কাছে। মণীশ রায়কে অমনভাবে পড়ে থাকতে দেখে মাথা চাপড়াতে লাগলেন, এ কী হল, অ্যাঁ। এ কী হল। কী সর্বনাশ।

কে যেন বলে উঠল, সিঁড়ি থেকে পা হড়কে নিশ্চয় পড়ে গেছেন অন্ধকারে—

—সিরিয়াস ইনজুরি?

—শিগগির হসপিটালে নিয়ে চলুন, বলে মন্দার তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এসে ধরতে গেল মণীশ রায়ের শরীরটা। গার্গী তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে বাধা দিল, এখন কেউ ওঁর গায়ে হাত দেবেন না। এখানে ডাক্তার কেউ আছেন, ডাক্তার?

pathagar.net

ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তারও দেখতে এসেছিলেন চিত্রদীপের প্রদর্শনী। বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক অধ্যাপকের বন্ধু ডাঃ প্রবাল রায়। তিনি দ্রুত ছুটে এসে নিচু হয়ে পরীক্ষা করলেন মণীশ রায়কে। কিছুক্ষণ পর হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, স্যরি, হি ইজ ডেড, বুকে গুলি লেগেছে মনে হচ্ছে—

চিত্রদীপ আর্তনাদ করে উঠে বললেন, গুলি! মাই গড। ডেড। কী সর্বনাশ—

—হ্যাঁ, বুকের বাঁদিকে একেবারে মোক্ষম জায়গায় গুলি করা হয়েছে ওঁকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ওঁর। শিগগির পুলিশকে খবর দিন।

ভিড়ের মধ্যে একটা অস্ফুট আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ল সহসা। পুলিশ শব্দের উচ্চারণে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল সবার ভেতর। ডোনা ওপাশ থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল, আমরা তাহলে একেবারে শেষ হয়ে গেলাম।

মণীশ রায়ের নিথর শরীর ঘিরে তখন গোটা প্রদর্শনীর লোক। যেন কেউ ভাবতেই পারছে না, অমন সুদর্শন পুরুষটির শরীরে প্রাণ নেই। তাঁর দুটি চোখই ভয়ার্তভাবে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন।

অলর্ক এতক্ষণ ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ ফ্যাসফেসে গলায় বলে উঠল, পুলিশে খবর দিন, এক্ষুনি—

গার্গী দোতলায় ছুটে গিয়ে টেলিফোন করতে বসল পুলিশকে, হ্যালো, ইনস্পেক্টর মি. মিত্র কথা বলছেন? আপনাকে এক্ষুনি একবার এ বাড়িতে আসতে হবে। রাসেল স্ট্রিটে। আবার খুন—

পরক্ষণে গার্গী ফোন করল স্থানীয় থানায়।

ভিড়ের মধ্যে থেকে মন্দার বলে উঠল, নিশ্চই আমাকে টার্গেট করে গুলিটা ছোড়া হয়েছিল। লক্ষভ্রষ্ট হয়েই স্যারের বুকে,—ওহ্ কী সাংঘাতিক। নইলে কেউ স্যারকে খুন করতে যাবে কেন?

মন্দারের চোখমুখে কিছুটা আতঙ্ক। তার মাথার বাঁদিকে এখনও তুলো লাগিয়ে সেলোফেন দিয়ে আটকানো। সেদিকে তাকিয়ে দৃশ্যটি কল্পনা করে শিউরে উঠল কেউ কেউ। মন্দার ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে, কিন্তু মণীশ নিহত হলেন আততায়ীর গুলিতে।

ক্রমশ বিষাক্ত, ভারী হয়ে উঠল গোটা বাড়ির আবহাওয়া। পুলিশ আসা মানেই এখন হাজারো কৈফিয়ত চাইবে সবাইয়ের কাছে। কয়েকদিন আগেই একটি মৃত্যু হয়ে গেছে, আবার একটি মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল একটি তাজা শরীর।

চিত্রদীপ পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলেন, কনস্পিরেসি, কনস্পিরেসি। আমার প্রদর্শনী বানচাল করার জন্য কেউ কেউ উঠে পড়ে লেগেছে।

গার্গী তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, আপনি কিছু ভাববেন না, আঙ্কেল। যে অপরাধী সে কিছুতেই ছাড়া পাবে না। একটু ওয়েট করুন—

বলে কাছেই দাঁড়ানো অলর্ককে বলল, আপনি দেখুন তো, কেউ যেন পুলিশ না আসা পর্যন্ত এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে না পারে।

মন্দার তৎক্ষণাৎ সায় দিল তার কথায়, হ্যাঁ, নিশ্চই হত্যাকারী এ বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে অলর্ক জানাল, এ বাড়ি থেকে বেরোনোর সব গেটই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আগে পুলিশ আসুক, জবানবন্দি নেওয়া হয়ে গেলে তারপর গেট খুলে দেওয়া হবে—

pathagar.net

ভিড়ের মধ্য থেকে দু একজন অস্ফুটস্বরে বললেন, কিন্তু সে তো এখনও ঢের দেরি। আমাদের বাড়ি ফিরে রাত হয়ে যাবে যে—

গার্গী হাত ঘুরিয়ে বলল, স্যরি। এখন আমাদের কিছুই করার নেই। এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সবাইকেই কিছু কিছু সাফার করতে হবে। কিন্তু অলর্কবাবু, আপনি দেখুন তো, মনে হচ্ছে এটা লোডশেডিং নয়। অন্য বাড়িতে, এমনকি রাস্তায়ও আলো আছে। হয়তো কোনও ফল্ট হয়েছে এ-বাড়িতে, কিংবা এ বাড়ির মেইন সুইচ্ অফ্ করে দিয়েছে কেউ।

অলর্ক ছুটে উঠে গেল সিঁড়ির উপরে, মেইন সুইচের কাছে। সেদিকে তাকাতেই বিস্মিত হয়ে বলল, ঠিকই বলছেন তো। মাই জেশাস, কে বন্ধ করল মেইন সুইচ?

গার্গী হাসল, যিনি গুলি চালিয়েছেন, তিনিই। আমাদের মধ্যে কেউ।

সাতাশ

আধঘণ্টার মধ্যেই এক বিশাল পুলিশবাহিনী পৌঁছে গেল রাসেল স্ট্রিটের মস্ত বাড়িটার গেটে। তখন রাত দশটার মতো, দ্রুত নিরিবিলি হয়ে আসছে গোটা কলকাতা। এতক্ষণে প্রদর্শনীর জায়গা থেকে কাউকেও একচুল নড়তে দেওয়া হয়নি। অনেকেই উশখুশ করছিলেন, 'রাত হয়ে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরতে হবে' এই বলে। পুলিশ এসে গোটা বাড়িটা ঘিরে ফেলতেই গার্গী হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

পুলিশবাহিনীর নেতৃত্বে স্থানীয় থানার ইনস্পেক্টর ছাড়াও রয়েছেন শিহরণ-হত্যার দায়িত্বে থাকা তুষারশুভ্র মিত্রও। গার্গী বিশেষভাবে তাঁকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিল টেলিফোনে। তাঁরা পৌঁছাতেই সমস্ত দর্শককে হাজির করা হল নিচের বিশাল হলঘরটিতে। আপাতত পুলিশের হেপাজতে সবাই সাময়িকভাবে আটক।

তুষারশুভ্র মিত্র গার্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন কী ব্যাপার। আপনি বললেন, শিহরণ হত্যার সঙ্গে আজকের ঘটনার একটা যোগসূত্র আছে!

গার্গী অদ্ভুতভাবে হাসল, আছে মনে হয়েছে বলেই আপনাকে ডিসটার্ব করলাম, ইনস্পেক্টর সাহেব। তার আগে আপনি পুরো বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিন। নিহত অধ্যাপক মণীশ রায়কেও একবার দেখে নিতে পারেন। তা ছাড়া একটা কিছু ছুড়ে ফেলে দেওয়ার শব্দও শুনেছি আমরা। হয়তো সেটা একটা পিস্তল।

পুলিশ অফিসাররা মিনিট দশেকের মধ্যে ঘুরেফিরে এসে একটা ঝকমকে পিস্তল রুমালে মুড়ে এনে বললেন, কিন্তু আমাদের কাছে পুরো ব্যাপারটা কিছুই পরিষ্কার হয়নি। হঠাৎ মণীশ রায়ের মতো একজন অধ্যাপকের উপর অ্যাটেম্পট হল কেন? সেই অধ্যাপক সমিতির ব্যাপারে নিয়েই নাকি? সিঁড়ির নিচে এই পিস্তলটাই বা কার!

পুলিশ অতঃপর তার নিজস্ব পদ্ধতিতে একে-ওকে জেরা করল কিছুক্ষণ। তার মধ্যে মণীশ রায়ের ডেডবডিও পাঠিয়ে দিল যথাস্থানে। অনেকেই উশখুশ করছিলেন বাড়ি যাবেন বলে। রাত ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে বলে অনেকেই বিরক্ত। তাদের কয়েকজনকে ছেড়েও দেওয়া হল প্রাথমিক জেরার পর।

গার্গী হেসে বলল, সবাইকে তো দরকার নেই আমাদের। যারা এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারেন, শুধু তাঁরা থাকলেই হবে।

pathagar.net

পুলিশ ইনস্পেক্টর অবিশ্বাসের গলায় গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী করে শিওর হচ্ছেন, খুনিকে আপনি চিনতে পেরেছেন। অন্ধকারে যে ঘটনাটা ঘটে গেল—

গার্গী বলল, সবই একে একে বলছি, ইনস্পেক্টরসাহেব। সে এতক্ষণে পুরোপুরি গুছিয়ে নিয়েছে নিজেকে। হলঘরের সমস্ত লোক তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিছুটা অসহিষ্ণু, কিছুটা বিস্ময়ের চোখেও। তাদের জোড়া জোড়া চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলতে শুরু করল, আজকের ঘটনাটা সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু এ-রকম একটা কিছু ঘটবে বলে আমি কয়েকদিন ধরেই আশঙ্কা করছিলাম।

তুষারশুভ্র মিত্র অবাক হয়ে বললেন, সে কি!

—হ্যাঁ, কারণ যিনি শিহরণ রায়চৌধুরীকে হত্যা করেছিলেন, তিনি একই সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও অনেকগুলো ঝামেলায়। একটা থেকে আর একটা, তারপর আরও একটা। শেষদিকে তিনি ধরা পড়ে যাবেন এমন আশঙ্কা করেই হঠাৎ আজকের এই কাণ্ডটি ঘটিয়ে ফেলেছেন। আজকের ঘটনাটার কথাই প্রথমে বলি। আমি ভিজিটরস্ বুক নিয়ে সারাক্ষণ বসে ছিলাম সিঁড়ির উপরে ফাঁকা জায়গাটায়। যিনিই প্রদর্শনী দেখতে আসছেন, সবাইকেই অনুরোধ জানাচ্ছিলাম, প্রদর্শনী দেখে এসে যেন তাঁর মতামত লিখে জানান ভিজিটরস বুকে। তার ফলে প্রত্যেক দর্শককের গতিবিধি আমার নজরে থাকছিল। এখানে একটা বিষয় লক্ষ করার মতো। হত্যার চেষ্টাটি ঘটেছে সিঁড়ি থেকে নামবার ঠিক মুখেই। যে মুহূর্তে আলো নিভে যায়, ঠিক তার পরের মুহূর্তেই ঘটে গেল ঘটনাটি। অর্থাৎ মণীশ রায় প্রদর্শনী দেখা শেষ করে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করার পরের মুহূর্তেই। সেক্ষেত্রে আমরা যদি কোনও উপায়ে দেখতে পারি, সেই মুহূর্তে মণীশ রায়ের পেছনে বা সামনে বা কাছাকাছি কে কে ছিলেন—

চিত্রদীপ হঠাৎ কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলেন, কাছাকাছি কে বা কারা ছিল তা কি এখন আর প্রমাণ করা সম্ভব? তাছাড়া তখন তো অন্ধকার।

মন্দার হেসে বলল, বোধহয় সেটা গার্গী মুখার্জির এক্স-রে আইতে ধরা আছে। গার্গী সব কথা উপেক্ষা করে বলে চলল, আমরা আরও লক্ষ করেছি, গুলির শব্দ হওয়ার পরের মুহূর্তে মণীশ রায়ের চিৎকার, সিঁড়িতে তাঁর গড়িয়ে পড়ার শব্দ। পরের মুহূর্তে কেউ যেন হুড়মুড় করে নিচে নেমে গেলেন। অর্থাৎ হত্যাকারী তাঁর কাজটি শেষ করে উপর থেকে নিচে নেমে এসে প্রথমে ছুড়ে ফেললেন পিস্তলটি, তারপর নেমে মিশে গেলেন ভিড়ের মধ্যে, যাতে তাঁকে কোনওক্রমেই কেউ আর সন্দেহ না করতে পারে।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে রণজয় দত্ত বলে উঠলেন, ঠিকই বলেছ, নামবার সময় কেউ যেন আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। আমি তখন সিঁড়ির একেবারে নিচের স্টেপে।

—তাহলে আমাদের দেখতে হবে, আলো নেভার পূর্বমুহূর্তে কার অবস্থান কোথায় ছিল, তারপর আলো জ্বলার পরমুহূর্তে কে কোথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে কেউ এইটুকু সময়ের মধ্যে উপর থেকে নিচে নেমে এসেছিলেন কি না—

মন্দার এই মুহূর্তে বলে উঠলেন, সেসব এখন আর কীভাবে প্রমাণ হবে! ফোটো তো আর কেউ তুলে রাখেনি—

—সেই প্রসঙ্গেই আমি আসছি এবার। আপনারা বোধহয় অনেকেই জানেন না, এই প্রদর্শনীটি উদ্বোধনের মুহূর্ত থেকেই দু-দুটো ভিডিও ক্যামেরা গোটা অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা ক্যামেরায় রয়েছে গ্রাউন্ডফ্লোরে সিঁড়িতে ওঠার জায়গায়, উপরের সিলিংয়ে, তাতে ছবি তোলা হচ্ছে আমাদের কোন কোন অতিথি গেট পেরিয়ে এসে

সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন উপরে, কিংবা কে কে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছেন নিচে। আর একটা ক্যামেরা দোতলার সিলিংয়ে আটকানো, সিঁড়ি বেয়ে উঠে আরও খানিকটা ওপাশে। তাতে রেকর্ডিং হচ্ছে, গোটা দোতলার বারান্দায় যাওয়া আসা করছেন কারা, কারা নামতে যাচ্ছেন, তাও। এই দুটো ক্যামেরায় তোলা ছবি যদি আমরা আলো নেভার আগে থেকে আলো জ্বলে ওঠার পর পর্যন্ত দেখে নিই, তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে, ঘটনা ঘটার আগে ও পরে আমাদের অতিথিদের কার অবস্থান কোথায় ছিল। অর্থাৎ কোন্ বিশেষ ব্যক্তি হত্যাকাণ্ড ঘটানোর ঠিক আগে মণীশ রায়ের কাছাকাছি বা পিছনদিকে ছিলেন, তারপর আলো জ্বলার পর তাঁকে সিঁড়ির নিচে দেখা যাচ্ছে কি না!

চিত্রদীপ অবাক হয়ে বললেন, ক্যামেরায় গোটা প্রদর্শনী রেকর্ডিং করে রাখা হচ্ছে, তা তো আমাকে জানানো হয়নি।

অলর্ক বলে উঠল, আপনাকে সারপ্রাইজ দেওয়া হবে বলে ডোনা নিষেধ করেছিল বলতে।

রণজয় দত্ত অবিশ্বাসের গলায় বললেন, মাই গড! তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে কে এই মার্ডারটি করেছে?

গার্গী মাথা নেড়ে বলল, সম্ভবত না। তার আগে এই ঘটনার নেপথ্যে যে জটিল কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছিল, সেগুলো বলা দরকার। আমি প্রথমে সেই কাহিনী বলে খুনের মোটিভ প্রমাণ করতে চাই। তারপর ভিডিও ক্যামেরার রেকর্ডিং দেখে শনাক্ত করব অপরাধীকে। তা ছাড়াও আমার হাতে আরও প্রমাণ আছে।—

টুঁ শব্দটি শোনা যায় না এমন নিঃস্তব্ধ হলঘরের দিকে তাকিয়ে ফের বলল, তাহলে গোড়া থেকেই শুরু করি। আপনারা অনেকেই জানেন, কয়েকদিন আগেই অধ্যাপক শিহরণ রায়চৌধুরী খুন হয়েছিলেন একটি প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে। বীভৎস সে খুন, কিন্তু তার খুনিকে ধরতে পারেনি পুলিশ। আমি গোপনে সমস্ত ব্যাপারটা স্টাডি করছিলাম বেশ কিছুদিন ধরে। কিছু কিছু প্রমাণ আমার হাতে পৌঁছালেও আমি অপেক্ষা করতে চাইছিলাম চরম মুহূর্তের জন্য। মনে হচ্ছিল হত্যাকারীকে খুব শিগগির হাতেনাতে ধরা যাবে। কিন্তু তাতে ক্ষতির মধ্যে এই হল যে, আমাদের একজন প্রিয় অধ্যাপককে হারাতে হল। তবে—, গার্গী একমুহূর্ত থেমে আবার বলল, তবে এই মণীশ রায়কে ঘিরেই সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি ত্রিভুজ রহস্য, যা এই জটিল কেসটি সমাধানে অনেকগুলো ক্লু রেখে যায়—

ইনস্পেক্টর তুষারশুভ্র মিত্র এই সময় মুখ খুললেন, ত্রিভুজ রহস্য!

—হ্যাঁ, কয়েকদিন আগেই ডোনাকে বলেছিলাম একটা জটিল থিয়োরেম আমাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে কদিন ধরে। একটা বৃত্তের মধ্যে কত অসংখ্য ত্রিভুজ আঁকা যেতে পারে সেটাই আমার কাছে এক জটিল ধাঁধা। সত্যিই অসংখ্য ত্রিভুজ গড়ে উঠেছে এই হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি চরিত্রকে ঘিরে। চরিত্রগুলো হল, শিহরণ রায়চৌধুরী, মণীশ রায়, ঈষিতা রায়, অলর্ক বোস, রণজয় দত্ত, চিত্রদীপ চ্যাটার্জি, বনানী চ্যাটার্জী, ডোনা চ্যাটার্জি এবং মন্দার মিত্র।

ভিড়ের ভেতর থেকে যেন ধমকে উঠলেন চিত্রদীপ, ননসেন্স।

—শিহরণ রায়চৌধুরী খুন হওয়ার পর সন্দেহভাজন হিসেবে প্রথমে আমি যে দুজনের কথা মনে করেছিলাম, তাঁদের একজন হলেন রণজয় দত্ত, অন্যজন মণীশ রায়। হ্যাঁ, মণীশ রায়। কিন্তু তাঁর কথায় পরে আসছি। প্রথমে শুরু করি রণজয় দত্তকে দিয়ে। একটি রিডার পোস্টের জন্য দাবিদার ছিলেন দুই অধ্যাপক মণীশ রায় ও রণজয় দত্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে মণীশ তাঁর চমৎকার একটি প্রবন্ধ পড়ার পর প্রতিযোগিতা থেকে হটে গিয়েছিলেন রণজয় দত্ত। কিন্তু

pathagar.net

তাতে হাল ছাড়েননি তিনি। অধ্যাপক হিসেবে মণীশ রায় ভীষণ জনপ্রিয় হওয়ায় তাঁর উপর আগে থেকেই তিনি ঈর্ষান্বিত ছিলেন; তার ওপর রিডারের পদটিও মণীশ পাচ্ছেন বুঝে তাঁর নামে নানান অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ং উপাচার্যের কাছে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। রিডারের পোস্টটি পেয়েছিলেন মণীশ রায়ই। আর এ-ব্যাপারে মণীশকে প্রবলভাবে সহায়তা করেছিলেন আর এক অধ্যাপক শিহরণ রায়চৌধুরী, এই সেমিনারে মণীশ রায়ের পক্ষে এবং রণজয়ের বিপক্ষে তাঁর শানিত বক্তব্য রেখে। তা ছাড়া রণজয় ও শিহরণের মধ্যে ছিল দীর্ঘ কুড়ি বছরের শত্রুতা। স্বভাবতই এই খুনের ব্যাপারে প্রথমে যাঁর উপর আমাদের সন্দেহ গিয়ে পড়ে, তিনি রণজয় দত্ত।

রণজয় দত্ত চোখ কটমট করে গার্গীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ইউ আর অ্যা ফার্স্টক্লাস স্টুপিড।

—কিন্তু ইতিমধ্যে শিহরণ রায়চৌধুরী জড়িয়ে পড়েছিলেন অন্য একটি ব্যাপারে। আমরা জানি, শিহরণ ছিলেন একজন তুখোড় ব্যক্তিত্বের মানুষ। তাঁর প্রচুর সদগুণ ছিল সন্দেহ নেই। তিনি ভাল লিখতে পারতেন, বলতে পারতেন, পড়াতেনও ভারি চমৎকার, পড়ানোর বিষয়ের বাইরেও তাঁর অনেক জ্ঞান ছিল, টেবিলটকেও ছিলেন বেশ এক্সপার্ট। কিন্তু তাঁর আর একটি হবি ছিল মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমানোয়। নারীর প্রতি ছিল তাঁর মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণ। তাঁর অনেক বান্ধবী ছিল, তাদের নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানোটা ছিল তাঁর অন্যতম হবি। এর মধ্যে একদিন শিহরণ রায়চৌধুরী গেলেন মণীশ রায়ের বাড়ি, তাঁর প্রোমোশন পাওয়ার ব্যাপারে কনগ্র্যাচুলেশন রাখতে। সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল ঈষিতা রায়ের।

মাত্র তিনবছর বিয়ে হয়েছিল ঈষিতা-মণীশের। কিন্তু মণীশ রায়ের ইদানীংকার ব্যবহারে ঈষিতা ভীষণ ফ্রাস্ট্রেটেড। মণীশ রায় সুপুরুষ, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মানুষ। ঠিক যে কারণে ঈষিতা ছুটেছিলেন তাঁর পিছনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন, একইভাবে বহুকাল ধরে ছুটেছে বা ছুটছে আরও বহু তরুণী। মণীশ তাদের প্রত্যেককেই প্রশ্রয় দিতেন, তাদের জন্য সময় ব্যয় করতেন ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরে। তাতে আস্তে আস্তে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন ঈষিতা। তাঁর মনের ভেতরকার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ হঠাৎ একদিন টার্ন নিল অন্যভাবে। হঠাৎ তিনিও অন্য পুরুষদের প্রতি আসক্ত হতে শুরু করলেন। শিহরণ রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হতেই তাঁর সঙ্গেও জড়িয়ে পড়লেন প্রবলভাবে। প্রায়ই তাঁদের দেখা যেতে লাগল এখানে ওখানে, কখনও রেস্তোরাঁয়, কখনও হোটেলে, কখনও লেক-পার্কেও।

মণীশ রায়ের পক্ষে ছিল এটা একটা বিরাট ধাক্কা। এতকাল তিনিই একচেটিয়া উপভোগ করেছেন নারীসঙ্গ, তাদের নিয়ে ঘুরেছেন, সিনেমা দেখেছেন, রেস্তোরাঁয় খেয়েছেন, এখন হঠাৎ তাঁর স্ত্রী ভোগ করছেন অন্যপুরুষ সঙ্গ, এটা তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। জীবনে সফলকাম একজন পুরুষ হঠাৎ আঘাত পেলে তার পরিণাম বড়ো ভীষণ হতে পারে। শিহরণ রায়চৌধুরীর হত্যার পর আমি তাই মণীশ রায়কে সন্দেহ করতে শুরু করেছিলাম। যে সন্দেহে আরও ইন্ধন জোগালেন ঈষিতা রায়ই। আমাকে বললেন, এম. আর. নিজেকে আড়াল করার জন্য দোষ চাপাচ্ছে অন্যের কাঁধে।

এখানে 'অন্যকে' বলতে বুঝিয়েছিলেন রণজয় দত্তর কথা। এর মধ্যে রণজয় দত্তকে নিয়ে আর একটা ইতিহাস আছে। ঈষিতা যেমন শিহরণের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তেমনি সঙ্গ দিচ্ছিলেন রণজয় দত্তকেও। এ ব্যাপারটাও হঠাৎ করে ঘটে যায়। ঈষিতা মণীশের উপর শোধ তুলতে গিয়ে নিজে থেকেই একদিন রণজয় দত্তের সঙ্গে পুরোনো আলাপ ঝালিয়ে তুলতে

...লেন। একদা ছাত্রী ঈষিতা, তার উপর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মণীশ রায়ের স্ত্রী, এমন সুবর্ণ সুযোগ হারালেন না রণজয়। তিনিও ঈষিতাকে নিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে লাগলেন। আর তা অন্যকে দেখিয়েই। ফলে রণজয়ের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে কলহ হল মণীশের, আবার শিহরণেরও। রণজয় আর শিহরণের কলহ অনেকদিনের, তা আবার অন্য চেহারায় ধরা দিল ঈষিতাকে কেন্দ্র করে। সুতরাং শিহরণ-হত্যার পিছনে রণজয় দত্তের ভূমিকা আছে, আমার এই পুরোনো ধারণাটি উসকে উঠল আবারও। এদিকে মণীশ রায়ও আমাকে ঠিক একই কথা বললেন। তিনিও চাইছিলেন, এই সুযোগ রণজয় দত্তকে ফাঁসিয়ে দিতে।

কিন্তু ইতিমধ্যে শিহরণ জড়িয়ে পড়েছিলেন আরও কয়েকটি ব্যাপারে। তার প্রথমটি হল অধ্যাপক-সমিতির নির্বাচন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন শিহরণ। সেসময় তাঁর সহপাঠী এবং বিপ্লবী-আন্দোলনের সহযোগী ছিলেন রণজয় দত্তও। পরে রণজয় পড়তে আসেন কমপ্যারেটিভ লিটারেচার। শিহরণ থেকে যান ইংরেজিতে। কলেজে আন্দোলন চলাকালীন ম্যানিফেস্টো লেখা নিয়ে রণজয় দত্তর সঙ্গে প্রবল ঝগড়া হয়েছিল শিহরণের। শিহরণ দল থেকে বেরিয়ে আসেন। রণজয়-শিহরণের বিবাদ সেই শুরু। আর তার জের এখনও চলছিল অধ্যাপক সমিতির দুই অ্যাসেসিয়েশনের লড়াইয়ে। এর সঙ্গে আবার জড়িয়ে আছে আর একটি প্রেমপর্ব।

শিহরণ রণজয়ের সঙ্গে একই ইয়ারে পড়তেন বনানী, আর এই দুই পুরুষই ছিলেন বনানীর দুই প্রেমিক। দুজনেই বনানীর প্রেমে পাগল। কিন্তু বনানী হঠাৎ বিয়ে করে বসলেন শিহরণকে। সম্ভবত শিহরণের কিছুটা নারী আকর্ষণের প্রতিভা ছিল বলেই। বিয়েটা হয়েছিল কিছুটা গোপনে, বাসও করতেন একটু দূরে শহরতলি এলাকায়। কিন্তু শিহরণ কোনও দিন এক নারীতে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই বনানীর সঙ্গে তাঁর বিয়েটা টিকল না। এর কিছুদিন পরেই বনানীর বিয়ে হল চিত্রদীপের সঙ্গে। এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু এর মধ্যে শিহরণ হঠাৎ দীর্ঘকাল পরে চিত্রদীপের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় পুরানো ত্রিভুজ শিহরণ-বনানী-রণজয়ের মধ্যে যেমন নতুন মাত্রা সৃষ্টি করল, তেমনি তৈরি হল শিহরণ-বনানী-চিত্রদীপের মধ্যে নতুন ত্রিভুজ। শিহরণ আর বনানীর মধ্যে যে একদা একটি সম্পর্ক ছিল তা আগে জানতেন না চিত্রদীপ, হঠাৎ ইদানীং সেটা জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বনানী শিহরণ দুজনেরই উপর।

চিত্রদীপ বেশ কয়েকবার বিরক্ত হয়ে বনানীকে বলেছেন, শিহরণকে ঘর ছেড়ে দিতে বলো, আমি ও-ঘরে স্টুডিও করব। কিন্তু বনানী তাতে একবারও রাজি হননি। তাতে আরও জটিল হয়ে উঠল রহস্য। এছাড়া শিহরণ যে চিত্রদীপের লে-আউট করা শোরুম দেখে বিদ্রূপ মন্তব্য করেছেন তা সহ্য করাও কঠিন হয়ে উঠল চিত্রদীপের পক্ষে। শিহরণ হয়ে উঠেছিল তাঁর পরম শত্রু। অতএব চিত্রদীপও হয়ে উঠলেন অন্যতম সন্দেহ ভাজন।

তার সঙ্গে কিন্তু বনানীও—

কারণ ঘটনাটা হঠাৎই মোড় নিল অন্যদিকে, যখন শিহরণ ওঁদের বাড়িতে পেয়িংগেস্ট থাকতে থাকতে ঝুঁকে পড়লেন ডোনার দিকে। শিহরণ যে তাকে নিয়ে প্রায়ই এখানে ওখানে যাচ্ছেন এটা সহ্য করতে পারছিলেন না বনানী। বনানী শিহরণকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। শিহরণ কতটা নারীশরীরপিপাসু তা জানেন বলেই তাঁর ভেতরে জ্বলছে এক ভয়ংকর ক্রোধ, কিন্তু তা প্রকাশও করতে পারছেন না, কারণ শিহরণকে তিনিই ডেকে এনে জায়গা দিয়েছেন বাড়িতে এবং জীবনের চরম ভুলটি করেছেন। ইতিমধ্যে বনানী এও জেনেছেন, শিহরণ ঈষিতা রায়ের

pathagar.net

সঙ্গেও ঘোরাঘুরি করছিলেন ইদানীং। এসব নিয়ে গোপনে প্রায়ই কথা কাটাকাটি চলছিল বনানী আর শিহরণের মধ্যে।

এহেন প্রেক্ষাপটে হঠাৎ চিত্রদীপের পিস্তল খোয়া যাওয়ায় ঘটনার গতিবেগ ঘুরে গেল অন্যদিকে। পিস্তল পুনরুদ্ধার হতে আরও গাঢ় হল রহস্য, কারণ দেখা গেল তাতে একটি কার্তুজ কম। স্বাভাবিকভাবেই পুলিশের সন্দেহ গিয়ে পড়ল চিত্রদীপ বা বনানীর উপর।

এই খোয়া যাওয়া পিস্তলটি নিয়েও কিন্তু ঘটে গেল অনেক নাটক। চিত্রদীপের অনুমতি না নিয়েই বনানী আলমারি থেকে বার করেছিলেন পিস্তলটা। তাঁর কাছ থেকে সেটা নিয়ে শিহরণ গিয়েছিলেন খড়্গাপুরের ট্যুরে। খড়্গাপুর থেকে ফেরার পর পিস্তলটা ঠিক কার কাছে ছিল তা পরিষ্কার বোঝা গেল না। প্রথমে ভাবা হল, শিহরণ ফেলে এসেছেন অলর্কের বাড়িতে। অলর্ক জানালেন, ওটা শিহরণদা রেখে এসেছেন মণীশ রায়ের ওখানে। মণীশ রায় কিন্তু অস্বীকার করলেন ব্যাপারটা। অথচ ঈষিতা জানালেন, মণীশ রায়ের কাছেই পিস্তলটা দেখেছেন উনি। এদিকে চিত্রদীপ বললেন, শিহরণ খড়্গাপুর থেকে ফিরে আসার দিন রাতেই অথবা তার পরদিন সকালে বেরোবার আগে বইয়ের র‍্যাকের পাশে ওটা রেখে গিয়েছিলেন। তারপর বনানী, না কি চিত্রদীপ, কার কাছে ওটা ছিল শেষপর্যন্ত তাও স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পিস্তলটা পাওয়া গেল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। আমার অনুমান, সেদিন খড়্গাপুর থেকে ফেরার পর যখন শিহরণদা গিয়েছিলেন মণীশ রায়ের বাড়ি, তখনও তাঁর কাছে পিস্তলটা ছিল, সেটা দেখিয়েও ছিলেন মণীশ রায়কে, কিন্তু রাতে সেটা বাড়ি এনে ভুলে রেখে দিয়েছিলেন বইয়ের র‍্যাকের পাশে। পরদিন সকালে সেটা চিত্রদীপের চোখে পড়লেও কোনও কারণে তুলতে ভুলে গিয়েছিলেন। পরে বনানীই কোথাও রেখেছিলেন। কিন্তু পুলিশ এসে ঝামেলা শুরু করার ভয়ে আর বার করেননি। কারণ তাতে একটি কার্তুজ কম ছিল, শেষপর্যন্ত ফেলে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যাতে পুলিশের নজর অন্যদিকে ঘুরে যায়।

কিন্তু এত সব ঝামেলার মধ্যে আর একটি যে জটিলতা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল, তা আর এক ত্রিভুজ-রহস্যের নায়ক অলর্ক বসুর বিশাল ব্যাবসা সম্পর্কিত কর্মকাণ্ড। ভবঘুরে, প্রায় কপর্দকহীন অলর্ক বসু ভোজবাজির মতো এক বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে গেলেন রাতারাতি। অত টাকা হাতে পেয়ে প্রথম দিকে তাঁর মাথা ঘুরে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, ভাল একটি ব্যবসায়ে নিয়োগ করবেন টাকাটা। সে ব্যাবসার পরিধি এমনই বড় যে, একা অলর্কের পক্ষে তা সামাল দেওয়া অসম্ভব। এহেন অবস্থায় শিহরণ রায়চৌধুরীর সঙ্গে অলর্কের আলাপ, তাতে অলর্ক তাঁর উপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। শিহরণও উপলব্ধি করলেন, অলর্ককে ঠিকমতো গাইড করার একজন লোক দরকার, নইলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে এত বড় ব্যবসায়। এই ভাবনাটাই তাঁর পক্ষে কাল হল, কারণ ব্যবসায় নামলেই শত্রুর সৃষ্টি হয় চারপাশে। শিহরণও এমন এমন সিদ্ধান্ত নিতে লাগলেন, তাতে কারও কারও স্বার্থের হানি হতে শুরু হল। যেমন হল চিত্রদীপ, কিংবা মন্দারের। হয়তো আরও অনেকের। সিদ্ধান্তগুলো যদি অলর্ক নিজে নিতেন, তাহলে হয়তো এত শত্রুর সৃষ্টি হত না, যতটা হল শিহরণের নাক গলানোয়। অলর্ক নিজেও কখনও কখনও বিরক্ত হতে লাগল শিহরণের এই অতিরিক্ত ফোঁপরদালালিতে। খড়্গাপুরে একবার কথা-কাটাকাটিও হয়ে গেল দুজনের মধ্যে, এমনকি প্রবল উত্তেজনার মধ্যে দুজন দুজনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল যার পরিণতি হয়তো এই ঘটনায় এনে দিত অন্য এক বাঁক, কিন্তু তার ডিটেলস পরে বলছি।

pathagar.net

চ্যালেঞ্জের মূল কারণ ব্যাবসা-সংক্রান্ত হলেও আসল লক্ষ্য ছিল ডোনা। শিহরণ যেমন ঝুঁকেছিলেন ডোনার দিকে, অলর্ক বোসও চেয়েছিলেন ডোনা হবে তাঁরই এক্সক্লুসিভ।

আসলে অলর্ক বোস একটু রোমান্টিক স্বভাবের যুবক, কিন্তু তাঁর রক্তে বিদেশিছোঁয়া থাকার ফলেই হোক, অথবা একা-একা নিঃসঙ্গভাবে বেড়ে ওঠার কারণেই হোক, তিনি অসম্ভব জেদি, একগুঁয়ে, যা ভাববেন, তাইই করতে হবে ওঁকে। ওঁদের কেন্দ্র করেও সৃষ্টি হয়েছিল তিন তিনটি ত্রিভুজের। শিহরণ অলর্ক ডোনা, শিহরণ মন্দার ডোনা, এবং অলর্ক মন্দার ডোনা। আসলে ডোনা এমনই একটি মেয়ে যে একই সঙ্গে অনেক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে, তাদের সময় দিতে পছন্দ করে। তাদের ভালবাসে কি বাসে না তা আমার আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু তার এই বোহেমিয়ানা অহেতুক সৃষ্টি করল প্রচুর জটিলতা। হঠাৎ একদিন আলাপ হওয়ার পর সে পছন্দ করে ফেলল মন্দার মিত্রকে। তাকে সময় দিতে লাগল, এমনকি তাকে নিয়ে তিনদিনের আউটিংও করে ফেলল প্রেমিক-প্রেমিকার ধাঁচে। পাশাপাশি শিহরণের সঙ্গে গড়ে উঠল এক অসম অস্বাভাবিক সম্পর্ক। ঠিক সেই মুহূর্তে পটভূমিকায় অলর্ক বোসের দুর্দান্ত আবির্ভাব বদলে ফেলল সমস্ত ছক। অলর্ক হঠাৎ ডোনাকে তার এ টু জেডের এক্সক্লুসিভ গার্ল হিসেবে যেন পাবলিসিটি দিতে লাগল বিপুলভাবে, তেমনই তার পিছনে খরচ করতে লাগল হাজার হাজার টাকা, আবার এই আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করল, ডোনাই হবে তার জীবনের এক্সক্লুসিভ নারী।

অতএব স্বাভাবিকভাবেই ঘনিয়ে এল শিহরণ-মন্দার-অলর্কের ভেতরকার যুদ্ধ।

আর এটা তো জানা কথাই যে, যুদ্ধ যদি প্রেমঘটিত হয়, তবে তা হয়ে ওঠে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম লড়াই। যার মুখে পড়লে যে কেউ কুটোর মতো ভেসে যেতে পারে। সুতরাং শিহরণ হত্যার এই জটিল রহস্যের মধ্যে মণীশ-রণজয়-চিত্রদীপ-বনানীর মতোই সম্ভাব্য খুনি হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি অলর্ক বা মন্দারকে।

কিন্তু এর মধ্যে আরও কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যা এই জটিলতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধু জড়িতই নয়, জটিলতাকে জটিলতর করে তুলল। দুর্ঘটনার প্রথমটি হল মন্দার মিত্রের আহত হওয়া, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভর্তি করতে হল নার্সিংহোমে। শিহরণ হত্যার কয়েকদিন পর পর্যন্ত তাঁকে নার্সিংহোমের কেবিনেই কাটাতে হল। দ্বিতীয়টি, অলর্ক বোসের উপর হত্যার প্রচেষ্টা বা একটুর জন্যে লক্ষভ্রষ্ট হল। তৃতীয় ঘটনাটি হল, মণীশ রায়ের উপর আজকের এই আক্রমণ।

আরও একটি ঘটনা এই সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত হলেও কারও ঠিক নজরে পড়েনি, পড়বার কথাও নয়, তা হল, বীরভঙ্গপুরের এক রাজবাড়ির রানিমার খুন হওয়া, তার জের হিসেবে তাঁদের হেড লেঠেল হরিশংকর চৌধুরীর মৃত্যু। হরিশংকরের লাশ আবার পাওয়া গিয়েছিল অলর্ক বোসের বাড়ির ঠিক কাছেই। পুলিশ সন্দেহ করেছে, এটা অলর্কের কাজ।

আমরা ভিডিও-রেকর্ডিং দেখার আগে একবার বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির ইতিহাসও শুনে নিই, তাতে এতগুলো খুনের মোটিভ সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

আপনারা লক্ষ করেছেন কি না জানি না, কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে প্রায় দেড়শো কিলোমিটার দূরত্বে কোনও এক বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়িতে সেখানকার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী বৃদ্ধা লাবণ্যপ্রভা মিত্র নাটকীয়ভাবে খুন হয়েছিলেন। সে বাড়ির আশ্রিত-আশ্রিতারা, এমনকি স্থানীয় পুলিশও খুনি হিসাবে চিহ্নিত করেছিল রাজবাড়িতে কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের অছিলায় বেড়াতে আসা জনৈক সাংবাদিককে। সাংবাদিকটির বিশেষত্ব

pathagar.net

হল, তার মুখময় কালো দাড়িগোঁফ, চোখে চশমা, এবং লেখে বাঁ-হাতে। তার কাছে ছিল একটি সাইড ব্যাগ, তার মধ্যে কিছু জামাকাপড়, লেখার প্যাড ও একটি কলম। সেই সাতাত্তর বছরের বৃদ্ধার কাছে সে রোজই গিয়ে বসত রাজবাড়ির প্রাচীন ইতিহাস ও তার উত্তরাধিকারের গল্প শুনতে। তারপর হঠাৎ শেষ দিনে সে বৃদ্ধার কাছে প্রকাশ করে সে-ই বৃদ্ধার একমাত্র জীবিত নাতি, এই রাজবাড়ির শেষ জীবিত উত্তরাধিকারী, বৃদ্ধার এই যাবতীয় সম্পত্তি তারই প্রাপ্য। বৃদ্ধা কোনও কারণে তাকে উত্তরাধিকারী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। 'সাংবাদিক'টি আক্রোশে, ক্রোধে নিজেকে আর সামলাতে পারেনি। বৃদ্ধাকে খুন করে সেই মুহূর্তে পালিয়ে আসে বীরভঙ্গপুর ছেড়ে। আসার সময় তাড়াহুড়োয় সে বীরভঙ্গপুরে ফেলে এল সাংবাদিকের মোক্ষম অস্ত্র, লেখার প্যাড আর কলম—যে দুটি ক্লু থেকে হত্যাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু কলকাতার এই বিশাল জনসমষ্টির মধ্যে সেই সাংবাদিককে খুঁজে বার করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, যদি না সে তার কোনও ঠিকানা অথবা নিজের কোনও হদিশ রেখে আসে রাজবাড়ির কোনও আশ্রিত-আশ্রিতার কাছে। তাকে চেনা আরও অসম্ভব হয়ে পড়ল, কেননা তার দাড়িটি ছিল নকল, সে চশমাও পরে না। শুধু যা লুকোতে পারেনি, তার লেখার প্যাড আর কলম।

যুবকটি হয়তো এভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই চলে যেত, যদি-না তার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়ে যেত হরিশংকর চৌধুরীর। তার চশমা, কালো দাড়িগোঁফ না থাকা সত্ত্বেও তাকে একদিন চিনে ফেলেন হরিশংকর। যুবকটিকে চিনে ফেলাই কারণ হল হরিশংকরবাবুর জীবনের সমাপ্তির। তাঁকে খুন হতে হল সেই মুহূর্তে। কারণ হরিশংকরবাবু তাকে চিনে ফেললে সেই যুবককে ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে। শুধু তা-ই নয়, হরিশংকরবাবু বরাবর বিরোধিতা করেছিলেন তাঁকে লাবণ্যপ্রভার নাতি হিসাবে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে একটু দম নেওয়ার জন্য থামল গার্গী। মন্দার মিত্র হঠাৎ হেসে উঠে বলল, এত সব কথা আপনি জানলেন কী করে ভেবে আশ্চর্য লাগছে।

গার্গী হাসল, এর জন্য এ কদিন কম ছোটাছুটি করতে হয়নি, মন্দারবাবু, এমনকি কদিন আগে একদিন বীরভঙ্গপুরেও ছুটতে হয়েছে আমাকে। যাই হোক, ইতিমধ্যে পুলিশ অলর্ক বোসের বাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে খুঁজে পেল আর একটা পিস্তল, এটা আবার বিদেশি মেকারের। আশ্চর্যের কথা এই যে, সে পিস্তলটির চেম্বারেও একটি কার্তুজ কম। অর্থাৎ সেটা থেকেও একটি গুলি ছোড়া হয়েছে। তাতে ব্যাপারটায় আরও জট পাকিয়ে গেল। চিত্রদীপ ও অলর্ক দুজনের পিস্তলেই একটি করে কার্তুজ কম, তাহলে কার পিস্তল সেদিন সন্ধেয় ব্যবহৃত হয়েছিল শিহরণকে খুন করতে! দুটো পিস্তল যেহেতু দুই মেকারের, তাহলে ব্যালিস্টিক রিপোর্ট দেখলেই তা বোঝা যাবে শিহরণের শরীরে কোন পিস্তলের গুলি ব্যবহৃত হয়েছে। সেটা তো পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনেই গেছেন, তাহলে তিনি কেনই বা সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করছেন না। পুলিশের তরফ থেকে কোনও উচ্চবাচ্য না হওয়ায় আমি নিজেই একদিন যোগাযোগ করলাম ইনস্পেক্টর তুষারশুভ্র মিত্রের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে যা জানলাম তা আরও আশ্চর্যের। জানা গেল শিহরণের দেহ থেকে যে গুলি পাওয়া গেছে তা এই দুটো পিস্তলের কোনওটা থেকেই ছোড়া নয়। সে গুলি অন্য কোনও পিস্তলের। অর্থাৎ আরও ঘোরালো হয়ে উঠল রহস্য।

হত্যাকারী কে, ততদিনে অবশ্য একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমার সামনে। বীরভঙ্গপুরের রানিমাকে যিনি হত্যা করেছিলেন, তাঁর ব্যবহৃত লেখার প্যাড আর কলম দেখে দুটি ক্লু আমার সামনে তখন পরিষ্কার। একটি, খুনি বাঁ-হাতে লেখে, কিন্তু তার হাতের লেখা

pathagar.net

চমৎকার, অলঙ্কারবহুল, আর তার ব্যবহৃত পেনটিতেও একটি বিশেষত্ব। সে-কথায় আমি পরে আসছি। আরও একটি ক্লু, তার মুখে কালো দাড়ি। কয়েকদিন আগে পুলিশ ইনস্পেক্টরও আমাকে জানালেন, এক বৃদ্ধ অধ্যাপক তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, তিনি এক দাড়িওলা যুবককে শিহরণের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছেন। আবার সেদিন মণীশ রায়ও আমাকে বললেন, তাঁর পাশেই বসেছিল যে যুবক, তার মুখে দাড়ি ছিল, সেও শো-ভাঙার মুখে হঠাৎ তাঁর পাশ থেকে উঠে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। যুবকটিকে অবশ্য তিনি চেনেন না।

আমাদের চেনাজানা যতজন সন্দেহভাজন আছেন, তাঁদের মধ্যে এক অলর্ক বসুর মুখেই দাড়িগোঁফ ভর্তি।

অলর্ক বোস এই সময় হেসে উঠে বলল, তাহলে কি আপনি ধরে নিয়েছেন যে, আমিই এই খুনগুলো করেছি।

গার্গী হাসল, আপনাকে হত্যাকারী হিসেবে ভাবার কিন্তু অনেকগুলো কারণ আছে, মি. বোস, তার কিছু-কিছু কথা আমি আগেই বলেছি। হয়তো আপনিই ছদ্মবেশে বীরভঙ্গপুরে গিয়ে উত্তরাধিকারিত্বের লোভে হত্যা করেছিলেন লাবণ্যপ্রভাকে। তারপর হরিশংকর চৌধুরীর সঙ্গে আপনার শত্রুতা ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছিল তা নিশ্চই আপনি অস্বীকার করতে পারেন না। হরিশংকর বরাবর আপনার উত্তরাধিকারের দাবিকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করেছেন, এবং শাসিয়েও ছিলেন আপনি যে সত্যিই উত্তরাধিকারী নন তা ফাঁস করে দেবেন সবার কাছে। দ্বিতীয়ত, শিহরণ রায়চৌধুরীর সঙ্গেও আপনি জড়িয়ে পড়েছিলেন অনেকগুলো ঝামেলায়। ডোনার সঙ্গে আপনার মেলামেশা যেমন উনি পছন্দ করেননি, আপনিও সহ্য করতে পারছিলেন না শিহরণদার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করুক ডোনা। শিহরণদার সঙ্গে আপনার ব্যাবসা সম্পর্কিত ব্যাপারেও নানান জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছিল। হয়তো শিহরণদা চেয়েছিলেন আপনার এই বিশাল সম্পত্তির অংশও। সবচেয়ে বড় কথা, খড়্গাপুরে আপনারা দুজনেই গিয়েছিলেন দুটি পিস্তল নিয়ে, সে দুটি পিস্তলেরই একটি করে চেম্বারে কার্তুজ নেই। আপনি অবশ্য সেদিন স্বীকার করেছেন, খড়্গাপুরে দুজন দুজনকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছুড়েছিলেন উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কারও গায়ে গুলি লাগেনি। হয়তো সে উত্তেজনার সমাপ্তি ঘটে ড্রাগ্সড্রামার শেষ দৃশ্যে পৌঁছে।

অলর্ক বোস হা হা করে হেসে উঠে বললেন, অদ্ভুত আপনার ব্যাখ্যা—

—আমাদের সন্দেহভাজনদের মধ্যে আরও একজন আছেন, তিনি মন্দার মিত্র।

মন্দার মিত্র আকাশ থেকে পড়লেন, আমিও?

—হ্যাঁ, ধরুন আপনিই ছদ্মবেশ ধারণ করে গিয়েছিলেন বীরভঙ্গপুরে, রানিমার নাতি বলে পরিচয় দেওয়ার পর তিনি আপনাকে মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় তাঁকে হত্যা করে পালিয়ে এলেন কলকাতায়। মনে করুন, দাড়ি এবং চশমা দুটোই ছিল আপনার ছদ্মবেশ। পরবর্তীকালে অলর্ক বসুর বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে ফেরার সময় হরিশংকর চৌধুরী চিনে ফেলেন আপনাকে। আপনি তখন অলর্ক বসুকে টার্গেট করতে ঘুরঘুর করছেন সেখানে, তাঁর অফিসেও। সুতরাং হরিশংকরকেও হত্যা করতে হল আপনাকে। শুধু তাই নয়, তার লাশ আপনি ফেলে এলেন অলর্ক বসুর বাড়ির কাছাকাছি, যাতে পুলিশের নজর পড়ে তারই উপর। কিন্তু আপনার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী তখন অলর্ক বসু, যে কিনা রাজবাড়ি গিয়ে আপনার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন কদিন আগে, বীরভঙ্গপুরের উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরে। তাঁকে চিঠি দিয়ে শাসালেনও, ইয়োর ডেজ আর নাম্বারড্। কিন্তু পরে বুঝেছিলেন, অলর্ক

বসুকে মেরে আর লাভ নেই, তাতে তার দখল করা সম্পত্তি আর আপনার ভোগে আসবে না। বরং ইতিমধ্যে এ চেষ্টাও করতে লাগলেন, যাতে অলর্ক বসুর কয়েক লক্ষ টাকার ইনটেরিয়র ডেকোরেশনের কাজটা হাতানো যায় কোনও ভাবে। কিন্তু তাতে আপনার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন শিহরণ রায়চৌধুরী। তিনি বারবার চাপ সৃষ্টি করছিলেন অলর্ক বসুর উপর, যাতে মন্দার মিত্রকে কাজটা না দেওয়া হয়। আপনি তা জানতে পেরে প্রথমেই ঠিক করলেন শিহরণ রায়চৌধুরীকে সরিয়ে দিতে হবে এই পৃথিবী থেকে। সিদ্ধান্ত নেওয়া মাত্র আপনি হঠাৎ একদিন শরীরে একটা মাইনর ইনজুরি করে ভর্তি হলেন নার্সিংহোমে। ডোনা আপনার সঙ্গে নার্সিংহোমে দেখা করতে গিয়ে ড্যান্সড্রামার একটি কার্ড দিয়ে আসে নিছক সৌজন্যবশত। আপনার সামনে এসে গেল সুবর্ণসুযোগ। ছদ্মবেশ ধারণ করে সেই কার্ড নিয়ে আপনি ফাংশনের দিন চলে গেলেন অডিটোরিয়াম হলে, বসলেন মণীশ রায়ের ঠিক পাশেই। আপনার ঠিক সামনের চেয়ারে ছিলেন শিহরণ রায়চৌধুরী। যিনি শো শেষের ঠিক আগেই এগিয়ে গিয়েছিলেন সামনে, ডোনাদের অভিনয়কে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন বলে। ভিড়ের মধ্যে আপনিও সিট ছেড়ে এগোলেন আপনার কোমরে গোঁজা পিস্তলটি নিয়ে তারপর—

—বাহ্ বাহ্, মন্দার মিত্র ব্যঙ্গের সুর মিলিয়ে একটু গলা চড়িয়ে বলে উঠল গার্গীকে লক্ষ করে, ভাল বানিয়েছেন তো গল্পটা। আপনি একজন ভালো স্টোরিটেলার তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটা আমার ঘাড়ে চাপিয়ে অন্যের চোখে অপরাধী প্রতিপন্ন করবেন না। শিহরণদা মার্ডার হওয়ার সময় আমি নার্সিংহোমে অচেতন।

—কিন্তু মন্দারবাবু, নার্সিংহোমের ব্যাপারটা একেবারে সাজানো। ওই নার্সিংহোম থেকে যে আপনি যখন-তখন পেরোতে পারতেন, তা আমার জানাই আছে। শিহরণদার মার্ডারের সময় আপনি নার্সিংহোম থেকে বেরিয়েছিলেন কি না তাও জানা গেছে ওই নার্সিংহোমে যোগাযোগ করে। ওদের রেজিস্টারে নোট করা আছে আমি দেখে এসেছি। যাই হোক, সেদিন ফাংশনের হলে যিনি আপনাকে নজরে রেখেছিলেন এবং পরে ডোনাদের বাড়িতে চিনলেন তিনি মণীশ রায়। ফলে হত্যাকারীর পরবর্তী টার্গেট হলেন মণীশ রায়ই। এখন তাহলে আমরা ভিডিও রেকর্ডিংয়ের দুটি টেপই একবার চালিয়ে দেখে নিই, ছবি দেখে মণীশ রায়ের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা যায় কি না। আমার এতক্ষণের অনুমান কিছু কিছু মিলছে কি না তাও প্রমাণিত হয়ে যাবে—

গার্গী সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে হলঘরের এককোণে রাখা টি.ভি-র স্ক্রিনের দিকে সবাই তাকিয়ে রইল রুদ্ধশ্বাসে।

স্ক্রিনে তখন দোতলার ক্যামেরার দৃশ্য দেখাচ্ছে। জমজমাট আলোর মধ্যে প্রদর্শনীকক্ষে যাওয়া-আসার ভিড়। সিঁড়ি দিয়ে উঠে একে-একে অতিথিরা চলেছেন প্রদর্শনীর দিকে। কেউ কেউ ফিরে আসছেন তাঁদের দেখা শেষ করে। গার্গী তার ভিজিটরস বুক নিয়ে বসে আছে সিঁড়ির প্রায় কাছাকাছি। মাননীয় অতিথিদের ফিরে আসতে দেখলেই সে অনুরোধ করছে ভিজিটরস বুকে কিছু লিখে দেয়ার জন্য। অনেকেই নিচু হয়ে দু-একটা লাইন লিখছেন, কেউ হেসে বললেন, এখনও সব দেখা শেষ হয়নি, পরে লিখছি। কেউ আবার লেখার অনুরোধ এড়িয়ে যাচ্ছেন। খানিক পরেই দেখা গেল মণীশ রায়কে। মণীশ রায় তার আগেই তার মন্তব্য লিখে গেছেন, তাই তাঁকে আর অনুরোধ জানাল না গার্গী, পরিবর্তে মিষ্টি হেসে বলল, 'এখনই কি চলে যাবেন, স্যার?' মণীশ রায় হেসে বললেন, 'যাব, ঈষিতা কোথায় আছে আগে খুঁজে বার করি। সে বোধহয় ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে।' মণীশ রায়ের ঠিক পেছনেই ছিলেন

একজন অপরিচিত মহিলা, তাঁকে এর আগে দেখেনি গার্গী, তাই শুধু মিষ্টি করে হেসে বলল, আপনি কি কিছু লিখবেন? তিনি ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেলেন, তাঁর ঠিক পিছনে মন্দারকে দেখা গেল হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসতে। তারপর রণজয় দত্ত। হঠাৎ অলর্ককে দেখা গেল উঠে আসতে।

তার একটু পরেই লোডশেডিং। লোডশেডিং পর্ব শেষ হলে দেখা গেল অনেকেই ছুটে আসছেন দোতলার ঘরগুলো থেকে। তার আগেই তো ঘটে গেছে সেই নৃশংস ঘটনাটি।

গার্গী উঠে এসে বদলে দিল ক্যাসেট। এরপর একতলার সিঁড়ির গোড়ায় যে ক্যামেরা ছিল তার দৃশ্য ভেসে উঠল টি.ভিতে। সবাই আরেকবার হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্ক্রিনের দিকে।

আবার সেই অতিথিদের ক্রমাগত সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার দৃশ্য। চমৎকার পোশাকে সেজেগুজে এসেছেন সবাই। প্রত্যেকেই দারুণ খুশির মেজাজে আছেন। কত যে দর্শক এই প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন তা সত্যিই গুনে শেষ করা যায় না, কেউ উঠছেন কেউ নামছেন। কেউ কেউ পাশাপাশি গল্প করতে করতে উঠছেন বা নামছেন। টুকরো টুকরো শব্দও ধরা পড়েছে রেকর্ডিংয়ের সময়। 'চমৎকার, দারুণ হয়েছে'। 'এতদিন চিত্রদীপ চ্যাটার্জির একজিবিশন ঠিক ফলো করিনি আমরা,' ইত্যাদি নানান সব মন্তব্য। বেশ অনেকক্ষণ পর দেখা গেল সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে মণীশ রায়। তার পিছনেই সেই অপরিচিত মহিলা, তারপর আগে-পরে মন্দার ও রণজয় দত্ত। কাছাকাছি অলর্ক বসু। পরক্ষণেই নিভে গেল স্ক্রিনের ছবি। একটা বিরাট শব্দ, আর আর্ত চিৎকার। হুড়মুড় করে কেউ নেমে এল যেন নিচে। বেশ খানিকক্ষণ পর আলো জ্বলে উঠতেই দেখা গেল সিঁড়ির ওপর অচেতন হয়ে পড়ে আছেন মণীশ রায়। তাঁর বাঁদিক থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তারপর হুড়মুড় করে উপর দিকে ছুটে আসছেন কেউ কেউ, নিচ থেকেও অনেকে—তাদের মধ্যে মন্দারও।

দেখতে দেখতে গার্গী বলে উঠল, আপনারা নিশ্চই দেখতে পাচ্ছেন কে উপরের দিক থেকে ছুটে নেমে আসছেন, কেউ বা নিচের দিক থেকে ছুটে উপরে যাচ্ছেন। যিনি উপরে ছিলেন আলো নেভার আগে, আলো জ্বলার পর কেন তিনি নিচে থেকে উপরে ছুটে গেলেন সেটাই নিশ্চয় ভাববার বিষয়। মণীশ রায়কে কে খুন করতে পারেন, তা নিশ্চয় আপনারা অনুমান করতে পারছেন।

গার্গী মুখে না বললেও সবাই বুঝতে পারলেন, মন্দার মিত্রের কথাই বলতে চাইছে সে।

ভিডিও-রেকর্ডিং শেষ হতেই পুলিশ ইনস্পেক্টর তুষারশুভ্র মিত্র বলে উঠলেন, ভিডিওটেপে দারুণ ধরেছেন কিন্তু ব্যাপারটা। কিন্তু আপনারা কী করে জানলেন, আজই এরকম একটা মিসহ্যাপ হবে?

গার্গী হাসল, আমরা জানতাম না এরকম মিসহ্যাপ হয়ে আজ। ব্যাপারটা একেবারেই কাকতালীয়। অলর্ক বসু নেহাৎ খেয়ালবশেই এই রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইনস্পেক্টর তবু আবারও প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগছে, বীরভঙ্গপুরের ঘটনার সঙ্গে কলকাতার ঘটনা আপনি মেলালেন কী করে?

গার্গীর কাছে সে প্রশ্নের জবাবও তৈরি। হেসে বলল, তাহলে বীরভঙ্গপুরের কাহিনীর আসল রহস্য পরিষ্কার করি এবার। বীরভঙ্গপুরের রাজা ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র বিপুল সম্পত্তির মালিক, তবু তাঁকে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। তাঁর অনেকগুলি পুত্রকন্যা হওয়া সত্ত্বেও শেষজীবনে প্রায় নিঃসন্তানের মতো জীবনযাপন করতে হয়েছে। বেশ কয়েকটি পুত্রকন্যা অল্পবয়সে মারা যায়। তিনটি সন্তান জীবিত ছিল, তার মধ্যে একমাত্র পুত্র সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাওয়ার পর খবর

এসেছিল সেও মারা গিয়েছে। বাকি দুটি কন্যা বড় হয়ে উঠেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাদের বিয়ের কথা যখন ভাবাভাবি হচ্ছিল, দুটি কন্যাই পর-পর বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এমন দুই যুবককে যারা কেউই রাজবাড়ির পছন্দের নয়। একজন রাজেশ্বরী, সে বিয়ে করেছিল রাজবাড়িরই আশ্রিত একটি লোককে যে একাধারে মাতাল ও লম্পট, শুধু তা-ই নয়, তার অন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিল। অন্যজন উর্বশী, সে কলকাতা বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ এক বিদেশি যুবককে পছন্দ করে, তার সঙ্গেই কোথাও উধাও হয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে এমন খবর এসেছিল রাজবাড়িতে। অতঃপর কোনও মেয়ের সঙ্গেই আর রাজবাড়ির সম্পর্ক ছিল না। রাজা জীবিত থাকতে তাদের নামও কখনও উচ্চারিত হয়নি রাজবাড়িতে। এমনকি রানিমাও কখনও মেয়েদের নাম মুখে আনতেন না।

আশ্চর্যের কথা এই যে, দীর্ঘকাল পরে যে যুবক রাজবাড়িতে সাংবাদিকের ছদ্মবেশে সম্পত্তির লোভে হানা দিয়েছিল, সে রাজেশ্বরীরই পুত্র। কিন্তু রানিমা সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছিলেন রাজেশ্বরী এক বিবাহিত লম্পটের সঙ্গে পালানোয়। ফলে তার গর্ভজ সন্তানকেও ক্ষমা করতে পারেননি। তাতে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ সেই যুবক উত্তেজনার মাথায় খুন করেছিল রানিমাকে। তার পরের কাহিনীও কম রোমাঞ্চকর নয়। রানিমা খুন হওয়ার পরে অন্য যে যুবক রাজবাড়ির উত্তরাধিকার দাবি করে হাজির হয়েছিল বীরভঙ্গপুরে, সে রানিমার আর এক কন্যা উর্বশীরই একমাত্র পুত্র।

আপনারা হয়তো অনুমান করেছেন, এই দুই যুবকের প্রথমজন মন্দার মিত্র, অন্যজন অলর্ক বোস।

গার্গী একটু থামতেই উপস্থিত শ্রোতাদের ভেতর কেউ কেউ বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য!

কিছু গুঞ্জন, ফিসফাসও শুরু হয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে। মন্দার মিত্রকে হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠতে দেখা গেল।

আর একটু বলার ছিল গার্গীর। কিছুক্ষণ দম নিয়ে সে বলল, মন্দার মিত্র একদিন একটা প্রশ্ন করে আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন আমাদের। অলর্ক বোসের পিতা ছিলেন এক আর্মেনীয়, সেক্ষেত্রে তাদের পদবি বোস হল কী করে। অলর্ক তার উত্তর দিয়েছেন সেদিন। সেই বিদেশি ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী উর্বশীর রূপে, গুণে, ভালবাসায় এমনই মুগ্ধ ছিলেন যে, নিজের বিদেশি পদবি বদলে কিছুটা মজা করেই উর্বশীর পালটি ঘর হিসেবে নিজের নামের পাশে বোস পদবি লিখতেন বরাবর। ছেলের নামও রেখেছিলেন সেভাবে। ঘটনাটি অভিনব সন্দেহ নেই।

অলর্ক প্রতক্ষণে তার মুখে সেই বিখ্যাত সরল হাসিটি ফুটিয়ে বলল, এত ইতিহাস কিন্তু আমিও জানতাম না, মিস মুখার্জি। আপনি আমাকেও সারপ্রাইজ দিলেন।

গার্গী হাসল, অবাক করার মতোই ঘটনা। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়, পৃথিবীর সব রাজবাড়িতেই এম.. আশ্চর্য সব রূপকথা লুকিয়ে থাকে। এ যুগের পরিত্যক্ত রাজবাড়িগুলো খুঁজলে আবিষ্কৃত হতে পারে এহেন দুর্ধর্ষ সব কাহিনী। এহেন অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা আমাকে আরও উসকে দিয়েছে মন্দার মিত্রের বীরভঙ্গপুরে অভিযান। বীরভঙ্গপুরের রাজবাড়ির কাহিনী খুঁজে বার করতে আমাকে আরও সাহায্য করেছেন সে-বাড়ির আশ্রিত-আশ্রিতারা, তার সঙ্গে সেই সাংবাদিক ওরফে মন্দার মিত্রের করা তথ্যাবলী, যা লেখা আছে ওখানকার থানায় একজিবিট হিসেবে রক্ষিত প্যাডটিতে।

বলতে বলতে মন্দার মিত্রের ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া চেহারার দিকে তাকিয়ে গার্গী বলল, আপনি কিন্তু কোনওভাবেই বাঁচতে পারছেন না, মি. মিত্র। আপনি বরাবর বাঁ-হাতে লেখেন।

আপনার প্যাডের সেই হাতের লেখার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছি নার্সিংহোমের বেডে রাখা আপনার ডায়েরির হস্তাক্ষরের সঙ্গে। তা ছাড়া আপনার যাবতীয় টেন্ডারের কাগজের লেখালিখি সব বাঁ হাতে লেখা। শুধু সেদিন আমাকে আপনার অফিসের ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন যে কাজগটিতে, তাতে ছিল ডানহাতের লেখা। গোটা-গোটা অক্ষরের সেই লেখা পড়ে আশ্চর্যই হয়েছিলাম সেদিন। কারণ ডায়েরির হস্তাক্ষরের সঙ্গে তার কোনও মিলই ছিল না। পরে বুঝেছিলাম, বীরভঙ্গপুরের ঘটনাটা গোপন করতে আপনি অন্যের সামনে ডানহাতে লেখার চেষ্টা করছিলেন ইদানীং। আপনার বিরুদ্ধে আর একটি প্রমাণও আছে, তা আপনার কলমগুলি। ডটপেনই হোক, বা ফাউন্টেন পেনই হোক, তার পেছনদিকটা দাঁত দিয়ে চিবোনা আপনার অভ্যাস। এই মুহূর্তে আপনার পকেটে যে কালোরঙের ডটপেনটি আছে, তাতেও নিশ্চিত দাঁতের দাগ থাকবে, যে দাঁতের কারুকাজ আমি দেখে এসেছি বীরভঙ্গপুরের থানায় জমা রাখা ফাউন্টেন পেনটিতেও। সব মিলিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আপনিই সেই অপরাধী। শুধু বিভ্রান্ত হয়েছিলাম চিত্রদীপ চ্যাটার্জির খোয়া-যাওয়া পিস্তল, কিংবা অলর্ক বসুর পিস্তলটির জন্য। পরে যখন জানতে পারলাম, শিহরণদাকে খুন করা হয়েছে তৃতীয় কোনও পিস্তল দিয়ে, তখনই নিশ্চিত হই, খুনি চিত্রদীপ, বনানী বা অলর্ক নয়, অন্য কেউ।

বলে একমুহূর্ত থামল গার্গী, আচ্ছা, মি. ইনস্পেক্টর, আপনি একটু দেখবেন মন্দার মিত্রের ডটপেনটি? আর এ বাড়িতে সিঁড়ির পাশে পড়ে থাকা পিস্তলটিতে ক'টা কার্তুজ আছে?

মন্দার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সবাইকে আশ্চর্য করে তুষারশুভ্র মিত্র তার পকেট থেকে বার করলেন যে কলমটি, তাতেও দাঁতের দাগ।

পিস্তলের চেম্বার খুলতে দেখা গেল, তাতে তিনটি গুলি কম। সম্ভবত শিহরণ হত্যার পর অলর্ক বোসকেও ছোড়া হয়েছিল আর একটি গুলি। এছাড়া আজ আর একটি।

গার্গী বলে উঠল, তাহলে মন্দার মিত্রের সত্যিই দুর্ভাগ্য। অমন বিশাল সম্পত্তির অর্ধেক মালিকানা কিন্তু তাঁরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু অতিরিক্ত উত্তেজনায় ভোগেন বলে তাঁকে খেসারত দিতে হল আজ। শেষপর্যন্ত অলর্ক বোসই জিতলেন।

অলর্ক বোস উঠে দাঁড়াল সেইমুহূর্তে, তার সেই ভুবন-ভোলানো হাসি ছড়িয়ে বলল, এখনও পুরোপুরি জিতিনি কিন্তু। আই ওয়ান্ট ডোনা চ্যাটার্জি অ্যাজ মাই এক্সক্লুসিভ—

pathagar.net

হলুদ খামের রহস্য

pathagar.net

উৎসর্গ

অরুণ আর মানা-কে

রচনাকাল : জুলাই ১৯৯৭—অক্টোবর ১৯৯৮
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৯, মাঘ ১৪০৫

pathagar.net

লেখকের কথা

রবিবাসরীয়তে 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুণী গোয়েন্দা গার্গীর নাম ছড়িয়ে যায় বাঙালি পাঠকমহলে। 'ঈর্ষা' সিরিয়াল দূরদর্শনে প্রচারিত হতে আরও বিখ্যাত হয়ে ওঠে গার্গী। এর পর 'ধূসর মৃত্যুর মুখ' রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত হতে শুরু করে। সে সময় বহু পাঠক-পাঠিকা জানতে চেয়েছিলেন, এটি 'ঈর্ষার সবুজ চোখ' এর পরবর্তী খণ্ড কি না। তার আগেই অবশ্য 'বহে বিষ বাতাস' প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেটি অনেক পাঠক-পাঠিকা পড়ে উঠতে পারেননি বলেই এ হেন প্রশ্নের অবতারণা। আসলে সব ক'টি রহস্য-উপন্যাসই গার্গীর এক-একটি তদন্তের ফসল। তবে প্রথম তিনটি কাহিনীতে গার্গী নিজেই জড়িয়ে পড়েছিলেন খুনের ঘটনার সঙ্গে। বলা যায় নিজেকে বা নিজের পরিচিত কাউকে বাঁচাতে প্রায় বাধ্য হয়েই তাকে তদন্ত করতে হয়েছিল প্রতিবার। কিন্তু এই চতুর্থ উপন্যাস 'হলুদ খামের রহস্য'-এ গার্গী প্রায় একক প্রচেষ্টায় নিজে সম্পর্কিত নয় এমন খুনের ঘটনা তদন্ত করেছে ও সমাধান করেছে বেশ অভিনব উপায়ে। অতঃপর একজন তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দা হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে পুলিশ মহলে।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

pathagar.net

প্যারাডাইস প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মতো একটা ভারী দায়িত্ব বহাল হওয়ার পর গার্গীর প্রতিটি মুহূর্ত কাটে ব্যস্ততায়, ব্যস্ততায় এবং ব্যস্ততায়। প্রতিদিন অফিসে ঢোকে তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা। বেরোয় যখন, সামান্য গুটিকয় অফিসার, পি এ ও কয়েকজন বেয়ারা হেল্পার আর কেউই থাকে না এই স্বর্গের সলতেটি জ্বালিয়ে রাখতে। প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি মানেই সমস্ত অফিসে ফল্গুর মতো প্রবাহিত একটা চাপা টেনশন। যেন দম ফেলার ফুরসতই নেই কারও।

এহেন ব্যস্ততম অফিসে গার্গীর প্রথম ঘন্টাটা কাটে কিছু জরুরি কাগজপত্র ও ডাকের ট্রে নিয়ে। কত রকমের চিঠিই যে আসে তার কাছে! তাতে বিষয়ের যেমন বৈচিত্র্য, তেমনই লেখার ধরন। এলাহাবাদ থেকে আসা এরকমই একটি রঙচঙে প্যাডে লেখা চিঠিতে সবে গাহন করছে গার্গী, হঠাৎই সায়নের হন্তদন্ত প্রবেশ তার চেম্বারে।

গার্গী উঠে দাঁড়িয়ে বাও করল, বসুন চেয়ারম্যান সাহেব।

সায়ন অবশ্য নিছক আড্ডার সন্ধানে আসেনি তার চেম্বারে। তার মগজে সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছে কত সব অভাবনীয় ভাবনা। আসলে লখনউ থেকে ফেরার পর হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সায়ন। কোনও ভূমিকা না করেই আজ গার্গীকে বলল দ্যাখো, অনেকদিন নতুন কোনও প্রোডাক্ট মার্কেটে ছাড়া হয়নি। লোকে ভাববে, প্যারাডাইস প্রোডাক্টস নামের কোম্পানিটা একেবারে এক জায়গায় থেমে আছে। কোনও ডাইভার্সিফিকেশন নেই, নতুন সাবানও নামাচ্ছে না। নিশ্চয় ওদের ম্যানেজমেন্ট ফিনিশড।

বিয়ের অল্প সময়ের মধ্যেই সায়নকে মোটামুটি চিনে ফেলেছে গার্গী। আগে যখন বাইরে থেকে দেখত, তার চোখে সায়ন ছিল এক সফল, ব্রিলিয়ান্ট এক্সিকিউটিভ। যখন ঘরনি হিসেবে দেখল, সায়নের মধ্যে আবিষ্কার করল সরল, নিজের সম্পর্কে ভারী উদাসীন, আলাভোলা এক স্বামী। এখন প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে দেখছে, সায়ন অসম্ভব কাজ পাগল, কোম্পানির প্রোডাকশন আর সেল নিয়ে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তিত। সেই কোম্পানির-অন্ত প্রাণ চেয়ারম্যানের দিকে চোখ ন্যস্ত করে বলল, তাহলে কী করতে চাও?

—একটা নতুন আইডিয়া এসেছে মাথায়।

—আইডিয়া ! সে তো সারাক্ষণ তোমার মাথায় পাক খাচ্ছে। চরকির মতো ঘোরাচ্ছে নিরন্তর।

—না, এবার সিরিয়াসলি প্রোডাক্শনে নামব। একটা মারমার-কাটকাট প্রোডাক্ট লঞ্চ করব যা দেখে অন্য কোম্পানিগুলো আর থই খুঁজে পাবে না।

গার্গী সায়নের স্বপ্নাতুর, স্মার্ট চোখ দুটো ভাল করে পড়ল, আইডিয়াটা কী তা বলবে তো?

সায়ন সত্যিই ঘোরের ভেতর ছিল, এতক্ষণের আলাপচারিতা ছেড়ে ধাঁ করে ল্যাণ্ড করল গার্গীর সামনে, হ্যাঁ, তোমাকেই প্রথমে আইডিয়াটা শোনাই। ধরো, মার্কেটে এখন নানান কোম্পানি বহু রকমের সাবান ছেড়েছে। সবই মধ্যবিত্ত সংসারে অল্প বাজেটের কথা মাথায় রেখে। তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে দাম বেঁধে রেখেছে সাবানগুলোর। কিন্তু ধরো, যদি এমন

pathagar.net

একটা সাবান তৈরি করি, একটু কস্টলি হবে, সাইজেও একটু বড়, তাতে মেশানো থাকবে চাঁপা ফুলের গন্ধ, রঙও হবে চাঁপা ফুলের, অল্প সাবানেই বেশি ফেনা হবে, ফলে চলবেও অনেক দিন, তার বিজ্ঞাপনে লেখা থাকবে 'কেবলমাত্র স্নান বিলাসিনীদের জন্য, তাহলে কেমন হয়?

সায়নের ভাবনাটা মাথার ভেতরে কিছুক্ষণ রোল করে গার্গী বলল, সাবানের দামটা একটা ফ্যাক্টর, কত দাম হবে সাবানটার?

—ধরো চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকা।

গার্গী মুহূর্তে নস্যাৎ করতে যাচ্ছিল সায়নের আইডিয়াটা বলতে যাবে, উঁহু চলবে না। আগে মার্কেট রিসার্চ করাও। তার আগেই সায়ন বলল দ্যাখো গার্গী চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকাটা এখন কোনও ফ্যাক্টরই নয়। নেই নেই করেও কিছু মধ্যবিত্ত ঘরের লোকও ধাঁ ধাঁ করে অনেক পয়সা করে ফেলছে। তাদের ঘরে মেয়ে বউরা তো বটেই, উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরেও কসমেটিক্স্ হেয়ার ফার্টিলাইজারে বহু পয়সা ব্যয় হয় এখন। একটা বিউটি পার্লারে গিয়ে মেয়েরা এক ঘন্টার রূপ-পরিচর্যার কত বিল দিয়ে আসে সেটাও নিশ্চয় তোমার অজানা নয়। আমার এই নতুন সাবানটা হবে সারাদিন ফুলেল হয়ে থাকার এক আশ্চর্য উপকরণ। স্নানবিলাসিনী মেয়েরা এমন একটা মনের মতো সাবান পেলে অনায়াসে—

গার্গী বুঝে ফেলল, সায়ন অনেক অঙ্ক করে, মার্কেট অ্যানালিসিস করে তবেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এখন গার্গীর সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে চাইছে, কাজে নামবে কি নামবে না। গার্গী অবশ্য জানেও সায়ন একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে সেখানে থেকে তাকে ফেরানো কঠিন। হেসে বলল, সে না হয় একটা ভেঞ্চার নিতেই পারো। কিন্তু তুমি এখন প্রোডাকশন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে, ক' সপ্তাহ লাগবে তার ঠিক নেই। এত এত প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছে মার্কেটিঙের, প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের, নতুনভাবে ক্যাম্পেনের, সেগুলো কে দেখবে?

সায়নের ঘোরে হঠাৎ কেউ জোরে ঝাঁকুনি দিলে সে বিভ্রান্ত হয় বরাবর। গার্গীর কথা যেন তার মগজে ধাক্কা খেয়ে রিবাউণ্ড করল, তার মানে?

—মানেটা খুব সহজ। গত কয়েক মাসে এ রাজ্যে ও-রাজ্যে ঘোরাঘুরি করে প্রচুর অর্ডার জোগাড় করেছে। এই সেদিন লখনউ গিয়েও কত ছোটাছুটি করলে কোম্পানির সেল বাড়ানোর জন্য। তাতে এত এত অর্ডার এসেছে তোমার কোম্পানিতে যে, মার্কেটিং হিমশিম খাচ্ছে। সামনেই এটা ওয়ার্কশপ তাতে হাজার ঝক্কি। সাত একজিবিশন—

সায়ন আবারও ঝাঁকুনি খেল, 'তোমার কোম্পানি' কথা বললে, তার মানে?

গার্গীর ভ্রুকুটি তার দৃষ্টি ছুঁয়ে রাখে সায়নের চোখ, আজ কোন সমুদ্রে ডুবে আছে বলো দেখি? আমার কথা কি সব ট্যান হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার মগজের সাত মাইল দূর দিয়ে?

—ট্যান! সেটা আবার কোন শব্দের কোড!

গার্গী হেসে ফেলে বলল, ট্যানজেন্ট। আমার কথা আর আপনার মগজে সেঁধুচ্ছে না, স্যার। ট্যানজেন্টর মতো মগজের ধার ঘেঁষে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মানেটা সেঁধায় সায়নের গভীরে, গম্ভীর হয়ে বলে, কোম্পানিটা শুধু আমার নয় আপনারও।

—সে না হয় আমারও। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব, আপনি মার্কেটিঙে নজর দেওয়ার পর থেকে হু-হু করে চাহিদা বেড়েছে কম্পানির প্রোডাক্টের। আপনি নিজেই তার মোকাবিলা করছিলেন এতদিন, এখন সেই চাহিদা সমুদ্রে আমাকে ভাসিয়ে আপনি এখন উৎপাদন সমুদ্রে অন্তরিন হলে কী করে সামলাব আমি? অঙ্কটা তখন একটু একটু শিখেছিলাম, কিন্তু অর্থনীতি তো আমার সাবজেক্ট নয়।

pathagar.net

সায়নের কাছে এতক্ষণে খোলসা হল সমস্যাটার আসল চেহারা। বেশ মোলায়েম হয়ে গেল তার স্বর, স্যরি, এম. ডি. সাহেব সেটা ভাবিনি। তবে তুমি সামলে নিতে পারবে ঠিক। হায়ার ইকোনমিক্স শুধু অঙ্ক আর অঙ্ক। তোমার কাছে এটা কোনো সমস্যাই নয়। তাছাড়া তোমার আদেশ কোম্পানির প্রতিটি কর্মীর কাছে বেদবাক্য। তুমি কয়েকদিন মার্কেটিং উইঙে গিয়ে বসলেই দেখবে ম্যাজিকের মতো লোডেড ট্রাকগুলো রওনা হয়ে যাচ্ছে চারদিকে। আর এগজিবিশনের ফর্মুলাও তোমার জানা। ফরমুলা অ্যাপ্লাই করলেই দেখবে—

গার্গী দুষ্টু দুষ্টু হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, বেশ অয়েলিং করতে শিখেছ তো! যাক্ স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেব যদি তার ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে অয়েলিং করেন—

এই সংলাপ ফার্স্ট আওয়ারের। অতঃপর গার্গী গাহন করতে নেমেছিল তার অফিসের হাজারো ঝক্কির অতল গভীরে। লিমিটেড কোম্পানির সমস্যা তো একটা নয়, লক্ষ লক্ষ। সেই লক্ষ ভাবনার ভেতর নিহিত থাকতে থাকতে হঠাৎ বিকেলের দিকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হল তার। হাই উঠল পরপর দু'বার, মনে হল এহেন কর্মসমুদ্র থেকে একটু কি ছুটি নেবে আজ?

কদিন ধরেই শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না গার্গীর । অনেকক্ষণ টানা কাজ করলে একটা ক্লান্তির ছাপ পড়ে চোখেমুখে। হাই ওঠে, হঠাৎ ঘুম পেয়ে যায়, ম্যাজম্যাজ করে শরীর। আসলে লখনউ থেকে ফেরার পর হঠাৎ অফিসে কাজের চাপ এত বেড়ে গেল যে, রোজই বাড়ি ফিরতে সাড়ে সাতটা আটটা। গতকাল ফিরেছিল রাত দশটা নাগাদ। সায়নের পাল্লায় পড়লে গোটা অফিস খাটতে খাটতে বেদম। নিস্তার নেই গার্গীরও। আজ বিকেলের দিকে মাথা ঝিমঝিম করতেই হঠাৎ ফনোকম তুলে পটাপট বোতাম টিপল, ওদিকে কৌতুকস্নিগ্ধ সায়ন, হ্যালো , এম. ডি. সাহেব—

—শরীরটা ভাল লাগছে না চেয়ারম্যানসাহেবের। আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরব। ওপাশে মুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সায়ন, তার গলার উৎকণ্ঠার ঝড়, কেন, কী হল, গার্গী। ডাক্তারকে ফোন করে দেব?

গার্গী হেসে তাকে আশ্বস্ত করে, আরে না, না, ঠিকই আছি। ভাবছি, একটু আগে বাড়ি ফিরে বিশ্রাম নি। কয়েকদিন পর পর এত প্রেশার গেল কাজের! তারপর সামনে আবার—

—যা বলেছ। আমিও তো ভাবছিলাম তোমাকে বলব, আজ বিশ্রাম নিতে। তবু তোমার মতো একজন নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী, উদ্যোগী ম্যানেজিং ডিরেক্টর পেয়েছিলাম বলে আমার কাঁধে এখন যথেষ্ট কম লোড।

গার্গী হাসতে হাসতে বলল, কী ব্যাপার আজ! ডেল কার্নেগি অ্যাপ্লাই করছ নাকি? যাই হোক, চেয়ারম্যান সাহেবের কাছ থেকে ঘন ঘন এমন ক্যারেকটার সার্টিফিকেট পেয়ে খুব ধন্য মনে করছি নিজেকে—

বলে গার্গী ফনোকমের রিসিভার নামিয়ে রেখে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল অফিসের বাইরে। গাড়ি নিয়ে তার জন্য নিচে তৈরিই ছিল রতন। গার্গী পেছনের সিটে উঠে বসতেই সে পলকের মধ্যে সরু রাস্তার ভিড় কাটিয়ে এসপ্ল্যানেড ইস্টের প্রশস্ত অথচ ভিড়াক্রান্ত রাজপথে। বিকেল চারটের কাছকাছি। ঝলসানো রোদ থেকে চোখদুটো বাঁচাতে গার্গী রোদচশমাটা পরে নিল দ্রুত। জুন মাসের এই দাবদাহের জ্বলন্ত দিনগুলিতে সব মানুষেরই চাতক প্রতীক্ষা, কখন বর্ষাদেবী একটু সদয় হয়ে ভিজিয়ে দিয়ে যাবেন পৃথিবীর ফোস্কাগুলিতে। এমনকী রাস্তার পিচগুলোও গলে একশো। কখন গাড়ির চাকাগুলোকে ভালবেসে গ্রাস করে নেবে এই পিচসমুদ্র তার ঠিক নেই। লাল লাইট অতিক্রম করতে করতে ভিড়ের ভেতর সাবধানে

pathagar.net

চালাচ্ছিল রতন, তবু তার স্পিড বিপদসীমার বেশ বাইরে। এসপ্ল্যানেড ইস্ট থেকে ল্যান্সডাউনে পড়তে পনেরো মিনিটও সময় নিল না। তবে বেশিক্ষণ লাল আলোর চোখরাঙানি সহ্য করতে হয়নি এই যা রক্ষা।

মাত্র আর কয়েক মিনিট গেলেই তাদের 'ব্লু-ওয়াণ্ডার' বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটটির কবোষ্ণ আমন্ত্রণ, ভাবনাটা দূর আকাশে একটা চিলবিন্দুর মতো চক্কর দিচ্ছিল তার মগজে, কিন্তু এই শেষদুপুরে —বিছানার সেই মধুর আরাম বোধহয় তার কপালে নেই। ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছে যে চারতলা বিয়েবাড়িটা এতদঞ্চলে ভারী বিখ্যাত, তার একটু আগেই সরু রাস্তার ভেতর 'ভীমপল্লশ্রী নামে একটি নতুন ছ'তলা ফ্ল্যাটবাড়ি হয়েছে, তার সামনে বেশ ভিড় দেখে গার্গী বলে উঠল, দাঁড়াও তো রতন।

তৎক্ষণাৎ মেন রাস্তার ওপর রতনের বাড়ি স্থাণু। শুধু যে ভিড় দেখেই গার্গী গাড়ি দাঁড় করাতে বলল তা নয়, তার সহসা নজরে পড়েছে দু দুটো পুলিশের জিপ ফ্ল্যাটবাড়িটার গেটের সামনে। জিপের পাশে দীর্ঘদেহী পুলিশ অফিসারটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হাতের ঢাউস ডায়েরিটিতে সযত্নে কিছু নোট করেছেন, তিনি আর কেউ নন, দেবাদ্রি সান্যাল।

থানা থেকে সি. আই ডি দপ্তরে বদলি হওয়ার পর থেকে পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের কাজের চাপ খুবই বেশি। কলকাতায় ইদানীং ডাকাতি, রাহাজানি, ব্ল্যাকমেলিং, খুন ইত্যাদি ছত্রাকের মতো যত্রতত্র ঘটে যাওয়াতে রাতদিন ছোটাছুটি করতে হচ্ছে তাঁকে। লখনউ থেকে ফেরার পর একদিন গার্গীকে ফোন করে দীর্ঘক্ষণ টেলি-আলাপ করেছেন তাঁর এই প্রবল ব্যস্ততার চিত্রটি বোঝাতে। আজ তাঁকে হঠাৎ এহেন ভিড়ের মধ্যে দেখে গার্গী গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগোল। দেবাদ্রির কাছে গিয়ে তার রোদচশমা খুলল, কী ব্যাপার, মিঃ সান্যাল, এগেইন মিসহ্যাপ?

দেবাদ্রি হঠাৎ গার্গীকে এভাবে ম্যাজিকের মতো আর্বিভূত দেখে চমৎকৃত, মুখে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বলল, আরে দেখুন না কী স্যাড্। আমাদের এক কলিগ মাত্র ক'মাস হল নতুন ফ্ল্যাট কিনে উঠে এসেছে। আজ দুপুরে তাঁর স্ত্রী বিনীতা রায় সেই ফ্ল্যাটের ভেতরে ব্রুটালি মার্ডারিড।

গার্গী চমকে উঠে বলল, সে কী! কীভাবে!

দেবাদ্রি হেসে বললেন, সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন। আমাদের কলিগ সত্যব্রত রায়কে খবর দেওয়া হয়েছে, সে এসে গেলে হয়তো কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

—মিঃ রায়, মানে আপনাদের কলিগ এখন কোথায়?

—সে তো দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া করে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পুলিশ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্সে গিয়েছিল। সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটের কনফারেন্স করে আমাদেরই এক বড় সাহেবের সঙ্গে সল্টলেকে গেছে। তার মধ্যে দুপুরে এই কাণ্ড।

—তাই নাকি! ফ্ল্যাটে সেসময় আর কেউ ছিল না?

—ছিল না বলেই মনে হচ্ছে, মিসেস চৌধুরী । এসব ক্ষেত্রে বাড়ির পুরানো চাকর বা ঝি-দের যোগসাজস থেকে থাকে সাধারণত। সেই অ্যাঙ্গেলটাও খতিয়ে দেখছি আমরা।

—ছিল না কি কেউ?

—অন্য ফ্ল্যাটে যারা থাকে, তাদের দু-চারজনকে এর মধ্যে জিজ্ঞাসা করে যা জানা গেছে, তাতে সে ধরনের কার্যকারণ একেবারেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। কিন্তু সত্যব্রত না আসা

পর্যন্ত কোনও কিছুই পরিষ্কার হচ্ছে না আমাদের কাছে। তবে মার্ডারের ধরন দেখে দুটো ব্যাপার পরিষ্কার, এক খুনি মিসেস রায়ের, মানে যিনি মার্ডারড হয়েছেন তাঁর পরিচিত। দরজায় আইহোল থাকা সত্ত্বেও মিসেস রায় কলিংবেলের শব্দ পেয়ে সে কারণেই দরজা খুলে দিয়েছিলেন। দুই, খুন হওয়ার আগে তিনি যথেষ্ট ধস্তাধস্তি করেছেন খুনির সঙ্গে।

দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে গার্গী যখন এহেন আলাপচারিতায় ব্যস্ত, ঠিক সেসময় পুলিশের আরও একটা জিপ প্রবল গর্জন তুলে এসে দাঁড়াল সরু লেনের মুখে। তার ভেতের থেকে প্রথমে একজন খাকি উর্দিপরা স্লিম চেহারার পুলিশ অফিসার, তারপর গিয়ে রঙের শার্ট আর ডিপ নেভি ব্লু রঙের প্যান্ট পরা একজন বছর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের স্বাস্থ্যবান যুবক নামলেন কেমন উদভ্রান্তের মতো। তাঁর হাতের ঝকঝকে অ্যাটাচিটি সেই স্লিম চেহারার পুলিশ অফিসারটি নিজের হাতে নিয়ে বললেন, আসুন—

তারপর দেবাদ্রি সান্যালের কাছে এসে বললেন, চলুন স্যার।

দেবাদ্রি তাদের দুজনের সঙ্গে ফ্ল্যাটের দিকে রওনা দেওয়ার উদ্যোগ করতেই গার্গী সামান্য ইতস্তত করে বলল, কিছু যদি মনে না করেন, মিঃ সান্যাল, মে আই অ্যাকমপ্যানি ইউ?

দেবাদ্রি তাঁর সঙ্গী অফিসারদের কথা ভেবেই বোধ হয় দ্বিধা করলেন এক মুহূর্ত , তারপর বললেন, আসুন না। আপনার পর্যবেক্ষণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই অনুমান ক্ষমতাও। আপনার চোখে বিশেষ কিছু ধরা পড়তে পারে ফ্ল্যাটের ভেতরটায়।

এসব মুহূর্তে যা হয়, গার্গীর মগজের ভেতর ততক্ষণে পার হয়ে যাচ্ছে কিছু অনুমাননির্ভর ফ্লিমের রিল। কলকাতার যত্রতত্র এখন আকাশচুম্বীর ঔদ্ধত্য, তার এখানে-ওখানে গজিয়ে ফুঁড়ে ফেলতে চায় অত বড় আকাশটার নীল চাঁদোয়া। না কি আকাশটাই শুয়ে আছে পর পর আকাশচুম্বী দিয়ে তৈরি এক বিশাল শরশয্যায়। সেই আকাশচুম্বীগুলোয় যারা এ ফ্ল্যাটে ও ফ্ল্যাটে বসবাস করে, তারা কলকাতার এক অভিনব প্রজন্ম। তারা সেই ছোট ফ্ল্যাটটাকেই মনে করে পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে তারাই একমাত্র বাসিন্দা। আকাশচুম্বীটার অন্য ফ্ল্যাটগুলিতে, কিংবা আকাশচুম্বীর বাইরে যেসব মানুষ বাস করে। তারা যেন সব অন্য গ্রহের বাসিন্দা। প্রায়শ কেউ কাউকে চেনে না, বা চিনতে চায়ও না। এহেন আত্মসর্বস্বতার কারণেই খুব দ্রুত একা, আইসোলেটেড হয়ে যায় পরিবারগুলি। বিপদেও পড়ে ঘন ঘন। কেউ বিপদে পড়লে বেশির ভাগ সময়েই ছুটে সাহায্য করতে আসে না বাকিরা।

কখনও এধরনের ফ্ল্যাটে সেল্‌সম্যান সেজে এসে দুপুরে কড়া নাড়ে। সমূহ বিপদ ছোট পরিবার সুখী পরিবারে। দুপুরের দিকে বাড়ির কর্ত্রী ছাড়া প্রায় কেউই থাকে না। খুব বেশি হলে কর্ত্রীর সঙ্গে কাজের মেয়েটি। খুব দুর্লভ ক্ষেত্রে বৃদ্ধা বিধবা মা বা শাশুড়ি।

কখনও ঝাড়ুদার আসে, কখনও টেলিফোন সারাইয়ের ছুতো করেও—

লিফট ওপরে ওঠার মধ্যেই যুবক লিফটম্যানটিকে ভাল করে নিরিখ করে নিল গার্গী। বয়স চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে। ব্যাকব্রাশ করা একমাথা চুল, পেছনদিকে চুলের ঝুল বেশ অনেকটাই। রঙ শ্যামবর্ণ, ভুরুর ওপর একটা কাটা দাগ, চোখ দুটো গোল-গোল। কালো পুরু ঠোঁট। একটু বেঁটে, কিন্তু গোলগাল চেহারা। পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে গার্গীকে দেখে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল যুবকটি।

গার্গী তাকে খুঁটিয়ে দেখে খুবই আস্তে দেবাদ্রিকে বলল, হ্যাভ এনি ইন্টারোগেটেড হিম?

দেবাদ্রি গলা নামাল, হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট অ্যাট দ্যাট রেলেভেন্ট টাইম।

—ও, গার্গীর মাথায় তৎক্ষণাৎ পাক খেয়ে গেল, কেন অ্যাবসেন্ট, তার এই অনুপস্থিতির সঙ্গে মার্ডারারের বা মার্ডরারদের কোনও যোগাযোগ আছে কি না। সে সময় কোথায় গিয়েছিল লোকটি বা কী কারণে লিফট ছেড়ে অন্য কাজে গিয়েছিল ইত্যাদি।

এই অনুপস্থিতির সঙ্গে মার্ডারার বা মার্ডারারদের কোনও যোগাযোগ আছে কি না। সে সময় কোথায় গিয়েছিল লোকটি বা কী কারণে লিফট ছেড়ে অন্য কাজে গিয়েছিল ইত্যাদি।

সে ইন্টারোগেশনের ভাবনা আপাতত মনের ভেতর চাবি দিয়ে রাখতে হল গার্গীকে, কেননা লিফটি ততক্ষণে ব্রেক কষে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট তলে।

দুই

পুলিশ ইন্সপেক্টর সত্যব্রত রায়ের ফ্ল্যাটটা চারতলার ওপরে। লিফটে চড়ে আরও তিন-চারজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে গার্গীও উঠে এল বেশ আধুনিক ডিজাইনের তিনের দুই নম্বরের ফ্ল্যাটটিতে। নতুন ফ্ল্যাট, দেওয়ালে প্রায় টাটকা রঙ, সিলিঙে ঝকঝকে ওয়ালপেপার, ফ্ল্যাটের সর্বত্রই একটা তকতকে পরিচ্ছন্নতা। সত্যব্রত রায় দুঃসংবাদটা কিছুক্ষণ আগেই পেয়েছেন, তাতে এতটাই শক্‌ড্ যে, লিফট থেকে নামার সময় শরীরটা টলে গেল সহসা। পায়ের একটা স্যাণ্ডেল খুলে যেতেই সামনে নিয়ে আবার পরে নিলেন সেটা। কিন্তু দু-চার পা এগিয়েই হঠাৎ উবু হয়ে বসে পড়লেন ফ্ল্যাটের দরজার সামনে। হাউমাউ করে বলে উঠলেন, আমি এ দৃশ্য দেখতে পারব না। প্লিজ, আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে চলুন। ক'ঘণ্টা আগেই যে আমাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিল, তার মৃত্যু আমি কীভাবে দেখব।

দেবাদ্রি সান্যাল তার পিঠের কাছে ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে বললেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, সত্য। কিন্তু আমাদের ফর্মালিটিজগুলো তো করতে হবে। প্লিজ, কো-অপারেট উইথ আস্।

তার বাহু ধরেই টানতেই সত্যব্রত রায় উঠে দাঁড়ালেন আবার। তার দু'চোখ দিয়ে তখন দরদর করে জল নামছে। ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে সেই বীভৎস দৃশ্যটি একলহমা দেখেই চোখ ঢাকলেন হাত দিয়ে, ইট'স অ্যাবসার্ড। এ আমাকে কী দৃশ্য দেখালেন, সান্যাল।

টিউবের ঝকঝকে আলোর গার্গীও তখন ভেতরের ঘরের মেঝের পড়ে থাকা সেই সাংঘাতিক দৃশ্যটা দেখছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সাতাশ আঠাশ বছরের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যুবতী হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে প্রায় রক্তের পুকুরে। মাথার পেছন দিকটা ফেটে-হাঁ হয়ে আছে. গলার কাছেও ধারালো অস্ত্রের কোপ। হলুদ সিল্কের শাড়িটা কোমর থেকে নিচে লুটোচ্ছে রক্তের ভেতর। গায়েও সংক্ষিপ্ত জামা। তাতে তার শরীরের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছে।

আশেপাশে আরও আঁতিপাতি নজর চালিয়ে গার্গী দেখল, ঘরের বিছানা প্রচণ্ড এলোমেলো। বেড কভারটা কুঁকড়ে দলা পাকিয়ে অনেকখানি ঝুলছে নিচে। ওপাশের ডাইনিং টেবিলের ওপর ফুলদানিটা উল্টে আছে, তাতে কিছু রজনিগন্ধার ঝাড়, দু-তিনদিনের পুরোনোই সম্ভবত, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রাকার।

শো-কেসের ওপর একটা বাহারি টেবিল ক্লথ, একটা হাতঘড়ি। সে দুটো অবশ্য অক্ষত।

দেবাদ্রি সান্যাল সত্যব্রত রায়ের সেই মুহ্যমান অবস্থার মধ্যেও জিজ্ঞাসা করলেন, দেখ তো সত্য, তোমার আলমারি থেকে কিছু খোয়া গেছে কিনা।

pathagar.net

শোওয়ার ঘরের আলমারিটা হাট করে খোলা। তার ভেতর থেকে কিছু শাড়ি জামা টেনে টেনে বার করে মেঝেয় ছড়ানো। একেবারে নিচের তাকে কিছু কাগজপত্র সেগুলো এলোপাথাড়ি ঘেঁটেছে কেউ। সত্যব্রত রায় টলতে টলতে আলমারির কাছে এসে ওপরের ও নিচের তাকগুলো পর্যায়ক্রমে দেখতে দেখতে হঠাৎ জড়ানো গলায় বললেন, নিচের তাকে একটা তিন হাজার টাকার বাণ্ডিল ছিল, সেটা দেখতে পাচ্ছি নে।

—আর কিছু?

—কিছু এন. এস. সি আর কিষাণ বিকাশপত্র এই নীল বাক্সটার মধ্যে। সেগুলোও খোয়া গেছে।

—আর কিছু

সত্যব্রত রায় এবার উঠে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকের মাঝখানে একটা বন্ধ লকারের পাল্লা টেনে খুলতে চাইলেন, খোলা গেল না কেননা সেটা লক করা। তাতে নিশ্চিত হয়ে বললেন, লকারটা খুলতে পারেনি যখন গয়নাগাঁটি নিতে পারেনি মনে হচ্ছে।

—লকারের মধ্যেই গয়না ছিল নাকি?

সত্যব্রত রায় ঘাড় নাড়লেন, হ্যাঁ। কিছু ছিল।

—তবু একবার নিশ্চিত হওয়াই দরকার। লকারের চাবিটা বার করো তো, সত্য।

ঘরের কোণে একটা টেবিল আছে, সত্যব্রত রায় এগিয়ে তার ড্রয়ারটা টেনে খুললেন, একটা স্টিলের ছোট্ট বাটি উপুড় করা, সেটা উল্টে বিড়বিড় করলেন, চাবি তো এখানেই থাকে। কোথায় গেল সেটা? নিশ্চয়ই —

ঘরের আরও কয়েকটি সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজাখুজি করলেন চাবির খোঁজে, না পেয়ে আরও উদ্‌ভ্রান্ত। তারপর হঠাৎ নিজের প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একরাশ খুচরোর সঙ্গে বার করলেন একটা চাবির রিং, যাতে দুটো স্টিলরঙা ঝকঝকে চাবি ঝুলছে। হাঁপ ছেড়ে তার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট চাবিটা দিয়ে খুলে ফেললেন লকারটা। লকারের ভেতর অনেকগুলো একশো আর পঞ্চাশ টাকার বাণ্ডিল, তার সঙ্গে চার-পাঁচটা গয়নার বাক্স। নীল-লাল গয়নার বাক্সগুলো টেনে টেনে বার করে খুলে নিশ্চিত হলেন, না, আর কিছু নেয়নি।

পাশের ঘরগুলো একবার দেখে নাও, আর কিছু নিয়েছে কি না।

দেবাদ্রি সান্যাল ও অন্য পুলিশ অফিসাররা তাঁকে নিয়ে পাশের ঘরগুলো দেখতে যাওয়ার ফুরসতে, গার্গী মেঝেয় পড়ে থাকা লাশ, সেই সঙ্গে অন্যান্য ফার্নিচার, খাট বিছানা, টেবিল-চেয়ার টিপয়, এমনকী খোলা আলমারিটাও খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সহসা আবিষ্কার করল, আলমারির ভেতর শাড়ির ভাঁজে উঁকি মারছে একটা হলদে রঙের খাম। পুলিশ অফিসাররা আলমারিটা বোধহয় এখনও তন্নতন্ন করে দেখেননি, দেখলেও হলুদ খামটা বার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি এখনও। কিন্তু গার্গীর স্বাভাবিক ইনট্যুইশন তাকে প্ররোচিত করল খামটা খুলে ভেতরে কী আছে দেখতে। কিন্তু এতজনের সামনে খামটা খোলা তার উচিত হবে না ভেবেই সেবার অলক্ষ্যে সেটা বার করে ভরে ফেলল তার ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর।

প্রায় চুরি করেই খামটা আত্মসাৎ করতে চাইল গার্গী। ফলে বুকটা টিবটিব করছে তার। এতগুলো পুলিশ অফিসারের নজর এড়িয়ে এভাবে পরদ্রব্য হাতিয়ে নেওয়া।

www.boiRboi.net

সারা বাড়ি ঘুরে ডাকতেরা আর কিছুই নেয়নি। এ ব্যাপারে সত্যব্রত রায় নিশ্চিত করায় দেবাদ্রি অতঃপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন লাশ মর্গে পাঠানোর কাজে। সেখান থেকে পোস্টমর্টেম যাতে আজই করা যায় সে নির্দেশ দিলেন তাঁর অধস্তন এক মোটা, বেঁটে ধরনের পুলিশ অফিসারটিকে। সেই সঙ্গে নির্দেশও দিলেন লাশ পাঠানোর পর সত্যব্রত রায়ের ফ্ল্যাটটি সাময়িকভাবে সিল করে, দরজার বাইরে দু'জন কনস্টেবল মোতায়েন করতে। সেই সঙ্গে সত্যব্রত রায়কেও ছুটি দেওয়া হল আপাতত।

লাশ মর্গে পাঠানোর কাজটি কম ঝামেলাপূর্ণ নয়। ইতিমধ্যে ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্ট থেকে অফিসাররা এসে তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধীর ফিঙ্গারপ্রিণ্ট খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন। ফটোগ্রাফারও পৌঁছে একের পর এক ফ্ল্যাশের ঝলকানি দিচ্ছেন যাতে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে লাশের অবস্থান তুলে রাখা যায় ফিল্মে।

দেবাদ্রি সান্যাল যখন তাঁর পুলিশ কর্তব্যগুলি পালনে অতি ব্যস্ত, শোকার্ত সত্যব্রত রায় সে সময় ঝিম মেরে বসে আছেন ড্রয়িংয়ের ঝকমকে নতুন একটি সোফায়। দুটি সিঙ্গল একটি ডাবল—সোফা সেটটি আকারে ও গঠনের প্রায় সিংহাসনপ্রতিম। তাদের মাঝখানে সেন্টারটেবিলটি পুরোপুরি কাচের। সেন্টারটেবিলের ওপর একটা বাংলা ফিল্ম ম্যাগাজিন। সেখানে সত্যব্রত রায়কে একা আতঙ্কিত চোখে বসে থাকতে দেখে গার্গী এগিয়ে গিয়ে বসল তার মুখোমুখি। পুলিশ অফিসারটির মনের অবস্থা আপাতত খুবই শোকবহ তা জেনেও গার্গী আস্তে আস্তে বলল, যদি কিছু মনে না করেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

সত্যব্রত রায় কিছুটা অবাক চোখে গার্গীর দিকে। যুবতীটি কে, হঠাৎ অন্য পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর ফ্ল্যাটে কেনই বা, এ -প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই তার মনে ঘুরপাক খেয়ে গেল নিশ্চিত। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি পরিস্থিতির শিকার। ভাঙা, জড়ানো গলায় বললেন, কী?

—আপনি আজ ঠিক ক'টার সময় বেরিয়েছিলেন ফ্ল্যাট থেকে?

—সে সময় আপনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল?

—হ্যাঁ। পাঁচি ছিল।

—পাঁচি কে?

—মেইড সারভেন্ট।

—আ্র কেউ?

—না?

—আপনি কি একাই বেরিয়েছিলেন?

—না। সঙ্গে আমার মেয়ে ট্রিঙ্কা ছিল।

—ট্রিঙ্কা?

—হ্যাঁ। ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর আমি কনফারেন্সে যোগ দিতে চলে যাই অফিসে।

গার্গী এবার ভাল করে দেখল সত্যব্রত রায়কে। এখনো পুরোপুরি সন্ধ্যে হয়নি। ফ্ল্যাটে অবশ্য ঝকঝক করছে টিউবের আলো। ড্রয়িংয়ের সোফা, শো কেস, ডিভান সবই নতুন। সদ্য কেনা ফ্ল্যাটে এতসব বৈভবেব মধ্যে হঠাৎ একটা খুন এই পরিবারটির সাজানো ছকটা ওলটপালট করে দিয়ে গেল।

এরকম একটা ফ্ল্যাটে কেনা মানে উচ্চ মধ্যবিত্তদের কাছেও স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সদ্য সফল হয়েছিল দম্পতির জীবনে। বাড়ির কর্ত্রী নিশ্চয়ই তাঁর পছন্দমাফিক সাজিয়েছিলেন ফ্ল্যাটটা।

দেওয়ালের পেইন্টিং, মুখোশ হরিণের শিং, শো-কেসের ভেতর রকমারি পুতুল, শৌখিন ভালুক, উলের কুকুর— সবই সেই স্বপ্নের পৃথিবীর একটু একটু করে রূপায়ণ। হঠাৎ এক ঝড়ের দমকায় ভেঙে তছনছ এতদিনকার সব স্বপ্ন, অ্যাম্বিশন। এহেন ঝড়াহাত পরিবারের কর্তাকে এখনই জেরা করা কি যথেষ্ট অমানবিক হবে! গার্গী থমকালো একলহমা। কিন্তু কে বা কারা এই সর্বনাশটা করল তা জানতেও তো হবে।

যত শীঘ্র সম্ভব।

—আচ্ছা মিঃ রায়, ফ্ল্যাটে আপনার বা আপনার মিসেসের চেনা কারও পক্ষে কি আসা সম্ভব ছিব আজ দুপুরে?

সত্যব্রত রায় গার্গীর দিকে তাকিয়ে থাকেন অপলক। একটু অস্বাভাবিক যেন সেই তাকানো। সে দৃষ্টির অর্থ এই হতে পারে যে, 'আপনি এসব প্রশ্ন করার কে? অথবা 'প্রশ্নটা এখনই করছেন কেন?' কিংবা 'আমি তা কী করে জানব?'

গার্গী কিছুক্ষণ সময় দিল সত্যব্রত রায়কে। আবার জিজ্ঞাসা করল, একটু ভাবুন না। কোনও পরিচিত লোক এসে খুন করেছেন, না কি অপরিচিত কেউ?

সত্যব্রত রায় একটু উষ্মা মেশালেন কণ্ঠস্বর, বললেন, এতদিন পুলিশে চাকরি করে আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে বলে, ইটস অ্যা কেস অব ডেকয়িটি।

ঘরের যা অবস্থা, তাতে এ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না আমি।

—আপাতদৃষ্টিতে তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার মিসেস আইহোল দিয়ে নিশ্চয় দেখেছিলেন, বাইরের কে বা কারা কলিং বেল টিপছেন। অচেনা লোক হলে দরজা খুলতেন?

সত্যব্রত থমকে গেলেন, হয়তো গার্গীর অনুমানের সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতি মিলিয়ে নেওয়াটাই তাঁর নীরবতার কারণ। বললেন, কলকাতায় খুব সম্প্রতি অনেকগুলো ফ্ল্যাটে এ ধরনের ডাকাতি হয়েছে। যে ক'টি কেস এ পর্যন্ত পুলিশ ধরতে পেরেছে, তার প্রায় সব ক'টি ক্ষেত্রেই হয়তো বাড়ির পুরানো কাজের লোক জড়িত। অথবা প্ল্যান্‌ড ডেকয়িটি হতে পারে।

—আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেল্‌সম্যানরা কি সরাসরি ফ্ল্যাটে এসে বেল টিপতে পারে? এ-সব ফ্ল্যাটবাড়িতে দারোয়ান অথবা লিফটম্যানরা অনেক সময়ই সেলসম্যান কিংবা সন্দেহভাজন কাউকে ঢুকতে দেয় না। আপনাদের ফ্ল্যাটে কি সেলসম্যান অ্যালাউড্?

সত্যব্রত রায় একটু ভাবলেন ব্যাপারটা। গার্গীর জেরার ভঙ্গি তাঁকে হয়তো অবাক করছিল, দ্বিধার স্বরে বললেন, লিফটম্যানকে বলা আছে, দুপুরবেলা কেউ এসে যেন বিরক্ত না করে ফ্ল্যাটে। কিন্তু অনেক সময় লিফটম্যানের নজর এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে কেউ কেউ। অথবা লিফটম্যান যখন না থাকে—

—লিফটম্যান কি দুপুরের দিকে রোজই চলে যায়?

—দুপুরে দু'ঘণ্টার জন্য ছুটি মঞ্জুর করা আছে ওকে। বাড়িতে খেতে যায়।

—দুপুরে মানে কখন?

—একটা থেকে তিনটে।

গার্গী চকিতে মিলিয়ে নিল, লিফটম্যান অনুপস্থিতির সঙ্গে খুনের সময়ের কোনও সঙ্গতি আছে কি না। সম্ভবত খুনি লিফট্‌ম্যানের খেতে যাওয়ার সময়টিই ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ লিফটম্যানের অনুপস্থিতির সময়টা আগেই কয়েকদিন ধরে নোট করেছে। তারপর সুযোগ বুঝে—

pathagar.net

—আচ্ছা, এ বাড়ির পুরানো চাকরের কোনও হিস্ট্রি আছে, যার পক্ষে এই ডাকাতিটা করা সম্ভব।

—না। কারণ ফ্ল্যাটটা নতুন কেনা। কেনার পর থেকেই পাঁচি নামে একটি মেয়ে কাজ করছে আমাদের ফ্ল্যাটে। আরও অনেক ফ্ল্যাটেই সে কাজ করে অবশ্য। তবে দুপুরে আমাদের ফ্ল্যাটে খায় ও থাকে।

—কোথায় থাকে পাঁচি?

—কাছেই একটা বস্তিতে, ওর একটা বড় ছেলে। সে অবশ্য তার মায়ের খোঁজে প্রায়ই আসে আমাদের ফ্ল্যাটে। ছেলেটার চালচলন, গতিবিধি মোটেই সুবিধের মনে হয়নি। তার সঙ্গে ওয়াগন ব্রেকার টাইপের দু-একটা ছেলেও প্রয়াই ঘোরাফেরা করে।

—কী নাম পাঁচির ছেলের?

—ঘোলা।

গার্গী আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল এ ধরনের একটা বীভৎস খুন করতে হলে কতখানি ক্রিমিনাল ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকার দরকার হয়। কিংবা হয়তো মার্ডার উদ্দেশ্য ছিল না। ডাকাতি করতে ঢুকেছিল। চুপচাপ আলমারির চাবিটা দিয়ে দিলেই নিরাপদে থাকতেন মহিলা। না দেওয়াতেই ঘটে গেল বিপর্যয়। মহিলা খুব সাহসী ছিলেন নিশ্চয়। হয়তো পুলিশ-অফিসারের স্ত্রী বলেই অনেকক্ষণ লড়ছেন দুষ্কৃতীদের সঙ্গে। ঘরের ভেতর আসবাবপত্র, বিছানার চাদর, ফুলদানি সব লণ্ডভণ্ড। কার জীবনে কখন যে এমন আচমকা বির্পযয় ঘনিয়ে আসে! আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে মিসেস রায় অনুমান করতে পারেননি তিনি আর এই বিকেলবেলাটা দেখতে পাবেন না।

—আচ্ছা মিঃ রায়. আপনার যা পেশা, তাতে বহু ক্রিমিনালদের সঙ্গে টক্কর দিতে হয়। আপনার তদন্তের ফলে অনেক অপরাধীর কড়া শাস্তিও হয়েছে নিশ্চই। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় কোনও সাজা পাওয়া অপরাধী প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেয়। আবার কখনও মুখে কিছু বলে না, কিন্তু রাগ পুষে রাখে ভেতরে ভেতরে। সেরকম প্রতিশোধস্পৃহা থেকেও কোনও অপরাধী জেল থেকে বেরিয়ে এ ধরনের একটা ক্রাইম করতে পারে।

সত্যব্রত রায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়, গার্গীর বুদ্ধিমত্তার দিকে তারিফ করার দৃষ্টি ন্যস্ত করে, সে তো আমাদের প্রফেশনাল হ্যাজার্ড। ব্ল্যাক মানি খুঁজে বার করতে গত কয়েক মাস ধরে ছোটাছুটি করেছি। বড়বাজারের এক ঝুনঝুনওয়ালার বাড়ির বারান্দায় পাপোশের নিচে চোরাকুঠরি। তার ভেতর থেকে আশি লক্ষ টাকা ক্যাশ পাওয়া গেল। অথচ আমাদের টিমের কারও পক্ষে ভাবা সম্ভবই হয়নি, সেখানে এত টাকা লুকিয়ে রাখতে পারে কেউ। আমার হঠাৎ সন্দেহ হওয়াতে পাপোশটা সরাই । ঝুনঝুনওয়ালার ছেলে আমার দিকে যা চোখ করে তাকাল, যেন পারলে তখনই খুন করে। তারপর ম্যুর অ্যাভেনিউতে এক ইউ. পি. ওয়ালার গাড়ির সিটের নিচে থেকে বেরোল তিরিশ লক্ষ টাকা। বাড়ি থেকেও—

—এ দিকটাও তাহলে ভেবে রাখবেন। পরে তদন্তের সময় দরকার হতে পারে।

প্রায় দক্ষ গোয়েন্দার ভঙ্গিতে গার্গীর এতসব জেরা, উত্তরদান ও তাঁকেই খুনির সূত্র খোঁজার দায় চাপিয়ে দিতে খুবই অবাক হলেন সত্যব্রত রায়। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে তা তো বুঝতে পারলাম না।

গার্গী হেসে বলল আমি? আমি গার্গী চৌধুরি। আপাতত তার বেশি কোন পরিচয় নেই।

সত্যব্রত মুখটা হাঁ-হয়ে গেল।

pathagar.net

তিন

লাশ মর্গে পাঠানোর পর্ব শেষ করে দেবাদ্রি তখন তদন্তের খুঁটিনাটি অংশে চোখ বোলাচ্ছেন। ফ্ল্যাটের দরজা সিল করবেন বলে সংগ্রহ করলেন গালা ও দেশলাই। নতুন দুটো তালা। দুজন গার্ড রাখতে হবে রাউণ্ড দি ক্লক।

তৎক্ষণাৎ সেলুলার কথা বলে নিলেন লোকাল থানার ডিউটি অফিসারের সঙ্গে। সিল করা সময় সাক্ষী লাগবে দু-তিনজন। সেই মতো আকিঞ্চন দত্তকে ডেকে নির্দেশ দিলেন ফ্ল্যাটবাড়িটার অন্য ফ্লোর থেকে কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে আসার জন্যে।

আর এতসব পুলিশি ঝকমারির মধ্যে এনে হাজির করানো হল বাড়ির কাজের লোক পাঁচিকে। মধ্যবয়স্কা স্থূল চেহারায় মহিলা। পান খেয়ে খেয়ে ঠোঁট-দাঁত কদাকার। তাকে তার বস্তির বাড়ি থেকে ধরে এনেছেন দেবাদ্রি সান্যালের বাহিনী। তার ভয়ার্ত চোখ মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল সে তার গৃহকর্ত্রীর খুনের সংবাদে বিপর্যস্ত। তাকে বিনীতা রায়ের বীভৎস খণ্ডিত দেহটা দেখানোর সে আর একটু হলেই মূর্চ্ছা যাচ্ছিল, কিন্তু গেল না দেবাদ্রি সান্যালের প্রবল ধমকানিতে।

দেবাদ্রি তখন চোখ লাল করে, দাঁতে দাঁত চেপে বলছিলেন, খবরদার, একটাও মিথ্যে বলবে না। মিথ্যে বললে, এই যে হাতের রুলটা দেখছ, তোমার পিঠে ভাঙা হবে।

পাঁচি হাউহাউ করে উঠে বলল, বিশ্বাস করুন, বাবু, আমি এসবের কিছুই জানিনে। আমি তো একটু আগে বউদিমণিরে দেখে গেচি—

—অ্যাই চোপ চোপ, কাঁদবে না একদম। বলো তো, কে খুন করতে পারে তোমার বউদিমণিকে। তোমার চেনাশুনো কেউ গতকাল বা আজ এসেছিল এই ফ্ল্যাটে।

—না, বাবু কেউ তো আসেনি। আমি তো বেলা একটায় গেচি এ বাড়ি থেকে।

—একটায় গেছ! কেন, রোজ দুপুরবেলা তুমি তো এদের ফ্ল্যাটেই থাকো, খাও তাই না?

পাঁচি আড়ষ্টভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, রোজদিন থাকি। কিন্তু দু-একদিন আবার চলে যাই।

—কেন, চলে যাও কেন? তোমার তো থাকারই কথা।

—হ্যাঁ বাবু। কিন্তু দু-একদিন আবার বউদিমণি বলেন, যা পাঁচি, আজ বাড়ি যা—

—কেন! দেবাদ্রি ভুরু কোঁচকালেন, কেন বাড়ি যেতে বলতেন?

পাঁচি আবার ভয়ার্ত চোখে তাকায়, জানিনে বাবু।

—আবার মিথ্যে কথা! বল্ কেন যেতে বলতেন? দেবাদ্রি ক্রোধে লাল হয়ে অনায়াসে তুমি থেকে তুইয়ে নেমে এলেন পাঁচির ওপর চাপ সৃষ্টি করতে।

—আমি জানিনে বাবু।

—তুই আলবত জানিস। দেবাদ্রি হাতের রুলটা বনবন করে রোল করাতে লাগলেন দু-হাতের তালুর ভেতর, না কি তোদের বস্তি থেকে লোক আনিয়েছিলি ডাকাতি করতে। বল কে কে এসেছিল?

দেবাদ্রি হাতের রুলের অবিরাম ঘূর্ণন, তার চোখের রক্তবর্ণ চাউনি আর মুখের পেশির শক্ত ভাব দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেল পাঁচি , হঠাৎ হাউমাউ করে বলল, বউদিমণি কাউকে বলতে বারণ করে দিচ্ছিলেন আমাকে।

দেবাদ্রি তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন পাঁচির দিকে, তাহলে বল, কে এসেছিল আজ? ক'জন?

পাঁচি চোখ ফ্যাকাসে করে বলল, আজ্ঞে, মাঝে মাঝে নীলবাবু আসতেন।

—কে নীলবাবু? কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে সেসব জানিনি, বাবু। মাঝে মাজে দুপুরবেলা আসতেন। বেশ লম্বা, সোন্দরপানা দেখতে। খুব সিগারেট খান।

—কখন আসতেন?

—আজ্ঞে, দুপুরবেলা। তবে বেশির ভাগ দিন আমার সঙ্গে দেখা হতনি। বউদিমণি দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া হলি বলত, যা পাঁচি, আজ বাড়ি যা। তা কোনও কোনও দিন খেতি দেরি হয়ি যেত। সেদিন আমি বেরোবার মুখে কলিংবেল বাজত। দরজা খুলে দেখতি পাতাম, নীলবাবুকে। চোখে কালো চশমা মুখে সিগারেট।

দেবাদ্রি ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ শক্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন পাঁচির দিকে, তারপর আবার বললেন, তুমি ঠিক বলছ, নীলবাবু কোথায় থাকে তুমি জানো না?

—না বাবু, মা কালীর দিব্যি।

—আজ কি তোমাকে বাড়ি যেতে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ বউদিমণি তখন রান্নাঘরে ডাল সাঁতলাচ্ছেন। ডেকে বললেন, পাঁচি আজ দুপুরে খেয়ে চলে যাবি।

—তখন দাদা বাড়িতে ছিলেন?

—হ্যাঁ। উনি তখন বাইরের ঘরে বুটজুতো পালিশ করছিলেন।

পাঁচিকে কড়া চোখে নিরীক্ষণ করে অতঃপর তাকে নজরে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন দেবাদ্রি সান্যাল। গার্গী এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে দেবাদ্রির জেরার ধরন ও পাঁচির উত্তর শুনে অনুমান করছিল, কতখানি সত্যি বলছে পাঁচি, কতখানিই বা মিথ্যে।

পাঁচি পটভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে আস্তে আস্তে দেবাদ্রি সান্যালকে জিজ্ঞাসা করল, কী মনে হল আপনার পাঁচিকে?

দেবাদ্রি চিন্তিত মুখে বললেন, এই নিরীহ মেয়েমানুষগুলোও অনেক সময় হাড় শয়তান হয়।

—ওর একটা ছেলে আছে, তার নাম ঘোলা। তার কিছু ইয়ার বন্ধুও আছে, যাদের ব্যাকগ্রাউণ্ড তেমন ভাল নয়।

—তাই নাকি! আজ রাতেই সব ক'টাকে তুলে আনছি ওদের বস্তি থেকে। একটু রগড়ালেই সব গুড়গুড় করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু এই নীলবাবুটি আবার কে?

চার

ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের জাঁদরেল পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন নীলবাবু সম্পর্কিত এপিসোডটি নিয়ে। সত্যব্রত রায় তাঁর একজন জুনিয়র কলিগ। তার ফ্ল্যাটে মাঝেমধ্যে দুপুরের দিকে তারই অনুপস্থিতিতে একজন নীলবাবু আসতেন তার যুবতী স্ত্রীর কাছে, এ -তথ্যটা ভারি অবাক লাগছে তাঁর।

সত্যব্রত ঘটনাটা জানে কি না, কিংবা নীলবাবু তাদের কোনও আত্মীয় কি না এ খবরটা জেনে নেওয়াও ভারি জরুরি তাঁর কাছে। হয়তো চেনা কেউ। নিকট আত্মীয় হতে পারেন, অথবা বন্ধু। বন্ধু হলে কার বন্ধু সত্যব্রতের, না কি তার স্ত্রীর বিনীতার। তবে সম্পর্কে যা-ই হোক না কেন, ঘোর দুপুরে যে-মহিলা একা থাকেন তার কাছে একজন পুরুষের নিয়মিত

pathagar.net

যাতায়াত কোনও ক্রমে সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। সেই যাওয়ার কথাও আবার কাউকে বলা বারণ। অর্থাৎ ঘটনাটার কোথাও একটুকরো 'কিন্তু' আছে। একটা ছোট্ট ক্লু পাওয়া গেল। সেটা এই মুহূর্তে সত্যব্রতকে জিজ্ঞাসা করে তার শোক আরও বাড়াতে চাইলেন না দেবাদ্রি। স্ত্রী খুন হয়েছে, তাতেই সত্যব্রত প্রবলভাবে শক্‌ড। এখন তার চোখের দৃষ্টি ভাসা ভাসা। জড়িয়ে যাচ্ছে গলার স্বর। কথা কেঁপে যাচ্ছে। এখনই যদি কোনও এক 'নীলবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করা যায়—

স্ত্রীচরিত্র দেবতারাও নাকি বুঝতেন না ঠিকঠাক। সত্যব্রতও কি জানত এরকম কোনও নীলবাবু এসে একটু একটু করে নীল বিষ ঢেলে দিচ্ছিল তার আপাতসুখী সংসারে!

সত্যব্রতকে আপাতত জেরা করবে কি করবে না সে সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রেখে দেবাদ্রি চোখ ফেলালেন লিফটম্যানের দিকে। বছর চব্বিশ-পঁচিশে গাঁট্টাগোট্টা যুবক তখন তার লিফট চালানোয় ক্ষান্ত দিয়ে চারতলার ব্রেক কষেছে হঠাৎ। লিফট দাঁড় করিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে রায়বাবুদের ফ্ল্যাটে। তাকে অমন কৌতূহলপ্রবণ দেখে দেবাদ্রি ছোটখাটো একটা ধমক দিলেন, অ্যাই শোন, কী নাম তোর?

সত্যব্রত ড্রয়িং-এ তখনও স্তব্ধবাক হয়ে বসে। সেদিকে একবার দৃষ্টি ফেলে তার চোখের আড়ালে নিয়ে গেলেন ছেলেটিকে। সেই নীলবাবুটির কোনও হদিশ করা যায় কি না একটু টোকা মেরে দেখা যাক।

—লালু, স্যার।

—কতদিন এ চাকরিতে বহাল হয়েছিস?

—সেই যবে থেকে এই ফ্ল্যাটবাড়ি তোয়ের হয়েছে, স্যার।

দেবাদ্রির একটু দূরেই তার সহকর্মী আকিঞ্চন দত্ত দাঁড়িয়ে। পাশেই গার্গী চৌধুরি। দুজনকে একঝলক দেখেই আবার দৃষ্টি ন্যস্ত করলেন লালু নামের লিফটম্যানটির দিকে। জেরা করার সময় দেবাদ্রির চোয়ালে একটু একটু করে শক্ত হতে থাকে ক্রমশ। হাতের রুলটিও রিভলভিং চেয়ারের মতো —

—আজ দুপুরের দিকে একজন ভদ্রলোক, চোখে কালো চশমা, খুব সিগারেট খান, এমন কেউ এসেছিলেন এই ফ্ল্যাটে?

লালুর চোখের কৌতূহল হঠাৎ বদলে গিয়ে আতঙ্কে টোল খাচ্ছে এবার। হঠাৎ পুলিশের জেরার মুখে পড়তে হবে ভাবেনি। তাও দেবাদ্রি সান্যালের মতো একজন লম্বা চওড়া পাথুরে-মুখের পুলিশ অফিসারের । চোখ গিলে বলল, আজ্ঞে, দুপুরের দিকে আমি ছিলাম না, খেতে বাড়ি গিয়েছিলাম।

—কখন গিয়েছিলি, কখন ফিরেছিলি?

—আজ্ঞে গেছি একটার পর, ফিরেছি সাড়ে তিনটের দিকে।

কথাটা আরও একবার দেবাদ্রিকে সে বলেছে। দেবাদ্রি আবারও বাজিয়ে দেখতে চাইছিলেন, ছোঁড়া দুরকম উত্তর দেয় কি না।

—এরকম একজন চেহারার কোনও লোক কি্এর আগে এসেছিল?

লালু তার স্মৃতির ঝাঁপি হাঁটকায়। অসংখ্য মুখ ঘেঁটেঘুঁটে দেখতে থাকে। কত মুখ রোজ রোজ আসে। বারোটা ফ্ল্যাটে, কতরকমের বাসিন্দা আছে তাতে। তাদের কত ভিজিটর, সে-সব ঘাঁটাচটা করতে করতে এক- একটা মুখ থিতু হয়ে আবার ছড়িয়ে যায় ঘাসের ভেতর।

pathagar.net

—মনে হয় স্যার আসতেন মাঝে মাঝে।

—কতক্ষণ থাকতেন ফ্ল্যাটে?

—অত তো স্যার মনে থাকে না।

—লোকটা কি শুধু দুপুরেই আসত? সকালে বা সন্ধের দিকে আসেনি কখনও?

—মনে নেই, স্যার। তবে মনে হয় দুপুরেই—

দেবাদ্রি একটা ধমক দিয়ে বললেন, ঠিক বলছিস তো?

লালু ঢোক গিলল আবার, ঠিক, স্যার।

—আজ দুপুরে যারা-যারা এঁসেছিল, তাদের সবার মুখে মনে রেখেছিস?

লালু আবার তার স্মৃতির ঝাঁপি হাঁটকায়। সে আবার একটু ভুলো, তবু ঝাঁপি উপুড় করে বলল, আজ্ঞে ওই একজন মেয়েছেলে ছাড়া আর কেউ বাইরের লোক আসেননি।

লালুকে প্রথমবার জেরার সময়ও একজন 'মেয়েছেলের' কথা উল্লেখ করেছে যার পরনে হলুদ সিল্কে শাড়ি. রঙ 'পুরো ফর্সা নয়, আবার কালোও নয়,' কানে চার ইঞ্চি লম্বা দুল, তাতে খয়েরি-পাথর বসানো, ঠোঁটেও খয়েরি রঙের লিপস্টিক।

—মেয়েছেলেটা এর আগে কোনও দিন এসেছিল।

—দেখিনি, স্যার। তবে মেয়েছেলে একবার দেখলে আমার মনে থাকে। মনে হয়, স্যার, আগে আসেনি।

—তখন ক'টা বাজে?

—আমি ভাত খেয়ে ফিরে সবে লিফট খুলেছি। তক্ষুণি এসে বলল, তিনের দুইয়ে যাব।

—চারতলায় নামল, তারপর তুইও লিফট নিয়ে নেমে এলি। কিন্তু মেয়েছেলেটাকে আর নামতে দেখিসনি? ঠিক বলেছিস?

—হ্যাঁ, স্যার , সত্যি বলছি। হয়তো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে কখন। আমি লিফটের ভেতর ছিলাম। খেয়াল করিনি।

—মেয়েছেলেটাকে দেখলে তুই চিনতে পারবি?

পারব, স্যার। মেয়েছেলের মুখ একবার দেখলে আমার মাথায় কুঁদে বসে যায়।

পাঁচ

দেবাদ্রি সান্যাল ততক্ষণে তিনের দুই ফ্ল্যাটের দরজা ভাল করে 'সিল' করতে হুকুম দিচ্ছেন তার অধস্তনদের। সাব ইনস্পেকটর আকিঞ্চন দত্ত একজন কনস্টেবলকে সহযোগী করে একটা মোমবাতি ধরালেন গালা গলাতে। দুটো তালা সিল করা বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রাত হয়ে এসেছে একটু। ভীম পলশ্রীর বারোটা ফ্ল্যাটের বাইরে যাঁরা বাইরে ছিলেন, সেইসব লোকজন ফিরতে শুরু করেছেন একে একে। তিনের দুই ফ্ল্যাটে যে একটা খুন হয়েছে, তা টেলিফোনের কল্যাণে অনেকেই জ্ঞাত হয়েছেন ইতিমধ্যে। খুনের ঝামেলায় কেউ জড়াতে চান না আজকাল। দিনকাল খারাপ। পুলিশি জেরা যে কী ভয়ানক বস্তু তার ভয়ে ঘরের দেয়ালটিও তটস্থ থাকে আজকাল। অতএব অন্য ফ্ল্যাটের ঘরফেরত বাসিন্দারা পটাপট দরজা খুলে অন্তরিন হলেন নিজের ঘরে। একবার নিজের দ্বীপে ঢুকতে পারলেই স্বস্তি।

দেবাদ্রি যখন দরজা সিল করা তদারকিতে ব্যস্ত, সমস্ত সেই ফুরসতে গার্গী খোঁজ করছিল,

pathagar.net

সত্যব্রত রায়ের একমাত্র কন্যা ট্রিঙ্কাকে কোথায় রাখা হয়েছে। আপাতত। ফ্ল্যাটবাড়িটার সব ক'টা ফ্ল্যাটেই তখন চারিয়ে গিয়েছে এক ঘোর আতঙ্ক। এ সব ফ্ল্যাটের অধিকাংশ অবস্থাপন্ন পরিবার। কেউ কেউ উঁচুপদে চাকরি করেন। তবে বেশিরভাগই বিজনেস। বিজনেসম্যান হলেই তবে ফ্ল্যাটে এত দামি মার্বেল পাথর বসানো যায় কিংবা এত খরচ করে করা যায় ইনটেরিয়র ডেকোরেশন। মাত্র কয়েকমাস হল একে একে বারোটি পরিবার বাস করতে শুরু করেছেন, এর মধ্যে একটি ফ্ল্যাটে এরকম একটা নৃশংস খুন হয়ে যেতে সবাই-ই যেন বেশ ঝাঁকুনি খেয়ে গেছেন এমন চোখ-মুখ। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে গার্গী এসে পৌঁছাল তিনতলার দুইয়ের দুই ফ্ল্যাটটিতে। বারোটি পরিবারের মধ্যে কয়েকটি পরিবার বাঙালি। একতলার অনিল বর্মণ ফ্ল্যাটে ঢোকার পর সামান্য কয়েকদিন থেকে আবার ফিরে গেছেন তাঁর আগে বাড়িতে। তাঁর সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না অন্য ফ্ল্যাটের পরিবাররা। তিনতলার জোড়নম্বরে যে পরিবারটি থাকেন, সেই অলকেন্দু নন্দ মাঝবয়সি। অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁদের একটিই পুত্র, দার্জিলিঙে কনভেন্ট স্কুলে পড়ে, তাই স্বামী-স্ত্রীর ছোট সংসারে ওপরতলার ট্রিঙ্কা খুবই আদরের। অলকেন্দুবাবুর স্ত্রী বীথিকার কাছে ট্রিঙ্কা খুব নিশ্চিন্তে থাকে দিনের অনেকটা সময় এ-তথ্য শুনে গার্গীও নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ল তাঁদের ফ্ল্যাটে।

জনা চারেক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে গার্গী এতক্ষণ খুনের জায়গায় বেশ স্মার্টলি ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে অলকেন্দুবাবুদের ধারণা গার্গীও নিশ্চই কোনও মহিলা পুলিশ অফিসার। সে দরজায় নক করতেই তাঁর সসম্ভ্রমে দরজা খুলে তাকে নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। গার্গী ভেতরে ঢুকে ফ্ল্যাটটির চারপাশ একনজর পর্যবেক্ষণ করে অতঃপর পরিবেশে সহজ করে তুলতে বলল, একগ্লাস জল খাওয়াবেন? সকাল থেকে খুব ধকল যাচ্ছে।

বীথিকা বছর চল্লিশের পাতলাচেহারার মহিলা, ব্যস্ত হয়ে বললেন, চা করব?

—না, না শুধু জল হলেই চলবে। এ সময় চা-ও ঠিক জিভে সইবে না, বলতে বলতে গার্গীর নজরে পড়ল ট্রিঙ্কার দিকে। ড্রয়িংয়ের সংলগ্ন যে বড়সড় বেডরুমটা, তার বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বছর আটেকের মেয়েটি। মাথায় কোঁকড়া চুলের রাশ ছাপিয়ে আছে পিঠে। পরনে মেরুন রঙের স্কুল ইউনিফর্ম। রঙ ফর্সা। বাবার মতোই রঙ পেয়েছে ট্রিঙ্কা, স্বাস্থ্যও বেশ ভাল। স্কুল থেকে চারটে নাগাদ বাড়ি ফিরে সে ই দরজায় কলিংবেল টিপে কোনও উত্তর না পাওয়ায় হঠাৎ ভেজানো দরজা ঠেলতেই দেখেছিল বীভৎস দৃশ্যটা। ভয়ে আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে, আঁ—আঁ শব্দে চ্যাঁচিয়ে সোজা নেমে এসেছিল তিনতলার এই ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটে তখন বীথিকা দেবী একাই। তিনি দরজা খুলতেই দেখেন ট্রিঙ্কা প্রায় অচেতন অবস্থায় তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

গার্গীর গলার স্বর শুনে ট্রিঙ্কা একঝলক মুখ তুলে তাকিয়ে আবার মুখ গুঁজল বিছানায়। গার্গী দেখল, ট্রিঙ্কার চোখ মুখ থেকে সেই ভয়ের ছাপ মিলিয়ে যায়নি এখনও। তখন থেকে ডুকরে কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল। ফুলেও গেছে চোখের কোণ দুটো। ট্রিঙ্কার অসহায় অবস্থাটা অনুধাবন করে গলার স্বর নামাল গার্গী। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, ট্রিঙ্কা কি রোজই ওর বাবার সঙ্গে স্কুলে যায়?

উত্তর দিলেন বীথিকা, না, না। রোজই তো স্কুল-বাসে যায়। এ দিন কোনও কারণে স্কুল-বাস সকালের ট্রিপ করতে পারবে না জানা ছিল। তাই—

—তাহলে স্কুল বাসই ফিরেছিল?

pathagar.net

—হ্যাঁ। ওর বাবা কিংবা মা যে কেউ একজন ওকে স্কুল বাসে তুলে দিত রোজ। কিন্তু ফেরার সময় বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকত ওর মা-ই। আজ বাস থেকে নেমে ওর মাকে না দেখতে পেয়ে ও খুব অবাক হয়। একা একাই বাড়ি ফিরে লিফটম্যানকে জিজ্ঞাসা করে, ওর মা আজ যায়নি কেন? লিফটম্যান কিছু বলতে পারেনি। তারপর ওপরে উঠে দ্যাখে—

বীথিকার গলাটা সহসা ধরে এল। চোখ দিয়ে জলও এল কয়েক ফোঁটা।

তাঁকে একটু সামলে নেওয়ার সময় দিয়ে গার্গী এবার অলকেন্দুবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, আপনারা কি বলতে পারবেন, এই খুনের পেছনে কার হাত থাকা সম্ভব?

অলকেন্দু ও বীথিকা একবার নিজেদের মধ্যে তাকাতাকি করেন। অতঃপর অলকেন্দুই বললেন, মনে তো হচ্ছে ডাকাতি করতেই ঢুকেছিল কেউ বা কারা।

—কিন্তু হঠাৎ এক বা একাধিক অপরিচিত লোক ফ্ল্যাটের দরজা খুলতে বলল, আর মিসেস রায় অমনি খুলে দিলেন দরজা!

—অনেক সময় সেলসম্যানরা তো এভাবেই আসে আমাদের ফ্ল্যাটে। এটা ওটা জোর করে বিক্রি করে যায়।

আপনাদের লিফটম্যান তাহলে জানে কে বা কারা ঢুকছে ফ্ল্যাটে। কোন ফ্লোরেই বা নামল তারা!

—দুর্ভাগ্য যে ঠিক ওই সময়ে লিফ্‌টম্যান রোজ খেতে যায় লিফট বন্ধ করে। যে বা যারাই এসে থাকুক না কেন, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়েছিল তাদের।

গার্গী দুপুরবেলায় চিত্রটা মনে মনে একবার এঁকে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, নীলবাবু বলে কেউ একজন দুপুরবেলা মাঝেমধ্যে আসতেন ওদের ফ্ল্যাটে। আপনারা কি তাঁকে চেনেন।

—নীলবাবু! অলকেন্দু ও বীথিকা দুজনেই এমন বিস্ময় মিশিয়ে নামটা উচ্চারণ করলেন যে, গার্গী বুঝল ওই নামে কাউকে চেনেন না ওঁরা। অলকেন্দু জিজ্ঞাসা করলেন, কার কাছে শুনলেন নীলবাবুর নাম? কার কাছে শুনলেন নীলবাবুর নাম?

গার্গী ইতস্তত করে বলল পাঁচি।

—পাঁচি! বীথিকা হঠাৎ রাগে গরগর করে উঠলেন, ওদের কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। আমার মনে হয়, পাঁচিই আসলে পালের গোদা। ও যে বস্তিতে থাকে, সেখানে শুধু ওয়াগানব্রেকার আর মাস্তানদের বাস। হয়তো ও-ই ইনফর্মার হিসেবে কাজ করেছে। এখন দিব্যি ন্যাকা সেজে নীলবাবুর গল্প তৈরি করেছে।

গার্গী ক্লুটা একলহমা মন দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তাহলে বলছেন মিসেস রায়ের সঙ্গে এরকম কারও যোগাযোগ ছিল না।

অলকেন্দু কিছুক্ষণ থমকে গেলেন গার্গীর প্রশ্নে, তারপর জোরে জোরে ঘাড় নাড়লেন, অন্তত আমাদের কানে তেমন কিছু আসেনি। বীথিকা তো মাঝেমধ্যে ওপরে গেছে বিনীতার সঙ্গে গল্প করতে। কাউকেই দেখেনি কখনও। বিনীতা খুব ভাল মেয়ে ছিল।

বলে বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অন্যমনস্কদের মতো।

গার্গী অবশ্য তাঁকে অমনোযোগী হওয়ার কোনও সুযোগই ছিল না। পরমুহূর্তে জিজ্ঞাসা করল, সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে বিনীতা রায়ের সম্পর্ক কীরকম ছিল?

—ভালই, বীথিকার তাৎক্ষণিক উত্তর, এই তো তিন চার দিন আগেও ছুটি ছিল বলে দুজনে মেয়ে নিয়ে সিনেমা দেখে এল।

pathagar.net

—ঠিক আছে, গার্গী হঠাৎ উঠে পড়ল সোফা থেকে। এই অসময়ে কিছুক্ষণ বিরক্ত করে গেলাম আপনাদের।

বলে ফ্ল্যাটের বাইরে বেরোতে যাবে, সে সময় ভারী বুটে গটগট শব্দ তুলে দেবাদ্রি এসে হাজির হলেন নিচের ফ্ল্যাটে, আরে, এই তো মিসেস চৌধুরি। আমরা আপনাকে খুঁজে খুজে হয়রান। ভাবছিলাম বোধহয় আমাদের এতসব ঝকমারির কাজে ব্যস্ত দেখে আপনি চলে গেলেন।

গার্গী ঘড়িতে চোখ রেখে বলল, হ্যাঁ, পায়ে সাড়ে সাতটা বাজে। এবার বাড়ি যেতে হবে। ওদিকে মিস্টার চৌধুরি যদি এতক্ষণে বাড়ি ফিরে থাকেন, তাহলে আমাকে না দেখলে হয়তো থানা বা হসপিটালে ফোনাফোনি শুরু করে দেবেন।

দেবাদ্রি ব্যস্ত হয়ে বললেন, সে কী ! কেন?

—অফিস থেকে শরীর ভাল নেই বলে বিকেল চারটেয় বেরিয়েছি। সাতটার সময়ও যদি আমাকে ফ্ল্যাটে না পায়, তাহলে ভাববে নিশ্চই কিছু একটা ঘটেছে আমার।

—ও, দেবাদ্রি শব্দ করে হেসে উঠে বললেন, চলুন তাহলে আমিই না হয় আপনাকে এসকর্ট করে পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাদের ফ্ল্যাটে।

—গুড প্রপোজাল, গার্গী হেসে অনুমোদন করল দেবাদ্রির প্রস্তাব।

—হুঁ, যেতে যেতে আমাদের এই গুডি গুডি স্বভাবের কলিগের স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনাটা নিয়ে কিছু আলোচনাও করা যাবে আপনার সঙ্গে।

ততক্ষণে বিনীতা রায়ের ডেডবডি মর্গে পাঠানোর দায়িত্ব পালন করে অন্য পুলিশ অফিসাররা একটু হালকা হয়েছেন। তাঁদের ডেকে কিছু জরুরি নির্দেশ দিয়ে দেবাদ্রি তাঁর জিপের ড্রাইভারকে বললেন, সিং, তুমি এই নীল অ্যাম্বসাডারটাকে ফলো করো।

ছয়

অতঃপর গার্গীর নীল গাড়িটিতে উঠে তার পাশে বেশ জাঁকিয়ে বসে দেবাদ্রি বললেন, কেসটা কিন্তু বেশ কমপ্লিকেটেড না কি মিসেস চৌধুরি?

—আপাতত, বলে গার্গী হাসল একঝলক, অন্তত যতক্ষণ না পর্যন্ত নীলবাবুর রহস্যটি ফয়সালা হয়।

—নীলবাবু! দেবাদ্রি এক মুহূর্তে ব্যাপারটা ভেবে নিয়ে বলল, কিন্তু সত্যব্রত বলছে, এ নামের কাউকেও ও চেনে না।

—চেনে না! গার্গী খুব একটা অবাক হল তা নয়। একটু আগে অলকেন্দু বীথিকাও জানিয়েছেন এ- নামের কোনও যুবককে বিনীতার কাছে আসতে শোনেননি বা দেখেননি। তাহলে ফ্ল্যাটের কাজের লোক পাঁচি হঠাৎ এরকম একটা উটকো নাম পুলিশের সামনে হাজির করল কেন সেটাই আপাতত সন্দেহের ব্যাপারে।

—পাঁচিকে দু'একদিনের জন্য কাস্টডিতে রাখতে বলে দিলাম। মনে হচ্ছে ওর কাছ থেকেই কোনও ক্লু পাওয়া যাবে। ওদের বস্তির কোনও লোক হয়তো জড়িত আছে মার্ডারের মধ্যে। আজকাল এই ধরনের ঠিক কাজের লোকগুলোই সবচেয়ে বেশি বিপদ ডেকে আনছে মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত ফ্ল্যাটগুলোতে।

pathagar.net

—সত্যব্রতবাবুর ব্যাপারে কোনও স্টেপ নিলেন নাকি?

—সত্যব্রতকে আপাতত বলা হয়েছে কলকাতার বাইরে না যেতে। ওর নিজের বাড়ি মুদিয়ালির কাছে। সেখানে ওর দুই দাদা সপরিবারে থাকেন। আপাতত কয়েকদিন সেখানেই থাকবে।

—কিন্তু একটা বিষয় এখনও সমাধান হয়নি, মিঃ সান্যাল। যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মিসেস রায়কে খুন করা হয়েছে, তার কোনও হদিশ পাওয়া গেল?

—নাহ্। মনে হয় এখুনি চম্পট দিয়েছে। আলমারি থেকে যা পেয়েছে তাই নিয়ে।

দেবাদ্রি সান্যালের কথায় বাধা দিয়ে গার্গী বলল, সত্যব্রত রায়ের ফ্ল্যাটে ডাকাতির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে বলছি, মিসেস রায়ের মার্ডার হওয়ার পেছনে অন্যান্য কারণগুলোও কিন্তু খতিয়ে দেখতে হবে মিঃ সান্যাল।

দেবাদ্রি থমকে গিয়ে বললেন, যেমন?

—এক, মিসেস রায়ের জীবনে কোনও এক নীলবাবুর অস্তিত্ব সত্যিই আছে কিনা. দুই, সত্যব্রতবাবু সেটা জানতেন কিনা। তিন, সত্যব্রতবাবুকে পাস্ট হিস্টরি সম্পর্কে আপনাদের কারও কিছু জানা আছে কি না।

দেবাদ্রি বললেন, সত্যব্রত রায় আমাদের সার্ভিসের একজন খুবই ব্রাইট অফিসার। ওর কোনও অতীত আছে কি না, সেটা দু-একদিনের মধ্যেই জেনে ফেলব। কিন্তু আপনি কি ভাবছেন সত্যব্রতই?

গার্গী হেসে বলল, না। তা এখনই ভাবছি না. তবে সব খুনের পেছনে একটা অঙ্ক থাকে। আপাতদৃষ্টিতে জটিল মনে হলেও একটা না একটা ফর্মুলা থাকে। এক্ষেত্রে খুনি কীভাবে কষেছে অঙ্কটা সেটাই বার করতে হবে আমাদের। হয়তো তার কোনও অতীতের ইতিহাসের সূত্র ধরেও খুনটা হতে পারে।

—দ্যাট্স্ রাইট। দেবাদ্রি এ ভাবনাটাও না ভাবেননি তা নয়। তিনিও একটা অঙ্ক কষেছেন মনে মনে। বললেন, দেখা যাক, দু একদিনের মধ্যে সেসব তথ্যও জোগাড় করে ফেলবে।

গার্গী তাতে নিশ্চিন্ত হল না। কিছুক্ষণ চোখ বুজে সত্যব্রত রায়ের মুখখানায় তার চোখের তুলি দিয়ে ব্রাশ করতে করতে বলল, দাঁড়ান সমস্ত ব্যাপারটা একবার ঝালিয়ে নিই। মিঃ রায়ের পুলিশ অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্সটা কটা থেকে কটা পর্যন্ত ছিল আজ?

—সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটেয়।

—আর মিসেস রায় খুন হয়েছে ক'টায়।

—অপরাধ বিশেষজ্ঞদের অনুমান বেলা দুটো নাগাদ। কিংবা তার একটু আগে পরে।

খুনের সময় নিয়ে গার্গী তার ভাবনাটা লোফালুফি করল কিছুক্ষণ। তবু নিশ্চিত হতে জিজ্ঞাসা করল, কনফারেন্সে পুরো সময়টাই কি উনি উপস্থিত ছিলেন?

দেবাদ্রি হেসে বলল, হ্যাঁ। অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট রজত দে সরকারকে আমি কিছুক্ষণ আগে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি। দেড়টা থেকে আড়াইটে লাঞ্চ ব্রেক ছিল। তার আগে ও পরে দুটো সেশনই সত্যব্রত বক্তৃতা করেছে। লাঞ্চ-আওয়ারেও ক্যান্টিনে লাইন দিয়েছে, লাঞ্চের নির্দিষ্ট কুপন জমা দিয়েছে কাউন্টারে। লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে সবার সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে খেয়েছে ক্যান্টিনের টেবিলে বসেই। সুতরাং ওকে সন্দেহ করবার কোনও ফাঁক-ফোকর নেই।

গার্গীও হাসল না। আসলে স্ত্রী খুন হলে আজকাল প্রথমেই তার স্বামী, দেওর বা শাশুড়িকেই তো সন্দেহ করে সবাই।

—সেসব পয়েন্ট আগেই খতিয়ে দেখেছি, মিসেস চৌধুরি। সত্যব্রত রায়ের ভাইরা মুদিয়ালির আলাদা বাড়িতে থাকেন। ওটাই ওঁদের আদত বাড়ি। তাঁর কেউ এ ফ্ল্যাটে আসেন না। মাও মারা গেছেন বছর দশেক আগে।

গার্গী হাঁপ ছেড়ে বলল, তা হলে একটা দিক অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখন তিনটে দিক আপনার সামনে খোলা। এক, কাল দুপুরে কোনও অ্যান্টি সোশ্যাল, ফেরিওয়ালা অথবা ঝাড়ুদার অথবা অন্য উটকো লোক কোনও ছলছুতোয় ঢুকে পড়তে পেরেছিল কি না মিসেস রায়ের ঘরে। মোটিফ অবশ্যই ডাকাতি। কিছু জিনিসপত্র যখন খোয়া গেছে, এই সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি। দুই, সত্যব্রত রায়ের প্রফেশনাল হ্যাজার্ডের কথাটা মাথায় রাখতে হবে। কোনও ক্রিমিনাল প্রতিশোধ নিতে এসেছিল এই সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিন, সত্যব্রত রায় বা বিনীতা রায়ের ব্যক্তিগত জীবনের কোনও প্রতিফলন ঘটল কি না এই ঘটনায়।

দেবাদ্রি সান্যাল চোখমুখ কুঁচকে মন দিয়ে শুনছিলেন গার্গীর বিশ্লেষণ। একটা খুনের পেছনে অনেকরকম সম্ভাবনাই থাকতে পারে। প্রত্যেক সম্ভাবনার পেছনে এক-একরকম মোটিফ, কোনওটাই সন্দেহের বাইরে রাখা চলে না। সব দৃষ্টিকোণ কিছুক্ষণ খতিয়ে দেখে দেবাদ্রি বললেন, ভালই বলেছেন, মিসেস চৌধুরি। একটা মানুষ যখন বেঁচে থাকে, প্রতি মুহূর্তে কত ঘটনা ঘটে চলে তার জীবনে। ছোট ছোট কত মুহূর্তে মানুষ প্রায় সময়েই ঠিকমতো নজর করে দেখে না। খেয়ালও করে না ঘটনাগুলো। অথচ সেই মানুষটা খুন হয়ে গেলে বা কোনও দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়লে অমনই সে একজন ভি. আই. পি. হয়ে গেল। সেলিব্রিটিদের জীবনের সামান্য খুঁটিনাটিও যেমন সাংবাদিকরা নোট করে রাখে, তা নিয়ে লেখালিখি হয়, তেমনই খুন হয়ে যাওয়া মানুষটার অতীত জীবনও হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে, পুলিশের কাছে। আপনার থার্ড পয়েন্টটা অবশ্য আমাকে ভাবাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে তদন্ত করার মতো দুটো মানুষের উপস্থিতি ঘটে গেছে। একজন নীলবাবু, দ্বিতীয় জন, কানে চার ইঞ্চি লম্বা দুল, ঠোঁটে খয়েরি লিপস্টিক-পরা এক মহিলা। দুজনেই আজ দুপুরে খুনের ঘটনার কাছাকাছি সময়ে এসেছিলেন বিনীতা রায়ের কাছে। এদের দুজনের ওপরই তদন্তের আলো ফেলা উচিত প্রথমে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সত্যব্রত রায় এদের কাউকেই চেনে না বলছে। তাহলে নিশ্চিন্তভাবেই দুজনেই বিনীতা রায়ের চেনা। কিন্তু বিনীতা রায় তো জীবিত নেই যে, তাঁকে জেরা করে উদঘাটন করব রহস্য।

গার্গী হেসে ফেলল হঠাৎ। দেবাদ্রি সান্যাল নিজেকে প্রায়শ স্মার্ট, তুখোড় পুলিশ অফিসার হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু যখনই কোনও জটিলতা বা ঝামেলার মুখোমুখি হন, তখনই তাঁকে ভারি অসহায় লাগে।

গাড়িটা তখন থেমে আছে একটা রাস্তার মোড়ে। শরৎ বসু রোডে রাতের এই সময়টায় প্রায়শ জ্যাম লেগে থাকে। চারপাশে শয়ে-শয়ে গাড়ি, বাস, ট্যাক্সি, অটো পরিবৃত হয়ে বসে গাড়ির ভেতর দরদর করে ঘামা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর থাকে না। এহেন ঘর্মাক্ত অবস্থায় দেবাদ্রির লম্বা চওড়া, চিন্তিত চেহারাটা নিরিখ করে কেন যেন বেশ মজা পেল গার্গী। হাসিটা অমনই বেরিয়ে পড়েছে তার। কিন্তু পাছে দেবাদ্রি কিছু মনে করে, বা আঘাত পায়, তাই কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, এখন আপনার সামনে দুটো রঙ— একটি নীল অন্যটি খয়েরি। খুনির চিন্তা করতে করতে রঙের গভীরে হাবুডুবি খেতে হবে আপনাকে।

—যা বলেছেন, মিসেস চৌধুরি। এখন এই নীলবাবুটিকে এবং খয়েরি বিবিটিকে খুঁজে বার করতেই হবে, যে করেই হোক।

—রাইট।

—হ্যাঁ, হু ইজ দ্যাট খয়েরি দুল-পরা উওম্যান? তিনি কি বিনীতার বান্ধবী না হত্যাকারী?

গার্গী হাসল আবার, রহস্য কিন্তু বেশ ঘনীভূত হল, মিঃ সান্যাল।

সাত

ততক্ষণে রতন তার নীল অ্যাম্বাসাডার দাঁড় করিয়েছে ব্লু-ওয়াণ্ডার নামের সেই বিখ্যাত বাড়িটির সামনে, যেটি কিছুকাল আগেই ক'দিন ধরে খবরের কাগজের শিরোনামের কারণ হয়েছিল। গার্গীর অনুমানমতো, সায়ন ততক্ষণে ফিরে এসেছে অফিসের কাজ শেষ করে। গার্গীকে ঘরে না দেখে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে এখানে ওখানে টেলিফোন করে অবশেষে নিচে নেমে এসেছে, গ্যারাজ থেকে আবার গাড়ি বার করবে কি করবে না এমন ভাবনায় বিপর্যস্ত, ঠিক সেসময় গার্গীর সঙ্গে দেবাদ্রি সান্যালকেও গাড়ি থেকে নামতে দেখে কীরকম নার্ভাস হয়ে পড়ল, বলল, কী ব্যাপার, গার্গী।

উত্তর দিলেন দেবাদ্রিই, তাঁর গলায় কৌতুক, কী আর ব্যাপার। অ্যানাদার মার্ডার।

—মার্ডার! সায়ন চমকে ওঠে।

—উঁহু। আপনার কোনও কনসার্ন নয়, মিঃ চৌধুরি। আপনার মিসেসটি আজকাল রাস্তায় চলতে চলতেও খুনের গন্ধ পেয়ে পৌঁছে যান অকুস্থলে। সেভাবেই হঠাৎ আজ বিকেলে ল্যান্সডাউন রোডের এক বাড়িতে। খুন হয়েছে আমাদেরই এক কলিগের স্ত্রী।

সায়ন বোধহয় এতক্ষণে বুঝে ফেলল গার্গীর দেরি করে ফেরার কারণ।

বেশ অসন্তুষ্টও হল তৎক্ষণাৎ। গার্গীকে বলল, তুমি আবার ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চাইছ?

গার্গী অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে চাইল, না, না, জড়িয়ে পড়িনি। হঠাৎ রাস্তায় ওপর ভিড় দেখে—

কিন্তু দেবাদ্রি সান্যাল হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন গার্গীর সুরক্ষায়.

মি. চৌধুরি আপনার মিসেস একটি রত্ন বিশেষ। পুলিশে চাকরি না করেও কঠিন কঠিন হত্যারহস্য কী অবলীলায় সলভ করে ফেলছেন তা তো দেখতেই পারছেন। আপনি কি চান না ওঁর বুদ্ধি মাঝেমধ্যে এক আধটু ধার নিই আমরা?

কলকাতায় এক দুঁদে পুলিশ অফিসারের এই সরল স্বীকারোক্তি শুনে সায়ন বিস্মিত, হতবাক। গার্গী অবশ্য হেসে উঠে সামলে নিতে চাইল পরিস্থিতি, বলল, ওহ, মিঃ সান্যাল, আজকাল এত বিনয় দেখাচ্ছেন—

বলল বটে, কিন্তু তার চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে স্ত্রী-গর্বে সায়ন রীতিমতো উল্লসিত। ফলত উদ্ভাসিত হাসিতে।

—ঠিক আছে, আপাতত থানায় ফিরে যাচ্ছি। দরকার মতো আপনাকে ফোন করবে মিসেস চৌধুরি।

দেবাদ্রি সান্যালকে বিদায় দিয়ে গার্গী অতঃপর সায়নের সঙ্গে উঠে এল দোতলায় তাদের ফ্ল্যাটে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে, টিউবে, ফ্যানে ঘর ভরিয়ে সায়ন তার গলায় উষ্মা ফোটাল, উঁহু তুমি মাঝেমধ্যে এমন দুশ্চিন্তায় ফেল না—

pathagar.net

গার্গী সে কথার উত্তর না দিয়ে তার মগজে যে এপিসোডটি তখন ঘুরপাক খাচ্ছে সে প্রসঙ্গেই ফিরে গেল পুনর্বার, বুঝলে, স্বয়ং পুলিশ ইনস্পেক্টরের বউই মার্ডারড। তাহলে আমাদের মতো সাধারণ নাগরিকদের কী দুরবস্থা বলো তো।

সায়ন অবশ্য গার্গীর পাগলামিতে মোটেই উৎসাহ না দেখিয়ে বলল, আগে কফি খাওয়াও তো।

তারপর—

গার্গী ততক্ষণে কিচেনে ঢুকে পড়েছে কফির আয়োজন করতে। আসলে সায়নের চোখের আড়ালে গিয়েই সে দ্রুত হাতে খুলে ফেলল বিকেলে সত্যব্রত রায়দের আলমারির থেকে হাতিয়ে আনা হলুদবর্ণ খামটি। ভেতরে প্যাডের কাগজে লেখা চিঠি। সাদা ধবধবে কাগজে যে করে যে-কয়েকটি লাইন বেশ যত্ন করে লেখা, তাতে চোখ বোলাতেই তার বুকের ভেতর বেজে উঠল তুমুল শব্দে দামামা। চিঠিটা এরকম।

২১/২/বি প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড
কলকাতা

বিনীতা,

তোমাকে এর আগে বহুবার কথাটা বলেছি, বারবার বলেছি, বোঝাতে চেষ্টা করেছি, যে, সত্যব্রত আমাদের দুজনের মধ্যে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তুমি তার প্রতিকার করার চেষ্টাই করোনি কখনও। ব্যাপারটা ক্রমশ খারাপের দিকে টার্ন নিচ্ছে। সত্যব্রত এখনও যদি সংযত না হয়, তাহলে তোমার ওপরই প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে। ইতি

নীলধ্বজ।

নীলধ্বজ! অর্থাৎ ইনি নিশ্চয়ই পাঁচি কথিত সেই নীলবাবু ! চিঠির পঙক্তিগুলি বার দুই পড়তে পড়তে গার্গীর শরীরে রক্তের গতিবেগ সহসা বেড়ে গেল কয়েকগুণ! কিছুক্ষণ আগে সত্যব্রত রায় জানিয়েছেন নীলবাবু নামের কোনও ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না। তিনতলার অলকেন্দু বা বীথিকাও বলেছেন কোনও নীলবাবু বিনীতার কাছে আসত বলে তাঁরা দেখেননি বা শোনেননি। অতএব পাঁচি অসত্য বলেছে, আর সেটা নিশ্চয়ই কোনও অসদুদ্দেশ্যে, অথবা তাদের বস্তির লোকজনের অপরাধ চাপা দিয়ে পুলিশের নজর অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে, এটাই দেবাদ্রি সান্যালের অনুমান। কিন্তু ঝুলির মধ্যে একটা বিড়াল যে ছিলই সেটা এই হলুদরঙের খামটা ওদের ফ্ল্যাটের আলমারি থেকে উদ্ধার করে না। আনলে জানাই যেত না হয়তো। তবে এরকম খাম আরও আছে কিনা, বা আরও নতুন কোনও ক্লু তা আগামীকাল সত্যব্রত রায়ের ফ্ল্যাটে তন্নতন্ন সার্চ না করলে জানা যাবে না।

কফির জল গার্গীর দীর্ঘ ভাবনার অবসরে একটু বেশিই ফুটে গিয়েছিল, সম্বিত ফিরতে তাড়াহুড়ো করে দু-কাপ কফি তৈরি করে ড্রয়িং-এ পৌঁছাতে সায়ন ঠাট্টা করল, কী ব্যাপার ম্যাডাম। কফি আনতে কি নীলগিরি পাহাড় পর্যন্ত যেতে হয়েছিল তোমাকে—

গার্গী হেসে বলল, না তবে আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত গিয়েছিলাম এ কথা ঠিক।

বলে হলুদ খামটা দু-আঙুলের ডগায় চেপে জাপানি পাখার মতো নাড়াতেই সায়ন অবাক, কী ওটা?

—একটা ত্রিভুজ প্রেম, যার পরিণতিতে একজন যুবতীর নৃশংসভাবে খুন হওয়া।

সায়নের ভুরুতে কোঁচ পড়ে। ও, তাহলে তুমি কি সত্যিসত্যিই গোয়েন্দাগিরি শুরু করলে?

গার্গী দুষ্টু-দুষ্টু হাসির পোজ দিল ঠোঁটের কোণায়, পাকাপাকিভাবে কি না তা বলতে পারছি না। কিন্তু গত পাঁচ-ছ বছর কম ঘটনার সঙ্গে তো আর জড়িয়ে পড়লাম না। তাতে আমার অভিজ্ঞতা বলে যে, ইদানীং কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের দক্ষতা এতটাই নিম্নমানের যে, তারা প্রায় কোনও খুনেরই কিনারা করতে পারছে না। এই দ্যাখো না, পরশু ফিফটিনথ্ জুন রবিরারের টেলিগ্রাফ কী বলছে—তিরানব্বই সাল থেকে অন্তত দশটা ফ্ল্যাট বাড়িতে খুনের ঘটনা ঘটেছে,তার মধ্যে মাত্র গোটা চারেক খুনের কিনারা হয়েছে। বাকিগুলো এখনও অথৈ জলে।

সায়ন গলায় আতঙ্ক মিশিয়ে বলল, তুমি কি এখন সেই বাকি ছ'টা খুনেরও তদন্ত শুরু করবে।

গার্গী হেসে কুটপাট হয়, আরে না, না। নেহাৎ এই ঘটনাটা চোখের সামনে পড়ে গেল, তাই। তাছাড়া দেবাদ্রি সান্যাল, আজকাল আমাকে দেখলে বেশ সাহস পান ভেতরে ভেতরে।

সায়ন হতাশ হয়ে বলল, তারপর একদিন হয়তো দেখব, তুমি প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের এতসব ঝকমারি ছেড়ে গোয়েন্দা বাহিনীতে জয়েন করে গেছ।

—যাহ্ গার্গী লজ্জাই পেয়ে গেল বেশ। আমার ওপর আস্থা রাখুন চেয়ারম্যান সাহেব, আপনার কোম্পানির বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করেই আমার অনুসন্ধিৎসাপর্ব চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে।

জাপানি পাখার মতো হলুদ খামের দোদুল্যমান হঠাৎ কী ভেবে সায়ন পট করে তুলে নিল গার্গীর কাছ থেকে। খামের ভেতর থেকে যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা চিঠিটির ভেতর অন্তরিন হল কয়েক মুহূর্ত। অন্তত বারদুয়েক চোখের ছুরি চালিয়ে কাঁটাছেঁড়া করল সারসার শুয়ে থাকা অক্ষরগুলিকে। অতঃপর গার্গীর দিকে চোখ ফেরায়, এ তো খুনি একেবারে তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছে।

—হাত বাড়িয়ে দিয়েছে? মানে? গার্গী কুপিত হয় সামান্য।

—মানে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে হাতকড়া পরার জন্য। এখন দেবাদ্রি সান্যালের হাতে কাল সকালে চিঠিটা তুলে দিলেই তিনি নাচতে নাচতে এক বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে গিয়ে গ্রেপ্তার করবেন নীলধ্বজবাবুকে। ব্যস্ খেল খতম।

—খেল খতম্। গার্গী হেসে উড়িয়ে দেয়, এতই যদি সহজ হত খুনের রহস্যের কিনারা করা, তাহলে আর এত এত পুলিশ পয়সা খরচ করে পুষতে হত না সরকারকে। এ চিঠিটাকে বলতে পারো রহস্যের একটা ক্লু। চিঠিটার সূত্র ধরে আমাকে এখন এগোতে হবে খুনি কে তার উৎস সন্ধানে। তবে নীলধ্বজবাবুর খুনি হওয়ার একটা অসুবিধে আছে। কী বলতো?

—কী?

—তিনি যদি অঙ্ক কষে খুন করে থাকেন, তাহলে চিঠিতে ঠিকানা দিতেন না।

সায়ন লাফিয়ে উঠতে চাইল, তুমি সত্যিসত্যিই আবার একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে চাইছ?

গার্গী ক্ষুব্ধ-ক্ষুব্ধ গলায় বলল, ঝামেলা মনে করলেই ঝামেলা। কিন্তু যদি এরকম ভাবো, একটা জটিল অঙ্কের সমাধান করতে যেমন আমরা একটা ক্লু-এর সাহায্য নিই, তারপর সেই ক্লু অনুসরণ করে একটু একটু করে জট ছাড়াই অঙ্কটার, এটাও সেইরকম।

সায়ন কী ভেবে স্থির দৃষ্টিতে পরখ করে গার্গীকে। গার্গী যে এককালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাথ্সের ছাত্রী ছিল, সে-কথা বিস্মরণ হয় সায়নের, হয়তো গার্গী তাইই মনে করিয়ে দিতে

pathagar.net

চায় তার ম্যাথ্‌সের ব্যাকগ্রাউন্ড। গার্গীর আঙ্কিক মগজটা তো সায়ন বাইরে থেকে দেখতে পায় না। তবু বলল, কিন্তু তুমি এখন অঙ্ক কষতে শুরু করলে প্যারাডাইস প্রোডাক্টস্ কে দেখবে! সবে একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করব ভেবেছি—

—ও, এই কথা! গার্গী সায়নকে একদমকায় আশ্বস্ত করে। তবে জেনে রাখুন, মশাই, আপনার কোম্পানির কথা সারাক্ষণ আমার মাথায় থাকে। এ-পর্যন্ত অফিসের কোনও কাজে কি আমার গাফিলতি প্রমাণিত হয়েছে, স্যার?

সায়নকে বলতেই হয়, না, তা নয়। তবে—

—তবে-টবের কিছু নেই, স্যার। যে কয়েকদিন আপনি প্রোডাকশন-সমুদ্রে অবগাহন করবেন, আপনার কোম্পানির দায়িত্ব আমি সঠিকভাবেই পালন করব। দেখবেন সেল্‌স্-এর ফিগার আপনার তত্ত্বাবধানে যেরকম আছে, তার থেকে বেশি বই কম হবে না।

সায়নের অবশ্য গার্গীর দক্ষতায় বরাবরই আস্থা। মাত্র কিছুকালের মধ্যেই যেরকম মানিয়ে নিয়েছে অফিসের আবহে, অন্য অফিসারদের সঙ্গে রণকৌশল আলোচনায়, স্টাফদের সঙ্গে আন্তরিকতা বিনিময়ে, হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অক্লান্ত মোকাবিলায়, তাতে তার এফিসিয়েন্সিকে সমীহ করতেই হয়।

—তাহলে তুমি শার্লস হোমস হবেই ঠিক করেছ?

—শার্লক হোমস! গার্গী নামটা শুনে ছিটকে উঠতে চাইল, তুমি ঠাট্টা করছ?

—তাহলে কি মিস মারপল?

গার্গী ক্ষুব্ধ গলায় বলল, নাহ্ , তুমি আজ বড্ড টিজ করছ। আমি গার্গী চৌধুরি। সেই নামেই পরিচিত হতে চাই। ওঁদের মতো পেশাদার গোয়েন্দা বা শখের গোয়েন্দা কোনওটা ওঠার সাধ নেই আমার। হঠাৎ কোনও রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে আমার ইচ্ছে হয় এই অঙ্কটাও কষে দেখি। কিংবা একটু অন্যভাবেও ভাবো না কেন সমস্যাটা। তুমি একের পর এক নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করার কথা ভাবো। সাবান তৈরির উপকরণগুলো কোন অনুপাতে মেশালে, তার সঙ্গে কী সেন্ট ঢেলে, কোন রঙ বা অন্য নতুন উপকরণ দিয়ে একটা নতুন সাবান তৈরি হবে। তার ভাবনাটাও এরকমই একটা রহস্যের জট খোলার মতো।

সায়নের ঠোঁটের কোণায় এতক্ষণ একচিলতে হাসির ছোঁয়া ছটফট করে উঠল, মাই গড! শেষপর্যন্ত আমার প্রোডাকশনের পদ্ধতিটাকেও তুমি রহস্য কাহিনীর ছাঁচে ঢাললে?

গার্গী দার্শনিক-দার্শনিক মুখ করে, আসলে কী জানো? মানুষের জীবনটাই খণ্ড-খণ্ড রহস্যে ওতপ্রত। আমরা, কেউই জানি না, আমাদের জীবনের পরবর্তী অনুচ্ছেদে, কিংবা পরবর্তী অধ্যায় কী লেখা আছে। সেই গভীর রহস্য প্রতিমুহূর্তে আবিষ্কার করতে করতে এগোচ্ছি আমরা প্রত্যেকেই। কাল সকালে আমাদের জীবনে কী ঘটবে তা আমিও জানি না, তুমিও জানো না। কোনও মানুষই জানে না। ঈশ্বর বলে কোথাও যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি প্রতিটি মানুষকেই এমন গভীর রহস্যে ডুবিয়ে রেখেছেন আকণ্ঠ। যে ঘুঁটে কুড়ুনি, সে হয়তো কাল সকালে কোনও অদৃশ্য লেখনে রাজা হয়ে যেতে পারে। যে রাজা, সে হতে পারে ঘুঁটে কুড়ুনি। যদি কারও চোখ থাকে, তাহলে জীবনের রহস্যের এই টুকরো টুকরো অংশগুলো জোড়া লাগিয়ে বিস্ময়ে লীন হয়ে যেতে পারে, সত্যিই জীবন এত রহস্যময়! কার মনে কী রহস্য খেলা করছে তা কি অন্য কেউ জানতে পারে।

সায়ন হতাশ হয়ে বলল, নাহ, তোমাকে গোয়েন্দা হয়ে ওঠা থেকে বোধ হয় আর আটকানো যাবে না।

pathagar.net

সায়নের অসহায় মুখখানা দেখতে গার্গীর বেশ লাগল। কফির কাপ সামনে পেলে সায়নের চোখ-মুখ যেমন চড়ুইপাখিটির মতো ছটফট হয়ে ওঠে, শেষ চুমুক দেওয়ার পর যেমন তৃপ্ত, আর বুঁদ, আজ সেই তৃপ্তির মধ্যে একটা হতাশা পাঞ্চ হয়ে বেশ ভোম্বল-ভোম্বল লাগছিল সায়নকে। গার্গী মজাও পাচ্ছিল, মায়াও হচ্ছিল ভেতরে-ভেতরে।

রাত তখন তার নিজস্ব রহস্য বিছিয়ে চাউর হয়ে যাচ্ছে কলকাতার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কফিপর্ব শেষ হতেই গার্গী কিচেনে। রাতের খাবার গরম করতে করতে তখন দ্রুত ছক কষে নিচ্ছে কীভাবে হলুদবর্ণ খামের সূত্র ধরে সে এগোবে তার রহস্য উন্মোচন করতে। নীল নয়, খয়েরি নয়, তার এখন লক্ষ হলুদ রঙ। তার এই নতুন ভূমিকায় দক্ষ হয়ে ওঠার অন্তরায় যে কী তা একটু আগেই কবুল করেছে সায়নের সঙ্গে আলোচনার সময়। তার তো শার্লক হোমস কিংবা মিস মারপলের মতো গোয়েন্দা হিসেবে কোনও পরিচিতি নেই। যেটুকু তার সম্বল তা দেবাদ্রি সান্যালের সামান্য প্রশ্রয়। এইটুকু ক্যাপিটাল নিয়ে একটা খুনের রহস্য তদন্ত করা খুবই কঠিন। তবু মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বার করতেই হবে আজ রাতের মধ্যে। যে নীলবাবুর সন্ধান খুঁজে বার করা দেবাদ্রি সান্যালের পক্ষে এই মুহূর্তে খুবই দুরূহ, সেই নীলবাবু আপাতত তার জিম্মায় বন্দি একটা হলুদ খামের ভেতর। এই মূলধন হাত ছাড়া করা কি তার পক্ষে উচিত হবে।

সে রাতে গার্গীর চোখে বহুক্ষণ নিদ্রাদেবী ভর করতে পারলেন না—যতক্ষণ না পরবর্তী রণকৌশল নির্ধারিত হল তার ছোট্ট মগজে।

আট

পরদিন বেলা আটটার মধ্যে গার্গী তার সংসার সামলে সোজা চলে এল বাইশের দুইয়ের বি প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের ঠিকানায়। বাড়িটি দোতলা, একতলার জনৈক আর, এল. গুপ্তের বাস। দোতলার সিঁড়ির বাইরে যে নেমপ্লেট ঝুলছে তাতে লেখা নীলধ্বজ বাগচি বৃন্দা বাগচি। বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করেই গার্গী গাড়ি থেকে নেমে আঙুল ছোঁয়াল কোনও আধুনিক গানের মিউজিক শোনানো কলিংবেল। মিনিটখানেক পরেই প্রায় রিমোট কন্ট্রোলের মতোই দরজাটা খুলে দিলেন কেউ। গার্গী ভেতরে ঢুকে কাউকেই দেখতে পেল না। দেখল, দরজার পেছনদিকে একটা লোহার চেন বাঁধা, সেটা রওনা দিয়েছে দোতলা অভিমুখে। দোতলার ঘরে বসেই চেন ধরে টান দিলে দরজাটা খুলে যাবে এমনই ব্যবস্থা।

দরজা খোলার এহেন রিমোট কন্ট্রোল বুঝে নিয়ে গার্গী এবার সামান্য টেনশনসহ পা বাড়াল দোতলার সিঁড়িতে । বেশ উচ্চবিত্ত ধরনের ফ্ল্যাট। প্রশস্ত, ঝকঝকে। হালকা গোলাপি মসলিনের পর্দা যততত্র ঝুলে আছে ফ্ল্যাটটির আভিজাত্য বাড়াতে। লিভিংরুমের রাজকীয় চেহারায় সোফায় যিনি বসে আছেন বছর বত্রিশ তেত্রিশের একজন লম্বা ফর্সা যুবক। মেরুন পাঞ্জাবি সাদা পাজামা পরনে, মুখে সিগারেট গুঁজে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ গার্গীকে দেখে কিছুটা বিস্মিত, ভুরু তুলে বললেন, কী ব্যাপার!

সেন্টারটেবিলের ওপর জিরোতে থাকা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় নজর ফেলে গার্গী ততক্ষণে দেখে নিয়েছে, নীলধ্বজ বাগচি সেই সংবাদটিই পড়ছিলেন, যাতে ল্যান্সডাউন রোডের ফ্ল্যাটে গতকাল যে হত্যাকাণ্ডটি সম্পন্ন হয়েছে, তারই বিবরণ বেশ ফলাও করে বর্ণিত। অনুমতি

pathagar.net

ছাড়াই যুবকটির মুখোমুখি সোফায় বসল গার্গী। বসেই কোনও ভনিতা না করে জিজ্ঞাসা করল, আপনি নিশ্চই নীলধ্বজ বাগচি?

—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

দেখুন, আমি বিনীতা রায়ের মার্ডার সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি।

—আপনি, মানে—, নীলধ্বজ এই আচমকা হানায় বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেন। এতটাই বিপর্যস্ত যে, ঠোঁটের সিগারেটটা অ্যাশট্রের ওপর রেখে, সোফা থেকে চট করে উঠে বন্ধ করে দিলেন ড্রয়িংসংলগ্ন বেডরুমের দরজাটা। এতক্ষণে বেডরুমের অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম থেকে একটানা জলধারার শব্দ ভেসে আসছিল। দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও বন্ধ হল আপাতত।

—আমি পুলিশের কেউ নই। আমার নাম গার্গী চৌধুরি। তবে এই খুনের ঘটনার যিনি তদন্ত করছেন, সেই পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল আমার অত্যন্ত পরিচিত। তবে সেটাও বড় কথা নয়, বলতে পারেন আমি বিনীতা রায়ের জনৈক হিতৈষিণী।

নীলধ্বজ বাগচি তখনও ঠিক আতস্থ হতে পারেননি। চোখে শান দিয়ে চেষ্টা করছেন গার্গীকে, তার প্রকৃত ভূমিকাই বা কী সেটা বুঝতে। একটু শক্ত হয়ে বললেন, কিন্তু সে ব্যাপারে আমার কাছে এসেছেন কেন?

—কারণ বিনীতা রায়কে আপনি চিনতেন। কী পরিপ্রেক্ষিতে বিনীতা খুন হলেন এ সম্পর্কে আপনি যদি কিছু আলোকপাত করতে পারেন সেই আশাতেই আপনাকে এভাবে বিরক্ত করা।

নীলধ্বজ বাগচি আরও শক্ত হয়ে বললেন, আপনি ভুল করছেন। এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। আপনি এখন আসতে পারেন। এই মুহূর্তে আমি ভীষণ ব্যস্ত। যাকে চিনিই না, তাকে নিয়ে সময় ব্যয় করার মতো সময় আমার হাতে নেই।

—কিন্তু আপনি বিনীতা রায়কে চিনতেন, গার্গী জোর দিয়ে বলল।

—চিনতাম মানে, নীলধ্বজ বাগচি ইতস্তত করে বললেন, আলাপ ছিল এটুকুই বলতে পারি।

—শুধু আলাপ! গার্গী তার তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে ফুঁড়ে ফেলতে চাইল নীলধ্বজ বাগচির বিভ্রান্ত চোখমুখ, না কি আলাপের চাইতে আরও একটু বেশি।

—না না নীলধ্বজ বাগচি জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে একদম ঝেড়ে ফেলতে চাইলেন বিনীতা রায়কে, সামান্য আলাপ। ব্যস, ওইটুকুই। এ ব্যাপারে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না, প্লিজ। আমাকে এখনই রেডি হয়ে বেরোতে হবে। আপনি এখন আসতে পারেন।

গার্গী মিটমিট করে হেসে পর্যবেক্ষণ করতে চাইল নীলধ্বজ বাগচির সন্ত্রস্ত চেহারা। কিন্তু এখনই গেলে আমার তো চলবে না, মিঃ বাগচি। আপনার সঙ্গে বিনীতা রায়ের যে একটা সম্পর্ক ছিল তা আমি জানতে পেরেছি। আর সেই কারণেই আমার আসা।

নীলধ্বজ সামান্য বিপর্যস্ত মনে হল, তবু রূঢ় গলায় বললেন, কী জানতে পেরেছেন?

—জানতে পেরেছি যে প্রায়ই দুপুরের দিকে আপনি বিনীতা রায়ের কাছে যেতেন।

—কে বলেছে এসব আপনাকে? সব ড্যাম লাই—

—আপনি তাকে চিঠি লিখতেন সে কথা তো অস্বীকার করতে পারবেন না।

—চিঠি! কই, না তো— কথা বলার সময় বেডরুমের বন্ধ দরজাটার দিকে সন্ত্রস্ত চোখে নীলধ্বজ বাগচিকে তাকাতে দেখে অবাক হচ্ছিল গার্গী।

pathagar.net

—এটাও যদি অস্বীকার করেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনি গোটা ব্যাপারটাই চেপে যেতে চাইছেন, বলতে বলতে গার্গী তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে নীলধ্বজ বাগচির লেখা চিঠির একটি ফটোকপি বার করল, দেখুন তো, এই হাতে লেখাটা আপনার কি না!

—প্রথমে জোরে তারপর ক্ষীণভাবে হলেও গার্গীর সঙ্গে বেশ লড়াকু ভঙ্গিতে এগোচ্ছিলেন নীলধ্বজ বাগচি। হঠাৎ তার মুখটা রক্তশূন্য হয়ে গেল ফটো কপির ওপর চোখ পড়তে। গার্গীকে নস্যাৎ করার যে প্রবণতা এতক্ষণ দেখাচ্ছিলেন তা মুহূর্তে উবে গিয়ে ভেঙে পড়লেন মিনমিন করে, কিন্তু বিশ্বাস করুন, ও চিঠির সঙ্গে বিনীতা রায়ের খুন হওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই।

—কিন্তু চিঠির বয়ান অন্য কথা বলছে।

—আসলে একটা বিশেষ কারণে লিখতে হয়েছিল চিঠিটা।

—কী সেই বিশেষ কারণ, মিঃ বাগচি?

নীলধ্বজ ঘাড় নাড়লেন, সেটা একান্তই ব্যক্তিগত।

—কিন্তু ব্যক্তিগত সেই কারণই এখন সম্পূর্ণ আপনার বিরুদ্ধে, তা নিশ্চই বুঝতে পারছেন! এ চিঠি পুলিশের হাতে গেলে পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করবে, মিঃ বাগচি।

নীলধ্বজ বাগচি সহসা কেঁপে উঠলেন নিজের ভেতর, কিন্তু খুনটা আমি করিনি। আমার পক্ষে করা সম্ভবও নয়, মিসেস চৌধুরি।

গার্গী এবার আসল প্রশ্নের শামিল হল, কাল দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন, বলুন তো!

—কাল! কাল—কাল দুপুরে একটা টেণ্ডারের ব্যাপারে গিয়েছিলাম এসপ্ল্যানেড ইস্টে ডিফেন্সের একটা অফিসে। ওখানে মিঃ সঞ্জীব গুপ্তার চেম্বারে ঢুকেছিলাম।

—তখন ক'টা হবে আন্দাজ?

—ক'টা ! তা দুটো থেকে তিনটে সাড়ে তিনটে হবে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বেডরুমের লাগোয়া বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শুনল গার্গী। সেই শব্দে সচকিত হয়ে নীলধ্বজ বাগচি মুহূর্তে সেন্টার টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ফটোকপি করা চিঠিটা তুলে নিয়ে অন্তর্হিত করলেন তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে। তাঁর মুখের সন্ত্রস্তভাব ও চিঠি তুলে নেওয়া অসম্ভব তৎপরতার দৃশ্য তৎক্ষণাৎ গার্গীর ঠোঁটে ঘনিয়ে আনল স্মিত কৌতুক। পরক্ষণেই হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের গোলাপি হাউসকোট পরা এক স্বাস্থ্যবতী যুবতী বেডরুমের দরজা খুলে বেরোতে গিয়েই সহসা গার্গীকে দেখে থমকে দাঁড়াল এক মুহূর্তে। ভুরুতে কোঁচ ফেলে নিজের পোশাকের দিকে চকিতে নজর ছুঁয়ে বেডরুমের ওপাশে সম্ভবত কিচেনের মধ্যে ঢুকলেন দ্রুত পায়ে। মাথার চুলে তোয়ালে জড়িয়ে খোঁপা করে বাঁধা। সদ্য স্নান সেরে বেরোনোয় মাথার সামনের দিকে ও কপালে অবিন্যস্ত চুলের রাশ। দুধে আলতা গায়ের রঙ। চোখের দৃষ্টি খর। যাকে বলে প্রবল সুন্দরী। সম্ভবত ইনিই নীলধ্বজের স্ত্রী বৃন্দা বাগচি। —নেমপ্লেট থেকে এমনই ধারণা হল গার্গীর। তাঁকে বাথরুম থেকে বেরোতে দেখে বেশ নার্ভাস দেখাল নীলধ্বজকে, সামান্য সন্ত্রস্ত্র গলায় বললেন, ঠিক আছে, আমার যা-বলার তা তো বললাম। এবার আপনি আসতে পারেন। আমাদের দুজনকেই এবার বেরোতে হবে।

গার্গী তাতেও ওঠার কোনও লক্ষণ দেখাল না, বলল আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—তাহলে বরং আমার অফিসে আসুন। বাগচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি, সেভেনটি ফোর বাই টু বি বাই ওয়ান পার্ক স্ট্রিট। পার্ক প্লাজার ঠিক আগে। বিকেল তিনটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ওখানেই থাকি। ফোন নম্বর টু ফোর ফোর থ্রি টু।

pathagar.net

—আর তার আগে?

—তার আগে বিভিন্ন সাইডে ঘুরতে হয় আমাকে, যেখানে যেখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে দেখতে হয় তার কাজকর্ম। রোজই নটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হয় আমাকে। সাইড ঘুরে কিংবা বিভিন্ন অফিসে টেণ্ডার অ্যাটেণ্ড করে কিংবা পেমেন্টের জন্য ধর্না দিতে হয় সারা দুপুর। বোঝেনই তো আমাদের কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কাজে কত ঝামেলা!

ঠিক সেই মুহূর্তে বেডরুমের ভেতর থেকে টেলিফোনের তীব্র পিঁক-পিঁক-পিঁক আওয়াজ আসতেই সোফা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন নীলধ্বজ। তার আগেই কিচেন থেকে বেরিয়ে বৃন্দা দ্রুত অ্যাটেণ্ড করতে গেলেন ফোন। পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, তোমার ফোন—

ফোন শুনে নীলধ্বজ তৎক্ষণাৎ এগিয়ে গেলেন বেডরুমের দিকে। বৃন্দা আরও একবার তার বিরক্তির নজর গার্গীর মুখ-চোখ শরীরের ওপর রেখে আগের মতোই দ্রুত পায়ে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিলেন কিচেনে। তার আগেই গার্গী মৃদুকণ্ঠে ডাকল, শুনুন, মিসেস বাগচি—

বৃন্দা খুবই অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন, ভুরুর বিরক্তির ভরা কোঁচ মেলাতে সময় নিলেন একটু। পরক্ষণেই এগিয়ে এলেন, কী বলুন?

—দু মিনিট যদি সামনের সোফাটায় বসেন। দু-তিনটে প্রশ্ন করে আপনাকে।

—আমাকে! বৃন্দা প্রবল বিস্ময় নিয়ে সোফায় বসতেই গার্গী দ্রুত তার প্রশ্নাবলি। সাজিয়ে নিল মনে মনে। নীলধ্বজ তার টেলি-আলাপ সেরে বেরোনোর আগেই নাড়াচাড়া দিতে হবে বৃন্দাকে।

—আচ্ছা মিসেস বাগচি, সকালের কাগজটা নিশ্চই পড়েছেন?

—হ্যাঁ একঝলক চোখ বুলিয়েছি।

—তাহলে নিশ্চই বিনীতা রায় নামে যে মহিলা খুন হয়েছেন, তাঁর ফ্ল্যাটের ভেতর সে খবরটাও নজরে পড়েছে।

—হ্যাঁ পড়ার তো কথা। যেভাবে ফার্স্ট পেজে বোল্ডটাইপে ছাপা হয়েছে।

—আপনি কী করেন মিসেস বাগচি?

বৃন্দা বাগচি তখনও বুঝে উঠতে পারছেন না গার্গীর পরিচয় কী। তাঁর স্বামী নীলধ্বজ যখন গার্গীর সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলেছেন, তখন তাঁর চেনা হতে পারে। তবু নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, আমি স্টেজে অভিনয় করি। স্বাতন্ত্র্য গ্রুপ থিয়েটারে। কিন্তু আপনি? নীলধ্বজের সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?

—না। আজই পরিচয় হল। আমি ওই খুনের ব্যাপারেই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছি। লালবাজারের সঙ্গে আমার কানেকশন আছে।

লালবাজার শুনে বৃন্দার ভুরুতে আবার কোঁচ। বললেন, হ্যাঁ। বলুন?

—কাল দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন বলুন তো?

—আমি! বৃন্দার গলায় একলক্ষ বিস্ময়। কিছুক্ষণ গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি বাড়িতেই ছিলাম। সন্ধেয় শো ছিল। পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে যাই। আজও শো আছে।

—আর নীলধ্বজবাবু?

—ও তো দুপুরে দেড়টা নাগাদ বেরোল। বলল, টেণ্ডার আছে কোন অফিসে।

গার্গী চকিতে একবার বেডরুমে খোলা দরজার দিকে তাকাল, যার ভেতর আপাতত নীলধ্বজ বাগচি অন্তরিন। টেলিফোনে তার কথা বলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে গার্গী।

pathagar.net

—আপনি কি জানেন যে মহিলা খুন হয়েছেন তাঁর সঙ্গে নীলধ্বজবাবুর একটা যোগাযোগ ছিল?

বৃন্দা এক লহমা কেঁপে উঠল নিজের ভেতর, তারপর ঘাড় নাড়ল, না, জানতাম না।

—নীলধ্বজবাবু প্রায়ই দুপুরে বিনীতা রায়ের কাছে যেতেন। কেন, তা কিছু অনুমান করতে পারেন?

বৃন্দা পালটা প্রশ্ন করল, আপনি কী করে জানলেন?—

যেভাবেই হোক জানতে পেরেছি। নীলধ্বজবাবু চিঠিও লিখতেন বিনীতা রায়কে। বৃন্দা গলা নামাল, হতে পারে। আমি ওসবের কোনও কিছুই জানিনে।

—আপনি চিনতেন বিনীতা রায়কে?

বৃন্দা ইতস্তত করল, হ্যাঁ। আলাপ হয়েছিল একবার।

—কী সূত্রে আলাপ হয়েছিল আপনাদের?

বৃন্দা চেপে যেতে চাইল কিছু, দেখা হয়েছিল কোনও একটা পার্টিতে।

—ও! গার্গী এবার চাপ সৃষ্টি করল বৃন্দার ওপর, নীলধ্বজবাবু যে কাল দুপুরেও বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিনীত রায়ের কাছে গিয়েছিলেন, সে খবর জানেন?

বৃন্দা যেন আর একবার কেঁপে উঠলেন নিজের ভেতর, ঠোঁট কামড়ে ধরলেন দাঁত দিয়ে। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, তাই নাকি!

গার্গী আন্দাজে ফেলেছিল টোপটা। বৃন্দা সেটা খেয়ে ফেলল দেখে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। আপনি জানেন, বিনীতা রায়ের আলমারি থেকে এমন একটা চিঠি পাওয়া গেছে,যা থেকে প্রমাণিত হতে পারে, বিনীতা রায়কে উনিই কাল দুপুরে—

বৃন্দা একদম ভেঙে পড়ল এবার, থাক, থাক আর বলতে হবে না। এবার সব পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে। সেই জন্যেই ওকে এত বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল কাল বিকেলে—

—কাল ক'টায় বাড়ি ফিরেছিলেন নীলধ্বজবাবু?

বিকেলে চারটে নাগাদ।

গার্গী খুবই অবাক হচ্ছিল নীলধ্বজবাবুর গতিবিধির সঙ্গে বিনীতা রায়ের খুন হওয়ার ঘটনাটার সময় হুবহু মিলে যাচ্ছিল দেখে। আরও অবাক হচ্ছিল তার স্ত্রী বৃন্দা দিব্যি বিশ্বাস করছিল নীলধ্বজ এ-কাজ করতে পারেন। শুনে। অর্থাৎ দুজনের মধ্যে অবিশ্বাসের বীজ ভীষণভাবে অঙ্কুরিত হয়েছে।

গার্গী আরও একটু বাজিয়ে দেখতে বলল, বিকেলে বাড়ি ফেরার পর রাতে কি আবার বেরিয়েছিলেন বাইরে?

—না। বিছানায় গুম হয়ে শুয়েছিল। রাতেও ভাল করে ঘুমোতে পারেনি।

গার্গী এবার উঠে পড়তে চাইছিল, ওঠার আগে বলল, বাট নাউ হি উইল বি ইন ডিপ ট্রাবল।

বৃন্দার অনেকদিনের ক্ষোভ এবার বার্স্ট করল, ওর শাস্তি পাওয়াই উচিত। যে নিজের বউকে অন্যের হাতে তুলে দিতে চায় নিজে বাঁচার জন্যে, তার—

বৃন্দা হয় তো আরও কিছু বলতে চাইছিল, সেই মুহূর্তে টেলিফোন বার্তা শেষ করে বেডরুম থেকে এলেন বেরিয়ে নীলধ্বজ। গার্গী তৎক্ষণাৎ আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল অন্যদিকে। আপনার বারান্দায় যে বনসাইগুলো দেখে এলাম সেগুলো সত্যিই চমৎকার, মিসেস বাগচি।

pathagar.net

—হ্যাঁ দাঁড়ান, আপনার জন্যে চা করে আনি, বলে বৃন্দা মুখে হাসি আনার চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তে অন্তরিন হল কিচেনের দিকে।

—থ্যাঙ্কু, চা আজ থাক, বলে গার্গীও উঠল সোফা থেকে। নীলধ্বজ ততক্ষণে চিন্তিত মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন গার্গীর সামনে। পেছনদিকে একবার সন্ত্রস্ত চোখে তাকিয়ে বৃন্দাকে দেখা যাচ্ছে কি না পরখ করে দ্রুত তার পাঞ্জাবির পকেট থেকে বার করল একটা হলুদ রঙের খাম। ঠিক বিনীতা রায়ের আলমারি থেকে যেরকমটা হাতিয়েছিল গার্গী। সেটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নীলধ্বজ নিচু গলায় বললেন, এর মধ্যে একটা ঠিকানা আছে অপরূপা মিত্রের। বৃন্দার সঙ্গে একই গ্রুপে নাটক করে। ওকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন কে খুন করেছে বিনীতাকে।

গার্গী তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, তাহলে তো আপনিও জানেন কে খুন করেছে।

—জানিই তো। সত্য। সত্যই তো তার বলকে—

কাগজটায় চোখ বুলিয়ে গার্গী দেখল, ঠিকানা ও ফোন নম্বর 'স্বাতন্ত্র্য' নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী অপরূপা মিত্রর। নীলধ্বজ বেশ যত্ন করে অপরূপা মিত্র বাড়ির ঠিকানা, বাড়িতে যাওয়ার পথনির্দেশ টেলিফোন নম্বর একটা চিরকুটে লিখে তুলে দিয়েছেন গার্গীর হাতে, যাতে বিনীতা রায়ের হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে পারে গার্গীকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গার্গী ভাবছিল, একই ছাদের নিচে বাস করে দুই নারীপুরুষ, অথচ দুজনে দুটি সমান্তরাল সরলরেখার মতো। সব সময়ই একটা দূরত্ব রেখে চলবে, কখনও মিলবে না।

নয়

নীলবাবু লোকটি যে কে, তাকে কীভাবে খুঁজে বার করবেন কলকাতার এই জনারণ্যে তা নিয়ে বিস্তর রাম-শ্যাম-যদু-মধু ভেবে চলেছেন দেবাদ্রি সান্যাল। ইতিমধ্যে তিনের দুই ফ্ল্যাটের কাজের লোক পাঁচিকে লক-আপ থেকে ডেকে পাঠিয়ে জেরা করেছেন আর এক প্রস্ত। বেশ ভয়ও দেখিয়েছেন। তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। বরং পাঁচি পুলিশের ভয়ে দাঁতে দাঁত লেগে সংজ্ঞাহীন হওয়ার উপক্রম।

রুলের উঁচোনো তর্জনি, খাকি উর্দির ধমক, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইন্টারোগেশন সেল— সব মিলিয়ে, একটি নিরক্ষর পরিচারিকার অভিব্যক্তি রক্তশূন্য করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। যেটুকু কথা অতিরিক্ত আদায় করা গেছে তা হল, 'সত্যি বলছি বাবু। এই কালো চশমা পরা বাবুর সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি আর জানিনে। আমার ছেলে একদিন খুঁজতে এসেছিল আমাকে। আমি তখন অন্য বাড়িতে কাজে গেছিলাম। সে বলল, বউদিমণি ওই চশমা-পরা লোকটার সঙ্গে সোফায় বসে কথা বলছিলেন। লোকটা বেশ রাগারাগি করছিল।

পাঁচিকে ফুটিয়ে দিলেন অতঃপর। তাঁর বিশ্বস্ত অধস্তন আকিঞ্চন দত্তকে ডেকে হুকুম দিলেন, যাও তো, আকিঞ্চন পাঁচিকে নিয়ে ওর বস্তিতে চলে যাও। ওর ছেলের নাম ঘোলা। তাকে জিপে তুলে নিয়ে চলে এসো। ছোঁড়ার সঙ্গে যদি কোনও শাগরেদ বা দোস্ত থাকে তাদেরও—

পাঁচি অবশ্য ভয় পেয়ে, হাউমাউ করে চ্যাচাতে শুরু করেছিল, দোহাই বাবু, আমার ছেলে

pathagar.net

একদম কচি। ও কিচ্ছুর মধ্যে কিছু জানেনি। বউদিমণির ফ্ল্যাটে এক-আধদিন আমার খোঁজ করতি গেছে মাত্তর— তার বেশি কিছু নয়। ওরে নে এসে যেন মেরোনি, বাবু। ও বাবু—

দেবাদ্রি রুল উঁচিয়ে পরবর্তী ধমক দিতেই আবার দাঁতে দাঁত।

রুলটা অবশ্য পাঁচির জন্য নয়, প্রস্তুত করলেন তার ছেলে ঘোলির জন্য। সত্যব্রত বলেছিল, ঘোলার ব্যাকগ্রাউণ্ড খুব সুবিধের নয়। ওয়াগন ব্রেকার টাইপ। ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে যে-সব পরিবার থাকে, তাদের অধিকাংশই একে অন্যের খবর রাখতে নিস্পৃহ। 'হাম দো হামারা এক' হয়ে ছোট্ট একটা পরিবার খোকো অন্তরিন হয়। কোত্থেকে এক-একটা কাজের লোক তার ভেতর জুটিয়ে খাল কেটে কুমির আনে। কুমির একদিন সর্বস্ব লুটেপুটে, প্রয়োজন হলে মালিক বা মালকানকে খুন করে উধাও হয় কোথায় না কোথায়। এ ক্ষেত্রে পাঁচির ছেলেকে একটু কড়কে দিলে কোনও নয়া তথ্যের উদ্দাম হয় কি না সেটাই দেবাদ্রির অভীষ্ট।

আকিঞ্চন দত্তর জিপ ফিরতে বেশ বেলাই হল। সঙ্গে দুটো কচি কচি অ্যান্টি-হিরো। দুজনেরই কাঠপেন্সিলের মতো চেহারা। একজনের সরু লম্বা মুখের কাঠামো। টিয়াপাখির মতো নাক। পরনে সরু ঘেরের চাপা প্যান্ট, পায়ের গোড়ালির অনেকটা ওপরে তার ঝুল। গায়ে ময়লা নীল টি-শার্ট তার পেছনে লেখা, আই অ্যাম থার্স্টি। সোর নামই ঘোলা। অন্যজনের পরনে রঙিন বাহারি লুঙ্গি-হলুদ ছিট-ছিট প্রিন্টের। গায়ে মেটেরঙের হাফ হাতা গেঞ্জি। মাথার চুল চুড়ো করে আঁচড়ানো। তাকে দেখিয়ে আকিঞ্চন দত্ত বলল, স্যার, বস্তিতে এর নাম শাহ রুস্তম।

শাহ্ রুস্তমের দিকেই চোখ বিদ্ধ হল দেবাদ্রি সান্যালের। চালচলনে বেপরোয়া ভাব। চাউনিতে ক্রুরভঙ্গি। আপাতত পুলিশের খপ্পরে পড়ে সামান্য ভয়ার্ত। দুজনে সামনে আসতেই দেবাদ্রি হাতের তেলোয় তুলে নিলেন তাঁর প্রিয় রুলটি। শাহ্ রুস্তমের দিকে নজর রেখে বললেন, কী নাম তোর?

—আজ্ঞে রতন।

—রতন, না রুস্তম।

—আজ্ঞে না স্যার। পাড়ার লোকে আদর করে রুস্তম বলে ডাকে।

—তাই? খুব আদর করে নাকি পাড়ার লোক? কেন রে? খুব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিস বুঝি পাড়ায়? তাহলে তোর নাম শাহ্ রুস্তমই মানায়, কী বল?

রুস্তম চুপ করে থাকে, চোখ ঘুরিয়ে দপ্তরের চারদিকে চোখ বোলাতে থাকে গভীর কৌতূহলে। একবার দেবাদ্রির হাতের ঘুরন্ত রুলটির দিকেও তাকায়। চোখে আরও কয়েক আউন্স ভয় মিশেল হয়।

—ঘোলা তোর কে হয়?

—আজ্ঞে, বন্ধু।

—কীরকম বন্ধু। একসঙ্গে রাতের বেলা ওয়াগন ভাঙতে যাস?

—না, স্যার, আমার কোনও খারাপ কাজ করিনে।

—তাই নাকি? সবই ভাল কাজ করিস? বাহ্ বাহ্ বেশ ভাল ছেলে তো তোরা? তা কী কী ভাল কাজ করিস তার একটা লিস্টি শোনা তো।

রুস্তম চুপ করে থাকে। কী বলবে ভাবতে ভাবতে বাঁ-হাতের আঙুল দিয়ে ডানহাতের নখ খোঁটে। একবার ঘোলার দিকে তাকায়। ঘোলা অবশ্য স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক শরীর ভীতি নিয়ে।

pathagar.net

—বল কী কী ভাল কাজ করিস?

—আজ্ঞে স্যার, কেউ মরে গেলে আমরা শ্মশান-ঘাটে নিয়ে যাই।

—বাহ, বাহ, চমৎকার, দেবাদ্রি সহসা তাঁর দপ্তর ফাটিয়ে হা হা করে হেসে ওঠেন, তা বেশ তো, তা সপ্তাহে ক'বার করে শ্মশানে যেতে হয় তোদের।

শাহ্ রুস্তম আবার ভাবতে থাকে, নখ খোঁটে অবিরল। দেবাদ্রির রুলটা তার মেটে রঙের গেঞ্জির ওপর স্যাকরার হাতুড়ির মতো ঠুকঠুক করছে দেখে বলল, আজ্ঞে স্যার, হপ্তায় দু-তিনবার তো যেতে হয়ই।

—সপ্তাহে দু-তিনবার? এত লোক মরে নাকি তোদের বস্তিতে।

—না। স্যার, না মরলেও যাই।

—তাই! দেবাদ্রি সহসা কী যেন অনুমান করে। বুঝেছি, শ্মশানঘাটে তোদের একটা ঠেক আছে নিশ্চই। কী করিস ওখানে? ধেনো খাস?

—না, স্যার। আমরা ধেনো খাই না।

—তাহলে নিশ্চই গাঁজা?

শাহ রুস্তম চুপ করে নখ খুঁটতে শুরু করে পুনর্বার। দেবাদ্রির রুল তার কনুইয়ের ছোট্ট একটা ঘা মারে। ওইটুকু ঘায়েই অবশ্য সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করে ওঠে শান রুস্তমের। দেবাদ্রি কনুইয়ের ওই বিশেষ জায়গাটি জানেন।

—বল শিগগির।

—আজ্ঞে মাঝেমধ্যে খাই।

—হুঁ। তুইও তাহলে রুস্তমের কলকে বন্ধু অ্যাঁ? দেবাদ্রির চোখ হঠাৎ ঘোলার দিকে, সেইজন্যেই শরীর দুটো এমন দড়ি-দড়ি?

ঘোলার কনুয়েও একটা রুলাঘাত হতে সে চিৎকার করে ওঠে।

—কী রে, কাল দুপুরে তোরা দুজন কোথায় ছিলিস?

ঘোলার দিকেই দেবাদ্রির চোখ। উত্তর দিল ঘোলাই, কাল দুপুরে, স্যার। ঘোলা ঢোক গিলে বলে, ঘরে ঘুমোচ্ছিলাম, স্যার।

—ঠিক করে বল? নইলে—

রুল আবার উদ্যত হতেই রুস্তম হবে ওঠে, সত্যি বলছি, স্যার, পরশু রাতে শ্মশান থেকে ফিরতে রাত কাবার হয়ে গিয়েছিল। মরা পুড়িয়ে ফিরে—

—মরা! কার মরা! পরশু রাতেও কি তোদের পাড়ায় কেউ—

—না, স্যার। আমাদের পাড়ায় নয়। এক লিডার টেঁসে গিয়েছিল, স্যার।

—লিডার, কে লিডার?

—আজ্ঞে, তা ঠিক জানি না। এরকম তো মাঝেমধ্যে আসে। অনেক লোক এসে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ করলেই আমরা বুঝে যাই, নির্ঘাত লিডার। আমরাও স্যার, তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাই। বিনিপয়সায় চা বা খাবারের প্যাকেট পাওয়া যায়।

দেবাদ্রি অনুমান করার চেষ্টা করছিলেন, এহেন অ্যান্টি-হিরোদের বিনীতা রায় খুন হওয়ার সম্ভাবনা কতটা। দুজনেরই বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে শ্মশানে-মশানে যারা পড়ে থাকে, তাদের ব্যাকগ্রাউণ্ড অধিকাংশই ভাল হয় না। এই ছোকরাদুটোকে অবশ্য তিনি এর আগে দেখেননি। কিছুটা ফুরসত খুঁজে লোকাল থানার ও. সি কে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেন, ঘোলা

pathagar.net

বা রতন ওরফে শাহ্ রুস্তমের নামে কোনও কেস আগে রুজু হয়েছে কিনা। হয়নি জেনে একটু নিরাশ হলেন। তাহলে এখন অভিজাত কালপ্রিটদের খাতায় নাম ওঠেনি ওদের। ছিঁচকে হলেও হতে পারে। বিনীতা রায়ের খুনটায় ওদের হাতে খড়ি হওয়াও অসম্ভব নয়। ভয় দেখিয়ে কিছু মালকড়ি নিয়ে কেটে পড়ার ধান্দা করেছিল হয়তো। চিনতে পেরে চ্যাঁচামেচি করতেই ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছে এমনও হতে পারে। লোকাল ও. সি-র কাছে আর খবর নিয়ে জানলেন, পরশু রাতে স্থানীয় লোকাল কমিটির এক লিডার সত্যিই মারা গিয়েছে। তাকে পুড়িয়ে ঘরে ফিরতে পার্টির লোকদের ভোর হয়ে গিয়েছিল। শাহু রুস্তমের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে সারা রাত জাগার পর কাল দুপুরে পড়ে-পড়ে ঘুমোনো অসম্ভব নয় দুই অ্যান্টি হিরোর পক্ষে। তবু নীলবাবুর খবরটাই আগে নেওয়া যাক। ঘোলার দিকে চোখ রাখলেন দেবাদ্রি।

তিনের দুই ফ্ল্যাটে, তোর মা যেখানে কাজ করে, তুই মাঝেমধ্যে যেতিস?

ঘোলার মুখ ফ্যাকাসেই ছিল এতক্ষণ, এবারে ফ্যাকাসেতর হল। ঢোক গিলে বলল, হ্যাঁ। মাকে খুঁজতে।

—ফ্ল্যাটের ভেতর কখনও ঢুকেছিস?

—না, স্যার। কক্ষনো না। মাকে ডাকলে বাইরে এসে কথা বলে যেত।

—কাল দুপুরে গিয়েছিলি?

—না, স্যার, মাইরি বলছি, স্যার। যাইনি। ঘুমোচ্ছিলাম। তারপর সন্ধেবেলা জানলাম, কেস খুব হেভি।

—কী কেস?

ওই স্যার, মার্ডার।

—এদের ফ্ল্যাটে কালো চশমা-পরা এক ভদ্রলোক যাতায়াত করতেন, তুই দেখেছিস কখনও তাঁকে?

ঘোলা তার ভয়মাখানো চোখ স্থির করল দেবাদ্রির ওপর, বুঝে উঠতে পারল না 'হ্যাঁ বললে সুবিধে হবে , না কি 'না' বলবে?

—সে, স্যার একদিন মাকে খুঁজতে এসে দেখেছিলাম লোকটা তিনের দুই ফ্ল্যাটের ভেতর সোফায় বসে আছে। খানিক পরে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

—তখন লিফট চলছিল না?

—না, স্যার। দুপুরে ওদের লিফটম্যান থাকে না।

—থাকে না তুই কী করে জানলি?

—লালু তো আমাদের ওদিকেই থাকে, স্যার। দুপুরে খেতে যায় রোজ।

—ফ্ল্যাটে তখন আর কে ছিল?

—আজ্ঞে, ওই বাড়ির বউটা, একা।

—হুঁ। লোকটাকে দেখলে তুই চিনতে পারবি?

—পারব, স্যার।

—লোকটা কোথায় থাকে জানিস?

—না, স্যার। আমি নিচে নেমে দেখলাম লোকটা একটা ট্যাক্সিতে উঠে চলে গেল।

খুবই হতাশ আর বিরক্ত দেখাল দেবাদ্রিকে। কলকাতার এই লক্ষ ভিড়ে লোকটা কোথায় থাকে তার সামান্য কোনও সূত্র না পেলে খুঁজে বার করা সম্ভব! অথচ নীলবাবু নামের লোকটা এই খুনের তদন্তের পক্ষে যে খুবই জরুরি, তা উপলব্ধি করতে পারছেন প্রতি মুহূর্তে।

pathagar.net

—ঠিক আছে, আপাতত তোরা বাড়িতেই থাকবি। কোথাও পালানোর চেষ্টা করবি নে। থানার লোক কিন্তু তাদের দুজনকে চোখে চোখে রাখবে। দরকার পড়লেই আবার তুলে নিয়ে আসব থানায়। নীলবাবু নামের লোকটাকে আইডেনটিফাই করতে হতে পারে। বুঝলি?

ঘোলা আর শাহ রুস্তম দুজনেই ভয়ে-ভয়ে ঘাড় নাড়ে। শাহ রুস্তমের ক্ষুদ্র পেটটির ওপর রুলের ডগা দিয়ে একটা খোঁচা মেরে দেবাদ্রি ধমক দিলেন, যা এখন শালারা—

দুজনে বিদায় নেওয়ার পর দেবাদ্রি থম হয়ে পোস্টমর্টেম করছিলেন ঘটনাটার। এখন তেমন কোনও ক্লু হাতে পাননি যা দিয়ে এগোতে পারেন রহস্য উন্মোচন করার পথে। ভদ্রমহিলা, মানে মিসেস বিনীতা রায় দুপুরে একা ছিলেন সে সময় কে বা কারা এসে খুন করে গেল তাঁকে, তা খুঁজে বার করা এই মুহূর্তে একটা প্রহেলিকা।

চোখ বুজে ক্লু-র সন্ধানে হাঁচড়-পাঁচড় করছেন, সে সময় কে যেন তার সামনে এসে ডাকল, দেবাদ্রিদা—

দেবাদ্রি চোখ মেলাতেই সামান্য চমকে উঠলেন। সত্যব্রত রায় দাঁড়িয়ে আছে, বিষণ্ণ জিজ্ঞাসু চোখে।

—বোসো, সত্য। কী খবর?

—মার্ডারারের কোনও হদিশ পেলেন?

দেবাদ্রি তাঁর মনের ভাব গোপন করলেন হুঁ, ক্লু পাওয়া গেছে।

সত্যব্রত উৎসাহিত হয়ে বললেন ক্লু?

দেবাদ্রি হাসলেন, ক্রমশ প্রকাশ্য। তার আগে জানা দরকার তোমার মিসেসের কোনও বান্ধবী আছেন কি না। যিনি সেদিন দুপুরে তোমার মিসেসের কাছে কোনও কাজে এসেছিলেন।

সত্যব্রত অবাক হয়ে বলল, কিন্তু বিনীতার তেমন কোন বান্ধবী তো নেই যিনি দুপুরে আসতে পারেন।

—কোনও আত্মীয়া?

—আত্মীয়া হলে আমি নিশ্চই জেনে যেতাম ইতিমধ্যে। কাল রাতে দাদার বাড়িতে ছিলাম। খবরটা পেতে সেখানে সব আত্মীয়স্বজনরই তো নিয়ে এসে অথবা টেলিফোনে খবর নিয়েছে। কেউই তো বললেন না দুপুরে গিয়েছিলেন বিনীতার কাছে।

—বলবেন কেন? হয়তো তিনিই কাজটি হাসিল করে লিফটে না নেমে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছেন সবার অলক্ষ্যে।

সত্যব্রত রায় সামনে ঝুঁকে পড়ে টেবিলের ওপর আঁকিবুঁকি কাটছিলেন।

তার চুল এলোথেলো । মুখে একদিনের না -কাটা দাড়ি। চোখ বসে গেছে একরাত্রেই। হঠাৎ চোখ তুললেন, দেবাদ্রিদা, আমি একজনকে সন্দেহ করছি। আপনি একবার ইন্টাররোগেট করে দেখুন তো।

দেবাদ্রি লাফিয়ে উঠে বললেন, কে?

—রণাদিত্য মিত্র। আমার ফ্ল্যাটের উলটো দিকে থাকে।

—কই, তাঁকে তো কাল দেখলাম না। ফ্ল্যাটে তো তালা দেওয়া ছিল।

সেইটেই তো আমার সন্দেহের কারণ। লোকটা সারাদিনই বাড়ি থাকে। আর্কিটেক্ট। বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করে ঘরে বসে। সন্ধেয় বেরিয়ে যায় এসপ্ল্যানেড না কোথায় ওঁর নিজস্ব অফিসে। সেখানে ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়।

—তাই? ব্যাচেলর?

pathagar.net

—না, ওঁর স্ত্রী সকাল আটটায় বেরিয়ে যান। কোনো হোটেলে ক্যাটারিঙের চার্জে থাকেন। ফেরেন বেশ রাত করে।

দেবাদ্রি বিষয়টা রোল খাওয়ালেন মাথার গভীরে। সত্যব্রতকে পুনর্বার স্টাডি করলেন। কাল সত্যব্রত তার এই সন্দেহের কথা বলেনি। হতে পারে কাল সে বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিল।

—তাঁকে সন্দেহ করার কারণ?

—আমি কখনও চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি লোকটা দুপুরের দিকে বিনীতার কাছে আসত।

দেবাদ্রির ভুরুতে ভাঁজ কেন?

—কী জানি। তবে আসত যে সে প্রমাণ আমার কাছে আছে।

—কী প্রমাণ?

সত্যব্রত তার জামার বুক-পকেট থেকে চার ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করেন। আর্টপেপার। ভাঁজ খুলে দেবাদ্রির সামনে রাখতেই শরীরে একটা অস্বস্তি। শায়িত এক নারীর ছবি। চিত অবস্থায় শুয়ে, ডান হাতের চেটো মাথার নিচে৷ বাঁ পা ভাঁজ করা, হাঁটুর ওপর বাঁ হাত রেখে লীলায়িত ভঙ্গিমা সেই নারীর। শুধু অস্বস্তির কারণ ঊর্ধ্বাঙ্গে শাড়ির আঁচল নেই, সংক্ষিপ্ত ব্লাউজ, তাতে আব্রু রক্ষিত হয়নি। বুকের আঁচল সাপের মতো এঁকেবেঁকে জড়িয়ে আছে বিছানায়।

ছবিটার বিষয় দেখে একমুহূর্তে দেবাদ্রির স্মরণে এল, খুন হওয়ার পর বিনীতা রায়কে প্রায় এরকম ভঙ্গিতে শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন। পার্থক্য একটাই। ছবিতে নারীর ভঙ্গিমা প্রাণবন্ত, উচ্ছল। বাস্তবের বিনীতা প্রাণহীন নিঃস্পন্দ। দেবাদ্রির শরীর শিরশির করে ওঠে সহসা।

বুঝতে পারছিলেন তবুও জিজ্ঞাসা করলেন, কার ছবি এটা।

—বিনীতার। কে এঁকেছে জানেন? রণাদিত্য মিত্র। দেবাদ্রি বিস্মিত হলেন। স্তম্ভিতও। এমন বেআব্রু হয়ে শুয়ে রণাদিত্যর সামনে পোজ দিয়েছিল বিনীতা!

—কিন্তু তুমি বললে না, রণাদিত্য বিল্ডিং-প্ল্যানার?

—ছবিও আঁকে। ওর ঘরে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন। সারা ফ্ল্যাটে শুধু ছবি আর ছবি।

—তা মিসেস রায় এরকম ছবি আঁকলেন কেন বাইরে একজন লোকের কাছে।

—আসলে বোকা তো। সরল সাদাসিধে মেয়ে আর্টিস্ট দেখে গলে গিয়েছিল। একদিন আমাকে বলেছিল, 'জানো , কী সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকেন। আমার ছবিও আঁকতে চাইছেন।' তা আমি বারণ করেছিলাম, 'খবরদার আর্টিস্টদের পাল্লায় পড়ো না। ওরা ডেঞ্জারাস হয়।'

—তারপরও এরকম ছবি আঁকলেন। তুমি কিছু বলোনি?

—প্রথমে তো আমাকে জানায়নি কিছু। আমিও দুপুরে অফিসে যাই। ওদিকে শ্রাবন্তী, মানে রণাদিত্য মিত্রের স্ত্রী মিসেস মিত্র সারাদিনই প্রায় ঘরে থাকেন না। দুপুরে কী যে করে ওরা তা কী করে জানব! তারপর এই কিছুদিন আগে ছবিটা আলমারির ভেতর তাকের কাগজের নিচে দেখতে পাই। ধরা পড়ে তখন বলল, 'আমার একটা ফটো দিয়েছিলাম।

সেইটে দেখে দেখে এঁকেছে। তারপরই নিজেই বলল, 'লোকটা খুব বাজে'।

দেবাদ্রি উৎসাহের চোখ ফেলেন সত্যব্রতর ওপর, কেন বললেন এ-কথা?

—বলল 'জানো, আমাকে এরকম একটা পোজ দিতে বলেছিলেন। আমি রাজি হইনি। তখন বললেন, তাহলে একটা ফটো দিন। ফটো দিতেই এরকম বিশ্রী একটা জীবন এঁকে একদিন বললেন, এই নিন। মিলিয়ে নিন আপনার সঙ্গে।'

pathagar.net

—ইন্টারেস্টিং।

—হ্যাঁ। আরও কী বলল জানেন? বলল 'ভদ্রলোক ভীষণ সেক্সি, আমার হাত ধরে টানাটানি করছিলেন। আমি জোর করে ঠেলে দিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান নিচে। সেই থেকে ভীষণ রেগে আছেন আমার ওপর।

—তুমি কিছু বলোনি, সত্য?

—বলতে গিয়েছিলাম। কিন্তু রণাদিত্য মিত্র ঘটনাটা বেমালুম অস্বীকার করল সেদিন। তারপর গতকাল তো এই কাণ্ড। নিশ্চয় আমাদের ফ্ল্যাটে জোর করে ঢুকে কাল বিনীতাকে রেপ করতে চেয়েছিল। না পেরে—

দেবাদ্রি সূত্রটা কিছুক্ষণ ঝাঁকালেন মগজে । টেবিলের ওপর বিছানো ছবিটা দেখলেন আর একবার। মুখটা বিনীতারই। বেশ এঁকেছে কিন্তু। শুধু বড্ড সেক্সি করে এঁকেছে বিনীতাকে।

—আপনি ওকে ইন্টারোগেট করুন তো। নিশ্চয়ই স্বীকার করতে বাধ্য হবে। ওর বাঁ হাতের অনামিকার একটা আংটি আছে ওটা কে দিয়েছে জিজ্ঞাসা করবেন।

দেবাদ্রি বিস্মিত পুনর্বার কে দিয়েছে?

—বিনীতাই। বোকা তো!

দশ

দুপুরে রণাদিত্য মিত্রকে ফ্ল্যাটেই পাওয়া গেল। বছর চল্লিশেক বয়স। দেখতে সরু, লম্বা। বেল বাজাতেই ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বললেন, 'আসুন।' যেন জানতেনই পুলিশ তাঁকে জেরা করতে আসবে।

দেবাদ্রি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন রণাদিত্য মিত্রের ড্রয়িং। একপাশে মস্ত একটা স্ট্যাণ্ড, তার ওপর দামি আর্টপেপার একটা চারতলা বাড়ির ডিজাইন। ফ্রন্টাল ভিউ হিসেবে যে চারতলার বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে মুখ করে, তেমন রাজসিক বাড়িতে একটা আস্ত ফ্ল্যাটের মালিক হলে দেবাদ্রি নিজেই গর্বিত হতেন।

ড্রয়িংয়ের অন্যপাশে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তবে যে-দিকটায় রণাদিত্য বসেন, সেখানে একাদশীর চাঁদের মতো করে টেবিলটা কাটা। তাতে টেবিলের একটু ভেতরে ঢুকে বসা যায়। ডানদিকে বাঁদিকে ডাঁই করে রাখা বইপত্তর, ফাইল ইত্যাদি।

কিন্তু দেবাদ্রির নজর লাফিয়ে থিতু হল ড্রয়িংয়ের দেওয়ালে। খুবই দক্ষ হাতে আঁকা একরাশ ছবি, বেশ সিমেট্রিক্যালি টাঙানো। বেশির ভাগ ছবিই নারীর। অসংখ্য নারীশরীর বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নিজেদের মেলে ধরেছেন শিল্পীর তুলির সামনে। রণাদিত্য মিত্রর ফ্ল্যাটের ড্রয়িং পর্যবেক্ষণ করে দেবাদ্রির দৃষ্টি এবার বিদ্ধ হল শিল্পীর ওপর। পাতলা ফিনফিনে চেহারা। দেবাদ্রি ও আকিঞ্চনকে টেবিলের এ পাশে দুটি রেক্সি-আঁটা স্টিলের চেয়ারে বসতে বলে রণাদিত্য বসলেন ওপাশের কাঠের বাচারি চেয়ারটিতে। দেখে মনে হল শিল্পী এতক্ষণ স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যানভাসের বিল্ডিং-প্ল্যানটি আঁকতেই ব্যস্ত ছিলেন।

—হুঁ, বলুন কি জানতে চান?

—স্যরি মিঃ মিত্র আপনার কাজের সময় এরকম ডিস্টার্ব করতে হল।

—না, না, ঠিকই আছে। এতবড় একটা মিসহ্যাপ ঘটে গেল পাশের ঘরে। আপনাদের তো ইনভেস্টিগেশন করতে আসতেই হবে।

pathagar.net

দেবাদ্রি খুঁটিয়ে দেখছিলেন রণাদিত্যের চাউনি, কথাবার্তা বসার ভঙ্গিমা। চেহারা রোগা হলেও কণ্ঠস্বর বেশ ভারী। এমন কেটে কেটে, গমগম গলায় কথা বলেন যে, প্রথম আলাপে সমীহ হবে যে কারও। চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা, চাউনির মধ্যে একটা নরম স্বপ্নালু ভাব আছে। বিনীতা রায় এই পুরুষ সম্পর্কেই বলেছিলেন, সেক্সি।

—হ্যাঁ, কাল দুপুরে, যে সময় ঘটনাটা ঘটেছিল, আপনি ঘরেই ছিলেন নিশ্চই।

রণাদিত্য সামান্য হাসলেন, না। থাকলে হয়তো মিসেস রায়কে এভাবে অকালে চলে যেতে হত না। ফ্ল্যাটের ভেতর সেরকম চ্যাঁচামেচি হলে নিশ্চই শুনতে পেতাম এখান থেকে।

দেবাদ্রি একটু অবাক হওয়ার ভান করে বললেন, ছিলেন না আপনি?

—না। একটা নাগাদ বেরিয়ে যেতে হয়েছিল এক ক্লায়েন্টের বাড়ি দেখতে।

—কোথায় ক্লায়েন্টের বাড়ি?

—বাগুইহাটি। কোন এক বাগচি কনস্ট্রাকশন কাজটা করছে প্রোমোটার হিসেবে। তাদেরই একজন লোক করিয়ে নিয়ে গেল প্ল্যানটা। টেলিফোন করে বলল, 'ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও আসবেন।' ঢালাই দেওয়ার আগে একবার আমাকে দিয়ে ও. কে করিয়ে নিতে চায় কনস্ট্রাকশনের কাজ। কিন্তু গিয়ে দেখি কেউ আসেনি। তারপর আজ একটু ফোন করে জানাল, ইঞ্জিনিয়ার তাকে 'আসছি , এসে বেরুব' বলে বসিয়ে রেখে কোথায় যে গেলেন, ফিরলেন বেলা চারটেয় ' দেখুন কীরকম কাণ্ডজ্ঞান।

বলে রণাদিত্য মিত্র স্ট্যাণ্ডের বিল্ডিং প্ল্যানটির দিকে তর্জনি তুললেন, এই প্ল্যানটি আজ আর এক ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। কাল ওভাবে বেরিয়ে যেতে হওয়ায় এটাও শেষ করতে পারলাম না। আর একটু পরেই ফোন করবে এই ভদ্রলোক। কী যে বলব এঁকে।

দেবাদ্রি কড়া নজর ফেলে পরখ করছিলেন রণাদিত্য মিত্রর কথায় কত আউন্স সত্য মিশেল দেওয়া। তাঁর চকচকে মুখে একটুকরো কালো মেঘ ঘনিয়ে দেবেন বলে এবার পকেট থেকে বার করলেন বিনীতা রায়ের শায়িত ভঙ্গির ছবিটি। আর্টপেপারের ভাঁজ খুলে রাখলেন রণাদিত্য মিত্রর সামনে, চিনতে পারেন কার ছবি?

দেবাদ্রি ভেবেছিলেন ছবিটার ভাঁজ খোলামাত্র পলকে নিভে যাবেন রণাদিত্য। পরিবর্তে তাঁর ভুরুতে একটা তাচ্ছিল্য, কার ছবি?

—বুঝতে পারছেন না, না কি না বোঝার ভান করছেন?

রণাদিত্যর ফর্সা মুখে লাল ছোপ, কী বলতে চাইছেন?

—বিনীতা রায়ের এই ছবিটা আপনি আগে কখনও দেখেননি?

রণাদিত্য তিনতলার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়লেন, আমি কী করে এ-ছবি দেখব?

দেবাদ্রি ভেবেছিলেন হয়তো অস্বীকার করতে পারেন রণাদিত্য। তবু এই মুহূর্তে অবাক হলেন কেননা শিল্পী তাঁর নিজের সৃষ্টিকে অস্বীকার করবেন সেটা ভাবতেও বাধছিল তাঁর। তবে পুলিশের সামনে রণাদিত্যর অস্বীকার না করেও তো উপায় নেই।

দেবাদ্রি চোয়াল শক্ত করলেন, এ ছবিটা আপনার আঁকা নয়?

—আমার! রণাদিত্য সাততলার ছাদ থেকে নিচে নেমে এলেন যেন, কী করে ভাবলেন এ ছবি আমি আঁকতে পারি? দেখুন তো দেওয়ালের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে।

দেবাদ্রি তাকালেন এ-দেওয়াল ও-দেওয়াল। দেওয়ালেরগুলো পরিপাটি করে বাঁধানো বলে একটু বেশি সুন্দর লাগছে এই যা। চোয়াল তখনও শক্ত, কী দেখব?

pathagar.net

—দুটো পেইন্টিঙের মধ্যে একলক্ষ মাইলের ফারাক তা বুঝতেও পারলেন না?

দেবাদ্রি কড়া চোখে পরখ করলেন একবার টেবিলের ওপর শায়িতা বিনীতা রায়ের দিকে, একবার দেওয়ালে টাঙানো নগ্ন নারীমূর্তিগুলোর দিকে। ছবির জগৎটা তিনি ভাল বোঝেন না ঠিকই, কিন্তু একলক্ষ মাইলের ব্যবধানটা ঠাহর হল না তাঁর পুলিশী-চোখে, ছবি তাঁর কাছে ছবিই। কোনওটা একটু ভাল কোনওটা একটু খারাপ।

—কিন্তু এ ছবিটা যে আপনারই আঁকা তা অস্বীকার করতে পারবেন না।

—ইমপশিব্‌ল্‌। আপনি ছবির কিস্যু বোঝেন না বলেই এরকম ইডিয়ট—। মুখে এসে যাওয়া খারাপ কথাটা দ্রুত গিলে ফেলে বললেন, এরকম আনাড়ির মতো কথা বলছেন। টেবিলের এই ছবিটা প্যাস্টেলে আঁকা। কোনও রেখাটাই পাকা হাতের আঁকা নয়। আর আমার পেইন্টিংগুলো সব অয়েলে আঁকা। প্যাস্টেল বা ওয়াটার কোনোটাই আমার মিডিয়াম নয়। দেখুন আমার আর সব ছবিগুলো—

বলতে বলতে টেবিলের নিচের একটা ড্রয়ার খুলে একরাশ ছবি বার করলেন, টেবিলের ওপর দ্রুত বিছোতে লাগলেন একটা একটা করে, এই দেখুন, সবই অয়েলের কাজ। অয়েল বোঝেন?

দেবাদ্রির চোয়াল শক্ত, মুখ রাগে রক্তবর্ণ। পাশে বসা আকিঞ্চন দত্ত বেশ অস্বস্তিতে। তদন্ত করতে এসে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় প্রায়শ। কিন্তু এরকম ক্রুদ্ধ শিল্পীর মোকাবিলা করতে হয়নি কখনও।

দেবাদ্রি অবশ্য আস্তে আস্তে সামলে নিলেন নিজেকে। রণাদিত্য মিত্র এখন নিজেকে আড়াল করতে অনেক প্লি নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাঁকে এখন কায়দা করে গোটাতে হবে জাল। পরক্ষণেই ছুড়ে দিলেন প্রশ্নবাণ, আপনার বাঁ-হাতের ওই আংটিটা কি কেউ প্রেজেন্ট করেছেন, মিঃ মিত্র।

এক ঝটকায় ছবির জগৎ থেকে আংটিতে পর্যবসিত হওয়ায় রণাদিত্য মিত্র থমকে গেলেন একমুহূর্ত। বাঁ-হাতের অনামিকার দিকে চোখ ছুঁয়ে তুলে নিলেন পরক্ষণে, হ্যাঁ।

—কে প্রেজেন্ট করেছেন?

ইতস্তত করলেন রণাদিত্য, আমার এক বান্ধবী।

—কী নাম আপনার সেই বান্ধবীর?

রণাদিত্য পুনর্বার ক্রুদ্ধ, সে-কথা আপনার কাছে বলতে আমি বাধ্য নই।

নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

দেবাদ্রি হঠাৎ রেগে গেলেন খুব। খুব রোয়াবি নিচ্ছিল লোকটা, এতক্ষণে বাগে পেয়েছেন। ছাড়বেন কেন এবার!

—ইনভেস্টিগেশন স্বার্থে আপনাকে অনেক কিছুই বলতে হবে, মিঃ মিত্র। বলুন কে প্রেজেন্ট করেছে আপনাকে?

রণাদিত্য মিত্র বোধহয় ভাবতে পারেননি, হাতের আংটিটা কার দেওয়া তাও জবাবদিহি করতে হবে পুলিশ-অফিসারদের কাছে। মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর তাঁর চোখদুটো কঠিন হয়ে উঠছে ক্রমশ। দেবাদ্রি তার ভেতর আবিষ্কার করলেন কোনও খুনি মানুষের চাউনি।

—আপনার এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি মাই পার্সোনাল অ্যাফেয়ারস।

pathagar.net

দেবাদ্রি কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, সেই পার্সোনাল আর্ফেয়ার্স নিয়েই তো আমরা কথা বলতে এসেছি, মিঃ মিত্র। বিনীতা রায়ের সঙ্গে আপনার অ্যাফেয়ার্স কতদূর এগিয়েছিল, আপনি তার ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন, তার বিনিময়ে তার কাছ থেকে আপনি কী মূল্য দাবি করেছিলেন, সে মূল্য না দেওয়ায় কী শাস্তি হল, সে সবই আপনাকে বলতে হবে একে-একে। পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের নাম আপনি বোধ হয় এর আগে শোনেননি!

—না, শুনিনি। রণাদিত্য মিত্র এককথায় দেবাদ্রি সান্যালকে নস্যাৎ করে দিয়ে বললেন, বিনীতা রায়ের সঙ্গে আমার অ্যাফেয়ার্স হয়েছিল বলতে চান যে ইনস্পেক্টর, তাঁর বুদ্ধির দৌড় যে কত, তা বোঝা হয়ে গেছে আমার।

—স্টপ ইট! দেবাদ্রি সান্যাল রেক্সিন-আঁটা হাফ রাউণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষি মেরে বললেন, প্লিজ হোল্ড ইয়োর টাং। আপনি এখানে যদি মুখ খুলতে চান, তাহলে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে হবে আপনাকে।

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? ভয় দেখিয়ে কথা বার করতে চাইছেন আমার মুখ দিয়ে? রণাদিত্য রাগে কাঁপতে শুরু করেছেন, তাহলে শুনুন পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার বৃত্তান্ত। উনি নিজেই একদিন দুপুরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আলাপ করলেন লিফ্‌টে। তারপর আমার সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে ঢুকে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন. 'ছবিগুলো মন থেকে আঁকা, না মডেল সামনে রেখে?' তো বলেছিলাম, 'ন্যুড ছবি মডেল সামনে রেখে আঁকাই রেওয়াজ।' তারপর একদিন হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে বললেন, 'আমার একটা ছবি এঁকে দেবেন? আপনি যেরকম পোজ দিতে বলবেন, সেভাবেই পোজ দেব।' শুনে অবাক হয়েছিলাম, বলেছিলাম,' দেখুন আমাদের মডেলরা প্রফেসনাল মডেল। আপনার পক্ষে এবারে পোজ দিতে অসুবিধে হবে।' তো তাতে উনি খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন।

দেবাদ্রিও ততক্ষণে স্তম্ভিত। বুঝে উঠতে পারছিলেন না, সত্যব্রত রায়ের কাছে বিনীতা রায় যে গল্পটা বলেছিলেন, সেটা সত্যি। না কি রণাদিত্য মিত্র যে গল্পটা শোনালেন, সেটা।

রণাদিত্য ক্রোধে তখনও জল পড়েনি। পরক্ষণে আবার বললেন, দ্যাট উওম্যান ইজ অ্যাবসলিউট্‌লি ক্যারেকটারেন্স। কয়েকদিন ধরে চোখে পড়ছে এক ভদ্রলোক,কালো চশমা পরা, হাতে ফোলিও ব্যাগ, দুপুরের দিকে আসছেন ওঁর কাছে, কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে যান সিঁড়ি বেয়ে।

সিঁড়ি বেয়ে যায় কেন?

—কারণ ঠিক যে সময়ে উনি আসেন, তখন লিফটম্যান থাকে না। এগুলো হচ্ছে স্ট্রাটেজি, যাতে মহিলার স্বামী কোনওক্রমে জানতে না পারেন ভদ্রলোকের গতিবিধি।

—কাল উনি এসেছিলেন কি না জানেন?

—কাল? বলতে পারব না, আমি একটা নাগাদ বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তার আগে আসেননি এটুকু বলতে পারি।

রণাদিত্য মিত্রকে আপাতত আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই বুঝে দেবাদ্রি তাকালেন আকিঞ্চন দত্তের দিকে। ইশারায় উঠতে বলে রণাদিত্যকে বললেন, আপনি আপাতত কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আরও ইন্টারোগেট করতে হতে পারে।

রণাদিত্য হেসে বললেন, আপনি হুকুম করলেও কলকাতা ছেড়ে নড়ার কোনও উপায় আমার নেই। প্রতি তিনদিনে একটি করে বিল্ডিং প্ল্যান আঁকতে হয় আমাকে। আগামী ছ'মাসের

জন্য বুক্‌ড হয়ে আছি। তাও রোজই চার পাঁচটা করে অফার রিফিউজ করি। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

দেবাদ্রির দাঁত কিড়মিড়ি করে উঠল লোকটার অহঙ্কার দেখে। কলকাতায় এখন বাড়ি তৈরির বন্যা এসেছে। প্রোমোটার, সাপ্লায়ার থেকে শুরু করে ডিজাইনার, আর্কিটেক্ট— সবার হাতেই কাজের বন্যা। লোকগুলো এখন বাতাসে ভর করে হাঁটে। রাস্তায় বেরিয়ে আকিঞ্চনের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিপ হিম আণ্ডার ওয়াচ। উনি ছবিটা আঁকেননি, তবে কি রাস্তার লোক এসে এঁকে দিয়ে গেছে। আর্টিস্ট কি পথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কীরকম মিথ্যেগুলো বলে গেল হড়হড় করে! দেখাচ্ছি মজা।

রণাদিত্য মিত্রকে দেবাদ্রি অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসেন কি না তা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন সত্যব্রত রায়। জিপ থেকে দেবাদ্রি সান্যাল আর আকিঞ্চন দত্তকে নামতে দেখে হতাশ হয়ে বললেন, দেখা পেলেন না?

দেবাদ্রি গম্ভীর। সেটা রণাদিত্য মিত্রের অহঙ্কারের কারণে, নাকি সত্যব্রত তাঁকে ভুল বুঝিয়েছে এই ভেবে তা বোঝা যাচ্ছে না আপাতত। বললেন, পেয়েছি। কিন্তু লোকটি ঘোলা জলের মৎস্য। চট করে ধরা মুশকিল।

সত্যব্রত অবাক হয়ে বলল, কেন, মুশকিল কীসের?

দেবাদ্রি অতি ক্ষুদ্র বর্ণনায় ব্যক্ত করলেন একটু আগের ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতাটি। অবশ্য বিনীতা রায় সম্পর্কে রণাদিত্যর অশোভন মন্তব্যটিকে সেন্সার করেই। সত্যব্রত স্তম্ভিত হয়ে বললেন, আপনাকে এভাবে হেনস্থা করল, আর আপনি ওকে ছেড়ে দিয়ে এলেন?

—একেবারে ছাড়িনি, আকিঞ্চনকে বলেছি ওয়াচে রাখতে। আরও কিছু প্রমাণ চাই।

—প্রমাণ? সত্যব্রত কিছুক্ষণ হাঁচড়পাঁচড় করলেন মনের গহনে। আগে তো বুঝিনি। লোকটা এতখানি ডেঞ্জারাস, তাহলে সব টেপ করে রাখতাম।

—কী টেপ করে রাখতে?

—ওই যে, লোকটা বিনীতাকে যা সব বিশ্রী বিশ্রী কথা বলত। বিনীতা শেষদিকে আমাকে বলেছিল, অন্য কোথাও ফ্ল্যাট কিনে এটাকে বেচে দিতে।

শুধু ওই লোকটার জন্যই। ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমের দেওয়ালে কী সব অশ্লীল ছবি এঁকে বাঁধিয়ে রেখেছে দেখেছেন? এরকম একটা নোংরা রুচির লোকের সঙ্গে প্রতিবেশী হয়ে বাস করা একেবারে অসহ্য ব্যাপার। ওর এরকম নোংরামির জন্যেই মিসেস মিত্র সারাদিন বাড়ির বাইরে থাকেন।

দেবাদ্রি লক্ষ করছিলেন সত্যব্রতর অভিব্যক্তি। শেষ কথাটায় হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, মিসেস মিত্রকে তো একবার জেরা করলে হয়। দ্যাট উয়োম্যান মে নো অ্যালট,কী বলো?

—এক্‌জ্যাটলি। আমি তো এটাই আপনাকে সাজেস্ট করব ভাবছিলাম।

—ভদ্রমহিলা কোথায় কাজ করেন বললে?

—হোটেল ডলফিন। একটা প্রাইভেট হোটেল। থ্রিস্টার। ক্যাটারিঙের চার্জে আছেন। ম্যানেজমেন্ট পাশ করা। খুব পার্সোনালিটি আছে মহিলার। সদর স্ট্রিট পার হয়ে বাঁদিকে টার্ন নিলেই।

pathagar.net

এগারো

নীলধ্বজ বাগচিদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে দ্রুত ড্রাইভ করেও অফিসে ঢুকতে সামান্য দেরি করে ফেলল গার্গী। আধঘন্টার মতো। এটুকু দেরিও তার অভিপ্রেত ছিল না, কেননা সায়নকে সে কথা দিয়েছে রহস্যের জট ছাড়াতে গিয়ে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের কাজে একবিন্দুও ঢিলে দেবে না। দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করছে রাস্তায়। গায়ে ফোস্কা পড়িয়ে দেওয়ার মতো হলকা ছড়াচ্ছেন সূয্যিদেব। দরদর করে ঘামতে ঘামতে অফিসে তার চেম্বারে ঢুকে দ্রুত উল্টে দেখল ডাকের চিঠিগুলো। অনেকগুলো সাপ্লাই অর্ডার এসেছে আজ। এগুলো সায়নই ম্যানেজ করে তার কর্মাশিয়াল ম্যানেজারকে চেম্বারে ডেকে। আজ সায়ন অফিসে আসবেন না। ফ্যাক্টরিতেই সারাদিন। এখন পরপর কয়েকদিনই হয়তো তার এমন কাটবে। সেই বাড়তি কাজটুকু এখন গার্গীর বিশ্বস্ত কাঁধে। আশ্চর্য, অফিসে এই একস্ট্রা কাজের সময়ই কি না বিনীতা রায়ের খুন সম্পর্কিত জটিলতার ভেতর সে ঢুকিয়ে ফেলল তার টিকালো নাকটি।

অপরূপা মিত্রর নাম ঠিকানা টেলিফোন নম্বরের কাগজটি টেবিলে পেনস্ট্যাণ্ডের নিচে আধচাপা করে গার্গী ফনোকমে টোকা দিল কমার্শিয়াল ম্যানেজারকে, কাজের চাপ কেমন, মিঃ মিত্র?

—খুব বেশি না, ম্যাডাম। যে ক'টা রিকুইজিশন এসেছে, ট্রাক লোড করতে বলে দিয়েছি সুপারভাইজারদের।

—এদিকে আরও কয়েকটা অর্ডার এসেছে আজকের ডাকে। কী করা যায়।

—আমি এখনই আপনার ঘরে আসছি, ম্যাডাম।

কর্মাশিয়াল ম্যানেজারের সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে ঘোরতর মিটিং করল গার্গী । মিঃ মিত্র কীভাবে সারাদিনের প্রোগ্রাম করেছেন তা প্রথমে বুঝে নিয়ে তার নিজের কিছু সাজেশনও যোগ করে দিল তার সঙ্গে। কর্মাশিয়াল ম্যানেজার 'থ্যাঙ্কু ম্যাডাম। ইট উইল বি ক্যারেড আউট ইমিডিয়েটলি' বলে চেম্বারের বাইরে যেতেই গার্গী আপাতত ফ্রি। তবে মুক্ত বিহঙ্গ নয়।

অপরূপা মিত্রকে ফোনে একবার যোগাযোগ করবে এখনই। গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেত্রী, কীভাবে গ্রহণ করবে তার টেলি-আলাপ তা এখনও বুঝতে পারছে না। থাচ রহস্যের ভেতর একবার ঢুকে পড়লে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা অভিমুন্যের মতোই কঠিন। এখন তার তূণীরে যত তির আছে, সেগুলো হিসেব করে ব্যবহার করাই তার এই মুহূর্তের লক্ষ্য। এই খুনের ঘটনার সঙ্গে যাদেরই নাম জড়িয়ে পড়ছে, সবার দিকেই ছুড়তে হবে তার লক্ষ্যভেদী বাণ। যতক্ষণ না চাঁদমারি বিদ্ধ হবে, অব্যাহতি নেই।

গ্রুপ থিয়েটারে অভিনেত্রী অপরূপা মিত্রের দিকে কীভাবে শর নিক্ষেপ করা যায় তার ছক গুছিয়ে নিচ্ছিল একমনে। তার মধ্যেই হঠাৎ টেলিফোনের পিঁক পিঁকা পিঁক। গার্গী ঝট করে রিসিভার তুলেই, হ্যালো—

—ম্যাডাম, সব ঠিকঠাক চলছে?

—চলছে স্যার। নাথিং টু বি ওরিড।

—না , চিন্তিত মোটেই হচ্ছি না। আসলে ভাবনাটা এ-কারণেই যে, তোমার ওপর বোঝা একটু বেশিই চাপাচ্ছি দিন দিন। তবে দিন পাঁচ-সাতের মধ্যেই আমি ফ্রি হয়ে যাব।

গার্গী মনে মনে বলল, আরে বাবা, এই পাঁচ-সাত দিনটাই তো আমার কাছে ভাইট্যাল।

pathagar.net

মুখে বলল, টেক ইয়োর টাইম, স্যার। নো হ্যারি, প্লিজ। প্যারাডাইস প্রোডাক্টের সব কাজ ঠিক ঠিক সময়ে হয়ে যাবে।

—সে তো একটু আগেই কমার্শিয়াল ম্যানেজারের ফোন পেয়েই বুঝে গেছি। মিঃ মিত্র বলছিলেন, ম্যাডাম আমাকে এমন চমৎকারভাবে সারাদিনের প্ল্যান করে দিলেন—

—ও বাবা, এর মতো সে খবরও তোমার কানে পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেছে। গার্গী হেসে উঠল, আসলে জানো তো আমি এম. ডি. হলেও সবাই জানে তুমিই হচ্ছো আসল বস্। আমার স্ট্র্যাটেজি তোমাকে দিয়ে এনডোর্স করে নিল।

—আরে না, না। সায়ন তৎক্ষণাৎ কথার মোড় অন্যদিকে বাঁক খাওয়ায়, তোমার তদন্তের কী ফলাফল?

—সে এখনও বিশবাঁও জলে। এখন এক গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেত্রীকে ফোনে ধরার চেষ্টা করছি।

সায়ন টেলিফোনের মধ্যেই আঁতকে উঠল, সে কী? আবার গ্রুপ থিয়েটার? সেদিন লখনউ গিয়ে সিরিয়ালে অভিনয় করলে একবার। এখন গ্রুপ থিয়েটার করতে স্টেজে নামবে নাকি?

গার্গী হেসে উঠল, একটু জোরেই। লখনউয়ে গিয়ে সিরিয়ালে বাইজির ভূমিকায় অভিনয় করাটা মন থেকে মোটেই মেনে নিতে পারেনি সায়ন। এখন আবার গ্রুপ থিয়েটারের কথা কানে যেতেই শঙ্কিত, আতঙ্কিত। আশ্বস্ত করতে বলল না, না। এবার বোধ হয় অভিনয় করা পর্যন্ত গড়াবে না। যা হবে সবই বাস্তব। নো অ্যাক্টিং।

—সকালে সাজগোজ করে বেরোলে, কোনও ক্লু মিলল?

—হ্যাঁ, একটা ঠিকানা আর ফোন নম্বর সামনে গিয়ে বসে আছি। একটা ক্লু থেকে আর একটা ক্লু। সেখান থেকে আর একটা ক্লু—এভাবেই যদি কোনও এক সময় জট খুলু করা যায়।

সায়ন ওপারে হা হা করে হেসে ওঠে। গার্গীও হাসল, যদিও তার মগজে এখন একশো ভাবনা। কাল বিকেলে কেন যে অফিস ফাঁকি দিয়ে শরীর খারাপ বলে বেরিয়েছিলেন। না হলে তো এত ঝঞ্ঝাট মাথায় পাক দিত না এ সময়ে। সায়ন ফোন রেখে দিতেই গার্গী পেনস্ট্যাণ্ডের নিচে রাখা টেলিফোন নম্বরটি বোতাম টিপে টিপে সেঁধিয়ে দিল তার পথের ভেতর।

টেলিফোনের বোতাম টিপতেই ওপাশে চমৎকার সুরেলা কণ্ঠস্বর, অপরূপা মিত্র বলছি—

গার্গী তৎক্ষণাৎ বলল, দেখুন মিস মিত্র—

—মিস নয়, মিসেস—

—সরি মিসেস মিত্র। দেখুন আপনি আমাকে চিনবেন না, কিন্তু আপনাকে আমার খুব দরকার। আজকের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছেন, ল্যান্সডাউন রোডে বিনীতা রায় নামে এক মহিলা খুন হয়েছেন কাল দুপুরবেলা। সে ব্যাপারে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—আমার সঙ্গে! অপরূপা মিত্র ভারি আশ্চর্য হলেন, কিন্তু বিনীতা রায়কে তো আমি চিনিই না।

গার্গী হাল ছাড়ল না, দেখুন লালবাজার সূত্রেই কিন্তু আপনার নামটা আমার হাতে পৌঁছেছে। কাল এ-নিয়ে লেখালিখিও হতে পারে কাগজে। তার আগে আপনার সঙ্গে কথা একবার বলে নিতে পারলে ভাল হত।

লালবাজার, খবরের কাগজ ইত্যাদি ভয়াবহ সব নাম শুনতেই অপরূপা মিত্ররই কণ্ঠস্বর বদলে গেল মুহূর্তে, হুঁ কখন কথা বলতে চান? বিকেলে আমার শো আছে।

— তাহলে এখনই যেতে পারি।

অপরূপা মিত্র ইতস্তত করলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বললেন, ঠিক আছে, চলে আসুন।

এসপ্ল্যানেড ইস্ট থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের একটি বহুতল বাড়ির সিক্সথ ফ্লোর পৌঁছাতে মিনিট পনেরোর বেশি লাগল না গার্গীর। কলকাতার বুকে এই মধ্যদুপুরে আজ আকাশে কিছু মেঘ থাকায় ভারি মনোরম হয়ে উঠেছে জুন মাস। নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে ঢুকে তত সুন্দরী নয় অথচ ভল্যাপচুয়াস অপরূপা মিত্রর চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। ফ্ল্যাটটা তত বড় নয়। দেখে মনে হল আপাতত ফ্ল্যাটে অপরূপা একাই। সালোয়ার কামিজের পক্ষে স্বাস্থ্যটা একটু বেশিই চোখে পড়ে, মাথার চুল এলোমেলো। অগোছালো তার হাবভাব, চাউনি। বয়স আঠাশ তিরিশের মতো। শাঁখা সিঁদুর টায়টায়। গার্গী ঢুকতেই বলল, দেখুন, কোনও খবরের কাগজের সাংবাদিকের কাছে কথা বলা খুব রিস্কি। আমার মুখ দিয়ে এরকম কথা বলিয়ে নেবেন, আর ছাপবেন আর একরকম। তারপর আমার পক্ষে আর দর্শকদের সামনে হাজির হওয়াই হবে কঠিন। গ্রুপ থিয়েটারের ম্যানেজমেন্টেও আমাকে রাখতে চাইবে না।

গার্গী ড্রয়িংয়ের চারপাশে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু আপনি যে বললেন বিনীতা রায়কে আপনি চেনেন না। কিন্তু তাঁর হাজব্যাণ্ড সত্যব্রত রায়কে নিশ্চই আপনি চেনেন।

—হ্যাঁ, আলাপ আছে।

—কী সূত্রে আলাপ তা যদি একটু খোলসা করে বলেন, তাহলে সুবিধে হয়।

—দেখুন, স্টেজে অভিনয় করলে বহু ধরনের মানুষের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়ে যায়। অনেকে কল শোয়ের ব্যাপারে যোগাযোগ করতে আসে। কেউ কেউ অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে পরিচিত হতে চায়। সেরকমভাবেই সত্যব্রতবাবুর সঙ্গে আলাপ। আমার এক কলিগ আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

—কলিগ! আপনি কি বৃন্দা বাগচির কথা বলছেন?

অপরূপা সচকিত হয়ে বলল, হ্যাঁ। তাকে আপনি চেনেন নাকি?

—হ্যাঁ। আমার সঙ্গে আলাপ হল আজ সকালে।

অপরূপার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আরও ঘনীভূত হল, আমার কথা কি বৃন্দাই আপনাকে বলেছে?

গার্গী জরিপ করল অপরূপাকে হ্যাঁ।

—ওকে আপনি আগে কখনও দেখেছেন।

—না।

—খুব ডেঞ্জারাস মেয়েছেলে কিন্তু। আমার তো ধারণা—

—কী ধারণা আপনার? গার্গী উৎসুক হয়।

—ও-ই ও-ই খুন করেছে মিসেস রায়কে।

—কেন? হঠাৎ এরকম ধারণা হল কেন আপনার?

—কারণটা খুব সোজা। মিস্টার বাগচি একটা অ্যাফেয়ার গড়ে তুলতে চাইছিলেন মিসেস রায়ের সঙ্গে। এ নিয়ে মিস্টার বাগচির সঙ্গে বৃন্দার সাংঘাতিক ঝগড়াঝাঁটি চলছে অনেকদিন ধরে। একই বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু কোনও সম্পর্কই নেই দুজনের মধ্যে।

গার্গী তার মগজে সকালের নীলধ্বজ বাগচির ফ্ল্যাটের এপিসোডটি একঝলক রি-ওয়াইণ্ড করে নিল। পরমুহূর্তে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা সত্যব্রত রায় মানুষটি কেমন?

pathagar.net

—সত্যব্রত! হুঁ। ভালই তো মনে হয়।

—কতদিন ধরে চেনেন ওঁকে!

— বেশিদিন নয়। মাসখানেক হবে।

— আর নীলধ্বজ বাগচি?

— মিস্টার বাগচির কথা আর বলবেন না। ওঁর অনেক দু'নম্বরি কারবার আছে। খুব অল্পদিনে বোধহয় কোটি টাকার মালিক। সত্যব্রত ওঁর কালো টাকার তদন্তে গিয়েই তো জড়িয়ে পড়ল এতসব ঝামেলায়।

—তাই! কতদিন আগে গিয়েছিলেন কালো টাকা ধরতে?

—প্রায় মাসদুয়েক আগে।

ঘটনাগুলো একবার মাথার মধ্যে ঢালা উপুড় করে নিল গার্গী । মনে হচ্ছে আর সবাই্ নানানভাবে মিথ্যে বললেও অপরূপা মিত্র খুব একটা মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছেন না। না কি চতুর খেলোয়াড়, গার্গীকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে সুকৌশলে! তাঁর কাছ থেকে আরও দু-একটা কথা জানার ছিল গার্গীর, জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বৃন্দা বাগচি অভিনেত্রী হিসেবে কেমন?

—কেমন আবার, থার্ড ক্লাস। শুধু ওর স্বামী গ্রুপে মোটা টাকা চাঁদা দেয় বলে এখন ও টিকে আছে। তবে বোধহয় আর চাঁদা দিতে চাইবেন না। মরিয়া হয়ে বৃন্দা এখন সিনেমায় নামার ধান্দা করছে।

—তাই নাকি। অফার পেয়েছেন নাকি তেমন?

—পায়নি। কিন্তু পাওয়ার জন্য যা যা করার দরকার তা করতে চাইছে এখন। একটা হাফ-ন্যুড ফটো তুলে একটা সিনেমা পত্রিকায় ছাপিয়েছে সেদিন। সে ছবি দেখলে আপনার—

বলে পাশেই আলমারির মাথা থেকে একটা রঙিন পত্রিকা নামিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে চাইছিল, গার্গী তাকে বারণ করল, আপনি এ ফ্ল্যাটে একা থাকেন মনে হচ্ছে মিসেস মিত্র?

—হ্যাঁ আপাতত একাই।

—ও, আর আপনার স্বামী?

—আসলে আমি ডিভোর্সি। কিন্তু থিয়েটারের লাইনটা খুব খারাপ। তাই শাঁখা সিঁদুরও যেমন রাখতে হয়, তেমনই 'মিসেস ভূষণটিও । না হলে উটকো লোকেরা সারাক্ষণ জ্বালাতন করে!

গার্গী আরও একবার তারা এক্স-রে আই বুলিয়ে নিল অপরূপা মিত্রর আপাদমস্তকে। এ ধরনের অভিনেত্রীদের জীবনযাপন অনেকটাই বড়লোকদের টাকার মতো। কিছু সাদা থাকবে, কিছু কালো। কতটা কালো, তা জানার জন্য সত্যব্রত রায় ঢুকে পড়েছিলেন অপরূপা মিত্রর অন্দরমহলে। ব্যাপারটা ঝুঁকির, তা জেনেও। সেই ঝুঁকি বহুসময় পরিণতি পায় এ-রকম একটা বীভৎস খুনে। গার্গী খুবই আচমকা টোকা দিতে শুরু করল অপরূপা মিত্রর জীবনযাপন।

—সত্যব্রত রায় কি আপনাকে কখনও জ্বালাতন করার চেষ্টা করেছিল, মিসেস মিত্র?

অপরূপা ঘাড় ঝাঁকায় না, না। সে রকম কোনও অকেশন ঘটেনি।

—তা হলে কাল দুপুরে হঠাৎ তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন কেন?

—কাল দুপুরে? আমি? অপরূপা মিত্রর ভলাপচুয়াস শরীরে প্রায় ভলক্যানো উথলে ওঠে, আমি কেন যেতে যাব? মিসেস রায় তো আমার নাম শুনলেই—

অপরূপা মিত্র চকিতে থেমে যেতেই গার্গী তৎক্ষণাৎ, তাহলে আপনাকে খুবই অপছন্দ করতেন, মিসেস রায়?

pathagar.net

—না, তা নয়। আসলে মহিলা খুব সন্দিগ্ধ-চরিত্রের।

—কাকে সন্দেহ করতেন? আপনাকে? আপনি যে সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তা বুঝি উনি পছন্দ করতেন না?

অপরূপা মিত্র ততক্ষণে সর্তক হয়ে গেছেন, বললেন, আমার সঙ্গে তো তেমন মেলামেশা ছিল না। জাস্ট আলাপ। তবে শুনেছি মহিলা ওইরকমই।

—কার কাছে শুনেছেন?

—কার কাছে আবার। ওঁর হাজব্যাণ্ড—সত্যব্রত রায়ই একদিন বলেছিলেন কথায় কথায়।

ঠিক আছে। গার্গী দ্রুত উঠে পড়ল সেখান থেকে, তার যা যা জানার দরকার তা জানা হয়ে গেছে। বলল, যদি পরে দরকার হয়, ফোন করব আপনাকে।

বারো

একরাশ কুজ্ঝটিকা মাথায় টাপেটুপে ভরে নিয়ে গার্গী দ্রুত ফিরে এল তার অফিসে। দুপুরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ততক্ষণে বিকেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচছে কলকাতার মানুষজন, ঘরবাড়ি, রাস্তার পিচ। চেম্বারে ঢুকেই টেলিকমে ধরল কমার্শিয়াল ম্যানেজার রোহিতাশ্ব মিত্রকে ডেসপ্যাচ, কতদূর, মিঃ মিত্র?

—ডান, ম্যাডাম। অ্যাবসিলিউটলি ও. কে।

—থ্যাঙ্কু, মিঃ মিত্র।

—টেলিকমের রিসিভার ক্র্যাডলে রাখতে না রাখতে আবার একঝলক পিঁক পিঁক পিঁক। সায়নের ফোন, থ্যাঙ্কু, ম্যাডাম।

গার্গী সবে কমার্শিয়াল ম্যানেজারকে একটা মস্ত থ্যাঙ্কস্ দিয়ে হাঁপ ছাড়তে যাবে, সে সময় সায়নের কাছ থেকে কমপ্লিমেণ্ট পেয়ে অবাক হল। সেই বিস্ময় তার গম্ভীর গলায়, হোয়াই স্যার?

—কমার্শিয়াল উইং থেকে এইমাত্র জানাল, সব রিকুইজিশন, সাপ্লাই অর্ডার— হ্যাভ বিন টাইমলি কমপ্লায়েড উইথ।

—এর মধ্যে তাও জানা হয়ে গেছে তোমার? আমি যে জানাব খবরটা সে সময়ও পাওয়া গেল না?

—আসলে তুমি একটু বিজি বলে আমিই টেলিফোনটা করেছিলাম কমার্শিয়াল উইংএ।

—ওহ্, গার্গী কিশোরী কন্যার মতো ঠোঁট ফোলায়, বুঝেছি। আমারও এফিসিয়েন্সির ওপর তোমার আস্থা নেই। অফিস থেকে যে একটু বেরিয়েছিলাম তাতেই তুমি ভাবছ, কাজকর্ম রসাতলে গেল।

সায়ন হাঁ হাঁ করে ওঠে, আরে তা নয়, ম্যাডাম। চেয়ারম্যানের কাছে কোনও না কোনও চ্যানেলে কোম্পানির যে কোনও খবর পৌঁছাবেই। ডোন্ট মিসআণ্ডারস্ট্যাণ্ড, ম্যাডাম। আমার ল্যাবরেটরিতে একটু ফেরত পেতেই ফোনটা করলাম। ফোন করেই বুঝলাম, তোমার মগজের মধ্যে সব সময়ে একটা রিমোট কন্ট্রোল থাকে। তুমি অফিসে থাকো না থাকো তোমার ওই রিমোট কন্ট্রোলের দৌলতে সব সেকশনের কাজ গড়গড়িয়ে চলতে থাকে সারাদিন। যাই হোক, তোমার তদন্ত কতদূর?

pathagar.net

—এখন পনেরো বাঁও জলের তলায়। তবে কাল লিফ্‌টম্যান যে সব তথ্য দিয়েছিল, তাতে কোনও একজন মহিলা ঘটনার দিন অর্থাৎ কাল দুপুরে তিনের দুই ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। তিনিই মার্ডারের কিনা তা এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে সকাল থেকে এ পর্যন্ত দু'জন মহিলার সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য ঘটেছে, তাদেরই একজন হয়তো—

সায়ন সামান্য হেসে বলল, মহিলারা দেখছি সবসময়েই ডেঞ্জারাস।

গার্গী প্রতিবাদ করল, নাহ্‌ কথাটা এরকম জেনারালাইজ করা উচিত নয়। তবে প্রেমঘটিত ব্যাপারে বিশেষ করে অবৈধ প্রেম, তার জেরে এরকম মার্ডার হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

—মাই গড। তাহলে কোনও মহিলাই।

—হতে পারে। নাও হতে পারে। আপাতত দুজন মহিলা প্রেক্ষাপটে আর্বিভূত। দুজনেই গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেত্রী। এঁদের মধ্যে কেউ কাল দুপুরে বিনীতা রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন কি না সেটাই খতিয়ে দেখছি।

—তবে যে বললে, ডাকাতিও হতে পারে।

—সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এখনও পর্যন্ত প্রফেসনাল ডাকাতদের উপস্থিতি কোনও ভাবেই প্রমাণ করা যাচ্ছে না। হয়তো অন্য কেউ মার্ডার করে হাতের কাছে যা পেয়েছে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারা আলমারি খুলে টাকা ইত্যাদি নিয়ে গেল, কিন্তু ঘড়ি দু'টো শো কেসের ওপর রেখে গেল কেন তা আমার মাথায় ঢুকছে না।

—ও. কে. ম্যাডাম। আবার রাতের বেলা তোমার তদন্তের বাকি অংশটুকু শোনা যাবে।

সায়ন তার রিসিভার ও-প্রান্তে রেখে দিতেই গার্গী আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল তার পরবর্তী পদক্ষেপে। দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর ইনভেস্টিগেশনে কতদূর এগোলেন, কিংবা এগোতে গিয়ে আরও নতুন জটের গভীরে ঢুকেছেন কি না সেটাই গার্গীর জ্ঞাতব্য। অফিসের টুকটাক কিছু কাজ ঝটপট সেরে নিয়ে ফোনে ধরল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে, হ্যালো, দেবাদ্রি সান্যাল আছেন?

দেবাদ্রি সান্যাল বোধ হয় কোথাও বেরিয়েছিলেন, চেম্বারে ফিরেই ফোনটা ধরে একটু হতবাক, কী খবর, মিসেসে চৌধুরি? এইমাত্র হোটেল ডলফিন থেকে ফিরলাম।

—হঠাৎ হোটেল ডলফিনে কেন? বিনীতা রায়ের খুনের ব্যাপারেই কি?

—একজ্যাকটলি। একটা নতুন ক্লু-এর সন্ধান পেয়েছি—

গার্গী উৎসাহিত হল, কী পেলেন সেখানে?

দেবাদ্রি গড়গড় করে রণাদিত্য মিত্র-সম্পর্কিত যাবতীয় কাহিনী বিবৃত করলেন গার্গীর কাছে। শেষে বললেন, রণাদিত্য মিত্রর স্ত্রী শ্রাবস্তী মিত্র হোটেল ডলফিনে একটা ভাল পোস্টে কাজ করেন। কিন্তু তাঁকে ইন্টারোগেট করতে গিয়ে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল।

—হঠাৎ রণাদিত্য মিত্রকে সন্দেহ করছেন কেন, মিস্টার সান্যাল?

—সত্যব্রতই ক্লু-টা দিয়ে গেল আজ সকালে এসে। সেই সূত্র রণাদিত্য মিত্র সম্পর্কে বিনীতা রায় সত্যব্রতকে যে চিত্র দিয়েছিল, রণাদিত্য মিত্র কিন্তু তার ঠিক বিপরীত চিত্র দিলেন বিনীতা রায় সম্পর্কে, আবার শ্রাবস্তী মিত্রকে জেরা করতে গিয়ে নতুন বাঁক নিল তদন্তটা।

গার্গী ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়, কীরকম?

—শ্রাবস্তী মিত্র বললেন, বিনীতা মোটেই খারাপ মেয়ে নয়। অন্তত ছুটির দিনে বিনীতা রায়কে তিনি যেটুকু দেখেছেন, বা তার সঙ্গে কথা বলেছেন, তাতে বিনীতা রায়ের চরিত্র

pathagar.net

সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো কিছু আছে বলে মনে করেন না। বরং তাঁর স্বামীদেবতাই মানে রণাদিত্য মিত্র কিছু ধোয়া তুলসি পাতা নন। তবে সত্যব্রত রায়কেই তাঁর সন্দেহ।

—সে কী, কেন? গার্গী ততক্ষণে উৎসাহিত হয়ে পড়েছে আরও দুই সমান্তরাল সরলরেখার সন্ধান পেয়ে।

—বললেন, সত্যব্রত রায় ইজ ডেঞ্জারাস। তার বেশি আর কিছু বলতে চাইলেন না। অনেক চাপাচাপির পর শুধু এইটুকু বললেন, আরও অনেক বদগুণের সঙ্গে একটা ভয়ঙ্কর দিক হল, হি ইজ অ্যা উওম্যানাইজার।

গার্গী বলল, সত্যব্রত রায়ের সেরকম কোনও অ্যান্টিসিডেন্টের কথা কি আপনাদের পুলিশ মহল জানে?

—এখনও সেরকম খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। তবে শ্রাবস্তী মিত্র যখন অভিযোগ করেছেন, একবার দেখতে হচ্ছে বিষয়টা।

—সত্যব্রতবাবু এখন কোথায় আছেন, মিঃ সান্যাল?

—মুদিয়ালিতে ওঁর দাদার বাড়িতে।

—কী নাম ওঁর দাদার?

—দেবব্রত রায়।

গার্গী নামটা দ্রুত নোট করে নিল তার মগজে। লুডোর ঘুঁটির মতো এক খোপ থেকে আর এক খোপে দ্রুত পার হয়ে চলেছে ঘটনাক্রম। সত্যব্রত রায়কে দেখলেই বোঝা যায় সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পুলিশ অফিসারের চাকরি পেয়ে উচ্চমধ্যবিত্ত হওয়ার দৌড়ে এগোচ্ছেন হু হু করে। সেই দৌড়ে শামিল হয়ে সুন্দরী বউ পেয়েছেন, নতুন ফ্ল্যাট হয়েছে, মেয়ে ভাল স্কুলে পড়ে। সেইসঙ্গে এসব দৌড়ের আরও কিছু গুণাগুণ সম্ভবত একটু একটু বর্তাচ্ছে তাঁর চরিত্রে। সাধারণভাবে দেখলে তাঁর জীবনের উজ্জ্বল দিকটাই চোখে পড়ে সবার। কিন্তু যেই তাঁর স্ত্রী খুন হল, অমনিই নানান কাহিনী-উপকাহিনী হুস হুস করে ভেসে উঠছে চারদিকে। একদিকে নীলধ্বজ-বৃন্দা, অন্যদিকে রণাদিত্য শ্রাবস্তী—দু'জোড়া সমান্তরাল সরল রেখা। সত্যব্রত ও বিনীতা কি তৃতীয় সরলরেখা হিসেবে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় জোড়ার ভেদক। খুনটা সে কারণেই?

ঘটনাগুলো একবার ঢালা-উপুড় করে গার্গী পরক্ষণে চলে গেল অন্য প্রশ্নাবলীতে, আর কোনও ডেভেলপমেন্ট?

—পাঁচিদের বস্তি থেকে তার ছেলে ঘোলা ও ঘোলার দোস্ত শাহ্ রুস্তম নামের দুই অ্যান্টিহিরোকে ধরে এনেছিলাম জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তেমন কোনও সন্দেহজনক ক্লু পাইনি। তবে দরকার হলে দুজনকে তুলে আনব আবার?

গার্গী জিভে চুকচুক শব্দ করে বলল, আহা, কেন বেচারিদের শুধু কষ্ট দিচ্ছেন? আমার ধারণা খুনি কোনও বস্তির ছেলে হবে না। রীতিমতো অ্যারিস্টোক্র্যাট বংশের পুরুষ। কিংবা কোনও মহিলা হলেও বিস্মিত হব না।

—মহিলা! কার কথা বলছেন? শ্রাবস্তী মিত্র?

—আর একটা দিন দেখি সব ব্যাপারটাকে নাড়াচাড়া করে। কাল আবার আলোচনা করা যাবে।

—শ্রাবস্তী মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটা ইনফর্মেশন পেলাম, যা বেশ

pathagar.net

সন্দেহজনক। কাল হোটেল থেকে বেলা একটার সময় বেরিয়েছিলেন দু'ঘণ্টার ছুটি নিয়ে। কোথায় গিয়েছিলেন তা কিন্তু বললেন না।

—হ্যাঁ। একাধিক মহিলা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন মনে হচ্ছে।

দেবাদ্রি অবাক হয়ে বলল, আপনি সে কথা কী করে জানলেন, মিসেস চৌধুরি?

—এ সবই আমার অনুমান। শুধু কয়েকটা ইনফর্মেশন যদি আমাকে সংগ্রহ করে দেন তো কৃতজ্ঞ থাকব।

—অবশ্যই মিসেস চৌধুরি। বলুন কী জানতে চান?

—এক, গতকাল বেলা একটা থেকে চারটের মধ্যে এসপ্ল্যানেড ইস্টে ডিফেন্সের অফিসে কোনও টেণ্ডার খোলা হয়েছে কিনা। হয়ে থাকলে বাগচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি থেকে কে বা কারা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। দুই, ট্রিঙ্কা এখন কোথায় কার হেপাজতে আছে। তিন,—

প্রথম প্রশ্নটা শুনেই দেবাদ্রি অবাক হল বাগচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এর মধ্যে কী করে এল, মিসেস চৌধুরি? রণাদিত্য মিত্রও এই নামটা বলেছিলেন তখন। তারাই ফোন করে রণাদিত্য মিত্রকে নিয়ে গিয়েছিল বাগুইহাটিতে।

গার্গী নোট করে করল ব্যাপারটা। তাই নাকি? খুব ইন্টারেস্টিং

—আপনি ওদের চেনেন, নাকি, মিসেস চৌধুরি?

—নাহ্, গার্গী হেসে ওঠে, এখনও চিনিনি। তবে চেনার চেষ্টায় আছি। আমার তৃতীয় জ্ঞাতব্য হচ্ছে, সত্যব্রত রায়কে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে। তাঁর কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।

—আপনি কি ওকে সন্দেহ করছেন?

—আসলে কি জানেন, আমার মনে হচ্ছে, হয় উনিই খুনটা করেছেন, অথবা অন্য একজন খুনটা করে কেসটা এমনভাবে সাজিয়েছে যাতে সত্যব্রত রায়ের ঘাড়েই খুনের দায়টা চাপে।

দেবাদ্রি সান্যাল তিনটে প্রশ্নই কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে প্রথমে উত্তর দিলেন তৃতীয়টির, সত্যব্রতকে কিন্তু আমি সন্দেহের আওতা থেকে বাদ দিইনি, মিসেস চৌধুরি। আপনি যদি ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান, তাহলে কাল সকাল আটটা নাগাদ ওর দাদার বাড়িতে পাবেন।

গার্গী ঠিকানাটা নোট করে নিয়ে বলল হুঁ। আর?

—ট্রিঙ্কা আপাতত ওর দিদার কাছে আছে ফর্টি নাইন বাই ইলেভেন হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর সন্ধের মধ্যে অবশ্যই পাবেন।

গার্গী একটা মস্ত থ্যাঙ্কস দিয়ে বলল, আর কোন ডেভেলপমেন্ট হলে আমাকে জানাবেন। কিন্তু।

—একটা ছোট্ট ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, মিসেস চৌধুরি। সত্যব্রত খুব ভেঙে পড়েছে। বলছে, ওর সংসারটা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। যে বিনীতাকে খুন করেছে তাকে যেন যথাশীঘ্র সম্ভব ধরা হয়।

গার্গী হেসে বলল, তাহলে ইমিডিয়েটলি ধরুন, মিস্টার সান্যাল। নইলে ফ্ল্যাটে যারা বাস করছে, বিশেষ করে মহিলাদের প্রাণ তো বিপন্ন। অনেকেই দুপুরে একা থাকে কিনা—

pathagar.net

তেরো

বিকেল ততক্ষণে গোধূলি অভিমুখে ধাবিত। আর একটুও কালক্ষেপ না করে গার্গী গুডবাই করল তার অফিস চেম্বারটিকে। গাড়িতে উঠেই দ্রুত মিশে গেল কলকাতার জ্যামসমৃদ্ধ রাজপথে। তার চালকটি খুবই দক্ষ, চতুর বটে। রাজপথ ছেড়ে সেঁধিয়ে গেল লেন বাইলেন তস্য বাইলেনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাটকের পর্দা উন্মোচনের আগেই সে পৌঁছে গেল নেতাজি সুভাষ মঞ্চের গ্রিনরুম থেকে একটু দূরে তাদের অফিস ঘরটিতে। উদ্দেশ্য , আর এক নাটকের পর্দা উন্মোচন করা।

আজ যে 'স্বাতন্ত্র্য' নাট্যগোষ্ঠীর 'অন্য ভুবন' নাটকটি নেতাজি সুভাষ মঞ্চে অভিনয় হচ্ছে সে খবরটা কাগজ খুলে দেখে নিয়েছে গার্গী। অনেকক্ষণ পর, তিন চারটি কণ্ঠস্বরে 'কে বলছেন, কী দরকার' ইত্যাদি কোয়ারির উত্তর দিয়ে গার্গী ধরতে পারল বৃন্দা বাগচিকে। খবরের কাগজের সাংবাদিক শুনে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসেছিল মেক-আপ রুম থেকে। গার্গীকে দেখে অতীব ক্রুদ্ধ হল, কেন আপনি বারবার জ্বালাতন করছেন বলুন তো? সকালে তো একবার বলেছি, এ ব্যাপারে আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না।

গার্গী হাসার চেষ্টা করল, সে জন্যে কিন্তু আপনাকে বিরক্তি করছি না, মিসেস বাগচি। আপনি ওর মধ্যে না থাকলেও অপরূপা মিত্র জড়িত আছেন বলে কি আপনার মনে হয় না?

—অপরূপা !

—হ্যাঁ। আপনাদের গ্রুপে অভিনয় করেন। চেনেন নিশ্চই।

—চিনব না! হাড়ে হাড়ে চিনি।

—সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে অপরূপার পরিচয় আছে, সে খবর নিশ্চই রাখেন।

—শুধু পরিচয়। দুজনে হাবুডুবু খাচ্ছে প্রেমে।

—তাহলে তো এর মধ্যে অপরূপার হাত থাকতে পারে।

বৃন্দা বাগচি বোধ হয় দম নিচ্ছিলেন, একটু পরে গলা নামিয়ে বললেন, আপনাকে একটা ইনফর্মেশন দিচ্ছি। খুব সিক্রেট, দিন দশেক আগে সত্যব্রত রায় অফিসের কাজে নর্থবেঙ্গলে গিয়েছিলেন। সম্ভবত জলপাইগুড়ি। দু-রাত্রি স্টে করেছিলেন ওখানে। তাঁর সঙ্গে অপরূপা মিত্রও গিয়েছিল। খোঁজ নিয়ে দেখুন তো।

—থ্যাঙ্কু, মিসেস বাগচি। আমি খোঁজ নিচ্ছি।

—খবরের কাগজ পড়ে আমার যা ধারণা হয়েছে, তাতে মনে হয় ঘটনার দিন দুপুরে সত্যব্রত রায় যখন অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্স করতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অপরূপাই বিনীতা রায়কে তার ফ্ল্যাট ঢুকে—

গার্গী প্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। বৃন্দার দেওয়া ক্লুটা পায় ঈশ্বরপ্রেরিত। কোনও একজন মহিলা কাল দুপুরে বিনীতা রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন। কে তা নিয়ে জল্পনাকল্পনা যখন তুঙ্গে, তখন বৃন্দা বাগচি চোখে আঙুল দিয়ে তাকে জানালেন কোন মহিলা। অপরূপার সঙ্গে কথা বলার সময়ই তাকে মনে হয়েছিল কেমন পিচ্ছিল চরিত্রের। একটু গোলমেলেও। ডিভোর্সি, অথচ শাঁখা সিঁদুর টায়টায়। সধবার সাজ বজায় রেখে নর্থবেঙ্গলে অন্য পুরুষের সঙ্গে রাত্রিযাপন করে আসাটাও বোধ হয় তার চরিত্রের পক্ষে মানানসই!

—থ্যাঙ্কু, মিসেস বাগচি। গার্গী ততক্ষণে তার কৌতূহলের পরবর্তী অংশে প্রবেশ করাচ্ছে তার টিকালো নাক। বৃন্দা বাগচি বোধ হয় মেকআপে বসেছিলেন, গালে লাল ছোপ। কপালে,

pathagar.net

চিবুকে দু-হাতে ফর্সা রঙের প্রলেপ। ছ'টার শো। এখনও অনেক দেরি আছে তবু ভদ্রমহিলা উশখুশ করছেন।

—ঠিক আছে, আপনাদের ডিরেক্টরকে একটু একটু খবর দেবেন। জাস্ট দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বৃন্দা বাগচি অবাক হয়ে বলল, কী কথা?

—ওই, অপরূপা মিত্র সম্পর্কেই।

অপরূপা মিত্রের নাম শুনেই বৃন্দা বাগচি খুশি হলেন। ভাবলেন, খুনের ঘটনায় ভালই জড়িয়ে গেছে অপরূপা। 'এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি' বলে দ্রুত মিলিয়ে গেলেন গ্রিনরুমের দিকে।

বোধহয় কাছেই কোথাও দাঁড়িয়েছিলেন অপরূপা মিত্র। বৃন্দা বাগচি গার্গীর সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছেন সে দৃশ্য নজরে পড়ে যেতেই তিনি প্রবল সন্দিগ্ধ। বৃন্দা চলে যেতেই পটভূমিতে আর্বিভাব তাঁর, কী ব্যাপার, আপনি এখানেও ধাওয়া করেছেন।

—হ্যাঁ হঠাৎ দরকার পড়ে গেল।

—কার সঙ্গে দরকার? বৃন্দার সঙ্গে? কী মন্ত্র দিয়ে গেল আপনার কানে?

—তেমন কিছু নয়। আসলে আমি আপনাদের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতেই এসেছি। সামান্য দু-একটা কথা।

বলতে বলতে গার্গীর চোখ পড়ল অপরূপা মিত্রর ঠোঁটের দিকে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙের অপরূপা ঠোঁটে খয়েরি রঙের লিপস্টিক মেখেছে। তাহলে তো দুয়ে-দুয়ে চার। লিফটম্যান, লালু যে মহিলার বর্ণনা দিয়েছিল, তার সঙ্গে অপরূপা মিত্রর একটা মিলও খুঁজে পাওয়া গেল—খয়েরি লিপস্টিক। কানের দুল অবশ্য মিলল না। অপরূপার কানে একটা ইমিটেশনের সোনা রং ঝুমকো। বৃন্দাও অপরূপার দিকেই ইঙ্গিত করে গেলেন। কিন্তু অপরূপা দিব্যি অস্বীকার করলেন বিনীতা রায়ের কাছে তার যাওয়ার ঘটনা। অপরূপাকে হাতের কাছে পেতেই গার্গী সুযোগটা ছাড়ল না, দুম করে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মিসেস মিত্র, আপনি কি দিনকয়েক আগে কোনও কারণে নর্থবেঙ্গল গিয়েছিলেন?

অপরূপা চোখ ওল্টালেন, আমি?

—হ্যাঁ কারও সঙ্গে বেড়াতে?

—ইমপশিবল্। আপনি যে কোত্থেকে এসব আজেবাজে খবর পাচ্ছেন?

গার্গীর বুদ্ধিতে টায়টায় ভরা চোখ দুটি অপরূপা মিত্রকে জরিপ করল এক মুহূর্ত, পরক্ষণে বেশ জোর দিয়ে বলল, আমার কাছে সত্যিই খবর আছে, আপনি সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ির কোনও হোটেলে ছিলেন। সেই হোটেলের রেজিস্টার দেখলেই কিন্তু প্রকাশিত হবে তথ্যটা।

অপরূপা মিত্র একটুও না ঘাবড়ে বললেন, ও সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে। তাহলে খোঁজ নিয়ে দেখুন নিশ্চই বৃন্দা গিয়েছিল।

—বৃন্দা।

—হ্যাঁ। হোটেলে খোঁজ নিয়ে দেখুন না।

বেশ ধন্দে পড়ল গার্গী। দুই নারী একে অপরকে চেপে ধরতে চাইছে, এবং অবশ্যই একজন মিথ্যে বলছে অকাতরে। কিন্তু সে কোনজন! দেবাদ্রি সান্যালকে বলতে হবে জলপাইগুড়ি থেকে কোনও ভাবে মেসেজটা আনাতে। দুজনেই অভিনেত্রী যখন, অভিনয়টা ভালই করছে। কিন্তু কোনজন অধিকতর তুখোড় তা ধরে ফেলাটাই তো তদন্তকারির কাজ।

এবার তদন্ত করতে নেমে গার্গী অবশ্য খুবই অবাক হচ্ছিল তার নিজের ভূমিকায়। নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন একটি কেস তদন্ত খুব একটা করেনি সে। বেশির ভাগ তদন্তই করেছে যে ঘটনাগুলো তার ঘাড়ে অমনই এসে লাফিয়ে পড়েছে। সে পেশাদার গোয়েন্দা নয় তার গায়ে পুলিশি ছাপও নেই কোনও। তবু সে হুটহাট করে এর কাছে ওর কাছে যাচ্ছে, গিয়ে প্রশ্ন করছে, উত্তরও পেয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটার। তার কারণ সম্ভবত একটাই। কোনও খুনের ঘটনায় যখন জড়িয়ে পড়ে ঘটনার, কুশীলবরা তারা প্রতিটি মুহূর্তেই সিঁটিয়ে থাকে আতঙ্কে। কখন কীভাবে তারা সন্দেহভাজন হয়ে পড়ছে পুলিশের চোখে, তা বুঝে বা না বুঝে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে। তখন রেহাই পেতে চায় কোনও ভাবে। গার্গীকে হয়তো পাত্তা দিচ্ছে এ কারণেই। গার্গীও ক্রমশ ঢুকে পড়ছে ঘটনার গভীরে।

অপরূপা মিত্রকে আরও একবার জরিপ করে গার্গী কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা, মিসেস মিত্র, বৃন্দা বাগচিই বা কেন গিয়েছিলেন সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে ? ইজ দেয়ার এনি অ্যাফেয়ার গোয়িং অন— ?

—না, না, অপরূপা ঘাড় ঝাঁকাল। বেশ জোরেই ঝাঁকালো, তারপর বলল ব্রাইব, ব্রাইব!

—ব্রাইব?

—বুঝলেন না, নীলধ্বজ বাগচি তার কালো টাকার হাত থেকে বাঁচতে স্ত্রীকে ব্রাইব হিসেবে ব্যবহার করছিল।

গার্গী স্তম্ভিত। কোন কথাটা ঠিক বা বেঠিক তা বুঝতে গেলে অবশ্যই শার্লক হোমস হওয়া দরকার। তবু সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে কোন মহিলা গিয়েছিলেন, বা আদৌ কেউ গিয়েছিলেন কিনা সেটা জেনে নেওয়া অসম্ভব নয়। তারপর ভাবা যাবে কে সেই মহিলা?

ঠিক সেসময় একমুখ দাড়ি, মাথাভর্তি এলোমেলো চুল, গাঢ় মেরুন রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা চুস্ত পাজামা পরিহিত এক মাঝবয়সি ভদ্রলোককে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে অপরূপা মিত্রে পটভূমি থেকে দ্রুত প্রস্থান। চেহারা দেখেই গার্গী অনুমান করল, ইনিই 'স্বাতন্ত্র্য নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক রূপময় হাজরা। এসেই চোখেমুখে ব্যস্ততা লেপে দিয়ে বললেন, কী ব্যাপার, বলুন তো! নাটকের আগে আমাদের এক মুহূর্তও ফুরসত থাকে না, আর আপনি ? এ সময়ে—

গার্গী তা জানেও, বলল, আমার দু-একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে— যা জানা দরকার একটা তদন্তের কাজে।

—কীসের তদন্ত? রূপময় হাজরা কিছুই জানেন না বলে মনে হয়। বৃন্দা বাগচি হয়তো সেভাবে খুলে বলেননি।

গার্গীকে অতএব দু-এক পংক্তি বলতে হল, একটা খুনের ব্যাপারে। কাল দুপুরে একজন মহিলা খুন হয়ে গেছেন শরৎ বসু রোডের একটা মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিঙের ফ্ল্যাটে।

—খুন ! তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? রূপময় হাজরা কিছুটা হতভম্ব, কিছুটা ক্রুদ্ধ।

—না, আপনি কোনও ভাবে সম্পর্কিত তা বলছি না। তবে আপনার গ্রুপের কেউ হয়তো জড়িত থাকলেও থাকতে পারেন। সে কারণেই আমার জিজ্ঞাসা। আচ্ছা, বলুন তো রূপময়বাবু, কাল বিকেলে আপনার গ্রুপের কোনও শো ছিল কি না?

—কাল? না কাল তো বুধবার ছিল। শো ছিল না। তবে রিহার্স্যাল ছিল। নতুন নাটক নামানো হয়েছে কিনা। প্রতিটি শোয়ের আগের দিন বিকেলে রিহার্স্যাল দিয়ে নিতে হবে।

pathagar.net

বিশেষ করে তার আগের দিন শোয়ে যদি কারও কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকে অভিনয়ে, তা শুধরে নিতে হয়।

—কাল ক'টায় রিহার্স্যাল ছিল?

—ঠিক বিকেল তিনটেয়।

—আচ্ছা, বলুন তো কাল রিহার্স্যালের সময় আপনার গ্রুপের কেউ দেরি করে ঢুকেছিলেন কি না।

রূপময় হাজরা মনে করার চেষ্টা করলেন চোখ ছাদের দিকে তুলে!

গার্গী ধরিয়ে দেওয়ার জন্য বলে, ধরুন, কোনও অভিনেত্রী।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। বৃন্দা প্রায় আধঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট দেরিতে এসেছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে। গ্রুপ থিয়েটার তো। আমাদের পাংচুয়ালিটি মেইনটেইন করতে হয় ভীষণভাবে, খুব বকুনি খেয়েছে কাল।

—বৃন্দা বাগচি? গার্গী একটু অবাক হয়ও বা। পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করে, খুব সামান্য প্রশ্ন, তবু মনে করার চেষ্টা করুন তো, আপনার গ্রুপের কোনও অভিনেত্রী খুব লম্বা দুল পরে? খয়েরি পাথর বসানো। বিশেষ করে কাল পরেছিলেন কি না।

—লম্বা দুল? এ প্রশ্নের জবাব দিতে অবশ্য খুব দেরি হল না রূপময় হাজরার, বৃন্দাই পরে মাঝেসাঝে।

—কাল? হ্যাঁ হ্যাঁ। একটা ঝগড়ার দৃশ্যে মাথা নাড়ানোর সময় ঝুলমুল করে দুলছিল দুলটা। আমি আবার বকলাম রিহার্স্যালের সময় বা স্টেজে কখনও পরবে না এটা। তাতে দর্শকদের দৃষ্টি দুলের দিকে চলে যায়, অভিনয় চাপা পড়ে যায় তাতে।

—এবারে শেষ প্রশ্ন, দিন দশেক আগে আপনার কোনও অভিনেত্রী কি দু-তিনদিনের জন্য কলকাতার বাইরে গিয়েছিলেন?

—দিন দশেক আগে? দাঁড়ান, দাঁড়ান। মাঝে কয়েকদিন আমাদের শোবা রিহার্স্যাল বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

—কেন বলুন তো?

—আমাদের হিরো অসুস্থ হয়ে পড়েছিল হঠাৎ।

—থ্যাঙ্কু, মিঃ হাজরা। আপনাকে খুব দেরি করিয়ে দিলাম, আজ আমি উঠছি।

—না, না, ঠিক আছে। রূপময় হাজরা যেমন ছুটে এসেছিলেন, তেমনই তড়িঘড়ি চলে গেলেন গ্রিনরুমের দিকে, সেইসঙ্গে গার্গীকে ডুবিয়ে দিয়ে গেলেন এক অতলান্তিক সাগরের গর্ভে। অর্থাৎ যতটা কুয়াশার মধ্যে এগোচ্ছিল এতক্ষণ, হঠাৎ দ্বিগুণ কুয়াশা ঝাঁপিয়ে এসে ভরে দিল তার চারদিক।

সেই এক কলকাতা কুয়াশা ঠেলে সরাতে সরাতে গার্গীর গাড়ি তখন ঘরমুখো। কিছু তথ্য স্বচ্ছও হল, কিছু আবার হল না। বরং জট পাকিয়ে গেল আরও। শরৎ বোস রোডের 'ব্লু-ওয়াণ্ডার'-এর সামনে তার গাড়ি ল্যাণ্ড করল যখন, সায়ন ফেরেনি। নিশ্চই এখনও সে তার 'বাথকুইন' নিয়ে সাঁতার কাটছে আর এক প্রশান্ত সমুদ্রের গভীরে। ডুবরির মতো বুদবুদ কাটতে কাটতে ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের নিচে। সেখানে যে আর এক দৃষ্টিনন্দন পৃথিবী আছে তা আবিষ্কার করতে। কত রাতে যে তার স্নানরানির সঙ্গে বিহার শেষ হবে গার্গী জানিত। সে অতএব ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, ভেতরে লাইট-ফ্যান চালিয়ে প্রথমেই ফোন করল দেবাদ্রি সান্যালের চেম্বারে, একটা জরুরি জ্ঞাতব্য আছে মিঃ সান্যাল।

pathagar.net

দেবাদ্রি সান্যাল চেম্বারেই ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে। ব্যস্ত অফিসার, এক খুনের কেস থেকে আর এক গুমের কেসে ঢুকে যেতে কতক্ষণ! রিসিভার তুলে অবাক হলেন, আপনি খুব দ্রুত এগোচ্ছেন মনে হয়, মিসেস চৌধুরি!

—না, না, শুধু আর একটা খবর জোগাড় করে দিন। দিনদশেক আগে সত্যব্রত রায় কোনও কাজে, বা অকাজেও হতে পারে, নর্থবেঙ্গল গিয়েছিলেন এরকম একটা খবর আছে। সঙ্গে একজন মহিলাও ছিলেন। তিনি কে এটা জানা দরকার।

দেবাদ্রি লাফিয়ে উঠে বললেন, কী, মিসেস চৌধুরি?

—ঘটনাটা সত্যি নাও হতে পারে। হয়তো কেউ মিস্‌লিড করার জন্য ধারণাটা ঢুকিয়ে দিল মাথায়। তবু দেখুন তা জানা যায় কি না।

—এখনই মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি, মিসেস চৌধুরি।

—থ্যাঙ্কু । এনি আদার ডেভেলপমেন্ট?

—তেমন বলার মতো নয়।

সায়ন ফিরল রাত এগারোটা নাগাদ। কলকাতা ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করেছে তখন। গাড়ির সংখ্যাও কমে আসছে দ্রুত। সায়ন অবশ্য যথারীতি চিন্তার গভীরে। বোধহয় স্নানসুন্দরীর আইডিয়াটা বেশ জেঁকে বসেছে মাথায়। এ-দেশের হ্যাভস'দের স্ত্রী-কন্যারা কীভাবে আরও কেতায় স্নান করতে পারবে তা ভেবে এক বিশাল কোম্পানির চেয়ারম্যানের চোখে ঘুম নেই।

নিশ্চই রাতে বিছানায় শুয়ে এখন সেই স্নানরানির কথা ভাববে সায়ন।

গার্গীর সঙ্গেও আলোচনায় রত হবে কেন তার এই নতুনতম প্রোডাক্ট ঘূর্ণি তুলবে সারা দেশে। কেন হু হু করে বিক্রি হবে তার বাথকুইন। সারাদিনের কাজ সেরে ঘর্মাক্ত স্বামী কিংবা বাবারা যথাক্রমে তাঁদের স্ত্রী বা কন্যাদের হুকুম তামিল করতে এক বা একাধিক স্নানারানিকে বগলে করে ফিরবেন যাঁর যাঁর কুলায়।

এহেন একটি চিন্তায় বুঁদ হয়ে খবরের কাগজে চোখ রেখে গার্গী নিজের মনেই হাসছিল বোধহয়। সায়ন হঠাৎ গার্গীকে নিজের মনে হাসতে দেখে রীতিমতো অবাক, কী ব্যাপার, এম. ডি সাহেব। কোম্পানির জন্য কোনও সুখবর পেলেন নাকি! কোনও বড় অফার?

—নো, স্যার। ইট'স পিওরলি পার্সোন্যাল। একজন মহিলা দিনে দুপুরে তাঁর ফ্ল্যাটে খুন হলেন। ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, এ ধরনের খুনের পেছনে অনেকগুলো মোটিফ একই সঙ্গে কাজ করে।

—ত্রিভুজ প্রেমের গল্প?

—চর্তুভূজ কিংবা পঞ্চভূজও হতে পারে।

—মাই গড!

—হ্যাঁ । কখনও মনে হচ্ছে এক দম্পতির সঙ্গে আর এক দম্পতির ক্রশ কানেকশন।

—মানে?

—মানে এক দম্পতির পুরুষটি অন্য দম্পতির বেচার হাফের প্রতি আসক্ত।

—অ্যাণ্ড ভাইসি ভাসা?

—ঠিক তা বুঝতে পারছি না। শুধু বোঝা যাচ্ছে, অন্য নারীটির প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল। তবে একটি পঞ্চম চরিত্র আছে। নারীচরিত্র।

—ওহ্, তাহলে তো যে কোনও একজনের খুন না হয়ে উপায় থাকে না।

pathagar.net

—একজ্যাক্টলি। কিন্তু চারজনের মধ্যে কার পক্ষে খুন করা সম্ভব, সেটাই এখন তদন্তের বিষয়। জ্যামিতির অনুকরণে বললে বলতে হয়, দুইটি সমান্তরাল সরলরেখাকে যদি তৃতীয় একটি সরলরেখা ছেদ কর। তাহলে—তাহলে কী কী ঘটতে পারে সেটাই আমার বিচার্য বিষয়।

সায়ন হাঁ-করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল গার্গীর বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখের দিকে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল, তুমি কি সত্যিই গোয়েন্দা হয়ে উঠতে চাইছ?

—উফ্ তুমি বারবার গুলিয়ে দিতে চাইছ অঙ্কটা। দেখছ এতগুলো চরিত্র নিয়ে হাবিডুবি খাচ্ছি কী রকম! এখন শুধু ভেবে যাওয়া এত চরিত্রে কার কী মোটিফ থাকা সম্ভব!

বলতে বলতে গার্গী তখন ডিনারের আয়োজনে ব্যস্ত।

ডিনার টেবিলে সাদা ধবধবে ভাতের সঙ্গে চিকেনকারির সহাবস্থান করতে করতে সায়ন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তা তোমার এই চতর্ভূজ কিংবা পঞ্চভূজের ভূজগুলি কারা? কার কী মোটিফ তা ভেবে বার করেছ?

এ ধরনের আলোচনা এর আগে পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গেই কয়েকবার করেছে গার্গী, সায়নের সঙ্গে করেনি কখনও। সায়ন কখনও কৌতূহল দেখায়নি বলেই। আজ সায়ন জানতে চাইতেই উৎসাহিত হয়। সায়নের মগজ ঝকঝকে শ্বেতপাথরের মতো। তাতে শান দিয়ে কোনও নতুন দৃষ্টিকোণ খুঁজে পাওয়া যায় কি না সেই চেষ্টাই শুরু করল গার্গী।

—ধরো , প্রথম ভূজ নীলধ্বজ বাগচি। কনস্ট্রাকশনের কাজ করে এক নম্বরি পথে প্রচুর আয়। কালো টাকা হওয়ার কারণে প্রথম সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে, পরে বিনীতা রায়ের সঙ্গে আলাপ। সেই কারণের সূত্র ধরেই বিনীতা রায়ের কাছে দুপুরবেলার দিকে প্রায়ই যাতায়াত শুরু করেছিলেন। ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা, কতটা ঘনিষ্ঠতা তা পরিষ্কার নয়। কাল দুপুরেও এসেছিলেন সম্ভবত। তাঁর পক্ষে এই খুনটি করা অবশ্যই সম্ভব।

—হুঁ। আর?

—দ্বিতীয় ভুজ বৃন্দা বাগচি। নীলধ্বজ বাগচির সঙ্গে হয়তো বিনীতার কারণেই খুবই ভুল বোঝাবুঝি চলছে। আবার রেষারেষিও চলছে গ্রুপ থিয়েটারে তাঁর সহ-অভিনেত্রী-কাম প্রতিদ্বন্দ্বী অপরূপা মিত্রর সঙ্গে। গতকাল দুপুরে তিনিই বিনীতার কাছে এসেছিলেন এরকম প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, যদিও তার কারণ স্পষ্ট নয়।

সায়ন কৌতূহলী হল, কীরকম প্রমাণ?

—লিফটম্যান লালুর বর্ণনার সঙ্গে বৃন্দা বাগচির কানের দুল আর ঠোঁটের লিপস্টিকের মিল পাওয়া গেছে। সেদনি রিহার্স্যালেও দেরি করে এসেছিলেন। সম্প্রতি তিনি হয়তো জানতে পেরেছিলেন, তাঁর স্বামী নীলধ্বজ বাগচির ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বিনীতা রায়ের সঙ্গে। সেই কারণেই—

—হুঁ , আর?

—তৃতীয় ভুজ অপরূপা মিত্র। সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার সূত্রে, তাঁর পথের কাঁটা হয়ে উঠেছিলেন বিনীতা রায়। কাল দুপুরে যে মহিলা এসেছিলেন বিনীতা রায়ের কাছে, তিনি বৃন্দা বাগচি না হয়ে অপরূপা মিত্র হওয়াও সম্ভব। কিন্তু নাট্যনির্দেশক রূপময় হাজরার সঙ্গে কথা বলার পর মনে হচ্ছে হয়তো অপরূপা নয়, বৃন্দাই এসেছিলেন বিনীতার কাছে। যেই এসে থাকুন, তাঁর আগমনের কারণ সন্দেহজনক।

সায়ন এতক্ষণ শুনছিল মন দিয়ে। এতক্ষণে আলোচনায় অংশ নেয়। শুধু কানের দুল আর লিপস্টিকের রং দেখেই সমাধানে পৌঁছোনো কি ঠিক হবে? এমনও তো হতে পারে অপরূপা

pathagar.net

ইচ্ছে করেই বৃন্দা বাগচির মতো দুল আর লিপস্টিক পরে এসেছিল যাতে ধোঁকা দিতে পারে লিফট্‌ম্যানকে। লিফটম্যান কি আর কোনও বর্ণনা দিয়েছিল?

—হ্যাঁ, বলেছিল গায়ের রং পুরো ফর্সাও নয়, আবার কালোও নয়।

—তাহলে তো আরও একটা পয়েন্ট পাওয়া গেল। সেক্ষেত্রে বৃন্দা, না অপরূপা?

—দুজনেই রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। দুজনের মধ্যে বৃন্দার গায়ে সামান্য ফর্সার পোঁচ।

—আরও তো গুলিয়ে দিলে সমস্যাটা।

গার্গী হাসল, সেক্ষেত্রে অপরূপা হলেও হতে পারে। কারণ বৃন্দা না এসে কাল দুপুরে অপরূপা আসার সম্ভাবনাটা বেশি।

সায়ন ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসে, তাহলে তোমার অঙ্ক মেলে বোধ হয়।

—কিন্তু সে মেলাটা গোঁজামিল কিনা তাও ভাবতে হবে।

—হুঁ, চতুর্থ ভুজ?

—রণাদিত্য মিত্র। লোকটা যে খুব সুবিধের নয় তা আজ কিছুক্ষণ কথা বলেই দেবাদ্রি সান্যাল বুঝে ফেলেছেন। বললেন, অর্থলোলুপ সেই সঙ্গে পারভার্টেড।

—যেসব ছবি আঁকেন রণাদিত্য, তা দেখেই ধারণা হয়েছে দেবাদ্রির।

সারা দেওয়াল ন্যুড রমণীদের ছবি টাঙানো!

সায়ন হেসে উঠে বলল, দেবাদ্রি সান্যালের নিশ্চয় ভাল আর্টক্রিটিক বলে খ্যাতি নেই। পৃথিবীর সব বিখ্যাত ছবিই ন্যুড-রমণীর। তার মানে সেই শিল্পীরা সবাই পারভার্ট তা ভাবার কোনও কারণ নেই।

—দ্যাটস অ্যা পয়েন্ট, কিন্তু বিনীতা রায়ের ছবিটা যেভাবে এঁকেছে তাতে নাকি তার পারভার্সনই প্রকাশ পেয়েছে। রণাদিত্য মিত্র অবশ্য বললেন তিনি কাল দুপুরে ঘরে ছিলেন না, বেরিয়েছিলেন তাঁর ক্লায়েন্টের কাছে। যদিও সেই ক্লায়েন্টের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি।

—রণাদিত্য মিত্রর স্টোরিটা সাজানো হতে পারে। তবে সেই ক্লায়েন্টের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখতে পারেন দেবাদ্রি। সে সত্যিই রণাদিত্য মিত্রকে যেতে বলেছিল কি না।

—দ্যাট্‌স রাইট। সেই ক্লায়েন্ট বাগচি কনস্ট্রাকশনের লোক সম্ভবত। এমনও হতে পারে, নীলধ্বজ ইচ্ছে করেই ফোন করে তার ফ্ল্যাট থেকে বার করে নিয়ে গিয়েছিলেন বাগুইহাটিতে। যাতে বিনীতা রায়ের কাছে আসতে সুবিধে হয় তাঁর। তবে রণাদিত্যর স্ত্রী শ্রাবস্তী মিত্রও তাঁর স্বামীর পবিত্রতার ব্যাপারে তেমন আস্থা নেই। তিনি সত্যি বলছেন কি না তাও জানতে হবে।

সায়ন আবার হাসে, আসলে কী জানো, পৃথিবীর অধিকাংশ মেয়েরই স্বামীর ওপর একটু একটু সন্দেহ থাকে, স্বামী কোথায় যায়, কার সঙ্গে মেশে বাইরে গেলে, এ-নিয়ে সব স্ত্রীরই বোধ হয় কিছু না কিছু ভাবনা হয়। আর কোনও একটা খুনের ব্যাপারে তার স্বামী যদি পুলিশের সন্দেহভাজন হয়, তাহলে তো স্ত্রী ভাববেই—তার স্বামী হয়তো—

—আর পঞ্চম ভুজটি হলেন স্বয়ং সত্যব্রত রায়। স্ত্রী খুন হলে সারা বিশ্বের মানুষের সন্দেহের তর্জনি উদ্যত হয় তার স্বামীর দিকেই।

সায়ন হঠাৎ চুপ করে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ নির্বাক। তার জীবনে ঠিক এমনই একটা ঘটনার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় তার স্মৃতি নিশ্চই চকিতে ছুঁয়ে গেল ঐন্দ্রিলার সুন্দর মুখখানা। পরক্ষণেই হয়তো তাকে ঝলসে দিয়ে গেল ঐন্দ্রিলার পোড়া, বীভৎস শরীর। ঐন্দ্রিলা-হত্যার দায়ে

সায়নকে দীর্ঘদিন কীভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে পুলিশের হাতে তা সায়ন ভোলেনি, কখনও ভুলবেও না। গার্গী নিজেও তো সে ঘটনা ভুলতে পারবে না কোনও দিন।

বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সায়ন আস্তে আস্তে আসতে বলল, কী মনে হচ্ছে তোমার সত্যব্রত রায়কে?

গার্গী সত্যব্রত রায়ের শোকস্তব্ধ মুখখানা ভাল করে নিরিখ করল মনে মনে। সায়নের মুখে যেরকম অসহায়তা ফুটে উঠেছিল সেবার, সত্যব্রত রায়ের মুখে সেই ছাপ দেখতে পেয়েছিল কি না। তাইই দেখতে চেষ্টা করে অণুবীক্ষণে। হঠাৎ বলল, এখনও যা মনে হচ্ছে সত্যব্রত রায় খুব নিষ্কলুষ নন। তাঁর একস্ট্রা-ম্যারিটাল সম্পর্ক যে ছিল কারও না কারও সঙ্গে, তার পরিণতিতে এ ধরনের খুন হয়ে থাকে। সেই খুনটা সত্যব্রতই করেছেন কি না তা ভারতে হবে আরও। তবে তাঁর অঙ্গুলিহেলনে হলেও হতে পারে।

সায়ন আবারও চুপচাপ, তাই মনে হচ্ছে তোমার? কোনও প্রমাণ পেয়েছ?

—না। সবটাই অনুমান। তবে বৃন্দা বাগচি, শ্রাবস্তী মিত্র—এঁরা দুজনেই সত্যব্রত রায়ের যোগসাজশের দিকেই ইঙ্গিত করলেন।

—রণাদিত্য মিত্র কিছু বলেছেন সত্যব্রত রায় সম্পর্কে? গার্গী একমুহূর্ত ভেবে বলল, বোধ হয় না।

—নীলধ্বজ বাগচি?

—না। তবে নীলধ্বজ বাগচিকে আরও একবার ইন্টারোগেট করতে হতে পারে। তিনি সত্যিই রণাদিত্য মিত্রকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন কিনা । তবে তার আগে সত্যব্রত রায়ের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।

—তাহলে তোমার পঞ্চভূজের এখানেই পরিসমাপ্তি?

—আপাতত।

—এদের মধ্যে একজনকে তোমার সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছ কিন্তু। তিনি শ্রাবস্তী মিত্র। হয়তো দেখা যাবে তিনিই সবচেয়ে চতুর খেলোয়াড় । বিনীতা রায়কে 'ভাল' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজের স্বামীকে সন্দেহ করেন। তাঁহার স্বামীর আঁকা বিনীতা রায়ের ছবি হয়তো আগে দেখেননি, কিন্তু বিনীতা রায়ের সঙ্গে তাঁর স্বামীর যে একটা গোপন সম্পর্ক হয়েছে এটা তাঁর নজরে পড়ছে নিশ্চই। অফিসের দিনে বাইরে থাকলেও, ছুটির দিনে কোনও না কোনও সময় কিছু দেখে থাকতে পারেন।

—বাহ্, গুড বয়। গার্গী প্রায় হাততালি দিয়ে সায়নকে অভিনন্দন জানায় আর কি, তুমিও তাহলে সমস্যাটার গভীরে ডুব দিয়ে ফেলেছ। বাথকুইনের জন্মরহস্য ছেড়ে বিনীতা রায় হত্যারহস্যের জট খুলতে সাহায্য করছ আমাকে!

—ওই আর কি, সায়ন হাসতে থাকে, তুমি যখন গোয়েন্দা হবে বলে নাছোড়, তখন তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়া যায় কি না ভেবে দেখি—

—অ্যাসিস্ট্যান্ট! গার্গী থতমত খায়, তোমার যা চকচকে মগজ, একবার এ-লাইনে চেষ্টা করলে গোয়েন্দাদের অন্ন উঠে যাবে নিশ্চিত।

গার্গীর সঙ্গে সায়নও হাসতে থাকে ডাইনিং টেবিলে ঢেউয়ের লহরী তুলে।

pathagar.net

চোদ্দো

মুদিয়ালি স্টপেজের পেছনে সদানন্দ রোড ধরে কিছুটা এগোতেই বাঁদিকের একটা গলিতে সাঁইত্রিশের দুইয়ের বি বাড়িটা একট পুরোনো দোতলা। বাইরের দেওয়াল থেকে খসে পড়ছে পলেস্তারা। এককালে বর্ধিষ্ণু পরিবার, এখন অনেক শরিক। ওপরে-নিচে মিলিয়ে দশ-বারোটা ঘর। দেবব্রত রায় থাকেন দোতলার উত্তর দিকের অংশে।

গার্গী নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে পৌঁছে গেল সকাল আটটার মধ্যেই। কলকাতার অনেক পরিবারে এই সময়টা যথেষ্ট ভোর বলে গণ্য হয়। কিন্তু শরিক বাড়িতে হইচই চ্যাঁচামেচির কল্যাণে অনেককেই বিছানা ছাড়তে হয় সকাল সকাল। একজন অচেনা যুবতীকে গাড়ি থেকে নেমে কলিংবেল টিপতে দেখে জানলায়-জানলায় কৌতূহলী চোখ।

সত্যব্রত রায় অবশ্য ঘরেই ছিলেন, বেশ উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে এই সাত-সকালেও। কাল একদফা জেরা করার পর গার্গী যখন আত্মপরিচয় দিয়েছিল, বেশ বিস্মিত হয়েছিলেন সত্যব্রত। আজও তাঁর অবাক হওয়ায় কথা। কিন্তু সত্যব্রতর অভ্যর্থনার ধরন দেখে অনুমতি হল, তিনি গার্গীর আগমনবার্তা জেনে গেছেন আগেই। নিশ্চই টেলিযোগে জানিয়ে দিয়েছেন সংবাদটি।

গার্গীকে নিয়ে সত্যব্রত যে ঘরটিতে বসলেন, সেটিকে এ বাড়ির বসার ঘর বলাই চলে, যদিও ঘরের কোণে পুরানো সোফাসেট, আলমারি ছাড়াও একটি সিঙ্গেলবেডের খাট। কলকাতার একদা-উচ্চমধ্যবিত্তরা এখন অনেকেই মধ্যবিত্তে পর্যবসিত। এই পরিবারটিও তাই। পরিবারের বেশির ভাগই চাকুরিজীবী। যারা একটু ভাল চাকরি পেয়ে যান অথবা সত্যব্রত রায়ের মতো 'উপুরি' সম্বলিত চাকুরিতে যোগ দেন, তাঁরা কেউ ফ্ল্যাট কিনে, অথবা বাড়ি করে চলে গেছেন এ বাড়ির স্বল্প পরিসর ছেড়ে। সেরকমই একজন সত্যব্রত রায়। আপাতত কপালের ফেরে আবার তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছে আদত বাড়িতে। সত্যব্রত দাপুটে পুলিশ অফিসার, তবু এই মুহূর্তে তাঁকে বেশ জড়সড়োই দেখা গেল গার্গীর সামনে। শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় বললেন, হ্যাঁ বলুন, কী জানতে চান?

ঘরের বাইরে অপরিসর করিডোরে মাঝে মধ্যে দু-একটি কৌতূহলী বা সন্দিগ্ধ চোখ উঁকি মেরে যাচ্ছে। সেদিকে একবার চোখ রেখে গার্গী শুরু করেদিল তার জিজ্ঞাস্য।

—সরি মিঃ রায়, আপনাকে আর একবার বিরক্ত করছি। যদিও এটা আমার পেশা নয়, তবু আমার নিজেরই মাসতুতো দিদি ঐন্দ্রিলার হত্যারহস্য উদঘাটন করেছিলাম একবার। এই কেসটার সঙ্গে তার মিল আছে বলেই মনে হল। দেখি না, হত্যাকারীকে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। আপনিও নিশ্চই তাইই চান, তাহলে বলুন তো, আপনার প্রতিবেশী রণাদিত্য মিত্র সম্পর্কে আপনার কীরকম ধারণা?

সত্যব্রত রায় তখন দ্রুত গুছিয়ে নিচ্ছেন নিজেকে। গার্গীর চোখের দিকে অবশ্য চোখ রাখছেন না বেশিক্ষণ। তাঁর ডানদিকের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখতে দেখতে বললেন, আই হ্যাভ ভেরি ব্যাড আইডিয়া অ্যাবাউট হিম।

—আপনার কি ধারণা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে উনি কোনও সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছিলেন?

সত্যব্রত রায় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, এ-বিষয়ে আমার বলবার তা আমি সান্যালকে কাল বলেছি।

—তা মিসেস রায়, মানে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে এ-ব্যাপারে কোনও আলোচনা হয়েছিল?

সত্যব্রত রায় আবারও চুপ। যেন ক্যাসেট রিওয়াইণ্ড করে দেখে নিচ্ছেন আগের দৃশ্য।

pathagar.net

তারপর হঠাৎ বললেন, হ্যাঁ, আমাকে বলত, এই আর্টিস্ট ভদ্রলোক যেন কেমন-কেমন। দু-একদিন নাকি হঠাৎ করে ঢুকে পড়েছেন। দুপুরবেলা । তখন হয়তো বিছানায় শুয়ে আছে বিনীতা।

গার্গী তার সামনে বসা পুলিশ অফিসারটিকে নিরিখ করল আবার, ফ্ল্যাটের দরজা কি খোলাই থাকত দুপুরে?

—না। সবসময় থাকত তা নয়। কিন্তু উনি তো আমার ফ্ল্যাটের ঠিক উল্টোদিকের বাসিন্দা। মিসেস মিত্র সারাদিনই বাইরে কাটান। ফলে দুপুরের দিকে মিঃ মিত্র একাই থাকেন ঘরে। দরজা খুলে সবসময় চোখ রাখেন আমার ফ্ল্যাটের দিকে। বিনীতা কখনও দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেলেই—

—এ নিয়ে আপনি রণাদিত্য মিত্রর সঙ্গে কথা বলেছেন?

—আসলে কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম বলব-বলব। কিন্তু ছুটির দিনে মিসেস মিত্র বাড়িতে থাকেন, তখন বলা হয়ে ওঠে না। অফিসের দিনে তো আমিও বাইরে।

—আচ্ছা, মিসেস মিত্রকে কেমন লাগে আপনার?

—মিসেস মিত্র? খুব গভীর জলের মাছ। ওঁর স্বামী ওঁর ভয়ে জুজু হয়ে থাকেন।

—আপনার সামনে ফ্ল্যাটেই তো থাকেন, কথাবার্তা নিশ্চই হয় মাঝে মধ্যে।

—খুব কম। আসলে পুলিশে চাকরি করি বলে আমাকে দুজনেই একটু এড়িয়ে চলতে চান।

—শুধু এই কারণেই?

সত্যব্রত রায় চুপ করে কিছু ভাবলেন, তারপর, আসলে ওঁরা জেনে গেছেন যে, আমি ব্ল্যাক মানি আন্‌আর্থ করার টিমে আছি। সেই কারণেই ভয় পান আমাকে। মিঃ মিত্র তো ইতিমধ্যে প্রচুর কালো টাকা করে ফেলেছেন কি না।

—কী করে জানলেন ওঁদের প্রচুর কালো টাকা?

—ও আমরা লোক দেখলেই বুঝতে পারি আজকাল। পুলিশের চাকরি করতে করতে থট-রিডিং করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা জন্মে যায় আমাদের। এখন যে কোনও লোকের মুখের দিকে তাকালেই বলে দিতে পারি সে লোকটা ক্রিমিনাল কি ক্রিমিনাল নয়। অথবা আর কোনও উইকপয়েন্ট আছে কি না। তেমনই ব্ল্যাক-মানির জন্য এখানে-ওখানে রেইড করতে গিয়ে বুঝতে পেরে যাই সে-বাড়িতে কালো টাকা পাওয়া যাবে কি না, কিংবা পেলে কোন কুলুঙ্গির ভেতর কিংবা ঠাকুরের আসনের নিচে মেঝের ভেতর কোনও ফাঁকা জায়গায় পাওয়া যাবে সে টাকা। আবার এ-ক্ষমতাও জন্মেছে যে, মুখ দেখেই বলে দিতে পারি লোকটা ব্ল্যাক না হোয়াইট।

শেষ বাক্যটি গার্গীর কাছে কিছুটা ল্যাটিন-ল্যাটিন, মানে?

—একটা লোক যা রোজগার করে তার সবটাই ট্যাক্সের রির্টানে দাখিল করলে তাদের বলি হোয়াইট। না দাখিল করলে বলি ব্ল্যাক। তবে সমাজে ব্ল্যাকের সংখ্যাই বেশি।

গার্গী তারিফ না করে পারল না, বাহ। আপনার থট-রিডিঙের ক্ষমতা তো অসামান্য!

সত্যব্রত সামান্য হাসল এতক্ষণে।

এহেন আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশ অফিসারটিকে এবার ভাল করে বাজিয়ে দেখতে চাইল গার্গী, আচ্ছা মিঃ রায়, আপনি মিঃ সান্যালকে বলেছেন, রণাদিত্য মিত্রকে আপনি আপনার স্ত্রীর হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন। এ-বিষয়ে তেমন কোনও প্রমাণ কি আপনার কাছে আছে—এই ছবিটি ছাড়া?

pathagar.net

—কেন, রণাদিত্য মিত্রর হাতেই ওই আংটিটা?

—আংটি কে দিয়েছে তা রণাদিত্য মিত্র বলতে চাননি, তাছাড়া মিসেস রায় যদি ওই আংটি ওঁকে প্রেজেন্ট করেও থাকেন, তাতে প্রমাণ হয় না যে, উনি হত্যা করছেন মিসেস রায়কে।

সত্যব্রত রায় উত্তেজিত হয়ে বললেন, কিন্তু মোটিফ তো আছে।

—মোটিফ?

—হ্যাঁ। মিঃ মিত্র বিনীতাকে বারবার বিরক্ত করছিলেন। হঠাৎ-হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে খারাপ প্রপোজাল দিচ্ছিলেন প্রায়ই। তাতে বিনীতা উত্যক্ত হয়ে তাঁকে বলেছিল মিসেস মিত্রকে সব বলে দেবে। এমন কী ওই ছবিটাও দেখাবে।

—মিসেস রায় কি আপনাকে বলেছিলেন তিনি মিসেস মিত্রকে সব বলে দেবেন?

—হ্যাঁ, বলেছিল।

গার্গী কিছুক্ষণ পরখ করল সত্যব্রত রায়ের মুখচোখ। খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন পুলিশ অফিসারটি। বলল, কিন্তু মিসেস মিত্র তো আপনাকেই সন্দেহ করছেন।

—আমাকে ? সত্যব্রত রায় আরও উত্তেজনায় সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন, আমাকে তো এখন ফাঁসাতে চাইবেই ওরা।

গার্গী আরও তীক্ষ্ণ করল তার দৃষ্টি, কেন?

—ওদের ইদানীং ভয় হয়েছে, ওদের ব্ল্যাকমানির কথা আমি ওপর মহলে পৌঁছে দেব। তাতে যে কোনও দিন ওদের ফ্ল্যাটে রেইড হতে পারে। অতএব বিনীতাকে খুন করতে পারলে রণাদিত্য মিত্রর এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে। বিনীতা যে শাসিয়েছিল মিঃ মিত্রর সব কুকীর্তি ফাঁস করে দেবে মিসেস মিত্রকে। তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। দুই, আমার ওপর খুনের দায় চাপিয়ে দিলে ব্ল্যাকমানি রেইড হওয়া থেকে নিষ্কৃতি মিলবে। আসলে ওরা দুজনে প্ল্যান করেই খুন করেছে বিনীতাকে।

—দুজনে ! গার্গী অবাক হয়।

—হ্যাঁ, দুজনেই যে ওই সময়ে ফ্ল্যাটে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা তা তো দুজনের অ্যালিবাই প্রমাণ করে দিচ্ছে।

—কীরকম?

—রণাদিত্য মিত্র প্রমাণ করতে চাইছেন ওই সময়ে তিনি ফ্ল্যাটে ছিলেন না। কিন্তু যে কারণে সেই সাইটে গিয়েছিলেন বলে প্লি নিচ্ছেন, সেখানে তিনি আদৌ পৌঁছেছিলেন তা প্রমাণ করতে পারবেন না। কারণ উনি সেখানে পৌঁছে নাকি দেখেছিলেন আর কেউ আসেনি। কথাটা খেয়াল করবেন। আরও খেয়াল করুন, শ্রাবস্তী মিত্র পরশু দুপুরে দু'ঘণ্টার জন্য হোটেল ডলফিন থেকে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। খুবই রহস্যজনক তাঁর গতিবিধিও, আসলে এ সবই করেছে আমাকে ফাঁসানোর জন্য।

গার্গী কথাগুলো নিজের ভেতর গচ্ছিত রেখে দ্রুত চলে এল পরবর্তী এপিসোডে। আরও একটি প্রসঙ্গ যা সত্যব্রত রায়ের মুখ থেকে জানা দরকার সেটিও ভারি গুরুত্বপূর্ণ। বলল, আপনি নীলবাবু বলে কাউকে চেনেন না, মিঃ রায়।?

—নীলবাবু! না, না এরকম কোনও লোকের সঙ্গে আমার পরিচয়ই নেই। সান্যালদাও জিজ্ঞাসা করছিলেন আমাকে।

—নীলধ্বজ বাগচি? সত্যব্রত রায় 'না' বলতে গিয়েও থমকে গেলেন সহসা। উল্টে গার্গীকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বলুন তো?

pathagar.net

—চেনেন কি চেনেন না?

—হ্যাঁ। আলাপ হয়েছিল কোথাও। কেন বলুন তো?

—তাঁর স্ত্রী বৃন্দা বাগচির সঙ্গে কখনও আলাপ হয়েছিল?

সত্যব্রত রায় এবারে বেশ বিব্রত বোধ করছেন তা গার্গীর নজর এড়াল না। দাপুটে পুলিশ অফিসার এতক্ষণে বেশ সন্দিগ্ধ বোধ করতে শুরু করেছেন গার্গীর তদন্তকারি সম্পর্কে। বললেন, আপনি ওদের চিনলেন কী করে?

—একটা খুনের ঘটনা হলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত চরিত্রের শিকড়ে টান পড়ে। কে মুখ থুবড়ে পড়বে এখনও ঠিক নেই। এখন বলুন তো, ওদের সঙ্গে আপনার কোন সূত্রে আলাপ?

সত্যব্রত বেশ সময় নিলেন তাঁর উত্তর প্রস্তুত করতে, জানলার দিকে তাকালেন দু-তিনবার। যেন সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে তাঁর মুখে উত্তর জোগান দিতে। গার্গীও একবার চকিতে তাকাল জানলার দিকে। সেখানে অবশ্য শুধুই আকাশ।

—দেখুন, ব্ল্যাকমানি বার করার টিমে আছি বলে এরকম বহু লোকের খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। অনেকেই বিপদ বুঝে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে যাতে তাদের বাড়ি আমাদের টিম রেইড করতে না যায়। বাগচির সঙ্গে সেভাবেই আলাপ।

গার্গী তৎক্ষণাৎ পরবর্তী প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে সত্যব্রত রায়কে আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতাও হয়। সে ঘনিষ্ঠতা এমন যে নীলধ্বজ বাগচিকে ঘন ঘন ছুটে আসতে হয় আপনার ফ্ল্যাটে। ঠিক কিনা?

—কী বলছেন আপনি? সত্যব্রত রায় লাফিয়ে উঠতে চাইলেন, কেন, আমার বাড়ি আসবে কেন ওরা?

—সে আপনিই জানেন । কিন্তু নীলধ্বজ বাগচি যে দুপুরের দিকে আপনার স্ত্রীর কাছে কোনও কাজে আসতেন তার অনেক তথ্য প্রমাণ আছে, মিঃ রায়।

—আমার স্ত্রীর কাছে? অসম্ভব।

গার্গী হাসল, এমন কী ঘটনার দিন দুপুরেও এসেছিলেন তা জানেন? যে ঘরে গার্গীরা বসে আছে, সেই ঘর, কি বসতবাড়িটা উল্টে ধরলেও বোধহয় এতটা বিস্মিত হতেন না সত্যব্রত রায়, কী বলছেন আপনি?

—আপনার কি মনে হয়, নীলধ্বজ বাগচির পক্ষে এই খুনটা করা সম্ভব?

সত্যব্রত রায় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন গার্গীর দিকে, কেমন অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, এতক্ষণে পরিষ্কার হল ব্যাপারটা।

—কী পরিষ্কার হল?

—নীলধ্বজ বাগচি আমাকে ফাঁসানোর জন্য সব প্ল্যান এঁটেছিল।

—কেন?

—আসলে ওদেরও তো কালো টাকার পাহাড়। কয়েকদিন আমার পেছনে ঘুর ঘুর করে বিফল হয়েছে। তারপর নিশ্চয় বিনীতাকে ধরেছিল যদি রেহাই পায় আমাদের হাত থেকে। সেইজন্যেই বিনীতা কয়েকদিন আগে আমাকে বলেছিল, ব্ল্যাকমানি রেইড করার ব্যাপারে আমার হাত আছে কি না। ইচ্ছে করলে কাউকে রেহাই করে দিতে পারে কি না। আমি না বলতেই আর জোরাজুরি করেনি অবশ্য।

গার্গী হঠাৎ তার প্রসঙ্গ বদলাল, আর একটা প্রশ্ন, আপনি দিনদশেক আগে কারও সঙ্গে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলেন বেড়াতে?

সত্যব্রত রায় বেশ শঙ্কিত হলেন এবার। এতসব কথা কে বলল আপনাকে?

—গিয়েছিলেন, না যাননি?

সত্যব্রত রায় ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললেন, না যাইনি তো। কিন্তু কে বলল আপনাকে এসব কথা?

—ধরুন যে গিয়েছিল, সেই বলেছে।

সত্যব্রত কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন গার্গীর দিকে। গার্গীর ভেতর হাসি ফুলিয়ে উঠছিল চমক দিয়ে, কোনও ক্রমে থামিয়ে বলল, বলুন গিয়েছিলেন কিনা?

—না, যাইনি। যে বলেছে সি ইজ অ্যা হোর, কার না কার সঙ্গে গেছে, আর হোটেলের খাতায় আমার নাম লিখে এখন ফাঁসাতে চাইছে আমাকে।

—আপনাকে ফাঁসিয়ে তার কী লাভ?

—বাহ্, দেখছে খুনের ঘটনায় তার নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। এখন সব দায় আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলেই সবাই নিশ্চিন্ত। সব প্রি প্ল্যান। বুঝলেন না?

গার্গী একটু হেসে উঠে দাঁড়াল, ঠিক আছে, মিঃ রায়। আপনাকে কিছুটা ট্রাবল দিলাম। আজ চলি।

সত্যব্রতর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বেশ, বললেন, সবাই যে আমাকে ফাঁসাতে চাইবে। তা জানতাম। এদের এক একজনের যা ব্যাকগ্রাউণ্ড যদি আপনি জানতেন—

গার্গী গাড়িতে উঠে কিছুক্ষণ নিজের মনে হেসে নিল। তাকে এমন একা একা হাস্যরত দেখলে যে কেউ পাগল বলে রায় দেবে নিশ্চিত। কিন্তু যে পুলিশ অফিসার এতক্ষণ ফোঁসফোঁস করছিলেন তাঁর ফণা এভাবে নুঁইয়ে দিতে পারলে কার না ভাল লাগে। কিন্তু গার্গীর মনে এখন একশো চিন্তার এভারেস্ট। বিনীতা হত্যা রহস্যের জট ছাড়াতে খুব কি এগোতে পেরেছে এখনও। না কি একটুও এগোতে পারেনি। একে একে অনেকগুলো চরিত্র জড়িয়ে পড়েছে ঘটনার সঙ্গে। এক-একজনের এক-একরকম মোটিফ। কিন্তু আসল কাজটা কে করেছে, কেনই বা, হাতে-কলমে প্রমাণ না পেলে কীই বা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে গার্গী।

পনেরো

গার্গী এদিনও অফিসে ঢুকল পনেরো মিনিট দেরিতে। ফেরার পথে এ তাবৎ পাওয়া তথ্যগুলি কেবলই ঝালিয়েছে মগজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তন্তুগুলির ভেতর। তাতে আরও কুয়াশায় মাখামাখি হয়েছে রহস্যটা। অফিসে ঢুকেই শুনল, ইতিমধ্যে দু-দুবার টেলিফোন করেছেন পুলিশ ইনস্পেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল। নিশ্চই কোনও নতুন খবর, হয়তো খুবই জরুরি, গার্গী দেরি না করে পরমুহূর্তে ধরল দেবাদ্রিকে, বলুন, মিঃ সান্যাল, এনি ডেভেলপমেণ্ট?

—হ্যাঁ। জলপাইগুড়ি ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিস থেকে খবর পাওয়া গেছে, দিন-দশ বারো আগে ওখানকার গরুমারা ফরেস্ট বাংলোয় জনৈক এস. রায়ের নামে একটা পাস ইস্যু হয়েছিল। তাঁর সঙ্গী ছিলেন মিসেস বি. রায়।

—বি. রায়?

—হ্যাঁ, বিনীতা রায় হওয়াই সম্ভব।

—না মিঃ সান্যাল। বিনীতা রায় হলে একটু আগেই সত্যব্রত রায় তাঁর নর্থবেঙ্গলে যাওয়ার

pathagar.net

কথা বেমালুম অস্বীকার করতেন না। সঙ্গে এমন কেউ ছিলেন যিনি সত্যব্রত রায়ের জীবনের কোনও অবৈধ নারী।

—তাহলে আপনি কাকে সন্দেহ করছেন?

—যে-ই গিয়ে থাকুক তাঁর পরিচয় গোপন করতেই সত্যব্রত রায় জলপাইগুড়ি ট্যুরের ব্যাপারটা অস্বীকার করছেন পুরোপুরি। আমার সামনে আপাতত দুটো নাম আছে। দুজনকেই আমি একটু টোকা দিয়ে দেখি । কে কীরকমভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়।

দেবাদ্রি বোধ হয় দুটো নামের কোনওটাই সন্ধান পাননি এখনও, তাই অবাক হয়ে বললেন, আপনি কি শ্রাবস্তী মিত্রের কথা বলছেন?

গার্গী হেসে উঠে বলল, শ্রাবস্তী মিত্র আমার তালিকায় তিন নম্বরে। তার আগের দুজনের কথা আপনাকে জানাচ্ছি। যদি ঠিকমতো টোকা দিতে পারি, তাহলেই তার কথা জানাব। নইলে শুধু কেন গ্রেপ্তার হবেন তাঁরা?

দেবাদ্রি বোধ হয় একটু ক্ষুব্ধ হলেন, একটু চুপ করে থেকে বললেন, ঠিক আছে, না নয় পরেই জানাবেন। তবে জানাবেন কিন্তু—

—অবশ্যই। আর কোনও খবর?

—হ্যাঁ পরশু ডিফেন্সের অফিসে মিঃ সঞ্জীব গুপ্তার চেম্বারে বাগচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির তরফ থেকে যিনি টেণ্ডারের ব্যাপারে মিট করতে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম সুমোহন বসু। টেণ্ডার খোলার সময় তিনিই উপস্থিত ছিলেন, ওদের কাগজে তাঁর স্বাক্ষরও আছে।

—বাহ্ তাহলে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল। আর কোনও খবর?

—যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিনীতা রায়কে খুন করা হয়েছিল সেটা পাওয়া গেছে কিচেনে

—গ্যাস-সিলিণ্ডারের আড়ালে। সত্যব্রতর একটা লুঙ্গি দিয়ে জড়ানো ছিল ওটা।

—আর?

—নাহ্, আপাতত আর কোনও খবর নেই।

—থ্যাঙ্কু, মিঃ সান্যাল বলে ফোন রেখে দিল গার্গী। অতঃপর অফিসের নৈমিত্তিক কাজগুলোয় নিজেকে সেঁধিয়ে দিল দ্রুত। অফিসে তার ওপর যে গুরুদায়িত্ব চাপানো আছে, তা না করে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ালে মোটেই খুশি হবে না সায়ন। ঘন্টাদুয়েক টানা কাজ করে সমাপন করল নির্ধারিত কর্তব্যগুলি। অতঃপর নজর ফেরাল সামনে রাখা টেলিফোন নম্বর দুটির ওপর। প্রথমেই ধরল অপরূপা মিত্রের ডেরায়, আজ আবার আপনাকে বিরক্ত করছি, মিসেস মিত্র, নিতান্ত বাধ্য হয়েই, কারণ খবর পাওয়া গেল, আপনি দিন দশ-বারো আগে সত্যব্রত রায়ের সঙ্গে জলপাইগুড়িতে গরুমারা ফরেস্ট বাংলোয় রাত কাটিয়েছেন। একেবারে সঠিক তথ্যপ্রমাণ আমার হাতে এসেছে।

অপরূপা মিত্র আগের দিনের মতো 'না না না' বলে প্রতিবাদ তো করলেনই না, বরং কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন কী প্রমাণ?

—সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিনীতা রায় যে-দুপুরে খুন হন, সে সময় একজন মহিলা কোনও কারণে বিনীতা রায়ের কাছে এসেছিলেন। লিফটম্যান লালু তাঁর মুখটা মনে রেখেছে। আপনি নিজেই বলুন, সেই মহিলা আপনি কি না।

অপরূপা মিত্র পরিষ্কার গলায় বললেন, দেখুন, আমি কখনও ওঁদের ফ্ল্যাটে যাইনি। আপনি আমাকে এ ব্যাপারে অনর্থক সন্দেহ করছেন।

pathagar.net

—ঠিক আছে, মিসেস মিত্র। দরকার হলে আবার আপনাকে ফোন করব।

রিসিভার রেখে কয়েকমুহূর্তে অপরূপারও কথাগুলোর সত্যতা বিচার করল একমনে। কোন নতুন দিগন্ত উদ্ভাসিত হল কি না তাও চিরে চিরে দেখল চোখ বুজে। পরক্ষণে বোতাম পুশ করে ধরল বৃন্দা বাগচিকে।

—হ্যালো মিসেস বাগচি। আপনার সামনে একটি খুবই জরুরি প্রশ্ন রাখছি। তার উত্তরে আপনি হ্যাঁ কিংবা না বলবেন, তার বেশি নয়।

বৃন্দা বাগচি গলা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললেন, কী জানতে চান?

—বিনীতা রায় যে দুপুরে-খুন হন, আপনি সেইদিনই দুপুরে বিনীতা রায়ের কাছে কোনও কারণে গিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আমার কাছে প্রমাণ আছে। বলুন, হ্যাঁ, কি না?

বৃন্দা বাগচি বলে উঠলেন, আপনি কি আমাকে চার্জ করছেন?

—আপনি আমার প্রশ্ন কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছেন, মিসেস বাগচি? এড়িয়ে গেলেও কিন্তু আপনি রেহাই পাবেন না। কারণ সব প্রমাণ হাতে নিয়েই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি কী জন্য সেখানে গিয়েছিলেন, তা না বললে আপনি কিন্তু এই খুনের মামলায় জড়িয়ে যাবেন নিশ্চিত।

বৃন্দা বাগচি চুপ করে রইলেন ওদিকে, কিছু বোধ হয় ভেবে নিচ্ছেন এই চার্জ থেকে রেহাই পেতে। গার্গীর মনে হচ্ছিল বৃন্দার এই সামান্য ভেবে নেওয়ার সময়টুকু তার জীবনের ও গার্গীর তদন্তের পক্ষেও অসামান্য নিস্তব্ধতা। যেন একটি হ্যাঁ কিংবা না বলার মধ্যে লুকিয়ে আছে বিনীতা হত্যা রহস্যের জট খোলার চাবিটি।

কিছুক্ষণ পরে বৃন্দা বাগচি বললেন, সব ঘটনা তাহলে আপনার সামনে বলা দরকার, মিসেস চৌধুরি। টেলিফোনে বলা যাবে না। আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে?

একমুহূর্তও দেরি না করে গার্গী বলল, আপনি বরং আমার অফিসেই চলে আসুন। সামনাসামনি কথা বলার পক্ষে এসপ্ল্যানেড ইস্টে আমার চেম্বারটি আপনার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।

—ঠিক আছে, আমি এখনই আসছি বলে অফিসের ঠিকানা ও পথনির্দেশ ঠিকঠাক জেনে নিলেন বৃন্দা। ফোন ছেড়ে দিয়ে গার্গীও ডুবে রইল একগাল উৎকণ্ঠায়। কেন যে এত টেনশন হচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারল না আজ। যেন হত্যার সূত্র হাতের মুঠোয় নিয়ে তার কাছে আসছেন বৃন্দা বাগচি। যে জটিল অঙ্কটা গার্গী কষতে চাইছে, কষে কষে ফুরিয়ে ফেলেছে কতগুলো সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা সেই অঙ্কটায় সমাধান কিনা আর এক মহিলার কাছে।

ঠিক এরকম উদ্বেগের মুহূর্তে সায়নের ফোন এল পিঁক পিঁকা পিঁক শব্দের ঝর্না বইয়ে, হ্যালো ম্যাডাম? সমাধান আর কত দূর?

কী আশ্চর্য, সায়ন তার কোম্পানির কাজের প্রোগ্রেস না জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করছে কিনা রহস্যের সমাধানের কথা! তার মানে সায়নও বোধ হয় ঢুকে পড়েছে ঘটনাটার গভীরে। হেসে বলল, খুব অদ্ভুত কাণ্ড। সমাধান এখন নিজেই রওনা দিয়েছে আমার কাছে পৌঁছাবে বলে।

পরবর্তী ঘটনার আগাপাশতলা কিছুই জানে না সায়ন, অতএব সরল সাদামাটা মানুষটাকে হোঁচট খেতেই হয়, বেশ ধাঁধার মতো শোনাচ্ছে কথাটা ম্যাডাম।

—বুঝলে এতদিন নিজের অঙ্ক নিজেই কষেছি। অজস্র সাদা পৃষ্ঠা কালো করেছি দিনের পর দিন রাতের পর রাত। আজ আবিষ্কার করলাম, আমার অঙ্ক অন্য কেউও কষে দিতে

pathagar.net

পারে। সেই কারণেই সে রওনা দিয়েছে আনোয়ার শাহ রোড থেকে এসপ্ল্যানেড ইস্টের উদ্দেশ্যে।

আনুপূর্বিক ঘটনা সংক্ষেপে শোনার পর সায়ন বলল, সত্যিই কি এত সহজে সমাধান হবে? তুমিই তো বলেছিলে খুনের রহস্যের জট ছাড়ানো ভারি কঠিন। তার অনেকগুলো গিঁট থাকে। একটা ছাড়ানোর পর তখনও বাকি রয়ে যায় আরও সহস্র গিঁট।

গার্গী অন্যমনস্কের মতো বলল, দেখা যাক। তবে সেদিন দুপুরে বিনীতা রায়ের ফ্ল্যাটের একজন সাক্ষী তো এসে ধরা দিচ্ছে স্বেচ্ছায়, সেটা কম নয়।

—সাক্ষী , না আসামি?

—সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। হয়তো সাক্ষী শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হবেন আসামিতে।

সায়ন হো হো করে হেসে উঠে বলল, বেশ বললে যা-হোক, এতদিন জানতাম, আসামি রূপান্তরিত হয় সাক্ষীতে, মানে যাকে রাজসাক্ষী বলে। এখন তুমি বলছ—

বৃন্দা বাগচি পৌঁছালেন বেলা দুটো দশে। বেশ বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাঁকে। ঠোঁটে খয়েরি লিপস্টিক আজ, কিন্তু কানে ইমিটেশন। তেমন সাজার ফুরসত পাননি বোধহয়। অথবা মানসিক অবস্থা সাজের মতো ছিল না।

গার্গীকে এরকম একটা ঝকঝকে অফিসে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ভূমিকায় দেখবেন আশা করেননি বোধ হয়। গার্গী অবশ্য পি এ. কে বলে রেখেছিল। বৃন্দা চেম্বারের ভেতর ঢুকে সপ্রতিভ হওয়ায় চেষ্টা করেও ভেঙে পড়লেন দ্রুত। বললেন, আমার সেদিন কী যে হল, হঠাৎ পিছু ধাওয়া করতে গেলাম ওর। না গেলে এরকম একটা দৃশ্য দেখতে হত না।

—গার্গী ধন্দে পড়ল বৃন্দা কার কথা বলছেন ভেবে। এ-সময় চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

—আমি আসলে অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছিলাম ওকে। মিঃ রায় যেদিন থেকে আমাদের বাড়ি এসেছেন, সেদিন থেকে উনি আমাদের রাহু। পরপর এমন সব কাণ্ড ঘটালেন, এত উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলেন আমাদের সংসারে, তারপর থেকেই আমাদের দুজনের মধ্যে একটা মস্ত ফাটল। মিঃ রায় কীভাবে যে ওর কনস্ট্রাকশন কোম্পানির খবর পেলেন, তার সূত্র ধরে আমাদের পরিবারে এসে মিঃ বাগচি মানে আমার স্বামীকে কী সব বলে এমন ঘাবড়ে দিলেন যে, রাতে ঘুম হত না ওর। মাঝরাতে উঠে বসে বিড়বিড় করে বকতেন কী সব।

গার্গী মুখে রা-টি না করে নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনে চলেছে বৃন্দার কথা।

—আমি জানতে চাইতাম, কী হয়েছে খুলে বলো। কিন্তু তা কিছুতেই জানাতে চাইত না। শুধু সত্যব্রত রায় হঠাৎ হঠাৎ চলে এলে দুজনে কথা হত নীচু গলায়। একদিন আমাকে ডেকে আমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিল। বলল চা করো। তারপর থেকে মিঃ রায় আমাদের বাড়ি যাতায়াত বাড়িয়ে দিলেন আরও। এমনকী মিঃ বাগচি ঘরে না থাকলেও চলে আসতেন। আমাকে বলতেন 'চা করুন। আপনার সঙ্গে একটু আড্ডা মারা যাক। এরকম বুদ্ধিদীপ্ত মহিলার সঙ্গে দু'খণ্ড আড্ডা দিলেও কাজের ইনস্পিরেশন বাড়ে। মগজ খোলসা হয়।' তারপর বুঝলেন, একদিন আমাকে বললেন, 'চলুন, কোথাও একটু ঘুরে আসা যাক। বাইরে কোথাও, যেখানে এই শহরের দমবন্ধ করা আবহাওয়া নেই। মিঃ বাগচিকে বলুন না—'

বলতে বলতে বৃন্দা থামলেন খানিক। বোধহয় পরবর্তী সিকোয়েনস ভেবে চলেছিলেন দ্রুত। একটু পরে বললেন, আমি প্রতিবারই এড়িয়ে যাই। কখনও বলি, 'আমার শো ছেড়ে তো যাওয়া যায় না।' কখনও বলি, 'মিঃ বাগচির কাজের এখন খুব চাপ।' কিন্তু মিঃ রায় একেবারে

pathagar.net

নাছোড়বান্দা। শেষে একদিন বললেন, মিঃ বাগচির কাজের চাপ থাকলে চলুন আমি আর আপনি দুজনে ঘুরে আসি। সোম-মঙ্গল-বুধ তো আপনার শো থাকে না। ওই সময় একটু মিঃ বাগচিকে ম্যানেজ করে—

বৃন্দা আবার থামেন, কিছু ভাবেন, আবার বলেন, এর মধ্যে কখন যে মিঃ বাগচির সঙ্গে মিসেস রায়ের আলাপ হয়েছে তা জানিই না। একদিন দেখি মিঃ বাগচি টেলিফোনে কথা বলছেন মিসেস রায়ের সঙ্গে। একদিন দেখলাম টেবিলের কাগজের নিচে মিঃ বাগচির লেখা একটা চিরকুট,'যা বলেছি মনে আছে তো? প্লিজ—' এরকম সাংকেতিক ভাষায় লেখা। অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর টেলিফোন করে দেখেছি, উনি অফিসে যাননি। এরকম পরপর কয়েকবার হওয়ার পরও খুনের দিন দেখলাম সকালে কী সব চিঠি লিখছেন খসখস করে। আমাকে দেখে লুকোলেন মনে হল। উনি অফিসে বেরোবার পরই সন্দেহ হওয়াতে আমি অনুসরণ করলাম ওঁকে। ওঁর পিছু পিছু একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেলাম শরৎ বসু রোড পর্যন্ত। 'ভীমপলশ্রী ' বাড়িটার ভেতর ঢুকতেই আমি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। উনি কিন্তু বেরোলেন একটু পরেই। খুব বিধ্বস্ত। অস্থির দেখাচ্ছিল ওঁকে। কী হয়েছে ওঁদের মধ্যে জানার জন্য কৌতূহল হল খুব। এতক্ষণ লিফটটা বন্ধ ছিল বোধ হয়। আমি যখন উঠতে যাই সদ্য লিফটম্যান এসেছে সে সময়। লিফটে চড়ে ওপরে গিয়ে প্রথমে কলিং বেলে আঙুল ছোঁয়াই, কিন্তু কেউ খোলে না। তখন দরজা ঠেলি। ঠেলতেই দরজা খুলে যায়, ভেতরে ঢুকতেই দেখি সেই বীভৎস দৃশ্য। তক্ষুণি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে আসি দুদ্দাড় করে। সে যে কী বীভৎস দৃশ্য।

বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন বৃন্দা। সত্যিই বিচলিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। দুদিন আগের শক যে এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তা দীর্ঘক্ষণ মুখ ঢেকে বসে থাকা দেখেই বুঝে ফেলল গার্গী। কিন্তু বৃন্দার পরের কথাটা চমকে দিল ভীষণ, ধন্দেও ফেলল তাকে।

—বুঝলেন, আমার স্বামী যে এরকম একটা নিষ্ঠুর কাজ করতে পারেন তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এর আগে। এই কথাটা বলার জন্যই চলে এলাম আপনার কাছে।

গার্গী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ভাল করে পড়ল বৃন্দার চোখের ভাষা। মহিলা অ্যাম্বিশাস, , তাঁর রূপ ও শরীর দুইই সেজন্য দায়ী। স্বামীর বদন্যতায় গ্রুপ থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করেন এটাও ঠিক, কিন্তু তাঁর স্বামী আর এক নারীকে খুন করেছেন, তা ভাবতে বাধছে তাঁর। তবু নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখে এসেছেন—

—আর ইউ সিওর, আপনার স্বামীই খুনটা করেছেন?

—তাছাড়া আর কে করবে? সেদিন সিঁড়ি দিয়ে যখন নামল, যেরকম ভেঙে পড়তে দেখেছিলাম ওকে!

—ঠিক আছে, মিসেস বাগচি। পরে দরকার হলে আপনাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব।

বৃন্দা তাঁর ব্যাগ ও আঁচল সামলে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন চেম্বারের বাইরে, আর গার্গী নিমজ্জিত হল এক ঘোর ঘূর্ণির ভেতর। তাহলে কি নীলধ্বজ বাগচিই?

pathagar.net

ষোলো

সে রাতে ডিনারের টেবিলে বসে গার্গীর সর্বশেষ অভিজ্ঞতাটি বেশ মন দিয়ে শুনল সায়ন। তার কথা শেষ হতেই বলল, দেখেছ, সেই হলুদ খামটা সেদিন দেখেই বলেছিলাম, হত্যাকারী হাতকড়া পরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তোমার দিকে, তাহলে আপাতত তোমার ইনভেস্টিগেশন শেষ?

গার্গী তবুও অন্যমনস্ক। বলল তবু শেষেরও একটা শেষ থাকে। বৃন্দা বাগচি কিন্তু নিজের চোখে দেখেননি তাঁর স্বামী খুন করছেন বিনীতা রায়কে।

সায়ন হতাশ হয়ে তাকাল গার্গীর দিকে। গার্গী তখনও যেন তার খাতায় জটিল অঙ্কটি কষে চলেছে একমনে। একরাশ চিন্তায় ঠাসা তার চোখমুখ।

—তাহলে তুমি কী করতে চাইছ?

—নীলধ্বজ বাগচিকে খুনি প্রমাণ করাটাই সবচেয়ে সুবিধেজনক এই কেসটিতে। তাঁর বিপক্ষে অনেকগুলি তথ্য আমাদের সামনে। তিনি যদি সত্যিই খুন করে থাকেন, তাহলেও আমি আরও প্রমাণ চাইব। আই উইটনেস যদি নাও পাওয়া যায়, অন্তত এমন কোনও ক্লু— যা থেকে সিদ্ধান্ত পৌঁছাব যে নীলধ্বজ খুনটা করেছেন।

সায়ন তৎক্ষণাৎ একটা ক্লু ধরিয়ে দিল, কেন, হলুদ খামের চিঠিটাই তো সবচেয়ে বড় ক্লু।

অন্যমনস্ক গার্গী বলল হ্যাঁ। অন্তত একটা বড় ক্লু তো বটেই। সে কারণেই নীলধ্বজ বাগচিকে আর একবার ইন্টারোগেট করা দরকার। সেটা আমিই করব, না কি পাঁচি কথিত সেই ‘নীলবাবুটি কে এবার প্রকাশ করব দেবাদ্রি সান্যালের সামনে, করে দেবাদ্রিকেই জেরা করতে বলব নীলধ্বজ বাগচিকে— তাই ভাবছি।

—নীলধ্বজ বাগচি কি স্বীকার করবেন খুনের দায়?

—যদি করেন ভাল না করলে তিনি ফ্ল্যাটে গিয়ে কী দেখেছিলেন, বিনীতা রায়কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায়—সেটা তো জানা যাবে।

—হ্যাঁ। তিনি যখন অকুস্থলে সেই বিশেষ দুপুরে গিয়েছিলেন, তাকে অবশ্যই একবার জেরা করা উচিত। তবে এই জেরাটা পুলিশের হাতেই ছেড়ে দাও।

গার্গী সায় দিল সায়নের প্রস্তাবে, ঠিকই বলেছ। নীলধ্বজ বাগচি অকুস্থলে পৌঁছানোর আগে আরও কারও পক্ষে খুনটা করা সম্ভব। যেমন রণাদিত্য মিত্র, যেমন শ্রাবস্তী মিত্র। হয়তো সত্যব্রত রায়ও, হয়তো অন্য কেউ।

সায়ন চুপচাপ খাওয়ার প্লেটে মন দিল। হয়তো খুনের ক্লু নিয়ে সেও ভাবতে শুরু করেছে এবার। রহস্যটা এবার এমন একটা পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে, কে খুনি তা জানার জন্য হাঁকপাঁক করবে সায়নও।

সেদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে গার্গী হঠাৎ টেলিফোনে ধরল দেবাদ্রি সান্যালকে, একটা রিকোয়েস্ট আছে, মিঃ সান্যাল।

দেবাদ্রি সান্যাল তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললেন, আপনার একটা দারুণ সুখবর আছে, মিসেস চৌধুরি। সত্যব্রত কী বলেছে জানেন?

বলেছে, গার্গী চৌধুরির ইনভেস্টিগেশনের পদ্ধতি খুব ভাল। আপনি ওকে নাকি এমনভাবে জেরা করেছেন, কোনও দুঁদে গোয়েন্দাও নাকি ওরকম দক্ষতায় জেরা করতে পারে না।

pathagar.net

—তাই নাকি। তাহলে আমার তরফ থেকে ওঁকে একটা মস্ত থ্যাঙ্কস জানালাম।

—ও কে. ম্যাডাম।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। সেই যে, পাঁচি-কথিত নীলবাবুর সন্ধান কি পেলেন?

—এখন পাইনি। তবে আমার বাহিনী কলকাতায় প্রায় কুম্বিং অপারেশন চালাচ্ছে। ঠিক খুঁজে বার করব ব্যাটাকে।

গার্গী হাসি চেপে বলল, আমি নীলধ্বজ বাগচি নামের এক ভদ্রলোকের সন্ধান পেয়েছি, আনোয়ার শাহ রোডে থাকেন। সম্ভবত ইনিই সেই নীলবাবু। ঘটনার দিন , অর্থাৎ পরশু দুপুরে নীলধ্বজ বাগচি 'ভীমপল্লশ্রী' নামে আকাশচুম্বীটার তিনের দুই ফ্ল্যাটে কোনও কারণে গিয়েছিলেন।

দেবাদ্রি অবাক হয়ে গেল গার্গীর এহেন আবিষ্কারে, আপনি কোথায় পেলেন তাকে?

গার্গী নীলধ্বজ বাগচির ঠিকানা দিয়ে বলল, নীলধ্বজ বাগচি বিনীতা রায়কে খুন করেছেন বলে আমার কাছে একজন জবানবন্দি দিয়ে গেছে।

দেবাদ্রি লাফিয়ে উঠে বললেন, আমি এক্ষুনি লোকটাকে অ্যারেস্ট করে আনছি, ম্যাডাম।

—কিন্তু তার নামে চার্জশিট দেওয়ার আগে তাঁর বক্তব্য শোনা দরকার। বিনীতা রায়কে খুন করার পেছনে তার ভূমিকা আছে, এরকম প্রমাণ থাকলেও হয়তো তিনি খুন করেননি। তাঁকে গ্রেপ্তার করার আগে পরিস্থিতিটা আরও ভাল করে বিচার করা দরকার।

দেবাদ্রি বুঝে উঠতে পারল না গার্গীর হেঁয়ালি।

—তাঁর স্বীকারোক্তি পেলে ভাল কথা। না স্বীকার করলে অন্তত এটুকু বলতে পারবেন, তিনি যখন বিনীতা রায়ের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন, তখন বিনীতা রায় জীবিত, না মৃত?

দেবাদ্রি কিছুই না বুঝে বলল, মানে?

—মানে, খুন কে, তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনটি সম্ভাবনা অনুমান করছি। হয় নীলধ্বজ বাগচি খুন করেছেন, কিংবা তিনি যাওয়ার আগে কেউ খুন করে গেছে। অথবা তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পরে খুন হয়েছেন বিনীতা। কিন্তু এত কিছু ভাবার আগে জানা দরকার নীলধ্বজ বাগচি কী বলেন।

—থ্যাঙ্কু, ম্যাডাম। আমি কাল সকালেই তুলে আনছি নীলধ্বজ বাগচিকে।

ফোন রেখে গার্গী বিছানায় অন্তরিন হওয়ার সময় শুনল সায়নের হাসি— হাসি কণ্ঠস্বর, তোমাকে এখন প্রায় দুর্গতিনাশিনির মতো লাগছে, গার্গী হাতে একটা ত্রিশূল, তার তিনটি ফলা উদ্যত। কোন ফলাটা শেষ পর্যন্ত বিদ্ধ হবে অসুরের বুকে তা দেবাঃ ন জানন্তি। কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গার্গী বলল, অনুমান করতে পারছি। কিন্তু হাতে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। প্রমাণ ভাবে কত খুনি বেকসুর খালাস পেয়ে যায় আদালত থেকে, তা তো তুমি জানই। আমার সামনে এখন একটা আশ্চর্য প্রশ্ন, সেদিন নীলধ্বজ বাগচি কেন রণাদিত্য মিত্রকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাগুইহাটি পর্যন্ত? রণাদিত্য মিত্রকে চারতলা থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারলে তার সুবিধে হবে বলেই!

গার্গীর কিন্তু দৃঢ় ধারণা, নীলধ্বজ বাগচি খুনটা করেননি।

pathagar.net

সতেরো

পরদিন সকালেও গার্গীর চোখেমুখে ভাবনার অতলান্ত সমুদ্র। যে-ভীষণ দুপুরে বিনীতা রায় খুন হয়েছিলেন, তাঁর ফ্ল্যাটে যারা হানা দিয়েছিলেন একের পর এক, তাদের যে কারও ওপরে চাপতে পারে এই হত্যার দায়ভাগ। কিন্তু কে তিনি, কেনই বা তেমন ক্লু না রেখে দিব্যি আড়াল করে রাখতে পারছেন নিজেকে, তা গার্গীর কাছে এক বিস্ময়। তবে একটা ব্যাপারে গার্গী নিশ্চিত, খুনি যথেষ্ট সাবধানি, অনেক হিসেব করে খুন করেছে লক্ষ বস্তুকে।

ঘুম থেকে উঠেই সায়ন ফোলা-ফোলা চোখে যথারীতি জানতে চায়, আজও কি এখনই বেরিয়ে যাবে তুমি?

গত দু'দিন গার্গী সকালের ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে গেছে তদন্তের কাজে। সায়নও এই সময় বেরোচ্ছে বলে সুবিধেই হচ্ছে গার্গীর। সায়ন যখন প্রোডাকশনের নতুন কোনও পণ্যের কথা ভাবে, তা নিয়ে গবেষণা করে, তখন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত রাখে নিজেকে। নাহলে, তার মতে, কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়। যে কোনও সৃষ্টির কাজই হল একটা ফুলটাইম জব। একটা নতুন সাবান তৈরি—তাও তো একধরনের শিল্পকর্মই। হাতে রং-তুলির পরিবর্তে থাকে বিভিন্ন উপকরণ আর একটা স্ব-উদ্ভাবিত ফর্মুলা।

সায়নের প্রশ্ন শুনে গার্গী তার ভাবনাসমুদ্র থেকে ভুস করে ভেসে উঠল, হ্যাঁ যাব। দু-একদিনের মধ্যেই একটা ফয়সালা করতে হবে সমস্যাটার।

—বাহ্, গুড গার্ল। আমিও চেষ্টা করছি যাতে খুবই দ্রুত বাথকুইনের জন্ম দিতে পারি।

—তাই ? তাহলে অনেকটা এগিয়েছ, বলো? গার্গীর কাছে এ-সংবাদটা আনন্দের, বিস্ময়ের। কোম্পানি একটা নতুন প্রোডাকশন বাজারে ছাড়তে পারবে, কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে, হইচই পড়বে চারিদিকে, এর চেয়ে উল্লাসের খবর আর কীই বা হতে পারে তাদের কাছে। সেও সায়নকে কমপ্লিমেন্ট জানাল, গুড বয়। তাহলে দুটো অঙ্কের সমাধানই যেদিন হবে, সেদিন সন্ধের পর সেলিব্রেট করব আমরা।

—এ গুড প্রপোজাল। তাহলে দ্রুত ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ফেলো। যার যার অঙ্ক কষতে বেরিয়ে পড়ি এখনই।

বলতে বলতে সায়ন দ্রুত শেভ করে, স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিয়েছে সারা দিনের মতো। এই সময়টা প্রায় যুবরাজের মতো দেখায় সায়নের লম্বা, ফর্সা, দোহারা শরীরটা। গার্গী মনে মনে তারিফ করে বলল, তোমার উত্তর যদিও বা মেলে, আমার উত্তর এত দ্রুত মিলবে কি না কে জানে।

টোস্ট, ওমলেট, কলা ও স্যালাড সহযোগে দুজনের ব্রেকফাস্টের প্লেট, তখনও শেষ হয়নি, তার মধ্যেই দেবাদ্রি সান্যালের ফোন। ফোনটা আসবে এরকমই যেন আশা করেছিল গার্গী। কণ্ঠস্বরে খুবই উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা মিশেল করে বলল, বলুন মিঃ সান্যাল।

—খুব ভোরে নীলধ্বজ বাগচিকে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে তুলে এনেছি। খুব ধমকধামক দিতেও কিন্তু কিছুতে স্বীকার করলেন না।

—কী স্বীকার করলেন না।

—যে উনিই বিনীতা রায়কে খুন করেছেন।

—কী বলছেন তাহলে?

—বলছেন, উনি সেদিন দুপুরবেলা ভীমপল্লশ্রী ফ্ল্যাটবাড়িটার তিনের দুই ফ্ল্যাটে

pathagar.net

গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু উনি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দেখেন, ফ্ল্যাটের দরজা ভেজানো। দরজা ঠেলেই খুলে গিয়েছিল অমনি। ভেতরে গিয়ে দেখলেন, ততক্ষণে খুন হয়ে গেছেন বিনীতা রায়।

—তারপর?

—তারপর উনি আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে চুপিচুপি নেমে আসেন সিঁড়ি বেয়ে।

—আচ্ছা, ওঁকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছেন কি, সে সময় রণাদিত্য মিত্রদের ফ্ল্যাটে কি তালা দেওয়া ছিল?

—উনি বলেছেন, দৃশ্যটা দেখে উনি এতই শক্‌ড হয়ে গিয়েছিলেন যে, কোনও কিছুই নজরে পড়েনি তার।

—কিন্তু কেন গিয়েছিলেন বিনীতা রায়ের কাছে সে-সম্পর্কে কিছু বলেছেন?

—না, বলেছেন এমনিই। জাস্ট ফর ফ্রেণ্ডশিপ। তবে কিছুক্ষণ থার্ড ডিগ্রি দিলেই হুড়হুড় করে কথা বার করে ফেলব নিশ্চিত।

—ঠিক আছে, গার্গী হাসল, এখনই থার্ড ডিগ্রি দেওয়া দরকার নেই।

আমি একটু বেরোচ্ছি। হয়তো ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই ফিরে আসব। মিঃ বাগচিকে ততক্ষণে আপনাদের ওখানে রেখে দিন।

—হ্যাঁ। এখন ওঁকে ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই। তবে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলি। খুব ভোরে, যখন নীলধ্বজ বাগচিকে তুলে নিয়ে আসছি ওঁদের ফ্ল্যাট থেকে, ওঁর স্ত্রী বৃন্দা বাগচি হঠাৎ আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী বলল জানেন?

—কী বলল? গার্গীর কণ্ঠস্বরও বিস্ময়।

—বলল, কাল মিসেস চৌধুরিকে বলেছি আমার স্বামীই খুনটা করেছেন। তখন রাগের মাথায় বলেছি। উনি কিন্তু বিনীতা রায়কে খুন করেননি।

—রিয়্যালি? গার্গী প্রায় হতভম্ব, ঠিক আছে। ঘণ্টা দুয়েক পরে আপনাকে আবার ফোন করব। দরকার হলে আমি থানায় যেতেও পারি নীলধ্বজ বাগচিকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে।

ফোনটা রেখে ব্রেকফাস্ট শেষ করলে গার্গী। সায়ন তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল তার গাড়ি চালিয়ে। গার্গী ও গ্যারেজ থেকে বার করল তার নতুন বাহন। এত সকালে রতন আসে না বলে সে নিজেই ড্রাইভ করে এসে পৌঁছাল হিন্দুস্থান পার্কের সেই ঠিকানায়, যেখানে ট্রিঙ্কা তার দিদার কাছে পরশু সন্ধে থেকেই আছে। ইতিমধ্যে বারকয়েক পুলিশের লোক, দু-দুটি সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিরা ঘুরে গেছে ট্রিঙ্কার কাছে। গাগীও অতএব আর একটি সংবাদপত্র হয়ে ঢুকে গেল দোতলা বাড়িটার মস্ত বারান্দায়, যেখানে ট্রিঙ্কা একটা ঢাউস পুতুল কোলে নিয়ে বসে আছে শুকনো, বিষণ্ণ মুখে। একটু দূরে সাদা থান পার বৃদ্ধা দিদা চশমা পরে খবরের কাগজের পাতায় নিমগ্ন।

বৃদ্ধার অনুমতি নিয়ে গার্গী হাসি-হাসি মুখে ভাব জমাতে চাইল ট্রিঙ্কার সঙ্গে, তোমার পুতুলটাকে দেখতে অনেকটা হাওয়াইয়ান দ্বীপের মেয়েদের মতো, তাই না?

ট্রিঙ্কা তার ফোলা ফোলা চোখদুটো তুলে গার্গীকে পরখ করল, হাওয়াইয়ান দ্বীপ কোথায়?

—সে অনেক দূরে। সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে। সে দ্বীপের চারপাশে নীল সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় শুধু নীল জল আর নীল জল। আর সমুদ্রের বিচের ধার ঘেঁষে লম্বা লম্বা নারকেল গাছের সার।

ট্রিঙ্কার পরবর্তী প্রশ্ন তুমি কে?

pathagar.net

—বলো তো, আমি তোমার কে হই?

—নিশ্চই আর একটা মাসিমণি।

—জাস্ট অ্যা গুড গার্ল। গার্গী তার গালে ছোট্ট একটা টোকা মারল, তোমার আই কিউ কিন্তু দারুণ।

আই কিউ ব্যাপারটা আজকাল সব শিশুরাই বোঝে। ট্রিঙ্কা তাতে এত খুশি হল যে, গার্গী তার সঙ্গে অচিরেই দারুণ ভাব জমিয়ে ফেলল। একটু পরেই ট্রিঙ্কা সহজ হয়ে উঠল গার্গী এবার শুরু করল তার প্রশ্নাবলী।

—আচ্ছা ট্রিঙ্কা, পরশু তোমরা ঠিক ক'টার সময় বাড়ি থেকে স্কুলে বেরিয়েছিলে বলো তো?

ট্রিঙ্কাকে অবশ্য একটুও ভাবতে হল না, বলল দশটা পাঁচে।

—আর স্কুলে পৌঁছাল কখন?

—দশটা পঞ্চাশে।

—তোমার বাবা তোমাকে স্কুলে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন, না বাসস্টপে নেমে তুমি নিজেই চলে গিয়েছিলে স্কুলে?

—না, বাবা তো আমার সঙ্গে নামল। তারপর রাস্তার একটা দোকান থেকে একটা চকোলেট -বার কিনে দিয়ে বলল, তুই টিফিন খাবি।

—খেয়েছিলে চকোলেটটা?

—না। ও তো বন্ধুরা ব্যাগের মধ্যে দেখতে পেলেই কেড়ে নিয়ে ভাগ করতে বসবে। বাবার কাঁধে একটা ব্যাগ ছিল, তার ভেতর চকোলেটটা রেখে দিয়ে বললাম, বিকেলে বাড়ি গিয়ে খাব।

গার্গী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, কী রঙের ব্যাগ?

সবুজ।

—তারপর তুমি স্কুলে ঢুকে গেলে?

—না। বাবা বলল, জুতোর মধ্যে শক্ত শক্ত কিছু একটা ঢুকেছে। বলে নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খুলে দেখে কি—উঃ কী সাংঘাতিক—

গার্গী চমকে উঠে বলল, কী?

—একটা আরশুলা। বোধহয় জুতোর মধ্যে ঢুকে বসেছিল। ওই অবস্থায় জুতো পরে বাবা এতদূর এসেছে। বাবার পায়ের চাপে থেঁতলে-থুতলে—ইস, ওয়াক্—

ট্রিঙ্কা মুখ কাঁচুমাচু করতেই গার্গী আলোচনার মোড় অন্যদিকে ঘোরায়, আচ্ছা ট্রিঙ্কা, তুমি নীলকাকুকে চেনো? মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়ি আসে তো?

—আমার ছুটি থাকলে আসে। কিন্তু মা লোকটাকে পছন্দ করে না।

কীরকম রেগে রেগে কথা বলে।

—ঠিক আছে, গার্গী তার ব্যাগ থেকে একমুঠো টফি বার করে ট্রিঙ্কার হাতে দিয়ে বলল, তাহলে এখন আমি আসি, মাসিমণি। আবার পরে আসব।

টফি পেয়ে ট্রিঙ্কা ভারি খুশি।

ঠিক সেই মুহূর্তে গার্গীর নজরে পড়ল. ট্রিঙ্কার পাশেই অবহেলায় ছড়িয়ে আছে দু-তিনটি বই। কোনওটাই অবশ্য তার পাঠ্যপুস্তক নয়। কী বই টেনে নিয়ে দেখতে যেতেই ট্রিঙ্কা বলল, দিদা দিয়েছে। গল্পের বই। আমার পড়ার বই তো সব আমাদের ফ্ল্যাটের ভেতর, তালাবন্দি।

pathagar.net

বেচারি ট্রিঙ্কার স্কুলও আপাতত শিকেয়। গার্গী দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে আরও দেখল, বইগুলির পাশে একটা রং-পেন্সিলের বাক্স। ভেতরে বারোটি মোম-পেন্সিল সাজানো। সেটি কৌতূহলী হয়ে দেখতেই ট্রিঙ্কা খুশি হয়ে বলল, দেখবে আমার ছবির খাতা? কত্ত ছবি এঁকেছি—

ঘরের ভেতর থেকে ড্রয়িংয়ের খাতাটা এনে খুবই উৎসাহভরে গার্গীকে উল্টেপাল্টে দেখাল ট্রিঙ্কা। তার ভেতর হাতি, উট, আম, ব্যাঙ, টিকটিকি ইত্যাদি আঁকা। দেখতে দেখতে গার্গী উচ্ছ্বসিত হল, বাহ, বেশ সুন্দর আঁকার হাত তো তোমার? কখন আঁকলে এত সব?

—বাবা তো মোম-পেন্সিল আর আঁকার খাতা কিনে দিয়ে গেছে কাল।

—তাই? আঁকা শেখো নাকি কারও কাছে?

—বাবাই তো মাঝেমধ্যে দেখিয়ে দেয়। কী ভাল আঁকতে পারে বাবা, তা জানো?

ট্রিঙ্কাকে একটা আদর দিয়ে গার্গী অতঃপর তার অফিসের পথ ধরল? হিন্দুস্থান পার্ক থেকে হু হু করে ছুটে চলল এসপ্ল্যানেড ইস্টের ব্যস্তসমস্ত অফিসপাড়ায়।

আঠেরো

হিন্দুস্থান পার্ক থেকে ড্রাইভ করে খুবই নিশ্চিন্ত মনে অফিসের পথ ধরল গার্গী। এত পরিশ্রমের পর ক্রমশ যখন কঠিনতর হয়ে উঠছিল অঙ্কটা, তখনই ছোট্ট দু-তিনটে সূত্র একেবারে হাতের মুঠোয় উঠে এল। ভাবেইনি, কঠিন অঙ্ক এত সহজ ফর্মুলার কষা যাবে। ভাবেনি বলেই এত হয়রানি।

অনেক সময় এরকম তো হয়ই। অ্যালজেব্রার গায়েগতরে অনেক ভারী অঙ্ক ছোট্ট একটা ফর্মুলা প্রয়োগ করেই উত্তর বার করা যায়। কতবার এরকম অভিজ্ঞতা ঘটেছে আগে। আজও ঘটল আর একবার।

গাড়ি চালিয়ে অফিসে পৌঁছাল যখন, ভারী কর্মব্যস্ত হয়ে উঠেছে প্যারাডাইস প্রোডাক্টসের অফিস। গার্গী রোজই দেরি করে ঢুকছে তা নজর এড়াচ্ছে না কারও। সবাই অবাক হয়ে ভাবছেও, এম. ডি. পরপর তিনদিন দেরি করে অফিসে ঢুকেছেন এমন তো হয় না কখনও।

না কি চেয়ারম্যান সাহেব অফিসে আসছেন না, ফ্যাক্টরিতে সারাক্ষণ থাকছেন বলেই এম. ডি.ও ঢিলে দিয়েছেন কাজে!

চেম্বারে ঢুকে খুব দ্রুত তার বকেয়া কাজগুলো সেরে ফেলল। কমার্শিয়াল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হল, সাপ্লাইয়ের চাকাও নির্ধারিত গতিবেগেই ঘুরছে। নিশ্চিত, সেই সঙ্গে নিশ্চিন্তও। পরক্ষণে ফোনে বোতাম টিপে যোগাযোগ করল দেবাদ্রি সান্যালের সঙ্গে, মিঃ সান্যাল, কোনও খবর আছে?

—না, দেবাদ্রি সান্যাল এবার সাট্‌ল্ ককটা ফিরিয়ে দিল গার্গীর কোর্টেই, খবর তো আপনিই দেবেন বললেন।

—হ্যাঁ দেব। কে হত্যা করেছে বিনীতা রায়কে তা জানাব সবাইকে। সত্যব্রত রায়কে ওঁদের 'ভীমপল্লশ্রী'র ফ্ল্যাটে নিয়ে আসুন। সঙ্গে নীলধ্বজ বাগচিকেও।

দেবাদ্রি স্বর দ্বিধান্বিত, কী বলতে চাইছেন, মিসেস চৌধুরি? সত্যিই?

—হয়তো হত্যাকারীকেও দেখতে পাবেন সেখানে।

দেবাদ্রি স্বভাবতই উত্তেজিত, জোক করছেন না তো মিসেস চৌধুরী?

pathagar.net

—অ্যাবসলিউটলি নট। ইট'স ট্রুথ অ্যাজ ডে লাইট। পারলে বৃন্দা বাগচি আর অপরূপা মিত্রকেও নিয়ে আসুন, বলে অপরূপা মিত্রের ঠিকানা দেবাদ্রিকে দিয়ে আরও বলল, আর রণাদিত্য মিত্রকে একটা ফোন করে দিন, তিনি যেন ফ্ল্যাট ছেড়ে কোথাও না যান আজ। অন্তত আমরা যতক্ষণ ওঁদের ফ্ল্যাট থেকে না বেরিয়ে আসি। সবাই জুটলে আমাকে একটা ফোন করবেন।

দেবাদ্রি ফোন করলেন প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর।

জানালেন, সত্যব্রত রায়কে খুঁজে বার করতে ঘাম বেরিয়ে গেছে। তার বাড়িতে না পেয়ে গাড়ি পাঠাতে হয়েছিল ক্যামাক স্ট্রিটের সেই ফ্ল্যাটে, যার ঠিকানা আপনি দিয়েছিলেন। অপরূপা মিত্র, তার নাকি বোন না আত্মীয়, সেখানেই ছিল সত্যব্রত।

দেবাদ্রির কাছে কথাগুলো শুনে খুব একচোট হাসল গার্গী। তারপর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ল্যান্সডাউন রোডের উদ্দেশে।

সত্যব্রত রায়ের ফ্ল্যাটে তখন দেবাদ্রি সান্যাল ছাড়াও আরও জনাতিনেক পুলিশ অফিসার। তাঁদের সঙ্গে প্লেনড্রেসে সত্যব্রত রায়। বৃন্দা অপরূপাও আছেন। আছেন রণাদিত্য শ্রাবন্তীও। গার্গীকে দেখে দেবাদ্রি অবাক হলেন, কই, খুনি তো এখনও এসে পৌঁছায়নি।

গার্গী হাসল। ভারি রহস্যময় হাসি। বলল, অত তাড়া কীসের মিস্টার সান্যাল, ঠিক ঠিক সময়ে আপনারা দেখা পাবেন কালপ্রিটের। তার আগে দুটো তথ্য যাচাই করেনি।

বলে গার্গী ড্রয়িং এর এককোণে রাখা একটি সবুজ কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ আবিষ্কার করে বলল, দেখুন তো ব্যাগটার ভেতর একটা চকোলেট-বার পাওয়া যায় কি না?

—চকোলেট-বার! দেবাদ্রি বিস্মিত হয়ে নিজেই এগিয়ে গেলেন নিরীহ ভাবে ঝুলতে থাকা সবুজ ব্যাগটার দিকে। তার ভেতর থেকে আবিষ্কার করলেন চকোলেট বারটি।

দেবাদ্রি অবাক হয়ে বললেন, এটার কী মানে হল, মিসেস চৌধুরি?

—বলছি । দ্বিতীয় তথ্যটি হল, মিস্টার রায়ে যে শু পরে সাধারণত অফিসে যান, সেটি নিশ্চই ঘরের কোণে ওই ব্রাউন রঙের শু-টাই?

সত্যব্রত রায় সায় দিলেন, হ্যাঁ।

—দেখুন তো, ওর ভেতরকার মোজায় কোনও দাগ আছে কিনা। ধরুন, আরশোলা পিষ্ট হওয়ার দাগ। স্লিম চেহারার যে পুলিশ অফিসারটি ক'দিন ধরে দেবাদ্রির সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছেন, তিনিই এবার এগিয়ে গেলেন জুতো জোড়ার দিকে। ডান পায়ের মোজায় লেগে থাকা দাগটা পরীক্ষা করে ঘাড় নাড়লেন, মনে হচ্ছে আরশুলা মরার দাগই। দেবাদ্রি তাতেএ কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, এতে কী প্রমাণ হল, মিসেস চৌধুরি। আর এসব ইনফর্মেশন আপনি জোগাড়ই বা করলেন কীভাবে?

—সবই বলব, মিঃ সান্যাল। তার আগে মিঃ রায়কে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, আপনার আলমারির ডুপ্লিকেট চাবিটা কোথায় থাকে বলুন তো?

সত্যব্রত রায় ততক্ষণে অগাধ বিস্ময়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, সামলে নিয়ে বললেন, ডুপ্লিকেট চাবি তো অনেকদিন আগেই হারিয়ে গেছে—

—দ্যাট'স রাইট। গার্গীকে এবার যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী দেখায় । তাহলে মিঃ সান্যাল, আমার অনুমান এবার ইন -টো টো মিলে গেল।

—কী মিলে গেল তা তো এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না আমাদের কাছে। দেবাদ্রিও বিভ্রান্ত।

—তাহলে আসুন সবাই, সোফায় বসে শুনুন পুরো গল্পটা। এক একটা খুনের পেছনে কত

pathagar.net

যে অদ্ভুত আশ্চর্য কাহিনী লুকিয়ে থাকে, তা যতই এ ধরনের খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ছি, ততই আমার কাছে পরিস্ফুট হচ্ছে আস্তে আস্তে। বিনীতা রায় খুন হওয়ার ঘটনা আপাত দৃষ্টিতে একটা প্রেমের অনিবার্য পরিণতি, কিন্তু ঘটনাটার সঙ্গে একের পর এক অনেক বিচিত্র চরিত্র জড়িত হয়ে গেছে, যেরকমটা হয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে ; বলতে পারেন, নিয়তি তাড়িত হয়ে।

সবাই ততক্ষণে সত্যব্রত রায়ের ফ্ল্যাটে বসেছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। কেউ সোফায়, কেউ প্ল্যাস্টিকের চেয়ার টেনে, কেউ বা মোড়ায়। শুধু দেবাদ্রির অধস্তন দুই পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে। কড়া চোখে লক্ষ রাখছেন ঘটনার কুশীলবদের ওপর।

গার্গীর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ সেই সব ক'টি মুখ একবার গভীরভাবে নিরিখে করে থিতু হল দেবাদ্রি সান্যালের ওপর, বুঝলেন মিঃ সান্যাল, এরকমই একটি চরিত্র রণাদিত্য মিত্র। খুবই প্রতিভাবান শিল্পী। একদিকে তিনি একজন উচ্চমানের বিল্ডিং প্ল্যানার, বাজারে ভাল খ্যাতি, প্রচুর চাহিদা তাঁর বিল্ডিং প্ল্যানের, রোজগারও যথেষ্ট। অন্যদিকে একজন ভাল চিত্রশিল্পী। কিন্তু বিল্ডিং প্ল্যান করে অর্থ রোজগারের পথে অধিকতর ঝুঁকে পড়ায় ছবি- আঁকিয়ে হিসেবে তেমন নাম করতে পারেননি। এ হেন রণাদিত্য মিত্র' ভীমপল্লশ্রী' নামের ফ্ল্যাটবাড়িতে বাস করতে এসে জড়িয়ে পড়লেন এক অদ্ভুত নারীর সঙ্গে। তিনি বিনীতা রায়।

রণাদিত্য মিত্রও উপস্থিত ছিলেন সত্যব্রত রায়ের ড্রয়িংরুমে, তিনি গার্গীর কথার প্রতিবাদ করে বললেন, জড়িয়ে পড়লাম মানে?

গার্গী হেসে বলল, বিনীতা রায়কে আমি দেখিনি। তাঁর স্বভাব-চরিত্রও আমার জানা নেই। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যে সামান্য জ্ঞান আহরণ করেছি গত তিন-চারদিনে, তাতে ভারি অদ্ভুত লেগেছে ভদ্রমহিলাকে। পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলায় কোনও সাধারণ নারী-চরিত্রের চেয়ে তাঁর একটু বেশিই উৎসাহ। কিন্তু একে গৃহবধূ, তায় পুলিশ অফিসারের স্ত্রী। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে কোনও পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার সাহস বা ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই এই ফ্ল্যাটবাড়িতে এসে প্রতিবেশী হিসেবে আবিষ্কার করলেন রণাদিত্য মিত্রকে। মিঃ মিত্র সারাদিন একাই থাকেন বাড়িতে। ছবি আঁকা আঁকি, বাড়ির প্ল্যান করতেই ব্যস্ত থাকেন, তার মধ্যেই লিফটে ওঠার সময় তাঁর আলাপ হয়ে গেল বিনীতা রায়ের সঙ্গে। ঘরের পাশেই এক শিল্পীকে দেখে বিনীতার মনেও ভারি কৌতূহল। প্রায় যেচেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইলেন রণাদিত্য মিত্রর সঙ্গে। মডেল হয়ে তাঁর একটা ছবি আঁকতেও প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিনীতা। সত্যব্রত রায় তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছিলেন ছবি আঁকার ব্যাপারটা। তিনি অবশ্য স্ত্রীর ওই অস্বাভাবিক আবদারে মোটেই খুশি হননি। বরং ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন স্ত্রীর এই পাগলামিকে।

বিনীতা রায়ের খুনের পরদিন সত্যব্রত রায় দেবাদ্রি সান্যালের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, রণাদিত্য মিত্রই বিনীতার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত অসফল হওয়ায় খুন করেছেন বিনীতাকে। প্রমাণ হিসেবে বিনীতা রায়ের একটি প্রায়-অশ্লীল ছবি দাখিল করেছেন দেবাদ্রি সান্যালের কাছে। বলেছেন, রণাদিত্য মিত্রই এঁকেছেন ছবিটা। সত্যব্রত আরও অভিযোগ করেছেন, তাঁর স্ত্রী একটি আংটিও প্রেজেন্ট করেছিলেন রণাদিত্য মিত্রকে।

রণাদিত্য বসেছিলেন একটা মোড়ায়। গর্জে উঠে বললেন, অল ড্যাম লাইজ।

—রণাদিত্য মিত্র খুন করেছেন কি না সে প্রশ্ন ঝুলিয়ে রেখে আমি অতঃপর নজর ফেলছি

pathagar.net

রণাদিত্যর স্ত্রী শ্রাবস্তী মিত্রর দিকে। খুবই এলেমদার মহিলা। তাঁকে প্রায় সারাদিনই ব্যস্ত থাকতে হয় হোটেল ডলফিনের বিশাল কিচেনের তদারকিতে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁদের ফ্ল্যাটে কী হয় না হয় তা তাঁর জানার কথা নয়। তিনি জানতেও চান না কারণ তাঁর স্বামীর চরিত্র বিষয়ে তিনি বিরক্ত। স্বামীর রুচিও সম্ভবত তাঁর পছন্দের নয়। ড্রয়িং-এ অতগুলি নগ্ন নারীর অয়েল পেইন্টিং টাঙিয়ে রাখেন যে শিল্পী, তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ও বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক শ্রাবস্তী মিত্রের পক্ষে। বিনীতা রায়ের সঙ্গে তাঁর স্বামীর কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কি না সে তথ্যের চেয়ে তাঁর ইদানীং মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছিলেন সত্যব্রত রায়। রণাদিত্য মিত্র যে প্রচুর কালো টাকার মালিক হয়ে উঠেছেন, আর সে ব্যাপারে নাক গলাতে শুরু করেছেন সত্যব্রত, সেটা বুদ্ধিমতী শ্রাবস্তী মোটেই ভাল মনে মেনে নিতে পারছিলেন না। নিশ্চই রণাদিত্য ও শ্রাবস্তীর মধ্যে এ ব্যাপারে আলোচনা হত প্রায়ই। কীভাবে সত্যব্রত রায়কে থামানো যায় তা ভাবতে গিয়ে দিশে হারিয়ে ফেলেছিলেন দুজনেই। সত্যব্রত সম্ভবত চাপ দিচ্ছিলেন রণাদিত্যকে কালো টাকার একটা সিংহভাগ তাঁকে দিতে, নইলে মিত্রদের হাজতবাস অবশ্যম্ভাবী। উল্লেখযোগ্য যে, ঘটনার দিন দুপুরে শ্রাবস্তী হোটেল ডলফিন থেকে দুঘন্টার ছুটি নিয়ে কোথাও গিয়েছিলেন, হয়তো নিজের ফ্ল্যাটেই এসেছিলেন স্বামী রণাদিত্য মিত্রর সঙ্গে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী এই কাজটা হাসিল করতে।

রণাদিত্য মিত্র চিৎকার করে বললেন, কীসের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ? কীসব মিথ্যে কথা বলছেন?

—যদি এরকম হয় যে আপনার দুজনে ষড়যন্ত্র করে বিনীতাকে হত্যা করে হত্যার দায়ভাগ কোনওক্রমে চালাতে পারেন সত্যব্রত রায়ের কাঁধে, তাহলেই অজস্র কালো টাকা রাখার দায়ে আপনাদের জেল-হাজতবাস থেকে রক্ষে হয়। সত্যব্রতর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার এইটাই তো একমাত্র উপায়, মিঃ মিত্র।

—অল লাইজ, ড্যাম লাইজ। রণাদিত্য মিত্র লাফিয়ে উঠতে চাইছিলেন। সেই মুহূর্তে দেবাদ্রি সান্যালের একজন অফিসার ছুটে গিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিলেন পুর্নবার।

—সত্যি কি মিথ্যে, তা যাচাই হবে পরে। এখন আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি দুটি বিষয়ের ওপর। এক, ঘটনার দিন-দুপুরে বাগচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির কোনও একজনের ফোন পেয়ে রণাদিত্য মিত্র সত্যিই ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়েছিলেন কিনা। এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন, রণাদিত্য মিত্র কি আগে থেকে চিনতেন নীলধ্বজ বাগচিকে? দেখুন তো মিঃ মিত্র, আপনি কি নীলধ্বজ বাগচিকে কখনও দেখেছেন এর আগে?

রণাদিত্য মিত্র গার্গীর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন নীলধবজ বাগচির দিকে, দেখেই বললেন, এঁকে তো মাঝে মাঝে আসতে দেখেছি বিনীতার কাছে। কী নাম ওঁর?

গার্গী উত্তর দেয়, ইনিই কিন্তু বাগচি কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার নীলধ্বজ বাগচি। আপনি ওদের কোম্পানির বিল্ডিং প্ল্যান করেছেন। ওঁদেরই ফোন পেয়ে সেদিন দুপুরে বাগুইহাটি গিয়েছিলেন বলে দাবি করছেন।

রণাদিত্য মিত্র ঘাড় নেড়ে বললেন, যা, এঁকে আমি কখনও দেখিনি। কে একজন সুমোহন বসু—বোধ হয় এঁদের কর্মচারী—তিনিই যোগাযোগ করতেন আমার সঙ্গে।

গার্গী তৎক্ষণাৎ তাকাল নীলধ্বজ বাগচির দিকে, বলল, কিন্তু মিঃ বাগচি, আপনি নিশ্চই জানতেন রণাদিত্য মিত্রর নাম। আপনার কর্মচারী যখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন বিল্ডিং প্ল্যানের ব্যাপারে, তাঁর নাম-ঠিকানা আপনার পক্ষে অবশ্যই জানা সম্ভব। তাহলে বলুন তো

pathagar.net

আপনি মিঃ মিত্রকে কেন ফোন করে নিয়ে গিয়েছিলেন বাগুইহাটিতে? উনি ফ্ল্যাট থেকে চলে গেলে আপনার পক্ষে খুন করতে সুবিধে হবে বলে?

নীলধ্বজ বাগচি বিস্ময়ের ভান করে বললেন, কে বলল আমি ওঁকে ফোন করে বাগুইহাটি যেতে বলেছিলাম? এটা নিশ্চই ওঁর বানানো গল্প।

নিশ্চই ওঁরাই স্বামী-স্ত্রী মিলে খুন করেছেন বিনীতাকে। তারপর একসঙ্গে ফ্ল্যাট ছেড়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছিলেন নিচে। আমি ওপরে এসে দেখতে পাই, বিনীতা খুন হয়ে পড়ে আছেন রক্তের নদীর মধ্যে।

—ঠিক আছে, গার্গী নিজের মনেই হাসল। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সত্যব্রত রায়ের কাছে, আচ্ছা, মিঃ রায়, বিনীতা রায় যেদিন খুন হন, সেদিনই আপনার ফ্ল্যাটের দরজা সিল করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আপনি কীভাবে রণাদিত্য মিত্রর আঁকা ছবিটা সংগ্রহ করলেন? সেটা তো ফ্ল্যাটের ভেতর থাকার কথা।

এতই আকস্মিক প্রশ্ন যে সত্যব্রত রায় স্বভাবতই বিব্রত হয়ে পড়লেন প্রথমটা। তারপর অবশ্য সামলে নিয়ে বললেন, ওটা আমার পকেটেই ছিল।

গার্গীর পরবর্তী প্রশ্ন তার মানে ধরে নিতে হবে, ছবিটা আপনি সঙ্গে নিয়েই ঘুরে বেড়াতেন। কিন্তু এবার বলুন তো, বিনীতা রায় খুন হওয়ার পরদিন সকালেই কেন আপনি একটা মোমপেন্সিলের বাক্স কিনলেন?

—মোম-পেন্সিলের বাক্স কিনেছি?

—হ্যাঁ। যেটা ট্রিঙ্কাকে দিয়ে এসেছেন কাল। যে পেন্সিলকে আর্টিস্টরা বলেন প্যাস্টেল, সেই প্যাস্টেল দিয়েই তো আঁকা হয়েছে বিনীতা রায়ের ছবিটা। আপনিই তো ট্রিঙ্কাকে আঁকা শেখান। আপনার আঁকার হাতও তো খারাপ নয়।

সত্যব্রত কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাল।

—বিনীতা রায়ের ছবিটা, আমার অনুমান আপনারই আঁকা মিঃ রায়। রণাদিত্যর ওপর আপনার রাগ প্রকাশ করার এই উপায়টা মাথা খাটিয়ে বার করেছিলেন আপনিই। খুন কে করেছিলেন সে প্রশ্নে পরে আসছি। কিন্তু রণাদিত্যকে খুনি সাব্যস্ত করার জন্য আপনি নিজের মৃতা স্ত্রীর ছবি ওভাবে না আঁকলেও পারতেন।

যাই হোক, ছবিটা এঁকে সত্যব্রত রায় আসলে ফাঁসাতে চেয়েছিলেন রণাদিত্য মিত্রকে। যখন কে খুনি তা ধরা যাচ্ছে না, পুলিশ ইন্সপেক্টর দেবাদ্রি সান্যাল খুনির খোঁজে চষে ফেলছেন সারা কলকাতা, সে সময় সত্যব্রত রায় ওরকম একটা অশ্লীল ছবি এঁকে দেবাদ্রি সান্যালের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন রণাদিত্য মিত্রের দিকে। কাজটা করেছিলেন বোকার মতোই, কেননা স্ত্রীর ওরকম একটা ছবি কেউ সারাক্ষণ সঙ্গে নিয়ে ঘোরে না। আর তাঁর এটাও বোঝা উচিত ছিল, রণাদিত্যর মতো পাকা ছবি আঁকিয়ে ওভাবে মোম-পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকবেন না। ছবি আঁকার হাত সত্যব্রত রায়ের যত ভালই হোক, রণাদিত্য মিত্রর মতো দক্ষতা যে তাঁর নেই। তা যে কেউ দুজনের আঁকা দেখলেই বুঝে ফেলবেন তদন্তে।

আসলে সত্যব্রত রায় প্রথম থেকেই ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন পুলিশকে। প্রথমে ডাকাতির গল্প বলে পাঁচির ছেলে বা তার বস্তির ইয়ার বন্ধুদের দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে চেয়েছেন দেবাদ্রির। তাতে সফল না হয়ে স্ত্রীর অশ্লীল ছবি এঁকে দেবাদ্রিকে শোনালেন রণাদিত্য মিত্রর গল্প। ছবির জগৎটা দেবাদ্রি ভাল বোঝেন না বলে প্রাথমিকভাবে সত্যব্রত সফল হয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না।

pathagar.net

সত্যব্রত এতক্ষণে গম্ভীর হয়ে বললেন, কী বলতে চাইছেন আপনি?

—সবার কিন্তু নীলধ্বজ বাগচিকেই মনে হবে এই নাটকের আসল গুরু। তাঁকে খুনি প্রতিপন্ন করার সব ব্যবস্থাই নীলধ্বজ নিজে হাতে করেছেন। তার প্রথম প্রমাণ হল এই হলুদ খামটি।

ভ্যানিটিব্যাগ থেকে হলুদ খামটি বার করে দেবাদ্রির হাতে দিয়ে গার্গী বলল, এই হলুদ খামটি হাতে না পড়লে আমি কিন্তু রহস্যের আসল গল্পের ভেতর ঢুকতে পারতাম না কখনও। এই চিঠির ভাষায় যে ইঙ্গিত দেওয়া আছে। তাতে নীলধ্বজ বাগচিকে খুনি না ভাবার কোনও কারণ নেই। নীলধ্বজ বাগচির খুনি হওয়ার দ্বিতীয় ক্লু, ওই দিন দুপুরে তাঁর বিনীতা রায়ের কাছে আসা ও তার আগে রণাদিত্য মিত্রকে বাগুইহাটিতে ফোন করে নিয়ে যাওয়া। আসলে দুটো ঘটনাই কাকতালীয়। রণাদিত্যকে ফোন করেছিলেন বাগচি কনস্ট্রাকশনের অন্যতম কর্মী সুমোহন বসু। যিনি নীলধ্বজ বাগচির হয়ে অনেকটা দায়িত্ব বহন করেন তাঁর কোম্পানির। আর নীলধ্বজ বাগচি কেন যাতায়াত করতেন বিনীতার কাছে, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি, তার আগে সত্যব্রত রায়ের কথাই বলি। কিছু মনে করবেন না মিঃ সান্যাল, আপনাদের অনেক পুলিশ অফিসারই চাকরিতে ঢোকার পর কতভাবে টাকা রোজগারের রাস্তায় নামা যায় প্রথমে তারই ছক কষতে থাকেন অবিরত। অবশ্য এ ব্যাপারে ক'দিন আগে পুলিশের কোনও একটা অ্যাসোসিয়েশনের পাণ্ডা প্রকাশ্য মিটিং-এ দায়ী করেছেন বড় বড় পুলিশ কর্তাদেরই। বলেছেন, রিক্রুটমেন্টের সময় এইসব প্রার্থীদের কাছ থেকে এমন মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ নিয়ে নেওয়া হয় চাকরিটার বিনিময়ে যে, তারা চাকরিতে ঢুকে তো কখনই দুধ খাবে না, ঘুষই খাবে।

তো সত্যব্রত রায় বোধহয় এ ধরনেরই মানসিকতার যুবক যিনি চাকরিতে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন কীভাবে দ্রুত আরও আরও অর্থ রোজগার করা যায়, বড়লোক হওয়া যায় আরও অনেকের আগে। ওঁর লকারের ভেতর ক্যাশ টাকার পরিমাণ দেখে কিছুটা অনুমান করা গেছে নিশ্চই। বাকি টাকা কোন ব্যাঙ্কের কোন অ্যাকউন্টে আছে সেটা বার করা আপাতত আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শুধু কীভাবে টাকা রোজগারের ফন্দি এঁটেছিলেন, তারই মাত্র একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

পার্ক স্ট্রিটের বাগচি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মালিক নীলধ্বজ বাগচি এরকমই আর একজন যুবক। যিনি একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির মালিক, যিনি বহু সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সিভিল কনস্ট্রাকশনের কাজ করেন। তাতে প্রচুর উপার্জন, কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর অর্থ রোজগারের আরও অনেকগুলো পথ আছে যার সবটাই হয়তো সাদা পথের নয়। ফলে একদিকে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি থেকে যেমন বহু অর্থ সমাগম হচ্ছে তাঁর, তেমনই অসদুপায়ের রোজগারও কম নয়। মাত্র তেত্রিশ চৌত্রিশ বছরেই লক্ষ লক্ষ টাকা কি হয়তো কোটি টাকা রোজগার করতে গেলে কী পরিমাণ এলেম থাকতে হয় তা নিশ্চই অনুমান করা সম্ভব। এহেন এলেমদার নীলধ্বজ বাগচির সঙ্গে কোনও ভাবে দেখা হয়ে যায় আর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, জাঁদরেল পুলিশ ইনস্পেক্টর সত্যব্রত রায়ের।

বলতে বলতে প্রথমে সত্যব্রত রায়ের দিকে, পরক্ষণে দেবাদ্রি সান্যালসহ বাকি পুলিশ অফিসারদের দিকে নজর ছুঁয়ে এল গার্গীর চোখ। কঠিন রূঢ় কথাগুলো এত সহজভাবে বলে যাচ্ছে গার্গী যে, দেবাদ্রি সান্যালও নিশ্চয়ই ভাবছেন, কলজেয় বেশ সাহস থাকলে তবেই এভাবে বলা যায়।

pathagar.net

সত্যব্রত রায় অচিরেই জেনে ফেললেন, নীলধ্বজ বাগচি প্রচুর কালোটাকার মালিক। ইচ্ছে করলেই তিনি ইনকাম ট্যাক্স দপ্তরে অথবা তাঁর নিজের এনফোর্সমেন্ট দপ্তরের খবর দিয়ে. বিপদে ফেলতে পারেন নীলধ্বজকে। কিন্তু তিনি সে তালেই গেলেন না, সরাসরি সে টাকার ভাগ চাইলেন নীলধ্বজের কাছে।

নীলধ্বজ বুঝলেন, তিনি বেশ ঝামেলায় পড়েছেন। ফলে পুলিশ ইনস্পেক্টরের খিদে মেটাতে মেটাতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ঠিক করলেন, তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে খিদের পরিমাণ কমাতে হবে। একদিন সত্যব্রত রায়কে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাড়িতে। সেখানে আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রী বৃন্দা বাগচির সঙ্গে। ভাবলেন, সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে যদি ইনস্পেক্টর-এর মেজাজ নরম হয়। বৃন্দা অবশ্য আমার জেরার জবাবে বলেছেন, তাঁদের আলাপ হয়েছিল কোনও এক পার্টিতে। তবে সেটা সম্ভবত ঠিক নয়।

—সত্যব্রতর সঙ্গে বৃন্দা বাগচির আলাপ করিয়ে দিতে হিতে বিপরীত হল নীলধ্বজের। বৃন্দা থিয়েটারে অভিনয় করেন, অসাধারণ সুন্দরী, কথাবার্তায় তুখোড় বুদ্ধির ছাপ, এহেন নারীর সঙ্গ ও স্বাদ দুইই পেতে চাইলেন সত্যব্রত। টাকায় খাঁই করে সত্যব্রত এবার নীলধ্বজের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন, বৃন্দাকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গ দিতে বাধ্য করতে।

নীলধ্বজ পড়লেন মহাবিপদে। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী, একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা তাও নয়, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য অভিনয়ে আরও আরও নাম করা। তার জন্যে যদি কিছু দিতে হয় তাতেও তিনি রাজি, কিন্তু খামোকা এক পুলিশ অফিসারের পাল্লায় পড়তে যাবেন কেন!

নীলধ্বজ নিজেকে বাঁচাতে সে -কথা ঠারেঠোরে তাঁর স্ত্রী বৃন্দাকে বলতেই বৃন্দা নীলধ্বজের ওপর প্রবল ক্ষিপ্ত হন। এতটাই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কটাই গেল নষ্ট হয়ে।

কিন্তু সত্যব্রত একবার গন্ধ পেয়েছেন সুন্দরী নারীর, বৃন্দার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য তখন একদম মরিয়া। তা দেখে নীলধ্বজ গোপনে যোগাযোগ করলেন সত্যব্রতর স্ত্রী বিনীতার সঙ্গে। প্রায়ই দুপুরের দিকে তাঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে লাগলেন, এও জানালেন একমাত্র বিনীতাই পারেন সত্যব্রতকে নিরস্ত করতে। বিনীতা অবশ্য সত্যব্রতকে নিরস্ত করতে পারছিলেন না, কারণ সত্যব্রত একজন জাঁদরেল পুলিশ ইনস্পেক্টর, টাকাও করে ফেলেছেন প্রচুর, বিনীতার কোনও সাধ-আহ্লাদ অপূর্ণ রাখেননি। তাঁর ধমকানিতে বিনীতাকে চুপ থাকতে হত। তা ছাড়া সত্যব্রত হয়তো এও বুঝিয়েছিলেন বিনীতাকে যে, নীলধ্বজের কথা সবটাই বানানো। তিনি তাঁর কালোটাকা ধরা পড়ার ভয়েই এ ধরনের বদনাম ছড়াতে চাইছেন পুলিশ ইনস্পেক্টরের নামে।

নীলধ্বজ তখন একদিকে চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন বিনীতার ওপর, অন্যদিকে বৃন্দা নিজে রেহাই পেতে আর এক চাল চাললেন। তাঁরই এক সহকর্মী আর এক অভিনেত্রী অপরূপা মিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন সত্যব্রতর। অপরূপা ডিভোর্সি, একা থাকে, তার চরিত্রে খুব একটা সুনাম আছে তা নয়। বৃন্দা ভাবলেন, অপরূপার সঙ্গে সত্যব্রতকে ভিড়িয়ে দিতে পারলে তাঁর নিষ্কৃতি হবে। সত্যব্রত অবশ্য টোপ গিলে ভিড়ে গেলেন অপরূপার সঙ্গে। দুজনে রাত কাটাতে লাগলেন বাইরে ট্যুরে গিয়ে। কিন্তু সত্যব্রতর তখন বেশ নেশা ধরে গেছে নারীশরীরে। অপরূপা মিত্রের সঙ্গে নিয়মিত পাওয়ার মধ্যেও বৃন্দাকে পাওয়ার আশা ছাড়লেন না। আসলে বৃন্দা অতিরিক্ত সুন্দরী হওয়ার কারণেই মাথাটা খারাপ হয়ে গেল সত্যব্রতর।

ওদিকে অপরূপা কিন্তু ততদিনে সত্যব্রতর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তাকে বিয়ে করার জন্য। সত্যব্রত সেটা ভাবছেনও। কিন্তু বিনীতা তখন বাধ্য হয়ে আছে। তাকে সরিয়ে না দিতে পারলে অপরূপাকে পাবেনই বা কীভাবে!

একনাগাড়ে বলে চলেছিল গার্গী, কিন্তু এতক্ষণে সত্যব্রত রুখে উঠলেন, এসব গল্প আপনি কী করে বানাচ্ছেন বলুন তো। নীলধ্বজ বাগচিই তো বিনীতার কাছে রোজ দুপুরে আসত। সেই তো—

গার্গী হেসে বলল, নীলধ্বজ বাগচি প্রায়ই দুপুরে আসতেন, সে কথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি যে খুনের দিন দুপুরেও তিনি এসেছিলেন বিনীতার কাছে।

—খুনের দিন দুপুরেও! তাহলে তো তার পক্ষে খুন করাও সম্ভব, মিসেস চৌধুরি। কারণ সত্যব্রতর পক্ষে সেদিন দুপুরে ফ্ল্যাটে আসা কোনও ক্রমেই সম্ভবই ছিল না, দেবাদ্রির প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। সে সম্ভাবনার কথাও মাথায় আছে আমার। নীলধ্বজ বাগচি এসপ্ল্যানেড ইস্টের এক অফিসে টেণ্ডারে যাওয়ার নাম করে আসলে এই ফ্ল্যাটেই এসেছিলেন সেদিন দুপুরে। কিন্তু তার আগেই সত্যব্রতর হাতে খুন হয়ে গেছেন বিনীতা। সে দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে ফিরে যান নীলধ্বজ। তারপর ঘুমোতে পারেননি সারারাত।

সত্যব্রত চিৎকার করে উঠলেন, অসম্ভব। আমি কোনও ভাবেই ফ্ল্যাটে আসতে পারি না। সব আপনার তৈরি করা স্টোরি।

কিন্তু আপনি যে সেদিন দুপুরে ফ্ল্যাটে এসেছিলেন, তার অন্তত দুটি প্রমাণ একটু আগেই আপনারা দেখতে পেলেন নিজের চোখে। প্রথমটি চকোলেট বার, দ্বিতীয়টি মোজায় আরশুলা মরার দাগ। কীভাবে সেটা এবার পরিষ্কার করি। শুনুন মিঃ রায়, আপনি সেদিন বেলা দশটা পাঁচে আপনার মেয়ে ট্রিঙ্কাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তাকে স্কুলে পৌঁছে দেবেন বলে। আপনার পায়ে ছিল এই ব্রাউন শু আর কাঁধে ওই সবুজ ব্যাগটা। স্কুলে পৌঁছে আপনি মেয়েকে একটা চকোলেট-বার কিনে দিতে, সে আপনার ব্যাগেই রেখে দেয় ওটা, বাড়ি ফিরে খাবে বলে। তারপর আপনার জুতোর মধ্যে একটা আরশুলাও আবিষ্কৃত হয়, যে আরশুলাটি আপনার পায়ের চাপের থেঁতলে গিয়েছিল। যাইহোক, আপনি ট্রিঙ্কাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে চলে যান অ্যাসোসিয়েশনের কনফারেন্সে যোগ দিতে। সেখানে টিফিন পর্যন্ত ছিলেন, ক্যান্টিনে খেয়ে সবার অলক্ষ্যে ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসেন আপনার ফ্ল্যাটে। বিনীতাকে খুন করবেন সেটা আপনার পরিকল্পনাই ছিল, কিন্তু মারতে গিয়ে এত ধস্তাধস্তি হবে তা বুঝতে পারেননি। যাইহোক, কাজ সম্পন্ন করে ফেরার সময় দুটো ভুল করলেন। তাড়াহুড়োয় শু না পরে পায়ে গলিয়ে নিলেন স্যাণ্ডেলটা। আর কাঁধের সবুজ ব্যাগটা রেখে নিয়ে গেলেন অ্যাটাচি।

বলতে বলতে গার্গী তার দৃষ্টি ন্যস্ত করল দেবাদ্রি সান্যালের ওপর, আপনার নিশ্চই মনে আছে, মিঃ সান্যাল, সেদিন সত্যব্রত রায় যখন জিপ থেকে এসে নেমেছিলেন ফ্ল্যাটের সামনে, তাঁর হাতে ছিল অ্যাটাচি, আর পায়ে স্যাণ্ডেল!

দেবাদ্রি অবাক হয়ে বললেন, কিন্তু চকোলেট-বার আর আরশুলার ঘটনা কার কাছ থেকে শুনলেন?

—সে তো ট্রিঙ্কার কাছ থেকে।

সত্যব্রত রায় হুঙ্কার দিয়ে বললেন, তাহলে আলমারি ভেঙে টাকা চুরি করলে কে?

—সেও আপনার সাজানো কেস, মিঃ রায়। আলমারির চাবি বরাবর যেখানে থাকে, সেখানে না পাওয়া যেতে সেটা উদ্ধার হল আপনার পকেট থেকে। যে চাবির ডুপ্লিকেট নেই

সে-চাবি আপনার পকেট থেকে উদ্ধার হওয়ার অর্থই হল, আপনিই আলমারির পাল্লা খুলে রেখে, মেঝেয়ে শাড়ি জামা ছড়িয়ে গল্প ফাঁদলেন ডাকাতরাই এত কাণ্ড করেছে। খেয়াল করবেন, আলমারি কেউ ভাঙেনি, পাওয়া গেছে খোলা অবস্থায়। চাবিটা ঘরে পাওয়া গেলেও না হয় আলমারি কে খুলেছে তা নিয়ে সংশয় থাকত, কিন্তু আপনার পকেট থেকে আবিষ্কৃত হওয়ায় আর কোনও সন্দেহই নেই।

—কিন্তু নীলবাবু যে এসেছিলেন সেদিন দুপুরে, সেখানেও তো সন্দেহ থেকে যাচ্ছে, মিসেস চৌধুরি? দেবাদ্রি আরও প্রশ্ন।

দেবাদ্রি সান্যালের প্রশ্নে কিছুটা সময় নিয়ে ভাবল গার্গী। তারপরে নীলধ্বজ বাগচির সেই হলুদবর্ণ খামটি বার করে বলল, নীলধ্বজ বাগচি সেদিন এ-ফ্ল্যাটে এসেছিলেন ঠিকই, তবে আর একবার এই চিঠিটা পড়ুন। চিঠির ভাষাও অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু পরে আমি চিঠিটা ভাল করে পড়ে দেখলাম, আসলে সমস্যাটি পরিষ্কার করে লিখতে পারেননি নীলধ্বজ। তাই তাঁর ওপর সন্দেহের তির ছুঁয়ে যাচ্ছে। 'সত্যব্রত আমাদের দুজনের মধ্যে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে'—এখানে আমাদের দুজন বলতে নীলধ্বজ আর বিনীতাকে মনে হতে পারে। আসলে দুজনে হল নীলধ্বজ আর বৃন্দা। সত্যব্রতর চাহিদা পথের কাঁটা উঠেছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। তাছাড়া শেষ লাইনে আছে, সত্যব্রত যদি এখনও সংযত না হয়, তাহলে তোমার ওপরই প্রতিশোধ নিতে হবে আমাকে—এখানে প্রতিশোধ বলতে খুন করা বোঝাতে চাননি নীলধ্বজ, বলতে চেয়েছিলেন সত্যব্রত যদি বৃন্দার দিকে লোভের হাত বাড়ায়, তবে তিনিও বিনীতার দিকে লোভের হাত বাড়িয়েই প্রতিশোধ নেবেন। যাইহোক পুরো ব্যাপারটা এতক্ষণে নিশ্চই পরিষ্কার হয়েছে আপনাদের কাছে। সত্যব্রত রায়ের মতো একজন লোভী, লম্পট, নিষ্ঠুর মানুষের কিন্তু উপযুক্ত শাস্তিই পাওয়া উচিত।

তৎক্ষণাৎ দেবাদ্রি সান্যাল তাঁর সঙ্গী অফিসারদের হুকুম দিলেন সত্যব্রত রায়কে গ্রেপ্তার করতে। তারপর গার্গীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আসলে নীলবাবুকে খুঁজে পেলেন বলেই আপনার পক্ষে খুনিকে শনাক্ত করা এত সহজে সম্ভবপর হল, তাই না?

—হ্যাঁ। ওই হলুদবর্ণ খামটির কল্যাণেই তা সম্ভব হয়েছে, বলে গার্গী হাসল আত্মপ্রত্যয়ের হাসি।

pathagar.net

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যে ব্যোমকেশ বক্সী ও ফেলুদা অধিকার করে নিয়েছে এক চিরস্থায়ী আসন। কিন্তু বাংলায় যার অভাব ছিল তা একজন নারী গোয়েন্দা চরিত্র। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টি গার্গী এমনই এক চরিত্র যা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালি পাঠকের মনে সৃষ্টি করেছে এক অপর্যাপ্ত কৌতূহল।

তরুণী গোয়েন্দা গার্গী তার মেধা ও মননে খুব দ্রুত পৌঁছে যায় রহস্যের গহন গভীরে। তার তীক্ষ্ণ চাহনি ও বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যায় দুঁদে অপরাধীও।